সূচীপত্র

বিষয় সূচী

পরিচয়লিপি

কল্লোলে গত এক বৎসর ধরিয়া পরিচয়লিপি লেখা হইতেছে। এই পরিচয়লিপির উদ্দেশ্য, লেখক বা লেখিকাদিগের রচনার ভিতর যে বিশেষ একটি ভাব থাকে তাহা পাঠক-পাঠিকাদের নিকট উপস্থিত করা। কল্লোলের প্রতি সংখ্যার সমস্ত রচনাগুলির বিচিত্রতা হইতে একটি সহজ সুর সংগ্রহ করিয়া তাহাও পরিচয়লিপির আকারে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা অনেক লেখকের লেখাকে সাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত করিয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। যাঁহারা স্বভাবতঃ একটু সঙ্কোচ করেন, অথচ তাঁহাদের রচনাশক্তি আছে, এমন অনেক লেখককে এই অবসরে বাংলার পাঠকসমাজে সুপরিচিত করিতে পারারও সৌভাগ্য ঘটে।

সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া যাঁহাদের ক্ষুণ্ণ করিয়াছি, সে অপরাধ ইচ্ছাকৃত নয় জানিয়াও মার্জ্জনা চাহিতেছি।

আজ এক বৎসর পরে পাঠকপাঠিকা ও বন্ধুদের অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমাদের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়া বলিতে পারি যে কল্লোল এই সকল নানা অবস্থার ভিতরেও আপনাদিগকে ইহার বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া সেবা করিতে পারিয়াছে। ইহার অন্য কোনও কারণে কল্লোল কখনও ভয় পায় নাই, ভয় পাইবে না। আরও সুখের কথা কল্লোলের যে অল্পাধিক গ্রাহক-গ্রাহিকা আছেন তাঁহারা সাধারণের অপেক্ষা বিশেষ ভাবে পৃথক বলিয়া চিহ্নিত এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই আজ পর্য্যন্ত কল্লোলের হিতৈষী ও সহযাত্রী রূপে ইহার সুখদুঃখে জড়িত হইয়া রহিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে নূতন বৎসরের নমস্কার জানাইয়া বৈশাখের কল্লোল উপহার দিতেছি।

এবারকার সংখ্যায় ধ্যানী-কবি রবীন্দ্রনাথ 'শেষ অর্ঘ্যে' বিদায়ের গান গাহিয়া যাত্রা করিয়াছেন, আমরা প্রার্থনা করি বিশ্বকবি ও তাঁহার সহযাত্রীগণ এই দেশ-পর্য্যটন মহিমান্বিত করিয়া ফিরিয়া আসুন।

পরিচয় লিপি

আমাদের শ্রদ্ধেয় ও শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ও শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয় এ সংখ্যায় তাঁহাদের রচনা কল্লোলের পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিতেছেন।

এই সংখ্যায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পারের খেয়া' গল্পটি মনোরম হইয়াছে।

শ্রীসুনীতি দেবী, শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী, শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়, শ্রীলীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুধীর চৌধুরী, শ্রীঅহল্যা গুপ্ত, শ্রীহরিহর চন্দ্র, শ্রীনীলিমা বসু কাজী নজরুল ইস্লাম, শ্রীসান্তনা বসাক, শ্রীসুবোধ রায়, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকলেখিকাগণ কল্লোলের প্রাণ-শক্তির সহিত বিশেষ ভাবে যুক্ত তাঁহাদের রচনা ও উৎসাহ কল্লোলকে বহু ভাবে সাহায্য করিয়াছে।

শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর তাঁহার 'বিচ্ছেদ' নামক গল্পে 'ছোট ভাইয়ের' চরিত্রটি সুন্দর সৃষ্টি করিয়াছেন।

আজ বৈশাখে সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আশা করি আবার সকলে প্রদীপ্ত উৎসাহে সমস্ত অসারতাকে অবহেলা করিয়া এই কল্লোলের সার্থক যাত্রায় যোগ দিবেন।



অত্যাচারের দারুণ কঠোরতার হস্তে প্রতি মুহূর্ত্তে নিষ্পেষিত হইয়া জগতের একজন ভিখারিণী পরের দুয়ারে একমুষ্টি তণ্ডুলের জন্ত দাঁড়াইয়া অশ্রুপাত করিতেছে—সন্তানের মঙ্গলের জন্ত যুক্ত করে মঙ্গল-নিদানের নিকট আপনার দুঃখ জানাইয়া অবসন্ন হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতেছে। * * * আজ বহুদিন পরে সন্তান মাতার উদ্ধারের জন্ত বদ্ধপরিকর হইতে চায়—নির্ম্মমতার দুয়ারে অশ্রু বিসর্জ্জনে কোনও ফল নাই। * * * জগতের সকলে জানুক সভ্যতার আবরণে অত্যাচার কিরূপে লুকাইয়া থাকে। * * * জগতে যাহার জননী বন্দিনী তাহার শান্তি কোথায়? পরের নিকট হইতে ভিক্ষা লইয়া সহস্র সুখ লাভ ঘটিতে পারে কিন্তু তাহাতে অশান্তি বই শান্তি বৃদ্ধি হইবে না। * * * ছিন্ন-বসনা দেবী কারাগারের অশেষ যন্ত্রণার মধ্যেও অনুগ্রহের দান লইতে চাহে না—পুত্রের জন্ত এক মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা মাগিতে যাওয়াও পশ্চাৎপদ।

—বন্দিনী।

৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষ অর্ঘ্য

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যূষ বেলায়
প্রথম শুনাল মোরে নিশান্তের বাণী
শান্ত মুখে ; নিখিলের আনন্দ মেলায়
স্নিগ্ধকণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল ; দিল আনি'
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি' কম্পিত পরশে
চম্পক অঙ্গুলিপাতে তন্দ্রা-যবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা ;
এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে ।

পারের খেয়া

—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১

নসীবপুরের পাহাড়ের নীচে দিয়ে যে নদীটা কুল কুল ক'রে বেয়ে চলেছে সাগরের উদ্দেশে, সেই নদীরই ধারে পাহাড়ের বুকে ছিল বৃদ্ধ ফজলের জীর্ণ কুঁড়েখানি, আর বুক-জুড়ান-মাণিক মা-হারা মনিয়া। ফজলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মারা গিয়েছিল অনেকদিন আগে কোন ছেলেপুলে না রেখে; তাই মুনিয়া প্রথম পক্ষের হ'লেও সে ছিল তার সব। ফজলের পেশা ছিল নদীতে মাছ ধরা আর সেই মাছ নিয়ে হাটে বিক্রী করা। এই ক'রে সে জীবনের তিন ভাগ কাটিয়ে দিয়েছিল।

মুনিয়াদের বাড়ীর একটু দূরেই থাক্‌ত লাল্লু—তার সাথী। লাল্লুর মা ছিল না, বাপ ছিল। মা হারিয়েও বাপের আদরে সে তার মার অভাব বোধ করেনি। লাল্লুর বাপও ফজলের মত মাছ ধরে দিন কাটাত।

ভোরের আলোয় যখন জগৎ হেসে উঠ্‌ত, লাল্লুর বাপ ও ফজল যেত তাদের দিনের কাজে, আবার যখন পশ্চিম দিক রাঙা ক'রে সূর্য্যদেব অস্ত যেতেন তারা তাদের বাড়ীতে ফিরে আস্‌ত। বাপের অনুপস্থিতিতে লাল্লু মুনিয়াদের বাড়ীতে আস্‌ত, সারাদিন তার সঙ্গে গল্প কর্‌ত, আবার সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফির্‌ত। এমন খেলা-ধুলোর মধ্যে তাদের জীবনের ভোর বেলাটা কেটে গেল। তারা যৌবনে পদার্পণ কর্‌ল। ফজল ও লাল্লুর বাবা জান্‌ত যে লাল্লুর ও মুনিয়ার মিল হবে। তারা বেঁচে থাক্‌তে কিন্তু এই মিলের আগেই লাল্লুর বাবার ডাক এল, সে ইহকালের দেনা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। লাল্লু চোখে অন্ধকার দেখ্‌ল। এই সবে মাত্র আঠার বৎসর তার বয়স সে এখন কি করবে! ফজল তাকে অনেক আশ্বাস অনেক সান্ত্বনা দিল। আর যত দিন না তার একটা কিছু হয় ততদিন তার খাওয়া-পরার ভার নিল। এমনি ক'রে আরও দুবছর কেটে গেল।

২

সেদিন ভরা চাঁদনির রাতে জগৎ হাস্‌ছিল। মুনিয়া তার কুঁড়েতে একলা শুয়ে কত কি ভাব্‌ছিল। ফজল আজ বাড়ী নেই কি একটা বিশেষ কাজে গেছে, আস্‌তে দেরী হবে বলে গেছে। মুনিয়ার আর ভাল লাগ্‌ল না, উঠে বাহিরে এল, তারপর নদীর ধারে একটা চড়ায় গিয়ে বস্‌ল। দূরে থেকে তার কাণে বাঁশীর একটা করুণ সুর ভেসে আস্‌ছিল। মুনিয়া বুঝ্‌তে পার্‌ল যে এ বাঁশী বাজাচ্ছে লাল্লু। বাঁশীর সুরে বিভোর হ'য়ে সে ভাব্‌ছিল অনেক কথা —লাল্লুর কথা আরও কত কি! ভবিষ্যতের কি একটা আশা মাঝে মাঝে তার মনের কোণে জাগ্‌ছিল ঠিক একটা রঙীন ছবির মত। পিছন থেকে লাল্লু এসে তার চোখ টিপে ধর্‌ল। মুনিয়া বুঝ্‌তে পারল কিন্তু চুপ করে বসে রইল। চোখ ছেড়ে দিয়ে লাল্লু বল্‌লে "মুনিয়া তুই রাগ করেছিস, না?" অভিমানের সুরে মুনিয়া বল্‌লে "কে বল্‌লে?" "এও বুঝি বলে দিতে হয়?" তুই কথা বল্‌ছিস না আমি কি বুঝ্‌তে পারছি না?" ছল্‌ছল্‌ চোখে মুনিয়া বল্‌লে "তবে তুই কদিন আসিস নি কেন?"

"কি ক'রে আসি বল্? জানিস্ ত পেটের চেষ্টা ত করতে হবে।"

"ও ভারি পেটের চেষ্টা—কেন তুই ত এখানে থাক্‌তে পারিস্, বাবা বলেছে।"

"রোজ রোজ কি থাক্‌তে পারি মুনিয়া, তাহ'লে লোকে কি বল্‌বে বল্?"

"লোকে যা বলে বলুক না—তুই না এলে যে আমার ভাল লাগে না মোটে।"

দুষ্টামির হাসি হাসিয়া লাল্লু বল্‌লে "আমি এলে খুব ভাল লাগে, না?"

লজ্জায় মুনিয়ার মুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল, সে বল্‌লে "যা অমন করিস্ ত তোর সঙ্গে কথাই বল্‌ব না।"

তার গালে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে লাল্লু বল্‌লে "না বলিস্ ত আমার কি? তুই নিজেই মর্‌বি। হ্যাঁরে মুনিয়া, তোর বাবা কোথায়?"

"কি জানি কোথায় গেছে—তুই একটু বসে গল্প কর্ না, তাঁর আস্‌তে দেরী হবে বলে গেছেন।"

লাল্লু সেখানে বসে বসে মুনিয়ার সঙ্গে অনেক ক্ষণ গল্প কর্‌লে, তারপর মুনিয়ার

বাবা এলে সে নিজের ঘরে চলে গেল। খাওয়া দাওয়ার পর ফজল বল্লে "মুনিয়া তোর সাধির ঠিক ক'রে এলুম।"

মুনিয়া চুপ ক'রে রইল। ফজল আপনা আপনিই বল্লে "ছেলেটি বড় ভাল, তার খালি মা বেঁচে আছে, তোর কোন কষ্ট হবে না। কি বলিস্?"

মুনিয়ার বুকখানা কে যেন জোরে দুলিয়ে দিয়ে গেল। সে চুপ ক'রে রইল।

পরদিন মুনিয়ার মুখে সব কথা শুনে লালু অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে ছুটে এল ফজলের কাছে এবং তার কাছ থেকে মুনিয়াকে ভিক্ষা চাইল। ফজল কিছুই বল্লে না। লালু নিরাশ হ'য়ে নদীবপুর ছেড়ে চলে গেল।

তারপর এক বাদ্‌লা দিনে করিম খাঁ এসে মুনিয়াকে সাধি ক'রে নিয়ে চলে গেল। সেই বাদ্‌লা দিনে আকাশ থেকে যেটুকু জল-বর্ষণ হয়েছিল মুনিয়ার চোখ থেকে তার চেয়ে বোধ হয় বেশী জল পড়েছিল। করিমের ব্যবহার দেখে ফজল মনে মনে বল্লে "কাজটা বোধ হয় ভাল হ'ল না।"

৩

মুনিয়ার সাধির পর প্রায় তিন বছর কেটে গেছে। এই তিন বছর লালু বাড়ী ফেরেনি। ভবঘুরের মত এদেশ ওদেশ ঘুরে কাটিয়ে দিয়েছে। যেখানে যায় ভাল লাগে না। মুনিয়ার স্মৃতি কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না। নদীর কল কল তান তার আর ভাল লাগে না। পাখীর গান কঠোর শুনায়। জীবনটা একটা বিড়ম্বনা বলে মনে হয়। সে বসে বসে কত কি ভাবে। তার মনে পড়ে অতীতের কথা। মুনিয়ার সঙ্গে বাল্য জীবন কাটানর কথা। তার কৈশোরের সেইদিনকার কথা মনে পড়ে, যেদিন মুনিয়া সারাদিন ধরে অতি যত্নে তার জন্যে একটা ফুলের মালা গেঁথেছিল, আর রাত্রে তার গলায় সেইটি পরিয়ে দিয়েছিল। এই সব কথা লালু ভাবে। একবার নবীন উৎসাহে নব আশা নিয়ে সে কাজে লাগ্‌বার চেষ্টা করে, কিন্তু পরক্ষণেই মুনিয়ার স্মৃতি এসে দমিয়ে দেয়। এমনি ক'রে উদাস প্রাণে উদাস মনে আরও দু বছর কাটাবার পর সে একদিন হঠাৎ বাড়ী ফিরে এল। বাড়ীতে এসে ফজলের বা মুনিয়ার কোন খবরই পেলে না। পরদিন সে নূতন উৎসাহে বাপের রেখে যাওয়া জাল নিয়ে গেল নদীতে মাছ ধর্‌তে। লোকেরা দেখে সুখী হ'ল। মাস খানেক পরে একদিন সে একটু দেরী ক'রে বাড়ী ফির্‌ছিল। সে প্রায় তীরের কাছে এসেছে এমন সময় দূর থেকে একটা করুণ স্বর তার কাণে ভেসে এল!

সে দূরে তাকিয়ে দেখ্‌লে যে একটা ছোট নৌকা প্রায় জলমগ্ন আর তার আরোহীরা প্রাণের দায়ে চীৎকার করছে। সে ছুটে গিয়ে তাদের নৌকাটাকে অনেক কষ্টে তীরে আন্‌ল। নৌকাতে ছিল একটি শিশু ও একটি বৃদ্ধ। লাল্লু চিন্‌তে পারলে। কিন্তু সে চেতনাহীন! ছোট ছেলেটি জল খায়নি, তাই আর কিছুই হয় নি। অনেক চেষ্টার পর বৃদ্ধের জ্ঞান হ'ল। সে ক্ষীণ স্বরে বল্‌লে "কে আমায় জল থেকে তুললে বাবা?"

লাল্লুর গলার স্বর চিন্‌তে পেরে বৃদ্ধ ফজল বল্‌লে "লাল্লু? তুই এসেছিস? ভালই হ'ল। তোকেই আমার দরকার ছিল। যাক্ আল্লা তোকে জুটিয়ে দিয়েছেন।"

লাল্লু বল্‌লে "আপনি আস্তে আস্তে বাড়ী চলুন, সব কথা পরে শুন্‌ব।" হাঁপাতে হাঁপাতে ফজল বল্‌লে "তার আর অবসর হবে না। আমার সময় হ'য়ে এসেছে। আমার দাদু কই, দাদু?" লাল্লু ছেলেটিকে ফজলের কাছে দিল। ফজল বল্‌লে "মুনিয়াকে তোমার হাতে দিইনি তার জন্যে অনেক দুর্ভোগ ভোগ করেছি। কিন্তু এটিকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। এখন থেকে তুমি এর সব।"

আশ্চর্য্য হ'য়ে লাল্লু বল্‌লে—"কেন মুনিয়া? সে কোথায়?"

"সে আজ এক বছর আগে মারা গেছে।" লাল্লুর বুকে কে যেন মুগুরের ঘা মারতে লাগ্‌ল। সে বল্‌লে "করিম খাঁ?"

"সে আবার সাধি করেছে—দাদুকে আমার নিতে পারবে না। মুনিয়াকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছিল—সে তার হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে—এখন বলে, যে ছেলের ভার সে নিতে পারবে না।" কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফজলের প্রাণবায়ু বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে গেল।

বৃদ্ধকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে লাল্লু শিশুর হাত ধরে বাড়ী ফির্‌ল। তার কেবল মনে হ'তে লাগ্‌ল—মুনিয়ার সেই মুখখানি আর তার এই স্নেহের দান।

* * * *

তারপর থেকে যে কেউ তাকে ছেলেটির কথা জিজ্ঞাসা করে, তাকেই সে বলে, "এটি আমার পারের খেয়া।"



পান্থবীণা

— শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪

আজিকার এই মেঘ্‌লা-শাত-শীত দিনটা যে কেমন করিয়া কাটিবে, নিভা তাহাই ভাবিতেছিল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, বিভাকে সঙ্গে লইয়া আজিও দুপুর বেলাটা কোনো এক বন্ধুর বাড়ীতে কাটাইয়া আসিবে।

বিভা জানালার ধারে বসিয়া তাহার একটা রঙিন জামা কাঁচি নিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছিল।

একটি কাজ কর্‌ ত ভাই বিভা। বলিয়া নিভা তাহাকে কি একটা কথা বলিবার জন্য অগ্রসর হইতেই নূতন জামাটার দুরবস্থা দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, সকাল বেলা আজ আবার মাথায় এ কি ঝোঁক্‌ চেপেছে তোর? জামাটা কেটে ফেল্‌লি যে হতভাগী?

কাট্‌বো না ত সারাদিন তোমার পায়ে কত তেল দেব দিদি? মেয়ের খান-দুই জামা আজ কদিন থেকে চাইছি বল ত?—মুখ না তুলিয়াই গম্ভীর ভাবে এই কথা কয়টা বলিয়া বিভা আপন মনে পুনরায় কাঁচি চালাইতে লাগিল।

নিভা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, নিজের ভালো জামা কেটে পুতুলের জামা তৈরী করতে হয়, এ বিদ্যে তোকে কে শেখালে?

বিভা এইবার মুখ তুলিয়া বলিল, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে,—আর মোটে তিনটি দিন বাকী, জান?

নিভা আর একবার হাসিল। বলিল, দূর্ পোড়ার মুখী, পোষ্ মাসে কি বিয়ে হয়? এটা যে পোষ্ মাস?

বিভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হয় হয়,—তুমি জান না। মেয়ে বড় হয়েছে, আর রাখা যায় না।

আচ্ছা বেশ, তাই না হয় হ'ল, কিন্তু আজ দুপুরে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি ত?

হ্যাঁ যাব। বলিয়া কয়েকটা গোলাকার কাপড়ের মাঝখানে পুতুলের মাথা গলাইবার মত একটি ছোট ছিদ্র করিয়া বিভা বলিল, দেখ না দিদি কতগুলো হ'ল,—এই ধর, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত,—

থাক্ অনেক হয়েছে, আর গুনতে হবে না। বলিয়া কাপড়ের টুক্‌রাগুলা নিভা তাহার কোলের উপর ফেলিয়া ডাকিল, বেয়ারা!

দরজার বাহিরে কৈলাস আসিয়া দাঁড়াইতেই নিভা বলিল, ঠাকুরকে বল কৈলাস, আজ যেন সাড়ে-দশটার মধ্যে আমাদের খাবার দিয়ে যায়, আমরা বেড়াতে বেরোব।

কৈলাস চলিয়া গেল এবং অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, উনানে আগুন দেওয়া হইয়াছে কিন্তু এখনও ভাত চড়ানো হয় নাই; দাদাবাবুর কে এক বন্ধু নাকি আজ এখানে আহার করিবেন, পোলাও রান্না হইবে, ঠাকুর বাজারে গিয়াছে এবং ফিরিতে হয়ত তাহার একটুখানি দেরীও হইতে পারে।

দাদাবাবুর বন্ধুটি যে কে, এবং কিসের জন্য আজ তাহার এখানে নিমন্ত্রণ, সে কথা বুঝিতে নিভার দেরী হইল না, এবং এই চিন্তার সূত্র ধরিয়া গত কল্যকার জুতা ফেলিয়া দেওয়ার ব্যাপারটাও তাহার মনে পড়িয়া গেল। বলিল অত সব জানিনে বাপু! শোন কৈলাস, সাড়ে দশটার সময় ভাত আমার চাই ই। তা নইলে কিছু বাকী রাখ্‌ব না বলে দিচ্ছি।

কৈলাস ভয়ে ভয়ে নীচে নামিয়া গেল।

নিভা বলিল, ও সব রাখ্ বিভা, চান করবি তো আয় আমার সঙ্গে।

বিভা তাহার দিদির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, চান? বাবাঃ যে শীত! আমি পারব না দিদি, তুমি যাও।

নিভা আর কোন কথা না বলিয়া স্নানের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

স্নান যখন তাহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, বিভা বন্ধ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, দিদিমণি!

স্নানের ঘরের ভিতর হইতে কোন সাড়া না পাইয়া বিভা সেই দরজার উপর বার কতক আঘাত করিয়া বলিল, এসো দিদিমণি, দাদা ডাকৃছে, শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো।

একটা বড় আর্সির সন্মুখে দাঁড়াইয়া নিভা লোসন্ দিয়া তাহার চুলগুলা ঝাড়িয়া লইতেছিল, বাঁ হাত দিয়া দরজার ছিট্‌কানিটা খুলিয়া দিল।

বিভা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, দাদা ডাকৃছে কতক্ষণ থেকে, শুনতে পাচ্ছো না?—বা, তোমার এটার তো বেশ গন্ধ। আমার চুলেও একটু দাও না দিদি?

তাহার মাথার উপর খানিকটা লোসন্ ঢালিয়া দিয়া নিভা বলিল, তখন ডাক্‌লুম, এলিনে যে?—দাদা আমায় কি জন্যে ডাকৃছে রে বিভা?

বিভা বলিল, তা আমি কেমন ক'রে জানব? তুমি এসো, আমি চল্লুম। বলিয়া বিভা চলিয়া যাইতেছিল, নিভা তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাদা একা রয়েছে?

না, সেই বংশীদা এসেছে।

সে তোর দাদা হয় বুঝি? বলিতে বলিতে সোনার একটা ক্রচ্ দিয়া নিভা তাহার সাড়ীর আঁচলটা আট্‌কাইয়া লইতেছিল; ক্রচের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ হঠাৎ তাহার আঙুলের ডগায় ফুটিয়া যাইতেই উঃ বলিয়া ক্রচ্‌টা মেঝের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে সে বলিয়া উঠিল, আর পারিনে বাবা,—যা বল্‌গে যা, সে এলো না।

বেশ, তাই বলিগে। বলিয়া বিভা বাহির হইয়া গেল।

ইচ্ছাসত্ত্বেও নিভা তাহাকে আর ডাকিয়া ফিরাইতে পারিল না। সম্মুখে আর্সির উপর তাহার নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে একদৃষ্টে সে বহুক্ষণ ধরিয়া তাকাইয়া রহিল এবং এক সময় অন্যমনস্কের মত ক্রচ্‌টী কুড়াইয়া লইয়া সাড়ীর স্খলিত অঞ্চলের উপর আটকাইয়া দিয়ে ধীরে ধীরে অমরেশের ঘরে গিয়া দাঁড়াইল।

সোফার একপার্শ্বে বংশী বসিয়াছিল, তাহার কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিভা একখানা ছবির বই উল্টাইতেছে। সহসা দিদিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিভা বলিয়া উঠিল, কেমন? আস্তে হ'ল কি না?

নিভা যেন একটুখানি লজ্জিত হইয়া পড়িল। বংশী একবার মুখ তুলিয়াই তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নত করিয়া বইএর একখানা ছবির দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিল।

অমরেশ বলিল, ওরে নিভা, আজ আবার তুই কোথায় যাব বলেছিস?

নিভা দেখিল, দরজার পার্শ্বে তাহাদের পাচক-ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথ জোড় হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। এ কাজ যে তাহারই, সে সম্বন্ধে তাহার কোনো সংশয় রহিল না। নিভা একবার তাহার দিকে তাকাইয়া রুক্ষ, কণ্ঠে কহিল, তাই আসতে না আসতেই নালিশ হয়েছে বুঝি?

বিশ্বনাথ ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

অমরেশ বলিল, না রে না, ওকে আর কিছু বলিস্ নি। সাড়ে দশটার সময় ভাত আর ও দিতে পারবে না,—তোরও কোথাও যেয়ে কাজ নেই।

নিতান্ত নিরুপায় হইয়া নিভা ঠাকুরের দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

অমরেশ বলিল, যাও বিশ্বনাথ, তুমি যাও। নিভা যদি আজ একটু ওকে দেখিয়ে শুনিয়ে না দিস্ তাহ'লে রান্না যা করবে তা তো আর মুখে দেওয়া যাবে না।

যা করে করুক, তাই বলে আমি আর রান্নাঘরে যেতে পারবো না দাদা। বলিয়া নিভা বসিতে যাইতেছিল, হঠাৎ সম্মুখস্থ আয়নাটার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সকলের অলক্ষ্যে প্রথমে সে তাহার নিজের মুখখানা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। আয়নার ভিতরে বিভা এবং বংশী সকলকেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, বংশীর খালি পা দুইটার দিকে সহসা তাহার নজর পড়িতেই নিভা কোন প্রকারেই তাহার হাসি দমন করিতে পারিল না। আর একটা সোফার উপরে বসিয়াও সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছিল কিন্তু অমরেশের নিকট তাহার সে হাসি ধরা পড়িয়া গেল।

অমরেশ বলিল, হাসছিস্ যে?

মুখে কোনো কথা না বলিয়া বংশীর পা দুইটার দিকে নিভা তাহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

আঙ্গুল বাড়াইয়া ঘরের কোণের দিকে কার্পেটের উপর একজোড়া নূতন জুতা দেখাইয়া দিয়া অমরেশ বলিল, আর এগুলো কি ?

কিনেছেন বুঝি ?

কিন্‌বে না ? তুমি যেমন ডাকাত ?

নিভা বলিল, হাঁ ডাকাত ! তা বই কি ! আমার মার্ব্বেলের চেয়ে ওঁর একজোড়া জুতোর দাম বেশী নয়, তা জান ?

কথাটা তাহারই উদ্দেশে বলা হইতেছে ভাবিয়া বংশী একবার মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিল কিন্তু পরক্ষণেই তাহাকে পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া নিভারও আপাদ মস্তক জ্বলিয়া গেল। দেওয়ালের আর্সিটার দিকে তাকাইয়া পুনরায় সে তাহার নিজের মুখখানাই একাগ্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কিন্তু এমন ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেখান হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই নিভা ডাকিল, বিভা !

বংশী তখন বিভাকে কি একটা ছবির অর্থ বুঝাইয়া দিতেছিল। দিদির ডাকে একবার মাত্র সাড়া দিয়া বিভা পুনরায় বংশীর কথাগুলা শুনিতে লাগিল। বংশী বোধ করি নিভার কথাটা শুনিতে পায় নাই, তাই, সেও চুপ করিল না।

নিভার রাগ আরও বাড়িয়া গেল। সে আবার ডাকিল, বিভা !

বংশী বিপরীত দিকে মুখ রাখিয়াই বলিল, যাও না, দিদি কি বল্‌ছে শুনে এসো।

কথাটা অগ্রাহ্য করিয়া বিভা বলিল, না, তারপর কি হ'ল বল।

নিভা বলিল, আমি বলে দিচ্ছি আয়, উনি জানেন না।

দিদির মুখের পানে ফিরিয়া তাকাইয়া বিভা বলিল, হাঁ, বংশীদাদার চেয়ে তুমি বুঝি বেশী জান ?—তুমি বুঝি ওঁর চেয়ে বেশী পড়েছ ?

হাঁ পড়েছি। শোন্। ছবি যারা আঁক্‌তে পারে না, তাদের মাষ্টারী করাও সাজে না।

অমরেশ বুঝিল, নিভার ছবিখানার উপর গত কল্য বংশী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে, ইহা তাহারই আক্রোশ। বলিল, শুনেছিস্, বংশী, আমি না কাল তোকে বলেছিলুম, ওর আঁকা ছবি খারাপ হ'লেও ভালো বল্‌তে হবে।

বংশী মুখে কিছু বলিল না, নিভার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না, অমরেশের মুখের পানে তাকাইয়া সে ঈষৎ হাসিল মাত্র।

মুখে কিছু বলিলেও বা কোন রকমে এ বিতর্কের মীমাংসা হইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তাহার দিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া অপরের মুখের পানে তাকাইয়া এই যে একটুখানি অবহেলার হাসি, নিভার বুকে বড় নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করিল। সহসা সে এই সামান্য কারণেই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল,—দুর্জ্জয় অভিমানে তাহার অন্তর-বাহির গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কোন মতে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া নিভা খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। অমরেশ বলিল, যাচ্ছিস্ কেন নিভা, তার চেয়ে একটা গান গা, শুনি।

ইচ্ছা হয় এর পর শুনো। বলিয়া নিভা চলিয়া যাইতেছিল, অমরেশ বলিল, তোর একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই নিভা, সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

কি একটা অপ্রিয় শক্ত কথা নিভার ঠোঁট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু যাহার উদ্দেশে সে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল সেই নিরীহ বংশীর শান্ত সুন্দর মুখের অচঞ্চল গাম্ভীর্য্য এবং প্রবল ঔদাসীন্যের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সন্ধানী শর তাহার ধনুকের ছিলাতেই আট্‌কাইয়া রহিল,—নিক্ষেপ করিতে সাহস হইল না। না জানি, পাষাণে নিক্ষিপ্ত এই শর হয়ত ফিরিয়া আসিয়া তাহারই বক্ষভেদ করিয়া বসিবে! . . . আর কোনো দিকে না তাকাইয়া নিভা নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং দুড়্ দুড়্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে নীচের রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

রান্নাঘরের পাশে যে ঘরটা ছিল, সেইখানে বসিয়া বিশ্বনাথ তখন গাঁজার কলিকায় আগুন চড়াইয়া সবে মাত্র একটি দম দিয়াছে এবং কৈলাশ হাত বাড়াইয়া কলিকাটা লইতে যাইতেছে, এমন সময় নিভার চটি জুতার শব্দ শুনিয়া উভয়েই চমকিয়া উঠিল, বিশ্বনাথের বুকের ভিতর পট্ পট্ করিয়া অতি দ্রুত তালে সেই জুতার শব্দের যেন প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, কোন রকমে হাতের কলিকাটা ছুঁড়িয়া দিয়া নিশ্চল পাথরের মত সে বসিয়া রহিল, তাহার গলার ভিতরটা পর্য্যন্ত নিমিষেই যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল।

কৈলাস তাড়াতাড়ি নিভার কাছে আসিয়া বলিল, আপনি আবার কেন নীচে নেমে এলেন দিদিমনি, বিশ্বনাথ সব ঠিক ক'রে ফেলেছে—আর আধ ঘণ্টা খানেক।

নিভা বলিল, না, আর এক মিনিট নয়,—যেমন হয়েছে আমায় তাই দিতে বল, ঠাকুর কোথায় ?

নিভা যে তাহাদের অপকর্ম্মটা দেখিতে পায় নাই, শুধু আহারের নিমিত্ত নীচে নামিয়া আসিয়াছে, ইহা জানিয়া কৈলাস যেন নিমেষেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল এবং চীৎকার করিয়া বিশ্বনাথকে ডাকিয়া বলিল, যেমন হয়েছে তেম্‌নি দাও।

বিশ্বনাথও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া থালা বাটি টানিয়া লইয়া সাজাইতে সুরু করিতেছিল, নিভা তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, এখন খাব না। একটু একটু ক'রে দাও কেমন রান্না হয়েছে তাই দেখি।

মাংস মুখে দিয়াই নিভা চীৎকার করিয়া উঠিল, জল! জল! ছি, ছি, একি কোরেছ ঠাকুর! যা ভেবেছি তাই!

নিভা আর কথা বলিতে পারিল না, দর্‌ দর্‌ করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া এক গ্লাস জল খাইয়া উঃ! আঃ! করিতে করিতে সে রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিল। বলিল, যাও বিশ্বনাথ যাও তুমি, অন্য কোথাও চাক্‌রির চেষ্টা দেখ বাপু, এখানে আর চল্‌বে না। বাড়ীতে একটা ভদ্রলোক এসেছে, এ রান্না মুখে দেবে কেমন ক'রে বল ত ?—কি চড়িয়েছ ?

অতি কষ্টে বিশ্বনাথ উত্তর দিল, পোলাও আর চাট্‌নি।

সর, তুমি আর হাত দিও না। বলিয়া নিভা উনানের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে-ভয়ে বিশ্বনাথ সরিয়া গেল।

নিভা ডাকিল, কৈলাস! যাও তুমি বাজার থেকে আবার মাংস নিয়ে এসো—এত ঝাল কেউ সহ্য কর্‌তে পারে না। উঃ!

কৈলাস বাজারে চলিয়া গেল বিশ্বনাথ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, আপনি পার্‌বেন না দিদি-ঠাক্‌রুণ,—আমায় ছেড়ে দিন!

নিভা রাগিয়া উত্তর দিল, আর কথা বলো না ঠাকুর, তুমি সরে পড়। মেয়েরা আর-কিছু পারে আর না পারে, অন্ততঃ রাঁধ্‌তে জানে।—তোমার মাইনে বাকী আছে ?

বিশ্বনাথ ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল যে, মাহিনা তাহার বাকী নাই।

নিভা বলিল, আজ খেয়ে দেয়ে তুমি চলে যাও, তোমায় আমি জবাব

দিলুম। দাদার কাছে গিয়ে কাঁদতে পাবে না বলে দিচ্ছি, তাহ'লে আমি কিছু বাকী রাখ্‌ব না—অপমান করে' তাড়িয়ে দেব, জান?

এখানের অন্নজল বিশ্বনাথের যে আজ হইতে উঠিয়া গেল তাহা সে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াই ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইল।

খাইবার সময় বিশ্বনাথের পরিবর্ত্তে নিভাকে পরিবেশন করিতে দেখিয়া গর্ব্বে এবং আনন্দে অমরেশের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, তবে যে সে সময় বল্‌লি পার্‌ব না? দেখ্‌ দেখি কেমন সুন্দর মানিয়েছে,—এই ত চাই!

কথাটা শুনিয়া বংশীও একবার মুখ তুলিয়া নিভার মুখের পানে তাকাইল। তাহার সে নিঃসঙ্কোচ এবং নির্ভীক দৃষ্টির মধ্যে কোনো অর্থই ছিল না, তথাপি নিভা তাহা লক্ষ্য করিতেই তাহার কর্ণমূল হইতে গণ্ডদ্বয় পর্য্যন্ত সহসা হিঙ্গুলের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

পেরেছি কি সাধে? দেখ্‌বে তবে? বলিয়া নিভা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে বিশ্বনাথের রাঁধা এক বাটি মাংস আনিয়া অমরেশের থালার নিকট ধরিয়া বলিল, খাও তো দেখি?

খানিকটা মাংস মুখে দিয়াই অমরেশ বলিয়া উঠিল, এই বুঝি সে রান্না করেছিল? উঃ! বলি, হাঁ হে বিশ্বনাথ, বাজারে আজ লঙ্কা কি আর আছে, না সব এতেই দিয়েছ?

কথাটা শুনিয়া নিভা হাসিয়া একবার বংশীর দিকে তাকাইল। সে তখন নতমুখে আহার করিতেছিল।

বিভা এই অবসরে তাহার পুতুলকে জামা পরাইয়া লইতেছিল। নিভা বলিল, এ সময় পুতুল নিয়ে বস্‌লি কেন বিভা, খেতে হবে না?

বিভা বলিল, দাঁড়াও না দিদি, আর এই একটা।

বাবাঃ! এর মেজাজ্‌ দেখ্‌লে কি হয়! বলিয়া বংশীর দিকে একবার কটাক্ষ হানিয়া নিভা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথাটা বলা হইল, সে-ব্যক্তিটি যেমন নতমুখে বসিয়া আহার করিতেছিল, তেমনি বসিয়া রহিল, একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিভা নীচে নামিয়া আসিয়া বলিল, আমায় এবার দাও দিদি, বড় খিদে পেয়েছে।

পাবে না? বেলাও তো কম হয়নি! বলিয়া রান্নাঘরের এক কোণে তাহাকে খাইতে দিয়া নিভা তাহার সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল।

বিভা বলিল, তুমি খেতে বস্‌লে না দিদিমণি?

ঈষৎ হাসিয়া নিভা বলিল, দাঁড়া ভাই, সবাইকে খাইয়ে নি, আগে। দাদার ঐ অসভ্য বন্ধুটা এসে যে আমায় রাঁধুনি সাজিয়ে ছেড়ে দিলে।

একটু পরে নিভা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা. বল্ দেখি বিভা, এখন আমায় কেমন মানাচ্ছে?

বিভা একবার দিদির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, বেশ।

আর যখন আমি সেই চান্ করে' তোদের কাছে গেলুম?

বিভা বলিল, তখনও বেশ।

নিভা আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিল. ,কোন্‌টা বেশ? তখন না এখন?

সেই তখন। চুলগুলো এখন মাথার উপর বেঁধেছে কিনা নাই—

ছাই দেখাচ্ছে বুঝি? দূর পাগলী। তুই কাণা, তোর চোখ নেই।

পরাভব স্বীকার করিতে বিভা কোন কালেই রাজী নয়, বলিল, চল, না হয় দাদাকে জিজ্ঞেস করবে।

মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া নিভা বলিল, কোন দাদাকে? আমাদের দাদা, না তোর সেই কাঠ্‌খোট্টা বংশীদাদাকে?

বংশীর কাঠখোট্টা অপবাদে বিভা যেন একটুখানি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, হাঁ! বংশীদাদা বুঝি তাই? অমন চেহারা—

নয় ত কি? বলিয়া নিভা হাসিতে লাগিল।

সমস্ত দিন টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসও বহিতেছিল। অপরাহ্নের দিকে বৃষ্টি ধরিয়া আসিল এবং একটুখানি স্নিগ্ধ রৌদ্রের আভাস তারের ফাঁক দিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িল। আজ এই বাদলের দিনে নিভার মনটাও যেন খামোখা ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিয়াছিল এতক্ষণে শান্ত মধুর একটি চাহনির মত মেঘাবরণমুক্ত সূর্য্যের এই প্রসন্ন দৃষ্টির সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাহার মনের উপর হইতে যেন একটা মেঘের সূক্ষ্ম পর্দ্দা সরিয়া গেল। মনে মনে আজ সারাদিনের অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলির আলোচনা করিতে গিয়া নিভা দেখিল, আজ সে লঘু পাপে একটা গুরু দণ্ড করিয়া বসিয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল,

বিশ্বনাথকে যেন না তাড়াইলেই ভাল হইত। তৎক্ষণাৎ কৈলাসকে ডাকিয়া নিভা জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্বনাথ চলে গেছে ?

কৈলাস বলিল, হাঁ দিদিমণি, বংশীবাবুর সঙ্গে সে এইমাত্র চলে গেল ?

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিভা কহিল, বংশীবাবুর সঙ্গে ? কেন, তার সঙ্গে কেন ?

কৈলাস তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, গরীব লোক দিদিমণি, আজকাল-কার বাজারে চাকুরী পাওয়া তো সোজা নয়! তাই বংশীবাবু যখন এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সে তাঁর হাতে পায়ে ধরে কেঁদে বল্লে,—আপনি যদি দিদিমণিকে একবার বলে দেন বাবু, তাহ'লে আমার চাকুরীটি থাকে। তাই-না শুনে বংশীবাবু বললেন,—তা আমি পারব না বাপু, তবে তুমি আমার সঙ্গে এসো, দেখে শুনে তোমার একটা চাকুরী আমি যোগাড় করে' দিতে পারি।

কথাগুলা শুনিয়া নিভা যেন দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিল। বলিল, ত্থাখো কৈলাস তোমাদের আমি এখন থেকে বলে' রাখ্ছি, ফের যদি বিশ্বনাথ আমাদের বাড়ী ঢোকে, তাহ'লে ঐ সদর দরজা থেকে তাকে দূর ক'রে দিও। তা না হ'লে বুঝ্তেই পারছ, তোমাদের কারও চাকরী থাক্‌বে না।

এই বলিয়া তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া টেবিলের উপর বই এবং কাগজ পত্রগুলা বিনা কারণেই নিভা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

কৈলাস ভয়ে ভয়ে বলিল, যে আজ্ঞে দিদিমণি!

সে চলিয়া গেলে নিভা উদাস গম্ভীর দৃষ্টিতে একবার বাহিরের পানে তাকাইল। দেখিল তাহাদের কথা কহিবার অবসরে কোথা হইতে এক খণ্ড মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং সম্মুখের বারান্দার উপর হইতে তাহার সামান্য রশ্মিটুকুও কোন্ সময় অপসারিত হইয়া গিয়াছে। ধরণীর বুকে মেঘে ও রৌদ্রে লুকোচুরি খেলা আবার সুরু হইল! . . .

ক্রমশঃ

চাওয়া

—শ্রীলীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়।

১

সন্ধ্যার অন্ধকার রোগীর ঘরে বেশী ক'রেই যেন জমাট বেঁধেছিল। পল্লীগ্রামের নীরবতা ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে দু একটা কুকুর দূরে দূরে ডাকছিল—আর অশ্রান্ত ভাবে শোনা যাচ্ছিল এক টানা ঝিল্লিরব!

দুয়ারের বাইরে এক মাত্র সঙ্গী চাকর দীনু বসেছিল আর ঘরের মধ্যে ছোট্ট বিছানার ওপর অতুল এ পাশ ওপাশ ক'রে ক'রে এই কিছুক্ষণ ক্লান্ত হ'য়ে একটু চুপ ক'রে পড়েছিল।

বাহিরের অন্ধকার—নির্জ্জন পল্লী আর এই নীরব রোগী, দীনু যেন ক্রমশঃ কেমন অস্থির হ'য়ে পড়্ছিল। বার দুই চেষ্টা করে' সে ধীরে ধীরে ডাক্‌লে বাবু!

অতি ক্লান্ত স্বরেই অতুল উত্তর দিলে "ডাক্‌ছ?"

"না। ঘুমুলেন কি তাই দেখ্‌ছিলুম্।"

"ঘুম? নারে ঘুম কই? ঘুম এলেও ত বাঁচতুম্—আজ ক'দিন ধরে ঘুমও নেই যে, আর ভাবনা—"

আচ্ছা বাবু, কেউ কি আপনার নেই? এত বড় অসুখ, আর এই পাড়াগাঁ, ডাক্তার বদ্যি কিছু মেলে না তেমন—আর কল্‌কতা ছেড়ে আপনি কি না অসুখ নিয়ে এলেন এখানে।

"আমার কেউ নেই দীনু, আপনার বলতে এই এক পিসিমা। তিনি এখানেই থাকেন। তাঁরই কাছে এসেছিলুম। অসুখটা সবাই শক্ত বল্‌লে, তাও তিনিও আবার তীর্থে গেছেন হঠাৎ, আমি জান্‌তুম না আর জান্‌বার—দেখ্‌ত দীনু দুয়ার খুল্‌লে কে?"

বাহিরে ব্যগ্রকণ্ঠে কে বলে উঠ্‌ল তুমি এখানে দাঁড়াও শক্তি, আমি দেখি—"

"দীনু দীনু আলো একটা—একটা আলো নিয়ে যাও, আমার বড় বিনয়—" বলিতে বলিতে এই উত্তেজনার ফলে অতুল অজ্ঞান হইয়া গেল।

দীনুও ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল আর সেই মুহূর্ত্তেই ঘরের ভিতর এক তরুণ ও এক তরুণী ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল; মুহূর্ত্তমাত্র তরুণী স্তব্ধ হইয়া সব দেখিয়া লইল। পর মুহূর্ত্তে রোগীর নিকট আসিয়া রোগীর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া বিছনার উপর বসিয়া বলিল, "দেখ ঐ কুঁজোটায় বোধ হয় জল আছে, দাও ত ঐ গ্লাসটায় ঢেলে। আর তুমি পাখাটা আমায় দাও ত বাবু, আর কিছু ভয় নেই, বড় দুর্ব্বল কি না তাই—"

"বিনয়! বিনয়!"

"এই যে, ভাই আমি এসেছি। তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে এসেছি আবার কে এসেছে দেখেছ? শক্তিও আমার সঙ্গে এসেছে।"

"তাইত একি করেছ বিনয়? ওঁকে কেন নিয়ে এলে?"

"কি করি বল? আর রেখেই বা আসি কার কাছে? তোমার ও আমার দুজনেরই ত আপনার বল্‌তে কোনও বালাই নেই। ঝি চাকরের মধ্যে রেখেই বা আসি কি করে? আর শক্তি যা' বললে তাও ঠিক, এ সব বিষয়ে আমরা ত ঠিক করে কর্‌তেও পারি না ভাই, একটু আগে ও না থাকলে—"

"কি যে বাজে বকো তুমি!"

অতুল শক্তির কণ্ঠস্বরে মাথা তুলিয়া চাহিল। আশ্চর্য্য! যে বন্ধুপত্নীকে সে কোনও দিন চোখেও দেখে নাই, আজ তাহারই কোলে মাথা দিয়া সে শুইয়া আছে! সে সঙ্কোচের মধ্যেও নারীর এই মহিমময়ীমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

২

"আপনি খুব লক্ষীর মত ওষুধটা খেয়ে নিন,—তবে আমি আরও পড়্‌ব, না হ'লে আর পড়্‌ছি না।"

"শক্তি।"

"কেন?"

তাহার এই আব্‌দার মাখান স্বরে অতুল হাসিয়া উঠিল।

"বেশ ত হায়নে শুয়ে শুয়ে, আমি চল্লুম।"

"কোথায়?"

"কেন আমার কি আর কাজ নেই নাকি ?"

"আচ্ছা, কি কাজ শুনতে—"।

শক্তি এইবার রাগিয়া গেল "বয়ে গেছে বল্‌তে—সেই থেকে ওষুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—"

অতুল হাসিয়া উঠিল, "ব্যস্‌, হয়েছে, চোখে জল এসে গেল ত ? শক্তি, এই ছ'মাসেও তোমার একটু ক্লান্তি এল না—তুমি কি !"—বলিতে বলিতে তাহার নিজের কণ্ঠ এইবার অশ্রুভারে রুদ্ধ হইয়া গেল। নিজেকে মুহূর্ত্তে সংযত করিয়া অতুল স্নিগ্ধস্বরে বলিল "দাও ওষুধ, বাপরে, বিনয় কি করেই যে ঘর করে তোমায় নিয়ে—এমন কাঁদুনে আমি কখন ত দেখিনি, আর—"

"বেশ, বেশ আপনি ত ভাল, কি করে ঘর করেন ? আপনিও ঘর কচ্ছেন—"

বাধা দিয়া অতুল ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল "শক্তি !"

শক্তি চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—কি দেখিল সে ই জানে, মুহূর্ত্তে সে মুখখানি নত করিয়া ঔষধটি অতুলের হাতে দিল। মুখে ঢালিয়া দিবার সাহস যেন সে আর খুঁজিয়া পাইল না।

"বিনয় কবে আস্‌বে শক্তি ? এত দেরী কর্‌ছে কেন সে ? একি, চুপ করে কেন ?"

লজ্জিত নত দৃষ্টি তুলিয়া সে "জানিনা" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আর তার গমন পথের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল অতুল। তাহার ত কোন অভাব ছিল না। যশ, মান, সম্পদ, রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি সবই প্রচুর ছিল, কিন্তু একি অজানা অভাবের বেদনা তার সমস্ত বুকে ভরিয়া উঠিতেছে !

সে কলিকাতা ছাড়িয়া এই পল্লীগ্রামে পিসিমার বাড়ী আসিয়াছিল, আত্মীয়ের সেবা পাইবার জন্য। আর কে এই পরমাত্মীয় ! তাকে এমন করিয়া সুস্থ করিয়া তুলিল। বন্ধু—পরমবন্ধু বিনয়ের স্ত্রী সে, কিন্তু একি ! একি উচ্ছ্বাস তার বুকে আজ !

৩

"দেখ শক্তি, নিমন্ত্রণ সেরে ফির্‌তে আমার হয়ত খুবই রাত হবে, তুমি অতুল এলে ব'ল—আজ যেন সে বাড়ী না যায়—আর যদি বেশী রাত হওয়ার

জন্যে তারা না ছাড়ে, অতুল থাক্‌লে, তোমার ভয় কর্‌বে বলে ভাবনাও আমার থাক্‌বে না—কেমন ?”

“তুমি ত জান রাত্রে তিনি থাক্‌তে চান না। সেখান থেকে এসে হপ্তা দুই ছিলেন—তারপর যত রাতই হ’ক না বাড়ী চলে যান। তুমিও ত এর জন্যে কত বকেছ—”

“এক পাগল তার আর কি ! অদ্ভুত খেয়ালী, সেখান থেকে এসে শরীরটা সারা পর্য্যন্ত কোন ক্রমে রেখেছিলুম। কি যে বোঝে। বাড়ীতে কেউ থাক্‌লেও বা কথা ছিল, কেউ নেই, থাবে এখানে। সেই রাত দুপুরে টুক টুক করে বাড়ী যাবে, তা দেখ তুমি একলা থাক্‌বে ছেলে মানুষ, এ কথা সে জান্‌লে কখনই যেতে পার্‌বে না।”

পরম নিশ্চিন্ত মনে স্বামী চলিয়া গেল, শক্তি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই সদানন্দ প্রেমময় স্বামী ! এই বুকভরা অনন্ত বিশ্বাস, তাহার চোখ দুইটা জ্বালা করিতে লাগিল, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বারান্দার উপর বসিয়া পড়িল।

দূরে রান্নাঘরে ঠাকুর কাহার সহিত তর্ক করিয়া বলিতেছিল “হাঁ, মানুষ আবার পারে না—মানুষ যে, সে সবই পারে।” দাসীর মা মসলা পিষিতে পিষিতে বলিয়া উঠিল “সবাই যদি মানুষ হ’বে ত ভাবনা কি ?”

“শক্তি !”

শক্তি চমকিয়া মুখ তুলিল। জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরা ! সেই আলো ঘরে বাইরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; আর সেই আলোক কতকটা যেন সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া সম্মুখে অতুল দাঁড়াইয়া !

শক্তি প্রাণপণে জোর করিয়া হাসিয়া উঠিল, “এই যে ঠাকুরপো ! এত দেরী হল তোমার ? যা ভয় করছিল—একলাটি—”

“বিনয় কোথা গেল ? তার রাজকার্য্য কি সকল সময় ?”

“তুমি ও ত এতক্ষণে এলে ঠাকুর পো। সেই সকালেই একটি বার এসেই চলে গেছ, আমি সমস্ত দিন—”

“শক্তি, এ যে ছন্নছাড়া মানুষ। বিনয় গেল কোথা ? সে—”

“তুমি ইচ্ছা করে আসনা ঠাকুরপো আমি জানি। না এসে ভাল থাক না হয়ত, কিন্তু ইচ্ছে করেই যে আস না এ ও ত ঠিক। কেন

এম্নি করে ভাবিয়ে তোলো? শরীর যদি ভাল হ'ত বাড়ীতে কেউ থাকৃত তাহ'লে আমি বলতুমও না।"

"থাকৃলে সহ্যও হ'ত না তোমার; ছিঃ আবার কাঁদে? একি! চা খাবার এ সব—"

"আনি" বলিয়া মুহূর্ত্তে শক্তি চলিয়া গেল।

চা খাবার লইয়া শক্তি ফিরিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া সেগুলা একটা টিপয়ে রাখিয়া শান্ত কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "ঠাকুরপো চা জুড়িয়ে যাবে কিন্তু; আমি আবার নূতন করে, ক'রে আনৃতে পারব না।"

অনেকক্ষণ পরে অতুল যখন চায়ের কাপ্ লইতে গেল তখন সে লইবার পূর্ব্বেই শক্তি আবার গরম করিবার জন্য চায়ের বাটিটি লইয়া গেল।

"দেখ ঠাকুরপো, আজ কিন্তু ফিরে বাড়ী যেতে পাচ্ছ না, যেমন সারাদিন কাটিয়ে এসেছ—"

"লক্ষীটি আর ও নিয়ে অনুরোধ ক'রো না—জানত পড়ার ক্ষতি হয়—"

"যেন পাশের পড়া! এতগুলো পাশ করেও পড়ায় অরুচি ধরল না ঠাকুরপো? তাত নয় আমি জানি কেন থাকনা—কিন্তু আজ হয়ত আস্তে পারবেন না। বিশেষ করে বলে গেছেন তোমায় থাকৃতে বলার জন্যে, হয় ত—"

"আচ্ছা, আর বল্‌তে হ'বে না।"

দুই জনের চোখই সিক্ত হইয়া উঠিল!

৪

দীর্ঘ তিন বছর শক্তি স্বামীর সঙ্গে পুরীতে আসিয়াছে। বিনয়ের অনেক অনুরোধে অতুল একটিবার আসিয়াছিল; দিন কতক থাকিয়া ফিরিয়া যায়। শক্তি যখনই সমস্ত কথাগুলি ভাবিতে বসে তখনই যেন আশ্চর্য্য হইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে নিজেদের আলোচনা তাহারা কোন দিনই করে নাই কিন্তু উভয়েরই উভয়কে বুঝিতে একটুও ত বাধে নাই, কিন্তু আজ! আজ মনে হয় শক্তি বুঝি কিছুই বুঝে নাই! একি অশান্তি তাহার বুক জুড়িয়া বসিয়াছে; চোখের জল কথায় কথায় অকারণে ঝরিয়া পড়িতে চায়!

অতুলের একটা কথা কেবলই তার ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়ে।

একদিন সে কথায় কথায় বলিয়াছিল, "শক্তি, তুমি জন্মান্তর মান? আমি মানি। আর এখন বেশী করেই মানি। এই প্রার্থনাই দিন রাত করি আমি, যেন জন্মান্তরে যা যা' পাই, সম্পূর্ণ করেই পাই; আর না পাই তাতেও ক্ষতি নেই।"

শক্তি সেদিনও চোখের জল মুছিয়া শেষ করিতে পারে নাই—এখনও ভাবিতে গেলে তেমনি করিয়াই ভাঙ্গিয়া পড়ে। তবু ত সে আজ বুঝি অন্তরে বাহিরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে! আর শক্তি—

সন্ধ্যার অন্ধকারে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে শুধু অনুভব করিতেছিল যে অমনি অন্ধকার আজ তাহার অন্তরে বাহিরে,—এতটুকু আলোর রেখা আজ বাহিরেও নাই, তার অন্তরেও নাই।

কতদিন! আজ এমনি করিয়া সে তার দুর্ব্বহ জীবন ভার বহন করিয়া চলিয়াছে। তাহার জীবনের সুখ শান্তি, আনন্দ উৎসব সকলই সে হারাইয়া ফেলিয়াছে—বুঝি তাহার অনুভূতির শক্তিটুকুও আর নাই!

সে আর পারে না। কতদিন এমনি পথ চাহিয়া তাহার কাটিয়া গিয়াছে। কত রাত্রি এমনি করিয়া সীমাহীন অন্ধকারে দুটী চোখে কি এক দারুণ ক্ষুধা লইয়া সে জাগিয়া কাটাইয়াছে। ক্লান্তি হয় ত আসিয়াছে। ব্যথাও হয়ত সে পাইয়াছে। কিন্তু উপেক্ষা, অবহেলার কথা ত সে ভাবিতেও পারে নাই।

অতুল হয়ত আজ জয়ী। তাহার ভুলের সংশোধন করিতে পারিয়াছে। কিন্তু সে যে পারে না; শুধু পারে না নয়, চায় না! যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হৃদয় তাহার অবসন্ন, ক্লান্ত চোখ দুটি বুঝি চিরদিনের জন্য ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তবু সে চাহিয়া আছে—এ চাওয়ার বুঝি শেষ নাই—সীমা নাই!

বিচ্ছেদ

—শ্রীকুমুদিনী কান্ত কর।

১

বিকাশ বড় ভাই প্রকাশ বাবুর চিঠি পাইয়াই শ্বশুরকে একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দিয়া আসিল—লতিকার যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দিবেন. পত্রে বিস্তারিত বিবরণ জানাইতেছি।

টেলিগ্রাম করিয়া আসিয়াই সে পত্র লিখিল—কৈলাসরা পুরুষ পরম্পরায় আমাদের গোলাম বংশ ; সেদিনও তাহার বাপ আমাদের বাড়ীর শিকদার ছিল, আমাদেরই সাহায্যে কৈলাসকে ইস্কুলে পড়াইত। আজ তাহার অবর্ত্তমানে এম. এ, পাশ করিয়া বড় চাকুরী পাইয়াই কৈলাস ভদ্রলোক সাজিবার জন্য অন্যগ্রামে উঠিয়া গিয়াছে। এখানেই লতিকার বিবাহ হইলে আমরা দেশে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। আমাদের অপমানের একশেষ হইবে। অর্থ লোভে স্বজন পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন কি ?

টেলিগ্রাম করিয়া এবং পত্র লিখিয়া বিকাশ মনে করিল নিশ্চয়ই এ বিবাহ আর হইবে না। এ বিবাহে যত টাকার লোভই কেন হউক না তাহাদের মত সম্মানী জমিদার আত্মীয়কে চটাইতে তাহার শ্বশুর কিছুতেই সাহস করিবেন না। কৈলাসকে তাহার ধৃষ্টতার জন্য জব্দ করিবার উপায়ও সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল এবং এ সম্বন্ধে বড় ভাইকেও একখানা চিঠি লিখিল।

কৈলাস প্রভুবংশকে জব্দ করিতে প্রভুরই আত্মীয়া কুলীন কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রচুর অর্থে বশীভূত করিয়া যে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিল তাহার প্রখর দূরদৃষ্টি ছিল। সে পূর্ব্বাহ্নেই বিকাশ কিম্বা অন্য কাহারও পত্রাদির জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, ডাকপিয়নকে দশ টাকা বকশিস দিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে বিকাশের শ্বশুরের নামে যত চিঠি যত টেলিগ্রাম আসিবে সে সমস্ত তাহাকে দিতে হইবে ; সুতরাং বিকাশের চিঠি এবং টেলিগ্রাম তাহারই হস্তগত হইয় ছিল। সে মনের আনন্দে হাসিয়া সেই সমস্ত কাগজ দিয়া বাড়ীতে বসিয়া তামাক সাজিয়া খাইয়াছিল। কিন্তু তাহার এত সতর্কতা সত্ত্বেও কথাটা

একেবারে গোপন ছিল না। লোকে কথায় বলে কুকথা বাতাসের আগে উড়িয়া যায়। বিবাহের পূর্ব্বদিন বিকাশদের বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোক সেই গ্রামে বেড়াইতে আসিয়া এই বিবাহের কথাটা শুনিতে পাইল। সে মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করিয়া বিবাহের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বিকাশের শ্বশুর শরৎ বাবুকে কহিল, "ম'শায়! আপনি এ কি কর্‌ছেন? আমি বিকাশের বিশেষ বন্ধু তাদের কিছুই আমার অজানা নেই; এই কৈলাস তাদের গোলামের ছেলে তাদের বাড়ী থেকে তাদেরটা খেয়েই মানুষ, আর আপনি তারই সঙ্গে বিকাশের শালীর বিয়ে দিচ্ছেন? এর ফলাফল এই হবে যে তাদের সঙ্গে আর আপনার মুখ দেখাদেখি থাক্‌বে না। কখনও এ বিয়ে দেবেন না ম'শায়। আপনার নিজেরও ত একটা জাতের ভয় আছে?"

এই কথাগুলি শুনিয়া শরৎবাবুর মনটা কেমন দমিয়া গেল। তখনই ঘটককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সমস্ত শুনিয়া ঘটক হাসিয়া কহিল, "কর্ত্তা আপনি কুলীনের ছেলে, এতখানি বয়স হয়েছে, এই সামান্য কথাটা বুঝ্‌তে পারলেন না এই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! আমরা এ ব্যবসা করেই খাই, কথা শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পারি কে কি ভাবে কথা বল্‌ছে। যে লোকটি এসে আপনাকে এ সব কথা গেল তার দুষ্ট অভিসন্ধি ত স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে! সে নিশ্চয়ই এই সম্বন্ধের খোঁজে আছে, তারপর সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দিতে পার্‌লেই তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যদি তাই হবে তবে আর আপনি এমন নির্ব্বিবাদে এ বিয়ে শেষ কর্‌তে পার্‌তেন না। আপনার জামাই এর বড় ভাই প্রকাশ বাবু বড় যে সে লোক ন'ন; একে ত জমিদার তায় আবার তাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ; তাঁর দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, তার লেঠেলদের কৃপায় এতক্ষণ আপনার বাড়ীর একখানি ঘরের চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকত না, আর শ্রীমান কৈলাসের হাড় থাক্‌ত এক জায়গায় আর মাংস থাক্‌ত এক জায়গায়——"

শরৎ হাঁফ ছাড়িয়া বলিল, "তাই ত বলি হে, এও কি হয়? এত বড় একটা কথা আমি কিছুই জান্‌তে পার্‌লাম না? এ লোকটা কে হে বল্‌তে পার?"

"রাম! ও সব বাজে লোকের কথায় কান দেবেন না, সব মিথ্যা কথা, কোন্ হিংসুকের কাজ, চাই কি আপনার কোন জ্ঞাতিরও একাজ হতে পারে। আবার এও বলি কর্ত্তা, আপনি হলেন কুলীন আপনার জাতি আবার মারে কে? আপনি ইচ্ছা কর্‌লে কুল দিতে পারেন, ইচ্ছা কর্‌লে কুল ভাঙ্গতে পারেন।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, এমন কত গোলাম আমরা উদ্ধার ক'রে দিয়েছি।"

"যা হ'ক শুভকার্য্যে আর মন খারাপ করবেন না, আমার ত আর এখন কোন কাজ নেই কর্ত্তা, আমার বিদায়টা——"

"কোন চিন্তা নেই হে কোন চিন্তা নেই। অগ্রিম চার হাজার পেয়েছি আর বাকী ছ হাজার আজই রাত্রে পাব, তা হ'লেই তোমারটা হবে। পেয়েছি যেমন তা খরচটাও ত দেখ্‌ছ ?"

"তা নিশ্চয় তা নিশ্চয়, হাজার বার ত নিশ্চয়, যা করছেন আপনি খুব করছেন। তবে আমরা বড় গরীব কিনা কর্ত্তা আপনাদের ভরসাই করে থাকি। মেজমত যা হয় তাই দেবেন, তার জন্য আর কি হয়েছে, আর আপনি তেমন লোকও ন'ন্——"

বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের সংবাদ শীঘ্রই বিকাশের কর্ণগোচর হইল। সে স্ত্রীকে সংবাদটা শুনাইয়া বলিল, "আজ থেকে তোমার বাপের বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচ্‌ল।"

কথাটা স্ত্রীলোকের মনে কি রকম আঘাত করে তাহা স্ত্রীলোক ছাড়া আর কেহ বুঝিবে না। হেমনলিনী চোখের জল ফেলিয়া বলিল, "তোমরা পুরুষ মানুষ সবই বলতে পার, সবই করতে পার তোমাদের পক্ষেই সব সম্ভব। স্ত্রীলোকের কাছে বাপের বাড়ীর সম্বন্ধটা কত বড় তা তোমরা হয়ত বুঝ না। আমিই না হয় বাপের বাড়ী না গেলাম, কিন্তু আমার বাবাও কি আমায় দেখ্‌তে তোমাদের এখানে আস্‌তে পারবেন না ?"

"বোধ হয় না। দাদা যে রকম চটেছেন তাতে তাঁকে পেলেই ভয়ানক অপমান করবেন।"

"আর তাঁর জামাই মেয়ে তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে ? তোমাদের বাড়ীতে তাঁকে আস্‌তে না দিতে পার কিন্তু তাঁকে অপমান করবার তোমাদের কি ক্ষমতা আছে ?"

পিতার ভাবী অপমানের চিত্র মনে হইতেই হেমনলিনী ক্রোধে এই কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

২

প্রকাশবাবুর উঁচু মাথা নীচু হইল। কিছুদিন পর্য্যন্ত কাহারো সহিত তিনি বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না। তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে নানারূপ টিট্‌কারী দিতে লাগিল, অপমানে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

তাঁহারই গ্রামের পাশ দিয়া যখন কৈলাস বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া মহা সমারোহে নূতন বৌ সঙ্গে করিয়া গৃহে ফিরিল, তখনই তাঁহার মনে হইল যেন কৈলাস তাঁহারই বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে। তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইলেন। সদর নায়েবকে সেই রাত্রেই ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "একশ লেঠেল লাগিয়ে শেষ করে দাও, কেউ যেন ফিরে না যায়, শালা গোলামের বাচ্চার মাথার খুলির ভাঙ্গা হাড় এনে আমায় দেখাবে।"

নায়েব মহাশয় তখন কোন কথা না কহিয়া কিছুক্ষণ বাদে বাবুর মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হইলে আসিয়া কহিল, "কর্ত্তা! ওর মত একটা সামান্য লোকের মাথার খুলি ভেঙ্গে ফেলা একটা কিছু বেশী কথা কি? তা পারি, কিন্তু আমি বলি কি ছোট হউক বড় হউক এভাবে একটা বিপদ টেনে আনি কেন? কলে কৌশলে হারামজাদাকে পোকার মত টিপে মারতে চাই, কর্ত্তা কি বলব, আপনার ত কথাই নেই, অপমানে আমাদের পর্য্যন্ত অঙ্গ জ্বলে যায়! বেটাকে জব্দ করতেই হবে, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ পরামর্শ আছে, আজ অনেক রাত্রি হয়েছে, কাল নিবেদন করব।"

পরদিন গভীর রাত্রে পরামর্শ শেষ হইবার পর প্রকাশবাবু নায়েবকে বলিলেন, "যত টাকা লাগে ঐ জমিদারীটুকু কিনে ফেল, আর লোকজনের বন্দোবস্ত ভাল ক'রে ক'রো।"

ইহার পর হঠাৎ একদিন প্রকাশবাবুর তিনশ লাঠিয়াল যে গ্রামে কৈলাসের বাড়ী সে গ্রাম দখল করিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল প্রকাশবাবু এক লক্ষ টাকায় গ্রামখানি কিনিয়া লইয়াছেন। কৈলাসের বাড়ীর উপরেই জমিদারের কাছারী এবং দুইপাশে মুসলমান রাইয়ৎ বসিল। অতি শীঘ্রই কৈলাসের বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইল। তাহার চাকরের মাথা ফাটিল, তাহার বিরুদ্ধে বাকী খাজনা এবং মান হানির নালিশ রুজু হইল। কি ফৌজদারী, কি দেওয়ানী, দুই চারি নম্বর মোকর্দ্দমা তাহার বিরুদ্ধে লাগিয়াই রহিল। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কৈলাস গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

সহরে আসিয়াও সে নিরাপদ হইল না, পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে লাগিল। কতগুলি অপরিচিত লোক গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে লাগিল। শেষে একদিন রাত্রির অন্ধকারে কে একজন তাহারই বাড়ীর

সম্মুখে তাহার পাখানি লগুড়াঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া দিয়া পলাইয়া গেল। কৈলাস হাসপাতালে গিয়া শয়ন করিল।

অশ্রুমুখী হেমনলিনী গম্ভীর বিকাশকে কহিতেছিল, "আমি সব বুঝি। কৈলাসের জীবন কে নষ্ট করেছে, কেন করেছে আমি সমস্ত জানি। প্রাণে না মারলে কি প্রতিশোধ নেওয়া হয় না? আমার বোনটাকে বিধবা করে তোমাদের কি লাভ হবে? কি করেছে তোমাদের সেই অবোধ বালিকা? ভগবান আছেন, তিনি এত সইবেন না——"

বিকাশ গম্ভীরভাবে কহিল, "আমায় অনর্থক দুষ্‌ছ হেম, এতে আমার হাত নেই।"

"তুমি কি পুরুষ নও? অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারবে না?"

"কিছু করতে গেলেই ত একটা —"

"যারা বাস্তবিক পুরুষ তারা গ্রাহ্য করে না।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বিকাশ কহিল, "বাস্তবিকই দাদার এ ভারি অন্যায়, আমি তাঁকে অনেক বলেছি, কিন্তু তিনি রাগে অন্ধ হয়ে আছেন, কিছুই শুনতে চান না।"

* * * *

কৈলাসের জীবনটাকে একরকম করিয়া দিয়া প্রকাশবাবুর মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা হইল, কিন্তু তাঁহার মন হইতে প্রতিহিংসার আগুন একেবারে নিবিয়া গেল না। এ ঘটনার মূল যিনি, তিনি তাঁহার লক্ষ্যস্থল হইয়া রহিলেন।

৩

একে একে পাঁচটা বৎসর অতীত হইল। বাপের বাড়ীর কোন সংবাদ না পাইয়া হেমনলিনী অস্থির হইয়া উঠিল। স্বামীর নিকট কাঁদিয়াও যখন কোন ফল হইল না তখন সে গোপনে বাপকে আসিবার জন্য একখানা পত্র লিখিল। পত্র পাইয়া শরৎবাবু মনে করিলেন, এতদিনে নিশ্চয়ই তারা সব ভুলে গেছে, যাই মেয়েটাকে গিয়ে একবার দেখে আসি, অনেকদিন তাকে দেখিনি, আমার মনটাও তাকে দেখ্‌বার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

দিবা নিদ্রার পর জমিদার প্রকাশবাবু নায়েবের সঙ্গে দপ্তরে বসিয়া একটা খুনী মকর্দ্দমার বিষয় পরামর্শ করিতে করিতে তাকিয়ায় হেলান দিয়া তামাক খাইতেছিলেন। এমন সময় লাঠি হাতে, ছাতি বগলে, চটি পায়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে

হাঁপাইতে হাঁপাইতে শরৎবাবু সেখানে প্রবেশ করিলেন। প্রকাশবাবু এক বার আড়-নয়নে চাহিয়া দেখিয়াই গম্ভীর হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। নায়েব, কর্ত্তার সেই দৃষ্টি এবং গাম্ভির্য্যের অর্থ বুঝিত। সেও একবার ক্রুর বক্র দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে চাহিয়া কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই মনে করিয়া পরিশ্রান্ত শরৎবাবু কহিলেন, "ভাল ত বাবা প্রকাশ? বিকাশ কোথায়?" এই বলিয়া ফরাসের এককোণে বসিতে উদ্যত হইলে প্রকাশবাবু রুক্ষ স্বরে কহিলেন, "এখানে বস্‌বেন না, আপনার সঙ্গে এক ফরাসে বস্‌তে আমি অপমান বোধ করি—ওরে, কে আছিস্ রে এখানে, বাইরে একখানা জলচৌকি দে।"

জনৈকভৃত্য তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

কৌলিন্যাভিমানী বিস্মিত শরৎবাবু বলিলেন, "তোমার এ আচরণের অর্থ কি প্রকাশ? আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার কি তোমার উচিত হচ্ছে?"

"আমার এ আচরণের অর্থ খুব স্পষ্ট, এবং তা আপনার বিশেষ ভাবে জানা আছে। আপনার প্রতি আমার ঠিক যে ব্যবহার করা উচিত ছিল তার কিছুই করি নি।"

"প্রকাশ! আমি তোমার পূজনীয় ব্যক্তি—"

"ছিলেন, কিন্তু যে আপনাকে এইমাত্র বস্‌বার আসন দিয়ে গেল, আপনি এখন তারই সমতুল্য।"

আমাকে আত্মীয় বলে না মান, আমি একজন অতিথি বটে! বাড়ীতে পেয়ে এত অপমান—"

"আপনাকে একজন অতিথি বলে মনে করেছি বলেই এই বস্‌বার আসন টুকু পেয়েছেন, নতুবা অন্য রকম কিছু পেতেন—"

অপমানের বোঝা মাথায় করিয়া শরৎবাবু স্তম্ভিত হইয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখ ফাটিয়া লাঞ্ছনা এবং অপমানের অশ্রু বহির্গত হইল। উত্তেজিত প্রকাশবাবু বারান্দায় দ্রুত পদচারণ করিতে লাগিলেন। নায়েব খুনী মকর্দ্দমার কাগজের আড়ালে মুখ লুকাইয়া মুচকিয়া হাসিতে লাগিল।

শরৎবাবু বলিলেন, "আমাকে যা করবার তাত করলে, এখন মেয়েটির সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"এখন হবে না, যে পর্য্যন্ত না আপনার জামাই আসে সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। সে এসে যদি বলে, দেখা করবেন, নতুবা বিদায় হবেন—রামসিং! এই দেউড়িতে পাহারা থাক্, আমার হুকুম ছাড়া কেউকে আস্‌তে বা যেতে দিবি না, আর দুইজন ঘোড়্ সওয়ার এখনই ছোটবাবুকে ডেকে আনতে মাধবগঞ্জে পাঠিয়ে দে, জলদি কর্।"

* * * *

৪

পত্র লিখিয়াই হেমনলিনী পিতার আসিবার পথ চাহিয়া থাকিত। বাহিরে গোলমাল শুনিয়া একজন দাসীকে সংবাদ আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। দাসী আড়ালে থাকিয়া সমস্ত ব্যাপাটা দেখিয়া শুনিয়া গিয়া অতিরঞ্জিত করিয়া অনেক কথা কর্ত্রীকে শুনাইল। হেলনলিনী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া দেখিল দেউড়িতে পাহারা! উত্তেজিত কণ্ঠে রামসিংকে বলিল, "আমার বাপকে ভিতরে আস্‌তে দে?"

রামসিং উত্তর করিল, "বড় কর্ত্তার হুকুম নেই।"

"আমার হুকুম তুই পথ ছেড়ে দে।"

রামসিং নতশিরে কহিল, "গোলামকে মাফ্ করবেন না, কা'কেও ভিতরে যেতে দেবার হুকুম নেই।"

হেমনলিনী রোষভরে দাসীকে বলিল, "তুই এখান থেকেই বড় কর্ত্তাকে ডাক্।"

দাসীর চীৎকারে প্রকাশবাবু আসিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিলেন চুপ্ হারামজাদী চেঁচাস্‌নি, বউকে বল এটা তার বাপের না, শ্বশুর বাড়ী, শীঘ্র তাকে অন্দরে যেতে বল্

হেমনলিনী কিঞ্চিৎ উগ্র এবং উচ্চ স্বরে বলিল, "আমি থাক্‌তে আমার বাপ্‌কে কিছুতেই এভাবে অপমান করতে দেবো না কারো সে ক্ষমতা নেই।"

"এখানে কোন বেয়াদবি চল্‌বে না, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, আপনি চুপ্ করে গিয়ে ঘরে বসুন্।"

মেয়ের অপমানে আর থাকিতে না পারিয়া শরৎবাবু বলিয়া উঠিলেম, "হেম তোমার ছোট ভাইএর বৌ, ওকেও অপমান করতে ছাড়লে না? এ কোন্ দেশী ভদ্রতা?"

প্রকাশবাবু তাঁহার দিকে ফিরিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "আপনি কথা কইবেন না, চুপ করে থাকুন এটা আমার বাড়ী, এখানে আমার কর্তৃত্ব, আপনি কে? আমার ভ্রাতৃবধু আপনার মত চাষারই মেয়ে তার আচরণ এর চেয়ে আর কি ভাল হবে?"

অপমানে, ক্রোধে, লজ্জায়, ঘৃণায় শরৎবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন, হাতের ছাতি দ্বারা মাথায় আঘাত করিলেন। তাহা দেখিয়া হেমনলিনী উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। এমন সময় বিকাশ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মহাব্যস্ত ভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। প্রকাশবাবু গম্ভীর ভাবে ভ্রাতার মুখমণ্ডলে কি পাঠ করিবার চেষ্টা করিলেন, তারপর তাহাকে কহিলেন "এখন এভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার আর সময় নেই; আমি যা বল্‌ব তা শুনে আমাকে স্পষ্ট জবাব দাও—একদিকে তোমার শ্বশুর ও স্ত্রী অন্যদিকে আমি তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং স্বর্গগত পিতৃপিতামহ, তুমি কাকে চাও? একদিকে অপমান ও কলঙ্ক অন্যদিকে পিতৃকুলের সম্মান, তুমি কি চাও? তোমাকে সমস্ত খুলে বল্‌বার দরকার নেই সমস্ত বুঝ্‌তে পারছ, তোমার শ্বশুরকে আমার সঙ্গে এক ফরাসে বস্‌তে দিই নি তোমার স্ত্রী তোমার শ্বশুরকে বাড়ীর মধ্যে চেয়েছিল আমি নিষেধ করেছি, তাতে আমার অসম্মান হ'ত ব'লে আমি মনে করি, এখন বল তুমি কি চাও, কাকে চাও?"

বিকাশ নীরবে মস্তক নত করিল! তাহার অন্তরে যুগপৎ অনুকুল ও প্রতিকূল ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইল! এই সময় হেমনলিনী পুনরায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বিকাশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এ অপমান আর আমার সহ্য হচ্ছে না, বাবাকে না নিয়ে ঘরে ফিরলে আমি প্রাণ দোব।" পরে পিতাকে ডাকিয়া বলিল "বাবা! আপনি চ'লে আসুন, দেখি কে কি করতে পারে।"

শরৎবাবু এবার সাহসে ভর করিয়া যেমন দেউড়ির দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়াছেন অমনি প্রকাশবাবু এক লাফে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, দাঁড়ান্, এখনো না, এখনো উত্তর পাইনি——" পরে বিকাশের হাত ধরিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বল তুমি কাকে চাও? যদি আমাকে চাও তবে শ্বশুরকে এখান থেকেই চিরদিনের মত বিদায় নিতে হবে; আর যদি আমাকে না চাও তবে শ্বশুরকে সঙ্গে ক'রে ঘরে যাও। বল কাকে চাও। শীঘ্র উত্তর দাও, এখনো নীরব?

হেমনলিনী পুনরায় উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, বিচলিত বিকাশচন্দ্র ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া শ্বশুরকে কহিল, "আসুন আমার সঙ্গে——"।

বিকাশ শ্বশুর ও স্ত্রীর সঙ্গে গৃহদ্বারের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিস্ময়-স্তম্ভিত প্রকাশবাবু আকাশে লক্ষ্যহীন দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় ক্ষণিক দাঁড়াইলেন। পরে গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, তবে সব শেষ !"

অস্তগামী রবি জমিদার বাড়ীর সৌভাগ্য হরণ করিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেলেন।

সেই রাত্রেই বিচ্ছেদান্ধকার আরো ঘনীভূত করিয়া এক প্রকাণ্ড ইষ্টক প্রাচীর জমিদার বাটী দ্বিখণ্ডিত করিয়া গগনমার্গে উত্থিত হইল। সেই বৎসরই হেমনলিনী ভগ্নি ও ভগ্নিপতিকে পূজায় বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল।

লোকের বিশ্বাস আছে যে কেবল শত্রু অথবা স্নেহ-দয়া-দাক্ষিণ্য শূন্য ব্যক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে সেই অত্যাচার করে।

বিবিধ প্রবন্ধ।

শ্রান্তির শেষ

—শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী।

"এখনও জেগে আছে!"

"যাক্, তুমি ত ঘুমিয়েছিলে?"

"যাহোক মানুষ বটে—এত রাত্রে এত তন্ময় ভাবে এমন কি পড়া হচ্ছিল জানতে পারি কি?" বলিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে ভূপেন একবার হিমাংশুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

হাতের বইখানা বন্ধ করিয়া হিমাংশু বলিল—"দিনটা ত রেখে দিয়েছি কলেজের জন্য—রাতেও কি একটু কিছু দেখ্‌ব না? বিশেষতঃ আজকে যখন ছুটীর দিন।"

"তবু—" রহস্যের সুরে কথাটি শেষ করিয়া ভূপেন থামিল? হিমাংশু পাশের অর্দ্ধ বন্ধ জানালাটা খুলিতে খুলিতে উত্তর দিল—"দেখ্‌ছিলাম লেখক, মানুষের মনটাকে ভারী সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তুলেছে!"

"ওঃ নভেল্ আর মনস্তত্ত্ব!" বলিয়া ভূপেন একটু হাসিল। হিমাংশু অর্দ্ধ হেলান ভাবে উপাধানে ভর দিয়া বলিল—"তুমি কি বল মনস্তত্ত্বটা কিছুই নয়?"

ঈষৎ গম্ভীর মুখে ভূপেন উত্তর দিল—"না কিছুই নয় তাও বল্‌ছিনে, আর একটা বিশেষ রকম যে কিছু তাও বল্‌তে পারিনে, এ ঠিক জানি, মানুষের মনের ভিতর অনেক জিনিষ থাকে, কিন্তু দেখা যায় সে সব গুলো জীবনের পথে চল্‌বার সময় সত্য হ'য়ে ফুটে ওঠে প্রায়ই খুব কম,—বেশীর ভাগ ব্যর্থতাই এনে উপস্থিত করে। তার চেয়ে অত মনস্তত্ত্বের আলোচনা না করে চোখের সম্মুখে যে কাজ পাচ্ছি তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক্‌লে মানুষের দিনগুলো সুখকে বরণ করুক আর নাই করুক নৈরাশ্যের দুঃখটাকে নিয়ে আস্‌তে পারে না।"

"তা হ'তে পারে, তাই বলে মনটাকে বাদ দিয়ে যে কিছুই চলে না বলে আমার মনে হয়, অন্ততঃ চোখের উপর দেখ্‌তে পাচ্ছি যে মনটার তৃপ্তির জন্যেই বিশ্বটা ছুটোছুটি কর্‌ছে।"

হিমাংশুর অসমাপ্ত কথায় বাধা দিয়া ভূপেন বলিল "তাইতেই যে বল্‌ছি,

মন জিনিষটাকে নিয়ে বেশী নাড়া চাড়া কর্‌তে গেলে ছুটোছুটিই সার হয়, সাফল্য কতটুকু বল্‌তে পার, এই উপস্থিত পরীক্ষা সম্মুখে, এত রাত্রি পর্য্যন্ত তুমি যদি মনস্তত্ত্বের আলোচনায় তন্ময় না থেকে পরীক্ষার পড়াগুলো আরো ভাল করে দেখ্‌তে তাহ'লে তোমার বেশী উপকার হ'ত না কি? একথা কি তুমি অস্বীকার কর্‌তে চাও?"

হিমাংশু কিছুক্ষণ কোন উত্তর করিল না,—সে মুক্ত গবাক্ষ পথে বাহিরের উদার জোৎস্নার দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। ভূপেন যে ক্লাসের পাঠ্য বিষয় হইতে নিজের ছাতা জুতার পর্য্যন্ত দৈনন্দিন ব্যবস্থার কোন ভুল করিত না তাহা সে বেশ জানিত; অথচ অমন ভাবে প্রত্যেক খুঁটি নাটিতে দৃষ্টি রাখবার শক্তি তাহার মোটেই ছিল না, সেই জন্যই খানিক পরে সে উত্তর দিল,—"কি জানি তোমার মত অমন কাজ নিয়ে থাকার শক্তি আমার নেই।"

(২)

প্রায় বারো বৎসর পরে একদিন গভীর রাত্রিতে নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশের বুকে দৃষ্টি করিয়া ভূপেন অতীতের অনেক কথাই ভাবিতেছিল উদার নৈশ সমীরণ ধীরে ধীরে তার শ্রান্ত ললাট স্পর্শ করিয়া বহিয়া যাইতে ছিল, সমস্ত গৃহখানি ভরিয়া উঠিয়াছিল অদূরস্থিত হাসনুহেনার গন্ধে!

আজ সমস্ত দিন ধরিয়া অত্যন্ত পরিশ্রমে ভূপেনের ভিতরটা বড় ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বার বার তার মনে আসিতেছিল, কোন সময়ের কাহার যেন একটা কর্ম্ম জগতের উপর অনেক খানি তাচ্ছিল্যভরা বাণী! তবু কিছুতেই ঠিক পাইতেছিল না সে কে?—যে এক দিন কর্ম্মের উপর ঔদাসীন্য দেখাইয়া বলিয়াছিল—"কি জানি, তোমার মত অমন কাজ নিয়ে থাকার শক্তি আমার নেই," সেই মুখখানি ছায়ার মত অস্পষ্ট ভাবে স্মৃতির ভিতর ফুটিয়া উঠিলেও অনেকক্ষণ চিন্তাতেও নামটা কিন্তু ভূপেন স্মরণে আনিতে পারিল না। কেবল সে এই যে কর্ম্মস্রোতের ভিতরে জীবনটাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া অশ্রান্ত গতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে,—ইহার মূল্য স্বরূপ সে এই এত বড় পৃথিবীর নিকট হইতে সর্ব্বসাধারণে যাহা পাইয়া থাকে সেই একমুষ্টি অন্ন ভিন্ন এমন কি বেশীর ভাগ পাইয়াছে! আত্মীয়হীন প্রবাসে রোগে অসুবিধায়, এই যে শত ঝঞ্ঝাটভরা চাকরীর বোঝা বহন করিয়া প্রত্যেকদিনের প্রভাত হইতে গোধুলির আঁধারভরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছুটাছুটি, তাহাতে তৃপ্তির মত কই কোন কিছুই ত পায় নাই!

বৈচিত্রহীন একটানা জীবন খানিকে কোন রকমে টানিয়া লইয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য কোন সার্থকতা আজ আর তার চোখের নিকটে কোন চিত্র আঁকিতে পারিল না। উপরওয়ালার নিকট সে যথেষ্ট খ্যাতি পাইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্বেও তার ভিতর যে আরো যেন কি প্রার্থনা করে তাহা আজ যেমন সে গভীরভাবে উপলব্ধি করিল এমন ভাবে বুঝি আর কখনো করে নাই। বড় পরিশ্রান্তভাবে টেবিলের উপর বাহু স্থাপন করিয়া ভূপেন তাহার উপর মাথাটা রাখিল।

সহসা বাহির হইতে ডাক আসিল "দারোগা বাবু"—

মাথাটা তুলিয়া অপ্রসন্ন-ভাবে ভূপেন উত্তর দিল "কি খবর?"

আগন্তুক হাঁকিল "টেলিগ্রাম আছে বাবু।"

"টেলিগ্রাম?" অনেকখানি বিস্ময় ও বিরক্তির সহিত কথা কয়টী উচ্চারণ করিয়া সশব্দে দরজা খুলিয়া ভূপেন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহক যথানিয়মে টেলিগ্রামখানি তাহার হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। ভূপেন সেখানি হাতে করিয়া চিন্তিতভাবে পুনরায় ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের আলোটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সেখানির খাম খুলিতেই চোখে পড়িল গুটি কয়েক অক্ষরের সমষ্টি—

"বাড়ী এস বৌমা পীড়িত।"

প্রথমে তার অন্তরাত্মা ইহা যেন বিশ্বাস করিতে চাহিল না কিন্তু যখন আরো একবার, তারপর আরো একবার চোখের উপর সেই একই অক্ষর কয়টি ফুটিয়া উঠিল, তখন তার অন্তরে একটি গভীর আন্দোলন বহিয়া গেল। আজ তার জীবনে প্রথম মনে হইল সুনীতিকে সে বিবাহ করিয়াছে সত্য, কিন্তু স্বামীর কর্ত্তব্য কতটুকু করিয়াছে? কে জানে এই অসুস্থতাই যদি তার যাত্রার ডাক হয়! ভূপেন আর যেন বসিয়া ভাবিতেও পারিল না, শিথিল ভাবে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তখন দশমীর চাঁদ খণ্ড মেঘের অন্তরাল হইতে প্রকৃতির ললাটে জ্যোতির্ম্মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

সজোরে হুইসিল্ দিয়া মন্থর গতিতে ট্রেণখানি আসিয়া যখন নন্দনপুর ষ্টেশনে থামিল তখন ভূপেনের বুকটায় সহসা কে যেন একটা ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল।

সম্মুখে অনতিদীর্ঘ শ্যামল শস্যাচ্ছাদিত প্রান্তর,—উষার স্বচ্ছ আলোকে যেন এই চিরপরিচিত আগন্তুককে প্রীতিসম্ভাষণ করিবার জন্যই প্রসন্ন মুখে দাঁড়াইয়াছিল। ভূপেন এক নিমেষ মাত্র সে দিকে চাহিল—এইটুকুর

পরই যে তার বাল্য কৈশোর ও যৌবনের শতস্মৃতিবিজড়িত বাড়ীটি। কে জানে সে আজ কি মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার জন্য দাঁড়াইয়া আছে; অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা-ভরা বুকে ক্ষিপ্র হস্তে ব্যাগটা টানিয়া লইয়া সে নামিয়া পড়িল।

মাঠ পার হওয়ার পর দৃশ্যপটের মতই বাড়ীখানি তার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল। অন্তরের ভিতর গভীর ঝড় লইয়া প্রায় মিনিট দুই পরে পৌঁছাইয়া দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিল "কাকীমা?"

প্রথমটা উত্তর আসিল না। ভূপেন বিস্মিত হইল, শঙ্কাটা আরো দ্বিগুণ হইয়া তার বুকের উপর চাপিয়া বসিল, সে অধীর কণ্ঠে আবার ডাকিল "কাকী মা!"

উত্তর আসিল "কে ভূপেন?"

ইহার পর মিনিট খানেকের ভিতর দরজা খুলিয়া গেল।

ভূপেন চাহিয়া দেখিল, তার প্রৌঢ় কাকা সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন।

"আয়, ওরে বড় দেরী ক'রে এসেছিস্!"

কথাটা কি ভাবে যে তাহার নিকট উপস্থিত হইল, আজ যেন তাহা সে বুঝিতেও পারিল না, অভিভূতের মত সে তেমনি ভাবে দুয়ার প্রান্তে স্থির হইয়া রহিল।

সহসা এক বিপুল কান্নার শব্দ তার কাণে আসিল, অন্যমনস্কের মতই সে চাহিয়া দেখিল তার কাকীমা গভীর কান্নায় বাড়ীখানিকে শব্দায়মান করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রৌঢ় পিতৃব্য সেই সময়ে ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি ধরিয়া লইয়া গিয়া বাড়ীর ভিতর মুক্ত বারান্দার উপর তাহাকে বসাইলেন।

বেশ কিছুক্ষণ কাল কান্নার স্রোত চলিবার পর একজন প্রতিবেশিনী যখন বলিতেছিল "ছেলে বেঁচে থাক, বৌয়ের আবার অভাব নাকি? এই দুইমাস পরেই ফাল্গুন মাসে আবার বৌ ঘরে এনো।" সেই সময়ে উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে কাকীমার মুখের দিকে চাহিয়া ভূপেন বলিল—"কাকী মা! খোকা কোথায়?"

আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে কাকীমা উত্তর দিলেন "তুমি ত আস্তে দেরী ক'রে ফেল্‌লে—তার মামা এসেছিল তাকে নিয়ে গিয়েছে।"

উভয় করতলে নিজের মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া ভূপেন বলিল "সেও চলে গিয়েছে—যাক্।"

"কি কর্‌বো তাকে যে রাখ্‌বার অনেক চেষ্টা করেছি; কিছুতেই সে যে রইল না" বলিয়া কাকীমা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

ভূপেন একটিও উত্তর দিল না। প্রৌঢ় কাকা তাহার নিকট আসিয়া সস্নেহে তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—"নিয়তি ত কারো রোধ কর্‌বার শক্তি নেই; এখন উঠে আয় স্নান কর্‌বি।"

ভূপেন উঠিল না,—কেবল সে একবার আর্ত্তনাদ ভরা হতাশ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চাহিল মাত্র।

তুমি বল্‌তে পার্‌লে না যে, শূদ্র নইলে ধান রোয় কারা? ফসল জন্মায় কোন্ ভট্টচায্যি মশায়ের বাড়ীতে? 'শূদ্দুরের দান' নৈলে ভদ্দরলোক মশাইদের যে নিজে হাতে কোদাল ধর্‌তে হবে। ভদ্দর থাক্‌বে কেমন করে?

"নারীশক্তি"

পিয়াসী

—শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

ছাত্রাবস্থায় যখন আমি মস্কোসহরে অবস্থান করছিলাম, তখন আমার বাসার ঠিক সম্মুখের অট্টালিকার দ্বিতলস্থ এক কক্ষে বাস করতো এক দীর্ঘাঙ্গী ও স্থূলকায়া রমণী, নাম তাঁর টেরেসা। বড় বড় তার গোল গোল চোখ দুটীর বিদ্যুৎবর্ষী তীব্র দৃষ্টি, বজ্রনাদী তার কণ্ঠস্বর, মাংসপেশীবহুল দেহের অপরূপ গঠন, ও পুরুষ-সুলভ তা'র অদ্ভুত গতিভঙ্গী—এ সমস্ত দেখ্‌লে তা'র প্রতি স্নেহ, প্রেম বা ভক্তির পরিবর্ত্তে ভীতির ভাগটাই মানুষের মনের কোণে বেশী ক'রে জেগে উঠ্‌ত; আর সেই জন্যই তার গৃহে উপস্থিত থাকার লেশমাত্র সাড়া পেলেই আমি আমার সম্মুখের দরজা জানালা উন্মুক্ত ক'রে আমার চোখের দৃষ্টিটুকুকে তা'র কক্ষের পানে ছেড়ে দিতে সাহস করতাম না! অবশ্য বাসায় তা'কে উপস্থিত থাক্‌তে দেখা যেত,—দিনের মধ্যে খুবই অল্প সময়ের জন্যই; আর হঠাৎ যদি কখন তা'র সম্মুখীন হ'য়ে পড়্‌তাম, তবে সে তার কুটিল কটাক্ষ ও কুৎসিত বক্র হাসিতে আমায় এতই বিব্রত ক'রে তুল্‌ত যে সেই মুহূর্ত্তেই আমাকে সেখান থেকে পালাতে হ'ত আত্মসম্মানটুকুকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য। মাঝে মাঝে যখন সে মদ্যপানে ঢুলুঢুলু চক্ষু ও রুক্ষ শুষ্ক আলুলায়িত কেশপাশ নিয়ে সামনের বারান্দায় পায়চারি করত তখন আবার আমার সঙ্গে কথা ক'ইতেও চেষ্টা করত যদিও তার কথার চেয়ে তীব্র কটাক্ষ ও বক্র হাসির পরিমাণটাই ছিল অধিক।

বাসার কক্ষটি যদি অত সুন্দর ও মনের মতন না হ'ত—তা হ'লে হয়ত তা'র সে দৃষ্টি ও হাস্যের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমি অতি সত্বরই বাসা বদ্‌লে ফেল্‌তাম কিন্তু ঐ দীর্ঘ অট্টালিকার সেই ক্ষুদ্র কক্ষটির কোন অজানিত মাধুর্য্যই আমাকে তা'র মোহন-মন্ত্রে সেখানে আবদ্ধ করে রেখেছিল আর তাই আমায় তার সে সমস্ত কুৎসিত অত্যাচারই অমন ক'রে নীরবে মুখ বুঁজে সহ্য করতে হ'ত।

নিদাঘের এক স্নিগ্ধ প্রভাতে সমস্ত দেহখানাকে এলিয়ে দিয়ে চুপ

ক'রে পড়ে আছি। উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়ে সদা জাগ্রত প্রকৃতির অঞ্চল সঞ্চালনের মৃদু মন্দ বায়ুটুকু ধীরে এসে আমার সর্ব্বাঙ্গে তার মোহন স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছিল। তরুণ অরুণের স্বর্ণ রশ্মিরাশিতে সমস্ত কক্ষ খানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, এমন সময় পিছন থেকে হঠাৎ একটা কর্কশ কণ্ঠে আহ্বান এসে কানে বাজ্‌ল,—"নমস্কার, মশাই।"

পিছন ফিরেই চেয়ে দেখি—সাম্‌নের বাটির সেই রূপসী রমণী টেরেসা। কিন্তু তার মুখের চেহারাটার মধ্যে কেমন একটা পরিবর্ত্তন দেখ্‌লাম, অন্য দিনের চেয়ে সেটা যেন কেমন আজ একটু অস্বাভাবিক; মনে হ'ল যেন একটা করুণ-মিনতির সুস্পষ্ট কাল ছায়া তা'র সারা মুখখানার উপর ছড়িয়ে প'ড়েছে!

"আপনি কি চান?"

"আপনার এক কণা দয়ার প্রার্থী।—"

অন্তরে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় ক'রে উত্তর দিলাম,—"কি চাই, বলুন!"

অত্যন্ত মিনতি-ভরা কাতর কণ্ঠে সে ধীরে ধীরে বল্‌লে,—"দেখুন আমি আপনাকে দিয়ে একখানি চিঠি লিখিয়ে নিতে চাই—"

"বেশ!"

চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিলের সামনে এসে একখানা চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে বল্‌লাম—"কি লিখ্‌তে হ'বে বলুন।"

"বলছি লিখুন" ব'লে সে একটা ঢোক গিলে একটু ভেবে নিয়ে আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে—"লিখুন—প্রিয়তম বোল্‌স! তুমি এতদিন আমায় চিঠি দাও নাই কেন? তুমি কি তবে আমায় ভুলে গেলে? প্রিয় আমার তুমি কি জাননা যে তোমার ঐ সামান্য চিঠিটুকু আমার কাছে কত মূল্যবান—তা'রই আশায় পথ চেয়ে আমি কেমন ক'রে দিনরাত কাটিয়ে দিই—তোমার প্রাণের টেরেসাকে—ওকি লিখ্‌ছেন না?"

উচ্ছ্বসিত হাস্যতরঙ্গ আমার বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠ্‌ছিল;—তা'র অদম্য বেগ চেপে রেখে আমি তা'কে অত্যন্ত বিস্মিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম—"এ বোলেষ্ট কে?"

"বোলেষ্ট নয়, বোল্‌স্; আমার প্রণয়ী।"

"প্রণয়ী?"

"আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন? আমার মত বালিকার পক্ষে একজন প্রণয়ী থাকা কি এতই অসম্ভব? হ'লেমই বা কুৎসিৎ—"

মনে মনে ভাবলাম—"ইনি আবার বালিকা—তা'র আবার প্রণয়ী!—" মুখে বল্লাম—"না—না;—তা' কেন হবে না? আপনি কতদিন থেকে তাঁকে ভালবাসেন?"

একটা ঢোক গিলে সে উত্তর কর্ল—"ছ বছর।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বল্লাম—"বেশ, বলুন।"

* * * *

চিঠি লেখা শেষ হ'লে সে আমায় অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বল্লে,—"আমায় দিয়ে আপনার যদি কোনও উপকার সাধিত হওয়া সম্ভব মনে করেন—আমায় বল্লে পর আমি তা' সানন্দে কর্‌ব। আমায় আপনি দয়া ক'রে জানাবেন কি?"

"না, বিশেষ কোনও দরকার নেই;—ধন্যবাদ!"

আস্তে আস্তে সেদিনের মত সে চ'লে গেল;—আমি ফিরে এসে আমার চেয়ারের উপর তেম্‌নি ক'রে শুয়ে পড়্‌লাম।

* * * *

তারপর প্রায় দু' সপ্তাহ কেটে গেছে। এক মৌন সন্ধ্যায় আমি আমার সজ্জিত কক্ষটিতে একলাটি চুপ ক'রে ব'সে ব'সে অনেক কিছু ভাবছিলাম,—বাইরে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়্‌ছিল,—এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল।

হঠাৎ পিছনের দরজাটা সশব্দে উন্মুক্ত হ'য়ে গেল—এবং পর মুহূর্ত্তেই কক্ষে প্রবেশ কর্‌ল সেই টেরেসা!

অত্যন্ত শুষ্ক মুখে একটু মৃদু হেসে তা'র কণ্ঠটাকে কোমলতায় ভ'রে তুল্‌বার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে বল্লে—"নমস্কার;—আপনার বোধ হয় এখন কোনও বিশেষ কাজ নেই?"

"কি দরকার, বলুন ত?"

মিনতি করুণ-কণ্ঠে সে বল্লে—"আর একখানা চিঠি লিখ্‌বার জন্যে এসেছিলাম—"

"আচ্ছা, বসুন।—সেই বোলসকে ত?"

"না—এবারে তা'রই কাছ থেকে—"

"তা'রই কাছ থেকে ?—"

"হাঁ।—এ চিঠিটা আমার নয়—আমার এক পুরুষ বন্ধুর। তা'র নামও বোল্‌স ;—আর ঠিক আমার নাম দিয়েই তা'রও একজন প্রণয়িণী আছে। সেই বন্ধুই লিখ্‌ছে তা'র প্রণয়িণীকে—"

তা'র কথা শুনে তা'র মুখের পানে চাইলাম ;—দেখলাম তা'র মুখখানা যেন কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো ;—হাতের আঙুলগুলি ঘন ঘন কাঁপ্‌ছে।

মুহূর্তের জন্য আমার মনের মধ্যে তা'র সেদিনকার ও আজকের সমস্ত কথাগুলো জেগে উঠ্‌ল। কে যেন আমার মনের গুপ্ত কন্দর থেকে ব'লে উঠ্‌ল—"সমস্ত মিথ্যা—সমস্ত শয়তানী।"

সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ দিয়েও বেরিয়ে এলো,—"দেখুন, আজ আমি আপনার সমস্ত চাল ধ'রে ফেলেছি। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আপনার সমস্ত কথাগুলি মিথ্যা—আপনি শুধু আপনার কুহকমন্ত্রে আমায় বশ ক'র্‌বার জন্য এ কাজ কর্‌ছেন—আমি কি কিছু বুঝি না ?—কিন্তু আপনার সে আশা নিষ্ফল! আপনি এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে বেরিয়ে যান্‌।—আর কখন এখানে আস্‌বেন না।—"

আমার প্রতি বাক্যটি যে তার বুকের মধ্যে গিয়ে এক একটা জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত হ'য়ে বেজেছিল—তা'র অন্তরের সমস্তখানি যে তার তীব্রদহনে জ্বলে জ্বলে উঠ্‌ছিল—তা'র তদানীন্তন মুখের নিবিড় কাল প্রতিচ্ছবিটুকু বেশ স্পষ্ট ক'রেই আমার তা' বুঝিয়ে দিচ্ছিল। আমার কথার উত্তরটি পর্য্যন্ত না দিয়ে সে ধীরে ধীরে অত্যন্ত ভীত ও চঞ্চল ভাবে সেখান থেকে চ'লে গেল ; যাবার সময় দ্বারের কাছ থেকে একবার তা'র সজল চোখের কাতর দৃষ্টিটুকু আমার পানে মেলে ধ'র্‌ল।

পরক্ষণেই আমার মনের পটে একটা তিক্ত অনুতাপের ছায়া পড়্‌ল।—মনে হ'ল—তা'র কাছে গিয়ে তা'কে ডেকে এনে ক্ষমা চেয়ে তা'র চিঠিখানা সম্পূর্ণ ক'রে দিই। যাবার বেলায় তা'র সেই অশ্রু ছল ছল চক্ষের করুণ দৃষ্টিটুকু আমার বুকের পাতে যেন পাথরের বুকে লোহার আঁচড়ের মত মুদ্রিত হ'য়ে গিয়েছিল।

খানিক পরে হঠাৎ বেরিয়ে পড়্‌লাম তা'রই বাসার উদ্দেশ্যে।

কক্ষে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌লাম—একখানি আরামকেদারায় সে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় প'ড়ে আছে,—চক্ষুদুটি ঈষৎ রক্তবর্ণ, দৃষ্টি তাঁর শূণ্যের দিকে নিবদ্ধ।

মুখের ভাব দেখে মনে হয় যেন তা'র অন্তরের মধ্যে একটা চরম ব্যর্থতার তীক্ষ্ণ বাণ বিদ্ধ হ'য়েছে; আর সেই শেলাঘাতের তীব্র বেদনাই তার মুখের উপর স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

কখন যে আমি ধীরে ধীরে তা'র কক্ষে প্রবেশ ক'রে তা'র পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছি সে তা' টেরও পায় নি। হঠাৎ আমার কাশির শব্দে সে চম্‌কে উঠে পিছন ফিরে চাইলে; তা'র মুখের পানে ভাল ক'রে চাইতেই দেখ্‌লাম— চোখের নীচে গালের উপর শুষ্ক অশ্রুর রেখা।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে আমার পানে চেয়ে থেকে সে আস্তে আস্তে বল্‌লে,—"বসুন।"

আমি তা'র পাশে অত্যন্ত নিকটে একখানা চেয়ার টেনে ব'সে বল্‌লাম— "আমি আপনাকে অন্যায় তিরস্কার ক'রেছি হয়ত—আমায় ক্ষমা করুন।"

আর এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে সে উত্তর করলে,—"না—আপনি ঠিকই বলেছেন;—আজ পর্য্যন্ত আমি আপনাকে যে সমস্ত কথা বলেছি তার বেশীর ভাগই মিথ্যা।—সত্যিই বোল্‌স ব'লেও কেউ নেই—টেরেসাও আমি ভিন্ন আর কারও নাম আছে কিনা আমি জানি না।"

আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বোধ করি ভিতরের বেদনার তীব্রতাকে একটু প্রশমিত ক'রে সে আবার বলল—"কিন্তু তাই ব'লে আপনার চিঠিখানা লিখ্‌তে কি এতই পরিশ্রম হ'ল? থাকতেও ত' পারত বোলস্ ব'লে কেউ। আপনিও দেখছি আর সকলেরই মত আমার প্রতি সমানই বিরূপ। আপনি জানেন—আমি অত্যন্ত কুৎসিৎ।"

হঠাৎ তার কথায় বাধা দিয়ে আমি তা'কে বল্‌লাম—"না-না-আমায় ক্ষমা করুন—"

"না, আজ আপনাকে আমার এ কথাগুলি শুন্‌তেই হবে—যদিও তা' আপনার পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হবে। কিন্তু তবু আমি আজ আপনাকে শোনাব। আমি যে কুৎসিত তা' শুধু আপনি কেন, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবে। আর সেই জন্যই ত' কোনও পুরুষই আমার দিকে তা'দের করুণ দৃষ্টিতে একবার ফিরেও চায় না;—বরং দেখ্‌তে পেলে একটা ব্যঙ্গের বক্রদৃষ্টি হেনে— হাসতে হাসতে চ'লে যায়। পথের কাছ থেকে রূপের ব্যঙ্গ শুনে নারীর মনে যে কি বেদনা বাজে তা' হয়ত আপনারা বুঝ্‌বেন না, বুঝ্‌বার ক্ষমতাও আপনাদের নেই। তাই অনেক দিন পর্য্যন্ত পুরুষদের কাছ থেকে

এমনি ব্যঙ্গ আর অবহেলা কুড়িয়ে কুড়িয়ে হৃদয়ের নারীত্ব যখন বুকের দ্বারে এসে হাহাকার ক'রে উঠ্‌ল, তখন শুধু তা'রই কথঞ্চিৎ সান্ত্বনার জন্য আমি একটা উপায় বার কর্‌লাম। মনে মনে ভেবে নিলাম আমার প্রিয়তম একজন আছে, নাম তার বোল্‌ন্। তারই নাম দিয়ে মাঝে মাঝে পরের কাছে থেকে চিঠি লিখিয়ে নিতাম আর তার উত্তর ও লিখিয়ে নিতাম। হৃদয় যখন নিদাঘের তপ্ত দ্বিপ্রহরের পথিকের মত তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে পড়্‌ত, তখন আমি সেই গুলি ব'সে ব'সে পড়্‌তাম আর তারই সুধাটুকু পান ক'রে তবু কিঞ্চিৎ শান্তি পেতাম। এমনি ক'রেই আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি আমার শূন্য অন্তরের অদম্য আকাঙ্ক্ষাজনিত হাহাকারের নিবৃত্তি করতে যদিও এটা নিশ্চয় ক'রেই জানি যে নারীর কাছে তা' সম্পূর্ণ নিষ্ফল। তা'ই ঐ সামান্য পত্রটুকু দিয়ে একটা জীবন্ত পুরুষের অভাব দূর কর্‌বার জন্যই আজ আমি আপনার দ্বারে এককণা করুণার ভিখারী হ'য়ে গিয়েছিলাম।—”

আবার আমি অনুনয় কর্‌লাম—আমায় ক্ষমা করুন—আমি জান্‌তাম না।”

“না, দোষ ত আপনার নয়, দোষ আমার। নইলে ঈশ্বর আমায় এমন কুৎসিত ক'রেইবা গড়্‌বেন কেন বলুন ত? নারীই যখন আমায় কর্‌লেন তিনি, তখন আমায় অন্ততঃ এক কণাও কি রূপ দেওয়া উচিত ছিল না তাঁর? জানি না—হয়ত বা আমার সারা জীবনটাকে এমনি ব্যর্থতায় পূর্ণ করাই তাঁর অভিপ্রায়! যাক্, সবই ভাগ্য!”

মুহূর্ত্তের নীরবতার পর সে আবার বল্‌লে—“যে ভালবেসেছে তা'র আনন্দই বা কতটা, এবং যে ভালবেসেও তা'র প্রতিদান পায় নি তা'র দুঃখটাই বা কতটা—এ দুয়ের কোন্‌টাই আমি ধারণা করতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয়—মনের মধ্যে ভালবাসার প্রবল বাসনা সত্বেও যে তা'র সারা জীবনের মধ্যে এমন একটা প্রাণীকেও পায় নি যা'কে সে ভালবেসে তা'র বুকের মধ্যে অনুভব করতে পারে তা'র চেয়ে হতভাগিনী বুঝি আর কেউ নেই!” একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চুপ করলে।

চোখ তুলে চেয়ে দেখ্‌লাম তা'র রক্তবর্ণ দুই চোখের দুই কোণে মুক্তার মত অশ্রু বিন্দু টল্‌মল্ করছে! *

---

* 'গল্পী' হইতে।

বনফুল

—শ্রীসুনীতি দেবী।

মেয়েটির ভারি সাধের বাগান। কেয়ারি-করা বেলফুলের ঝাড় ছিল, সারি বাঁধা সাদা, লাল, হলদে গোলাপ ছিল, আর তাদের মাঝে মাঝে ছিল সরু রাঙা কতকগুলি পথ। বাগানের মাঝখানটিতে একটি শ্বেতপাথরে বাঁধান ফোয়ারা ছিল। নীল আকাশের দিকে সে থেকে থেকে জলের পিচকারি ছুঁড়্‌ত, আর নিজের খেলার আমোদে হেসে শতসহস্র ধারে পৃথিবীর বুকে লুটিয়ে পড়্‌ত।

মেয়েটি সকাল সন্ধ্যা বাগানে আস্‌ত। নিজে হাতে বাজে ঘাস পাতা তুলে ফেল্‌ত। আদরের মাধবীলতাটিতে জল ঢাল্‌ত। সুন্দর ফুলগুলি বেছে তোড়া বেঁধে রূপার ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখ্‌ত।

এমন যত্নের বাগানে, বড় ঝুমকোজবার ছায়ার আড়ালে, সবার অগোচরে, ছোট একটি নাম-না-জানা গাছে ছোট একটি ফুল ফুট্‌ল। সকালের আলো, স্যাড়ীর সোনালি আঁচলের মত যেই বাগানে ছড়িয়ে পড়্‌ল, অমনি ফুলটি তার কচি মুখখানি একটু বার করে উঁকি মারল। পায়ের নীচে সবুজ ঘাসে তার ছুটোছুটি কর্‌তে মন গেল; হঠাৎ চেয়ে দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে! মেয়েটি দুটো ঝুমকোজবা কাণে দুল করে পরে দ্রুত চলে গেল, বনফুলকে দেখ্‌তে পেল না! একটু দূরে গিয়ে সে প্রকাণ্ড একটি লাল গোলাপ তুলে পাতা দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে গেল। তখন অন্য ফুলেদের মুখ ঈর্ষ্যায় রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। এ সৌভাগ্য ত সবার হয় না। খানিক পরে দেখা গেল বাড়ীর যে জানালাটা বাগানের দিকে মুখ করে আছে, তারই ওপর কাজ করা ফুলদানিতে সেই গোলাপটি! বনফুলের একটুও হিংসা হল না। সে আপন মনে বলে উঠ্‌ল—বেচারী গোলাপ! ওকে দেখাচ্ছে যেন দৈত্যপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যা! ভাগ্যিস্ আমার রূপ নেই, নয় ত অমনি করে হয়ত কেউ মায়ের বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে বন্দী করে রাখ্‌ত!

ক্রমে রোদ বেড়ে চল্‌ল; বনফুল পাতায় মুখ ঢাক্‌তে যাচ্ছে, দেখ্‌ল, বাগান-ভরা সব ফুলের সজ্জা ও রংকে হার মানিয়ে এক প্রজাপতি তার কাছে উড়ে

এসেছে! প্রজাপতি বল্‌ল—কে গা তুমি? বনফুল বুঝি? এখানে যে? আমায় ভয় কি! লুকিও না, এস খানিক খেলা করি।

বনফুল বল্‌ল,—না ভাই, অত রং আমার চোখে সয় না।

প্রজাপতি হেসে বল্‌ল—ভারি ত! কথা কইলাম বলে বুঝি জাঁক হয়েছে? কে বা তোমার পানে চায়!—যাই, আমার ঢের খেলার সাথী আছে।

হাল্কা পাখায় ভর দিয়ে প্রজাপতি উড়ে গেল। একবার এ ফুলে, একবার ও ফুলে ঘুরে কোথায় গেল কেউ জান্‌ল না।

দুপুর রোদের তাপে পাতার ঘোমটায় বনফুল মুখখানি ঢেকে ফেল্‌ল। বাইরে শুন্‌তে পেল,—গুন্ গুন্ গুন্! কে আবার দরজায় এল ভেবে বনফুলের বুক কেঁপে উঠ্‌ল।

ভ্রমর ডেকে বল্‌ল,—বনফুল, আমি তোমায় চিনি যে! বাইরের রূপে না ভুলে তাই তোমার কাছে এসেছি। তোমার মধু আমায় দাও। বনফুল গো ঘোমটা খোল।

বনফুল চোখ মুদে রইল। সাড়া দিল না। চায় না সে রসগ্রাহী, চায় না সে মধু বিলাতে। ভ্রমর ডেকে ডেকে ফিরে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ঝিরঝিরে বাতাসের ছোঁয়া লেগে বনফুলের পাপ্‌ড়িগুলি খুল্‌তে লাগ্‌ল। পাতার ঘোমটা সরিয়ে সে চোখ মেলে চাইল। কাউকে ত দেখ্‌তে পেল না অন্ধকারে! অবাক্ হয়ে ভাবল,—একি মায়া! রূপের চটক্ নেই, কথার মোহ নেই, অন্ধকারে শুধু আছে স্পর্শ! তাতেই এমন জাগিয়ে তোলে?

বনফুল সব দলগুলি মেলে নিশ্বাসে নিশ্বাসে বাতাসটুকু বুকের মধ্যে নিল। তারপর ডেকে বল্‌ল—ওগো অরূপ, তোমাকে প্রাণে পেয়ে সার্থক হল আমার ক্ষুদ্র জীবন। আমার সুগন্ধ তুমি নাও, আমার সব নাও, তুমি আমায় নাও।

এবার দক্ষিণ হাওয়ার সাড়া পেল। সে আদরে সোহাগে বনফুলকে দুলিয়ে দিয়ে বল্‌ল,—দাও তোমার সৌরভ, যাবার আগে আমার শূণ্যতা তাই দিয়ে ভরে নিই।

বনফুল বল্‌ল—সে কি! তুমি থাক্‌বে না? এখনই চলে যাবে?

মলয় উত্তর দিল,—আমি যে ঘর-ছাড়া। কোথায় থাকি বল?

বনফুল কেঁদে বল্‌ল,—তাইত, তুমি যে চঞ্চল, তুমি যে বিরাট, তোমায় রাখ্‌বার স্থান আমিই বা কোথায় পাব?

বাতাস বল্‌ল—তুমি কিন্তু আমার সাথী হয়ে রইলে। চললাম বন্ধু, অনেক দূরে যেতে হবে। আমার চঞ্চলতায় ছেয়ে থাক তোমার সৌরভ, অচঞ্চল বেদনার মত। তুমি আমার মধ্যে মিলিয়ে থাক।

বনফুলের মুখের উপর শেষ চুম্বন রেখে বাতাস দিগন্তে ছুটে গেল। বনফুল হাওয়ার ভর সইতে না পেরে বৃন্তচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

পরদিন সকালে প্রজাপতি উড়ে যেতে যেতে বনফুলের ধূলি-ম্লান রূপ দেখে অবজ্ঞার হাসি হাস্‌ল।

ভ্রমর তাকে দেখে বল্‌ল,—আহা মধুটুকু যদি দিত। তবে সেটুকুও ত সঞ্চিত থাক্‌ত।

অন্য ফুলেরা বলাবলি করল, এ আবার কে? চিনি না ত! কবে এখানে ফুটে ছিল?

চিরন্তন হাসির ফোয়ারার এক ঝলক জল বনফুলের গায়ে পড়েও তার শুষ্কতা দূর কর্‌তে পার্‌ল না। মেয়েটি এসে ঝুমকোজবা গাছের তলা পরিষ্কার কর্‌বার সময় অশোভন শুক্‌নো ফুলটা দূরে ফেলে দিল।

সৌরভ-মন্থর বায়ু শুধু বিরহীর কাণে কাণে গেয়ে গেল,—হায়, হায়!

নিজের উদারতা দ্বারাই বিশ্বসংসারকে মহত্বপূর্ণ ও পূজনীয় করিয়া তোলা মানুষের স্বধর্ম্ম। এইজন্যই মানুষ তাহার নিজেহাতে গড়া জিনিষের নিকট ও বশ্যতা স্বীকার করে।

"বর্ত্তমান জগৎ"

প্রিন্স

—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

আপনি আমাকে আপনার কাগজের জন্য একটি ছোট গল্প লিখ্‌তে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু কি করে আপনার অনুরোধ রক্ষা কর্‌ব তা এতদিন ভেবে পাচ্ছিলুম না। আজ ক'দিন ধরে বহু চেষ্টা করেও মাথা থেকে ছোট কি বড় কোন রকম গল্প বার কর্‌তে পার্‌লুম না। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, পৃথিবীতে নানারকম ছোট খাট ঘটনা ত নিতাই ঘটে। আর সেই সব ঘটনার ভিতরও ত যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। সুতরাং আমার চোখের সুমুকে যা সব ঘটেছে, তারি মধ্যে একটির বর্ণনা কর্‌লেই সম্ভবত সেটি গল্পের মত শোনাবে।

আমি যখন বিলেতে ছিলুম, তখন সে দেশে একটি হিন্দুস্থানী যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেই পরিচয় দু'দিনেই বন্ধুত্বে পরিনত হয়। আমরা দুজনেই ভারতবর্ষের লোক, দুজনেই বিলাত-প্রবাসী, দুজনেরই বয়েস এক; এই সূত্রেই আমাদের পরস্পরের সখ্য জন্মায়। কেননা একটি বিষয় ছাড়া অপর কোনও বিষয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য ছিল না, না বিদ্যায় না বুদ্ধিতে না চরিত্রে—না শিক্ষায়, না চেহারায় না অবস্থায়।—

বন্ধুটি ছিলেন পশ্চিমের কোনও রাজবংশের সন্তান। তাঁর উপাধি ছিল Prince—কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা তাঁর পদের অনুরূপ না হওয়ায় তিনি বিলেতে তাঁর নামের পূর্ব্বে ঐ Prince উপসর্গটি ব্যবহার কর্‌তেন না। কিন্তু অপরের কাছে তাঁর বংশ-মর্য্যাদা গোপন কর্‌লেও তিনি নিজের কাছে সে সত্যটি এক মুহূর্ত্তও গোপন করতে পার্‌তেন না। বরং পৈতৃক সম্পত্তির অভাবে পৈতৃক তাঁর নামটিই তাঁর কাছে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস হয়ে উঠেছিল। তাঁর চাল-চলন কথা-বার্ত্তা আশা আকাঙ্ক্ষা সবই খুব উঁচু পর্দ্দায় বাঁধা ছিল। তাঁর ব্যবহারের একটি নমুনা দিচ্ছি—তার থেকেই আপনারা তাঁর সমগ্র চরিত্র বুঝ্‌তে পার্‌বেন।—

তিনি পোষাকে দেদার টাকা খরচ করতেন, এবং এ বিষয়ে অতিব্যয় করবার জন্য তাঁকে অপরাপর বিষয়ে অতিশয় মিতব্যয়ী হতে হত এমন কি তাঁর আহার একরকম উপবাসের সামিলই ছিল। ইংলণ্ডের রাজপুত্র যে দোকানে পোষাক তৈরী করান তিনিও সেই দোকানে পোষাক তৈরী করাতেন, সমান ব্যয় করে, কিন্তু তিনি জীবন ধারণ করতেন রুটি মাখম ও কলা খেয়ে!—

বিলেতে আমরা পাঁচজন দেশী ছোকরা একত্র হলেই নানা বিষয়ে আলোচনা করি। ধর্ম্ম সমাজ দর্শন বিজ্ঞান, কাব্য কলা রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের তর্কের আর অন্ত ছিল না। এ সব আলোচনায় Prince কখনো যোগদান করতেন না। আমাদের বাক্‌বিতণ্ডায় যোগ দেওয়া দূরে থাক আমাদের বকাবকি তিনি কাণে তুলতেন কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। ও সব কথা শুনলে তিনি এমনি চুপ হয়ে যেতেন, যে মনে হত, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। অপর পক্ষে তিনি যখন মুখ খুলতেন তখন আবার আমরা সব চুপ হয়ে যেতুম। তার কারণ যে একটি মাত্র বিষয়ে তাঁর সম্যক অভিজ্ঞতা ছিল, সে বিষয়ে আমরা সকলে ছিলুম সমান অনভিজ্ঞ। ভদ্রভাষায় সে বিষয়টির নাম হচ্ছে Love.

আমরা কবিতা পড়ে নভেল পড়ে যে love এর মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে শিখি, সে loveএর সন্ধান তিনি বড় একটা রাখ্‌তেন না। যেমন চুম্বক ও লোহের ভিতর তেমনি স্ত্রীপুরুষের ভিতর যে নৈসর্গিক টান আছে, সেই আকর্ষণী শক্তিরই বিচিত্র লীলা তাঁর আদ্যোপান্ত মুখস্থ ছিল। এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য তিনি বই পড়ে লাভ করেন নি, শিখেছিলেন হাতে কলমে। এ শিক্ষা লাভ করবার তাঁর সুযোগও যথেষ্ট ছিল। যে রাজপুরীতে তিনি আশৈশব লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হয়েছিলেন সেখানে মানব জীবনের মুখ্যকর্ম্ম ছিল প্রণয় চর্চ্চা। Princeএর গল্প আমরা যে পাঁচজনে হাঁ করে শুনতুম, যেমন ছোট ছেলে রূপকথা শোনে, তার কারণ তখন আমরা সবাই ছিলুম তরুণের দল। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই মনে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল, আর রমণী প্রসঙ্গ আমাদের সকলেরি অন্তরের এমন একটি তারে ঘা দিত, যার উপর দর্শন বিজ্ঞানের বিশেষ কোনও প্রভাব নেই। সে কথা যাক্, এ হেন শিক্ষা-দিক্ষা নিয়ে Prince যে বিলাতে মাসে একবার করে loveএ পড়্‌তেন সে কথা বলাই বাহুল্য। তাতে অবশ্য তাঁর মানসিক কিম্বা সাংসারিক কোনও ক্ষতি হয় নি। তিনি পদে পদে যেমন বিপদে পড়্‌তেন আবার তেমনি হাত হাত ফাঁড়া কাটিয়ে

উঠ্তে পারতেন। ফলে তাঁর নিত্য নূতন প্রণয় কাহিনী শোন্‌বার জন্য আমরা সদাসর্ব্বদাই প্রস্তুত থাক্‌তুম।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে Princeএর পদমর্য্যাদার অনুরূপ তাঁর সম্পত্তি ছিল না। যত দিন যেতে লাগ্‌ল, তত তাঁর আর্থিক অবস্থা হীন হয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। শেষটা তাঁর মনে হল যে, তিনি যদি কোনও ক্রোরপতির কন্যা বিবাহ করতে পারেন, তাহলে তিনি ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থ ও কামের অপর্য্যাপ্ত ফলভোগী হতে পারবেন। বিলাতে অনেক নিঃস্ব লোক, আমেরিকার millionaire কলু, কসাইদের কন্যা বিবাহ করেন, অর্থের লোভে ও উপাধির জোরে। যদি Lord উপাধির মূল্যস্বরূপ আমেরিকানরা অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা দান করতে প্রস্তুত হয় তাহলে তারা Prince উপাধির দাম যে আরও বেশি দেবে সে বিষয়ে বন্ধুবরের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না।

এ চিন্তা তাঁর মনে উদয় হবা মাত্র, লণ্ডনের একটি বড় হোটেলে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করলেন যেখানে আমেরিকার millionaireরা এসে বাস করে।

সাত দিন যেতে না যেতে তিনি সেখানে একটি millionaireএর কন্যার সঙ্গে দস্তুর মত loveএ পড়ে গেলেন। তারপর তিনি কি উপায়ে সেই মহিলাটির কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করবেন তা স্থির করতে না পেরে আমার কাছে মন্ত্রণা নিতে এলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে আমি যেমন সহৃদয় লোক তেমনি সদ্বিবেচক। তিনি আমাকে এক দিন স্পষ্টই বলেছিলেন যে তিনি যদি কখনো রাজা হন, তাহ'লে তিনি আমাকে তাঁর মন্ত্রী করবেন। কেন না রাজকার্য্যের ভার আমি হাতে নিলে, তিনি নিশ্চিন্ত মনে অন্দর মহলে বাস করতে পারবেন। ক্ষেত্রে তাঁর মুস্কিল হয়েছিল এই যে তিনি মেয়েটির কখনো একলা দেখা পেতেন না, তার মা কন্যারত্নটিকে যক্ষের ধনের মত আগ্‌লে নিয়ে বেড়াত।

কথায় কথায় জান্‌তে পেলুম যে মেয়েটি প্রতি সকালে ঘোড়ায় চড়ে Hyde Parkএ বেড়াতে যায় এবং এই এক মাত্র সময় যখন তার মাতা তার রক্ষক থাকেন না।

আমি বল্লুম এই ত তোমার সুযোগ। তুমিও একদিন তাই করো না। ঘোড়সোয়ার অবস্থায় বীর পুরুষের মত প্রণয় নিবেদন করলে, কোনও মহিলা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না, বিশেষত Hyde parkএ এবং বসন্তকালে ফুলে ফলে লতায় পাতায় প্রকৃতি যখন সুসজ্জিত হয়ে ওঠে সে দৃশ্যে মানুষের মন

স্বতঃই প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষে ও ইউরোপে কোনও প্রভেদ নাই। মানুষের স্বভাব মূলতঃ এক। আমার এ প্রস্তাব শুনে Prince একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে আমার প্রতি কথার অসম্ভব রকম তারিফ করতে করতে আশায় বুক বেঁধে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এই ঘটনার সাত দিন পরে এক রবিবারে ঘুম থেকে উঠে, আমি ঘরে বসে কাগজ পড়ছি, এমন সময় একটি Boy messenger এসে আমার হাতে একখানি চিঠি দিলে। খুলে দেখি সেখানি Princeএর লেখা। তাতে শুধু একটি ছত্র লেখা ছিল।—"I am dying"

পত্রপাঠ আমি একটি গাড়ী ভাড়া করে তাঁর হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি Prince বিছানায় শুয়ে রয়েছেন, কম্বল মুড়ি দিয়ে! প্রথমে তাঁকে দেখে আমি চিনতে পারিনি। কারণ তাঁর মুখ এত ফুলেছিল যে তাঁর কাণ থেকে কাণ পর্য্যন্ত সব একাকার, হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে আমার চোখে পড়ল যে Princeএর তিলফুলের মত নাসিকা তাল ফলের মত গোলাকার হয়েছে!

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কটুভাষায় নিজের ভাগ্যের নিন্দে করতে লাগলেন। তার সমস্ত দুঃখের কান্নার ভিতর থেকে আমি এই সার সংগ্রহ করলুম যে তিনি আমার পরামর্শ মত অশ্বারোহী হয়ে Hyde parkএ কন্যারত্ন আহরণ করতে গিয়েছিলেন। এর জন্য তাঁর পাচশ টাকা এক দিনে খরচ হয়ে গিয়েছে; ঘোড়ার ভাড়া দিতে ও ঘোড়ায় চড়বার পোষাক তৈরি করাতে। . . . তিনি যে একজন পয়লা নম্বরের ঘোড়সোয়ার তাঁর প্রণয়পাত্রীকে তাই দেখাতে তিনি একটি খুব তেজী ঘোড়া ভাড়া করেছিলেন। এতেই তাঁর সর্ব্বনাশ ঘটেছে।

ঘোড়াটি রাস্তায় খুব ভালমানুষের মত চলেছিল, কিন্তু Hyde parkএ প্রবেশ করেই সে হঠাৎ ধনুকের মত বেঁকে চার পা তুলে লাফাতে সুরু করলে। Prince অনেক কষ্টে তাকে কোন রকমে তার প্রণয়পাত্রীর ঘোড়ার পাশে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে I love you এই কথাকটি বলবার অভিপ্রায়ে যেমন I lo—পর্য্যন্ত বলেছেন অমনি তাঁর ঘোড়া হঠাৎ এমনি জোরে মাথা তুললে যে সেই অশ্বমস্তকের আঘাতে তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা নির্গত না হয়ে, তাঁর নাসিকা দিয়ে রক্তস্রাব হতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে সেই

আমেরিকান মহিলা, খিলখিল করে হেসে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। আর তিনি হোটেলে ফিরে শয্যাশায়ী হলেন।

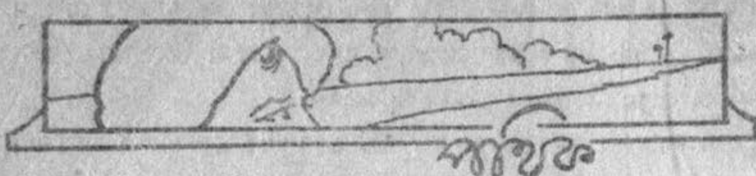
সত্য কথা বল্‌তে গেলে স্বীকার কর্‌তে হয় যে তাঁর মুখের চেহারা দেখে ও তাঁর নাকী কথা শুনে আমারও বেজায় হাসি পেয়েছিল এবং অতিকষ্টে সে হাসি আমি চাপি। তাঁর কান্নাকাটির উত্তরে কি বল্‌ব ভেবে না পেয়ে আমি শেষটা বল্লুম যে man proposes God disposes—

তার উত্তরে তিনি বল্লেন তা যদি হ'ত ত বল্‌বার কোন কথা ছিল না; কিন্তু আমি যে propose না কর্‌তেই ঘোড়া বেটা সব dispose করে দিলে!

এ কথার পর আমি তাঁকে আশ্বস্ত কর্‌বার বৃথা চেষ্টা না করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলুম এই ভরসায় যে তাঁর নাকের জখমের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হৃদয়ের জখমও সেরে যাবে। মাস খানেক বাদে দেখা যাবে যে Prince আবার loveএর একটি নূতন পালা আরম্ভ করেছেন। আসলে ঘটলও তাই—শুধু পূর্ব্ব প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ তাঁর নাকের উপর একটা বিশ্রী দাগ থেকে গেল।

শিল্পের মধ্যে যাহা মহৎ তাহা স্তব। অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ বিশ্বসৌন্দর্য্য যে খুব ভাল লাগিয়াছে সেই কথাটুকু জানাইবার জন্যই ছবি আঁকা, গান গাওয়া, কবিতা রচনা—সেই ক্ষণকালীন ভাললাগাকে সমস্ত মানুষের মধ্যে চিরকাল রাখিয়া যাইতে পারিবে মহৎ শিল্পের এই একটা মাত্র আশা।

"বাতায়ন"



(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২৯

একদিন সমাজ-প্রাঙ্গনের সর্ব্বত্র একটি কথা ছড়াইয়া পড়িল—Dr. Mitra has fished a Millionaire—the Fish has bags of money . . .'

তাহার পরই রব উঠিল—কে-কে ? কোথা থেকে এল ? কার ছেলে—এবং তাহার সহিত আপনাদের অবিবাহিতা কন্যাদিগের প্রতি তাকাইয়া তাঁহাদের অনাস্থিকে দীর্ঘশ্বাসও পড়িল।

কথাটি মায়ার কাছেও আসিয়া পৌছিল, কিন্তু সে বিশ্বাস করিতে চাহিল না। কমলা বলিল—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি। তুই দীপ্তিকে লিখে দেখ্।

কিন্তু লিখিতে হইল না, দীপ্তির একখানি চিঠি এই সময় মায়া পাইয়া সমস্তই জানিতে পারিল।

দীপ্তি লিখিতেছে :—

'দিদি আমি বিয়ে করছি। মা বাবার মত আছে কি না ঠিক বুঝ্তে পারলাম না। বাবা বল্লেন—Do what you consider best, মা বল্লেন—ভেবে দেখ দীপ্তি, মাসীমা বল্লেন—আমি কোন কথায় নেই। কিন্তু মিসেস্ ডি—সেদিন খুব help করেছেন. তিনি বল্লেন, 'ঐ ছেলেগুলো যে অপমানের কালি তোমার গায়ে দিয়েছে তা বিয়ে না করলে যাবে না'—আমিও পুরুষের খেয়ালের খেলার পুতুল হ'য়ে থাক্‌বার ইচ্ছে মন থেকে বিদেয় দিয়েছি।

অসিতের কথার মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই, কোন মিথ্যে উচ্ছ্বাস বা Sentimente না। বল্ল 'আমি জীবনটাকে একটা Business বলেই মনে

করি। তুমি আমার শাস্তি দাও আমি তোমার জন্যে সুখ খুঁজে এনে দেবো। তোমাকে পেলে আমার ভারি উপকার হবে, আমার কাজের উন্নতি হবে।'

আমি মত দিয়েছি।'

মায়ার চোখ হইতে ধীরে ধীরে জল গড়াইয়া পড়িল। কমলার দিকে চাহিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল—ভেবে কি করবি?

কমলা বলিল—ভাব্‌ব না? বলিস্ কি মায়া? ও যে দীপ্তি! ও যে জগতের কিছু জানে না, ওকে যে সবাই মিলে চালিয়ে এসেছে এত দিন, আর আজ তাকে 'Do what you consider best' বলে ছেড়ে দেবে?

মায়া। হাঁ। চিরদিন কি চালান যায় কম্‌লি? ও যে চল্‌তে আরম্ভ করেছে এবার নিজের থেকেই।

কমলা। দিস্‌নি চল্‌তে।

মায়া। কেন?

কমলা। ভুল পা ফেল্‌বে—ভয়ানক ভুল।

মায়া। ফেলুক, ভুলকে ও চিন্‌বে। নইলে সত্যকেও চিন্‌তে পারবে না। মায়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটি কাগজে লিখিল—

দীপ্তি, আমি তোকে মেসোমশাইএর কথাটাই লিখ্‌ছি—Do what you consider best—

নাম স্বাক্ষর করিয়া মায়া কমলাকে বলিল—Let us think of the best—

কমলা উত্তেজিত ভাবে মায়ার হাত ধরিয়া বলিল—তুইও ছাড়্‌লি ওকে?

মায়া। না, আমার একটা স্বার্থ আছে সেটা পূর্ণ করতে চাই।

কমলা। কি স্বার্থ?

মায়া। আমার ছেলেকে ও চিন্‌বে।

কমলা। এমনি ক'রে বাধা গড়ে তোল্‌বার সহায়তা ক'রে? তুই কি পাগল হয়েছিস মায়া।

মায়া হাসিয়া বলিল—পুরুষের খেয়ালের খেলা . . . কি স্পর্দ্ধার কথা! বিকাশের খেয়াল?—আমি মা হ'য়ে সহ্য করব এত বড় অপমান?

মায়ার চোখ দুটি ধীরে ধীরে আবার রাঙ্গা হইয়া আসিল।

কমলা বলিয়া উঠিল—আমায় ভাল লাগ্‌ছে না ভাই।

মায়া। আমার কি খুব ভাল লাগ্‌ছে? 'ভাল লাগা' বোধ হয় জন্মের মত চলে গেল!

কয়েক মাস ধরিয়া পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে করিতে মায়ার চোখ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন হইতে সে নিজে আর পড়িতে পারে না, দুপুর বেলা বিকাশ এবং সকাল ও সন্ধ্যায় শ্রীশ পড়িতে থাকে, মায়া শুনিয়া যায়। তাহার এই অসুস্থতার জন্য মায়া কিন্তু একেবারেই দুঃখিত নয়, তাহার মন তাহার শরীরের কাছে ইহার জন্য অনেকখানি কৃতজ্ঞ ছিল। এই অসুস্থতার সাহায্যে সে বিকাশ এবং শ্রীশকে অনেকখানি সময় কাছে পাইত। একজন ভাগ্যহত আর একজন ছন্ন-ছাড়া। দুইজনেই তাহার অত্যন্ত প্রিয়।

মায়ার জন্য যতটুকু সময় বিকাশ দিত সেই সময়টুকু দিন দিন তাহার কাছে অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া মনে হইতে ছিল। ঐ সময় সে আপনার মনের সমস্ত ব্যথা বেদনা এবং গ্লানির হাত হইতে নিস্তার পাইত। শ্রীশ পাইত অনাবিল শান্তি।

কিন্তু সেদিন যথাসময়ে বিকাশ মায়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মায়া শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—এ কি বিকাশ! নিশ্চয় শরীর খারাপ হয়েছে?—

বিকাশ ম্লান হাসিয়া উত্তর দিল—হাঁ, কাল সন্ধ্যার দিকে একটু জ্বরের মত হয়েছিল রাতেও ভাল ঘুম হয় নি—

বিকাশকে আর কোন কথা বলিতে না দিয়া মায়া তাহাকে একটি চেয়ারে বসাইয়া বলিল—কিছু খাওনিও নিশ্চয়?—

বিকাশ হাসিয়া বলিল—জ্বর হলে বুঝি খায়?

মায়া বকিয়া উঠিল—রুগীর মুখে ডাক্তারীর ডেঁপোমি আমি সহ্য কর্তে রাজি নই,—কম্‌লি—

কমলা পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল—হুকুম করুন মহারাণী, কিছু গরম লুচি, আলু পেঁয়াজ ভাজা, খান দুই মাছের ফ্রাই আর এক বাটি দুধ কমলা আর—

বিকাশ ভয়-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তাহলে ঠিক মারা যাব! I am a sinner not prepared to die.—

মায়া গম্ভীরভাবে কমলাকে আদেশ করিল নিয়ে এসো—

তিনজনেই এক সঙ্গে হাসিয়া ফেলিল। বিকাশ অনুনয় করিয়া কমলাকে বলিল—কিছু কম আন্‌বেন।

কমলা বলিল—বাপ্‌রে তাকি পারি! ক্ষুধার অন্ন চুরি করে রাখ্‌ব, আমার তাহলে নরকেও জায়গা হবে না।

সে চলিয়া গেল। এবং অল্পক্ষণ পরে সমস্ত দ্রব্য একটি ট্রেতে করিয়া সাজাইয়া আনিয়া বিকাশের সম্মুখে রাখিল।

দুইদিক হইতে দুইজনের তাড়া খাইয়া বিকাশ আহার করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল, সে মারা গেল না, উপরন্তু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল এবং বালকসুলভ সরলতার সহিত ইহা স্বীকার করিতে গিয়া দেখিল—মায়া তাহার আরক্ত চোখ দুটি অন্যদিকে ঘুরাইয়া লইতেছে!

বিকাশ বলিল—এবার আমাদের কাজ আরম্ভ করা যাক্‌?—

মায়া বলিল—না, আজ আমার ইচ্ছে নেই।

এই সময়ে বাড়ীর দরজার কাছে একটি মটর থামার শব্দ এবং দরজায় মৃদু আঘাত শুনিয়া মায়া নীচে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই দীপ্তির সহিত তাহার চোখচোখি হইল।

মায়া দুইটি কবাটে হাত দিয়া উন্মুক্ত স্থানটুকু জুড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোন কথা বলিতে পারিল না।

দীপ্তি বলিল—সর ভেতরে যাই, বাড়ীতে ঢুকতে দিবি না নাকি?

মায়া ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইতেই দীপ্তি ভিতরে আসিয়া সিঁড়ির দিকে যাইতে যাইতে বলিল—তোর চিঠি পেয়েই চলে এসেছি, ওপরে চল্‌ আমার কিছু জান্‌বার আছে।

মায়া ছুটিয়া আসিয়া সিঁড়ির পথ আট্‌কাইয়া বলিল—তুমি একটু এখানে দাঁড়াও আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এস না।

জীবনে এই প্রথম বোধ হয় দীপ্তি শুনিল, মায়া তাহাকে 'তুমি' বলিল। সে কেমন আড়ষ্ট হইয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে মায়া বলিল—আমি না আসা পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করে এখানে অপেক্ষা করলে বিশেষ বাধিত হব।—আমার বেশী দেরী হবে না।

কান্নায় এবং অভিমানে দীপ্তির বুক ফুলিয়া উঠিতেছিল, সে কোন উত্তর না দিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

উপরে আসিয়া একটা বিরক্তির ভাব মুখে আনিয়া মায়া বলিয়া উঠিল—আর পারি না বাবা, বাঁচা দায় হয়ে উঠেছে! বিকাশ, তুমি কিছুক্ষণের জন্যে বাবার পার্কের দিকের ঘরে গিয়ে ব'স না। আমার একটি বন্ধু এসেছেন দেখা করতে; অল্পদিন হল তার বিয়ের ঠিক হয়েছে, না জানি তার প্রেম-সাগরের লোনা ঢেউ কতই আমায় খেতে হবে!—কমলার এস্রাজটাও ওখানে আছে, ইচ্ছে হলে বাজাতে পার।

বিকাশ যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল—ইচ্ছে করছে আপনার বন্ধুটিকে বলে দিই—আর এ বাড়ীতে আসবেন না—বেচারী কত আশা করে আসছে আর আপনি তাঁর সম্বন্ধে ঐ মত প্রকাশ করলেন? আমি হলে—

বিকাশ চলিয়া যাইতেই ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার উপর পর্দ্দা টানিয়া মায়া কমলাকে বলিল—দীপ্তি এসেছে তাকে এখানে নিয়ে আসছি।

কমলা কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া মায়া বাহির হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে দীপ্তিকে লইয়া ঘরে আসিয়া ভদ্রতা করিয়া বলিল—ব'স।

দীপ্তি জলিয়া উঠিয়া বলিল—আমি তোর কাছ থেকে ভদ্রতা শিখতে আসি নি, আমি এসেছি তোর মুখ থেকে শুনতে চিঠিতে যে কথাটা লিখেছিস তার বাংলা অর্থটা।

মায়া হাসিয়া বলিল—ঠিক ঐ কথাটার বাংলা অর্থ যে কি হতে পারে তা জানি না। তবে একটা সাধু উক্তি আছে, আমার মনে হয় সেটা কতকটা পরিষ্কার করে দিতে পারবে।—শুনতে চাও?—

দীপ্তি। যথা?—

দীপ্তির চোখের দিকে তাকাইয়া মায়া অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে বলিল—'কর্ত্তব্য ভাবিবে যাহা, নির্ভয়ে করিবে তাহা,—যায় যাক্, থাকে থাক্ ধন, প্রাণ, মান রে—'

মায়ার এই কথার পর দীপ্তির অভিমান কমিয়া গিয়া মন অনেকখানি কঠিন হইয়া উঠিল। বলিল—বেশ তাহ'লে সকলেরই মতামত আমি পেলাম, তবে আমার ধারণা ছিল তুমি সকলের থেকে কিছু আলাদা, তোমার কাছ থেকে কিছু নতুন কথা শুনতে পাব—আমার সে ভুল ভেঙ্গেছে, তুমি আর দশ জনের থেকে কিছু আলাদা নও। কমলা তুই আমাকে একটা কথা বল্‌বি ভাই? মনে রাখিস্ আমি এখন যে জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে ভালমন্দ বিচার করবার শক্তি মানুষের থাকে না।

কমলা। কিন্তু বিচার ত তুই করেছিস্ দীপ্তি।

দীপ্তি। না বিচার নয়, কাজ, একটা কাজ করে ফেলেছি, সেটাকে যদি বিচার বল আমি নিরুপায়—আমি জানতে চাই সেটা কি অন্যায় হয়েছে?—

কমলা। সে কথা বলা কি সম্ভব দীপ্তি?

দীপ্তি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—নয়? কিন্তু ঐ কথাটাই ত আমার জানতে

হবে।—আচ্ছা ধর্, যার হাতে তুই শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের সঙ্গে ছেড়ে দিবি নিজেকে, সে যদি ঐ রকম জঘন্য একটা প্রস্তাব করে—

কমলা। ঐ ত দীপ্তি তোর বিচারের ঝোঁক লেগেই আছে বরাবর। কথাটা তোর জঘন্য মনে হয়েছে।

দীপ্তি। সত্যিই ত তাই। আমার অবস্থায় পড়্‌লে তুই ও বল্‌তিস্ নাকি ও কথা?

কমলা স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল—না। আচার বা পদ্ধতিকে আমি মানুষের ওপরে যেতে দিই না। অন্য দেশের বিয়ের পদ্ধতি দেখে আমরা যেমন হাসি, আমাদের বিয়ের পদ্ধতি দেখে তারাও তেমনি হাসে। যাকে নিয়ে বিয়ে আমার সার্থক হবে,—পদ্ধতির বাঁধনে সে বাঁধা আছে কি না আছে তা ভাবার দরকার মনে করি না।

দীপ্তি। পরিণামে যদি—

কমলা। যদি সে আমার বিশ্বাস নিয়ে খেলা করে, আইনের প্যাঁচে ফেলে তার কাছ থেকে আমার বা আমার ছেলে মেয়ের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে নিতে পারব এই ত? কিন্তু কথাটা ভাবতেই লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে।

কমলার কথা শেষ হইতে না হইতেই মায়া তাহার পাশে বসিয়া অশ্রু-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল—আমি আমার বন্ধুদের 'জানি' বা 'বুঝি' বলে খুব বেশী একটা গর্ব্ব ছিল কিন্তু তোকে নিয়ে এই দুবার আমার সে গর্ব্ব চূর্ণ হ'ল কম্‌লি,—তুই আর শান্তা, তোদের আমিকিছুই চিন্‌তাম না। এত ভাল লাগ্‌ছে—

বলিতে বলিতে কমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া মায়া তাহার মুখখানি চুম্বনে সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

অদূরে দীপ্তি বসিয়া আছে, তাহার বুকের মধ্যে ক্রমেই অশান্তি এবং সংশয়ের ঝড় বাড়িয়া উঠিতে ছিল। হঠাৎ তাহাদের মনে হইল যেন বহু দূর হইতে কাহার ক্রন্দনের সুর ভাসিয়া আসিতেছে! তিন জনেই এক সঙ্গে অধীরভাবে শুনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। শব্দ ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। শুনিতে শুনিতে দীপ্তি একবার শিহরিয়া উঠিল। ঐ সুর তাহার পরিচিত, ঐ সুরের মধ্যে যে কথা লুকানো আছে তাহাও সে জানে, ঐ সুর যে তুলিতেছে তাহাকে সে নিজেই একদিন শিখাইয়া ছিল!

অতি কষ্টে আপনার উদ্বেলিত মনকে সংযত করিয়া দীপ্তি মায়ার মুখের

দিকে ব্যাকুল দুটি চোখ তুলিয়া বলিল—দিদি তুই শুধু বল্—তুই বলে দে, আমি নিজে নিজে এত বড় একটা সংশয়ের সঙ্গে আর লড়তে পারছি না, তুই বলে দে আমি কি করব—

মায়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শান্ত আবেগহীন কণ্ঠে বলিল—তোর বাবা, মা, ভাই, বোন, সমাজ, সমস্ত জগতকে এক পাশে ঠেলে ফেলে, তাদের অশান্তি অসন্তোষ উপহাস সমস্ত তুচ্ছ করে, সমস্ত জগৎ হ'তে বিচ্ছিন্ন ঐ মানুষটার কাছে গিয়ে বলতে পারবি—তোমার যে কাজ তাই আমার কাজ, তোমার যে বিশ্বাস তাতেই আমি বিশ্বাস করি, তোমার যে ধর্ম্ম তাই আমার ধর্ম্ম।—যদি পারিস্ ঐ দরজাটা খুলে ওর কাছে যা।

দীপ্তি মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। মূর্চ্ছাহতের ভাবহীন অর্দ্ধ নিমিলিত চোখ দুটি দিয়া একবার রুদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিল, তাহার পর ফিরিয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

মায়া তাহার চেয়ারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু কমলা ছুটিয়া গিয়া দীপ্তিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ভুল করলি দীপ্তি ভয়ানক ভুল করলি—

দীপ্তি ম্লান হাসিয়া বলিল—অন্যায়ের চেয়ে বোধ হয় ভুল করাই ভাল।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে দীপ্তি রেলিং ধরিয়া একবার দাঁড়াইল তাহার বুকের ভিতর হইতে যেন সুর উঠিতেছে :—

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব যখন
আলোক নাহিরে।

কমলা বলিল—দীপ্তি আমি শেষ মানুষ, আমি তোর শেষ বন্ধু তোকে বলছি তুই ফের্ এখনও সময় আছে—

দীপ্তি আর একবার চেষ্টা করিয়া তাহার অবশ পাদুটি ধীরে ধীরে বাড়াইয়া দিয়া নীচে নামিতে লাগিল। এ যেন সমস্ত রূপ-হাসি-গানের জগৎ হইতে কোন্ অন্ধতম বর্ণ গন্ধ চেতনাহীন গহ্বরে সে নামিতেছে! কিন্তু তাহার থামিবার শক্তি নাই। কমলার শেষ ব্যাকুল আহ্বানও মিলাইয়া গেল! অবশ পাদু'টিকে কোনমতে ফেলিতে ফেলিতে সে গাড়ীতে আসিয়া বসিল। ড্রাইভার গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতে হইবে?

দীপ্তির যেন সমস্তই গোলমাল হইয়া গিয়াছিল, কিছুরই ঠিক ছিল না।

কিছুতেই সে মনে আনিতে পারিল না কোথায় যাইতে হইবে। বাড়ীর কথাও তাহার মনে হইল না। বলিল—একটু ফাঁকা যায়গার দিকে কোথাও নিয়ে চল।

তখন রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে। আশে পাশে অনবরত বিভিন্ন আকারের যান ছুটিয়া চলিয়াছে, লোকের ভিড় সরাইয়া দীপ্তির গাড়ী ধীরে ধীরে চলিয়াছে। চারিধারের কর্ণভেদি শব্দের মধ্যেও তাহার কানে যেন সেই গানের সুর ভাসিয়া আসিতে ছিল :—

তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলায় ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙেগেছে
প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা
হোক্ না এখন প্রাণের মেলা,—
তারের বীণা ভাঙ্‌ল, হৃদয়
বীণায় গাহিরে।

গাড়ী তখন গঙ্গার ধার দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল; শীতল বাতাসে দীপ্তির শরীর যেন জুড়াইয়া গেল। সে চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহাকে এইরূপ অবসন্ন দেখিয়া ড্রাইভার আপনার মনে কিছুক্ষণ পথে পথে গাড়ী ঘুরাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া থামিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে একজনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দীপ্তির যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

অসিত তাহার হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া যাইতে যাইতে বলিল—আমি আস্‌বার একটু আগেই এঁরা সকলে এলিসন্ রোডে গেছেন শুন্‌লাম, তুমি ওখানে যাওনি?

দীপ্তির শুষ্ক কণ্ঠ হইতে কোন কথা বাহির হইল না, সে শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল—না।

দীপ্তিকে ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া অসিত বলিল—এখানটায় বেশ হাওয়া আছে একটু ব'স না, তোমাকে আজ আমার কতকগুলো কথা বল্‌বার আছে—

বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া অসিত আবার আরম্ভ করিল—এর আগেও অনেকবার চেষ্টা করেছি কিন্তু—ব'স, এই চেয়ারটাতে তোমাকে খুব tired দেখাচ্ছে, অনেক ঘুর্‌তে হয়েছে বুঝি?

অসিত দীপ্তির পাশে বসিয়া তাহার একখানি হাত তুলিয়া লইয়া আঙ্গুল-গুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

দীপ্তির বক্ষের স্পন্দন এত দ্রুত হইয়া উঠিল যে তাহার মনে হইতে ছিল বুঝি এখনই তাহা ফাটিয়া যাইবে। সে চোখ চাহিয়া থাকিতেও পারিতে ছিল না। তাহার এই নীরবতাকে নারীর স্বাভাবিক লজ্জা বা সম্মতির চিহ্ন মনে করিয়া অসিতের আশা বাড়িয়া চলিয়া ছিল। অসংবদ্ধ ভাবে মনের আবেগে কথা কহিতে কহিতে একটি আংটি দীপ্তির আঙ্গুলে পরাইয়া দিয়া সহসা তাহাকে আপনার বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া মুখের উপর অজস্র চুম্বন ঢালিয়া দিল। দীপ্তি একবার একটু কাঁপিয়া উঠিয়া স্থির হইয়া গেল। সে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিল না, কাঁদিল না, মনের আনন্দে চুম্বনের প্রতিদান দিল না, অসিতকে বাধা দিয়া ক্রোধের একটি কথাও বলিল না বাহির হইতে তাহাকে মৃতের মত বোধ হইতে ছিল। কিন্তু জ্ঞান তাহার লুপ্ত হয় নাই, প্রতি চুম্বনে সে আপনার বক্ষে মৃত্যুর স্পর্শ পাইতে ছিল। অসিতের কঠিন বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মন তাহার অস্থির হইয়া উঠিলেও শরীর নিশ্চল হইয়াই রহিল—

৩০

পত্র-পুষ্প শোভিত তরু প্রচণ্ড কুজ্ঝটিকার মধ্যে পড়িয়া যেমন শ্রীহীন হইয়া যায়, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বিকাশকেও সেইরূপ দেখাইতে ছিল। তাহার কথায়, কাজে, মনে, সর্ব্ব শরীরে, সর্ব্ব বিষয়ে প্রকৃতির এক তীব্র পরিহাসের চিহ্ন যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে ঢাকা দিবার মত কিছুই তাহার ছিল না। তাহার এই অনাবৃত নগ্ন-বেদনা ধরা পড়িল প্রথম জীবনের কাছে।

যে দীপ্তির কথা বলিয়া বিকাশ শেষ করিতে পারিত না, যাহার কথা ভাবিতে বা বলিতে তাহার চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, সহসা তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে ছবিখানি বিকাশের শিয়রের কাছে টেবিলের উপর একটি ছোট ফ্রেমে বদ্ধ হইয়া ছিল, তাহাও সহসা তিরোহিত হইয়াছে।

প্রথম দুই দিন সে নীরবে বিকাশকে দেখিল, তৃতীয় দিনে কি একটা বলকারক পেটেণ্ট ঔষধ আনিয়া বিকাশকে বলিল—তোমাকে এটা খেতে হবে, দিনে বার চারেক ক'রে।

শিশিটি হাতে লইয়া বিকাশ কয়েক বার নাড়া চাড়া করিয়া বলিল—আচ্ছা।

জীবন। আরো ভাব্‌ছি তোমায় এক জোড়া মুগুর present করব।

যাদের health খারাপ হয় ওটা তাদের ভারি কাজে লাগে, বিমলের খুব উপকার হয়েছে।

ম্লান হাসিয়া বিকাশ বলিল—বেশ নিয়ে এস, খোরাব।

কিন্তু জীবনের সহস্র চেষ্টাতেও বিকাশের বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হইল না, জীবন বিশেষ অশান্তির মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিল।

একদিন সে কি মনে করিয়া বিকাশকে বলিয়া ফেলিল—দেখ, কিছুদিন আগে মিস্ রায়কে পড়াবার জন্যে শ্রীশ আমায় বলে ছিল, কিন্তু জান ত আমার একেবারেই সময় নেই। তুমি যদি কিছুক্ষণ করে তাঁর কাছে কাটাও বোধ হয় খুব ভাল হবে।

জীবনের এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিকাশ তাহার চোখের সামনে যেন এক আশার আলোক দেখিতে পাইল, এক মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল এই মায়াকে প্রণাম করিয়া সে একদিন বলিয়া ছিল—এই শেষ আশ্রয়টুক আমার থাক্। আশ্রয়! এই ত আশ্রয় তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এতদিন তাহার কথা তাহার মনে হয় নাই! মাতৃত্বের তেজ গর্ব্ব এবং করুণা ভরা সেই বালিকার চোখের দৃষ্টি একদিন তাহাকে একান্ত আপনার করিয়া যে কাছে টানিয়া লইয়াছিল। তাহা কি একে বারে মিথ্যা হইতে পারে?

বিকাশ বলিল—আমার মনেই ছিল না সে কথা; মনে করিয়ে দিলে, ভালই হল। আজ বিকালেই যাব তাহ'লে—

জীবন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

ইহার পর হইতে প্রতিদিন বিকাশ মায়ার কাছে যাইতেছে। ক্রমে মায়ার কাছে যাওয়ার তাহার আর সময় অসময় রহিল না। ইচ্ছা হইলেই যাইত।

একদিন ভোরের বেলাতেই সে মায়ার কাছে আসিয়া বলিল—আজ ভাব্‌ছি সমস্ত দিনটা এখানেই থাক্‌ব। আর সমস্ত দিন আপনার সঙ্গে খাটব।

মায়া খুসী হইয়া অনেক দিন পরে একটা হাসির গান গাহিয়া ফেলিল। তাহার পর চা'পান ইত্যাদি শেষ করিয়া বলিল—আজ চারদিন শ্রীশদা ফেরার, তার টিকি দেখ্‌বার জো নেই! মেসোমশাই বোধ হয় তাকে ধরে রেখেছেন। আমাদের পাহারা দেবার জন্যে রোজ রাতে দারোয়ান পাঠান। এমন হাসি পায় ওঁদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি দেখে—কমলি তুই চট্‌পট্ ঠাকুরকে রাঁধা-বাড়ার সব ব্যাপার বুঝিয়ে দিয়ে আয়, আমি সকাল বেলাটা একটু পড়ি তারপর দুপুরটা উনি, আর কল্যাণীকে এনে খুব খানিক হুল্লোড় করা যাবে।

তাহাদের এই সব পরামর্শ চলিতেছে এমন সময় সৌম্যমূর্ত্তি পক্ক কেশ এক বৃদ্ধকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বিকাশ ঈষৎ ভীতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং পরক্ষণেই মায়াকে ছুটিয়া তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

উপর্য্যুপরি কয়েকবার এই বৃদ্ধকে চুম্বন করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া অভিমানে ভরা গলায় মায়া বলিল—আড়ি, যাও কি দুষ্টু বাবা তুমি তোমার সঙ্গে আমার কথা নেই।

মায়াকে বক্ষে চাপিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে চন্দ্রকুমার বলিলেন—আগে আমার সব কথা শোন্ তার পর রাগ করিস্ পাগ্‌লী—

মায়া। কোন কথা শুন্‌তে চাই না আমি শুন্‌ব না—

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত না যাইতেই মায়ার অভিমান চলিয়া গেল। পিতাকে বসাইয়া নিজে তাঁহার কোলে বসিয়া বলিল—কেন জানাও নি তুমি আস্‌ছ?

চন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন—বুড়ো মানুষ যদি একটা দোষ করে ফেলে তার জন্যে কি এত বক্‌তে হয়? কমল মা, তুমিই বল না।

চন্দ্রকুমারকে প্রণাম করিয়া কমলা বলিল—ও আজকাল খালি সবাইকে বকে, সবার ওপর ও সর্দ্দারি আরম্ভ করেছে।

চন্দ্রকুমার বিকাশের দিকে তাকাইয়া মায়াকে বলিলেন—ঐ বুঝি তোর ছেলে? দিব্যিটি ত! সর্ ওকে একটু দেখি—

মায়া। হাঁ ঐ আমার ছেলে, কিন্তু এক বারও মা বলে ডাকে না, খালি বলে মায়াদি—ভারী দুষ্টু না বাবা?

চন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন—তা ও একই কথা।

তিনি উঠিয়া আসিয়া বিকাশের দুই কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কিছুক্ষণ নির্ণিমেষ নয়নে দেখিয়া বলিলেন—সেই চোখ, সেই মুখ, সেই সব! সুচারুকে আজ নতুন করে যেন দেখ্‌লাম! শুধু একটি জিনিস পাচ্ছিনা বিকাশ, সুচারুর ছেলের ও স্বাস্থ্য নয়।

বিকাশ স্তম্ভিত হইয়া গেল। আপনা হইতেই তাহার মাথা বৃদ্ধের পায়ের কাছে নত হইয়া আসিল। তাহার সম্বন্ধে চন্দ্রকুমার সব কথাই যে জানেন ইহা মনে করিয়াও তাহার কোন সঙ্কোচ হইতে ছিল না; অপরিচিত বলিয়াও নিজেকে মনে হইল না। সে চন্দ্রকুমারের মুখের দিকে একবার চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া অপরাধীর মত হাসিতে লাগিল।

মায়া বলিল—একটু বকে দাও ত বাবা, মোটে ও আমার কথা শোনে না!

চন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন—তোর চেয়ে আমি কি ওকে ভাল করে বক্‌তে পারব ?—যে পথ দিয়ে সুচারু চলে গেছে সে পথে এসে দাঁড়াবার যে স্পর্দ্ধা রাখে তাকে বল্‌বার মত কোন কথা আমার ত মনে আসে না। উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার দুঃখের পাত্রটি যদি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বিকাশ, জগতের কোন কিছুর ওপর যেন অশ্রদ্ধা তোমার মনে না আসে এই প্রার্থনা করি।—ওরে মায়া, কমলা বেশ যাহোক তোরা সব! আজ তিনদিন ট্রেণে আসছি, তাও কয়েক ঘণ্টা গাড়ী লেট্! বাড়ীতে পা না দিতেই সারমন্ দেওয়াতে লাগ্‌লি ?—পেটের মধ্যে যে আর এক সারমন্ শুনছি রে!

কথা কয়টি শুনিয়া বিকাশের চোখ দুইটি যেমন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বুকখানি তেমনি শান্তিতে ভরিয়া গেল। এইত এতখানি স্নেহ, এতখানি মমতা, এই রহস্যময় পৃথিবীতে তাহার জন্য আজও সঞ্চিত রহিয়াছে, ইহার খবর সে ত রাখে নাই! আজও সে দুঃখ করে! যে বন্যা একদিকে ধ্বংস বহিয়া আনে অন্যদিকে সেই বন্যাই নূতন সৃষ্টি সুরু করিতে থাকে। নিষ্ঠুরতা আর স্নেহ, ও যে ভিন্ন নয়। দুইটির ভিতরই পরিপূর্ণতা তাহার পরিপূর্ণ রূপ লইয়া বিরাজ করিতেছে।

কৃতজ্ঞ দুইটি চোখ তুলিয়া বিকাশ বলিল আজ এখন আসি, আপিসে আজ কিছু কাজ কর্‌ব, অনেক দিন কিছুই দেখ্‌তে পারি নি।

মায়া। দেখ্‌লে বাবা, ও কি দুষ্টু! পরিচয় পেলে ত ?—হাঁ যাবে বৈ কি কত দিন পরে বাবা এসেছেন আজ আর তোমায় ছাড়্‌ছি না বিকাশ।

* * *

অল্প কয়েকদিন পরে একদিন ভোরের বেলা মিত্র পরিবারে সানাইএর সুরের মধ্য দিয়া যে মিলন-সঙ্গীত আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল, সেই সুরেই বিকাশের প্রতি শিরা প্রতি রক্ত বিন্দু ও গুথাইয়া উঠিল . . .

মায়া বলিল—বিকাশ আমি দিন দুই এখানে থাকৃতে পার্‌ব না।

বিকাশ শুষ্ক হাসিয়া বলিল—বেশ ত আমি ত আর কচি খোকা নই, অত ভয় পাবার কি আছে ?

মায়া। ভয় পাবার নেই, সত্যি বলছ ?

বিকাশ। তোমার সন্দেহ হয় ?

মায়া। হাঁ।

বিকাশ। যাও, আমি ঠিক আছি।

মায়া। আমার মনে হয়, এই দুদিন তুমি যদি কোথাও একটু বেড়িয়ে আসতে ভাল হ'ত।

বিকাশ। না, তার কোন দরকার নেই।

আর কোন কথা হইল না। মায়া কমলার সহিত বিবাহ বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। এবং বীরেন্দ্রনাথ ও করুণার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বুক বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। চারি দিকে মানুষ হাসিতেছে, চারি দিকে আত্মীয় স্বজনের আনন্দের কল-হাস্য শুনা যাইতেছে, তাহার মধ্যে এই দুই জনে কষ্ট এবং চেষ্টা করিয়া আপনাদিগকে সকলের সহিত মিশাইতেছেন। দীপ্তির যেন কোন বিষয়েই চেতনা নাই! সে সবই করিতেছে, কিন্তু সেই করার মধ্যে দীপ্তিকে পাওয়া যায় না! সুবর্ণ প্রাণপণে কনের জন্য লাল সিল্কের ব্লাউজ সেলাই করিয়া চলিয়াছেন। এত বড় উৎসবে তাঁহার যেন আর কিছুই ভাবিবার নাই! শ্রীশ, অত্যন্ত ব্যস্ত, কিন্তু সে যে কি করিতেছে তাহা বুঝা কঠিন!

কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিতে পরিপূর্ণ গৃহে যখন রব উঠিল—বর—বর—

নব বধূর সাজে সজ্জিত দীপ্তি কাঁপিয়া উঠিয়া মায়াকে একবার জড়াইয়া ধরিয়া শুষ্ক কণ্ঠে ডাকিল। দিদি—'

আচার্য্য, বর প্রভৃতি সকলে সভায় বসিয়াছে, এই বার কনেকে যাইতে হইবে। মায়া বলিল—চল্ দীপ্তি আমি তোকে নিয়ে যাচ্ছি।

মায়ার পায়ের সঙ্গে পা ফেলিয়া দীপ্তি অগ্রসর হইল, পিছনে ছোট ছেলে এবং মেয়ের দল একান্ত উৎসুক হইয়া চলিয়াছে।

দীপ্তি বিবাহ বেদীতে আসিয়া বসিল। চারি দিকে সহস্র সহস্র মানুষ তাকাইয়া আছে! তাহাদের সেই চাহনি সে সমস্ত দেহ দিয়া যেন অনুভব করিতেছিল। মিলন-সঙ্গীত সুরু হইল . . .

মায়া ভাবিয়াছিল বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত দীপ্তির পাশে থাকিবে কিন্তু কি কথা মনে হওয়াতে সে অস্থির হইয়া উঠিল। কল্যাণী কমলা এবং উমাকে দীপ্তির পাশে রাখিয়া সে বাহির হইয়া আসিয়া কাহাকে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত জন তাহাকে তাহার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু কেহই কোন উত্তর পাইল না। মায়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া সমস্ত জায়গায় চোখ বুলাইয়া লইতেছে।

সভা হইতে কিছু দূরে এবং নিমন্ত্রিতদের নিকট হইতে ঈষৎ পৃথক ভাবে কে একজন দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার উপর চোখ পড়িতেই মায়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, কোথায় যেন একবার ঐ মুখ সে দেখিয়াছে। সেই চাহনি,... সেই চাপা ঠোঁটের কোণ সেই শীর্ণ শরীর দিনের পর দিন যাহারা তাহার সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে আসিয়া দেখা দিয়া গিয়াছে!

মায়া ধীরে ধীরে তাহার পিছনে আসিয়া আপনার উদ্বেলিত বক্ষ শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া ডাকিল—মুকুলবাবু—!

অপরিচিত নারী কণ্ঠে তাহার নাম শুনিয়া চকিত ভাবে মুকুল ফিরিতেই মায়া বলিল—একবার আমার সঙ্গে একটু আস্‌বেন? ভয়ানক দরকার—আমি মায়া আমায় চিন্‌তে পারলেন না?

মুকুল হাসিয়া বলিল—না পারার ত কোন কারন নেই, তবে প্রথমে আমি বুঝ্‌তে পারিনি কে কনে? আপনি ওঁকে ছেড়ে চলে এলেন যে?—

মায়া সহজ সুরে এবং হাল্কা ভাবে বলিল—আমি একজন লোক খুঁজ্‌ছিলাম আমার একটি কাজ করে দেবার জন্যে, কাকেও মনের মত লাগ্‌ল না আপনি ছাড়া—তাই আপনার কাছে এসেছি।

মুকুল অবাক হইয়া বলিল—বলুন কি কর্‌তে হবে, খুব কি দরকারী?

মায়া। হাঁ, ভয়ানক দরকারী—আপনাকে একটা বাড়ীর নম্বর বলে দেবো সেখানে আপনাকে যেতে হবে!

মুকুল। বলুন. সেখানে গিয়ে কি করব।

মায়া। আমার একটি বন্ধু আজ ভয়ানক অসুস্থ আছে, তার কাছে আপনি আজ থাক্‌বেন।

মুকুল। কেউ কি আর তাঁর কাছে নেই?—

মায়া। না। কেউ নেই তার কাছে আজ—আপনি যাবেন?

মুকুল তাহার জ্বালা ভরা তীব্র দৃষ্টি দিয়া একবার বেদীর দিকে চাহিল, তাহার পর মায়ার দিকে চাহিয়া বলিল—আমায় ঠিকানা দিন, নইলে বেশী দেরী হয়ে যাবে।

মায়া। একশ একান্ন নম্বর Sandhurst street—

মুকুল কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল—বাড়ীটা আমি চিনি বলে মনে হচ্ছে—ওটা কি কয়লা কুঠির বাড়ী?

মায়া। হাঁ, আপনি কি করে জান্‌লেন?

মুকুল। ওখান থেকে আমার কিছু প্রাপ্য টাকা আনতে গিয়ে ছিলাম। মিসেস সেনএর একটা Plaster bust. আমি করি।—সেখানে আমি কাকে পার

মায়া। বিকাশ। তারই কাছে আপনাকে পাঠাচ্ছি।

মুকুল। বর ও বধূর দিকে তাকাইয়া বলিল—আমায় তিনি যদি না আজ সহ্য করেন?

মায়া। বল্‌বেন আপনার মা আমায় পাঠিয়েছেন।

মুকুল একবার ভাল করিয়া মায়াকে দেখিয়া লইয়া বলিল—তাহলে আসি?—

মায়া। কিন্তু আপনার খাওয়া হল না যে?

মুকুল। কিছু দরকার নেই।

মায়া। না সে হবে না আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

মায়া চলিতে আরম্ভ করিল। মুকুলও আর প্রতিবাদ না করিয়া তাহার সহিত আসিয়া শ্রীশের ঘরে বসিল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই কিছু ফল সন্দেশ ইত্যাদি লইয়া মায়া পুনঃ প্রবেশ করিয়া বলিল—আপনার ওপর অত্যাচার কর্‌লাম মুকুল বাবু, খুব কষ্ট হবে আপনার—

মুকুল। এত লোকের মধ্যে আমাকে বিশ্বাস করে এই কাজের ভার দিয়েছেন শুধু এই কথা মনে করে সে কষ্ট আমি সহ্য করতে রাজী আছি। ভয়ানক একটা গর্ব্বও হচ্ছে মনে মায়াদেবী,—আমিও কারো কাজে লাগ্‌তে পারি!—আপনাকে কোন খবর দিতে হবে কি?

মায়া। না আজ আপনি তার কাছে আছেন এই কথা মনে হলেই আমি অনেক খানি হাল্কা বোধ কর্‌ব।

আহার শেষ করিয়া দাড়াইয়া উঠিয়া মুকুল মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমার তখন মনে হ'ল, কনেরও শরীর বিশেষ ভাল নেই।

মায়া চম্‌কিয়া মুকুলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কেন মনে হ'ল ও কথা??

মুকুল। তা ঠিক জানিনা এমনি মনে হ'ল, হয়ত আমারই দেখার ভুল।—আসি তা হ'লে?—

মুকুল চলিয়া গেল।

তখন বিবাহ শেষ হইয়াছে। বরের পাশে পাশে চলিবার চেষ্টা করিতে করিতে দীপ্তি ক্রমেই মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। মায়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

দীপ্তির শুষ্ক প্রায় ঠোঁট দুটি আর একবার কাঁপিয়া উঠিল—দিদি—'

ক্রমশঃ

শ্রী—

ভূতের বোঝা

—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ঘাড়ে ভূত চাপিলে মানুষ হয় পাগল, তার ভূত না ছাড়িলে সে মানুষ কাজে লাগে না, দেবতার বেলায়ও সেই কথাই পুরাণে পাই। সতীর মড়া দেহে জীয়ন্তের প্রাণ ছিল না, কেবল ছিল সেই মাংসপিণ্ডের সঙ্গে জড়াইয়া একটা অতীতের স্মৃতি। স্মৃতিকে পচা জড়ে বাঁধিতে গেলে বাধা পড়ে না, আর যাহা পচা তাহাও পচিয়া শেষ হয়; এই পচার সঙ্গে জোড়া যে অতীত বা ভূত, সেটা ভূতের বোঝা. বিষ্ণুর চেষ্টায় যখন ঠাকুরের ঘাড়ের ভূতের বোঝা নামিয়া গেল, তখন তিনি প্রাণের ধ্যানে প্রাণ পাইলেন।

মুসলমানের আমল থেকে যাহাদের জাতির পরিচয়ের নাম হইয়াছে হিন্দু, তাহাদের সমাজের প্রথায় মড়াকে পোড়াইয়া ছাই করিতে হয়, আর সে ছাই টুকুও ধুইয়া মুছিয়া শেষ করিতে হয়; প্রীতির স্মৃতির নামে শ্মশানের ছাই পুষিবার প্রথা নাই। এক বংশের আগ্রহে পোষা ছাইএর ভাঁড় বা কবরের পাথর, অপর বংশের লোকেদের মনে প্রীতি জাগায় না, জাগাইতে পারে না। যত লোক মরে, তাহাদের সকলের মড়ার সংকারে যদি ছাইএর ভাঁড়, কবর বা পুতুলের স্থান করিতে হয়, তবে সারা পৃথিবী হয় ভূতের বাসা; জীয়ন্তের দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। আগ্রায় বা দিল্লীতে গেলে চট করিয়া চোখে পড়ে যে, অনেক লোকে মাথা গুঁজিবার কুঁড়ে বাঁধার স্থান পাইতেছে না, আর মড়ারা বহুবিস্তৃত ভূমিতে বড় বড় প্রাসাদে স্থায়ী বাসা বাঁধিয়াছে। ভূতের শাসনে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কোণ-ঠেসা হইয়াছে। কবরখানাগুলি তাজা মানুষের ভোগের যে জমি দখল করিয়াছে, তাহার এক ইঞ্চও কমাইতে গেলে ধর্ম্মসংস্কারের নাড়ী ব্যথায় টন্‌টন্ করে।

ভারতের কোন দেশী রাজার রাজ্যে বা কোন দূর স্থানে ইউরোপীয় খৃষ্টানের দু'একটা কবর আছে কি না তাহা খুঁজিয়া-পাতিয়া লইবার জন্য ও টাকা খরচ করিয়া সেগুলি রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের বিধান আছে। যে মরিয়াছিল তাহার নাম-গন্ধ কেহ জানে না, তবুও সরকারী তহবিলে ভূতের

বোঝা বহাইবার ব্যবস্থা আছে। তুর্কীর সঙ্গে সন্ধি করিবার সময় ইউরোপীয়েরা একটা ধারা বসাইলেন,—যেন খৃষ্টানের কবরখানা বজায় থাকে!

আগ্রা-দিল্লীর কথায় কেহ কেহ স্মৃতিরক্ষার প্রয়াসের শিল্পচাতুরির কথা বলিতে পারেন। মড়ার নামেই হউক আর জীয়ন্তের নামেই হউক, শিল্পীর দক্ষতায় যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে অবশ্যই স্থায়ী করিতে হইবে; তবে সে শিল্পের নিদর্শনের পদার্থটিকে ভূতের মিউজিয়ম না করিয়া জীয়ন্ত মানুষের উন্নতি-সাধনের স্থান করিলে কোন গোল হয় না।

মানুষের এই উন্নতিসাধনের কথায় ভূতের বোঝার গুরু চাপের আর একটি দিকের আলোচনা করিতেছি। হিন্দুদের দানে চিরস্থায়ী ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, অন্নছত্র, জলাশয়, মঠ ও ঠাকুর-মন্দির হইয়াছে ও হইতেছে; মুসলমানদের ওয়াকৃফ্ ও বিলাতের Endowment প্রভৃতিতেও ঐরূপ ধরণের অনেক প্রতিষ্ঠান বসিয়াছে ও বসিতেছে। লোক সাধারণে এ ধরণের দানের মহিমা গাহিতে শিখিয়াছে; এ সকল দানের প্রতিষ্ঠান যে চিরস্থায়ী হইয়া অনেক স্থলে ভূতের বাসা হয় ও মানুষের উন্নতির বাধা হইয়া দাঁড়ায়, সেটা বেশী লোকে ভাবে না। মোটা টাকায় পোষা চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের অহিতকর অবস্থার আলোচনা করিতেছি।

দানশীল হয় অল্পই কয়েকজন উদারচেতা লোকহিতৈষী ধনী ব্যক্তি। এই মহাপুরুষদের মহত্ত্বের সাথে যে অনেক সময়ে অমঙ্গলে ভাব জড়াইয়া থাকে, তাহা গুণের দীপ্তিতে ঢাকা পড়ে। কথাটি সন্তান-বৎসল ভাল মা-বাপের দৃষ্টান্তে বুঝাইব। অনেক মা-বাপেরা চান যে তাঁহাদের সন্তানেরা ঠিক তাঁহাদের মনের মত গুণে মানুষ হইয়া ওঠে; এজন্য তাঁহারা ছেলেদের নানাদিকের স্বাধীন গতি বন্ধ করিয়া দেন। বাপ-মাদের চেষ্টা সফল হইলে স্বয়ং বিধাতার নিতান্ত অনিচ্ছাতেও মানুষেরা এক ছাঁচে ঢালাই হইত, ও নূতন নূতন মতের ও ভাবের বিকাশ হইত না।

ধরুন, দানশীল রামবাবু খুব সাধু; তিনি চান দেশের লোকেরা তাঁহার মনের মত ধর্ম্ম-কর্ম্ম মানিয়া সাধু হয়। সে সঙ্কল্পে তিনি চিরস্থায়ী ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রতিষ্ঠান বসাইয়া তাঁহার দানপত্রে এই সর্ত্ত রাখিলেন যে, তাহারাই উপসত্ত্ব ভোগ করিয়া প্রতিষ্ঠান রক্ষা করিবে যাহারা রামবাবুর নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত পালন করিয়া চলিবে, এই যে চিরকালের জন্য এক যুগের ধর্ম্মমত মন্দিরাদির পাথরের পাঁচিলের বেড়ায় ও উপসত্ত্বের টাকার লোভের দড়িতে বাঁধিয়া দেওয়া গেল,

তাহাতে প্রাচীন মত রক্ষা করিবার দিকে লোকের স্বার্থের বৃদ্ধি বাড়িল, আর নূতন স্বাধীন মতের বিকাশে বাধা পড়িল। ভূতের চাপে ও মন্দিরের পাথরের চাপে মানুষের স্বাধীন গতি পিষিয়া মরিল!

কেহ যদি ৫০ বছর আগে এই সর্ত্তে পাঠশালার শিক্ষকদের পদ চিরস্থায়ী করিতেন, যে শিক্ষকদিগকে চিরকাল রস্কোর কেমিষ্ট্রি, গেনোর ফিজিক্স্ প্রভৃতি পড়াইতে হইবে, তবে অতীতের বিদ্যা বজায় থাকিত,—নূতন জ্ঞান বাড়িত না। সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপের মধ্যযুগের বিদ্যা ও খৃষ্টানি ধর্ম্মবিশ্বাস কড়ায়-গণ্ডায় খাঁটি রাখিবার সর্ত্তে বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয় বসাইবার দান হয় নাই,—হইয়াছিল বিদ্যা বাড়াইবার জন্য; তাই নূতন নূতন জ্ঞান বাড়িতে পারিয়াছে ও পারিতেছে। এক যুগের প্রয়োজনের বিদ্যা অন্য যুগে জীয়ন্ত থাকিতেও পারে, নাও পারে; ভূতকেই তাজা রাখিতে গেলে ভূতের বোঝা বহিতে হয়, আর প্রত্নতত্ত্বেই দাঁড়ায়। এক যুগের অন্নছত্র অন্য যুগের অলসের আড্ডা হইতে পারে, ও এক সময়ের জলাশয় অন্য যুগে অহিতকর হইতে পারে। বিধাতার সৃষ্টিতে চলিয়াছে ক্রমবিকাশ, আর মানুষেরা আপনাদের দম্ভের মোহে চাহিতেছে নিজের জ্ঞানের চাপে ভবিষ্যতের বিকাশকে মারিয়া ফেলিতে।

এ যুগে যাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মমত মানেন না তাঁহারা সকল সময় মনে রাখেন না যে তাঁহাদের সুসংস্কার একদিন হয়ত কুসংস্কারে দাঁড়াইবে, সংস্কারকদের প্রতিষ্ঠানগুলি যদি এমন বাঁধা নিয়মে ট্রষ্টীদের হাতে পড়ে যে সেগুলি বাঁধন এড়াইয়া স্বাধীন ভাবে প্রসারিত হইতে না পারে, তবে প্রাচীনের মন্দির-গুলির পাথরের চাপে যেমন মানুষের স্বাধীনতা চাপা পড়িয়াছে, তেমনই ইঁহাদের মন্দিরগুলিও হয় নগণ্য হইয়া চামচিকার বাসা হইবে, আর না হয় সম্প্রদায় বিশেষ সে মন্দিরের ভূতের বোঝা বহিয়া মরিবে।



আলোচনা

বাঙ্গালীর দৈহিক অবস্থার কথা খোঁজ করিলে যেমন আজকাল দেখা যায়, যে প্রায় অধিকাংশ নরনারীই অজীর্ণ রোগে পীড়িত, তেমনি তাহাদের মনেরও যে অজীর্ণ রোগ জন্মিয়াছে তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। শরীরের অজীর্ণ রোগের প্রধান লক্ষণ চোঁয়া ঢেঁকুর,—মনের অজীর্ণ রোগের নিদর্শন আজকালকার কতকগুলি গল্প ও কবিতা। অজীর্ণ রোগে রোগীর ক্ষুধা থাকে না। মনের অজীর্ণ রোগে আনন্দ বা শান্তি সম্ভোগ করিবার উৎসাহ থাকে না। মনের এই অজীর্ণ রোগ কতগুলি ফরাসী, রুষীয় বা ভিন্ন দেশীয় উপন্যাস ও গল্পের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া প্রথমে বোধ হয় কতকগুলি লোককে অনেক পরিমাণে আক্রমণ করে। তাঁহাদের হজমশক্তির অক্ষমতা থাকায় তাহা হজম করিতে পারে না। ঐ সকল উপন্যাসের চিন্তার ধারা, কল্পনার সমষ্টি, ঘটনার আয়োজন, নিজেদের রচিত গল্পাদির ভিতর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে। এবং কালক্রমে সেই সকল বাংলা রচনা পাঠ করিয়া বাঙ্গালী নরনারীর মনে ধীরে ধীরে অজীর্ণ দোষ ঘটিতে আরম্ভ করে। সেই অবস্থায় নিজের স্বাভাবিক জীবন যাপন আর ভাল লাগে না, নিজেদের প্রণয় ও প্রেমকে নিতান্ত মামুলি বলিয়া মনে হয়, পারিবারিক জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা বা নিয়মাদিকে বন্ধন বলিয়া মনে হয়, এবং শেষ কালে কাহারও কাহারও এমন অবস্থাও ঘটে যে নিজ স্বামী বা স্ত্রীকে পর্য্যন্ত আর ভাল লাগে না। এই ভাল না-লাগা এতদূর সংক্রামক হইয়া উঠে, যে পর পর প্রণয় করিবার অভিলাষ বাড়িয়া চলে। প্রেম করিয়া যেন আশা মিটে না, সর্ব্বদাই একটা অস্বস্তি অশান্তি নরনারীকে প্রায় উন্মত্ত করিয়া রাখে। এই উন্মত্ততার

ভিতর মনের শক্তি ও সংযম জরাগ্রস্থ হইয়া পড়ে, তাহার সঙ্গেই শরীরের স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়া যায়।

এই অবস্থায় মানুষের জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠে, তাহার ফলে জীবনে ধিক্কার, আত্মহত্যা, কার্য্যে বিফলতা, উৎসাহহীনতা, অন্যায়-বিদ্রোহ বা অধঃপতন ঘটে। বিদেশী সমাজের প্রেমের গল্প, সামাজিক সংগ্রামের কথা পড়িয়া তাহা হইতে গ্রহণীয় জিনিষ বাছিয়া ভোগ করিতে না পারিয়া নিজ শরীর ও মনকে বৃথা উত্তেজিত করিয়া তোলে। যে কখনও চকোলেট্ খায় নাই, তাহাকে চকোলেট্ দিলে যেমন সে শিসার তবক্ শুদ্ধ চকোলেট্ চিবাইয়া খাইতে আরম্ভ করে, আমাদের অনেকে, সেইরূপ ঐ বিদেশী গল্পগুলির স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখিবার জন্য যে আবরণ থাকে তাহা শুদ্ধ মনের মধ্যে গিলিয়া বসে। ফলে বাংলার ঘরে ঘরে আজ অশান্তি। সে অশান্তির কতগুলি হয়ত শুনিতে পাওয়া যায়, আর অনেক গুলির খবর জানিতে পারা যায় না।

প্রেম করিবার একটা সখ্ মানুষকে পাইয়া বসে, নিজ অবস্থাকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিবার মত একটা দুরবস্থা হয়। তাহার জন্য আজকাল গল্পগুলি কেবলি দুঃখের কাঁদুনি বা অতৃপ্তির শোকোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ থাকে। এই গল্পগুলি নানা কারণে লেখা হয়। এক কারণ, নিজের মনের যে অবস্থা তাহা রচনার ভিতর ব্যক্ত করিতে পারিয়া যে একটু শান্তি তাহা পাইবার জন্য ; দ্বিতীয় কারণ নিরুপায় হইয়া লেখার ভিতর দিয়া কাহারও উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় ; তৃতীয় কারণ যাহা মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস নাই তাহা গল্প লিখিলে অপর পক্ষ পাঠ করিয়া জানিতে পারিবে এই আশায় ; চতুর্থ কারণ এইরূপ কতকগুলি চিন্তাক্লিষ্ট অজীর্ণ রোগগ্রস্থ পাঠক-পাঠিকার সহানুভূতি ও প্রশংসা লাভ করিবার প্রলোভনে ; পঞ্চম কারণ নিজের অন্য কিছু লিখিবার অক্ষমতা। এই সকল কারণ ছাড়াও হয়ত আরও একাধিক হেতু আছে। এই সকল লেখা পড়িয়া স্বভাবতঃই মন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হয়। এই অভ্যাস নেশার মত পাইয়া বসে। মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক-সাধারণকে লইয়া যে সকল গল্পের অবতারণা করা হয় তাহা আজকালকার দিনে নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। আজকাল 'মধ্যবিত্ত' বলিয়া কোনও অবস্থার লোক আছে বলিয়া মনে হয় না। হয় খুব বড়লোক, নয়ত একেবারে সব মিলাইয়া একদল, তাহাদের একমাত্র নাম হইতে পারে 'শ্রমিক'। এই ধনী বা বড়লোকের দল অত্যন্ত মুষ্টিমেয় ও নির্ব্বোধ, তাহাদের কথা উল্লেখ করিবার মত কিছু নহে।

তাহারা সমাজে নানাপ্রকার প্রলোভনের বস্তু উপস্থিত করে। সেই প্রলোভন ও মোহ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রকে পাইয়া বসিয়াছে। তাহাদের দেখিয়াই অনেকের মাথায় পাগ্‌লামী আরম্ভ হয়। তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

এই মুষ্টিমেয় বড়লোকদের ভিতরও একটা বেশ রেষা-রেষি চলে। তাহার একটি সামান্য উদাহরণ আলোচনা করিয়াই বেশ আমোদ সম্ভোগ করিতে পারা যায়। কলিকাতায়[1] সকল জাতির বড়লোকের সংখ্যা অধিক। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এই বড়লোকদের একটা ফ্যাসান গঙ্গার ধারে ষ্ট্রাণ্ড রোডে গাড়ী বা মোটর করিয়া বেড়াইয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা। কোনও পদচারী পথিক যদি সেই সময় একপাশে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে তাহা হইলে দেখিবে এই নির্ব্বোধের দল, শুদ্ধ বায়ু সেবনের অভিনয় করিতে আসিয়া একজন আরেক জনের অশ্বপদপিষ্ট বা মোটরের চাকা-চক্রিত ধূলিপূর্ণ বায়ু অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে ও শ্রদ্ধার সহিত সেবন করিতেছে। এই সকল লোককে দেখিয়াই অনেক 'মনাজীর্ণ' রোগী তাহাদের অনুকরণ করিতে প্রলুব্ধ হয়। অবস্থায় কুলাইতে পারে না বলিয়া জাল, জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখা যায়। এই সমস্ত অবস্থায়ই বিদেশাগত। কিন্তু বিদেশাগত বলিয়াই যে এগুলি ঘৃণার জিনিষ তাহা নহে। সকল দেশই, এই কালের এই অশান্তিকর অবস্থাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। কারণ কতগুলি জিনিষ সকল দেশের সকল লোকের পক্ষেই অশান্তিকর ও অপকারী। বিদেশী গল্পের নায়ক-নায়িকা আমাদেরই মত মানুষ। কতগুলি দেশগত পার্থক্য, আব্‌-হাওয়া সংস্কারের ভিন্নতা হেতু—তাহাদের চিন্তা বা কার্য্যের ধারা আমাদের জীবনে প্রযুজ্য নহে, ইহা বুঝিতে পারিলেই মনকে আশ্বস্ত করিতে পারা যায়, অসংযত মনকে নিষ্ঠাবান্‌ করা যায়, সত্য আচরণের প্রতি শ্রদ্ধা আসে, মোহকে জয় করা যায়, সমস্ত সংগ্রাম ও দুরবস্থার সহিত যুঝিবার মত যথেষ্ট শক্তি আহরণ করা যায়। তাহা হইলে গল্প লিখিবার ধরণও বদলাইয়া যায়। এবং উহা পাঠ করিয়া অবসন্ন মানুষ প্রাণে শক্তি ও আশার আলোক-সঞ্চার দেখিতে পায়। নিজ অবস্থার ভিতর নিজেকে শান্তভাবে সংস্থাপিত করিতে পারে। প্রণয়, প্রেম, দারিদ্র্য, উৎপীড়ন যে উল্লেখ-যোগ্য অবস্থা নহে—তাহা নয়। কিন্তু তাহা লইয়া মরা-কান্না না কাঁদিয়া, তাহা হইতে নিরাপদে উত্তীর্ণ হইবার ক্ষমতা লাভ করাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। এই সকল অবস্থার ভিতর নিজেকে জানিবার ও চিনিবার যে সুযোগ ঘটে তাহাই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারাই জীবনোপায়ের নিদর্শন। নিজ উপার্জ্জিত সিদ্ধির সংবাদ বহন করিয়া নির্য্যাতিত মানব সজ্ঞকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারাই গল্প লিখিবার একটা কল্যাণকর বিশেষত্ব। অসহায়ের বিলাপ-ধ্বনিতে নানা দুঃখে জর্জ্জরিত নরনারীকে অধিকতর ভয়াকুল না করিয়া তাহাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও ন্যায়ের সপক্ষে দাঁড়াইবার শক্তির সন্ধান করিয়া দিতে পারিলে আজকালকার দিনে গল্প বা কবিতার কিছু সার্থকতা থাকে বলিয়া মনে হয়।

ছোট গল্প।

প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩০—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প—শুধু কেরাণী। একটি কেরাণী যুবক ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া এই গল্প। এই দুইটি মানুষের প্রেম ও স্পৃহার মধ্যে কোনও আবিলতা নাই। স্ত্রীকে ভালবাসা জানাইবার জন্য স্বামীর নিত্য নূতন আয়োজন করিতে হয় নাই। স্ত্রীও, সে যে স্ত্রী বলিয়া স্বামীর দাসী, সে কথা কখনও সে মনে করে নাই। স্বামী পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিলে তাঁহার সেবা ও সাহায্য করা যে স্ত্রীর পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয় অথবা অপমানজনক নয় তাহা এই কেরাণীর স্ত্রীর ব্যবহারে বেশ বুঝা গিয়াছে। উভয়ে পরস্পরকে এমন পরিষ্কার ভাবে জানিত ও বুঝিয়াছিল যে তাহাদের বিবাহিত জীবনে ভুল বুঝিবার মত একটি মুহূর্ত্তও আসে নাই। কোনও অভিনয় করিবারও প্রয়োজন হয় নাই। এবং কালক্রমে স্ত্রীকে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়াও স্বামী তাহার নিবিড় প্রেমকে ঘটা করিয়া হা হুতাশ করিতে দেয় নাই। স্ত্রীও স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতে যে কতখানি কষ্ট পাইতেছিল তাহা তাহার একটি কথায় শেষ দিকে বেশ সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীমোহিনী মুখোপাধ্যায়ের গল্প—স্নেহের শাসন। ভাষা আর একটু সরস ও স্থানোপযোগী হইলে ভাল হইত। খুকুমণির 'চটুল চক্ষু দুটী' একেবারেই শোভন হয় নাই। ইলার 'অতন্দ্রিত স্নেহের ছায়ায়' ঘুমাইতে পারা একটু কষ্টকর। গল্পের খুকুমণির কথা ও কাজগুলি একটু অস্বাভাবিক হইয়াছে। ইলাকে বিধবা করিয়া তাহাকে এমন যন্ত্রণা দিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। গল্পে ইলার যে চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে সে বিধবা না হইয়া অন্য যে কোনও অবস্থার মেয়ে হইলেও তাহার জীবনকে এমনি ভাবেই পরিচালিত করিতে পারিত। মামুলি গল্পের মত কলমের খোঁচায় 'কাল ব্যাধি' দিয়া তাহার মৃত্যু না ঘটাইলেও গল্প বোধ হয় উপসংহারে কোথাও বাধিত না। ইলাকে মৃত্যু দিয়া পবিত্র রাখা হইল বলিয়া যেন মনে হয়।

গল্পটীর স্থানে স্থানে চমৎকার হইয়াছে. কিন্তু প্রকাশ করিবার আয়োজনে

ও উপমার বাড়াবাড়িতে অনেক স্থানে বড় 'ভয়ঙ্কর মিষ্ট' হইয়াছে। তবে আজকালকার অনেক গল্পের চাইতে ভাল হইয়াছে বলিতে পারা যায়।

বঙ্গবাণী, চৈত্র ১৩৩০,—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প-বিমাতা। গল্পটি যদিও ছোট গল্পের পর্য্যায়-ভুক্ত তথাপি আকারে বেশই বড়। জীবনের চলার পথে মানুষের মন নিজ-হাতে-গড়া পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে, কখনও নিজেকে জানিয়া, কখনও নিজেকে না জানিয়া—এ তাহারই একটি সহজ ছবি। গল্পটি আগাগোড়া খুব উজ্জ্বল নয়, তবে মাঝে মাঝে যেমন অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী—তেমনি মনে হয় দুই এক স্থলে খাদে নামিয়া আসিয়াছে।

শ্রীসুনীতি দেবীর ছোট গল্প—অনাত্মীয়। গল্পটির ভাষা ও বিন্যাস চমৎকার হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে কোথাও বাধে না। শৈলেন ও লতাকে লইয়াই গল্প। একজন বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী, অন্যে সুশিক্ষিতা কুমারী। অরুণার মত মেয়ে যে ঘটনার কিছু জানিতে পারে নাই, তাহা অরুণার সৌভাগ্য। শৈলেন যেমন করিয়া লতার অঙ্গকে আঁকড়াইয়া ধরিল, তাহাতে লতা যে ছাড়াইয়া যাইতে পারিয়াছে তাহা তাহার সুশিক্ষারই পরিচয়। তবে লতা যে, শৈলেনের আলিঙ্গনে একেবারে ধরা দেয় নাই তাহা নহে। ইহাতে লতার কিছু অপরাধ হইয়াছে কিনা তাহা লতার ভাবিবার কথা, আর কাহারও নহে। শৈলেন আজকালকার সেই মারাত্মক কথাটি বলিয়া মন্দ কাজ করে নাই, যথা, —"আমার ত মনে হয় কত জন্ম ধরে তোমার আমার মিলনের লীলা চলেছে' ইত্যাদি। ব্যাপারটাকে লঘু করবার জন্য, লতা যে সব কাজ করিয়াছে ও যে ভাবে 'কিন্তু আমার বুকে যে তোমার স্মৃতি অনন্তকালের জন্য জলন্ত অক্ষরে লেখা রইল, এ জ্বালা কিসে জুড়োব ?' চিন্তা করিয়াছে, তাহার পর অরুণার জন্য এতটা চিন্তা না করিয়া শৈলেনের আশ্রয় লইলেই ভাল হইত। লেখিকার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক এবং তাহা সকলে যে ভাবেই গ্রহণ করুন, লেখার ভঙ্গী খুব সাদাসিধে ও তাহার ভিতর যথেষ্ট প্রাচুর্য্য আছে। সমগ্র রচনার ভাষাটি সুন্দর ও সরস হইয়াছে। একটি লাইন যথা,—কথার যেখানে শেষ নাই, সেখানেই বুঝি এত কষ্ট ক'রে কথা খুঁজে মরতে হয় ;—অতি সুন্দর হইয়াছে।

ভারতী, চৈত্র ১৩৩০। শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর—চাঁদের আলো। ইহা যে কোন্ শ্রেণীর রচনা তাহার নাম দেওয়া কঠিন। কথিত ভাষায় এতগুলি কথা বলিয়াও যে সব কথা অকথিত থাকিতে পারে তাহাও বুঝিবার জিনিষ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডলের গল্প—বন্দিনী। নীলিমার 'বুকের মাঝে' 'বিবাহের

প্রকৃত তাৎপর্য্য যে প্রাণহীন পুতুলের বিবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়' তাহাই এই গল্পের ছাড়-পত্র। সুতরাং অপরাধ লইবার কিছু নাই। গল্পের এক একটি কথা অতি সুন্দর হইয়াছে।—হা নিষ্ঠুর, এটুকু অত্যাচার না ক'রে নিলে কি তোমার নিষ্ঠুরতা পূর্ণ হচ্ছিল না? স্থান হিসাবে কথা কয়টি সুন্দর মানাইয়াছে। গল্পের অনেক স্থানেই লেখক খুব সংযত হইয়া লিখিয়াছেন।

শ্রীসুবোধ দাশ গুপ্তের— অভিযোগ। ছোট জিনিসটির ভিতর কথাগুলি খুব সুন্দর করিয়া ফুটাইয়াছেন। শেষের দুইটি লাইন না থাকিলে যেন বালিশ বিছানা ও ঘরের মেজের কথাগুলির মধ্যে কোনও জোর থাকিত না। স্বপ্নের ভিতর এতখানি অ-ভাবুকের মত ভাবিতে পারায় কারিগরী আছে। ভাবার ঢেউও নাই, তাহার উপরে ফেনাও নাই।

শ্রীআশুতোষ ঘোষের ছোট গল্প—প্রায়শ্চিত্ত। ঝরঝরে লেখা, রচনার ভিতরে লেখকের বক্তৃতার কোনও চিহ্ন নাই। গল্পের প্লট্ পুরাণো হইলেও লেখার গুণে নূতন মনে হয়। দুই একস্থানে প্রকৃতির বর্ণনাগুলি একটু 'ভীষণ-মার্ত্তণ্ড-তাপে কাঠ কাটার' মত শুনাইয়াছে।

প্রাচী, ফাল্গুন ১৩৩০—শ্রীনরেশচন্দ্র সেন-গুপ্তের ছোট গল্প—বিশ্বনাথ। এ রকম ধরণের গল্প পূর্ব্বে আরও প্রকাশিত হইয়াছে। এই গল্পে দুইটি মনের অবস্থা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। চেষ্টা যে সফল হয় নাই তাহা নহে। তবে পাগলের চিন্তাগুলিকে লেখক এমন ভাবে বিপন্নের মত পাগলকে দিয়া না ভাবাইয়া, গল্পের প্রথম হইতে পাগলের কার্য্য-কলাপে যেমন করিয়া তাহার মনের অবস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি সরমার প্রতি তাহার আকস্মিক আকর্ষণের পর হইতেও তাহার কার্য্যাদির ভিতর দিয়া মনের অবস্থা প্রকাশ করিতে পারিলে আরও ভাল হইত। সমস্ত গল্পটি এই জন্য যেন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। ছাপার অনেক ভুল আছে, আশা করা যায়, সে ভুল নিশ্চয় লেখকের নয়।

শ্রীগিরিবালা দেবীর—কালোর ব্যথা। গল্পটি যদিও বড় এবং স্থানে স্থানে বাক্য-বহুল হইয়াছে তবুও লেখিকার হেমের চরিত্রটি সুন্দর ফুটিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে গল্পটির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। ভাষা এক এক স্থানে বেশ বিশুদ্ধ ও সরল হইয়াছে। গল্পটি এত বড় না হইলে ভাল হইত। ইহাতেও ছাপার ভুল প্রচুর।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর—চোখের দেখা। গুলুয়া চাকরের গল্প লিখিবার উপযুক্ত ভাষা হয় নাই। গল্পটি ইংরাজী গল্পের ছাঁচে লেখা। গল্পের ভিতর বিশেষত্ব কিছুই নাই। নূতন প্লট্, গুলুয়া বেচারাকে অযথা কষ্ট দিয়াছে। গল্পটি খুব উজ্জ্বল না হইলেও ঘটনাচক্রে গুলুয়ার প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করে।



কাহিনী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

হায় ভীরু কবি, যদি আরো আষাঢ়ের গুরুভারমেঘস্নিগ্ধ মন্দাক্রান্তাছন্দে আপনার অন্তরের মালবিকা-মণির রূপের দিঠি রাখিয়া যাইতে। যদি একটী শ্লোকেও বলিয়া যাইতে, সেই বিশাল রাজপুরে, নগর মণি উজ্জয়িনীর লতা ঘেরা কোন্ সে পর্ণকুটীরে তোমার অন্তরের রূপসী বধূ রূপের শিখা জ্বালাইয়া রাখিত।

কাহার রূপের শিখা তোমার ধ্যানের শিখা জ্বালাইয়া দিল? কোন নিপুণিকা মালবিকার রূপবহ্নিতে আহুতি দিবার জন্য অকাল বসন্ত আনিলে—কৈলাসের কাশশুভ্র বৈরাগ্যের বল্কলে হঠাৎ-জাগা মধুবসন্তের রক্ত-আবিরের আবরণ দিলে? কবে কোন্ দিন তোমাহারা কোন্ মালবিকা ছিন্ন অঞ্চলে ধরণীর কোলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল—তাহার সেই দিনের সারা ব্যাকুলতা আবার প্রিয়াহারা রতির অঙ্গে ফুটাইলে। রতির উন্মুখ যৌবনভারাতুর বক্ষে ধূলিকণা ফুটিয়া উঠিল। হে রূপতান্ত্রিক কবি যে রূপের তুলি দিয়া উমাকে গড়িয়াছ, সেই রূপের স্পর্শ তোমায় কে দিল?

উজ্জয়িনীর সন্ধ্যার আকাশে বিদেশী-মেঘের দল তমালতালে ছায়া করিয়া থাকিত। রূপবিলাসময়ী উজ্জয়িনী রুদ্ধঘরে রত্ন-দীপের নিলাজ আলোর আভায় আবার নূতনতর রূপের হাট খুলিত; দূরে সন্ধ্যার বাতাসে তন্ত্রীর ছিন্নতান ভাসিয়া আসিত; উজ্জয়িনীর রাজপথে কাজের জনতা থামিয়া আসিত; শুধু জাগিত দুই একটী অভিসারধানী দ্রুতপদের নূপুর-সিঞ্জিনী; আধ-অন্ধকারে তমালতরুর ফাঁকে ফাঁকে শুধু মাঝে মাঝে কণ্ঠের স্বর্ণহার চিকমিক করিয়া উঠিত; রাত্রি গভীর হইয়া আসিত; দূরে দুই একটী সঙ্কেত দীপ নিভিয়া আসিত; কোথাও অন্ধকারে বাতায়নে নক্ষত্রের মত আবার দীপ জ্বলিয়া উঠিত; রাত্রি ক্রমশঃ প্রভাত হইয়া আসিত; উজ্জয়িনীর প্রভাতের পথে শুধু পড়িয়া থাকিত দুই একটী দলিত কুসুমের ছিন্নহার; কোথাও কণ্ঠচ্যুত শিশিরের

মত একটী মুক্তা ; কোথাও একটী নূপুর ; কোথাও পদ্মপত্রে শুষ্ক শ্বেত-চন্দন ! উজ্জয়িনীর ভরা-রাত্রির রূপ-উৎসবে কোথায় থাকিতে, হে রূপস্রষ্টা কবি !

উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদের স্বর্ণচূড়ায় সোনার আলো লাগিল। একে একে শ্রান্ত নগররক্ষিগণের ক্লান্ত মুখগুলি দেখা দিল। রাত্রির ছিন্নমালার উপর দিয়া আবার রথচক্র বহিয়া চলিল। শ্রেষ্ঠী, মণিকার আবার বিপণী খুলিল। দুই একটী বিদেশী সৈনিকের মুখ দেখা দিল ; বিস্ময়ে তাহারা চাহিয়া দেখিতেছে সূর্য্যালোকে বিক্রমাদিত্যের রাজপুরী ! ভাট আসিয়া বিপুল উৎসাহে রাজপথে ঘোষণা করিয়া গেল—আজ অপরাহ্নে প্রবল পরাক্রম মহা-অধীশ্বর উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নাট-মন্দিরে উজ্জয়িনীর নব-রত্নের শ্রেষ্ঠরত্ন শ্রীকালিদাস কবির মহানাটক শকুন্তলা অভিনীত হইবে ; হে সজ্জন পুরবাসী দ্বিপ্রহরেই তথায় উপস্থিত হইও।

অভিনয় শেষে—উজ্জয়িনীরাজ স্বয়ং কণ্ঠের হীরকহার তোমার কণ্ঠে তুলিয়া দিল। রাত্রির কম্পমান অন্ধকারে—কাহার পায়ের তলায় সে হীরকহার নামাইয়া দিলে ?

তোমার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ কে জ্বালাইত ? কাহাকে অমর করিতে গিয়া বিরহ-ব্যথিত আষাঢ়ের প্রথম দিবসকে অমর করিয়া গেলে ! কোন্ নায়িকার আঁখির আলোয় সারাবিশ্বের বিরহীর মন্দিরে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়া দিলে। আজও তোমার সেই আলোর আভাস তোমার ছন্দের আড়ালে থাকিয়া আজিকার দিনে এই নূতনতর ধরণীর কোলে যাহারা ভালবাসিতেছে—ভালবাসিয়া যাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে—তাহাদের অন্তরের একক জগতে দোসরের মত তাহাদের ছিন্নমলিন অঙ্গে আর্দ্র করুণার স্পর্শ দিতেছে।

জগৎ তোমার জন্মের তারিখ হারাইয়া ফেলিয়াছে ; তোমার প্রতি দিবসের কাহিনী জগৎ বড় ভালবাসিয়া আপনার ধূলায় টানিয়া লইয়াছে ; উজ্জয়িনীর রাজসভা—বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী—সকলি রূপকথা হইয়া গিয়াছে। শুধু সত্যভাবে আজও বাঁচিয়া আছে—উজ্জয়িনীর স্থলে অলকা ; বিক্রমাদিত্যের রাজসভার স্থলে মেঘদূত ; উজ্জয়িনীর লক্ষ মানবের মাঝে—মালবিকার নাম ; সকল গৌরবময় উজ্জয়িনীর অতীতের মধ্যে চিরস্থায়ী হইয়া আছে—কবেকার কোন্ আষাঢ়ের জলসিক্ত কতকগুলি মন্দাক্রান্তা ছন্দ।

রূপ

—মুরলীধর বসু।

১

প্রবাসে আসিয়া অশান্তের সহিত শিখরেশের মাত্র এই পনের ষোল দিনের আলাপ, তবুও ইতিমধ্যে উভয়ের মধ্যে একটা মধুর প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে! এই কয়দিন দিনের অনেকখানি সময় দু'জনে একসঙ্গে থাকিয়াছে ও বেড়াইয়াছে। কথাও উভয়ের মধ্যে অনেক হইয়াছে। কিন্তু সে সব কথা এখানে বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই। শুধু নীচের এই কথাবার্ত্তাগুলা যাহাদের মধ্যে হইয়াছিল, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটা যে কি ও কেমন-ধারা, একজন বিশ বৎসরের তরুণ আর একজন সাতাস বৎসরের যুবকের সহিত অন্তর বাহিরের যাবতীয় ভেদ-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বন্ধুত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এই কয়টা দিনের মধ্যে কেমন ভাবে কতটা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল সংক্ষেপে তাহাই জানাইবার জন্য এই ভূমিকাটুকুর অবতারণা।

অশান্ত কিন্তু সেদিন এমনিধারা একটা ভূমিকা করার কোনও প্রয়োজন মনে করে নাই; যতদূর জানি এটা তার প্রকৃতিতেও বড় একটা আসিত না। তাই সেদিনকার সন্ধ্যায় শিখরেশের সহিত মাঝ-পথে দেখা হইতেই হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা, খুব সুন্দরী একটি মেয়ে দেখ্‌লে প্রথমটা তোমার কি মনে হয় বল ত?

শিখরেশ এতক্ষণ আপন মনেই চলিয়া আসিয়াছিল, তাই নজর পড়ে নাই, এখন দেখিল একটি সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ়ের সহিত এক তরুণী একখানা লাল চওড়া পেড়ে গরদের সাড়ী পরিয়া বেণী দুলাইয়া জরির কাজ-করা নাগরা-পায়ে এই মাত্র তাহাদের সামনে দিয়া সহজ অকুণ্ঠিত ভাবে পার হইয়া বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

আকাশে তখন কয়েকটা তারা সবে মাত্র উঁকি ঝুঁকি দিতে সুরু করিয়াছে, অশান্তের চোখের মণি দুইটাও কেমন যেন এক অস্বাভাবিক দ্যুতি লইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শিখরেশ বন্ধুর হাবভাব দেখিয়া রহস্য করিয়া তাহার সুরে সুর মিলাইয়া জবাব দিল,—বুকের রক্ত আন্ চান্ ক'রে ওঠে,—আর কি করবে !

অশান্ত সরল মনে নিঃসংশয়ে তাহার এই কথা বিশ্বাস করিল, পথ চলিতে চলিতে শিখরেশের পিঠের উপর একখানা হাত তুলিয়া দিয়া অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল,—কতক্ষণ থাকে ?

শিখরেশ এতক্ষণ তাহার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এইবার মাথাটা ঈষৎ দোলাইয়া বলিল,—তাও বল্‌তে হবে ?—ধর্, এই সেকেণ্ড খানেক ।—কিন্তু আজ হঠাৎ এ কথা কেন রে ?

অশান্ত যেন তার এই শেষের কথাটা শুনিতেই পাইল না । সে ধীরে ধীরে শিখরেশের পিঠ হইতে হাতখানা নামাইয়া লইয়া যে প্রশ্নের জবাব দিল, নিশ্চয়ই তা শিখরেশের প্রশ্ন নয় । কে তাহাকে এ প্রশ্ন শুধাইল জানি না, সে কিন্তু আপন মনে বলিয়া চলিল,—আমারও অনেকটা তাই হয় । রাস্তা দিয়ে চলবার সময় এমন কোনও মানুষ যেতে পায় না, যার দিকে আমি তাকাই না । এক দিনের কথা মনে পড়ে । কলকাতায় একদিন দুপুরের শেষে ঘুরতে ঘুরতে একটা বাড়ীর সামনে এসে একেবারে থ হ'য়ে গেলাম । দো তলার বারাণ্ডায় একটি মেয়ে বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে, সবে ঘুম থেকে উঠেছেন, চোখ দুটো তখনও ফুলো ফুলো, নিবিড় কালো কোঁকড়া চুলের দু'চারগোছা এলোমেলো ভাবে কপালের ওপর এসে পড়েছে, যেমন সুন্দর রং তেমনি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, সারা অঙ্গে কি অপূর্ব্ব সুষমা অথচ কি দীপ্তি, দাঁড়ানোর ভঙ্গীর মধ্যে সে কি শান্ত মহিমা . . . সবটুকু নিয়ে সে এক অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জস্য, পথের ধারে রেলিংঘেরা বারাণ্ডায় মুখ মোছবার জন্য তোয়ালে নিতে এসেছেন—, আমি সব ভুলে পলকহীন চোখে তাঁর পানে তাকিয়ে রইলাম । চল্‌বার শক্তিও তখন আর ছিল না । মেয়েটিও প্রথমটা অবাক হ'য়ে গেছলেন, পরক্ষণেই দ্রুতপদে ভিতরে সরে গেলেন । তখন আমার চমক ভাঙ্গল । চেয়ে দেখি রাস্তায় একটা লোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ও কদর্য্য হাসি হাস্‌ছে এবং আর একজন কি বলবার জন্য এগিয়ে আস্‌ছে । আমি জোর পায়ে পাশের গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম । . . . তারপর . . . কতদিন গেছে, আমি ঐ পথে গেছি আর এসেছি, শুধু তাঁকে একবার দেখ্‌বার জন্য ।

ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে, যাঁর নামে শিখরেশের নাম, তিনি যেমন ভাবে আছেন, এই কথার পর বোধ করি অনেকটা তেমনি করিয়াই শিখরেশ স্তব্ধ হইয়া রহিল । অশান্তকে এত শান্ত থাকিয়া এমনি ধীরে ধীরে কথা বলিতে এই স্বল্প দিনের পরিচয়ে সে আর একটি দিনও দেখে নাই । আজ তার এই নবলব্ধ বন্ধুর নূতন রূপ যেই তার চোখে পড়িল, অমনি সে অভিভূত হইয়া গেল । তার সেই একটু আগের হাসি-পরিহাসের লঘুচপল ভাব যেন নিমেষেই ঘুচিয়া গেল । সে গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিল । অশান্তও নীরবে তাহার পাশে থাকিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল । সে যেন এইমাত্র একটা মধুর অথচ করুণ স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে ।

রূপ

—মুরলীধর বসু।

১

প্রবাসে আসিয়া অশান্তের সহিত শিখরেশের মাত্র এই পনের ষোল দিনের আলাপ, তবুও ইতিমধ্যে উভয়ের মধ্যে একটা মধুর প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে! এই কয়দিন দিনের অনেকখানি সময় দু'জনে একসঙ্গে থাকিয়াছে ও বেড়াইয়াছে। কথাও উভয়ের মধ্যে অনেক হইয়াছে। কিন্তু সে সব কথা এখানে বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই। শুধু নীচের এই কথাবার্ত্তাগুলা যাহাদের মধ্যে হইয়াছিল, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটা যে কি ও কেমন-ধারা, একজন বিশ বৎসরের তরুণ আর একজন সাতাস বৎসরের যুবকের সহিত অন্তর বাহিরের যাবতীয় ভেদ-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বন্ধুত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এই কয়টা দিনের মধ্যে কেমন ভাবে কতটা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল সংক্ষেপে তাহাই জানাইবার জন্য এই ভূমিকাটুকুর অবতারণা।

অশান্ত কিন্তু সেদিন এমনিধারা একটা ভূমিকা করার কোনও প্রয়োজন মনে করে নাই; যতদূর জানি এটা তার প্রকৃতিতেও বড় একটা আসিত না। তাই সেদিনকার সন্ধ্যায় শিখরেশের সহিত মাঝ-পথে দেখা হইতেই হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা, খুব সুন্দরী একটি মেয়ে দেখ্‌লে প্রথমটা তোমার কি মনে হয় বল ত?

শিখরেশ এতক্ষণ আপন মনেই চলিয়া আসিয়াছিল, তাই নজর পড়ে নাই, এখন দেখিল একটি সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ়ের সহিত এক তরুণী একখানা লাল চওড়া পেড়ে গরদের সাড়ী পরিয়া বেণী দুলাইয়া জরির কাজ-করা নাগরা পায়ে এই মাত্র তাহাদের সামনে দিয়া সহজ অকুণ্ঠিত ভাবে পার হইয়া বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

আকাশে তখন কয়েকটা তারা সবে মাত্র উঁকি ঝুঁকি দিতে সুরু করিয়াছে, অশান্তের চোখের মণি দুইটাও কেমন যেন এক অস্বাভাবিক দ্যুতি লইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শিখরেশ বন্ধুর হাবভাব দেখিয়া রহস্য করিয়া তাহার সুরে সুর মিলাইয়া জবাব দিল,—বুকের রক্ত আন্ চান্ ক'রে ওঠে,—আর কি করবে!

অশান্ত সরল মনে নিঃসংশয়ে তাহার এই কথা বিশ্বাস করিল, পথ চলিতে চলিতে শিখরেশের পিঠের উপর একখানা হাত তুলিয়া দিয়া অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল,—কতক্ষণ থাকে?

শিখরেশ এতক্ষণ তাহার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এইবার মাথাটা ঈষৎ দোলাইয়া বলিল,—তাও বল্‌তে হবে?—ধর্, এই সেকেণ্ড খানেক।—কিন্তু আজ হঠাৎ এ কথা কেন রে?

অশান্ত যেন তার এই শেষের কথাটা শুনিতেই পাইল না। সে ধীরে ধীরে শিখরেশের পিঠ হইতে হাতখানা নামাইয়া লইয়া যে প্রশ্নের জবাব দিল, নিশ্চয়ই তা শিখরেশের প্রশ্ন নয়। কে তাহাকে এ প্রশ্ন শুধাইল জানি না, সে কিন্তু আপন মনে বলিয়া চলিল,—আমারও অনেকটা তাই হয়। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় এমন কোনও মানুষ যেতে পায় না, যার দিকে আমি তাকাই না। এক দিনের কথা মনে পড়ে। কলকাতায় একদিন দুপুরের শেষে ঘুরতে ঘুরতে একটা বাড়ীর সামনে এসে একেবারে থ হ'য়ে গেলাম। দো তলার বারাণ্ডায় একটি মেয়ে বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে, সবে ঘুম থেকে উঠেছেন, চোখ দুটো তখনও ফুলো ফুলো, নিবিড় কালো কোঁকড়া চুলের দু'চারগোছা এলোমেলো ভাবে কপালের ওপর এসে পড়েছে, যেমন সুন্দর রং তেমনি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, সারা অঙ্গে কি অপূর্ব্ব সুষমা অথচ কি দীপ্তি, দাঁড়ানোর ভঙ্গীর মধ্যে সে কি শান্ত মহিমা . . . সবটুকু নিয়ে সে এক অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জস্য, পথের ধারে রেলিংঘেরা বারাণ্ডায় মুখ মোছবার জন্য তোয়ালে নিতে এসেছেন—, আমি সব ভুলে পলকহীন চোখে তাঁর পানে তাকিয়ে রইলাম। চল্‌বার শক্তিও তখন আর ছিল না। মেয়েটিও প্রথমটা অবাক হ'য়ে গেছলেন, পরক্ষণেই দ্রুতপদে ভিতরে সরে গেলেন। তখন আমার চমক ভাঙ্গল। চেয়ে দেখি রাস্তায় একটা লোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ও কদর্য্য হাসি হাস্‌ছে এবং আর একজন কি বলবার জন্য এগিয়ে আস্‌ছে। আমি জোর পায়ে পাশের গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম। . . . তারপর . . . কতদিন গেছে, আমি ঐ পথে গেছি আর এসেছি, শুধু তাঁকে একবার দেখ্‌বার জন্য।

ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে, যাঁর নামে শিখরেশের নাম, তিনি যেমন ভাবে আছেন, এই কথার পর বোধ করি অনেকটা তেমনি করিয়াই শিখরেশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। অশান্তকে এত শান্ত থাকিয়া এমনি ধীরে ধীরে কথা বলিতে এই স্বল্প দিনের পরিচয়ে সে আর একটি দিনও দেখে নাই। আজ তার এই নব-লব্ধ বন্ধুর নূতন রূপ যেই তার চোখে পড়িল, অমনি সে অভিভূত হইয়া গেল। তার সেই একটু আগের হাসি-পরিহাসের লঘুচপল ভাব যেন নিমেষেই ঘুচিয়া গেল। সে গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিল। অশান্তও নীরবে তাহার পাশে থাকিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। সে যেন এইমাত্র একটা মধুর অথচ করুণ স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

২

রাত্রি তখন প্রায় এগারটা হইবে। শিখরেশ লেখা শেষ করিয়া তার নীল খাতাখানা বন্ধ করিয়া রাখিল।

কয়েক মিনিট নিশ্চেষ্ট ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া পুনরায় টেবিলের কোণে সরিয়া আসিয়া সে ধীরে ধীরে খাতাখানা খুলিয়া এতক্ষণ ধরিয়া যাহা লিখিয়াছিল, একাগ্রমনে তাহা পড়িতে সুরু করিল।

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৩০।

মানুষের কেবল বাইরের রূপ আমাকে কোনও কালেই বেশী টানে না। তার ভিতর বাহিরের যোগাযোগে যে রূপ ফোটে, তাই তার সত্য রূপ, তাতেই আমাকে মুগ্ধ করে। তার অন্তরগত বিশিষ্টতাটুকু যেখানে আপনার অপরূপ বৈচিত্র্যে এক পরিপূর্ণ সুন্দর অবয়বকে আশ্রয় ক'রে কথা বার্ত্তায় চলা ফেরায় দিনের সকল কাজে, সকল মুহূর্ত্তে সহজ হ'য়ে, উজল হ'য়ে, জীবন্ত হ'য়ে ফুটে বেরোয় সেই খানেই আমার অন্তর বসন্ত তরুর ফুলে ফলে ভরে ওঠার মত নিত্য নব নব আনন্দে ভরে ওঠে। তাই, যেখানে সুন্দর মুখ দেখি, সেখানে শুধু মুখের দিকে তাকিয়েই তৃপ্তি হয় না। একেবারে তার অন্তরের মণি-কোঠায় গিয়ে সেখানকার রঙে রঙে রঙীন, রেখায় রেখায় বিচিত্র বিরামহীন অনুপম ভাব-লীলার উৎসবে নিতান্ত দরদী আপন জনটির মত যোগ দিতে ইচ্ছা যায়।

. . . কিন্তু হায় আমার জানাশোনার মধ্যে এক মঞ্জু ছাড়া এমন ধারা ক'রে তাকিয়ে দেখবার মত মুখ, তন্ময় হ'য়ে যাওয়ার মত প্রাণ ত এত ঘুরেও বড় বেশী পাই না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত ভগবানের দেওয়া সৌন্দর্য্যের অমর্য্যাদাই দেখি। কোনও জায়গায় বা দেখি বিরুদ্ধ অবস্থার চাপে ভিতরকার সৌন্দর্য্য ফুটি ফুটি ক'রেও ফুটতে পেল না, আবার কোনও জায়গায় বা খানিকটা ফুটেই হঠাৎ তার বিকাশ বন্ধ হ'য়ে গিয়ে ঝরা ফুলের মত বিবর্ণ হ'য়ে শুকিয়ে উঠল, আবার কোথাও বা তাকে বাহিরের যত প্রাণহীন তুচ্ছ উপকরণ দিয়ে সাজাতে গিয়ে তার নির্ম্মম ভারে ও চাপে, সেই সুন্দর অন্তর সরল, সহজ, স্বাভাবিক মাধুরীকে নিরুপায় ভাবে এ জন্মের মত হারিয়ে ফেলা হ'ল। যেখানে মানুষ জন্ম থেকে কুৎসিৎ, সেখানেও খোঁজ নিয়ে দেখি, একদিন সেই পরিবারেও এমনি ক'রে সৌন্দর্য্যের আত্মহত্যা হ'য়ে গিয়েছে, কেউ তার খবর করে নি, তার রক্ত সেইখানেই জমাট বেঁধে কালো হ'য়ে উঠেছে, আজকের এই কদর্য্য কালো তারই প্রতিচ্ছবি। এপথে সেপথে বিপথে যখনই যে পথে চলেছি, আশে পাশে যত জায়গায় যত মুখ দেখেছি, অধিকাংশ সময়েই অনেক আশা নিয়ে বিফল হ'য়ে গভীর বেদনার সঙ্গে এইটে অনুভব ক'রে এসেছি। . . .

দুইদিন

—শ্রীসুধাংশুবিকাশ রায়চৌধুরী।

আজ এই পাঁচ বৎসর এই ষ্টেশনটাতেই আছি। এই পাঁচ বছরে জীবনের উপর দিয়ে কত ঝড়ো হাওয়া ব'য়ে গেছে, কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে এই দাসত্ব-ধূলি-ক্লিষ্ট জীবনের কত বছর কাটিয়ে দিয়েছি। জীবন-সায়াহ্নের অস্পষ্ট আলোকে পেছন পানে তাকিয়ে তাই আজ কত কথা মনে আস্‌ছে। ছোট্ট একটা পাখীর খাঁচার মত, তিরিশ টাকার রেল আফিসের বাবু, আমার বাসা, তার ভিতরই কোন রকমে এই জীবনের সকল ভার ব'য়ে এসেছি। রাত্তির ন'টার সময় ডিউটীতে এসে কতদিন কত দৃশ্য দেখেছি,—কত তরুণ জীবনের রঙ্গীন আশা-ভরা অভিসার যাত্রা দেখেছি, কত গৃহমুখী যাত্রীর অফুরন্ত কল কোলাহল শুনেছি—আরও এ পৃথিবীর কোলাহলময় জীবনে কত দেখ্‌ব! ষ্টেশন্ ঘরের জানালার ভিতর দিয়ে নৈশ আকাশের অসংখ্য তারার আলোর দেয়ালী দেখি—কি অনন্ত তার আলিঙ্গন—কি সুদূরস্পর্শী তার গতি! কতদিন সেই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির আলোর ম্লানিমার ভিতর কত অচিন্ পথিকের প্রণয় সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা শুনেছি; সে জীবন আজও চল্‌ছে—তেম্‌নি বিশেষত্বহীন—তেম্‌নি পুরাতন।

* * * *

রাত্তির বারোটা। এখনই মেল্ গাড়ীটা আস্‌বে—'নগ'ও এসেছে। পয়েণ্টস্‌ম্যান্‌টাকে ঘণ্টা দিতে বলে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর জীর্ণ টুপীটা মাথায় দিলুম। দূরে—বহুদূরে ট্রেণের ঝক্‌ঝকানি শোনা যাচ্ছিল, রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে তার রক্ত চক্ষুর চাউনিও বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম। গাড়ীটা এসে থাম্‌ল। কত জানালা দিয়ে কত রকম মুখ, কত চোখের কত রকম চাউনি, বিশ্বের সমস্ত ভাব-বৈচিত্র্য যেন সে চোখগুলোর দৃষ্টিতে ছড়িয়ে পড়্‌ছে। হঠাৎ কি ভেবে একটা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর হাতল ধরে উঠে পড়্‌লুম।... ভেতরে সে যেন যুগ-যুগের শাশ্বত প্রেমিক প্রেমিকার উচ্ছল কল গান।...সে একটী মেয়ে—সরম-রাঙ্গা মুখে সে আধ লজ্জা আধ প্রেম

মাখান একটী মুখ—সে যেন পৃথিবীর সমস্ত লীলা-মাধুর্য্য দিয়ে তৈরী একটী ফুল—র‍্যাফেলের সমস্ত সাধনা-পূত একটী চিত্র-প্রতিমা। পাশে বসে একটী যুবক—সে বুঝি, তারই স্বামী। ছেলেটী, তার রাঙ্গা মুখের ঘোমটা টেনে সরিয়ে তাকে বিব্রত ক'রে তুলছিল, আর সে লজ্জায় মুখটী সরিয়ে নিচ্ছিল। সে কত খেলা—বহিঃপ্রকৃতির অন্ধকারে সে যেন কোন যুগ যুগের তরুণ তরুণী . . .

কোঁস্—কোঁস—কোঁস্—স্—স্ ট্রেণটা ছেড়ে দিল—দিগন্তের সীমাহীন অন্ধকারে সে মিশে গেল,—কেবল তার বিকট রক্ত চক্ষু সে গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরে তীব্র দৃষ্টি হান্‌ছিল।

আবার আপন কুটীরে ফিরে এলুম—তখন ঝিলিমিলি বেলা; প্রভাতে আলো আঁধারের সরম-রাঙ্গা আলিঙ্গন। ভৃত্য ভজুয়া তখনো ঘুমোচ্ছিল। ডাক্‌লুম, "এই ভজু উঠ্‌লি? কত ঘুমোবি, বেলা যে চড়ে এল!"

ভজুয়া তার নিদ্রালস শরীরটা নিয়ে পাশ ফিরে শুল, চেঁচিয়ে বল্‌লুম, "এই হতভাগা, উঠ্‌বি না, এই আট্‌টার গাড়ীতে যে আমায় যেতে হবে।' . . .

তার ঘুম কেটে গেল, উঠে বসে বল্‌লে, "কোথায় বাবু?"

"জানিস্ না, আমি যে আবার বিয়ে কর্‌ব?"

ভজুয়া অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠে পড়্‌ল।

* * *

পশ্চিমের কোঠায় ট্রাঙ্কগুলোর উপর সেই হাতে আঁকা লক্ষ্মীর চরণ-চিহ্ন এখনো তেমনি রয়েছে। আল্‌নার উপর বস্তিনাথের মাসীমার দেওয়া কাপড়টী তেমনি রয়েছে!—সে যে তার বউভাতের সময়ে দেওয়া। রেল আফিসের তিরিশ টাকার বাবু, আমার সব তেমনি আছে, নেই কেবল আমার ঘরের সেই লক্ষ্মীশ্রী! সেই যুবক আর আমি! সে কতদূর গো—সে কত দূর! . . .

* * *

"বাবু আপ্‌নি কি সত্যি যাবেন?"

"না রে না, বললেই যেতে হবে নাকি রে! তোর যেন বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারেই গেছে—কে দেবে যে এ বুড়ো বয়সে এ তিরিশ টাকার রেলের বাবুর কাছে মেয়ে—" . . .

ভজুয়া আমার রকম দেখে চলে গেল।

* * *

ভোর বেলা থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়েছে—সে কি জল। আকাশখানা যেন

নিকষকাল দৈত্যের মুখচ্ছবি—আর সে বৃষ্টি যেন তার তূণ-মুক্ত অযুত শর-সন্ধান। দরজা জানালা বন্ধ ক'রে গুটিশুটি মেরে বসে বসে লিখ্‌ছিলাম—আর ভাবছিলাম এখনই ট্রেণটা আস্‌বে। জলের এক একটা ঝাপ্‌টা আস্‌ছিল—মনে হচ্ছিল যেন এ ছোট্ট ঘরখানা কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এই বিরাট ধ্বংস-লীলার কোথায় অবসান!

* * *

গাড়ীটা এসে থাম্‌ল। আকাশের সেই ভীষণ ভ্রূকুটি আর প্রকৃতির সেই উদ্দাম তাণ্ডবলীলা ভেদ ক'রে গাড়ীটা দাঁড়াল। সেই পুরাণ ওয়াটার প্রুফটা জড়িয়ে বেরুব এমন সময় একটা লোক এসে হাঁপাতে হাঁপাতে জল চাইল—আর বল্‌লে গাড়ীতে কে যেন কেবলি ফিট হচ্ছে। এ বাদল-ক্ষুব্ধ দিনে জল!—একটু কৌতূহল হ'ল!

আবার ঠিক্‌ পোনরটা দিন পরে তেম্‌নি ক'রে একটা সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ গাড়ীর হাতল ধরে দাঁড়ালুম। সে আর এক দৃশ্য! এও একটী মেয়ে, জীবনের প্রথম প্রভাতের দম্‌কা হাওয়ায় পৃথিবীর কঠিন বুকের উপর নিক্ষিপ্ত একটী তরুণী—ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাতে আজ রিক্ত। গাড়ীটার ভিতর যেন পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ, ব্যথা এসে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। সে মেয়েটী—একটী জড় পিণ্ডের মতো ঐ গদী-আঁটা বেঞ্চটাতে পড়ে আছে—পাশে তিন চারটী স্ত্রী ও পুরুষ। . . . পৃথিবীর কোন্‌ স্নিগ্ধ নিশীথের আনন্দ কোলাহলের মাঝে সে যে প্রাপ্তিকে বুকে চেপে রেখেছিল—নিষ্ঠুর বিধাতার বজ্র দণ্ডে আজ তা' বুঝি তার দৃষ্টির আড়ালে কোন্‌ অজানা সমুদ্রের দূর তীরে হারিয়ে গেছে! বাইরে মত্ত প্রকৃতির দম্‌কা আস্ফালন তেমনি চল্‌ছিল। . . . গাড়ীটা ছাড়্‌বে—হুইস্‌ল্‌ দিয়েছে, আমি নেমে যাবার সময় আর একবার এই অঙ্কহীন নাট্যের শোকাকুল দৃশ্যের পানে চাইলুম—তার সেই রাশি রাশি কালোচুলের মাঝখানে—সেই পোনরটী দিন আগের দেখা সেই মেয়েটির বক্ষ-ভীত, শোকার্ত্ত মুখখানি।

* * *

প্রাপ্তির মাঝে সেই বুক-ভরা আনন্দ—আর আজ এই তার কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

সংগ্রহ

রুচি লইয়া সমালোচকদের উন্মত্ত উৎসাহ, তাহাদের আক্রোশ, উত্তেজনা, উত্তাপ হাস্যকর। কাব্য সম্বন্ধে তাহারা এমন ভাবে লেখে, কেবল ধর্ম্ম-নীতি সম্বন্ধেই যাহা শোভা পায়! সাহিত্য মনোরাজ্যের জিনিষ, তাহার সহিত মনোরাজ্যের আচার অনুসারেই চলা উচিত, রোষের উদ্দীপনা, পিত্তের দাহ সেখানে অসঙ্গত।

* * *

অধিক ঝোঁক দিয়া বলিবার চেষ্টাতেই নবীন লেখকদের লেখা নষ্ট হয়, যেমন অধিক চড়া গাহিতে গেলে গলা খারাপ হইয়া যায়। বেগ, কণ্ঠ, ক্ষমতা এবং বুদ্ধির মিত প্রয়োগ করিতে শেখাই রচনাবিদ্যা—এবং উৎকর্ষ লাভের সেই একমাত্র রাস্তা।

* * *

লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য্য। লেখায় বিশুদ্ধ নিয়ম রক্ষা হইয়াছে কিনা তাহারই খবরদারী করা তাহার ব্যবসাগত কাজ বটে কিন্তু সেইটেই সব চেয়ে কম দরকারী।

* * *

প্রাচুর্য্যের ক্ষমতাটা লেখকের থাকা চাই, অথচ তাহা ব্যবহার করিয়া যেন সে অপরাধী না হয়। কারণ, কাগজ ধৈর্য্যশীল, পাঠক ধৈর্য্যশীল নহে; পাঠকের ক্ষুধা অপেক্ষা পাঠকের মুখ মরিয়া যাওয়াকেই বেশি ভয় করা উচিত।

* * *

সুকথিত রচনার লক্ষণ এই যে, ঠিক যেটুকু আবশ্যক তার চেয়ে সে অধিক বলে না অথচ যেটি বলিবার নিতান্ত প্রয়োজন সেইটিই বলে; * * * এক কথায় ইহার শব্দ সংক্ষিপ্ত, অর্থ অসীম।

* * *

—সাহিত্য প্রসঙ্গ।

(রচনা সম্বন্ধে জুবেয়ারের বচন।)

বঙ্গদর্শন; ১৩০৮।

বসন্ত

—দীপঙ্কর

এই যে আমায় জাগিয়ে দিল, ফাগুন প্রাতের আগুন-ভরা আলো
বিশ্ব উজল করা !
এই যে আমার সকল মন্দ ভালো
উঠ্‌ল র'ঙে এক নিমেষে—যেম্‌নি দেখি রঙে রঙিন ধরা
ফেল্‌ল খুলে কুজ্ঝটিকার তাপস বাকল খানি
বাসন্তী রঙ বসনটি তার টানি !
এই যে আমার নিদ্রা-অলস প্রাণ
নৃত্য রসে উঠ্‌ল মেতে ; গানের পরে গান
চিদ্‌গগনে আপনি ওঠে জেগে—
সুরের পরে সুর
স্বর্গ মর্ত্ত্য কর্‌ল যে গো সুন্দর বিধুর !
কার সে পরশ লেগে
প্রাণের জোয়ার এম্‌নি ক'রে ভিতর বাহির কর্‌ল গো ভরপুর ?
কার সে আদর এই ধরণীর ঐ আকাশের
সবুজ সুনীল স্নেহের ধারা বেয়ে
লুকিয়ে এসে আদর ক'রে যায় ?
কার সে পিয়াস পিক্‌পাপিয়ার দিক্‌ভোলান করুণ কণ্ঠ ছেয়ে
আমায় পানে চায় ?

এই যে তোমার জাগিয়ে তোলা, নাচিয়ে তোলা, মাতিয়ে তোলা মায়া
শরীর ধরে দাঁড়াক ক্ষণেক তরে
অমূর্ত্ত এই আদর তোমার, সকল রসের কায়া
মূর্ত্তি নিয়ে আমার পাশে দাঁড়াক লীলার ভরে।

আর চাহিনে কিছু,

অমনি শুধু চুপ্‌টি ক'রে মুখটি কর না,

চাও গো আমার পানে ;

সেই যে তোমার একটি চাওয়া—

সব ভুলান সব জুড়ান তৃপ্তি যেন আনে

সব যেন হয় পাওয়া।

সকল দাহন সব বেদনা লুপ্ত হ'য়ে যাক্

শুধু থাক্

একটু আদর একটি দৃষ্টি

নূতন জীবন করুক সৃষ্টি

তোমার নীরবতা

টুটুক মৃত্যু-বাঁধন—জাগুক প্রাণের চঞ্চলতা।

সবার চেয়ে কাছে আসা

সবার চেয়ে দূর।

বড় কঠিন সাধনা, যার

বড় সহজ সুর।

"গীতিমাল্য

সমাচার

শ্রীযুক্ত কাজী আবদুল ওদুদ্ প্রণীত—'নদী বক্ষে' এক খানি উপন্যাস। মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ৩ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

"নদীবক্ষে" বাংলার সরলপ্রাণ দরিদ্র চাষীজীবনের একখানি সুন্দর প্রতিচ্ছবি। সহরের বহুদূরে একটী দরিদ্র চাষার ছেলে আর একটী দরিদ্র চাষার মেয়ে পল্লী সংসারের মধ্যে দুই জনে দুই জনকে শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত সহস্র ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। আর ইহাদের দুই জনের ভালবাসার কাহিনীর মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটিয়া আছে—বাংলার পল্লী জীবনের খণ্ড খণ্ড রূপ। বৈশাখে আমের বনে আম কুড়ানোর ধুম—শ্রাবণের ধারা জলে পরিপূর্ণ পুষ্করিণীর নিটোল শোভা—আশ্বিনে ক্ষেত থেকে নূতন আমন ধানের মিষ্ট গন্ধ—বড় স্নিগ্ধ স্মৃতির সুখ মনে আনিয়া দেয়। পুস্তকের ভাষা সর্ব্বত্রই সুন্দর, ভাবে সরল এবং অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসরহিত।

নূতন বিধি অনুসারে, পূর্ব্বের মত কলিকাতা করপোরেশনে, কমিশনার, ভাইস্ চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান প্রভৃতি থাকিবে না, ইহা স্থির ছিল। সকলেই অবগত আছেন, গত ১লা এপ্রিল হইতে কলিকাতা করপোরেশন এক রকম কংগ্রেসেরই হাতে আসিয়াছে। কারণ প্রায় অধিকাংশ সভ্যই কংগ্রেসের সভ্য। নূতন আইন অনুসারে এই সকল নব-নিযুক্ত সভ্যগণ হইতে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর, মওলানা আক্রম খাঁ ও শ্রীযুক্ত সাহিদ সারওয়ার্দী এই পাঁচজন কলিকাতা করপোরেশনের অল্ডারম্যান্ নির্ব্বাচিত হইবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাউন্সিলের সভায় গত ৬ই এপ্রিল উপরোক্ত কয়জনেরই নাম স্থির হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দেশবন্ধু দাশ পরে মেয়র ও শ্রীযুক্ত সাহিদ সারওয়ার্দী ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইবেন। চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদ প্রার্থীদিগের

মধ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকেই গ্রহণ করা হইবে। আশা করা যায় এইরূপ ব্যবস্থায় দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত করপোরেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার মত সাধারণের আর কিছু থাকিবে না।

লাহোরে প্লেগের প্রকোপ খুব বাড়িয়াছে। পাঞ্জাবের বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট স্থির করিয়াছেন যে ইনটারমিডিয়েট ও বি, এ পরীক্ষা এই কারণে আপাততঃ বন্ধ থাকিবে।

আমাদের বন্ধু ও বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের সাহায্য কল্পে গত বুধবার ৯ই এপ্রিল, আল্‌ফ্রেড রঙ্গমঞ্চে প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের চেষ্টায় বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণ আবৃত্তি, সঙ্গীত ও বসন্তলীলা অভিনয় করিয়া কলিকাতাবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমরা কবি ও তাঁহার সাহায্যকারী সকলকে প্রীতি সম্ভাষণ জানাইতেছি।

গত ৪ঠা এপ্রিল কানপুর কটনমিলে মজুরেরা বেতন সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হইয়া ঢিল ছুঁড়িতে থাকে। ফলে পুলিশ আসিয়া জনতা সরাইতে চেষ্টা করে। পরে পুলিশ গুলি ছুড়িতে থাকে। ফলে চার জনের মৃত্যু হয় এবং ৩৪ জন আহত হইয়া হাঁসপাতালে আছে।

তারকেশ্বরে যাত্রীদের হাঙ্গামা ব্যাপারে ৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত সুভাস চন্দ্র বসু ইত্যাদি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রবাদ মহাত্মা গান্ধী Young India পত্রিকার সম্পাদনের ভার শীঘ্রই লইবেন।

বিষয় সূচী।

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষগণ পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিবার যে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন, তাহা একান্ত শ্রমসাধ্য এবং বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। সাধারণতঃই রবীন্দ্রনাথ বাংলার সকল শিক্ষিত নরনারীর প্রিয় এবং তাঁহার কবিতা অনেকেরই বিশেষ আদরের সামগ্রী। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁর সব বই সাধারণের পক্ষে খুব সুলভ নহে। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্য-গ্রন্থের একত্র সমাবেশে একটী "শোভন সংস্করণ" আছে বটে, কিন্তু বিশেষ ব্যয়-সাপেক্ষ বলিয়া জন-সাধারণের তাহাতে কোনও অধিকার নাই। আমাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গদ্য, পদ্য এবং নাটকের "শোভন সংস্করণ" অপেক্ষা একটী "সুলভ সংস্করণে"র অভাব দেশের লোক বেশী বোধ করিতেছে এবং তাহাতে রবীন্দ্রনাথের দেশের লোকের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লাভ করা ছাড়া "সুলভ" (Cheap) হইয়া পড়িবার আশঙ্কা নাই।

পরিচয়লিপি

জীবনের সন্ধিক্ষণ আসে এবং সেই শুভ-মুহূর্ত্তটিকে বুঝিয়া লইয়া মানুষ যদি পথ-নির্দ্দেশ করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বহুপ্রকারের বিরোধ ও অশান্তিকে তুচ্ছ করিয়া যাওয়া মানুষের পক্ষে কিছুই দুঃসাধ্য নহে।

এই সন্ধিক্ষণ বসন্তের আগমনের মতই নিঃশব্দে আসে। সে যে আসে তাহার কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। যে সেই শুভক্ষণটিকে অনুভব করিতে পারে না সে একদিন হঠাৎ দেখে জীবনের শুভ-সন্ধিক্ষণ চলিয়া গিয়াছে! সে যে আসিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা শীতের শীর্ণ বৃক্ষ-বল্কলে, শুকপত্রের অশান্ত মর্ম্মর-ধ্বনিতে, উত্তরের বাতাস বলিয়া ফেরে,—'গেল চলে জানাল তাই'।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, তাঁহার রচিত 'সন্ধিক্ষণ' গল্পটি মানুষের জীবনের একটি শুভক্ষণের ছবি আঁকিয়া দিয়াছে।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীর রচনা কল্লোলে এইবার প্রথম প্রকাশিত হইল। তাঁহার 'ভোলা' গল্পের কয়টি কথার যে সার্থকতা তাহা মানুষকে অন্ধকার-খিন্ন জীবনের ভিতর এমনি করিয়াই সাহসের পথ দেখাইয়া দেয়। লেখক লিখিয়াছেন :—'অন্ধকার বরাবর তাকে বাধা দিতে দিতে চলেছে, আর ঝিল্লীরা যেন তাকে এই লক্ষহীন যাত্রার জন্য কর্কশ কণ্ঠে তিরস্কার করছে। কিন্তু ভোলার মন আজ আর বাধা মান্‌লনা। . . . তার মনে হচ্ছিল, যেন কত জন্ম ধরে এমনি পথে কোন্ ইঙ্গিতের সন্ধানে যাত্রা করেছে, আর সে যাত্রার এখনও শেষ হয় নি।'

শ্রীহরিগত্য বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—'হারানিধি'। এই গল্পটিতে ও একটি সন্ধিক্ষণেরই ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীন ভিখারীর বেশে জীবনের শুভক্ষণ দ্বারে আসিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছিল, একজন তাহাকে ফিরাইয়া দিল। চারু আবার

যখন তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনিল. তখন সকলে দেখিল, তাহাদের হারা-নিধি ছোট ভাই সুবোধ এই শুভক্ষণকে সমুজ্জ্বল করিতে ফিরিয়া আসিয়াছে!

শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত অল্পকাল হইতে গল্প লিখিতেছেন। তাঁহার 'ভুলের শাস্তি' রচনাটিতেও একটি সন্ধিক্ষণের চিহ্ন আঁকিয়া গিয়াছে। 'রোজ-চেনা জিনিষ গুলিতে ত এত ঐশ্বর্য্য কে,নও দিন দেখি নি!' এই বিস্ময়, এই চিত্তের বিকাশ তাহার রোগমলিন মুখে মৃত্যুঞ্জয়ের শান্ত আশার বাণী ফুটাইল—'সে সেই মানুষ —যার বিরুদ্ধে কিছু ভাব্‌তে গেলে ভারী কষ্ট হয়। . . . পৃথিবী যে এত সুন্দর আগে ত তা জান্‌তাম না!'

শ্রীনীলিমা বসুর 'বরুণা' শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের 'দিদি' গল্পটি—এই সন্ধিক্ষণেরই আগমন বাণী শুনাইয়াছে।



কাল অনেক দিন পরে সূর্য্যাস্তের পর ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়াছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখ্‌লুম, আকাশের আদি অন্ত নেই—জনহীন মাঠ দিগ্‌ দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হাহা করচে! . . . কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তাহারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা! মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্ব্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ যুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে, মৌনমুখে, শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আস্‌ছে! তার বর যদি কোনও নেই—তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ? . . .

'ছিন্নপত্র'।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রত্যয়

—শ্রীসুবোধ রায় ।

আস্‌বে সেদিন আস্‌বে ।
যেদিন, আমার বুকের রক্ত-তিলক
তোমার ভালে হাস্‌বে ।
আমার বুকের দহন-জ্বালা
করবে তোমার হৃদয় আলা,
আমার অশ্রু-সরে তোমার
চিত্ত-কমল ভাস্‌বে ।
আস্‌বে সেদিন আস্‌বে ।

যে আশা মোর ফোটার আগে পড়্‌ল ঝ'রে আচম্বিতে,
যে ভাষা মোর হাস্‌তে গিয়ে ঝরল অশেষ অশ্রু-গীতে,
সেই ঝরা-দল, সেই ঝরা-জল,
তোমার পূজার অর্ঘ্য বিমল ;
মরণ-হাসি হেসে তারা
সকল আঁধার নাশ্‌বে ।
আস্‌বে সেদিন আস্‌বে ।

চাইনি তোমার আদর সোহাগ, চাইনি তোমার প্রেমের মণি,
দাঁড়িয়ে তোমার দ্বারের পাশে শুনি তোমার বীণার ধ্বনি ।
সেই না-চাওয়ার সাধন-টীকা
আমার ভালে জ্বালবে শিখা,
তার জ্যোতিতে চিন্‌বে আমায়
যেচে ভালবাস্‌বে ।
আস্‌বে সেদিন আস্‌বে ।

পরাজয়ের ব্যথা হেনে তোমায় আমি ল'ব জিনে,
বিনা মূল্যে বিকিয়ে গিয়ে তোমায় আমি ল'ব কিনে,
তোমার মধুর পরশেতে
নীরব হৃদয় উঠ্‌বে মেতে
হাজার সুরে উঠ্‌বে বেজে
হাজার গীতি ভাস্‌বে।
আস্‌বে সে দিন আস্‌বে।

* *

যাহারা শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহাদের সেই পাওয়াটুকুতে যে পরিমাণ দাবী আছে, দেশের লোকের তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা লইবার দাবীর পরিমাণ তাহার চেয়ে এক তিলও কম নহে।

'মেয়েদের কথা'

সন্ধিক্ষণ

—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

১

"যাও, তোমার মুখে আর কি কোনও কথা নেই?" কনক অভিমান-ভরে কথাটা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। তখন অস্তাগামী তপনদেবের কনক-দ্যুতি আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহারই রাঙ্গা ছবি বাগানের দীর্ঘ ঝিলের জলে ঝিকিমিকি খেলিতেছিল।

রাধাদিদি হাসিয়া বলিলেন,—"ভাল কথাই ত বলেছি। বাপ চিরদিনের নয়।"

কনকের মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হইল। ক্ষণেক পরে সে বলিল,—"তুমি কি মনে কর, আমরা দাসী বাঁদী? চিড়িয়াখানায় যার খাঁচায় ধরে দেবে তারই কেনা হ'য়ে থাকবার সামিল?"

"তবে কি চাস্? বাপ যাকে ঠিক করেছে, সে পাত্র মনে ধরে না? কেন, সে ত খাসা ছেলে!"

"তোমার খাসা তোমারই থাক্। আমি ত অনেকবার বলেছি, আমি ছোব্ড়া চাই নি। শাঁস না পাই, কিছুই চাইনা।"

রাধাদিদিও এবার গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"তোদের হাল্ ফেসানের কালেজে-পড়া মেয়েদের ভাব বোঝা ভার। ছেলে এত লেখাপড়া শিখেছে তবু তাতেও মন ওঠে না।"

"না। আর যার ওঠে উঠুক আমার ওঠে না।"

"ওঃ বুঝেছি, তুই বুঝি নাটক নভেলের নায়ক চাস্?—প্রেম করবে, তরোয়াল খেল্‌বে—"

"ঐ জন্তেই ত কোনও কথা—মাগো!" বলিয়া কনক চমকিয়া উঠিয়া রাধাদিদিকে জড়াইয়া ধরিল।

তখন গোধূলির আলো-আঁধার! একটি মনুষ্যমূর্ত্তি লতাবিতানের অপর পার্শ্ব হইতে অগ্রসর হইয়া তাহাদের সম্মুখে ছায়া করিয়া দাঁড়াইল।

কনক মুহূর্ত্তে সপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া পরুষকণ্ঠে বলিল,—"তুমি কেমন লোক? ভর-সন্ধ্যাবেলায় পরের বাগানে চোরের মত লুকিয়ে থেকে অপরের কথা শুনছেন?"

লোকটি অম্লানবদনে জবাব দিল,—"তা শুনছি বটে, সেজন্য আমি খুবই লজ্জিত। কিন্তু আমার অপরাধ নেই আমি পিছনের ঝোপে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।"

কনক কঠোরস্বরে বলিল, "তুমি জান পরের জমীতে অনধিকার প্রবেশ করেছ?"

লোকটি বলিল, "জানি।"

"তাহ'লে এখনই বেরিয়ে যাও।"

লোকটি, 'হাঁ, এই যাচ্ছি।" বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। যতক্ষণ অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের অস্পষ্ট আলোকে তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ কনকের স্থির দৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত রহিল।

পরে সে বলিল,—"পাড়ার এই ছোটলোকগুলোর আস্পর্দ্ধা দেখেছ? এই লোকটাকে আমি অনেকবার তোমাদের বাগানে মাটী কোদ্‌লাতে দেখেছি—কি? হাস্‌ছ যে? হাস্‌বার কথা কিছু বলিনি ত!"

রাধাদিদি বলিলেন,—"বল নি?"

"না। কেন হাস্‌ছ?"

"হাসবো না? যার বাগান তাকে সটান বাগান ছেড়ে যেতে হুকুম দিলি, হাস্‌ব না?"

কনক চমকিত হইয়া সাশ্চর্য্যে বলিল, "না? এ ত মৃণালবাবুর বাগান। তুমিই ত বলেছ তিনি এখানে থাকেন না।"

রাধাদিদি হাসিয়া বলিলেন,—"থাকেও বটে, নাও থাকে বটে। ও একটা পাগলা ছেলে কখন আসে, কখন যায়, তার কিছু ঠিক নেই। বলে, আমি পাড়া-গেঁয়ে আভতদারের ছেলে, বাগান কোদ্‌লাব না? তাই বাগানের মালিক হ'য়েও মালীর কাজ করে।"

কনক অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"এ বড় অন্যায়। তিনি যাই হ'ন, এমন ক'রে লুকিয়ে আমাদের কথা শোন্‌বার তাঁর কি অধিকার আছে? ছিঃ ছিঃ তাঁর বাগান, তা তুমি গোড়ায় বল নি কেন?"

"দরকার হয়নি বলে। আজ তুমি এমন অবস্থায় এনে ফেল্‌লে, যাতে বল্‌তে হ'ল। এই যে বাগান বাড়ী আর পাশে ঐ যে জমি দেখ্‌ছ সবই ওর। ওর বাপের আমল থেকে এই বাগানবাড়ী আমায় থাক্‌তে দিয়েছে। দেশেই থাকে, কচিৎ কখনও এই বাগানবাড়ীতে আসে।"

"তা অমন চাষার মত বেশভূষো কেন? চাষার মত চালচলনই বা কেন?"

"ও যে স্বদেশী। খদ্দর পরে, আর আপনার হাতে চরকা কাটে। মালীদের সঙ্গে সমানে খাটে, আর ঐ কাঠের কারখানাও দেখে।"

"তোমরা ওদের কে?"

"আমি ওর মায়ের পাতান গোলাপ, তাই আমায় মায়ের মত দেখে, মাসী বলে ডাকে। বাপ থাক্‌তে ও আমাকে ছেলেপুলে নিয়ে এই খানে বাস করতে দিয়েছে; উঠ্‌তে গেলে বলে, বিষয় বেচে কিনে বিলেত চলে যাবে, আর দেশে ফিরবে না।"

"থাক্‌গে। মণিমালাকে আমাদের কালেজের পিক্‌নিকে যেতে দেবে?"

"তা নিয়ে যাও না একদিন। কিন্তু আমি বল্‌ছিলুম কি, মনটা স্থির ক'রে ফেল্। প্রবোধ কাল পরশু আস্‌ছে।"

কনক আবার হঠাৎ গম্ভীর হইল, বলিল, "দিদি, একটা কথা বল্‌বে? বাবা কি তোমায় কিছু বলেছেন?"

রাধাদিদি বলিলেন, "হাঁ। তাঁর শরীরটা ক্রমশঃ খারাপ হ'য়ে পড়ছে, বিষয় আশয় নিয়েও গোলযোগ চলছে। তাই তিনি চান, যত শিগ্‌গীর কাজটা হ'য়ে যায়?"

কনক গম্ভীরভাবে জবাব দিল,—"আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, মন কারও বাঁধা ধরা নয়। অবশ্য বাবা আদেশ করলে সবই শুন্‌তে হবে, কিন্তু তাতে দেহ বিক্রী হবে, মন সুখী হবে না। প্রবোধদাদারা কখনও কি এ বিয়ের সম্বন্ধে কিছু বলেছে?"

"আঃ সে যে কুঁড়ে, সে যে বাবু! অত কথা মুখ থেকে খসাতে পারে না। ও সব কথা ছেড়েদে, একবার চার হাত এক হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের কি হয়েছিল? আমারাও ত পর্দ্দানশীন নই!"

"দেখ দিদি, এক একবার ভাবি, এমনভাবে সম্পত্তির মত দেহ কেনা-বেচার হাত এড়িয়ে নিজে রোজগার ক'রে খাওয়াই আমাদের উচিত। বিবাহ না ক'রে কি জীবন কাটে না? কেন, আমি যদি চাকরী করি? এতদিন হয় ত একটা মাষ্টারী করতুম, কেবল বাবার ভয়ে পারিনি!"

"ছিঃ ছিঃ ওসব পাগলামি ছেড়ে দে। কেন তোমার কিসের অভাব?"

কনক হাসিয়া বলিল, "দিদি, সব ত জান!"

রাধাদিদি কনকপ্রভাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ছি ছি,

ওসব দুশ্চিন্তা মনে করে না। যাই হোক, আমি ত আছি। "রাত হল, চল তোমায় বাড়ী রেখে আসি।"

২

টালিগঞ্জের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিষ্টার লালগোপাল চৌধুরীকে জানে না, এতদ্ অঞ্চলে এমন লোক কেহ ছিল না। তিনি জীবনে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। লোকে বলে, সব অর্থই তাঁহার ব্যারিষ্টারীর ফল নহে, কতকটা ঘোড়দৌড়খেলার। টালিগঞ্জে তাঁহার প্রকাণ্ড বাগান ও বাড়ী, দাস দাসী, মোটর লেণ্ডো,—খুব বোল বোলাও। জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে সংসারে বিষম শোক পাইতে হইয়াছিল, তাঁহার একমাত্র কন্যা কনকপ্রভাকে রাখিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহ জগৎ হইতে চির বিদায় লইয়াছিলেন। কনক তাঁহার সেই শোকে এক মাত্র সান্ত্বনা ছিল। কোনও রূপে তাহাকে লেখাপড়া ও গানবাজনা ইত্যাদি শিখাইয়া উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাওয়াই তখন তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল। পাত্রও তিনি বহুপূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন—সে ও ব্যারিষ্টার, তাঁহার পরমবন্ধু নবীনচন্দ্র খাসনবিশের পুত্র প্রবোধচন্দ্র।

প্রথমোক্ত ঘটনার দিন চার পরে কনক পাড়ায় এক সতীর্থের গৃহ হইতে ঘরে ফিরিতেছে, এমন সময়ে পথে হঠাৎ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নাবিল। কনক ছুটিয়া গিয়া রাধাদিদিদের বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল—তাহাদের বাড়ী প্রায় এই বাড়ীর পাশাপাশি। দ্বারপথে বৃষ্টি হইতে কথঞ্চিৎ দেহ রক্ষা করিয়া সে একবার ভাবিল ঘরে ফিরিয়া যাইবে, আবার ভাবিল, না রাধাদিদির সহিত দেখা করিয়া বৃষ্টি ধরিলে বাড়ী ফিরিবে।

জলটা খুব মুষলধারায় নাবিল, কাজেই কনকের আর ঘরে ফিরিয়া যাওয়া হইল না। সে দ্বারপথে দাঁড়াইয়া দেখিল, পার্শ্বের ঘরে একটা লোক পিছন ফিরিয়া একখানা অস্ত্র শান দিতেছে। তাহার অনাবৃত বলিষ্ঠ দেহের মাংসপেশী সমূহ উহাতে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ বায়ুতাড়িত কপাট খানা ধরিতে গিয়া কনকের হাতের চুড়ি বাজিয়া উঠিল। লোকটা চমকিত হইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্র দেহ ঋজু হইয়া উঠিল, সে বিস্ময় পরিপূরিতনেত্রে ক্ষণকাল কনকের দিকে চাহিয়া রহিল, তৎপরে অপ্রতিভ হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্র কণ্ঠে

অবনতদৃষ্টিতে বলিল, "একি আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন, চলুন ভিতরে চলুন না, মাসী—"

"থাক্ জল এখনই থম্‌বে।"

"তা হোক। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে মাসীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সময় কাটাতে পারবেন।"

"না, দরকার নেই, বাবার আস্‌বার সময় হয়েছে, আমি না থাক্‌লে অসুবিধে হবে।"

লোকটা আর কোন কথা না বলিয়া পার্শ্বের ঘর হইতে একখানা চৌকি আনিয়া দিল। কনক নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসিলে পর সে আপনার কাজে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কি জানি কেন, কনকের মনটা এই লোকটার সঙ্গে দুটো কথা-কাটাকাটি করিতে ব্যস্ত হইল। সে বলিল, "সেদিন আমি আপনাকে যা তা বলেছি, আপনি সেজন্য নিশ্চয়ই আমাকে অভদ্র মনে করেছেন। কিন্তু আমি জান্‌তুম না আপনি কে। আমায় ক্ষমা করবেন।"

মৃণালকান্তি এতক্ষণ অবনত মস্তকে কনকের কথা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইলে কনকের মুখের দিকে ধীরে ধীরে দৃষ্টি উন্নত করিয়া বলিল, "আপনি অন্যায় কিছুই বলেন নি, কাজেই ক্ষমা করবার কিছুই নেই।"

"নিশ্চয়ই অন্যায়। এই বাগান কি আপনার নয়?"

"না। এ বাগান মাসীমার, আমি তাঁর বাগানে কাজ করি।"

"দেখুন, আপনি ভাব্‌ছেন, এমনই ক'রে সত্য গোপন কর্‌লে বুঝি খুব মহত্ত্ব দেখান হয়; কিন্তু—"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "মহত্ত্ব? যাক্ সে কথা। বলুন আপনি আমার ব্যবহারে বিরক্ত হন নি।"

"না বল্‌তে পার্‌ব না, বল্‌লে মিথ্যে বলা হয়। আপনার নিজের বাগান অথচ আপনি এমনভাবে এখানে থাকেন যে কেউ জান্‌তে পারে না। এতে কি লোককে ভুল করবার অবসর দেওয়া হয় না? আপনি ভাব্‌ছেন, এতে আপনি খুব একটা বাহাদুরী করছেন—কিন্তু লোকে আপনার সুখ্যাতি করবে না।"

মৃণাল ক্ষণেক নীরব রহিল। তাহার পর কোন জবাব না দিয়া আপনার কাজে ফিরিয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত্তপরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দেখুন, আগাগোড়াই আমার অন্যায় হয়েছে। আমারই আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

কনক বস্তুতঃই তাহার কার্য্যে তাহাকে পাগল মনে করিল, তাহার কথার কোন বাঁধন নাই, কাজেরও কোন বাঁধন নাই, যাহা বলে যাহা করে, সবই আল্‌গা। তাহার হাসি পাইল। সে বলিল, "শুনেছি আপনারা সম্ভ্রান্ত লোক। তবে এমন ক'রে কুলি-মজুরের মত থাকেন কেন?"

মৃণালের মুখ গম্ভীর হইল। সে বলিল, "কুলি-মজুরের কাজ কি নিন্দার? সংস্থান থাক্‌লেই যে নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাক্‌তে হবে, এমন কোন কথা নেই। যাক্‌, সেদিন আমি অনিচ্ছাসত্বেও আপনাদের গোপন কথা শুনেছিলুম, এজন্য আমায় ক্ষমা করুন।"

কনক বলিল, "অনিচ্ছা কিরূপে জান্‌ব?"

মৃণাল উত্তরোত্তর গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখুন, তাহ'লে কথাটা সবই খুলে বলি। কাজে আমি আনন্দ পাই। সেদিনও কাজ কর্‌তে কর্‌তে তন্দ্রা এসেছিল, তাই প্রথমে আপনাদের কথা শুনতে পাই নি। কিন্তু যখন শুনলুম, তখন আপনাদের কথায় বাধা দিতে চাইনি। এতে অবশ্য আমার দোষ হয়েছে নিশ্চয়ই।"

"তা, মাটি কোদ্‌লান, অস্ত্র সানান বা চরকা কাটা ছাড়া কি পুরুষ মানুষের আর কিছু কাজ নেই?"

"আপাততঃ ত দেখ্‌তে পাইনি, অন্ততঃ আমার মত লোকের ত নেই।"

এই সময়ে একটা লোক ছাতা মাথায় দিয়া ব্যস্তভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "এই যে দিদিমণি এখানে। বাবু বাড়ী ফিরেছেন, তাঁর ভারী অসুখ হয়েছে, শিগ্‌গীর আসুন।"

কনকের মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তাহার সেই ব্যথিত কাতর দৃষ্টির দিকে চাহিয়া মৃণাল কনকের সম্মুখীন হইয়া করুণার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

কনক সেই সময়ে দৃষ্টি উন্নত করিতেই মৃণালের আয়ত নয়নে যে দৃষ্টি দেখিয়াছিল, তাহা জীবনে ভুলে নাই। সে তাহার দৃষ্টি অবনত করিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

মৃণাল কনকের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল ততক্ষণ সে সেইদিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনার কাজে যাইতে উদ্যত হইল। ঘরের দিকে মুখ ফিরাইবামাত্র দেখিল, সেখানে তাহার রাধামাসী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মাসী বলিল, "চলে গেল? একটু দাঁড়াল না? ভাল মেয়ে যাহোক! আমি এই খবর পেয়ে ছুটে আসছি ভিতরে নিয়ে যেতে।"

মৃণাল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দুঃখিত স্বরে বলিল,—"লালগোপাল বাবুর খুব অসুখ—"

"এঁ্যা? সে কি? আজ সকালেও ত ভাল ছিলেন, খেয়ে কোর্টে গেলেন——"

মৃণাল একখানা হাত-করাত লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে মৃদু হাসিয়া বলিল,—"রোগ শোক ত কাউকে খবর দিয়ে আসে না।" তাহার হাসিতে যে গভীর বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা জানিতে মাসীর বাকি ছিল না। তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া তাহার মাথার উপর একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন, "মৃণাল, একটা কথা সত্যি করে বলবি?"

মৃণালকান্তি বেদনা-কাতর নয়ন দুইটি তুলিয়া বলিল, "কি জিজ্ঞাসা করবে মাসী? যা মনে করছ, তা হয় না।" সঙ্গে সঙ্গে একটি দীর্ঘশ্বাস তাহার অন্তঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাধারাণী বলিলেন,—"কেন হয়না? তুমি কিসে ছোট?"

"তুমি আমায় বড় মনে করতে পার, কিন্তু আমি কাঠের আড়তদারের পুত্র বই কিছু নই। ওদের চোখে আমি পাড়াগাঁয়ের চাষাভূষোরই সামিল।"

"ওরা যা হয় ভাবতে পারে, কিন্তু তা বলে তুমি যা আছ তাও কেউ বদলাতে পারে না।"

"তুমি কি ভুলে যাচ্ছ, লালগোপাল চৌধুরী মস্ত ব্যারিষ্টার, জমিদার?"

"না ভুলি নি; কিন্তু তুমিও জাননা, আজ লালগোপাল চোখ বুঁজলে তার মেয়ে পথের ভিখিরী, আত্মীয় কুটুম্বের দয়ার পাত্রী?"

"না, না, তুমি ভুল শুনেছ। এত লোকজন, এত জমজমা—"

"ঐ পর্যন্ত। দেনায় সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গিয়েছে—"

"থাক্, এসব কথা শোনবার আমার অধিকার নেই। হাজার অবস্থা খারাপ হ'লেও ওরা আমার চেয়ে ঢের উঁচু। ওরা পথের ধুলোর মত আমাদের মনে করে। কাঠের আড়তদার—তার উপর কালেজের ছায়া মাড়াইনি—যাক, তুমি একবার ওদের বাড়ী যেতে পার? একলা, কেউ দেখবার নেই।"

"এই জন্যেই ত বলছি, এই মেয়েটার একটা বিয়ে ক'রে দিই। মুখে যতই

তেজী হোক্ ওটা পরের উপর ঝোঁক দিয়ে না থাকলে সংসারে দাঁড়াতে পারবে না। তোমারও ঘরকন্নার একজন চাই ত। তা,—"

বাধা দিয়া মৃণাল বিরক্তির সহিত বলিল, "খুব ঘটকালী হয়েছে থামো। যাওদিকি চট্ ক'রে।"

রাধামাসী চলিয়া গেলে মৃণালকান্তি বাহিরে পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, হাতের করাতখানা আপনিই খসিয়া পার্শ্বস্থ টেবিলের উপর পড়িয়া গেল। তখনও টিপ টিপ করিয়া আকাশের জল ঝরিতে ছিল। মৃণাল বারিপাতের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া ভাবিতেছিল, মাসী কি বলিয়া গেল? তাহার কথায় হৃদয়ের ভাবসমুদ্রে এ ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ হয় কেন? সে দূর হইতে বহুবার সেই দেবী-প্রতিমাকে দেখিয়াছে। ভক্ত যেমন ফুলে ফলে ইষ্টদেবতাকে পূজা করিয়া তৃপ্তি লাভ করে, দেবতা পূজা গ্রহণ করিলেন কি না জানিবার আকাঙ্ক্ষা রাখে না, সেও তেমনই হৃদয়ের নিভৃত সিংহাসনে বসাইয়া তাহাকে পূজা করিয়াছে। তবে মাসী একি প্রলাপ বকিতেছে? কিন্তু সে যে সহায়হীনা! তাহাকে সংসারের ঝঞ্ঝা হইতে কে সযত্নে রক্ষা করিবে?

তাহার এ সব চিন্তা কেন? আজ যদি তাহার মনের ভাব ব্যক্ত হয়, তাহা হইলে এই পল্লীর সম্ভ্রান্ত সমাজ তাহার বাতুলতায় হাস্য করিবে, তাহাকে দেখিয়া তাহারই আরাধ্য দেবী ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে। সে আড়তদারের ছেলে আড়তদারীই তাহার অবলম্বন।

৩

শোকের প্রথম বেগটা বড় ভয়ানক। শৈশব হইতেই কনক পরম আদরে পরম বিলাসিতার মাঝে প্রতিপালিত; অভাব কাহাকে বলে জানিত না। সুতরাং পিতৃহারা হইয়াই সে তিন চারিদিন একরূপ সংজ্ঞাহারা হইয়াছিল। পিতার অভাবের দারুণ আঘাত সে একবারেই সহ্য করিতে পারে নাই। এ কয়দিন রাধাদিদি অহোরাত্র কাছে না থাকিলে সে হয়ত আহার নিদ্রা পালনেও অমনোযোগিতা প্রকাশ করিত।

লালগোপালবাবুর দেহান্তের প্রায় সপ্তাহ পরে কনক শুনিল তাহাকে এই পৈত্রিক আবাসভবন ত্যাগ করিয়া দরজীপাড়ায় তাহার এক দূরসম্পর্কীয়া পিতৃস্বসার গৃহে আশ্রয় লইতে হইবে। কেন? ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া

সে সবিশেষ কিছু জানিতে পারে নাই। তবে এইটুকু শুনিয়াছিল যে, তাহার পিতা ঘোড়দৌড়ে এত হারিয়াছেন যে সেই দেনার দায়ে তাঁহার সর্বস্ব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। যে কিনিয়াছে, সে এতদিন গৃহ অধিকার করিয়া লইত কেবল তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিন মাস কাল তাঁহাকে দয়া করিয়া ভাড়া দিয়া বাস করিতে দিয়াছিল। সেই তিন মাসের আর মাত্র এক মাস কাল বাকি আছে। সাজ আসবাব-পত্র বাড়ীখানা অপরের, তাহার নিজের নহে, কনক এই কথাই ভাবিতেছিল।

পিতৃবন্ধু আর এক ব্যারিষ্টার দয়া করিয়া মাঝে দাঁড়াইয়া ঋণ-শোধের ব্যাপার মিটাইয়া দিয়াছেন তাঁহার কাছেই কনক কতক কথা শুনিয়াছে। গাড়ী ঘোড়া মোটর চিত্র, পুস্তক, সরঞ্জাম, তৈজসপত্র ইত্যাদি সমস্ত বিক্রয় করিয়া লোক লস্করের বেতন ও পাওনা চুকাইয়া দিয়া মাত্র শ দুই টাকা নগদ পুঁজি—ইহা লইয়া কনককে সংসারের যাত্রায় যাত্রা সাজিতে হইবে। তাহার মাতৃদত্ত দুই চারিখানা অলঙ্কার—উহাও সামান্য।

কনক ইহাতে যে একবারে দুঃখিত ও আশাহত হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারে না। তবে দুঃখটা একবারে জগদ্দল পাথরের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসে নাই। তাহার দুঃখ পিতৃ-বিয়োগে—তাহার পিতা তাহাকে পথে বসাইয়া গিয়াছেন এ কথা তাহার একবারও মনে হয় নাই, তবে তাহার পিতা যে তাহাকে সকল স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়া এই কর্কশ নীরস সংসারে রাখিয়া গেলেন,—ইহাই তাহার পরম দুঃখ।

সে যে পরমুখ-প্রত্যাশী হইয়া থাকিবে না, এ বিষয়ে সে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছিল। তাহার দর্জ্জীপাড়ার আত্মীয়া তাহাকে পুত্রবধূ করিতে স্বীকৃত হইলেও বাপের আদুরে মেয়ে বলিয়া স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন না, একথা সে বিলক্ষণ জানিত। বিশেষতঃ তাঁহার কন্যারা তাহার রূপগুণের হিংসা করিত এ কথাও বুদ্ধিমতী কনকের বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হয় নাই। সুতরাং সে স্থির করিয়াছিল, তাহাদের কালেজে একটা রেসিডেণ্ট টিচারের কাজ জুটাইয়া লইবে। কিন্তু কাজ পাওয়া যে তাহার মত বালিকা ছাত্রীর পক্ষে কত দুরূহ, তাহা সে একবারও ভাবিয়া রাখে নাই।

আর একটা কথা সে মনে তোলাপাড়া করিতেছিল। তাহার পিতার কঠিন রোগের সংবাদ পাইয়াও প্রবোধদাদাদের কেউ ত একবার কারু মুখেও খবর

লইতে আসে নাই। তাহার বাপের অবস্থা যতদিন ভাল ছিল, ততদিন ত সকলেই আসিত। তবে?—

এই সময়ে ডাকে একখানা পত্র আসিল। পত্রখানা খুলিয়া কনক দেখিল পত্র প্রবোধ দাদার মা লিখিয়াছেন। পত্রে লেখা ছিল, তাঁহারা এই ঘটনার সময় কলিকাতায় ছিলেন না, তবে পুরীতে খবর পাইয়াছিলেন। পুরী হইতে মাত্র তিন দিন হইল ফিরিয়াছেন, শীঘ্র দেখা করিতে আসিবেন প্রবোধ পুরী হইতে ওয়ালটেয়ার বেড়াইতে গিয়াছে।

ঘৃণায় কনকের সমস্ত শরীরটা ভরিয়া উঠিল। এই কি ব্যবহার? যিনি দুই দিন বাদে তাহাকে কন্যার মত ঘরে বরণ করিয়া লইবেন; তাঁহার এই চিঠি দূরের এই রাধাদিদি,—কে সে, তাহার সহিত কিসের সম্বন্ধ? অথচ সে যে তাহাকে স্নেহার্দ্র বুকের মাঝে সকল দুঃখ শোক হইতে সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিয়াছে আর যিনি পিতৃ-মাতৃহারা অনাথার মাতৃত্বের দাবী করিতেছেন, তাঁহার কি তাহার শোকে এই সান্ত্বনা?

যেমন জননী, তেমনি পুত্র! যাহার সহিত জীবন-মরণের সম্বন্ধ দুই দিন না হউক দশ দিন বাদে স্থির হইয়া আছে, সে এত বড় বিপদের কথা শুনিয়া স্বচ্ছন্দে ওয়ালটেয়ারে বেড়াইতে গেল? তবে কি—তাহারা তাহার দারিদ্র্যের কথা শুনিয়াছে? সেই জন্যই কি তাহারা দূরে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে?

কনকের মাথার মাঝে দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অভিমানিনী সে—লজ্জা ও অপমানে তাহার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল চোখের কোণে জল দেখা দিল। চিঠিখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সে জানালার দিকে চলিয়া গেল—বদ্ধ কক্ষে তাহার যেন প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল।

এমনই সময়ে পরিচারক সংবাদ দিল, পাশের বাগানের বাবু দেখা করিতে চাহেন। কনক কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিল না। হয়ত সে ভুল বলিয়াছে মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে বাবু?"

পরিচারক পুনরায় বলিল, "পাশের বাগান বাড়ীর বাবু।"

বাবুকে আনিবার আদেশ দিয়া কনক দাঁড়াইয়া রহিল। সে কেবল মনে মনে প্রশ্ন করিতেছিল—পাশের বাগানের বাবু? তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? সে কেন দেখা করিতে চায়?

কনককে জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়াই কক্ষে পদার্পণ করিয়া মৃণাল বলিল,—

"বোধ হয় আমার এই অনধিকার প্রবেশে অসন্তুষ্ট হবেন; কিন্তু একটা খুব জরুরী কথা বল্‌বার জন্যে এসেছিলুম।"

"জরুরী কথা? আমার সঙ্গে? কি কথা?"

মৃণাল দুই চারিটা ঢোক গিলিয়া নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় বলিতে লাগিল, "যা বল্‌ব তাও অনধিকার চর্চ্চা বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু যা শুনছিলুম তা যদি হয় তা হ'লে—

"তা হ'লে কি? কি শুনেছেন? আমার এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে এই ত?"

মৃণাল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "এত অল্প বয়সে আপনার উপর এত বড় ভার পড়্‌বে—"

"তাতে কি হয়েছে? ভগবান কি লোক বেছে দুঃখের বা বিপদের বোঝা চাপিয়ে দেন?" কনক এই কথা কয়টি সহজ গলায় বলিয়া মৃদু হাসিল। সে হাসিতে তাহার হৃদয়ের লুক্কায়িত দুঃখ-সমুদ্রের একটা গভীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস খেলিয়া গেল।

মৃণাল কাতর হইয়া আবেগ ভরে বলিল "তা হ'লে এখন কি করবেন ঠিক করেছেন?"

কনক বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে বলিল, "আমি বুঝ্‌তে পারছি না, আপনি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন। আপনি যে বল্‌লেন, একটা জরুরী কথা আছে?"

মৃণাল গাঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ বলেছি। যা জিজ্ঞাসা করেছি, তার সঙ্গে সে কাজটার খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। স্বীকার করছি আপনার সাংসারিক ব্যাপারে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আমার অধিকার নেই, তবুও জিজ্ঞাসা করছি প্রতিবেশী হিসাবে, বলুন কি করবেন ঠিক করেছেন?"

কনক ক্ষণেক নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ কি যেন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিল, "দর্জ্জিপাড়ায় আত্মীয়দের বাড়ী যাব।"

"তারা ত আপনাকে চায় না।"

কনক চমকিয়া উঠিল, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি জান্‌লেন কি ক'রে?

"সেদিন বাগানে আপনাকে এই কথা বলতে শুনেছি।"

"হুঁ। না, আমি কারও গলগ্রহ হব না, আমি চাকরী করব।"

"আপনি চাকরী করবেন? তার চেয়ে আপনার বিবাহ করা উচিত না কি?"

কনক উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিল। এই পাড়াগাঁয়ের অশিষ্ট লোকটার সাহস ত অল্প নহে! সে ঈষৎ ক্রোধস্ফুরিতাধরে বলিল, "বিবাহ আমি করব না। করি না-করি, আমার ইচ্ছামত করব।"

মৃণাল তথাপি ধীর ভাবে বলিল, "কেন, আপনার বিবাহ ত ঠিক হ'য়ে রয়েছে প্রবোধবাবুর সঙ্গে।"

কনক বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কখন না—বিশেষ প্রবোধ বাবুর সঙ্গে এ জন্মে ত নয়ই। আপনার কথা হয়েছে ত? এখন আপনি যেতে পারেন।"

মৃণাল অম্লানবদনে জবাব দিল, "না, এখনও যেতে পারিনা। আমি যা বল্‌তে এসেছিলুম তা এখনও বলা হয়নি। যা বলব, তাতে আপনি নিশ্চয় সন্তুষ্ট হবেন না, হয়ত এখনই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন কিন্তু তাহ'লেও আমি বলব।"

কনক কেবল বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, কোন জবাব দিতে পারিল না। মৃণাল বলিয়া যাইতে লাগিল,—"হঠাৎ আপনার এমন বিপদ আস্‌বে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কাজেই যা আমার মনে ছিল, যা কখনও এ জগতে প্রকাশ পেতো না, এই দুর্ঘটনায় আর তা চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। জগৎ আমায় এতে উন্মাদ বলবে সন্দেহ নেই; কিন্তু উন্মাদের উপযুক্ত কথা হ'লেও আমায় বল্‌তে হবে। আপনি ছেলেমানুষ, চিরদিন সুখে কাটিয়ে এসেছেন, এখন হঠাৎ ঘোর বিপদে আপনাকে পড়্‌তে হয়েছে। সংসারের এ ঝড়-ঝাপ্‌টা আপনি সইতে পার্‌বেন না। অথচ যারা আপনার লোক তারা কেউ আপনাকে চায় না। কিন্তু একজন আপনাকে চায়, আপনার পায়ের তলা থেকে পৃথিবীর সকল আপদ বালাই সরিয়ে দিতে চায়,—সে অবশ্য আপনার বাড়ী সাফ কর্‌বারও উপযুক্ত না হ'লেও সমস্ত প্রাণটা দিয়ে আপনাকে চায়—আপনি তাকে বিবাহ কর্‌বেন?"

কনকের সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছিল—সে কি সত্যই কাহারও কথা শুনিতেছে, না স্বপ্ন দেখিতেছে? একি আশ্চর্য্য ধৃষ্টতা! তাহার পর যখন মৃণাল অগ্রসর হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমি শিক্ষিত নই, আপনাদের সমাজের কেহ নই, আমি আড়তদারের ছেলে। তবু আমার চেয়ে এ জগতে আপনাকে কেউ বেশী চায় না, একথা আমি ভগবানের নাম নিয়ে শপথ ক'রে বলতে পারি। আপনি আমাকে

বিবাহ করবেন ?” তখন কনক ক্ষিপ্রগতি চৌকি হইতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, “মৃণাল বাবু, আপনি কি বল্‌ছেন ? আপনি আমার অপরিচিত, মাত্র ছুই চার দিন আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন, এ কথা কি ভুলে যাচ্ছেন !”

মৃণাল দৃঢ়স্বরে বলিল, “না, ভুলিনি। আমি জানি আমার কোন আশা নেই, তবু—তবু বলে রাখ্‌লুম কেবল আপনাকে সুখে রাখ্‌তে পারব এই আশায়। এ কষ্টের সংসারে আপনার গায়ে ঝড়ের আঁচ্ লাগ্‌বে, এ চিন্তা আমায় পাগল ক'রে তুলেছিল, তাই সাত পাঁচ না ভেবে অন্তরের গোপন কথা ব্যক্ত ক'রে গেলুম। আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমি আপনার মুখে জবাব পেয়েও মনে কোনওরূপ ব্যথা পোষণ ক'রে যাচ্ছি, তা ভুলেও কখনও মনে করবেন না। যখন দরকার হবে ডেকে পাঠাবেন, আমার সাধ্যমত আপনার কথা পালন করবার চেষ্টা করব।”

মৃণাল চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু দ্বারসান্নিধ্যে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই কনক ডাকিল, “মৃণাল বাবু !” মৃণাল ফিরিয়া দেখিল, কনক চেয়ারের হাতলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে, তাহার ভাসা ভাসা টানা চোখ দুটির কোমল পল্লব যেন জলাসিক্ত হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিল।

মৃণাল বলিল, “কিছু বলতে চান ?”

কনক বলিল, “আপনি কি আমার অবস্থার কথা শুনে আমার প্রতি দয়াবশে এই প্রস্তাব করছেন ?”

মৃণালের নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল, সে ক্রোধাভিমান জড়িত স্বরে জবাব দিল, “আমি আড়তদার হ'তে পারি, কিন্তু আপনাকে আমি, আমাকে এত নীচ মনে করবার কোন অবসর দিই নি বোধ হয়।”

“না, তা দেন নি। দেখুন, ভালবাসা দুই রকমের আছে। এক রকম আছে, যা খুব বড়, যা সচরাচর দেখা যায় না, যা প্রকৃত ভালবাসা, যা সব দিতে পারে অথচ প্রতিদান চায় না। আর এক রকম আছে যা সব দিয়ে তৃপ্তি পায়, প্রতিদানেও সব চায়। আপনি বল্‌ছেন, আমায় বিবাহ করবেন। কিন্তু প্রথমে যে খুব বড় ভালবাসার কথা বল্‌লুম; আপনি তা দিয়ে আমায় অবশ্যই বিবাহ করতে চাইছেন না, কেননা আপনি আমায় অতি অল্প কালই দেখেছেন, তেমন ভালবাসা দেবার আপনার অবসর ও সুযোগই

হয় নি। আপনি জানেন না, আমি সে ভালবাসার উপযুক্ত কি না। তবে এ প্রস্তাব করছেন কেন?"

মৃণালের কণ্ঠস্বর আরও গাঢ় হইয়া আসিল, সে একরূপ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দূর থেকে লোকে আকাশের চাঁদকে দেখে, তবু কি চাঁদ হৃদয়ে আনন্দ দিতে কৃপণতা করে? আমি আপনাকে যা দেখেছি, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপনাকে বিবাহ ক'রে সকল কষ্ট বিপদ হ'তে দূরে রাখ্‌তে পারব, এর বেশী আমি কিছু চাই নি, আশাও করি নি, আমি এইতেই সন্তুষ্ট।"

"এইটুকু পেয়েই আপনি সন্তুষ্ট হবেন?"

"হাঁ, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করব।"

"তার চেয়ে যে নারী আপনাকে যথার্থ ভালবাসবে, সকল বিষয়ে প্রতিদান দিতে পারবে, তাকে বিবাহ করাই কি আপনার উচিত না? তাতে কি আপনি বেশী সুখী হবেন না?"

"না। আমার সুখ দুঃখ আমি বেশী বুঝি।"

"আমি হয়ত স্বার্থের খাতিরে আপনাকে বিবাহ করতে পারি। কিন্তু আপনি আমায় সব দেবেন, প্রতিদানে আমি কিছু দিতে পারব না, একথা মনে ক'রে বিবাহের পর আপনি কি আমায় ঘৃণা করবেন না?"

মৃণাল সে সময়ে যে দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইল, তাহাতে কনকের মুখে চোখে সমস্ত রক্তস্রোত ছুটিয়া আসিল, সে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি অবনত করিয়া লইল।

মৃণাল বলিল, "ঘৃণা? আপনি আমাকে এখনও ঠিক বুঝ্‌তে পারেন নি।"

কনক পুনরপি বলিল, "আপনি আমায় ঘৃণা করতে না পারেন, কিন্তু আমি আমাকে ঘৃণা করব। দেখ্‌ছি আপনি আমার চেয়ে অনেক বড়। অবশ্য আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হ'তে পারিনি বটে কিন্তু এই প্রস্তাবে আপনি আমায় যে বিশেষ সম্মান দেখিয়েছেন, একথা খুবই বলব।"

মৃণাল এইবার অগ্রসর হইয়া কনকের একখানি হাত ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল, "তবে সম্মতি দাও। কনক, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বল্‌ছি, আমি প্রতিদান চাই নি। যদি আমার অক্লান্ত সেবায় কখনও তোমার মন পাই,—যদি তুমি কখনও নিজে হ'তে আমাকে প্রতিদান নিতে সাহস দাও, তা'হলে তোমায় চাইব, না হ'লে আমায় যা দিচ্ছ, তাই নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকব।"

মৃণাল আর কোনও উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া কক্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কনক টেবিলে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিতৃস্নেহে বঞ্চিতা স্বজনের অনাদৃতা বেদনাহতা বালিকার হৃদয়ের এই কান্নার কারণ কে নির্ণয় করিবে?

৪

বিবাহ হইয়া গেল। অরক্ষণীয়া কন্যা, তাই পিতার মৃত্যুর একমাস পরেই বিনাড়ম্বরে শুভকার্য্য সম্পূর্ণ হইল। বিবাহের পর কনক স্বামীর ঘর করিতে আসিল। যাত্রা কালে পিতার ভিটা ছাড়িয়া যাইতে তাহার প্রাণ কাঁদিল।

এ বিবাহে তাহার মন ছিল না। বস্তুতঃ পিতৃবিয়োগ না হইলে সে এই ভালবাসাহীন বিবাহে কিছুতেই সম্মত হইত না। কিন্তু হঠাৎ এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে তাহার তেজস্বী মন কেবল পরের উপর অভিমান ভরে এই বিবাহ উদ্যোগী হইল।

ঘটনাটি তাহার পক্ষে বড়ই অপমানকর। মৃণালকান্তির সহিত সাক্ষাতের দুই চারি দিন পরে সে প্রবোধচন্দ্রের মাতার নিকট হইতে আর একখানি পত্র পাইয়াছিল। সেই পত্রে তিনি প্রকারান্তরে পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পত্রের কথাগুলি অতি কর্কশ, অতি নীরস—উহাতে কনকের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি নির্দ্দয় নির্দ্দেশ ছিল, পরন্তু তাহার পিতার অপরিণামদর্শিতা ও বুদ্ধিহীনতার কথা উপদেশছলে কথিত হইয়াছিল। অভিমানিনী কনকপ্রভার মন এই ব্যবহারে একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারই ফলে হঠাৎ এই বিবাহ।

এ বিবাহে রাধাদিদির যত আনন্দ এত আর কাহারও হইয়াছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। কারণ, তিনি জানিতেন, এ বিবাহ হঠাৎ একটি মনের ঝোঁকে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহাতে কনকের পক্ষে স্থায়ী তৃপ্তির কারণ ছিল না। এই হেতু রাধাদিদি প্রাণপণে কনকের মুখে হাসি আনয়নের চেষ্টা করিলেও তাহার মনে সন্তোষ ও তৃপ্তি আনয়ন করিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন স্বামী স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে এক হইয়া গেলেও উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছিল। পরিণাম ভাবিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই স্বামী স্ত্রীর এই ছাড়াছাড় ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

অথচ বাহিরে কেহ জানিতে দিত না যে, উভয়ে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেও পরস্পর এত বিচ্ছিন্ন। মৃণাল বাক্যে যতটা না হউক, কায়মনে কনকের তুষ্টিসাধনে প্রয়াস পাইত। তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি কার্য্যে কনক ইহার পরিচয় পাইত। এজন্য সে মরমে মরিয়া যাইত। মৃণাল কার্য্যে তাহাকে তাহার সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বময়ী কর্ত্রী করিয়া দিয়াছিল, তাহার মুখের কথা খসিতে না খসিতেই পালিত হইত। কনক ইহার প্রতিদানে কিছুই দিতে পারিত না। সে প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও কিছুতেই বিদ্রোহী মনকে বশ করিতে পরিত না। যতবারই সে মনে করে, স্বামীকে ভালবাসিবে, স্বামীর সুখে দুঃখে অংশ ভাগিনী হইবে, ততবারই তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। বিশেষতঃ মৃণাল প্রতিদানে কিছুই চাহিত না—যে সর্ত্তে সে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণে বর্ণে পালন করিত, কাজেই চেষ্টা করিয়াও কনকপ্রভা প্রতিদানের সুযোগ পাইত না। এমন অবস্থা যে আশু সর্ব্বনাশের পূর্ব্বাভাস, তাহা রাধামাসীর মত পাকা গৃহিনীর বুঝিতে বাকী ছিল না।

একদিন রাধাদিদি দেখিলেন, সন্ধ্যার আলো-আঁধারে কনকপ্রভা জানালার ধারে একলা বসিয়া আছে। তাহার দৃষ্টি জানালার বাহিরে—সে এক মনে কি ভাবিতেছিল।

রাধাদিদি ডাকিতেই সে চমকিয়া উঠিল। রাধাদিদি বলিলেন,—"একলা লুকিয়ে ব'সে কি হচ্ছে? ভাঁড়ার দেবে কে?"

কনক প্রথমে অপ্রতিভ হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই চাবীর গোছাটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও না দিদি।"

"নেবো কি? আমি নিয়ে কি ধুয়ে খাব?"

"আমি ত বলেছি, এসব আমার ভাল লাগে না। আমায় ধরে বেঁধে ও সব বালাই চাপিয়েছ কেন?"

"দেখ বাবু, অতটা ভাল না। তোমার ঘর সংসার অপরে দেখবে কেন?"

"তা সত্যি। তা, মশাই কি করছেন? এতদিন ত আমি ঘর-সংসার চালাই নি।"

"এতদিন ত ঘর সংসারের কর্ত্তা তোমায় গিন্নী করে ঘরে আনে নি। নাও, ওঠ দিকি, যাও ভাঁড়ার দাও গিয়ে। এমনই ক'রে একলা বসে মন খারাপ করতে হবে না।"

"বলেছি ত, এ সব আমার ভাল লাগে না।"

"ভাল লাগাবে। অভ্যাস না কর্‌লে কি করে লাগ্‌বে? দেখ, সে তোমায় সুখে রেখে কত সুখী। সে ত কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তোমায় সুখী দেখ্‌লেই সুখী হয়। তা, যে তোমার জন্যে এতটা করছে, তাকে সুখী কর্‌বার জন্যে ও ত অন্তত সুখের ভাণ করতে হয়।"

"আচ্ছা দিদি, আমার সুখের জন্যে তিনি এত কর্‌ছেন কেন?"

"কেন, তা কি জান না?"

"ভাব্‌ছিলুম তাঁর এত বিষয়-আশয়, এত কাজ, তিনি কত সুখী। আমাকে বিবাহ করে কেন তিনি দুঃখ ডেকে আন্‌লেন?"

"তুমিও ত সুখী হ'লে পার। কেউ ত বাধা দেয় নি।"

"আমি সুখী হতে পারব?"

"প্রার্থনা কর্‌ছি দিন রাত, তুমি সুখী হও।"

কনক হঠাৎ রাধাদিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া খুব খানিকটা কাঁদিল। রাধাদিদি তাহাতে বাধা না দিয়া সস্নেহে তাহার মেঘের মত কাল চুলের রাশির উপর হাত বুলাইতে লাগিল। ক্ষণপরে কনক শান্ত হইয়া বলিল, "দিদি, কিসে তাঁকে সুখী করি? আমি ত রাতদিন চেষ্টা করেও উপায় খুঁজে পাই নি।"

রাধাদিদি হাসিয়া বলিলেন, "তাকে সুখী করতে তোমার ত বিশেষ কষ্ট হ'বে না। তুমি সুখী হইলেই সে সুখী হ'বে।" বলিতে বলিতে হঠাৎ রাধা দিদি গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখ, একটা কথা বলি। সে তোমায় প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসে। তার কণামাত্র প্রতিদান পেলেই সে সুখী হবে। কিন্তু চেষ্টা করে ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া যায় না। সে প্রতিদানের বাসনা কোন্‌ শুভ সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয় কেউ তা আগে জান্‌তে পারে না। যখন সে সন্ধিক্ষণ আস্‌বে তখন তোমাকে চেষ্টা করে সুখী হ'তে হবে না।"

কনক তাঁহার আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত হইয়া বলিল, "যদি এ জীবনে সে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত না হয়?"

"তা হলে এ জীবনে কখনও সুখী হবে না"। রাধাদিদি এই কথা বলিয়া ধীর গম্ভীর পাদবিক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন। কনক বহুক্ষণ একাকী বসিয়া এই কথাটাই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল,—"যদি সন্ধিক্ষণ উপস্থিত না হয়?" ভাবিতে ভাবিতে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, মনে হইল, তাহার মত দুঃখী পথের ঐ দিনমজুরও নহে। তাহার এই অল্প বয়সে বিধাতা

তাহার জন্ম এই দুঃখ-হলাহল যাপাইয়া রাখিয়াছেন কেন? সে কি এমন ঘোর অপরাধ করিয়াছে?

সন্ধ্যার অন্ধকারে কক্ষ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, কনকের কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। হঠাৎ কক্ষের বৈদ্যুতিক আলোক মালা জ্বলিয়া উঠিল। কনক শুনিল, গৃহস্বামী বলিতেছেন, "বাঃ ঘরের আলোগুলোও কি জ্বালিবার সময় হয় নি? বেশ লোকজন যা হোক!" সে অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। মৃণালকান্তি তাহাকে দেখিয়া বলিল, "প্রবোধবাবু ওয়ালটেয়ার থেকে ফিরে এসেছেন। আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি মুখে বলে দিয়েছেন, তাঁর মা আমাদের একদিন তাঁদের ওখানে যেতে বলেছেন। এই চিঠিতেও লিখে দিয়েছেন, আস্‌ছে বুধবার। কি জবাব দেব?"

প্রবোধবাবুর নাম শুনিয়াই কনকের মুখচোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল, সে প্রথমে নীরব হইয়া রহিল, পরে বলিল, "জবাব আমি কি দেব? যাকে লেখা হয়েছে, তারই জবাব দেওয়া ঠিক না?"

"পত্রখানা আমার নামে লেখা হলেও লেখা হয়েছে তোমাকে। ওদের নেমন্তন্ন নেওয়া হবে কি?"

"না। যদি আমার মত জেনে চিঠির জবাব দেওয়া হয়, তাহ'লে লিখে দিও, আমার মন ভাল না, কাজেই এখন কিছুদিন কোথাও যেতে ইচ্ছা নেই।"

"কথাটা খুব কড়া হবে না? এতকালের নিকট সম্বন্ধ।"

"তা হলে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করার দরকার কি ছিল?" কথাটা বলিবার সময় ঈষৎ ক্রোধ ও অভিমান উহার সহিত জড়ান ছিল।

মৃণাল বলিল, "থাক্ গে, এ পত্রের জবাবের জন্য মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তুমি যদি না যেতে চাও, তা হলে ব্যাপার চুকেই গেল। আর একটা কথা বল্‌ছিলুম্ কি।"—মৃণাল কথাটা বলিতে বলিতে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। কনকের মুখ শুকাইল। স্বামী স্ত্রী অথচ বহুক্ষণ উভয়ে একত্র বিশ্রম্ভালাপ প্রায়শঃ ঘটিয়া উঠিত না। কনকের কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। কাহারও সম্মুখে না হইলে সে বড় একটা স্বামীর সহিত কথা কহিত না। এখনও সে কি সূত্রে পলায়ন করিবে তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে ছিল। মৃণাল যে তাহার সে ভাব লক্ষ্য করে নাই, তাহা নহে, তাহার বেদনাহত কাতর নয়নে অন্তরের সকল কথাই স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সে ভারি গলায় বলিল, "দেখ, বেশীক্ষণ লাগ্‌বে না কথাটা বল্‌তে। কথা এই,

তোমার ও আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবরা একদিন আমোদ ক'রে একটা প্রীতি-ভোজ খেতে চায়। এ সপ্তাহে তার আয়োজন করবে কি ?"

কনক মুখ অবনত রাখিয়া টেবিলের চাদরখানা খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "তা করলেই হয়।—কর না।"

মৃণাল বলিল, "কে করবে ? যার করবার তার সে না করলে অপরে কেউ পারে কি ? দেখ, স্পষ্ট করে বলি। যে কড়ারে বিবাহ হয়েছে, তা সব আমার বেশ মনে আছে। আমি ত সে কড়ার ছাড়া একটু বেশীও আশা করি নি। তবে বিবাহ যখন হয়েছে, তখন এ জন্মে তার আর ভাঙ্গচুর নেই। কাজেই সে বিয়ের যতটুকু দায়িত্ব ঘাড়ে করে নিয়েছ, সেটুকু ত পালন করতে হবে।"

কনক তখনও মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। তাহার অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘশ্বাস আপনি বাহির হইয়া গেল। সে অতি অনুচ্চস্বরে বলিল, "কি করতে হবে বল। যা করলে তুমি সুখী হও, যা করলে ভাল হয়, বল।"

মৃণাল একবার বিস্মিত চকিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিল, একবার কনকের একখানা হাত ধরিতে হাত বাড়াইল। কিন্তু মুহূর্তপরেই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জানালার বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আমার বলবার কিছুই নেই, যা করবার তুমি ব্যবস্থা করলেই ভাল হয় না? তবে একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব। মার যে সব গহনাপত্র পেয়েছ তা ব্যবহার কর না কেন ?"

"ভাল লাগে না।"

"ওঃ!" মৃণাল কেবল এই কথাটি বলিয়া কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া গেল। কনকের মনটা হঠাৎ হাহাকার করিয়া উঠিল। এই ক্ষণপূর্ব্বে সে স্বামীর নিকট হইতে দূরে পলাইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার মনটা স্বামীকে ধরিয়া আনিবার জন্য আকুলিবিকুলি করিতে লাগিল। তাহার এ যন্ত্রণা কি সে স্বেচ্ছায় ডাকিয়া আনিতেছে ? কনক বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও ইহার সদুত্তর পাইল না।

৫

"এঁ্যা, এ কি ভেল্কী! সত্যি বল্‌ছি, দিদি, অবাক্ হয়েছি! যেখানে যে জিনিষটি ছিল, ঠিক তাই সাজান আছে! যে কিনেছে, সে কি কিছু নাড়ায় নি ?" কনক বিস্মিত হইয়া রাধাদিদিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

রাধারাণী বলিলেন, "দেখ্‌তেই পাচ্ছ।"

কনক তাহার পৈত্রিক আবাসবাটীতে আসিয়াছে, সেইখানেই প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হইয়াছে। সে বিস্মিত হইয়া দেখিল, যেমন অবস্থায় সে গৃহ সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল সেই অবস্থায় রহিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে সমস্ত আসবাবপত্র বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, সেগুলিও যথাস্থানে পুনরায় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, অধিকন্তু যে সব দাসদাসীকে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল তাহারা পুনরায় স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। বাগানে ও আস্তাবলে যেমন লোক জন ও যান-বাহন ছিল, সবই ঠিক বজায় আছে, সকলেই তাহার আজ্ঞা-পালনে উৎসুক হইয়া রহিয়াছে!

কনকের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। সে বলিল, "দেখ্‌তে, পাচ্ছি! কিন্তু এ সব কি ক'রে হ'ল, এখানে ভোজের আয়োজনই বা কি ক'রে হ'ল, কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে?"

রাধাদিদি হাসিয়া বলিলেন, "যে এ সব করেছে, তাকে না জিজ্ঞাসা কর্‌লে বুঝ্‌বে কি করে।

কনকের বুকের ভিতরটা গুরু গুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, দারুণ সন্দেহে তাহার মনটা আকুল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "দিদি, যা সন্দেহ কর্‌ছি তা যদি সত্যি হয়!"

সন্দেহ কেন, সত্যি। তুমি কি বুঝ না, সে তোমায় কত ভালবাসে? তুমি যে মাটী দিয়ে চলে যাও, সেই মাটী তার কাছে স্বর্গ। যে দিন শুনেছে, তোমার বাবার সব বিক্রী হয়ে যাচ্ছে, সেই দিন থেকেই সে তোমাদের উকীলের কাছে আগাম চেক রেখে দিয়েছে সব তোমার নামে কিনে নিতে। কেবল বাড়ীটা মেরামত কর্‌বার জন্য এই ছ মাস লোকজন তফাতে রেখেছিল, কিন্তু কাউকে কাজ থেকে ছাড়ায় নি।"

কনক নীরবে বসিয়া রহিল। রাধাদিদি বলিলেন, "কৈ তুমি ত কিছু খেলে না?"

কনক বলিল, "এত খেয়েছি, আর কি খিদে আছে? দিদি, কি করলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়?" তাহার দুনয়ন উছলিয়া অশ্রুধারা পতিত হইল। রাধাদিদি তাহার মাথাটা কোলে টানিয়া লইয়া স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন, "ছিঃ কাঁদে না। নিজে অসুখের সৃষ্টি করলে কেউ কিছু করতে পারে কি?

ইচ্ছে করে অসুখকে আঁকড়ে ধরে থাকলে অসুখ ছাড়বে কেমন ক'রে? তোমার সুখ ত তোমারই আয়ত্তের অধীন।"

অশ্রুসিক্ত মুখ খানি তুলিয়া কনক বলিল, "তুমিই ত বলেছ, জীবনে সে সন্ধিক্ষণ একবার আসে। চেষ্টা করলে ত তাকে ধরা যায় না।"

"না, তা যায় না। তবে তার প্রতীক্ষা করে তাকে দূরে রাখলে সে সন্ধিক্ষণ আপনি আসে না। মানুষকেও তাকে ধরবার জন্যে আগিয়ে যেতে হয়। থাক্, আমি এখন নীচে যাই, নিমন্ত্রণদের আসবার সময় হয়েছে। তুমি কাপড় চোপড় ছেড়ে নাও, আমি নেত্যের মাকে উপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

রাধাদিদি চলিয়া গেলে পর কনক কক্ষ মধ্যে অস্থির হইয়া পাদচারনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সোপানে পায়ের জুতার শব্দ হইল। কনক স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণ পরেই কক্ষে যিনি প্রবেশ করিলেন তাঁহাকে দেখিয়া সে চমকিত ও বিস্মিত হইল।

প্রবোধবাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়াই একবারে অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া আরাম কেদারায় শয়ীয়ান হইয়া বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে বলিলেন, "আশ্চর্য্য হচ্ছ আমায় দেখে কনক? তা আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। মা, বিনী আর সুনীকে নিয়ে ভিয়েন ঘরের দিকে গেছেন, আমি শুন্‌লুম, তুমি উপরে আছ, তাই একবারে এখানে দেখা করতে এলুম। তা এত বড় একটা সুখের খবর—একবারে হয়ে যাবার পরে জানালে, কেন আগে জানালে কি কিছু ক্ষতি ছিল?"

কনক শুনিয়া যাইতেছিল, কক্ষ ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুতও হইয়াছিল, কিন্তু শেষ কথাটা শুনিয়া তাহার ক্ষুব্ধ অভিমানহত মন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেও সমান ওজনে জবাব দিল,"দরকার হয় নি বলে খবর দিই নি।"

প্রবোধবাবু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ইস্, এত রাগ কিসের? রাগের কথা ত কিছুই বলিনি। তা বিয়ের এত তাড়াতাড়ি কেন—বাপ মারা যেতে না যেতে—তা হলে কি বুঝ্‌তে হবে, এ তাড়ার কোন বিশেষ কারণ ছিল?

কনক গম্ভীরভাবে বলিল, "সে কৈফিয়ৎ কারও কাছে দেবার দরকার আছে বলে মনে করি নি। যাক, তুমি এই খানে বস, আমি একবার নীচে দেখা করি গিয়ে।"

প্রবোধবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "বস, বস, পালাতে হবে না সত্যই তোমায় খেয়ে ফেল্‌তে আসিনি। একটা কথা জান্‌তে ইচ্ছে করে, বেছে বেছে এই পাড়াগেঁয়ে বুনো জানোয়ারটিকে পছন্দ কর্‌লে কি ক'রে? তোমার পছন্দ ত এমন ছিল না।"

ক্রোধে ঘৃণায় কনকের মুখ চক্ষু রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে পরুষ কণ্ঠে বলিল, "তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ কোথায় বসে কার সঙ্গে কথা কইছ? এ বাড়ী এখন আমার নয়। যাঁর বাড়ী তাঁর নিমন্ত্রনে এখানে এসে তাঁরই অপমান কর্‌ছ, তুমি ভদ্র বলে পরিচয় দাও না?"

"ইস্! এত দরদ! কৈ, মাস দুই আগে এ লোকটাকে তুমি জান্‌তে বলেও ত মনে হয় না। যাক্ যা বল্‌তে এসেছিলুম এই বেলা বলে যাই। কনক, তুমি কি মনে কর, তুমি এই বিয়েতে সুখী হবে? বলিতে বলিতে প্রবোধ বাবু কনকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কনকের হাতখানি ধরিতে গেলে সে সজোরে হাত ছিনাইয়া লইয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল। প্রবোধবাবু কিন্তু বিস্মিত হইবার ভাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সত্যি বলছি কনক, আমি তোমার বিপদের কথা জান্‌তে পার্‌লে ওয়ালটেয়ার থেকে ছুটে আস্‌তুম, মা আমায় কিছুই জান্‌তে দেয় নি। যখন শুন্‌লুম, তখন বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু কনক, আমি তোমার আশা ছাড়ি নি। তুমি কি জান্‌তে না, আমি তোমায় না পেলে থাক্‌তে পার্‌বো না—"

কনক তাঁহার কথা শেষ হইতে দিল না। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "প্রবোধবাবু, আপনি সাম্‌লে কথা কইবেন। ভুলে যাচ্ছেন কি, আমি এক জনের বিবাহিত স্ত্রী?"

উত্তরের অবসর না দিয়াই সে ঝড়ের বেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। প্রবোধবাবু ক্ষণেক তাহার চলন্ত মূর্ত্তি দিকে বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, পরে আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, অনেক খেলাতে হবে, গভীর জলের মাছ!"

* * *

সেইদিন নিমন্ত্রিতগণ চলিয়া গেলে সন্ধ্যার পর স্নান করিয়া যখন কনক উপরে উঠিতেছে, সেই সময়ে একজন দাসী তাহাকে একখানা পত্র দিয়া গেল। কনক পত্রখানা বসিবার ঘরের টেবিলের উপর রাখিয়া শয়ন কক্ষে কাপড় ছাড়িতে

গেল। কাপড় চোপড় ছাড়িয়া যখন পার্শ্বের ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন সে তাঁহার ঘরে স্বামীকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। মৃণাল তখন চেয়ারে বসিয়া চিঠিখানা নাড়াচাড়া করিতেছিল। কনককে দেখিয়া সে পত্রখানা দেখাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "ঠিকানার লেখাটা দেখে মনে হচ্ছে, চিঠিখানা প্রবোধবাবুর। তা, এমন চিঠি লেখালেখি কতদিন থেকে চল্‌ছে জান্‌তে পারি কি?

কনক স্তম্ভিত হইল। বস্তুতঃ সে তখনও পত্র খানা কাহার লেখা জানে না, পত্রের শিরোনামা পর্য্যন্ত পড়িবার ও সে অবসর পায় নাই। অথচ স্বামীর এ কি অন্যায় সন্দেহ? সে তখনও স্বামীর প্রতি মনকে লইয়া যাইতে পারে নাই বটে, কিন্তু কায়মনোবাক্যে সে কখনও স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হয় নাই। কথাটা শুনিয়া তাহার নিষ্পাপ তেজস্বী মন আহত নারীমর্য্যাদায় মুহূর্ত্তে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে সত্য বলিলেই পারিত, কিন্তু কোন ক্ষণে কি হইয়া যায়, তাহার উপর কাহারও হাত থাকে না। হয়ত এই মুহূর্ত্তেই ঘটনার গতি অন্য খাতে প্রবাহিত হইতে পারিত, কিন্তু ক্রোধে কনক আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ডাকিয়া আনিল। সে হস্ত প্রসারণ করিয়া সগর্ব্বে বলিল, "ও চিঠি আমার, কারও পড়্‌বার অধিকার নেই।"

মৃণাল ও গম্ভীরস্বরে বলিল, "কারও না থাক্‌তে পারে, কিন্তু তোমার স্বামীর আছে।"

কনক ক্রোধে জ্ঞান হারা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "যে চোরের মত গোয়েন্দার মত পরের কাজের ছল খুঁজে বেড়ায় তার স্বামীত্বের কোন অধিকার থাক্‌তে পারে না।"

মৃণাল ক্রোধস্ফুরিতাধরে একটা কথা বলিতে গিয়া সামলাইয়া লইল। পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ধীর গম্ভীরস্বরে বলিল, "সত্যি, আমার স্বামীত্বের অধিকার নেই, সে অধিকার পাবার সর্ত্তে আমাদের বিবাহ হয় নি বটে। তবে তুমি যে দোষ দিয়ে আমায় সে অধিকার হ'তে বঞ্চিত কর্‌ছিলে, সে দোষে আমি দোষী নই। যদি আমার কথায় বিশ্বাস কর, তা হলে বল্‌ছি, এই ঘরে আস্‌বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি এ চিঠির অস্তিত্ব জান্‌তুম না। একটা কথা বল্‌তে ঘরে এসেছিলুম, ভালই হ'ল তা আর বল্‌বার দরকার হ'ল না। আমি বুঝ্‌ছি আমাদের এ বিবাহে সুখ নেই। দুজনের একজন তফাৎ না হলে কেউই সুখী হব না। আমি তোমার সুখের ব্যাঘাত ঘটাতে আর এখানে থাক্‌ব না, যাতে তুমি শান্তি পাও সুখ পাও, তাই কর্‌ব।

এই নাও তোমার চিঠি। আমি স্বামীর অধিকার তোমার কাছে কখনও চাই নি, চাইবার সাহস ও রাখিনি। কিন্তু তা বলে এটা আশা করেছিলুম, তুমি আমায় কখনও ভালবাসতে না পারলেও স্ত্রীর কর্ত্তব্য কখনও বিস্মৃত হবে না। এখন বুঝছি, সেটা আমার অন্যায় আশা। আমি তোমার জীবন বিষময় করেছি, বিবাহ না করাই উচিত ছিল। সে ত্রুটি এইবার শোধ্‌রাবার চেষ্টা করব।"

মৃণাল কথাকয়টি শেষ করিয়া পত্রখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া ধীরপাদ-বিক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ তাহার পদশব্দ শোনা গেল, কনক কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পত্রখানির দিকে একবারও তাহার দৃষ্টিপতিত হইল না। তাহার পর সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একখানা চৌকী ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে ছিল। চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সে টেবিলের উপর মুখ রাখিয়া খুব খানিকটা কাঁদিল।

কতক্ষণ যে এই অবস্থায় ছিল তাহা সে জানে না। কাঁদিতে কাঁদিতে সে তন্দ্রাগত হইয়াছিল। যখন জাগিল, তখন দেখিল, বাড়ী নিশুতি, চারিদিক নিস্তব্ধ! তাহার গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। ঘরের কপাট খোলা, সে উঠিয়া বন্ধ করিতে গেল। দ্বার সান্নিধ্যে গিয়া দেখিল, বারাণ্ডার অপর দিকে তাহার স্বামীর ঘরে আলোক জ্বলিতেছে। এই ক্ষণিক পূর্ব্বে একটা বাজিয়া গিয়াছে, এত রাত্রিতে তাহার স্বামী কি জাগিয়া আছেন?

তাহার স্বামী! আজ তিনি কি বলিয়া গেলেন? তাহার সমস্ত শরীর থরথর কাঁপিয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি কপাট ধরিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তকাল মাত্র। তাহার পরে সে দ্রুতগতি স্বামীর ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। উন্মুক্ত বাতায়নপথে দেখিল, তাহার স্বামী জানালার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া সম্মুখে শূণ্যদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, টেবিলের উপর তাঁহার দুই হাতের নীচে একখানা লেখা কাগজ পড়িয়া আছে, আর কি সর্ব্বনাশ! পার্শ্বে উজ্জ্বল আলোকের তীক্ষ্ণরশ্মিতে একটা ক্ষুদ্র পিস্তল ঝক্‌মক্‌ করিতেছে!

কনকের হৃদয়ের দ্বারে কে যেন ভীষণ হাতুড়ির আঘাত করিতে লাগিল। ঘরের কপাট খোলা ছিল, কনক দ্রুতগতি কক্ষে প্রবেশ করিয়া একেবারে স্বামীর পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। পুরু গালিচা পাতা, তাহার পদশব্দ একবারে শোনা গেল না, গেলেও স্বামী এমনই তন্ময় হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন যে,

বোধ হয় বহির্জগতের কোনও শব্দই তখন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না।

কনক দুই হাতে স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া অতি দীন অতি করুণ কণ্ঠে বলিল, "এঁ্যা, এ কি করছিলে?"

স্বপ্নোত্থিতের মত লাফাইয়া উঠিয়া মৃণাল বলিল, "কে, কে, তুমি? তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?" বলিতে বলিতে সে তাড়াতাড়ি পিস্তলটা লইয়া ড্রয়ারের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। তাহার বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তখনও তন্ময়তার ঘোর একেবারে কাটে নাই।

কনক বলিল, "বলছি। এ কি করছিলে? পিস্তল কেন?"

মৃণাল বলিল, "এ কিছু না। রাত্রে চোর ডাকাতের ভয়ে আমি কাছে পিস্তল রেখে থাকি। চল তোমায় ঘরে রেখে আসি।"

কনক বলিল, "তা যাচ্ছি। কিন্তু বল, এই কাগজে কি লিখেছিলে?"

মৃণাল তাড়াতাড়ি কাগজখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, "ও একখানা দলীল। চল যাই।"

কনক ক্ষিপ্রগতি কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া বৈদ্যুতিক আলোকে পাঠ করিল। বেশী কিছু লেখা নাই, সামান্য দুই চারি ছত্র। উহাতে মৃণাল তাহার যাবতীয় সম্পত্তি শ্রীমতী কনকপ্রভা দেবীর নামে উইল করিয়া দিয়াছে, উহাতে দুইজন সাক্ষীর নামও স্বাক্ষরিত হইয়াছে, উইল রেজেষ্টারী করাও হইয়াছে। উইলের লেখা পুরাতন, কিন্তু সঙ্গে একখানা পত্র গাঁথা ছিল, উহাতে কালীর লেখা তখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই। ঐ পত্রে মৃণাল লিখিয়াছে সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ তাহার জন্য দায়ী নহে। কনকের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। সে কাছে আসিয়া বলিল, "এই দলীল কি আজ সন্ধ্যার সময় দেখাতে গিয়েছিলে?"

মৃণাল বলিল, "হাঁ।"

কনক আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এই দলীলখানা দিয়ে সংসার ত্যাগ করে যাবে ঠিক করেছিলে?"

মৃণাল পুনরপি বলিল, "হাঁ।"

কনক বলিল, "তার পর এই পত্র আর এই পিস্তল!"

মৃণাল এইবার প্রকৃতিস্থ হইয়া সহজ ভাবে বলিল, "আমি যা করছি, তাতে আমার অধিকার, অপরের তাতে কথা কইবার কি আছে। যাও ঘরে যাও।"

কনক দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি যাব না, আমি যাব না। আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না। এ ঘরও আমার ঘর।"

মৃণাল বিস্মিত হইল। ক্ষণ পরে বলিল, "কি হয়েছে যে তুমি এমন করছ?"

কনক বলিল, "কিছু হয় নি। তুমি কি সত্যই আমায় এত ঘৃণা কর?"

"ঘৃণা করি?"

"না করলে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছ কেন? এই বুঝি আমায় ভাল বাসা? চল, আমার ঘরে চল, আজ তোমায় একলা থাকতে দেব না।" কনক এই কথা বলিয়া সত্যই মৃণালের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। মৃণাল উত্তরোত্তর বিস্মিত হইয়া যন্ত্র চালিতের মত চলিতে লাগিল। আপনার বসিবার ঘরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া কনক স্বামীকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া নিজে তাহার স্কন্ধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার নয়ন অনার্দ্র ছিল না। স্বামীর মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তুমি আমায় ভাল বাসতে শেখাও নি কেন? ভালবাসায় কি সর্ত্ত করতে আছে? বল, শেখাবে?"

মৃণাল বলিল, "আমি তোমার জন্তে মরতে পারি, তোমার কথা শুনবো না?"

"তাই কি আমার সুখ হবে মনে করে নিজের প্রাণ বলি দিতে গিয়েছিলে? আমি কি এতই পাষাণী?"

কনক ঝরঝর ধারে কাঁদিয়া ফেলিল। মৃণালকান্তি তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া বালকের মত কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

কনক প্রথমে প্রকৃতিস্থ হইল, বলিল, "ছিঃ ছিঃ তুমি পুরুষ-মানুষ, তুমি আমায় ভালবাসতে শেখালে দু'জনে এত কাঁদিতে হ'ত না।"

মৃণাল এইবার মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি ত সুযোগ দাও নি।"

কনক হাসিয়া বলিল, "তবে তোমার কেমন ভালবাসা, যে ভালবাসায় এ সুযোগ খুঁজে নিতে না পারে, তার মূল্য কি? যাক, যা হবার হয়ে গেছে, এইবার ত সন্ধিক্ষণ এসেছে, এখন শেখাও।"

মৃণাল এইবার তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া হাসিকান্নার মাঝে বলিল, "বল, প্রবোধ তোমার কেউ না।"

কনক জবাব দিল, "কেউ না কেন, সে আমার ভাই। তবে পাগল ভাই বটে। এই দেখ তার পত্র।"

মৃণাল আশ্চর্য্যে বলিল, "একি! পত্র যেমন তেমনই রয়েছে, খোল নি?"

কনক তাহার কণ্ঠলগ্না হইয়া বলিল, "দরকার হয় নি।"

মৃণাল পত্রখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া বলিল, "তবে সকল অনর্থের মূলকে রেখে কাজ কি?

কনক গম্ভীরভাবে বলিল, "ওখানা অনর্থের মূল নয়, ওখানা আমার শুভ সন্ধিক্ষণ এনে দেবার মূল।"

তোমায় আর বেশী ক'রে পেতে চাই না আমি—অন্ততঃ আশা কর্‌বার জন্যও কিছু থাক্।

"প্রতিভার স্বপ্ন"

ঝরাফুল

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কালকের রাতটা যেন কালরাত্রির মত চোখের ওপর দিয়ে কেটে গেছে!...

ভোরবেলা মাণিক আমার একবার শুধু চোখ মেলে চেয়েছিল—তারপর আবার স্থির হ'য়ে পড়েছে! আজ দশদিন ধরে যাদু আমার মা বলে ডাকেনি আমায়! বুকের ভেতরে যেন একটা প্রলয়ের ঝড় বইছে!—চোখের সাম্‌নে পৃথিবীটা যেন ক্রমাগতই ঘুর্‌ছে—আর যে পারি না গো!...

সকাল হ'লে উনি বল্‌লেন—মাথায় আইস্‌ ব্যাগ'টা ভাল ক'রে চেপে ধরে থেকো—আমি ডাক্তার আন্‌তে চল্‌লুম—

আমি কেঁদে বল্‌লুম—ওগো, ও ডাক্তারে হবেনা, একজন ভাল ডাক্তারকে নিয়ে এস আজ দশদিন যে বাছা আমার কথা কয়নি।

উনি বল্‌লেন—ছিঃ মুকুল! ও রকম অধীর হ'লে চল্‌বে কেন? বিপদের সময় সাহস হারালে চলে কি?

—ওগো, অধীর কি সাধে হয়েছি? বুক যে ভেঙ্গে পড়্‌ছে! যে খোকা আমার একদণ্ড চুপ ক'রে থাকে না, দুরন্তপনায় সমস্ত ঘরদোর ছেয়ে ফেলে সে আজ দশদিন কথা বলেনি! আমি কি ক'রে ধৈর্য্য ধরে থাকি?

—ওগো ঠাকুর! ওগো আমার অন্তরের দেবতা। তোমাকে ত আমি একদিনও ডাক্‌তে ভুলিনি! তবে কেন তুমি, আমার অন্ধের যষ্ঠি, বুকের পাঁজ্‌রা আঁধার ঘরের সল্‌তেটুকুকে কেড়ে নিচ্ছ মার বুক থেকে? কি সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা তোমার ঠাকুর! এইটুকু প্রাণ নিয়ে তোমার কতখানি ক্ষুধা মিট্‌বে? যে দয়া দেখিয়ে একদিন তুমি এই শিশুকে আমার কোলে সঁপে দিয়েছিলে, আজ কোথায় গেল তোমার সে দয়া? আমি ত চাইনি। তুমিই ত নিজহ'তে দিয়েছিলে। তবে আবার ফিরিয়ে নেবার এত আগ্রহ কেন তোমার ভগবান্‌!

—আইস্‌ ব্যাগটা মাথায় চেপে ধরে আছি কিন্তু হাতটা যেন অবশ হ'য়ে আসছে। মনে হ'চ্ছে বুঝি আর ধরে রাখ্‌তে পারব না। চোখের সাম্‌নে

কালো আঁধারে পুঞ্জীভূত হ'য়ে আসছে যেন জগতের সব আলো আমার চোখে একেবারে নিভে গেছে। ওই অনন্ত আঁধারের অসীমতার দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস আমার বন্ধ হ'য়ে আসছে।

—ভুল! ভুল! পাষাণ দেবতার প্রাণে মমতার লেশমাত্র নেই রে, নেই!

সাহেব ডাক্তারকে নিয়ে এলেন উনি। কোল থেকে আস্তে খোকাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমি একপাশে সরে গেলুম।

খোকাকে দেখে ওষুধ লিখে দিয়ে ডাক্তার আস্তে আস্তে উঠে গেল। কই, কিছু বললে না ত? মুখখানা অত গম্ভীর কেন? তবে—তবে কি? থাকতে না পেরে চীৎকার ক'রে উঠলুম—ডাক্তারবাবু খোকা আমার বাঁচবে ত?

উনি ধমক্ দিয়ে উঠলেন—কি ছেলেমানুষী কর! অসুখ কি আর কারু হয় না?—বলে তিনি ভিজিট নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি কেঁদে ফেলছিলুম কিন্তু অমঙ্গল আশঙ্কায় চোখের জল মুছে ফেললুম। উঃ পুরুষের প্রাণ কি কঠিন! ওগো, তোমারই ত বুকে ক'রে মানুষ-করা ঐ একরত্তি প্রাণটুকু। তবে কেন এত অবহেলা, নিষ্ঠুর!...

দিনটা কোথা দিয়ে কেটে গেল, কিছু বুঝতে পারলুম না। আবার সেই কালরাত্রি! কি ক'রে কাটবে গো?

উঃ! বেড়ালটা কি বিশ্রী করুণস্বরে ডাকছে! ছাতের ওপর দিয়ে কালপেঁচাটাও ডেকে গেল! ওরে হতভাগারা, তোরাও কি আমাকে জবাই না ক'রে ছাড়বি না!

কি মুষলধারে বৃষ্টিটাই না নেমেছে! আকাশখানা বুঝি ভেঙ্গে পড়বে এইবারে! প্রলয়-রোলে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা চলেছে বাইরে! রাত্তিরটা কাটেও না রে!

সেই শেষবার ডাক্তার এসে মুখকালো ক'রে চলে গেল! তিনি তখন যেন ব্যস্তভাবে খোকাকে আমার কোল থেকে নিজের কোলে নিতে চাইলেন!

কেন গো কেন?

চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন উনি।

চলে গেছে? খোকা, যাদু, মাণিক, ধন রে আমার। মার বুক খালি ক'রে চলে গেলি? এই আঁধার রাতে, এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় ক'রে চলে গেলি? ক্ষুদ্র শিশুকে মার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার আর কি দিন পেলে না ঠাকুর! না—আমি যেতে দেব না গো দেব না!...

দিদি

—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল।

১

স্নেহের আবেগে ছোট ভাইটিকে সহস্র চুম্বন দিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মানসী, কক্ষের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল—ভোগ-বিলাসের কি সুন্দর বিবিধ সামগ্রী, সকল স্থানে কি সুন্দর অর্থের চাকচিক্য। বিদ্রূপ উপহাসের তিক্ত হাস্য মানসীর মুখে ফুটিয়া উঠিল। জীবনের সব সুখ বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্ণকিরণোজ্জ্বল বাসন্তী প্রভাতে পিকবধূর আকুল চীৎকারে প্রাণের সাড়া ভুলিয়া সে অর্থের প্রাচুর্য্যের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছে! . . . কিন্তু এ তৃপ্তি, না উৎকট গোপন ব্যথা? . . . এ শান্তি না প্রলয়ের প্রভঞ্জন তার অন্তর মধ্যে লুক্কায়িত? . . .

"মণ্টু, কেন আমায় এত স্নেহে বেঁধেছিস্ রে?"

জমাট অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিল। মানসী বুকে রাখিয়া মণ্টুকে চুম্বন করিয়া তাহার দিকে চাহিল। পিতৃ-মাতৃহারা অনাথ বালক, জগতের শ্রেষ্ঠ ধন হইতে বঞ্চিত। প্রকৃতির দুর্য্যোগের মধ্যে এতদিন কোথায় হারাইয়া যাইত। সেই না কত আদরে, আপনার বুকের কত স্নেহ দিয়া তাহাকে জীবন দিয়া তুলিয়াছে? গেলই বা তার জীবনের সব সুখ শান্তি হ'লই বা তা পথপানে চাওয়া উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের অশ্রু-ভাঙ্গা করুণ কাহিনী, সে যে আপন ভোলা হয়ে আপনার হৃদয়ের সব টুকু স্নেহ নিঃশেষে ভাইটির উপর ঢালিয়া দিয়াছে। . . .

ওই ত ঘন ঘটাচ্ছন্ন জীবণটা তার অন্ধকারে অনন্ত যাত্রার উদ্দেশ্যে ব'য়ে-যাওয়া নদীর মত ভীষণতর। পারিবে কি সে? হাঁ পারিবে, একটানা স্রোতের মত তার শ্রান্ত জীবনটা একঘেয়ে ভাবে বহিয়া যাইবে। . . . নিবিড় আঁধারে সুপ্ত জগতটার বুক চিরে পড়া উল্কার মত সে অন্য কোনও আলোক দেখিতে চায় না। . . . সে তা সহ্য করিতে পারিবে না। . . .

২

মানসী—'

মধুর ডাক। মানসী ফিরিল। কিন্তু তার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি আনত

হইয়া আসিল।—হাঁ এঁরই দয়ার করুণায় আজ সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে প্রাসাদের বুকে বসিয়া রহিয়াছে!

'কি বলুন, বিমল বাবু?'

বিমল মদ্য পানের ঘোরে টলিতেছিল বলিল, হাঁ বলছি, জানত মানসী তোমায় আমি কি বলেছি?

মানসী বাহিরের পানে চাহিল। আরক্ত মেঘখণ্ডগুলির সৌন্দর্য্য গ্রাস করিবার জন্য সন্ধ্যার আঁধার ছুটিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যাতারাটি আকাশ প্রান্তে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে!

কি উত্তর দিবে সে? অনাথিনী, আশ্রিতার ভালবাসা! সে ত ব্যভিচার! . . . শুষ্ক মরুময় জীবনটায় কেন আজ এ অযাচিত স্নিগ্ধ অনুভূতি? না, না,—সে প্রাসাদবাসের গৌরব প্রাপ্ত হ'য়ে কাঙ্গালিনীর লব্ধ ধনের মত, তীব্র আনন্দে এ ভাবে নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া কর্ত্তৃত্বাধিকার লইতে পারিবে না। জগতের চক্ষে অতি হেয়, অর্থপিপাসিনী, ব্যভিচারিণী প্রতিপন্ন হইবে না। যাক্ তার এই প্রস্ফুট যৌবন অকালে শুকিয়ে, সে মনের কোণে গোপনে বসিয়া ঈপ্সিতকে ভালবাসিবে—সেই ভাল!

'আপনি আমাকে খুব দয়া করেন—'

'দয়া? সেই এক নীরস মামুলী কথা বলে আমায় সন্তুষ্ট করতে চাও মানসী? আর কিছু কি আশা করতে পারি না?"

সমস্ত দুর্ব্বলতা চাপিয়া মানসী বলিল 'আপনি আশ্রয় না দিলে আজ আমি মণ্টুকে বাঁচাতে পারতাম না—'

জড়িত কণ্ঠে বিমল বলিল 'সেই কৃতজ্ঞতা! এ ভাবে বার বার তাড়িয়েছ, সেই প্রত্যাখানের আগুন নিবাবার জন্যে আমি মাতাল হয়েছি—'

'ও খেয়ে শরীর খারাপ করবেন না, বিমল বাবু।'

দরজাটায় হেলান দিয়া বিমল বলিল, 'মাতাল আমি। সব বিষয়ে বিস্মৃতি এনেছি মদ খেয়ে।—হ্যাঁ, তারপর, তুমি কি এইভাবে তিলে তিলে তোমার জীবনটা নষ্ট করতে চাও? না আমায়, আচ্ছা চল্লাম।'

'দিদি!'—

আহা, কি স্নিগ্ধ প্রশান্ত চক্ষু দুটি, মণ্টুর। মানসীর চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িল। হঁ, একেই সে চিরদিন বুকে করিয়া বেড়াইবে। কোনও দুর্ব্বলতা সে গ্রাহ্য করিবে না। এই নিঃসঙ্গ জগতে সে যে দিদিকেই চেনে।

সে যে দিদিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আপনার জীবনটার একটা অবলম্বন করিয়া লইতে চায়!

৩

বিছানায় পড়িয়া বিমল ছট্‌ ফট্‌ করিতেছিল। অন্তরের প্রবল বহ্নি প্রত্যাখ্যানের তীব্র হলাহল সে আজ সুরাপানে শীতল করিবার প্রয়াস পাইতেছে। প্রথম রঙ্গিন যৌবনে প্রাণের আবেগে হৃদয়ের সহিত তাহাকে ভালবাসিতে গিয়াছিল। মরুভূমির মত তার হৃদয়টা শুষ্ক, নীরস। পাষাণ প্রাচীরের মত দুর্ভেদ্য তার অন্তরের কাঠিণ্যের আবরণে প্রতিহত হ'য়ে সে বার বার ফিরিয়া আসিয়াছে।

'বিমল'—

'কে ডাক্তার বাবু, আসুন— ।'

'কেমন আছ?—'

'—বুকের ভেতর বড় ব্যথা,—ডাক্তার বাবু!'

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিল,—'অনেক দিন ওষুধ খেতে হবে হে বিমল'—মদ খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিতে হবে।

ক্ষীণ হাসি বিমলের মুখে ফুটিয়া উঠিল মাত্র।

প্রকৃতির দেহখানাকে অসাড় করিয়া হিম-শীতল বায়ু বহিতেছিল। বিমলের গৃহের রুদ্ধদ্বারের ফাঁকের মধ্য দিয়া বায়ু আসিয়া তীক্ষ্ণ সূচীর মত গাত্রে বিদ্ধ হইতেছিল।

সে ছিল অঘোর, অচৈতন্য, স্পন্দহীন, নির্ব্বাক।. . . . চক্ষু দিয়া মাঝে মাঝে টস্‌ টস্‌ করিয়া জল গড়াইয়া উপাধান সিক্ত করিতেছিল।. . .

'কেমন আছেন, বিমল বাবু?—'

বিমল চাহিল। ভাষাহীন, প্রশান্ত দৃষ্টি তার!

উতপ্ত ললাটে হাত দিয়া মানসী বলিল, 'জ্বরটা যা বেড়েছিল, তার চেয়ে কমে আসচে।

রুদ্ধকণ্ঠে বিকৃত স্বরে বিমল বলিল, 'ওঃ' মানসীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল ফুঁপাইয়া বলিল, 'আমরা কার কাছে থাকব, বিমল বাবু?' বিমল ম্লান হাসিয়া বলিল, 'কেন, কেন,—অর্থ অনেক অর্থ রেখে যাচ্ছি মণ্টুর নামে।

বিমলের মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া মানসী বলিল, 'কেমন করে তোমায় ছেড়ে থাকব?. . . আমি যে তোমার—

বিমল ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে আজ আবার একি শুনে যাচ্ছি, মানসী?

মানসী বিমলের বুকের উপর পড়িয়া বলিল, 'ওগো, তোমায় খুব—খুব ভালবাসি।'

'দিদি—'

অর্দ্ধ মুর্চ্ছিতা মানসী চাহিল। এই স্নেহের ডাকটির জন্য আজ তার সবশেষ হইয়া গেল। কোলে লইয়া চুম্বন করিয়া মানসী বলিল, 'উঃ, ডাক, আবার ডাক্ রে মণ্টু।'

ভীত চকিত মন্টু ডাকিল, 'দিদি—'

মানুষ যখন আনন্দের সন্ধান পায় তখন তার পর হয় আপন, দূর হয় নিকট, প্রাণ হয় তুচ্ছ, ক্লেশ হয় বরনীয়। যৌবনের ধর্ম্মই আনন্দের অন্বেষণ।

"উৎসব"



পান্থবীণা

—শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৫

দিন দুই পরে, সেদিন অপরাহ্ণ-বেলায় বিভা তাহার ছেলে-মেয়েগুলকে নূতন পোষাক পরাইয়া একটি ছোট টিনের বাক্সের মধ্যে ধীরে ধীরে শোয়াইয়া রাখিতেছিল। বেড়াইতে যাইবে বলিয়া গাড়ী আনিবার হুকুম দিয়া নিভা সেই ঘরের খোলা জানালাটার পাশে গিয়া চুপ করিয়া বসিল।

বিভা বলিল, আজ ত গায়ে-হলুদ হ'য়ে গেল দিদি, কাল আমার মেয়ের বিয়ে। তুমি তাকে কি দেবে বল? একটা গয়না দিও, কেমন?

আচ্ছা, তাই দেব। তুই আমার সঙ্গে যাবি ত ওদের তুলে রাখ— গাড়ী আন্‌তে বলেছি। বলিয়া নিভা বাহিরের রাস্তার পানে তাকাইয়া রহিল।

বিভা কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, নিভা সহসা চেয়ার হইতে উঠিয়া ডাকিল, কৈলাস—

অমরেশের ঘর হইতে কৈলাস উত্তর দিল, যাই দিদিমণি।

কৈলাস কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই নিভা বলিল, চাক্‌রী পথে-ঘাটে পড়ে থাকে না কৈলাস? ওই দেখ, বিশ্বনাথ আবার ফিরে আসছে!—এই বলিয়া নিভা রাস্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

কিন্তু কৈলাস যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখান হইতে রাস্তা পর্য্যন্ত নজর চলিতেছিল না, তথাপি সে বলিয়া উঠিল, সে কথা ত আগেই বলেছি, দিদিমণি, আজকালকার বাজার—

নিভা বলিল, আচ্ছা যাও, বিশ্বনাথকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও গে। এখান ভিন্ন আর গতি নেই, তা আমি জানি।

কৈলাস নিচে নামিয়া গেল এবং পরক্ষণেই বিশ্বনাথকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

নিভা বলিল, নিজের একটা চাকরী জোটাতে পারে না, এই ত তার মুরোদ,—সে দেবে তোমার চাকরী জুটিয়ে! কেন মিছে তবে তার খোসা-মোদি করতে গেলে ঠাকুর?—যাও, আর কখ্খনো ওরকম খারাপ রান্না করো না।

বিশ্বনাথ দরজার নিকট দাঁড়াইয়াছিল, নিভার কথাগুলা ভাল বুঝিতে না পারিয়াই বোধ করি সে একবার কৈলাসের মুখের পানে তাকাইল।

কৈলাস হাসিতে হাসিতে তাহাকে বুঝাইয়া দিল, দিদিমণির রাগ ত তুমি জানো বিশ্বনাথ, তবে তুমি কেন সেদিন চলে গেলে?

এইবার বিশ্বনাথ কহিল, আমার কাজ ত বংশীবাবু ক'রে দিয়েছেন; আমি ত আজ দুদিন সেইখানেই রাঁধ্‌ছি দিদিমণি।

কথাটা শুনিয়া নিভা যেন একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গেল, কিন্তু অন্তরের সে-ভাবটা বাহিরে গোপন করিয়া সে বলিয়া উঠিল, তবে কি জন্যে মরতে এসেছ এখানে? কৈলাসের সঙ্গে গাঁজা টানতে?

কৈলাস লজ্জায় মরিয়া গেল। বিশ্বনাথ বলিল, আজ্ঞে না, এখানে আমার একখানা ধুতি ফেলে গেছি, সেইটে নিতে—

নিভা তাহাকে কথাটা শেষ করিতে দিল না। বলিল, যাও তবে মরতে আর কোন দিন এবাড়ীর দরজা মাড়িয়ো না।

সিঁড়ি দিয়া তাহারা নিচে নামিয়া যাইতেছিল, সহসা নিভার ডাক শুনিয়া বিশ্বনাথ ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরিয়া বলিল, আমায় ডাকছেন দিদিমণি?

হাঁ ডাক্‌ছি, শোনো।

বিশ্বনাথ দরজার চৌকাঠের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। নিভা বলিল, ভিতরে পেরিয়ে এসো।

সে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে নিভা জিজ্ঞাসা করিল, বংশীবাবু কি সেই রাত্রেই তোমার চাকরী করে দিলেন?

না দিদিমণি, সে রাত্রে আমি তাঁর বাড়ীতেই ছিলুম, তার পরের দিন সকালে একটা মেসে আমায় রেখে দিয়ে এলেন।

নিভা একটুখানি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, তাঁর বাড়ীতে ছিলে? বাড়ী ঘর-দোর কেমন? থাক্‌বার জায়গা ছিল ত?

বিশ্বনাথ বলিল, তাঁরা বড় গরীব দিদিমণি, কিন্তু আহা, বুড়ো বাবাও তাঁর যেমন ভাল লোক, দিদিটিও তেম্‌নি। আমায় যে কোথায় রাখ্‌বেন, কি খেতে দেবেন, এই নিয়ে তাঁরা সবাই মিলে একেবারে যেন পাগল হয়ে উঠ্‌লেন। বংশীবাবুর বাবাকে দেখ্‌লে, তাঁর কথাবার্ত্তা শুন্‌লে, সব ভুলে যেতে হয় দিদিমণি! তিনি ত আমায় নিজের শোবার বিছানাটাই ছেড়ে দিতে চাইলেন। আমি বললাম, সে কি কথা বাবা, আমি যে ভাত রেঁধে খাই, রাঁধুনী বামুন! তিনি কিছুতেই শুন্‌বেন না, বল্‌তে লাগ্‌লেন, অতিথি যে জাতিই হোক্‌, তার সেবাই আমাদের ধর্ম্ম।

অনেক রাত পর্য্যন্ত আমাকে পুরাণের গল্প, মহাভারত, এই সব পড়ে শোনালেন। তাঁর একটু মাথা গরমের ছিট্‌ আছে বটে, কিন্তু এমন লোক আমি আর কখন দেখিনি দিদিমণি!

নিভা বলিল, আচ্ছা দেখনি বেশ করেছ। কিন্তু আমি যে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছি, বংশীবাবু তাঁর বাড়ীতে কি সে কথাও বল্‌লেন নাকি?

কই না, সে কথা ত বল্‌তে শুনিনি। আর, তাড়ানোর কথা কেন বল্‌ছেন দিদিমণি? দোষ অপরাধ কর্‌লে মনিবে রাগ ক'রে দুটো কথা বলে না ত কে বলে? আপনার কাছে যেমন সুখে ছিলাম, এমন কি আর কোথাও থাক্‌বো, না এমন কপাল আর হবে? আমিও তাই আপনার কথাই সেদিন পরিচয় দিচ্ছিলাম বংশীবাবুকে।

নিভা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আমার কথা কি পরিচয় দিচ্ছিলে ঠাকুর?

বিশ্বনাথ বলিল, সে আর কত বলব দিদিমণি, আপনার গাল-মন্দ যেমন খেয়েছি, আদর যত্নও তেম্‌নি পেয়েছি। সেই সে দিনের কথাটাই বলছিলাম। বলি, এমনটি কে করে বলুন ত বংশীবাবু, কোথাকার কোন্‌ রাঁধুনী বামুন শীতের রাতে ঠাণ্ডায় ঘুমিয়ে পড়্‌লে নিজের গায়ের দামী আলোয়ান তার গায়ে

জড়িয়ে দিয়ে যায়? আপনার সে কাজটি ত কোন দিন মরে গেলেও ভুলতে পারবো না দিদিমনি।

তাই বুঝি বংশীবাবুর কাছে বলা হয়েছে?

শুধু বংশীবাবু কেন দিদি, সে কথা যে আমি সবাইকার কাছে বলে বেড়াই।

নিভা এতক্ষণে তাহাকে বিদায় দিয়া বলিল, আচ্ছা যাও। চাকুরী গেলে আবার এসো।

বল্‌লেও আস্‌ব, না বল্‌লেও আস্‌ব। বলিয়া খুসীমনে হাসিতে হাসিতে বিশ্বনাথ চলিয়া গেল।

নিভা এইবার একদৃষ্টে তাকাইয়া বিভার পুতুল সাজানো দেখিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ীর ঘন্টার শব্দে সচকিত হইয়া দেখিল, দরজায় তাহাদের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ রে বিভা, কাল তোর মেয়ের বিয়ে, কাউকে খেতে বলবি নে?

কথাটা তাহার মনে ছিল না। হ্যাঁ, বল্‌বো। বলিয়া বিভা মুখ তুলিয়া দিদির মুখের পানে তাকাইল।

কাকে বলবি?

এইবার সে বিপদে পড়িল। কাহাকে বলিবে না-বলিবে তাহা সে জানিত না। সুতরাং নিভাকেও সে ঠিক সেই প্রশ্নই করিয়া বসিল। বলিল, তুমিই বলে দাও না দিদি, কাকে বল্‌বো?

নিভা চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, যা, তবে তোর বংশীদাদাকেই বলে আয়। দরজায় গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে,—যা শীগ্‌গীর যা, আর দেরী করিস্ নে।

চলো তবে। বলিয়া বিভা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার জুতাজোড়াটা পায়ে দিতে লাগিল।

নিভা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, দূর পাগ্‌লী! আমি কেন যাব? দাদাকে সঙ্গে নিয়ে তুই নিজেই যা!

বেশ। তুমি আমার পুতুলগুলো তুলে রেখে দাও দিদি। বলিয়া বিভা ছুটিতে ছুটিতে অমরেশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অমরেশ নিবিষ্ট মনে তখন একখানা ছবি শেষ করিতেছিল, বিভার এই প্রস্তাব তাহার মন্দ লাগিল না। এই ছুতা লইয়া বংশীর সঙ্গ লাভ করিবার

আনন্দে সেও যেন বিভার মত নিমেষেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। চেয়ার ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিল, চল্ কিন্তু সে আস্‌বে ত?

খুব আস্‌বে। বলিয়া আনন্দাতিশয্যে একেবারে অধীর হইয়া বিভা তাহাকে একপ্রকার টানিতে টানিতে বাহিরে লইয়া আসিল।

যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অমরেশ মার্বেল-বারান্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, নিভা তাহার ঘরের জানালার নিকট চুপ করিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছে। দরজার নিকট অগ্রসর হইয়া অমরেশ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, বিভার আব্দারটা শুনেচিস্ নিভা?

অনর্থক দেরী হইতেছে ভাবিয়া বিভা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। অমরেশের একখানা হাত ধরিয়া সে টানিতে টানিতে বলিল, এসো দাদা, তুমি আর দেরী করো না। দিদিমণি সব জানে,—ওই তো আমায় শিখিয়ে দিলে।

কথাটা শুনিয়া নিভার চোখ-মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কোন রকমে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া নিভা কহিল, মেয়ের কথা শোনো! আমি বুঝি শিখিয়ে দিলাম? আচ্ছা, কে তোর বেঁধে দেয় তাই আমি দেখ্‌বো।

বেশ, বেশ, দিও না। বলিয়া বিভা অমরেশকে আবার টানিতে লাগিল।

অমরেশ চলিয়া যাইতেছিল, নিভা বলিল, শুনেছো দাদা, তোমার বন্ধু সেদিন বিশ্বনাথকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে একটা চাক্‌রী করে দিয়েচেন। তাকে বলো, সে যেন আমাদের একটা রাঁধুনী-বামুন ঠিক করে দিয়ে যায়। আমি আর রাঁধ্‌তে পারবো না বলে দিচ্ছি।

অমরেশ হাসিতে হাসিতে কহিল, এখন আর সে কথা বল্‌লে কি হবে নিভা, তুই তো নিজেই বিশ্বনাথকে তাড়িয়েছিস্!

হ্যাঁ তাড়িয়েছি! তাই বলে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার এত বাহাদুরী নেবার কি দরকার ছিল? চাকরী না পেলে তাকে আবার এইখানেই ফিরে আস্‌তে হ'ত। তা জানো?

ঠাকুরের ভাবনা কি ভাই, আর একটা ডেকে আন্‌লেই হবে।—চল্ বিভা, সে বেরিয়ে গেলে আর দেখা হবে না। এই বলিয়া অমরেশ বিভার পিঠে হাত দিয়া চলিবার ইঙ্গিত করিল।

নিভা বলিল, হাঁ, তাই বই কি! ততদিন আমার কর্ম্মভোগ চলুক!

কিন্তু অমরেশ সে কথাটা শুনিতে পাইল না। সে তখন বিভার হাত ধরিয়া নিচে নামিয়া গিয়াছে।

গাড়ীতে উঠিয়া বিভা তাহার দাদাকে বংশী সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব অনেক প্রশ্নই করিতে লাগিল। অমরেশ দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়া অবশেষে কহিল, একা তোর বংশীদাদাকে নিমন্ত্রণ করলেই ত চলবে না বিভা, এই সঙ্গে তার বাড়ীশুদ্ধ সকলকেই বলিস্, বুঝ্লি?

বিভা বলিল, বংশীদাদার বাড়ীতে আর কে কে আছে দাদা?

তার দিদি আছেন, বাবা আছেন।

বিভা প্রশ্ন করিল, আর কেউ নেই? ভাই? বোন?

অমরেশ কহিল, না।

দেখিতে দেখিতে অমরেশের নির্দ্দেশমত তাহার গাড়ীখানা বংশীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। অমরেশ ভাবিয়াছিল, আজিও হয়ত বাহির হইতে ডাকাডাকি করিয়া তাহার বদ্ধ-দরজার খিল খোলাইতে হইবে, কিন্তু সদর দরজাটা খোলা দেখিয়া সে যেন একটুখানি আশ্বস্ত হইল। বিভার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে রাস্তায় আসিয়া নামিতেই ঘরের ভিতর হইতে কাহার যেন একটা তীব্র কর্কশকণ্ঠ অমরেশের কানে আসিয়া বাজিল। কিছুই ঠাহর করিতে না পারিয়া অমরেশ সেই উন্মুক্ত দরজার নিকট হইতে ডাকিল, বংশী—

ডাক শুনিয়া ঘরের ভিতর হইতে গায়ত্রী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, সম্মুখে অমরেশকে দেখিয়া সলজ্জ বিনয়ের সহিত কহিল, আসুন!

দাদার আদেশমত বিভা গায়ত্রীর কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই অমরেশ কহিল, এ আমার ছোট বোন—বিভা। বংশী কি আজও কোথাও বেরিয়ে গেছে?

গায়ত্রী বলিল, কাল থেকে একটি ছেলেকে সে প্রাইভেট পড়াচ্ছে, সন্ধ্যার পরেই ফিরবে।

সহসা সম্মুখের বারান্দার উপর অমরেশের নজর পড়িতেই সে দেখিল, রত্নেশ্বরের সহিত কে একটা লোক কথা কহিতেছে। সম্ভবতঃ তাহারই গলার আওয়াজ বাহির হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল; কিন্তু তাহার সে তীক্ষ্ণ কর্কশকণ্ঠ উহারই মধ্যে কোন্ সময় যে এত শান্ত সংযত হইয়া উঠিল অমরেশ তাহা বুঝিতে পারিল না। সে ব্যক্তিটি যে কে এবং কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছে সে সব কোন কথাই গায়ত্রীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অমরেশ ধীরে ধীরে বারান্দার উপর উঠিয়া গেল। এবং রত্নেশ্বরের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তিনি অমরেশের মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ

তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, এসো, এসো বাবা হাঁ চিনেছি, চিনেছি,—তুমিই না সেদিন এসেছিলে? সেই পরমেশ না কি তোমার নামটি বাবা?

আজ্ঞে হাঁ, অমরেশ। বলিয়া সে তক্তার একপাশে বসিয়া বলিল, আপনার শরীর এখন বেশ ভাল আছে ত?

হাঁ বাবা, ভগবান যেমন রেখেছেন তেম্‌নি আছে। আচ্ছা বাবা অমরেশ, কই তুমিই বল ত বাবা, যারা গরীব-দুঃখী মানুষ, তাদের কষ্ট দেওয়া কি ভাল? ত্রিশটা বছর এইখানেই কাটালাম, আর কয়টা দিনই বা বাঁচ্‌বো বাবা?—এই বলিয়া রত্নেশ্বর তাঁহার অভ্যাসমত অন্যমনস্ক হইয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিলেন।

কথাটা বেশ স্পষ্ট না হইলেও তাহার উত্তরে অমরেশ কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ভদ্রলোকের চীৎকারে তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। অমরেশের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, আপনি ত ছেলেমানুষ, আপনি আমায় কি বুঝিয়ে বল্‌বেন মশাই? ঢের ঢের লোক দেখেছি বাবা, এমন ভাড়াটে ত কখনও পাইনি!

লোকটা যে এই বাড়ীর মালিক, অমরেশ তাহা বুঝিতে পারিল। কথাটা একটুখানি খারাপ শোনাইবে জানিয়াও সে না বলিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, ছেলেমানুষ হলেও এই কলকাতা সহরে এমন অনেকগুলো বাড়ী ভাড়া আমাকেও আদায় কর্‌তে হয়,—দু' তিনটে জমিদারীও চালাতে হয়।—আপনি কি বল্‌তে চান, বেশ ভাল করে বলুন দেখি,—বাইরে থেকেও ত আপনার গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

পাবেন না মশাই? রোজ রোজ আসি আর ফিরে যাই, আমি শালা যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছি। তিন তিন মাসের ভাড়া বাকী,—সেই বংশী ছোক্‌রা বলে, আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি, আর এই বুড়ো, তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, পাওনাদার এলেই ইনি তো পাগল সেজে বসে থাকেন! এ মাস থেকে আর পঁচিশ টাকায় চল্‌বে না, ত্রিশ টাকা ক'রে ভাড়া দিতে পারেন ভালোই,—না পারেন, উঠে যান্‌। আমি কালই এবাড়ী অন্য লোককে বন্দোবস্ত করব।—যাক্‌ আমি আর চেঁচাতে পারি না,—তিন পঁচিশে পঁচাত্তর টাকা, দিন্‌ আমার ভাড়া মিটিয়ে দিন্‌। আজ আর আমি এক পয়সা বাকী রাখ্‌বো না।

এই বলিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রত্নেশ্বরের সুমুখে সে তাহার একখানা হাত বাড়াইয়া দিল।

তাহার সেই বিস্তৃত হাতখানা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া সেথান হইতে তুলিয়া দিয়া অমরেশ কহিল, খুব হয়েছে, ভদ্রলোকের বাড়ীর ভিতর ঢুকে আর বেশী গোলমাল করবেন না। আসুন, আপনার ভাড়া আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।

এমন সময় রান্নাঘর হইতে বিভা ডাকিল, দাদা, এখানে একবার এসো।

যাই। বলিয়া অমরেশ তাহার হস্তধৃত ব্যক্তিটিকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া গিয়া বাহিরে তাহার গাড়ীর ভিতর বসাইয়া দিয়া বলিল, এইখানে আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

অমরেশ রান্নাঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই ভিতর হইতে গায়ত্রী বলিল, টাকা আপনি ওকে দেবেন না, বংশী টাকা আনতে গেছে।

টাকা সে কোথায় পাবে? শুধু হাতে কে তাকে টাকা দেবে?

গায়ত্রী বলিল, শুধু হাতে নয়। পঁচিশটা টাকা দেবার মত জিনিস আমি তার সঙ্গে দিয়েছি, বাকী পঞ্চাশটা টাকা আমার কাছেই আছে। বাড়ী ভাড়ার টাকা আমি মাসে মাসে ঠিক করেই রাখি, কিন্তু উনি ঠিক সময় মত টাকা কখখন নিতে আসেন না। কলকাতাতেও থাকেন না যে, মাসের পর মাস টাকাটা বংশী তাঁর বাড়ী গিয়ে দিয়ে আসবে, সেইজন্যেই আমাদের বড় বিপদে পড়তে হয়।

তা হোক, টাকা আপনি রেখে দেবেন, অনেক সময় কাজে লাগবে। বলিয়া অমরেশ আর সেখানে মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, বিভা আবার ডাকিল, দাদা!

অমরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তুই দিদির কাছে থাক। আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। বংশীকে সঙ্গে নিয়ে যাস্—কিছুতেই ছাড়িস্ নে। আর, আপনি জানেন দিদি, ও আজ এখানে কি জন্যে এসেছে?

গায়ত্রী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, জানি।

বিভা বলিল, দাদা, চা খাও।

ঘরে দুধ ছিল না; যেটুকু ছিল, বৈকালে বংশীকে চা করিয়া দিয়াছে, তাই অমরেশকে ডাকিতে বলিয়া এবং চায়ের বাটিতে চা ঢালিয়াও গায়ত্রী অনেক ক্ষণ হইতে সেটা নাড়াচাড়া করিতেছিল,—দুধ-না-দেওয়া এই চা-টুকু তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিতে লজ্জায় তাহার মাথা যেন কাটা যাইতে লাগিল। বিভার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, এ চা আপনি খেতে পারবেন না। বাড়ীতে এমন কিছুই নেই যে,—

দুঃখে লজ্জায় গায়ত্রী মুখের কথাটা আর শেষ করিতে পরিল না।

অমরেশ তাহা বুঝিতে পারিয়াই বোধ করি নিজের হাতেই চায়ের বাটিটা তুলিয়া লইয়া বলিল, আপনার এই 'র'-চা, বেয়ারার হাতে তৈরী চায়ের চেয়ে অনেক ভালো।

চা খাইয়া অমরেশ চলিয়া গেল। ঘণ্টা বাজাইয়া কোচ্‌ম্যান্‌ গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গায়ত্রী চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া ধরিয়া অন্ধকার ঘরে, উনানের আগুনের শিখায় দেখিল, সমস্ত চাটুকু সে নিঃশেষে পান করিয়া গিয়াছে. এক বিন্দুও অবশিষ্ট রাখিয়া যায় নাই! নিজেকে সে তখন আর সম্বরণ করিতে পারিল না; এতক্ষণের অবরুদ্ধ অশ্রু তাহার দুই চোখ দিয়া দর্‌ দর্‌ করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। রত্নেশ্বর বলিলেন, সন্ধ্যা দে মা গায়ত্রী!

তুলসীতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়া গায়ত্রী ঘরে আলো জ্বালিল। সেই আলোকের শিখায় গায়ত্রীর পার্শ্বে রত্নেশ্বর বিভাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন মনে মনে গায়ত্রী এবং সন্ধ্যার আরাধনা করিয়া সবেমাত্র চক্ষু উন্মীলন করিয়াছেন। সদ্য-ধ্যানভঙ্গ তাঁহার দুই মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এই দুই জ্যোতির্ম্ময়ী বালা পরম বিস্ময়ে তাঁহাকে একেবারে নির্ব্বাক করিয়া দিল। কোন কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, কোন ভাবনা তিনি ভাবিতে পারিলেন না। অপলক দৃষ্টিতে তিনি তাহাদের পানে তাকাইয়া রহিলেন। এতক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মনশ্চক্ষের সম্মুখে যে দুই দেবী মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাই বুঝি সশরীরে হইয়া তাঁহারই মানবী কন্যারূপে আজ তাঁহাকে ধরা দিতে আসিয়াছে!—ইহাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। মা! মা! বলিয়া আকুল আগ্রহে রত্নেশ্বর তাঁহার শীর্ণ কম্পিত হস্ত দুইটি সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিলেন।

গায়ত্রী বলিল, বাবাকে প্রণাম কর বিভা।

সে কি কথা মা! আমি যে তোদের কাঙ্গাল ছেলে! আর কত কষ্ট দিবি মা! বলিতে বলিতে দুইজনকে দুই হাতে ধরিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গায়ত্রী ডাকিল, বাবা!

এতক্ষণে তাঁহার যেন তন্দ্রা কাটিল। বলিলেন, আমায় ডাক্‌চিস্ মা? কি বল্‌ছিস্?

গায়ত্রী বিভাকে দেখাইয়া কহিল, এ অমরেশের ছোট বোন্—বিভা।

এক হাত দিয়া বিভার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া রত্নেশ্বর বলিলেন, আহা, বেশ! বেশ মেয়েটি! এমনি ছেলে-মেয়ে না হ'লে কি আর ঘর সাজে রে!

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, শোন্ গায়ত্রী এবার আমি বংশীর বিয়ে দেব।

গায়ত্রী বলিল, দাঁড়াও বাবা, ছেলে-মেয়ে মানুষ করবার মত রোজগার করুক্ আগে।

রত্নেশ্বর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ও-সব কিছুই নয় মা! তোরা ছেলে মানুষ, বুঝিস্‌নে। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি। কালীমূর্ত্তি দেখেছিস্? একদিকে ভয়, আর একদিকে অভয়! দুঃখ দৈন্য যত বড়ই হোক্ না মা, তার থেকে উদ্ধারের উপায় তিনিই করে রেখেছেন।

নূতন সংসারের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতে রমণীর কতখানি আত্মোৎসর্গ করতে হয় তাহা বোধ করি পুরুষে তেমন করিয়া চিন্তা করে না।

'বিমাতা'

বঞ্চনা

—শ্রীনীলিমা বসু।

দুইদিন অনাহারের পর আর কোনও উপায়ান্তর না দেখিয়া মতি ধীরে এক হাতে তাহার পুরাতন ভিক্ষার ঝোলাটা, অন্যহাতে মোটা বাঁশের লাঠিটা লইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

গত তিন দিন সে পায়ের বাতের যন্ত্রনায় খুব কষ্ট পাইয়াছে, আজও সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই কিন্তু তবু তাহাকে উঠিতেই হইবে। এ ব্যায়রামে গত একবৎসর ধরিয়া সে কষ্ট পাইতেছে, মাসের মধ্যে একবার করিয়া পা দুইটা ফুলিয়া ওঠে এবং সেই সঙ্গে জ্বর হয়; তিন চার দিন অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করিয়া আবার ক্রমশঃ সুস্থতা লাভ করে। বিছানায় পড়িয়া থাকিলে তাহার দিন একরূপ অনাহারেই কাটে তাই, একটু সারিয়া উঠিলেই পেটের দায়ে, পরের দ্বারে এক মুষ্টি অন্নের জন্য ঘুরিয়া মরিতে হয়। চিরকাল সে স্বাধীন ভাবে নিজের অন্নের সংস্থান করিয়াছে, কিন্তু এখন বয়সও হইয়াছে, পূর্ব্বের সে শক্তি এবং সামর্থ্য এ দু'য়ের কোনটাই এখন তাহার নাই, সুতরাং ভিক্ষা ছাড়া আর উপায় নাই। আগে সে সহরের লোকের মোট বহন করিয়া কখনও বা ফিরি-ওয়ালার কাজ করিয়া, গান গাহিয়া স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া দিত। সংসার বলিয়া কোন কালেই কিছু তাহার ছিল না, তাহার মা কবে যে তাহাকে এ পৃথিবীর দুঃখ ভোগ করিবার জন্য অসহায় ভাবে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন তাহাও আর এখন স্মরণ হয় না। তাই নিজের অন্নবস্ত্রের জন্য দিন-মজুরী করিয়া যাহা কিছু পাইত, তাহাতে বেশ সুখেই কাটিয়া যাইত। তাহার ভাগ্যে বুঝি তাহাও সহিল না! মতি একেবারে রোগে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। নিতান্ত যখন কষ্ট হয় তখন সে বিগত দিনের কথা স্মরণ করিয়া চোখের জল ও বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মতি রাস্তায় নামিয়া এদিক ওদিক একটু চাহিয়া লইয়া অতি ধীর পাদক্ষেপে সামনের রাস্তা ধরিয়া একটু আগাইয়া গিয়া বড় বাড়ীটায় ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিল বটে, কিন্তু বাহির হইয়া আসিতেও বড় বেশী বিলম্ব হইল না। বড় লোকের বাড়ী প্রবেশ করিতেই তাহাদের এক ভৃত্য তাহাকে এমন তাড়া করিয়া আসিল যে সে, বাহির হইয়া আসিতে পথ পাইল না। এমনি ভাবে গোটা দুই বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া তৃতীয় জায়গায় একমুষ্টি চাউল মিলিল, আর এক বাড়ী হইতে

একটা পয়সাও পাইল। এই দুর্ব্বল শরীরে মতির আর চলিতে ইচ্ছা হইতে ছিল না। কিন্তু নিরুপায়, তাহাকে চলিতেই হইবে। না হইলে আজ যাহাও জুটিয়াছে তাহাতে একরূপ উপবাসেই কাটাইতে হইবে। একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল. তিন চারিটা বাড়ী পার হইয়া আসিয়া যে তেতালা বাড়ীটায় ঢুকিল সে এক মোক্তারের বাড়ী। এ বাড়ী তাহার কাছে নূতন নয়, আরও দুইবার সে এখানে আসিয়াছে, এবং আসিয়াও শূন্য হাতে ফিরে নাই, কিন্তু আজ তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল। অন্য যে দুইবার মতি এখানে আসিয়াছে সৌভাগ্য বশতঃ গৃহস্বামীর সু-নজরে পড়ে নাই, পূর্ব্বে যদি একবারও কর্ত্তার দর্শন মিলিত তাহা হইলে মতি এ দরজায় বোধহয় সাহস করিয়া পা দিত না।

এদিকে বেলাও মন্দ হয় নাই, বৈশাখী-রৌদ্রের তেজ ক্রমশঃ প্রখর হইয়া উঠিতেছে এখন কোন প্রকারে দিনের আহারের সংস্থান করিতে পারিলেই, মতি তাহার নিজের ভাঙ্গা টিনের ঘর খানিতে ফিরিয়া যাইতে পারে।

'মাগো,-দুটি ভিক্ষে দাও মা,' বলিয়া ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতেই, বাড়ীর কর্ত্তা এক হুঙ্কার দিয়া উঠিল, 'ওরে নন্দলাল, অ্যারে এই নন্দা, ছোঁড়া গেল কোথা! বজ্জাৎ ছোঁড়াকে ডেকে ডেকে পাবার যো নেই, কেবল ফাঁকি।' বলিয়া একবার গৃহিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই সম্মুখে নন্দলালকে দেখিতে পাইলেন। নন্দলালের উপর কর্ত্তার মৃদু মধুর সম্ভাষণ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বেই সে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। এ বাড়ীতে আসা অবধি প্রতিদিনই প্রাণপণ খাটিয়া গালাগালি খাইয়া সে দুই বেলা চারিটি ভাত পায় এবং মাসান্তে পাঁচটি করিয়া টাকা মাহিনা পায়; তবে এ বাড়ীর বৌদির নিকট হইতে সে যথেষ্ট সহানুভূতি পাইয়া থাকে। এ প্রকার গালাগালি তাহার কাছে জল-ভাতের মত হইয়াছিল, কাজেই আজ তাহার আর বেশী করিয়া কিছু মনে হইল না। নন্দলালকে দেখিয়া কর্ত্তার রাগটা নরম পড়িল সত্য, কিন্তু ঐ ভিক্ষুকটার উপরে রাগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। বলিলেন, 'দে ত লোকটাকে তাড়িয়ে, বল, এখানে কিছু মিলবে না।' লোকটার আস্পর্দ্ধা দেখ, খেতে বসেছি অমনি এসে চেঁচাতে সুরু করেচে।' গৃহিনী ও আসিয়া কর্ত্তার সঙ্গে যোগ দিলেন।

নন্দলালের নিষেধ সত্ত্বেও মতি কয়েক পা পিছনে সরিয়া আবার ক্ষুধার্ত্ত করুণ কণ্ঠে বলিল, 'মাগো, তিনদিন অনাহারী আছি মা, দয়া করে কিছু দাও মা ঠাকরুণ, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।'

—'রেখে দে তোর মঙ্গল, চালাকী করবার আর জায়গা পাওনি, বেরো

বল্‌ছি,—এ ত আচ্ছা আপদ দেখ্‌ছি, আমি দেব না—জোর করে নেবে! খাবার সময় যত উৎপাত এসে জোটে! গতর আছে খেটে খাওগে না বাপু, এখানে কিছু হবে টবে না। বলিয়া বাবু একবার বাহিরের দরজার দিকে তাকাইয়া বোধ করি ভিক্ষুকটা রহিল কি গেল দেখিয়া লইয়া পুনরায় আহারে মনোনিবেশ করিলেন।

বুড়াটাকে এমন নির্দয়ভাবে এই সময় তাড়াইয়া দিতেছে দেখিয়া এই বাড়ীরই বৌ বরুণার বড় কষ্ট হইতে ছিল। এই ভিক্ষুকটা আরও দুইবার তাহার নিকট হইতে ভিক্ষাস্বরূপ একমুষ্টি চাউল লইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে খুসী হইয়া এই বাড়ীর মঙ্গল কামনা করিয়াছে। বুড়া এ সময় চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বরুণা উপরে উঠিয়া গিয়া তাহার ঘরে ঢুকিতেই দেখিল তাহার স্বামী হীরেন্দ্র ইজি-চেয়ারটায় অর্দ্ধ শায়িতভাবে নূতন প্রকাশিত একখানি বই— 'দরিদ্র নারায়নে সেবা' পড়িতেছেন। বরুণা ঘরে ঢুকিয়া তাহার বাক্স খুলিয়া পয়সা বাহির করিতেছে দেখিয়া মুখ হইতে বইখানি একটু সরাইয়া লইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—'পয়সা দিয়ে কি হবে?'

'ঐ বুড়োটাকে দেব'। বলিয়া বরুণা বাহিরের রাস্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

বুড়াকে পয়সা দিতেছে শুনিয়া হীরেন্দ্র একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, 'তুমিও যেমন, যত সব চোর, ফাঁকি দিয়ে মেয়েদের কাছ থেকে পয়সা নেবার ফন্দি, রেখে দাও তুমি। তার চেয়ে বরং একটা ভাল কাজে দান কর, দেখ্‌বে কত নাম হয়।' শেষের কথা কয়টি সে ঠাট্টার ছলেই বলিল।

স্বামীর কোন কথায় কাণ না দিয়া বরুণা তাড়াতাড়ি চারিটা পয়সা এক টুকরা কাগজে মুড়িয়া লইয়া জানালার ধারে গিয়া দেখিল, বুড়া অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে, তাই স্বামীকে অনুনয় করিয়া, বলিল 'ওগো বুড়োটাকে একটু ডাক না, আমি চেঁচাতে গেলে সবাই শুনতে পাবেন, তাহলে আর রক্ষে থাক্‌বে না। এমন সময় একজন দুঃখী লোক বিনাদোষে গালাগালি খেয়ে যাবে সেটা যেন আমার ভাল লাগ্‌ছে না।'

'আমি পার্‌বো না বাপু, ছুটির দিনে খেয়ে দেয়ে একটু আরাম কর্‌বো তাও হবার জো নেই, যেতে দাও, ওকে যেতে দাও।'

বরুণা জানালার শিক্‌ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যদি বুড়া উপরে তাহার ঘরের দিকে একবার ফিরিয়া চায়, তাহা হইলে ইসারায় ডাকিয়া তাহাকে

পয়সা কয়টি দিবে। কিন্তু মতি ফিরিল না আরও একটু অগ্রসর হইয়া, এক বাড়ীর দেয়ালের ধারে ছায়ায়, লাঠিটা ও ঝোলাটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া বসিয়া পড়িল। মাথার উপরে রৌদ্রের প্রখরতা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় তাহার কণ্ঠনালী শুখাইয়া কাঠ হইয়াছিল, কি করিবে সহসা কিছুই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

বরুণা তখনও সেখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দীন কাঙ্গালকে এরূপ ছোট করিয়া দেখা, তাহার বুকে বড় বাজে। মানুষ এত নির্দ্দয়! একমুষ্টি অন্নের জন্য একটা দুঃখীকে কত কথাই না শুনাইয়া দিল! এইরূপ অনেক কথা বরুণার মনে হইয়া তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগিল! সেই সময় বাহিরে দরজার সামনে নন্দলালের ডাকে তাহার চমক ভাঙ্গিল, 'বৌদি আজ ভাত খাবেন না? মা যে ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গলেন!

বরুণা জানালার নিকট যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনিই রহিল।

নন্দলাল বলিল, 'বৌদি আসুন—'

বরুণা উত্তর দিল 'আমার আজ খিদে নেই। বলগে যা—খাব না।'

তুমি নিত্য জেগে আছে,
প্রেমের শিয়র কাছে
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।

'উৎসবের বাঁশি'

বন্দী

—শ্রীবিজয় সেন গুপ্ত।

১

রাত দুপুর। কারাগারে অসীম নিস্তব্ধতা। কেবল মাঝে মাঝে প্রহরীর পদচারণের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কারাকক্ষগুলির ঊর্দ্ধদিকে যে গোলাকার গবাক্ষ ছিল, অন্ধকারে সে গুলিকে দেখাচ্ছিল ঠিক মৃতের চোখের মত।

একটি আলো জ্বলছিল কারাধ্যক্ষের ঘরে। সেখানে একটা টেবিলের ওপর একখানা কাগজ বিছানা ছিল; দুজন লোক টেবিলের দুধারে মুখোমুখি বসে ছিল তাদের মধ্যে একজন কারাধ্যক্ষ আর দ্বিতীয় জন তাঁরি সহকারী। কাল সকালে যে সব বন্দীদের ফাঁসী দেওয়া হবে তাদের নামের গায়ে পেন্‌সিল দিয়ে দাগ দেওয়া হচ্ছিল।

ঝন্! ঝন্! ঝন্!—

কারাধ্যক্ষ পেনসিল রেখে দিয়ে বল্লেন,—ঐ আবার সুরু হল!

তাঁর সঙ্গী প্রশ্ন কর্‌লে,—ব্যাপার কি?

—একজন নতুন বন্দী। লোকটা দিনরাত তার চেনের শব্দে আমাকে জ্বালাতন ক'রে তোলে!

—কেন সে এমন করে?

—কেন? তা আমি জান্‌ব কি ক'রে? কাফের কুকুরটা সমস্তক্ষণ এমনি শব্দ ক'রে বেড়ায়; আমাকে একটু নিশ্চিন্ত হ'তে দেয় না। কি হতভাগা কাজ আমার। এত দিন কাজ ক'রেও ঐ শব্দটা এখন আমার বরদাস্ত হয় না।

ঝন্! ঝন্! ঝন্!—

এবার শব্দের জোর আগের চেয়ে বেশী।

অধ্যক্ষ অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠ্‌লেন—অসহ্য! ঐ শব্দ আর আমি সইতে পারি না। কালরাতে ওর জন্যে আমার মোটেই ঘুম হয়নি।

সহকারী হাস্‌তে সুরু কর্‌লে।

—হাস্‌ছ কেন?

—কেন হাস্‌ছি? তুমি যদি একটা সেদ্ধ মুরগীকেও বল যে ভেড়ার ভয়ে

নেকড়ে ভয় পায়, তা হ'লে সে ও হেসে উঠ্‌বে। তোমার এমন অস্বস্তি আর রাগের কি মানে হয়? ওকে চুপ করিয়ে দাও না।

—চুপ করান? বলা ভারী সোজা।

—ওকে ঘুমোতে বল।

—কিন্তু যদি না ঘুমোয়?

—যাতে ঘুমোয় তাই কর। তার ত উপায় আছে, নয়?—

বলে সে দেওয়ালে ঝোলানো কতকগুলো চাবুকের প্রতি দেখিয়ে দিলে। ছোট ছোট তার চোখ থেকে নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি যেন ফুটে বার হচ্ছিল!

ঝন্! ঝন্! ঝন্!—আবার মরচে-ধরা লোহার সেই বীভৎস শব্দ। অধ্যক্ষ বসে বসে ভাবতে লাগ্‌লেন। শেষে রাগে ঠোঁট কামড়ে তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। যে কক্ষ থেকে শব্দ আস্‌ছিল, সেইখানে গিয়ে গবাক্ষের কপাট খুলে উচ্চ রবে বল্‌লেন, কাফের কুকুর, শেকলের শব্দ থামিয়ে চুপ করে থাক্।

ভেতর থেকে কে যেন বল্‌লে—আমি ত কিছুই কর্‌ছি না!

—কেন তুই অমন করে শব্দ করিস্?

—কেন? চেন গুলোর গায়ে গায়ে আঘাত লেগে আপনা আপনি শব্দ হয়।

—তুই নড়িস্ কেন?

—আমি কি কর্‌ব?

—ঘুমো। ঘুমো। যদি না ঘুমোস, তা হ'লে,—অধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্য শেষ কর্‌লেন না।

বন্দী বল্‌লে,—ঘুম—বলা ভারী সহজ। মানুষের স্বাধীনতাকে যাকে রক্ষা কর্‌তে হবে, সে কেমন করে ঘুমোবে যদি তাকে এমনি জীয়ন্তে কবর দিয়ে রাখা হয়; যদি তার সব আশা নির্মূল করে দেওয়া হয়?

তার মনের ভেতরটা যেন আগ্নেয় গিরি। কারাকক্ষের আয়তন কম, চেন ভারী! চেনের ঝনৎকার যেন স্বেচ্ছাতন্ত্রের ভয়াবহ সঙ্গীত, যা সেই কোন্ আদিকাল থেকে কারাকক্ষের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে।

অধ্যক্ষ চলে গেলেন। বন্দী একবার চুপ করে কথাগুলি ভেবে দেখ্‌লে; তার পর আবার চলাফেরা সুরু কর্‌লে। দেওয়ালের ধারে ধারে সন্তর্পণে ছোট

ছোট পদক্ষেপে সে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌লে—তার শৃঙ্খলের শব্দে রজনীর নীরবতা বারে বারে আহত হ'তে লাগল।

সহকারী প্রশ্ন কর্‌লে—এ হতভাগাটা কত দিন থেকে এখানে আছে?

—তিন দিন আগে ও ধরা পড়ে গ্রেপ্‌তার গেলে। এ হ'চ্ছে সেই দলের যারা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারে না। ও যে কে, আর কোথা থেকেই বা এসেছে, তা কেউ জানে না।

—ও কি চড়্‌বে—এতে?

—কি? ফাঁসীকাঠে; নিশ্চয়ই—অবশ্য বিচারে যদি তাই ঠিক হয়।

দুজনেই নীরব। এ বিষয়ে বেশীক্ষণ কথা চলে না, তাই তারা মনে মনে এ বিষয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা কর্‌লেও মুখে আর কেউ কিছু বল্‌লে না। হঠাৎ শৃঙ্খলের একটা বিরাট শব্দে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গল।

—এক বার সকাল হোক, হতভাগা কাফের।—অধ্যক্ষ মনে মনে বল্‌লেন।

সহকারী উঠে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করে চলে গেল।

ভোর হল; বন্দীদের প্রাতরাশ দেবার সময় হল।

খাবার ভরা ডিস হাতে করে সেই অবাধ্য বন্দীটার কক্ষের দিকে যেতে যেতে কারাধ্যক্ষ বল্‌লেন—এইবার তোকে চুপ করাব একেবারে চিরদিনের জন্যে।

দরজা খুলে তিনি মেঝের ওপর খাবার রেখে দিলেন। বন্দী তখন নিদ্রিত। তিনি চুপি চুপি বার হ'য়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে সেইখানেই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, কিসে যেন তাঁকে সেইখানে ধরে রাখ্‌লে। চাবির গর্ত্তে চোখ দিয়ে তিনি ভেতরের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। বন্দী সুশ্রী; তার দেহে যেন একটা সদ্বংশের ছাপ আছে।

প্রশস্ত তার ললাটে একটি রেখা পড়ে নি; মনে হয় যেন তাতে কত মহৎ চিন্তা সেখানে আসা-যাওয়া করে। মুখ তার চরিত্র-বলের পরিচায়ক। সেই ঘুমন্ত মূর্ত্তির মধ্যে কি যেন ছিল যা অধ্যক্ষকে অভিভূত করে ফেল্‌লে। মনে তার ভয় জাগ্‌ল; এই অভূতপূর্ব্ব ভাবটাকে তিনি তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা কর্‌লেন। কেন তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে অমন করে বন্দীকে লক্ষ্য কর্‌ছেন? কেন তিনি চলে যান নি? এর উত্তর তাঁর জানা ছিল না, আর এ বিষয়ে চিন্তা কর্‌তেও তাঁর ইচ্ছা হ'ল না, তিনি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লেন।

তিনি দেখ্‌তে গেলেন বন্দী উঠে খাবারের দিকে এগিয়ে এল। তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গী তিনি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। হাঁটু তাঁর কাঁপ্‌তে সুরু কর্‌লে; অবসন্নের মত দরজায় ঠেস দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্রমে তাঁর গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠ্‌ল। কেন তিনি ঐ সৌম্য-দর্শন লোকটিকে এমন ক'রে মেরে ফেল্‌বেন,—যার ললাটখানি প্রশস্ত, চোখ দুটি ভাবে ভরা। দরজা খুলে বল্‌লেন,—থাম! থাম!

বন্দী অবাক হয়ে তাঁর পানে চাইলে।

—থাম। এ আমি করতে পারব না। যত পার তুমি চেনের আওয়াজ কর।

থালাটি তুলে নিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। বন্দী সব বুঝ্‌লে। সূর্য্যাস্তের শেষ অস্পষ্ট আলোর মত তার মুখে একটু হাসি দেখা দিলে। আনন্দে তার বুক ভরে উঠ্‌ল। কারাগারের অস্বচ্ছ ছাদের নীচে, বন্ধ দরজার মধ্যে সে আজ জয়লাভ করেছে!

২

হপ্তাখানেক চলে গেল।

ঝন্—ঝন্—ঝন্—এবার শৃঙ্খলের ধ্বনি চলেছিল 'এ'-গ্রামের মধ্যে দিয়ে। দুধারে চক্‌মক্ সঙ্গীন-শ্রেণীর মাঝে, মধ্যে দিয়ে একখানি শাদা মুখ দেখা যাচ্ছিল। বন্দীদের প্রাণবধের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দিনের আলোকেই শিকলের ধ্বনিতে মনে ভয় জাগিয়ে দিচ্ছিল। দু ধারের দরজা জানালা সব বন্ধ হয়ে গেল। এই ধ্বনি সেখানকার লোকের পক্ষে একটা মহাভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সারা রাস্তা এই ধ্বনিতে ভরে উঠ্‌ল; সাহসীদেরও বুক তাতে কেঁপে উঠ্‌ল।

বিচারও হবে সেইখানে; অনেক লোক সেখানে জমা হয়েছিল। সেখানে বিচারক, ব্যবহারজীবি, সেক্রেটারি সবাই ছিলেন। কারাধ্যক্ষ এবং তাঁর সহকারী এঁরা দুজনেও উপস্থিত ছিলেন।

কারাধ্যক্ষ মনে বার বার আবৃত্তি করছিলেন,—আমি এ কাজ করি নি। আমার কিছুই দোষ নেই।

বিচারক বন্দীর দিকে ফিরে বল্‌লেন,—তুমি 'এ'—গ্রামের—কেমন?

—না। আমি 'এ'-গ্রাম থেকে আসি নি।

—'এ'—তোমার বন্ধু ?

—আমি তাকে চিনি না।

—তুমি 'গ'—কে হত্যা করেছিলে ?

—হাাঁ, সে আমার শত্রু ছিল।

—তুমি অস্ত্র যোগাড় করে নিয়ে গিয়েছিলে 'স'-তে ?

—না আমি অস্ত্র যোগাড় করিনি।

কারাধ্যক্ষের সহকারী এতক্ষণ এ সবে বিশেষ যোগ দেয়নি। এইবার সে উঠে গিয়ে বিচারকের কাণে কাণে কি যেন বল্‌লে। তারপর বিচারকের ইঙ্গিত মত সে বন্দীর কাছে গিয়ে একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল।

বিচারের স্থান একেবারে নিস্তব্ধ। সবারই মনে হল এবার একটা অসাধারণ কিছু হবে, তাই সবার চোখ গিয়ে পড়্‌ল ঐ মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা লোক দুটির ওপর, যেখানে সামনা সাম্‌নি দাঁড়িয়েছিল—দুটি মুখ নয়, চারটি চোখ, —চারটি যেন অগ্নিশিখা! দর্শকেরা সবাই যেন ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ল। একটা কিছু এবার ঘট্‌বে, যা সাধারণতঃ ঘটে না।

তারা দুজনে তখনও তেমনি চোখে চোখ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ভ্রূ একটুও কুঞ্চিত হল না; মুখেও কোন কথা নেই।—ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোন শব্দই বার হ'ল না। তারা কেবল তাকিয়েই রইল পরস্পরের দিকে। তাদের মধ্যে একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ তবু তার চোখ দিয়ে ক্রোধ ফুটে বার হচ্ছে যেন কোন মহৎ কাজে বাধা পেয়েছে বলে। আর অন্য জনের দেহে জুকি অফিসারের মত পোষাক তবু সে যেন ভয় পেয়ে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল।

বন্দী পেছিয়ে দাঁড়াল। শিকল ঝন্‌ঝন্ করে উঠ্‌ল। এমন ঘৃণাসূচক ভঙ্গীতে সে ফিরে দাঁড়াল যে তাতে তার সম্মুখীন লোকটির মেরুদণ্ড দিয়ে একটা দারুণ কাঁপন বয়ে গেল; সে বাধ-বাধ স্বরে বল্‌লে,—আমি—আমি তোমাকে চিনি। তুমি 'এ'—

বন্দী উত্তর দিলে,—হাাঁ। তুমি আমার বন্ধু ছিলে।

বন্ধু? এত লোকের মাঝে এই কথা! কথাটা যেন আকার পরিগ্রহ করে একটা বিরাট দৈত্যের মত দাঁড়াল কারাধ্যক্ষের সহকারীর সম্মুখে। তার নিজের সমস্ত নীচতা সে উপলব্ধি কর্‌লে। নিজের কাছেই সে নিজে ভয় পেয়ে গেল! তার এই পোষাকের চক্‌চকে বোতামের জন্যে কতই না সে রক্তপাত

করেছে। আপনার অজ্ঞাতসারেই সে একটা বোতামে হাত দিলে ;— সেটা যেন বরফের মত শীতল! তাড়াতাড়ি সে হাত সরিয়ে নিলে। স্বাধীনতা প্রয়াসী এই বীরের সঙ্গে কত বছরই না সে প্রতারণা করছে নিজেকে তার বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে ; আর এরই মত কত লোককে সে ছলনা করে নিধনের পথে নিয়ে গেছে। নিজের তলোয়ারে একবার হাত দিয়ে তখনি হাত সরিয়ে নিলে ; তারপর চেয়ে রইল তার এই পুরাণো বন্ধুর শৃঙ্খলের দিকে যা তাকে পরতে হয়েছে স্বাধীনতা লাভের জন্যে সে বিদ্রোহ করেছে বলে। কোন্‌টা ভাল ?—তার এই তুর্কি অফিসারের তলোয়ার, না স্বাধীনতা প্রয়াসীর মরচে-ধরা শিকল ? যে প্রশ্ন সে অনেকদিন আগে সমাধান করেছে বলে মনে হয়েছিল, সেই প্রশ্ন আবার আজ তার মনে উদয় হল।

*　　　*　　　*

রাত ভয়ানক অন্ধকার। একটা অশ্রান্ত বাতাস কালো আকাশের নীচে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সহকারী কারাগারের দিকে চল্‌ল ; অধ্যক্ষ ডেকে পাঠিয়েছেন। সাধারণত তার গতিতে যে সজীবতা দেখা যেত, তা আর নেই। অন্ধকারটা মোটেই আনন্দদায়ক নয়। বাতাসটাও নয়। যে সব কথা তার মোটেই ভাব্‌তে ইচ্ছা ছিল না, সেই সব কথাই বারবার তার মনে হ'তে লাগ্‌ল। সেদিন প্রাতঃকালে যখন 'এ'-ফাঁসীতে চড়্‌লে তখন সে আত্মগোপন করতে কতই না চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। বন্দীর দৃষ্টি যেন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল ; শেষে খুঁজে বারও করেছিল। বিচারের সময় সে যেমন করে চেয়েছিল, এবারও তার দৃষ্টি ঠিক তেমনি! মরবার আগে বন্দী যেন তার সেই ঘৃণার চাহনি তার মাথায় অগ্নি-শলাকার মত পুরে দিতে চেয়েছিল।

ঐ যে অন্ধকারের মধ্যে তার সম্মুখে—দুটি জ্বলন্ত বিন্দু—চোখ! সহকারী আর যেতে পার্‌লে না ; থেমে পড়্‌ল। ঐ দুটি তার বন্ধুর চোখ ; ঠিক সেই রকম তেমনি বড়। সে কি এগিয়ে যাবে ? একটু ভেবে সে চোখ বন্ধ কর্‌লে। কিন্তু চোখ খুল্‌তেই দেখ্‌লে সেই দুটি চোখ এখন তেমনি চেয়ে আছে তার দিকে। এবার আগের চেয়ে বড় এবং তাদের চাহনির অর্থও বদ্‌লে গেছে। সে দৌড়তে চেষ্টা কর্‌লে। চোখ দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা বেড়াল তার সামনে দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল। নিজের এই অকারণ ভয়ে সে হেসে উঠ্‌ল কিন্তু আগের চেয়ে জোরে চল্‌তে লাগ্‌ল।

কারাগারের অঙ্গনে এসে সে হাজির হল। সকাল বেলায় প্রাণবধের স্থানটার

দিকে সে একটা চকিত দৃষ্টি ক্ষেপন করলে। তার মনে হল, লোকটাকে গোর দেওয়া হয়েছে, সব মাটি ঢুকে গেছে। কিন্তু সে দেখ্‌লে দেহটা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে উঁকি দিচ্ছে, আর বাতাসের স্পর্শে ফাঁসী কাঠটা যেন ক্রমাগত বিলাপ করছে, বাতাস সেই ধ্বনি দূরে দূরে বয়ে নিয়ে চলেছে! আর না তাকিয়ে সহকারী ছুটে চল্‌ল, কিন্তু বধ-মঞ্চের কাছাকাছি হতেই তার গতি আপনি মন্দ হয়ে এল। অবশেষে কম্পিত পদে সে অধ্যক্ষের ঘরে প্রবেশ করলে। সেখানে আলো আছে, আরএকজন লোকও আছে অন্ততঃ। অধ্যক্ষ চেয়ে দেখ্‌লেন না। তিনি কি ভাবছিলেন। সহকারীও চুপ করে রইল।

নীরবতা দূর কর্‌বার জন্য একটু পরে সহকারী বল্‌লে,—এইবার তুমি ঘুমোতে পার্‌বে, আর শিকলের ঝন্‌ঝনানি শোনা যাবে না।

—চুপ্‌! ঐ শুন্‌তে পাচ্ছ না!

বাইরে বাতাসের শব্দ অতিক্রম করে ফাঁসীকাঠের ক্যাঁচ ক্যাঁচ্‌ শব্দ হচ্ছিল। যেন মৃতদেহকে ঘুম পাড়াবার বিষাদমাখা সঙ্গীত!

—ওকে কবর দেওয়া হয়নি কেন?

—সেই জন্যেই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। কাল সকালে তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে গোর দেবে;—কেন না, তুমি ওর বন্ধু ছিলে।

সহকারী চুপ করে রইল। এ কি পরিহাস! যাই হোক, ও আর গোলমাল করবে না—সে মনে মনে ভাবলে।

অধ্যক্ষ মাথা নত করে রইলেন; অন্ধকারে তাঁর চোখ দেখা গেল না। সহকারী ধীরে ধীরে উঠে আলোটি নিয়ে অধ্যক্ষের মুখের কাছে ধর্‌লে। তিনি রাগে মুখ তুলে তার হাত থেকে আলোটি নিয়ে সজোরে মেঝের ওপর ছুড়ে ফেলে দিলেন। আলোটা চুরমার হয়ে গেল।

—কাপুরুষ বিশ্বাস ঘাতক—ও তোমার বন্ধু ছিল!—

ঘর অন্ধকার। তার প্রতি কোণ থেকে রাশি রাশি চোখ জ্বলে উঠ্‌ল,—ক্রমে তারা বড় হতে লাগ্‌ল। কি ভয়ঙ্কর! সহকারীর ইচ্ছা হল সে চলে যায় কিন্তু দরজা দেখ্‌তে পেলে না। ঘরের চারিদিকে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শেষে দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়্‌ল। বাহিরটাও কি ভয়ানক! অপার কালীমা সেই বাতাস আর ফাঁসীকাঠের শব্দ! উঃ—কি শব্দ। তার ভেতর প্রবেশ করে তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগ্‌ল। ঐ অদূরে মৃতলোকটা বাতাসে দুল্‌ছে। কোথায় সে যাবে? সে স্থির করলে যত জোরে সম্ভব দৌড়ে সে পালাবে, কিন্তু কয়েক

পা অগ্রসর হ'তেই কিসে যেন হঠাৎ তার দৃষ্টিকে উর্দ্ধমুখী করে দিলে। সে দেখ্‌লে তার সামনে দুটি জলন্ত ফুলে-ওঠা, রক্ত-ঝরা আঁখি! হাঁটু তার ভেঙ্গে পড়্‌তে চাইলে। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সে অধ্যক্ষের ঘরের দিকে ফিরে চল্‌ল।

অধ্যক্ষ আবার বল্‌লেন,—ভীরু, বিশ্বাসঘাতক!—

সহকারী ফিরে আবার দৌড় সুরু করলে। কিন্তু এবার বাতাসে তার পথ আটকে দিলে; সে চেয়ে দেখ্‌লে ফাঁসীকাঠের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। এবারে যেন আর মৃতলোকটির রাগ নেই মনে হল; সে যেন দরদ-ভরা চোখে নীচের দিকে চেয়ে আছে, আর বলছে বন্ধু! বন্ধু!

সে সাপের মত কুঞ্চিত হয়ে গুড়ি মেরে চল্‌ল। তারপর তাড়াতাড়ি মইটাকে খাড়া করে রেখে সেই মই বেয়ে ওপরে উঠে সেই দড়ির ফাঁস খুলে দিলে। মৃতদেহ মাটিতে পড়ে গেল। সেই ফাঁস সে নিজের গলায় পরিয়ে শূন্যে লাফিয়ে পড়্‌ল।

বাতাসের ক্রুদ্ধরবের সঙ্গে মিশিয়ে গেল একটি মানুষের দম আট্‌কে যাওয়ার শব্দ—আর সে শব্দ শোনা গেল না।

দুটি মৃতব্যক্তি পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল; একজন ছিল মাটিতে শুয়ে, আর একজন উঁচুতে ঝুলছিল,—অন্ধকারে বাতাসের মধ্যে। *

আমার মাঝে যেমন মধু দেবার প্রেরণা আছে, তেমনি আমি নিজেও যে মধু পিয়াসী।

'চাঁদের আলো'

---

* আর্মেনীয় লেখক Awetis Aharonean হইতে

ভুলের শাস্তি

—শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত।

মানুষ যখন মরে, তখন তার কাছে সুখ দুঃখের হিসাবটা আর বড় হ'য়ে ওঠে না, পৃথিবীর নিন্দা অপমান তখন তার কাণে তীব্র হয়ে বেজে ওঠে না; অসীম দরিদ্রতাও তাকে আর নির্য্যাতন করতে পারে না।

ঘর ছেড়ে যেদিন বেরিয়ে পড়ি, তখন অনেক কথাই কাণে বেজেছিল, সে সব দিকে তখন কোনই খেয়াল ছিল না। একজনের দুফোঁটা চোখের জল, সেইটেই বুকে ব্যথা দিয়েছিল। মনে সেদিন একটা গৌরবের স্থান থাক্‌লেও ব্যথাটা তখন সেটুকু ঢেকে দিয়েছিল। তারপর মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্র, মর্‌বার জন্য তখন ভারী ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম।

ফিরে এসে দেখি সব বদল হয়ে গেছে! যারা আমায় চিন্‌ত, তারা চিন্‌তে পার্‌লে না। তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে, কিন্তু আমায় বুকের দাগ্‌টা ত মুছ্‌ল না! গানের সব কথা ভুলে গেলাম, কিন্তু সুরটি যে এখনো কাণে বাজ্‌ছে। ভাবি আর ভাবি—এ ভাবনার আর শেষ হয় না। নিজের দেশে এসে অপরিচিতের মত হাঁসপাতালে পড়ে রইলাম।

কয়েকদিন কাট্‌ল, হুঁস ছিল না।

তার পর, আর পারি না। . . . শুয়ে শুয়ে শুধু ছট্‌ফট্‌ করি, এ ক্ষুধা ত মিট্‌ল না!

একদিন আমার কাণে মরণের নিমন্ত্রণ এসে পৌছল। আমার গ্লানি-ভরা বেদনাময় অন্তরের ওপর তার গহন কালিমা ছড়িয়ে পড়্‌ল। তখন এক নিমেষের জন্য মনে হ'ল ভারী তৃপ্তি এ। এত আনন্দ ত বিচ্ছেদে ছিল না। রোজ-চেনা জিনিষগুলিতে ত এত ঐশ্বর্য্য কোন দিন দেখিনি! ভোরের নির্মেঘ সুনীল আকাশটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভাবি, এত গান, এত আনন্দ কিসের জন্য? এই যে ভোরের আলোয় পাতার ফাঁকে ফাঁকে শিশির ঝল্‌মল্‌ কোরে ওঠে, এই যে চারিদিকে এত আনন্দের কোলাহল ওঠে, এ সবের কি কোনই অর্থ নেই? এরা ত ভাষাহীন নয়! . . .

অনেক কথা মনে পড়্‌ছে। একদিন তাদের বাড়ী গিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'তুমি ত আস শুধু কুমারের সঙ্গে দেখা করতে।' তার সেই অভি-

গানের সুরটি আজও যেন কাণে শুনতে পাচ্ছি।... একদিন সে বলেছিল—'তুমি পড়িয়ে দিলে, সেটা যেন জলের মত হয়ে যায়।' আমি তার চোখের দিকে চেয়ে একটু হেসেছিলাম।... আর একদিন মাথা ধরেছিল। সে বলেছিল—'আমি মাথা টিপে দিলে এক্ষুনি সেরে যাবে, কোন ওষুধের দরকার-ই হবে না।...' আচ্ছা এই কথা গুলোই আজ বারে বারে এত করে মনে হচ্ছে কেন? এই 'কেন'র উত্তর আজ আমায় কে দেবে?

* * * *

হঠাৎ নার্সকে বলে ফেললাম—তুমি ভারী সুন্দর! সে চটলে না একটু হাসলে। ডাক্তার এসে বললেনে—আপনি বড় বেশী ভাবেন। বন্ধু এসে বললে—তার বিয়ে হচ্ছে শীগ্‌গির-ই—বললাম—সে সেই মানুষ যার বিরুদ্ধে কিছু ভাব্‌তে গেলে ভারী কষ্ট হয়।...

* * * *

পৃথিবী যে এত সুন্দর আগে ত তা জান্‌তাম না! বাইরে অশ্বত্থডালে একটা কাক ডাকছে, কাকের ডাক এত মিষ্টি ত কোন দিন লাগেনি! গাড়ী মটর শব্দ করে চলেছে, মাঝে মাঝে কিসের ঘণ্টা বাজ্‌চে শুন্‌তে পাচ্ছি, একটা ঘুঁড়ি নীল আকাশের বুকে উড়্‌ছে আর উড়্‌ছে। একটা প্রজাপতি বারে বারে রৌদ্রে পাখা মেলে ঘরের ভিতর উড়ে উড়ে আস্‌ছে, তার কথা মনে পড়্‌ছে, সেই তার হাল্কা ছন্দময় গতিখানি।... নার্সকে বললাম, জানালার পরদা আর একটু সরিয়ে দাও, আমি আকাশটাকে একবার ভাল করে দেখি।

* * * *

সন্ধ্যার মুখে জ্বরটা একটু বেড়ে উঠ্‌ল।—

একটা তারা যেন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে! মনে হ'ল সে আমাকে ভালবাসে। হয়ত ভুল, কিন্তু তবু কি সুন্দর! এই ভুলকেই বুকে নিয়ে যেন মর্‌তে পারি। এস মরণ, তোমার গহন কালিমায় সমস্ত কলঙ্ক ঢেকে দাও, তোমার তুহিন-শীতল স্পর্শে সমস্ত আলো নূতন করে জেলে দাও, কিন্তু আমার এ ভুলকে ভেঙ্গোনা।

ভোলা

—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হ'লে ছেলেরা স্বভাবতঃ অভিমানী ও আদুরে হ'য়ে ওঠে, কিন্তু ভোলার এসব কিছুই ছিল না। তার অভিমান বল্‌তে ছিল দুফোঁটা চোখের জল আর আদর বল্‌তে আধ-পেটা মোটা চালের ভাত। সে আজ বারো বছরের কথা গ্রামের একটা সামান্য কুটীরে সুখে-দুঃখে, রোদে-জলে তার আধ্‌ ময়লা শরীরটা গড়ে উঠ্‌ছিল, আর দিদিমার বুক-ভরা স্নেহ, বর্ম্মের মতন তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে আস্‌ছিল; কিন্তু একদিন মৃত্যুর নির্দ্দয় ইঙ্গিতে সে আশ্রয়ও ভেঙ্গে পড়ল। শশ্মানের মৃত্যু-বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়িয়ে আট বছরের ছেলে ভোলা যখন তার দিদিমার মুখাগ্নি কর্‌ছিল, তখন ধীরে ধীরে তার সর্ব্ব শরীর অবশ হয়ে গেল, সে মাটীর উপর বসে পড়্‌ল! আজ সে তাহার একমাত্র আশ্রয়কে হারিয়েছে। তার আর আপনার বল্‌তে কেউ রইল না। সংসার-অনভিজ্ঞ বালকটির সরল মনে একটি কথা শুধু বার বার ঘুরে ফিরে আস্‌ছিল, পাড়ার আর সকলের দিদিমা ত রয়েছে তবে আমার দিদিমা মর্‌ল কেন?

দিন যায়। সে তার দূর সম্পর্কীয়া মামী সুরমার স্নেহ-নীড়ে আশ্রয় পেয়েছে। পুত্রহীনা নারীর হৃদয়ের কোমলতা ও বুকভরা স্নেহ এই চির স্নেহ-প্রয়াসী বালকের উপর পূর্ণ ধারায় বর্ষিত হয়েছে।

২

ভোলা আর সে ভোলা নাই তার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠেছে। শীতের অবসানে বসন্তের নব পল্লবের মত তার দেহে আবার কমনীয়তা ফিরে এসেছে। গ্রামে তার অনেক সঙ্গী জুটেছে; ভোলা তাদের সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে ধারে বেড়ায়, পাখীর ছানা পাড়ে আর নানা রকমের খেলা খেলে। ধীরে ধীরে মূক গ্রামটি আবার মুখর হয়ে উঠেছে।

দীন ভিক্ষুক যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয় তবে যেমন তার হৃদয় পাবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে আর অজ্ঞাতভাবে দু একটি অপকর্ম্মও করে বসে, সেইরূপ চির-স্নেহকাঙ্ক্ষী ভোলা যখন সুরমার অসীম স্নেহের অধিকারী

হ'য়ে বস্‌ল তখন দুষ্টুমিতে ভোলার নাম অজানা রইল না। একদিন মাধবের মা সুরমার কাছে এসে নালিশ করলে—

"বলি হাঁগা, তোমাদের ভোলা, রোজ রোজ মাধবকে মারে কেন বলত?

সুরমার ওষ্ঠে একটা ম্লান মৌন হাসি এসে চকিতে মিলিয়ে গেল। সুরমা বল্‌লে—"হাঁ ভাই, ছেলেটা বড় দুষ্টু হয়েছে; কারুর কথা শোনে না, আচ্ছা এলে আজ খুব বকে দেবথ'ন।"

ঠিক এই সময়ে ভোলা বাড়ীতে ঢুক্‌ছিল, কিন্তু মাধবের মাকে দেখে তার আর যাওয়া হল না। বাহিরে গোলার নীচে গিয়ে লুকিয়ে রইল, তার পর মাধবের মা চলে গেলে ছুটে গিয়ে মাকে বল্‌লে "মা খেতে দে বড় খিদে লেগেছে।" সুরমার মনে তখন পাড়ার লোকের নালিশ আর বিরক্তি তোল পাড়্ কর্‌ছিল, তখনই ভোলার কানটা ধরে বল্‌লে। "খেতে দেব না ছাই দেব, দুষ্টু ছেলে দুষ্টুমিতে ভরে উঠেছে। যার তার ছেলেকে মার্‌বেন ওঁর জ্বালায় আমার পাড়ায় থাকা ভার হ'ল।

ভোলা বল্‌লে "মাগো, আমি কাকে মার্‌লাম?"

"কেন মাধবকে মেরেছিস্ তার মা এসে বল্‌ছিল।

"তা ও হালদারদের সুধাকে মার্‌ছিল কেন? তাইত—"

"না উনি কিছু জানেন না। দুষ্টু ছেলের দুষ্টপনা দিন দিন বেড়ে চলেছে! আচ্ছা ওদের বাড়ীর শ্যাম শম্ভু প্রভাত সুশীল এরা ত সব রয়েছে ওদের নিন্দে ত কেউ করে না। ওরা তোর চাইতেও ঢের ভাল।"

"হাঁ ভাল বৈ কি, কৈ ওরা ত আমার মত গাছে উঠ্‌তে পারে না; সেবারে যখন একটা কাঠ-বেড়ালীর ছানা ওই বট গাছ থেকে পড়ে গেল, তখন ওরা ত কেউ গাছে উঠ্‌তে পার্‌লে না—আমি গিয়ে ত ছানাটাকে তার বাসায় রেখে এলাম, আর ওরা আমার মতন সাঁতার কাট্‌তে পারে বুঝি, সেদিন নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে সুধা যখন হঠাৎ নদীতে পড়ে গেল আর একটু হলে ডুবে গেছিল আর কি আমি গিয়ে ত তুল্‌লাম।"

"তা মাধবকে আজ মার্‌লি কেন?

"মার্‌ব না ত কি? সুধা ওদের গাছের গোটা কতক চাঁপা ফুল আমাকে দেবার জন্যে নিয়ে আস্‌ছিল, রাস্তায় মাধব ত তাকে মেরে সব কেড়ে নিয়েছে।"

সুরমার মন আবার ধীরে ধীরে নরম হ'ল। এই সরল ছেলেটির চল্‌চল

টানা চোখ দুটি দেখ্‌লে সুরমা রাগ দুঃখ সকলই ভুলে যেত। ভোলা যখনই মা বলে এসে দাঁড়াত সুরমার চির-বুভুক্ষু হৃদয়ে কে যেন অমৃতের পূত ধারা ঢেলে দিত; নৈরাশ্য-তাপদগ্ধ হৃদয়ে কে যেন শীতল স্নিগ্ধ-প্রলেপ দিত। খণিক সুখের তড়িৎ প্রবাহে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ত। আর কি এক মোহিনী-মন্ত্রে তার রাগ দুঃখ নিমেষে অন্তর্হিত হ'য়ে যেত এই ক্ষণিক সুখটুকু সুরমার নিকট বড়ই মধুর, বড়ই প্রীতিকর।

৩

আরও কিছু দিন চলে গেছে এর মধ্যে ভোলার এই স্বাধীন প্রকৃতির উপর কেহই পরাজয়ের ছাপ দিতে পারে নি! কিন্তু এ পথের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াল সুরমার স্বামী। ভোলার অনাথ অবস্থা দেখে তাঁর মনে যে দয়ার উদ্রেক হয়েছিল, ভোলার দুষ্টমি ও স্বাধীন প্রকৃতিতে তাঁর মনে আবার বিপরীত ভাবের উদয় হল। কিন্তু সুরমা পাছে রাগ করে একন্য তার সাম্‌নে ভোলাকে কিছু বল্‌তেন না বটে, কিন্তু সুরমার অসাক্ষাতে তাকে বকে দিতেন। কিন্তু এ বকুনিও ভোলা নিঃশব্দে সহ্য কর্‌ত। যে দিন খুব বেশি রকম বকুনি হ'ত, সে দিন সজল চোখে সুরমার কাছে গিয়ে নালিশ কর্‌ত সুরমার আদরে সব ভুলে গিয়ে যেমনটি ছিল আবার ঠিক তেমনটি হ'ত। কিন্তু সুরমা যে দিন তাকে কোন কথা বল্‌ত, সে দিন তার চোখে আর জল ধর্‌ত না; যত বারই তার মন শান্ত হতে চাইত, ততবারই আবার অভিমানের প্রবল বন্যা এসে তার চোখ দুটি সজল ক'রে তুল্‌ত।

বার বছরের ছেলে কোন কাজ কর্‌ত না তাইতে স্বামী যখন তখন ভোলাকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে বল্‌তেন। কিন্তু ভোলাকে পাঠিয়ে দিতে সুরমার মন উঠ্‌ত না। ভোলা তার চোখের মণি হয়ে উঠেছিল।

ভোলার এখন কাজের মধ্যে সকাল বেলায় পাঠশালায় যাওয়া আর দুপুরে নদীর ধারে ধারে নিজের দল নিয়ে বেড়ান। গুরুমহাশয় যদিও বুঝে ছিলেন লেখা পড়াটা তার ধাতে সইবে না তবুও ভোলাকে তিনি ভালবাসতেন তার কারণ ভোলার সরলতা, তার কারণ ভোলার গুরুসেবা। মাস না যেতে যেতে সুরমার কাছ থেকে পুরো দক্ষিণাটা আদায় করা তার একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বর্ষাকালে একদিন ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়্‌ছিল আর তার সঙ্গে সঙ্গে

বাজ পড়্ছিল। সুরমা রান্না ঘর থেকে শয়ন ঘরে এসে দেখ্লে ভোলা নাই! এত বৃষ্টিতে ভোলা কোথায় বেরিয়েছে! না এ ছেলেটাকে আর পারা যায় না! সুরমার মনে হচ্ছিল সে নিজেই নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছে। এমন সময় ভোলা একটা ছেঁড়া ছাতা মাথায় দিয়ে এসে হাজির! সুরমা তার দিকে চেয়ে বল্লে—"বলি এত বৃষ্টি বাদলে কোথায় কি কাজে গেছিলি? না তোর কি একটুও বুদ্ধি শুদ্ধি হল না, সুধাদের বাড়ীতে বুঝি খাওয়া হয়েছিল?

ভোলা তার টানা চোখ দুটো তুলে বল্লে "না মা, গুরু মশায়ের ছেলের বড় অসুখ করেছে—তাই একটু পুরাণো তেঁতুল দিয়ে আস্তে গিয়েছিলাম।

আর বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ কর্লে তোকে কে দেখ্বে বল্ত?

"কেন তুই?—"

"হাঁ, আমি তোর জন্যে চিরকাল বেঁচে থাকুব আর কি; আমি মরে গেলে তোর যে কি দশা হবে, তা ভেবে পাইনে।"

ভোলার চোখ দুটো ছলছল্ ক'রে উঠ্ল, সে সুরমার কোলে মুখ গুঁজে রইল।

৪

সেবার কলেরাটা খুব বেশী করেই হয়েছিল. পাড়াগাঁয়ের ওপর এ রোগ টার আক্রোশটা কিছু বেশী। ভোলাদের গাঁয়ের চারিদিকে মৃত্যু উৎ[illegible] আরম্ভ হয়েছে, সকলই সন্ত্রস্ত হয়ে আছে কখন কার ডাক পড়ে। সর্ব্বপ্রথ[illegible] ডাক এল সুরমার! দূর গ্রাম থেকে ডাক্তার ডেকে এনে সেই যে ভোলা সুরমা[illegible] পাশে এসে বসেছিল, তারপর একটুও ওঠে নি। সুরমা তখন ধীরে ধীরে বল[illegible] "ভোলা কাছে থাকিস্নি বাবা, এ যে ছোঁয়াচে রোগ।" ভোলা কোন কথা কয়ে সুরমার সেবা শুশ্রূষা কর্তে লাগ্ল।

সুরমার স্বামী একটু দূর গ্রামে এক জমিদারী সরকারে চা[illegible]রী ক[illegible] তিনি সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। এসে দেখ্লেন সুরমা[illegible] সুন্দর দেহে কে কালীমা ঢেলে দিয়েছে! সুরমা স্বামীকে খুব কাছে [illegible]কে [illegible]য়ে ধীরে "আমি ত মরতে বসেছি, আমার এই শেষ অনুরোধটা তু[illegible] রেখো, ভো[illegible] দেখো।" তারপর সে আর কথা কইতে পার্লে না, ভোলা[illegible]কে চাইতে চা[illegible] তার চঞ্চল দৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে গেল। ভোলার আকুল ক্রন্দন [illegible] বুকভরা বেদনায় দিয়ে সুরমার অস্তিত্ব শশ্মানের ধূলিকণায় মিশে গেল।

৫

সুধাদের বাড়ীটা ঠিক নদীর ধারে। সুধার বাপ একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সুধা তাঁর একমাত্র কন্যা। তাই সুধাকে তিনি বড় ভাল বাস্‌তেন এবং তাহার ইচ্ছা কখন অপূর্ণ রাখ্‌তেন না। সুধাকে ভোলার বড়ই ভাল লাগ্‌ত। যে দিন ভোলা নদী থেকে সুধাকে তুলেছিল সেদিন থেকে সুধা ভোলার বড়ই অনুগত হ'য়ে পড়ে ছিল। আর সুধার বাপ মা ও ভোলাকে নিজের ছেলের মতন ভাল বাস্‌তেন।

ভোলার মামা আবার বিয়ে করে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই নূতন স্ত্রীতে দ্বিতীয় পক্ষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বেশ নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছিল। ভোলার নূতন মামীমা ভোলাকে কখনও স্নেহের চোক্ষে দেখেন নি। উপরন্তু স্বামীর কাছে যখন তখন ভোলার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে তার প্রতি নির্য্যাতনের পথটা বেশ সুগম করে দিতেন।

একদিন মামার কাছে বকুনি খেয়ে ভোলার মনটা কেমন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল। সে কোন কথা না বলে নদীর ধারের বটগাছের তলায় এসে বসল। রাগে দুঃখে অভিমানে তার বুকটা ফুলে ফুলে উঠ্‌ছিল আর চোখ দুটোতে জল জমে আস্‌ছিল। সুধা তাদের ঘরের জানালা দিয়ে দেখ্‌তে পেলে—ভোলা এই দুপুর রোদে নদীর ধারে বটগাছের তলায় চুপটি করে বসে আছে!

সে ছুটে গিয়ে মাকে বল্‌লে "মা ভোলা দাদা, এই দুপুর রোদে নদীর ধারে ওই বটগাছের তলায় চুপটি ক'রে বসে আছে, কেন মা?

"বোধ হয় ওর মামা কিছু বলেছে, তাই রাগ করে এসেছে। যা সুধা, ই ওকে আমাদের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আয়"।

সুধা তখনই বটগাছের তলায় পা টিপে টিপে এসে পিছন থেকে ভোলার াখ দুটো টিপে, ধ' বল্‌লে "কে না বল্‌লে ছাড়্‌ছি না"।

ভোলা বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে "বারে সুধা—পরের দুঃখ দেখে বেশ আমোদ শিখিছিস্‌ ত। শিগ্‌গির আমার চোখ ছাড়্‌, বল্‌ছি, তোকে এখানে ক কে বল্‌লে?

ধা ভোলার চোখ ছেড়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে এতটুকু কার ভোলার কাছে থেকে কখনও পায় নি। অভিমানে তার চোখ ছল্‌ছল্‌ কর্‌ছিল। তারপর সে ভাঙ্গা গলায় বল্‌লে "মাগো, আমি বুঝি এসেছিলুম, মা ত আমাকে তোমায় ডেকে নিয়ে যেতে বল্‌লে।"

"বেশ, আমি যাব না, তুই চলে যা। দাঁড়িয়ে রইলি যে ?"

তারপর তুজনে অনেকক্ষণ চুপকরে রইল। ভোলার মন ধীরে ধীরে নরম হ'য়ে গেল। এই ছোট মেয়েটিকে সে একদিনও কোন তিরস্কারের কথা বলে নি, তাই তার মন অনুতাপে পূর্ণ হ'য়ে গেল। সে ধীরে ধীরে বল্লে "সুধা, রাগ করলি বুঝি, আচ্ছা তোর মা কেন ডাকছে বলত ?

"তুমি রাগ ক'রে এসেছ তাই মা তোমাকে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে খেতে বল্লে"

"না আমি যাব না, দিন দিন তোদের বাড়ী গিয়ে খাব না।"

"চল ভোলা দা, চল মা অনেক করে বলে দিয়েছে আর তুমি চাঁপা ফুল ভালবাস আজ সকালে আমি একছড়া চাঁপা ফুলের মালা গেঁথেছি, সে ছড়া তোমার দেব'খন।"

"সত্যি, দিব্বি বলছিস ত ?"

"আচ্ছা সত্যি কিনা দেখবে চল না"

এই সরলা বালিকার ব্যগ্র আহ্বানে ভোলার রাগ দুঃখ কোথায় ভেসে গেল। সে সুধার সঙ্গে তাদের বাড়ীতে গেল। সুধার মা ভোলাকে খুব যত্ন করে খাওয়ালেন। আহারের পর ভোলা যখন ঘাটে গিয়ে মুখ ধুচ্ছিল তখন সুধা পিছন থেকে গিয়ে চাঁপা ফুলের মালা ছড়াটি তার মাথা গলিয়ে ফেলে দিয়ে বল্লে "কেমন ভোলাদা আমার কথা সত্যি হ'ল ত ?"

৬

প্রায় পাঁচ বৎসর কেটে গিয়েছে, ভোলার দুঃখময় জীবনের ঘটনা-স্রোত একই ভাবে চলেছে। সারাদিন খেটেও যখন নূতন মামী ও মামার মন উঠ্‌ত না তখন ভোলার জীবনে বিকার আস্‌ত। সে কেন জন্মেছিল, তার জীবনে একটা দুঃখ শোকের কাহিনী মূর্ত্তিমতী হয়ে রয়েছে, যার ভবিষ্যৎ ও অতীতের দিকে যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু অন্ধকারে ভরা, তার জগতে না থাকাই ভাল। অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা যতই তাকে পেয়ে বসত, সুরমার বাৎসল্য ও যত্নের কথা ততই তাকে পাগল করে তুলত। সে বড় হতভাগা তাই এমন স্নেহময়ী মাকে পেয়েও হারিয়েছে।

সুধা বেশ বড় হয়েছে। অনেক জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল। সুধার মার ইচ্ছা ছিল ভোলার সঙ্গে সুধার বিয়ে দেন কিন্তু সুধার বাবা এই সঙ্গতিহীন যুবকের সঙ্গে সুধার বিয়ে দিতে সম্মত হলেন না। পাশের গ্রামে

৫

সুধাদের বাড়ীটা ঠিক নদীর ধারে। সুধার বাপ একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। সুধা তাঁর একমাত্র কন্যা। তাই সুধাকে তিনি বড় ভাল বাসতেন এবং তাহার ইচ্ছা কখন অপূর্ণ রাখতেন না। সুধাকে ভোলার বড়ই ভাল লাগ্‌ত। যে দিন ভোলা নদী থেকে সুধাকে তুলেছিল সেদিন থেকে সুধা ভোলার বড়ই অনুগত হ'য়ে পড়ে ছিল। আর সুধার বাপ মা ও ভোলাকে নিজের ছেলের মতন ভাল বাস্‌তেন।

ভোলার মামা আবার বিয়ে করে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই নূতন স্ত্রীতে দ্বিতীয় পক্ষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বেশ নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছিল। ভোলার নূতন মামীমা ভোলাকে কখনও স্নেহের চোক্ষে দেখেন নি। উপরন্তু স্বামীর কাছে যখন তখন ভোলার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে তার প্রতি নির্য্যাতনের পথটা বেশ সুগম করে দিতেন।

একদিন মামার কাছে বকুনি খেয়ে ভোলার মনটা কেমন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল। সে কোন কথা না বলে নদীর ধারের বটগাছের তলায় এসে বসল। রাগে দুঃখে অভিমানে তার বুকটা ফুলে ফুলে উঠ্‌ছিল আর চোখ দুটোতে জল জমে আস্‌ছিল। সুধা তাদের ঘরের জানালা দিয়ে দেখ্‌তে পেলে—ভোলা এই দুপুর রোদে নদীর ধারে বটগাছের তলায় চুপটি করে বসে আছে!

সে ছুটে গিয়ে মাকে বল্‌লে "মা ভোলা দাদা, এই দুপুর রোদে নদীর ধারে এই বটগাছের তলায় চুপটি ক'রে বসে আছে, কেন মা?

"বোধ হয় ওর মামা কিছু বলেছে, তাই রাগ করে এসেছে। যা সুধা, তুই ওকে আমাদের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আয়"।

সুধা তখনই বটগাছের তলায় পা টিপে টিপে এসে পিছন থেকে ভোলার চোখ দুটো টিপে, ধ'রে বল্‌লে "কে না বল্‌লে ছাড়্‌ছি না"।

ভোলা বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে "বারে সুধা—পরের দুঃখ দেখে বেশ আমোদ শিখিছিস্ ত। শিগ্‌গির আমার চোখ ছাড়্, বল্‌ছি; তোকে এখানে আস্‌তে কে বল্‌লে?

সুধা ভোলার চোখ ছেড়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে এতটুকু তিরস্কার ভোলার কাছ থেকে কখনও পায় নি। অভিমানে তার চোখ ছল্‌ছল্ করছিল। তারপর সে ভাঙ্গা গলায় বল্‌লে "মাগো, আমি বুঝি এসেছিলুম, মা ত আমাকে তোমায় ডেকে নিয়ে যেতে বল্‌লে।"

"বেশ, আমি যাব না, তুই চলে যা। দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

তারপর দুজনে অনেকক্ষণ চুপকরে রইল। ভোলার মন ধীরে ধীরে নরম হ'য়ে গেল। এই ছোট মেয়েটিকে সে একদিনও কোন তিরস্কারের কথা বলে নি, তাই তার মন অনুতাপে পূর্ণ হ'য়ে গেল। সে ধীরে ধীরে বল্লে "সুধা, রাগ করলি বুঝি, আচ্ছা তোর মা কেন ডাকছে বল্‌ত ?

"তুমি রাগ ক'রে এসেছ তাই মা তোমাকে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে খেতে বল্লে"

"না আমি যাব না, দিন দিন তোদের বাড়ী গিয়ে খাব না।"

"চল ভোলা দা, চল মা অনেক করে বলে দিয়েছে আর তুমি চাঁপা ফুল ভালবাস আজ সকালে আমি একছড়া চাঁপা ফুলের মালা গেঁথেছি, সে ছড়া তোমার দেব'খন।"

'সত্যি, দিব্যি বল্‌ছিস ত ?"

"আচ্ছা সত্যি কিনা দেখ্‌বে চল না"

এই সরলা বালিকার ব্যগ্র আহ্বানে ভোলার রাগ দুঃখ কোথায় ভেসে গেল। সে সুধার সঙ্গে তাদের বাড়ীতে গেল। সুধার মা ভোলাকে খুব যত্ন করে খাওয়ালেন। আহারের পর ভোলা যখন ঘাটে গিয়ে মুখ ধুচ্ছিল তখন সুধা পিছন থেকে গিয়ে চাঁপা ফুলের মালা ছড়াটা তার মাথা গলিয়ে ফেলে দিয়ে বল্লে "কেমন ভোলাদা আমার কথা সত্যি হ'ল ত ?"

৬

প্রায় পাঁচ বৎসর কেটে গিয়েছে, ভোলার দুঃখময় জীবনের ঘটনা-স্রোত একই ভাবে চলেছে। সারাদিন খেটেও যখন নূতন মামী ও মামার মন উঠ্‌ত না তখন ভোলার জীবনে ধিক্কার আস্‌ত। সে কেন জন্মেছিল, তার জীবনে একটা দুঃখ শোকের কাহিনী মূর্ত্তিমতী হয়ে রয়েছে, যার ভবিষ্যৎ ও অতীতের দিকে যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু অন্ধকারে ভরা, তার জগতে না থাকাই ভাল। অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা যতই তাকে পেয়ে বস্‌ত, সুরমার বাৎসল্য ও যত্নের কথা ততই তাকে পাগল করে তুল্‌ত। সে বড় হতভাগ্য তাই এমন স্নেহময়ী মাকে পেয়েও হারিয়েছে।

সুধা বেশ বড় হয়েছে। অনেক জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আস্‌তে লাগ্‌ল। সুধার মার ইচ্ছা ছিল ভোলার সঙ্গে সুধার বিয়ে দেন কিন্তু সুধার বাবা এই সঙ্গতিহীন যুবকের সঙ্গে সুধার বিয়ে দিতে সম্মত হলেন না। পাশের গ্রামের

এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে সুধার বিয়ের পাকাপাকি হ'য়ে গেল।

সেবার "পড়্‌ল ফাল্গুণ উঠ্‌ল আগুন" কথাটা সত্যি হয় নি; তবে বসন্তের হাওয়া যে ভাল করে বহেনি একথা বললে ভুল হবে। শীতটাকে বসন্ত মোটেই পছন্দ করে না; তাই সে নিজের পোষাক দিয়ে প্রকৃতিকে নূতন সাজে সাজিয়ে দেয়। বসন্তের এই নূতন সৌন্দর্য্যে ও কোমলতায় আর কোকিলের প্রাণ-মাতান তানে মানুষকে কেমন ক'রে ফেলে, মানুষ প্রকৃতির এই উৎসবে যোগ না দিয়ে থাক্‌তে পারে না, মানুষ আনন্দ-পথের পথিক, তাই তাহার অজ্ঞাতসারে তার মন আনন্দে নেচে উঠে।

এমন বসন্তের এক প্রভাতে হালদারদের বাড়ীতে শানাই বেজে উঠ্‌ল; কিন্তু এ শানায়ের ধ্বনি উদ্দাম হৃদয়ের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছে না, এ যেন কোন সংযত হৃদয়ের করুণ নিবেদন, কোন ব্যর্থ জীবনের প্রাণস্পর্শী বিলাপ। এ শানাইএ ভোলার মন আনন্দে উদ্বেলিত হচ্ছে না, এ যেন তার মানস চক্ষে অতীতের এক জ্বালাময় রঙ্গিন দৃশ্যপট ধীরে ধীরে প্রকাশিত করছে। বাল্যের রঙ্গিন কল্পনা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এমনি করে শুকিয়ে যায় বটে; তবু যে কল্পনা আমাদের মাথার উপর এত বড় একটা দুঃখের বোঝা অকাতরে চাপিয়ে দেয়, কই তাকে কি আমরা না ভালবেসে থাক্‌তে পারি?

একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে তার বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেল আর তার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা দমে গেল। এখানকার মানুষগুলো বড় নির্দ্দয়। তারা তার বুকটা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। আর এ গ্রামটা তাকে যেন চায় না। তাই তার সকল বাঁধন একে একে কেটে দিলে। যেদিন সুরমার স্নেহের শক্ত বাঁধন শশ্মানের ধূলার মধ্যে খসে পড়্‌ল সেদিনই ভোলা মনে করেছিল এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, তখন সে ভাবেনি আর একটা শক্ত বাঁধন তার অজ্ঞাতে তাকে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু সে বাঁধনও আজ ছিঁড়ে গেল, তবে মৃত্যুর নির্দ্দয় ইঙ্গিতে নয়, আনন্দের প্রাণহীন স্বার্থপরতায়। যেখানে অর্থের তুলায় মানুষকে বিচার করা হয়, যেখানে মানুষের গুণ শুধু অনাদর পায় যেখানে নিজে তার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ কেটে দিয়েছে সেখানকার মাটি কামড়ে থাক্‌তে তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না শুধু জীবনের একটা সুখময়ী স্মৃতি তাকে বড়ই নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ছিল, আর সেই স্মৃতির বাহন হ'য়ে ছিল সেদিন কার

সেই মালা ছড়াটা। ভোলা সতর্কিত ভাবে সেটা তার ভাঙ্গা বাক্স থেকে বার করলে, তার পর চারিদিকে চেয়ে বুকে স্পর্শ করলে ভোলার শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল।—মালাটা এর সকল সুখ বিলিয়ে দিয়েছে, আর কিছুই বাকি নেই আর এই ফুলগুলোর বুকে কে যেন দুঃখের পাষাণ চাপিয়ে দিয়েছে তাই তারা নির্ব্বাক হয়ে শুখিয়ে গিয়েছে! ভোলা সুরমার উদ্দেশে একবার প্রনাম করে, মালাটাকে বুকে ধরে বেরিয়ে পড়্‌ল।

সন্ধ্যা ধীরে ধীরে জগতে নেমে এসেছে আর কুল-ললনার শঙ্খরোলে তাঁর অভ্যর্থনা হচ্ছে। ভোলা নদীর পথ ধরে বরাবর চল্‌ল। আজ নদীর কল্লোলে কি যেন একটা ভাষা ফুটে উঠেছে, নদী যেন কি বল্‌তে চায়, কিন্তু পার্‌ছে না, তাই অভিমানে ফুলে উঠে মাথা খুঁড়্‌ছে।

যেখানে নৌকা থেকে সুধা পড়ে গিয়ে ছিল, সেখানে আজও একটা নৌকা বাঁধা রয়েছে, শুধু নাই সে অতীত সুখময় দিনগুলি। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মনের ভারটা একটু নাবিয়ে দিয়ে ভোলা আবার চল্‌তে লাগ্‌ল। আজ প্রকৃতি যেন সজাগ হয়ে উঠেছে। আন্ধকার বরাবর তাকে বাধা দিতে দিতে চলেছে আর ঝিল্লিরা যেন তাকে এই লক্ষ্যহীন যাত্রার জন্য কর্কশ কণ্ঠে তিরস্কার কর্‌ছে। কিন্তু ভোলার মন আজ আর বাধা মান্‌ল না। গ্রামের সীমা যখন পার হয়েছে, সাম্‌নে মাঠ পড়েছে তখন হঠাৎ তার প্রাণটা কেঁপে উঠ্‌ল হয়ত জীবনে সে এ গ্রাম আর দেখতে পাবে না। যে গ্রামে তার বাল্যস্মৃতি এমন নিবিড় ভাবে জড়িয়ে আছে। সে গ্রামটিকে ছাড়্‌তে তার পা উঠ্‌ছিল না। দু এক পা পিছিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু আবার উৎসাহের জয় হ'ল। মাঠের আঁকা বাঁকা পথ ধরে আবার তার চলা সুরু হল। তার মনে হচ্ছিল যেন কত জন্ম ধরে সে এমনি পথে কোন্‌ ঈপ্সিতের সন্ধানে যাত্রা করেছে, আর সে যাত্রার এখন ও শেষ হয় নি।

ওদের অস্তর দিয়ে মারে—প্রাণটাকে আর শাস্তর দিয়ে মারে—মনটাকে।

'মুক্তধারা'

হারানিধি

—শ্রীহরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

"বড় গরীব মশায় আমি, কেউ নাই আমার, আপ্‌নি না রাখ্‌লে তো আর বাঁচি না।"

এইটুকু বলিয়াই যুবকটি কাঁদিয়া উঠিল। সারারাত্রি কারখানায় কাজ করিয়া সবে মাত্র আমি বাড়ী ঢুকিতেছি। লোকটির চেহারা দেখিয়া এবং ক্রন্দন শুনিয়া প্রাণে একটু দয়া হইল কিন্তু নিদ্রালু চক্ষু এবং অবশ শরীর আমাকে আর স্থির থাকিতে দিল না। আমি চাকরকে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম "কে রে ও লোকটি?" উড়িয়া চাকর সর্ব্বদাই একটু ভয়ে ভয়েই থাকিত। সে আমাকে কিছু না বলিয়া সেই আগন্তুককে ফটকের বাহির করিয়া দিল।

আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কে কাঁদ্‌ছিল?" আমার তখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, "জানি না।"

বারঘণ্টা আগুণের পাশে কারখানায় কাজ করা যে কি কষ্ট তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যে বোঝে না, সে ও বুঝিত না, তাই আমার উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "জান না! আহা সকাল বেলাটায়—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে চাকরকে চুপি চুপি কি বলিল। আমি হাত মুখ ধুইয়া এক গেলাস সরবৎ খাইয়া শুইবামাত্র নিদ্রিত হইলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল বেলা তিনটা। উঠিবামাত্র প্রাতঃকালের সেই লোকটার কথা মনে হইল। সমস্ত বুকখানা অনুতাপে ভরিয়া গেল। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলাম না। স্নান আহার সারিয়া ডাকের চিঠি পত্র পড়িতে ও জবাব দিতে বসিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমার স্ত্রী আসিয়া "বলিল কি গো, লেখা পড়া হ'ল? আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "প্রায়, কেন?" মেজাজটা সরস দেখিয়া সে কাছে বসিয়া একথা সেকথা আরম্ভ করিল। আমি "হুঁ, হাঁ, না, তাই নাকি" এই সমস্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে দিতে হাতের কাজ শেষ করিলাম।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া প্রাণটা আঁৎকাইয়া উঠিল। কাজে যাইবার মহেন্দ্রক্ষণ

উপস্থিত। চারুকে বলিলাম, "পোষাকগুলো দাও চারু। আর এক গেলাস জল দাও।"

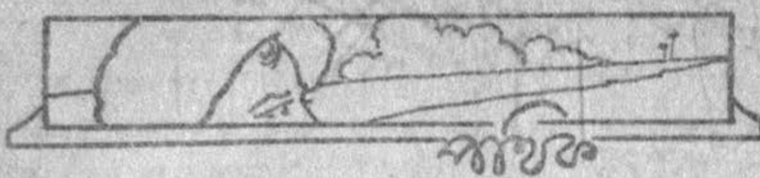
হাতের জিনিসগুলি নামাইয়া একটি যুবক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার মুখের পানে চাহিয়া আমি বলিলাম, "তুমিই কি সকালবেলা এসেছিলে বাপু" যুবকটি নতমুখে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ। মা আমাকে চাকর দিয়ে ডাকিয়ে পাঠান। আজ এইখানেই মায়ের প্রসাদ পেয়েছি। বাবু! আমি বড় গরীব, বড় হতভাগা, আমার বল্‌তে আমার কেউ নাই" বলিতে বলিতে যুবকের অশ্রুজলে গণ্ড ভাসিয়া গেল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। মনে ভাবিলাম, প্রকৃতই মাতৃত্ব চারুর ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু আলো করে আছে।

যুবককে সঙ্গে লইয়া সাহেবকে দেখাইলাম। সাহেব লোক ভাল আমার এক কথাতেই চাকরী দিলেন। তাহার নামটি লিখিতে লিখিতে মনে হইল, আহা বেশ নামটি। বড় আপনার এ নামটি আমার, সে আজ বার বৎসরের কথা যখন দুটি ভাই বিমাতার অত্যাচারে দেশত্যাগী হয়েছিলাম। অতি কষ্টে লেখা পড়া শিখে আমি আজ বড়বাবু হয়েছি, হায় কে জানে স্নেহের ভাইটি আজ আমার কোথায়। যুবককে পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। সে শ্রী বলিয়া একটু থামিয়া বলিল, রামধন আবার একটু থামিয়া বলিল, শ্রীরামধন ঘোষ। আর লিখিতে পারিলাম না। চোখের জলে কাগজ ভরিয়া গেল। হাত লাগিয়া দোয়াতটা উল্টাইয়া পড়িল। আমি বলিলাম, "ভাই সুবোধ তোমার বাড়ী কি নতিডি ?"

যুবক আমার মুখখানে চাহিয়া বলিল "আজ্ঞে হাঁ। তা আপনি কি করে জান্‌লেন ?" আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলাম।

তৃপ্তিতে বুক ভরিয়া গেল। সে রাত্রে আর কাজ করিতে পারিলাম না। ছুটি লইয়া দুই ভ্রাতায় বাসায় ফিরিলাম।

অসময়ে ফিরিতে দেখিয়া চারু জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরে এলে যে ?" সুবোধ যাইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। আমি বলিলাম, "আজ যে হারানিধি পেয়েছি চারু ! আর কি কাজে মন লাগে ?"



(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩১

মানুষ তাহার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধির দ্বারা কতকগুলি চিন্তা বা কাজকে—'অন্যায়' 'ভুল' 'অসত্য' 'পাপ' প্রভৃতি নাম দিয়া রাখিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকারে এই সমস্ত হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এই বিচার-বুদ্ধির মধ্যে প্রকাণ্ড একটা স্বার্থ, প্রবল একটা আত্মাভিমানও বিশেষভাবে জড়ান আছে। 'ভুল করিব না' 'অন্যায় করিব না' এই কথার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে,—শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান। এই অভিমানের সম্মোহনে পড়িয়া মানুষ অত্যন্ত নিবিড় সম্বন্ধ গুলিকেও ছিঁড়িতে উদ্যত হয়। কিন্তু শ্রদ্ধা প্রেম বা স্নেহ একবার যেখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে তাহাকে সেখান হইতে তাড়ান মানুষের ক্ষমতার বাহিরের জিনিস। তাহাকে অস্বীকার করা যায় কিন্তু নির্ম্মূল করিয়া তুলিয়া ফেলা যায় না। স্বার্থ বা অভিমানের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত প্রাণ রক্তের প্রবাহের মধ্যে চীৎকার করিয়া বলে—ছেঁড়া যায় না।—ছেঁড়া যায় না . . . এই কান্না কোন কিছু দিয়াই থামান যায় না।

বিকাশ তাহাকে অপমান করিয়াছে এই কথা শুধু যতদিন দীপ্তির মনে ছিল ততদিন সে তীব্র একটা অশ্রদ্ধার পর্দ্দা আপনার মনের উপর ঝুলাইয়া আপনাকে বিকাশের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। এই অশ্রদ্ধার মধ্যে সে এক প্রকারের শান্তি ও তৃপ্তি পাইত। কিন্তু যেদিন ঐ অপমান হইতে বাঁচিবার বাসনা মনে প্রবেশ করিয়াছে সেইদিন হইতেই সম্পূর্ণ এক নূতন ভয় ধীরে ধীরে তাহার মনটিকে অধিকার করিয়া বসিতেছিল। এ অপমান হইতে তাহাকে বাঁচাইবে—আর একজন পুরুষ; তাহার নিজের বাঁচিবার সাধ্য নাই! এই ত্রাণ কর্ত্তাকে সে দেখিয়াছে কিন্তু তাহাকে চিনিবার কথা তাহার মনে আসে

নাই,—কোন পরিচয়ও তাহার লয় নাই এবং সে আপনি এক প্রকার সাধিয়া নীরবতার সাহায্যে প্রকারান্তরে তাহার সম্মতি দিয়াছে।

অসিত প্রথম হইতেই এমন ভাব দেখাইয়া আসিয়াছে যেন দীপ্তি তাহার ব্যবসা-সংক্রান্ত একটি 'জয়' বা 'ল্যাভের'ই সামিল। দীপ্তিকে সে যে পাইবে তাহা যেন সে প্রথম হইতেই জানিত বা ধরিয়া লইয়াছিল। এবং কোন দিক হইতে কোন আপত্তির সম্ভাবনা না দেখিয়া একদিন সন্ধ্যায় সে যখন দীপ্তিকে আপনার বুকের উপর চাপিয়া তাহার জীবনের উপর বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দিল, দীপ্তি সেই মুহূর্ত্তে প্রথম অনুভব করিল—আশ্চর্য্য আর এক নূতন অনুভূতি!

প্রেম, স্নেহ, ভক্তি কি তাহার নাম সে জানে না। তাহার মনে হইল—বিকাশ তাহার হাতের উপর একগুচ্ছ ফুল রাখিয়া ফুলশুদ্ধ তাহার হাতখানি আপনার মুখের কাছে আনিয়া তাহাতে মুখ রাখিতে গিয়া সহসা ছাড়িয়া দিয়া অপরাধীর মত সরিয়া গেল। . . .

অসিত তখন দীপ্তির মুখের উপর আপনার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। দীপ্তির হৃদয় স্পন্দন কয়েকবার অতি দ্রুত উঠিল পড়িল। সে স্পন্দনে যেন আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছিল—বিকাশ—বিকাশ—বিকাশ—'

ইহার পর কয়েকদিন ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে যে সংগ্রাম চলিল, বিবাহের দিন সকালে তাহা করুণার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িল। মার গলা জড়াইয়া দীপ্তি ভীত শুষ্ককণ্ঠে বলিল—এ বিয়ে বন্ধ করে দাও মা—আমি পারব না, মরে যাব।

করুণা শান্ত ভাবে বলিলেন—আয়োজন সব শেষ হয়েছে; নেমন্তন্ন ও বাকি নেই, তুই বলিস্ কি?—

দীপ্তি। তা হ'ক, বন্ধ করে দাও মা।

করুণা। হয় না।

দীপ্তি। কেন? তবে ওরা আসুক,—খেয়ে যাক্।

করুণা। হয় না।

দীপ্তি। কেন?—

করুণা। ওরা আসছে এই বিয়েটাকে উপলক্ষ্য করেই,—তুই নিজেই ওদের ডেকেছিস্।

দীপ্তি কতকটা আপনার মনেই বলিল—ওদের নেমন্তন্ন-রক্ষার জন্যই আমাকে বিয়ে করতে হবে?—

করুণা। আজ অন্তত তাই হোক; পরে এ বিয়েকে সত্য করতে চেষ্টা করিস্।

বিবাহের দিন দীপ্তিকে এত ভীত ও অবসন্ন দেখিয়া তাহার বিবাহিত কয়েকটি বন্ধু হাসিয়া কুটি-পাটি হইল। দীপ্তির কাণের কাছে মুখ আনিয়া একজন বলিল—অমন ভয় আমাদেরও হয়েছিল—ও কিছু না।

আর একজন তাহার অভিজ্ঞতা-ভরা দৃষ্টি দীপ্তির মুখের উপর তুলিয়া বলিল—এখন ভাবছিস জুজু, কিন্তু তেরাত্তির এক বিছানায় শু'লে অন্য কথা বল্‌বি।

দীপ্তি ভিতরে বাহিরে একবার কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া আপনার শরীরটাকে সে সকলের হাতে ছাড়িয়া দিল। আজ তাহার নিজের কিছু করিবার অধিকার নাই। বন্ধুরা তাহাকে স্নান করাইল, চুল শুখাইয়া বাঁধিয়া দিল, পোষাক পরাইল, পায়ে অলক্ত-রেখা আঁকিয়া দিল, খাওয়াইল, তাহাকে ঘিরিয়া সমস্তদিন অবিশ্রান্ত কলহাস্য বিদ্রূপ চলিতে লাগিল কিন্তু দীপ্তির মন রহিল এ সমস্তের বাহিরে—যেখানে মায়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছে।

বিবাহের কিছু পূর্ব্বে বীরেন্দ্রনাথের শরীর হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় নগেন্দ্রনাথকে তিনি বলিলেন—আমি বোধ হয় অতক্ষণ ব'সে থাকতে পারব না, সম্প্রদানটা তুমিই ক'র।

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন—আরে সর্ব্বনাশ। চিরটা কাল পেটপুজো ক'রে এসেছি, হঠাৎ আমাকে এতখানি বৈরাগী হ'তে দেখ্‌লে ভগবান হেসেই অস্থির হ'য়ে উঠবেন।—ঐ ত শ্রীশ রয়েছে—সব ঠিক হয়ে যাবে'খন—চন্দর দা, তোমার ত কিছু অসুখ বিসুখ করে নি? দেখ—

চন্দ্রকুমার ম্লান হাসিয়া বলিলেন—পাত্রী হওয়া একটা সংক্রামক ব্যাধি। একবার ধর্‌লে আর ছাড়ে না! বারে বারেই পাল্‌টে পাল্‌টে ফেলে দেখ্‌ছি।

বিবাহ-সভায় আচার্য্য এবং অভ্যাগত মণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া কন্যাকর্ত্তার স্থানে দাঁড়াইয়া শ্রীশ বিবাহ পদ্ধতি হাতে লইয়া যখন বলিল—আমার ভগিনী কল্যাণীয়া দীপ্তি, শ্রীমান্ অসিতকুমার বিশ্বাসের পাণিগ্রহণেচ্ছু হওয়ায়, আমি শ্রীশ্রীশ মিত্র, উক্ত শ্রীমানের সম্মতিক্রমে আমার ভগ্নীকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিতেছি। আপনারা সকলে 'স্বস্তি' বলুন।

সভামণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইল—স্বস্তি-স্বস্তি—

যথারীতি সঙ্গীত ও প্রার্থনা হইবার পর আচার্য্য কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন—

কল্যানীয়া দীপ্তি, তুমি কি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে স্মরণে রাখিয়া, কল্যানীয় শ্রীমান্ অসিতকে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছান্দচিত্তে পতিত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ ?

সভাস্থ সকলে স্তব্ধ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল কন্যার কথা শুনিবার জন্য।

দীপ্তির ঠোঁটদুটি শুধু একবার নড়িল মাত্র। কোন কথা বাহির হইল না। সাক্ষীত্রয় বলিলেন—একটু জোরে বল মা লক্ষী, আমাদের শুনতে হবে।

একি নিদারুন পরিহাস! একি অভিনয় . . . পরিচিত, অপরিচিত সকলকেই সাক্ষী রাখিয়া দেবতার নামে শপথ করিয়া বলিতে হইবে—'স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে প্রস্তুত হইয়াছি . . . বিবাহ-বন্ধনের অচ্ছেদ্য-গ্রন্থিটি ফুলের মালার আকারে তাহার চোখের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে! উহারি মধ্যে আপনার মাথা গলাইয়া দিতে হইবে, আর এক মুহুর্ত্ত বিলম্ব কেহ সহিবে না . . . দীপ্তির বুকের মধ্যে আর একবার আর্ত্তনাদ জাগিল—বিকাশ—বিকাশ . . . মুখ দিয়া বাহির হইল—প্রস্তুত হইয়াছি।

* *

বিবাহ বাড়ীর স্বাভাবিক এবং যথারীতি আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের আনন্দের কলরব তখন শেষ হইয়াছে। পান ভোজনান্তে একে একে সকলেই চলিয়া গিয়াছে। করুণার আদেশ মত মায়া, বর ও বধূকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে আনিয়া বলিল—অসিতবাবু অনেক রাত হয়েছে শুয়ে পড়ুন। আমি একবার নীচে গিয়ে শ্রীশদাদের দেখে আসি। মুহূর্ত্তেই সে বাহির হইয়া গেল এবং দ্রুত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া শ্রীশের ঘরে আসিয়া দেখিল—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর অবসন্ন দেহ মেলিয়া জীবন, মুনি, সুপ্রকাশ ও শ্রীশ চারিখানি চেয়ার দখল করিয়া ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়া আছে! সে ধীরে ধীরে পুনরায় উপরে আসিয়া আপনার ঘর হইতে কয়েকখানা বিছানার চাদর ও ও বালিশ লইয়া শ্রীশের ঘরে আসিয়া অতি সন্তর্পণে মেঝের কার্পেটের উপর সেগুলি পাতিয়া চারজনের মুখের উপর কিছুক্ষণ গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধার দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—শ্রীশদা ও শ্রীশদা-শুনছো?

মুনি, সুপ্রকাশ ও শ্রীশ একসঙ্গে উঠিয়া পড়িল। শ্রীশ বলি—কি রে, এখন নেমে এলি যে?

মায়া। দেখ্‌তে এলাম তোমরা কি করছ। ঐ রকম করে শোয়? নাও ওঠ। বিছানা পেতে দিয়েছি।

মুনি, সুপ্রকাশ ও শ্রীশ উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু জীবন যেমন ঘাড় কাৎ করিয়া শুইয়া ছিল তেমনই রহিল।

মায়া বলিল—আহা, উনি একবারে ঘুমিয়ে পড়েছেন! মুনিবাবু ওঁকে তুলে এনে এখানে শুইয়ে দিন্ না।

মুনি। হাঁ, কচি খোকা কিনা! থাক্‌গে, ঘাড়ে লাগ্‌লে আপনি উঠে আস্‌বে—ওর ওপর আমি আজকে হাড়ে চটে গেছি।

পরিবেশনের সময় মুনি ও কল্যাণীর মধ্যে যে একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা মায়া কল্যাণীর নিকট হইতে কিছু পূর্ব্বে শুনিয়াছে। এবং তাহার জন্ম জীবন-ই দায়ী।

মায়া হাসিয়া বলিল—কিন্তু অপরাধটা ওঁর স্বেচ্ছাকৃত নয়, ওঁকে ক্ষমা ক'রে আপনার মহত্বের পরিচয় দিন্।

কথাগুলি বলিতে বলিতে মায়া জীবনের মাথার কাছে আসিয়া মুখ ঈষৎ নত করিয়া ডাকিল—জীবন বাবু—

জীবনের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মুনি হাসিয়া বলিল—ওটা কুম্ভকর্ণ মায়াদি। কাঁসর ঘণ্টা কাণের কাছে না বাজালে ওর জাগ্‌বার আশা নেই।

মায়া হাসিয়া জীবনের কপালের উপর হাত রাখিয়া তাহাকে ঈষৎ নাড়া দিয়া বলিল—জীবনবাবু—

এবার এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল। জীবন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চেয়ার হইতে একেবারে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেহখানিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিল—সকাল হ'য়ে গেছে নাকি রে?—

মুনি প্রভৃতি সকলে হাসিয়া উঠিল। মায়া পলাইবার যোগাড় করিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। এমন সময় জীবন চোখ মেলিয়া মায়াকে দেখিতে পাইয়া কি করিবে যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। অপরাধীর মত বলিল—আমার ঘুমটা দেখে ফেলেছেন তা'হলে?

মায়া। হাঁ, চমৎকার। ঐ রকম ঘুমই সবার হওয়া উচিৎ। কিন্তু ভারী দুঃখ হ'চ্ছে আপনাকে জাগিয়ে।

মুনি। মোটেই দুঃখিত হবেন না মায়াদি। ও শুয়ে পড়ুক, তারপর আর এক মিনিট দাঁড়ান, দেখ্‌বেন ও আগেকার থেকে ভাল ঘুমচ্ছে।

জীবন। না, ঘুমবে না। আমি কি তোর মত পাপী না চোর, যে

ঘুমতে পারব না? খালি চুরি-মত্‌লব মাথায় থাক্‌লে কি ঘুম হয়?—বলুন ত মায়া দেবী—

মায়া হাসিয়া বলিল—সত্যিই ভাই—নিন্, শুয়ে পড়ুন, আমি আসি। —শ্রীশদা কাল সকালে না হয় বিকালে এখান থেকে পালাতে চাই—কেমন?

শ্রীশ বলিল—আচ্ছা।

মায়া চলিয়া যাইতেই সুপ্রকাশ, জীবনকে বলিল—কি হয়েছে রে? মুনিটা তোর ওপর অত চটে গেল কেন?

জীবন। অপরাধ যেন আমারি! সেই তুই যখন বল্‌লি—চাট্‌নী কিছু কম পড়্‌বে, আমি ভাঁড়ার থেকে কিছু কিসমিস্ আনতে গিয়ে দেখি—আরে ছ্যা!—

মুনি প্রতিবাদ করিল—এত বড় একটা করুণ-রসাত্মক ব্যাপারকে যে অশ্রদ্ধা করে, সে জানোয়ার। আমিই বল্‌ছি প্রকাশ, জানই ত উনি ছিলেন ভাঁড়ারের চার্জ্জে, আমি কর্‌ছিলাম পরিবেশন। সন্দেশের চুব্‌ড়ীটা নিতে গিয়ে দেখি বেচারী একলাটি অশোকবনে সীতার মত বসে আছে! আমি বল্‌লাম—সন্দেশ চাই। সে আমার হাতে সন্দেশের ঝুড়িটা তুলে দিয়ে আঁচল দিয়ে আমার মুখটা মুছিয়ে—এমন সময় হতভাগা গন্ধমাদনের মত একটা চ্যাঙ্গারী মাথায় করে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—কিস্‌মিস্! বাদশাজাদীর ঘরে যেন হাব্‌সী নকীব Danger-signal দিয়ে গেল!

সকলে হাসিয়া উঠিল। জীবন বলিল—রুচিকেও বলিহারি বাবা! তরকারী দইক্ষীরে মাখামাখি শরীর নিয়ে—

মুনি—তুমি কি বুঝ্‌বে সন্ন্যাসী? কি অপূর্ব্ব শান্তি-সুষমায় ভ'রে বিধাতা ঐ একটি মুহূর্ত্ত আমাদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যাক্, তোমায় ক্ষমা করলাম যে হেতু দোষটা তোমার স্বেচ্ছাকৃত নয়।

গল্প করিতে করিতে চারিজনেই ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

মায়া চলিয়া যাইবার পর হইতে দীপ্তি কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কি করিতে হইবে তাহা যেন মনে ছিল না। তাহার অবসন্ন শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় অসিত তাহার হাত ধরিয়া সোফায় বসাইয়া নিজে তাহার খুব কাছে বসিয়া বলিল—তোমাকে ভয়ানক শ্রান্ত দেখাচ্ছে!—তা হ'ক এখুনি শুতে দিচ্ছি না। আমার মনে আজ যে কি হ'চ্ছে তা তোমায় বুঝাতে পারব না। একা একা আজ প্রায় পনেরো বছর কাটিয়েছি। শান্তি কেমন তা জানি নি। তবু আজ মনে হ'চ্ছে

যত দুঃখ পেয়েছি সে সব আমার সার্থক হয়ে উঠেছে তোমায় পেয়ে! সে সব দুঃখের কথা আর এখন আমার মনেই আসে না। আমার অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থাতেও কোন দিনও যে আমি অসন্তুষ্ট হইনি, অবস্থাকে বিধিলিপি বলে মেনে না নিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়েছি, তা থেকে নিজেকে উদ্ধার করেছি, নিজেকে সহজ অবস্থার ওপরে টেনে তুলেছি! আমি উঠ্‌ব, আমি বাঁচ্‌ব এই ছিল আমার চিন্তা। আজ সে বাঁচা আমার সার্থক করেছ তুমি।

ভাবের আবেগে কথা বলিতে বলিতে সহসা দীপ্তির উপর চোখ পড়িতেই সে দেখিল, দীপ্তি ধীরে ধীরে সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে! তাহার মাথা প্রায় তাহার হাঁটুর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে!

অসিত তাহাকে ধরিয়া সোজা করিয়া বসাইয়া বলিল—What a selfish brute I am!—না শোবে চল। তোমার শরীর নিশ্চয়ই খুব খারাপ হয়েছে। আমায় এতক্ষণ বল নি কেন?—না অত গয়না পরে ত শুতে পারবে না, গায়ে লাগ্‌বে।

স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে কথাগুলি বলিতে বলিতে অসিত দীপ্তির কণ্ঠ হইতে অত্যন্ত ভারী এবং লতা পাতা কাটা নানা রঙের পাথর বসান একছড়া হার খুলিবার সময় শুভ্র সুন্দর কণ্ঠের অপূর্ব্ব শোভায় মুগ্ধ হইয়া তাহার উপর মুখ চাপিয়া ধরিল।

ভীষণ আঘাত পাইলে মানুষ যেমন বাঁকিয়া যায় দীপ্তিও সেইরূপ করিয়া পিছাইয়া আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ত্রস্ত চকিতভাবে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল! তাহার অসংবৃত বসন সিঁড়ির ধাপে ধাপে লুটাইয়া তাহার সহিত নামিতে লাগিল। দ্বিতলে আসিয়া মায়ার ঘরের দরজায় সমস্ত শরীরের ভার দিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদের মত দীপ্তি ডাকিল—দিদি—দিদি—খোল্—খোল্—'

বহুকষ্টে আত্মীয়স্বজনের হাত হইতে মায়া এই ঘরখানি আপনার জন্য রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিল। বীরেন্দ্র, করুণা, সুবর্ণ, চন্দ্রকুমার প্রভৃতি সকলকে শুইতে পাঠাইয়া—তখন সবে সে তাহার ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়াছে এমন সময় ঐ চাপা কণ্ঠের সুর শুনিয়া সে কাঁপিয়া উঠিল।

আবার শব্দ হইল—খোল্, দিদি খোল্—

মায়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তি সশব্দে ঘরের মাটিতে পড়িয়া গেল। মায়া তাহার কাছে বসিয়া মাথায় হাত রাখিতেই দীপ্তি ভীত কণ্ঠে বলিল—বন্ধ কর্—বন্ধ করে দে দরজাটা—

মায়া কঠিনভাবে বলিল—এর মানে ?—

দীপ্তি। আমি পারব না। কিছুতেই পারব না—বন্ধ ক'রে দে দরজাটা—

মায়ার কণ্ঠ জড়াইয়া দীপ্তি এমন করিয়া তাহার মাথা মায়ার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল যে মায়ার নিঃশ্বাস লইতেও কষ্ট হইতেছিল। অবসন্নভাবে সে বলিল—আমি বন্ধ ক'রে দিলেও এ দরজা ভেঙ্গে তোকে ও ওর বিছানায় টেনে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের কারো বাধা দেবার সাধ্য নেই—তোরও না। অনেক বাইরের লোক আজ এই বাড়ীতে আছে, তারা যদি তোর এই কাণ্ড আজ দেখে, বলবে—নির্লজ্জার ন্যাকামী।

দীপ্তি কাঁদিয়া বলিল—যে বলে বলুক। তুই বলিস্ নি। তুই জানিস্ আমাকে।

মায়া। কিছু না। তোকে আমি কিছু জানি না। তোকে জানবার আর আমার বাসনাও নেই। আমায় অমন করে আর নথাস্ নি দীপ্তি,—তোর ঘরে যা, আমায় একটু নিঃশ্বাস ফেলতে দে।

দীপ্তি বিপুল বলে আর একবার মায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—না।

মায়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—তবে এ বিয়ে করলি কেন ? ঐ বেচারী মানুষটার জীবনে অশান্তি এনে দেবার জন্যে ? কি করেছিল ও তোর ? তুই ছাড়া ওর কি আর স্ত্রী মিলত না এ জগতে ?—যে মতের অমিলের জন্যে এক জনকে খুন করে এসেছিস্, সেই মতের মিলের জন্যেই আবার এক জনকে খুন করতে চলেছিস্ রাক্ষুসী !

মায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে দীপ্তির মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

* * * *

'স্পর্শ-সুখের শিহরণ যখন সর্ব্বশরীরে রঙীন্ নেশার জাল বুনিতেছে তখন তাহাকে এইখানে ঠেলিয়া সহসা দীপ্তি দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল! বিরক্তিপূর্ণ একটা উদ্‌ভ্রান্ত এবং উন্মাদ ভাব অসিতের মনটিকে ঘিরিয়া ধরিল। সে হাত বাড়াইয়া দীপ্তির দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আবেগ-কম্পিত ভগ্ন-কণ্ঠে বলিল—এস, এস—'

কিন্তু বেশী দূর আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অসিত দেখিল দীপ্তির চোখে মৃত্যু ভয় ; ... মুখে দারুণ লজ্জা ও ঘৃণা! এবং তাহাকে ভাবিবার কিছু অবসর না দিয়া—দীপ্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

সে কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিল—Do I look a cave-man really?—

অশান্ত মনটিকে লইয়া উত্তেজিত ভাবে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর শয্যার নিকট আসিয়া পাশাপাশি দুইটি বালিশের দিকে অসিত তাকাইয়া রহিল। সুগন্ধ পুষ্প বিছানায় প্রায় ভরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু একা এমন সুন্দর শয্যায় শুইবার তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে ধীরে ধীরে সোফার কাছে আসিয়া শ্রান্ত ভাবে বসিয়া একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইবার জন্য দিয়াশলাই জ্বালিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নারী-শরীরের মৃদুমধুর-সৌরভ তখনও যেন তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

আলো জ্বলিতে লাগিল। বাসক-সজ্জা শূন্য পড়িয়া রহিল। বর ও বধূর প্রথম মিলন-রাত্রি বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।

সকালে বেলা ব্যাপারটিকে সহজ করিবার জন্য মায়া হাসিয়া বলিল—অসিতবাবু, রাত্রে বৌ বিছানা থেকে পালিয়ে গেল টের পেলেন না?

অসিত ম্লান হাসিয়া বলিল—বৌ যদি কারো পালাব মনে করে, কোন স্বামী কি তাকে ধরে রাখতে পারে?

মায়া। পারে না?

অসিত। বোধ হয় না।—কথাই তো আছে জানেন,—Man marries to come in, woman marries to come out—ব্যতিক্রম কিছু হয় নি।

দীপ্তিকে ঠেলিয়া মায়া বলিল—শুনছিস?

কিন্তু দীপ্তি যে কিছু শুনিয়াছে তাহার পরিচয় দিল না।

তাহার পর বর ও বধূর বিদায়ের পালা আসিল। দীপ্তি কতকটা নির্লিপ্ত এবং কঠিন ভাবে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অসিতের সহিত গাড়ীতে আসিয়া বসিল। তাহার পর ভিড়ের মধ্যে করুণা ও বীরেন্দ্রনাথকে ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে একটু হাসিয়া মাথা নীচু করিল।

ক্রমশঃ

শ্রী—

রঙ্গীন ছবি

আজকাল বাংলাদেশে অনেক মাসিক পত্রিকা আছে। লোক সংখ্যা হিসাবে হয়ত এ কয়খানা পত্রিকা কিছুই নয়। এ পত্রিকাগুলির কয়েকটি খুব পুরাতন।

উপাসনা, অর্চ্চনা ভারতী, নব্যভারত, যমুনা, প্রভৃতি কয়েকখানি কাগজ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলা সাহিত্যের সেবা করিতেছে। বড় পত্রিকার ভিতর প্রবাসী বহুকালের পত্রিকা। তাহার পর স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতবর্ষ পত্রিকা-খানির প্রতিষ্ঠা করেন। মাসিক বসুমতী তাহার পর প্রকাশিত হয়; প্রাচী ঢাকা হইতে বাহির হয়। পূর্ব্ব বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মাসিক সাহিত্য বলিয়া ইহার স্থান দেওয়া যায়। বঙ্গবাণী অল্পকাল ধরিয়া বাহির হইলেও, বাংলার পাঠকদের নিকট এই কিছুকালের ভিতর ইহার আদর হইয়াছে। মানসী মর্ম্মবাণী, ময়মনসিংহের পল্লিশ্রী, বরিশালের তরুণ, শ্রমিকদিগের মাসিক পত্র সংহতি, প্রভাতী, বিকাশ, মাধবী, কুচ্‌বিহারের পরিচারিকা প্রভৃতি আরও অনেকগুলি কাগজ বাংলাদেশে প্রচলিত আছে।

এই কয়খানি কাগজের অনেকগুলিতেই নিজেদের কোনও বিশিষ্টতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ছবির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও সব কাগজগুলিতেই যে ত্রিবর্ণ বা বহুবর্ণ চিত্র থাকে, তাহা দেখিয়া কাগজের সম্পাদন বিভাগের যে এদিকে বিশেষ কোনও মনোযোগ বা রসগ্রহণের ক্ষমতা আছে তাহা বুঝা যায় না।

বাঙ্গালী পাঠক অনেকেই জানেন, অনেকক্ষেত্রে শিল্পীর খাতির রাখিতে যাইয়া, অনেক কাগজে অনেক ছবি ছাপা হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ছবির নীচে যে পরিচয়স্বরূপ বিষয়টির উল্লেখ থাকে তাহার সহিত ছবির পরিকল্পনার কোনই সম্বন্ধ থাকে না। অনেক ছবির নীচে আধুনিক বা অতীতকালের কবিগণের কবিতা হইতে দুই লাইন বা চারি লাইন কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হয়। পত্রিকার আপিস বা শিল্পী আশা করেন, তাঁহারা ছবির নীচে যাহা লিখিয়া দেন, বাংলা দেশের পাঠক পাঠিকা

তাহা দেখিয়াই নিজের সমস্ত বুদ্ধি ও রস-জ্ঞানকে ভুলিয়া গিয়া ঐ লাইন, কয়টি বা শব্দটির ভিতর হইতেই ছবির রস গ্রহণ করিবেন।

এমন দুই একখানি পত্রিকাও আছে, যাঁহারা চিত্রের নীচে যে পরিচয় থাকে তাহা সত্ত্বেও আরও একটি আলাদা চিত্র পরিচয় লিখিয়া দেন।

কিন্তু তাঁহাদের এই চিত্র পরিচয় মনুষ্যকে অনেক সময় সমধিক গোলমালে ফেলে। ছবি দেখিয়া যাহা বুঝা যায়, এই চিত্র পরিচয় পাঠ করিয়া তাহা যেন আরও জটিল হইয়া পড়ে।

সকলেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত, যে চিত্র সম্বন্ধে বাংলার অজ্ঞ পাঠকপাঠিকা-দিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্যই এই চিত্র পরিচয়ের আবির্ভাব।

বড় বড় পত্রিকাগুলির সম্পাদক যিনিই হউন, তাঁহার সহকারী যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের ভিতরেও আবার যিনি একটু ক্ষমতাবান্, তাঁহার সঙ্গে খাতির করিয়া, তাঁহাকে খোসামোদ করিয়া, তাঁহাকে বোকা বানাইয়া, হেন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা ছবি নাই যে তাহা যে কোনও পত্রিকায় ইচ্ছা করিলে ছাপা যায় না। যদিও ইহা একটু চেষ্টা সাপেক্ষ, তবুও নিরুপায় বা অনন্যোপায় হইয়া, এই দুর্ভাগা শিল্পী বা লেখকেরা এই হীন কাজে লিপ্ত হন্। আর তাহার জন্য দায়ী কয়েকটি পত্রিকা আপিসের লোক।

অবশ্য ইহাও সকলে জানেন যে কিছু কিছু ছবি ভাল কাগজে প্রকটিত না হইলে এই বাংলাদেশে চিত্র শিল্পীর পক্ষে প্রসিদ্ধিলাভ করা একটু কষ্টকর। এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ভাল ছবির প্রচার উদ্দেশ্য ছাড়াও এইরূপ মাঝে মাঝে দুই একখানি ছবি প্রকাশ করিয়া শিল্পীদিগকে উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন। এই সকল কারণ থাকা সত্ত্বেও, যে সকল পত্রিকা বাংলাদেশের দৃষ্টান্তস্বরূপ, ছবিছাপা সম্বন্ধে তাঁহাদের আরও বিশেষ করিয়া ভাবা প্রয়োজন।

ছবি সবদেশের সব লোকেই ভালবাসে। বাংলাদেশের লোকও ছবি ভালবাসে। চিত্রশিল্পের প্রতি এই আকর্ষণ দেখিয়া যে আজকালকার এক পয়সার দৈনিক, দুই আনার সাপ্তাহিক বা চার পয়সার পাক্ষিক, জন সমাজের জন্য যে সকল ছবি ছাপে তাহার বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, যে সকল ছবি ছাপিয়া এই পত্রিকাগুলি পয়সা করিতেছে, মনে করিতেছে বাংলার জন সাধারণকে নাচাইতেছে, এমন সময় শীঘ্রই আসিবে যখন এই বাংলার জনসংঘ এই পত্রিকা গুলিকেই অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিবে।

কিন্তু কয়েকখানা প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার ভিতরে যে সকল চঞ্চলতা দেখা যাইতেছে তাহা দেখিয়াও দুঃখ হয়। তাঁহারাও যেন বাজার দেখিয়া ভয় পাইয়াছেন মনে হয়। এক পত্রিকা তিনখানা ত্রিবর্ণ চিত্র দিয়াছে দেখিয়া, হয়ত সবার অপেক্ষা সকল রকমে শ্রেষ্ঠ একখানা পত্রিকাও চারিখানি রঙ্গীন ছবি ছাপিতে আরম্ভ করিলেন। কাজেই ছবির দিকে নজর থাকে না, ছবির সংখ্যার দিকেই ঝোঁক্ থাকে। এতগুলি ছবি প্রতি মাসে প্রয়োজন হইলে বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় চিত্রশিল্পীরা তাহা যোগাইয়া উঠিতে পারিলেও, তাহা যে ভাল ছবি হইতে পারে না তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

তাই সাধারণতঃ দেখা যায় একটি রমণীমূর্ত্তি যে কোনও ভাবে ছবির ভিতর আঁকিয়া তাহার নীচে একটি কবিতা বা চিত্র পরিচয় দিয়াই ছবির শিল্পী অধৈর্য্য হইয়া পড়েন। চিত্রশিল্পের যদি কিছু অবনতি ঘটিতেছে বলিয়া কাহারও মনে হয়, তাহা হইলে বাংলার জনসাধারণের রুচিকে দোষ দিলেই চলিবে না।

প্রসাধনরতা, প্রতীক্ষমানা, স্নানার্থিনী, বিরহিণী প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া যে সকল ছবি মাসিক কাগজে স্থান পাইতেছে তাহা আর্টের দোহাই দিয়া ছাপিবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। চিত্রশিল্পীদের এখন হইতে বিষয় নির্ব্বাচনে সময় দেওয়া প্রয়োজন। পুরুষ লইয়া, শক্তির ব্যবহার লইয়া, উৎসাহের উদ্দীপনা লইয়া সমস্ত জড়তা, হীনতা, দুঃখ, অবসাদের ভিতর মনুষ্যত্বের ক্রম বিকাশের পরিকল্পনা লইয়া আজ কাল কোনও ছবি বড় দেখা যায় না। বাংলাদেশে দুই একজন চিত্রকর পুরুষের কর্ম্মশীল জীবনের ছবি, নারীর কমনীয়তা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে সংশয়হীন একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও শক্তির প্রেরণা নিহিত থাকে তাহা চিত্রের বিষয়ীভূত করিয়া আঁকিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু কেন যেন তাঁহারাও সে পথ ত্যাগ করিয়া নারীকে মন্দিরের সিঁড়ির ধাপে, পুকুরের ঘাটে, ভিজা কাপড়ে, মুকুরের সম্মুখে, ঘন্ত্র-হাথা, বিরাট গাছের গুঁড়ির পাশে দাঁড় করাইয়া, অথবা গবাক্ষের অলিন্দে ভর করাইয়া দিয়া এই মরণশীল শিল্প রচনা করিতেছেন।

ভাগ্যহীন বাঙ্গালী জাতি,সকল রকমে কাঙ্গাল। বাংলার নরনারী ছবির ভিতর কি দেখিয়া তাহার নিরস, মনকে সরস করিবার সুযোগ পাইবে? দুঃখ-দারিদ্র্য, সংঘাত সংগ্রাম, অবিশ্বাসজনিত এই দুরবস্থার ভিতর চিত্রের কোন্ অংশ হইতে প্রাণের প্রেরণা পাইবে?

এদেশে চিত্রশিল্পের আদর নাই বোধ হয়,—এই জন্য, যে চিত্রশিল্পীও দেশকে

আদর করে না বলিয়া। চিত্র ত তাহার মনের কথাকে চিন্তা করিয়া তাহাকে অবসাদ হইতে মুক্ত করিতে পারে না। দেশের নারী ত দেখিতে পায় না, তাহার প্রতিদিনের জীবনের প্রসাধন প্রভৃতি ছাড়া, তাহার জীবনের অন্য কোনও প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা আছে। যে ছবি দেখিয়া সে নিজে দিনের পর দিন নিজেকে শতবার অপমানিত মনে করিতেছে সে ছবিই আবার চিত্রে দেখিয়া তাহার অবসাদ ঘুচিবে কেন?

ছবির ভিতর সৌন্দর্য্য, রস, বর্ণ ও ভাব ছাড়াও প্রাণস্বরূপের প্রাচুর্য্য থাকা প্রয়োজন। কিন্তু চিত্র ব্যাখ্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পাঠকপাঠিকা, চিত্র-শিল্পী ও পত্রিকার সম্পাদন বিভাগের সকলে মিলিয়া ছবিগুলি একসঙ্গে বসিয়া দেখিলে কেমন লাগে, এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে আমরা কি মত পাইতে পারি তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়।

ডান হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে, বাঁ হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না।

'মুক্তধারা'

সংগ্রহ

অনেক ভ্রমণকারী বড় বড় নদীর উৎস খুঁজিতে দুর্গম স্থানে গিয়াছে। বড় কাব্য-নদীর উৎস খুঁজিতেও কৌতূহল হয়। আধুনিক কবির জীবন চরিতে এই কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে এমন আশা মনে জন্মে। * * তাঁহার চিঠি পত্র পড়িলাম, জীবনের ঘটনাবলী দেখিলাম কিন্তু কোন খবর পাইলাম না। এ সমস্ত জীবনচরিত অন্য কাহার হইলেও আশ্চর্য্য বোধ করিতাম না। * * * কাব্যে যাঁহাদিগকে বড় করিয়া দেখিতেছিলাম, জীবন চরিতে তাঁহারা জন সাধারণের সহিত সমান হইয়া যান। সেখানে তাঁহারা বত্রিশ সিংহাসন হইতে নামিয়া অন্য রাখালের সহিত একাকার হইয়া দেখা দেন! জীবন চরিতে তাঁহারা চিঠিপত্র লেখেন, দেখা সাক্ষাৎ করেন, ভালমন্দ বকেন, স্তুতি নিন্দার টলেন, অবশেষে ব্যামো হইয়া বিশেষ তারিখে মরিয়া নিঃশেষিত হইয়া যান। * * * কবি, কবিতা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছেন, জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। যাঁহারা কর্ম্মবীর তাঁহারা নিজের জীবনকে নিজে সৃজন করেন। কবি যেমন ভাষার বাধার মধ্য হইতে ছন্দকে গাঁথিয়া তোলেন, তেমনি কর্ম্মবীরগণ সংসারের কঠিন বাধার মধ্যে নিজের জীবনের ছন্দ নির্ম্মাণ করেন।

বঙ্গদর্শন, আষাঢ়—১৩০৮

১৭০

নীরব

—শ্রীশৈলবালা সেন।

স্তব্ধ-রাতের নিরজনে
নীরব অবসরে,
নীরব আমার রাগিণীতে
নীরব বীণার তারে,—
তোমার কাছে মনের ছুটো
কথা ক'ব বলে,
সকল কাজ সাঙ্গ ক'রে
বসি পদতলে।
কথা আমার ফোটেনাকো
অশ্রু হয়ে ঝরে;
তাতেই তুমি বুঝে নিয়ো
মনের কথা প'ড়ে।
নীরব তুমি নীরব আমি
নীরব আমার ভাষা,
নীরব আমার প্রণাম জেনো
নীরব ভালবাসা।

সমাচার

'স্বরাজনেত্রী' একটি নাটক ; দাম ১৲ টাকা মাত্র।

নাট্যকার শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

নাট্যকার বইখানির প্রচ্ছদপটে নিজের পরিচয় দিতেছেন—"বঙ্গ-সাহিত্যে নীট্শে ও ইব্সেন সমালোচনার পথ-প্রদর্শক, বহুদেশ-পরিব্রাজক ভিক্ষু অকিঞ্চন।" পরিচয়টির মধ্যে বেশ অভিনবত্ব আছে। তার পর লেখক কোনরূপ কৈফিয়ৎ নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানেও দেড়পাতা এক নিবেদনে লিখিয়াছেন—"উদ্দেশ্যের অপেক্ষা আনন্দ দানেই আমার সবিশেষ লক্ষ্য—তাই দল-বিশেষের মন যোগানো মুখরোচক কথায় নির্ভর না করিয়া বহাল তবিয়তে নিজের খেয়ালেই শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছি।" উদ্দেশ্যটি যে সাধু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু খেয়ালের চোটে লেখার মধ্যে উদ্দেশ্যটি মোটেই বজায় রাখিতে পারেন নাই।

মানব-চরিত্র-অনভিজ্ঞ নাট্যকার নাটকের মধ্যে যে সমস্ত নায়ক নায়িকা সৃষ্টি করিয়াছেন তা অপূর্ব্ব, অভূতপূর্ব্ব। প্রধানা নায়িকা স্বরাজনেত্রী একটি খাঁটী বিলাতী ছাঁচে ঢালা, অসহ্য রকম প্রগল্‌ভা স্বেচ্ছাচারিণী রমণী। তিনি স্বরাজলাভের একমাত্র উপায় ঠাওরাইয়াছেন—উচ্ছৃঙ্খলতা, ও খুসীমত আত্মবিক্রয়।

প্রধান নায়ক স্বরাজনেত্রীর স্বামী একজন মস্ত ব্যারিষ্টার; কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গীতে মনে হয় তিনি যেন একটি সার্কাসের ক্লাউন্।

লেখাটির মধ্যে humour কিছু আছে বটে, কিন্তু একই কথার পুনরুক্তি ক্রমেই তিক্ত বলিয়া বোধ হয়।

নাট্যকার একজন পরিব্রাজক ভিক্ষু Veterinary Surgeon. নাটক ছাড়িয়া যদি তিনি দেশ বিদেশের অজবগয় বা ঘোড়া গরুর চিকিৎসার কথা লেখেন তাহা হইলে হয়ত ভাল বই লিখিতে পারিবেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও আদর লাভ করিতে পারিবেন।

'রূপোপজীবিনী'—গল্পের বই। শ্রীশিবশঙ্কর রায় চৌধুরী প্রণীত ও প্রকাশিত। ১২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

রূপোপজীবিনী ও অন্যান্য ছয়টি গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে। সব গল্পগুলিই চলন সই হইয়াছে। লেখকের লিখিবার শক্তি আছে, তাহা এই কয়টি গল্প পড়িয়া বোঝা যায়। তবে স্থানে স্থানে ভাষাকে দুর্ব্বোধ্যতার ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলিবার লোভ লেখক ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে লেখক এ বিষয়ে সাবধান হইলে ভাল করিবেন। বইখানি ছাপা,, কাগজ বাঁধাই বেশ ভাল হইয়াছে।

বিষয় সূচী

পরিচয়লিপি

রৌদ্রদগ্ধ-পৃথিবীর গান আবার আষাঢ়কে আহ্বান করিয়া আনিল—তপ্ত ধূলির পথে, জীর্ণ তরুর শাখে, শ্রান্ত ধরণীর শুষ্ক শিরায়।

সকলদিনের সব হারাণো সুর মায়াময় দিগন্তে হাতছানি দিল—জীর্ণ পল্লব মর্ম্মরিয়া উঠিল—চিনি, ওগো চিনি, ঐ ছায়া, ঐ কাজল ছায়া! শ্রান্ত ধরণী ব্যাকুল বেণু-মর্ম্মরে বলিয়া উঠিল—চিনি, ওগো চিনি, ঐ মায়া, ঐ শ্যামল মায়া!

রাজপথ হইতে "পথিক" বাতায়নে আসিয়া বসিল। আষাঢ় সন্ধ্যায় মেঘময় দূরে বাঁশী বাজে শুধু হারাণো দিনের সুরে—শুধু বিস্মরণের মীড়ে ধরণী আজ যেন মেঘের ইঙ্গিতে হারাণো লিপিকার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে—প্রিয়তমার সুপ্ত প্রেমের কাহিনী লইয়া!

ধূসর-ধ্বজায় আজ "ঝড়ে"র বাহনে আসে, সৃষ্টি-সুন্দর প্রলয়ঙ্করের, রূপ নিয়া—জীবনের জীর্ণ খাতার" পাতায় পাতায় আজ হারাণোদিনের স্বর্ণরেখা মেঘের আলোয় ফুটিয়া উঠিতেছে; আকাশে তাহারি প্রতিলিপি কোন্ মায়াময় শিল্পী বিদ্যুৎ-আখরে লিখিতেছে।

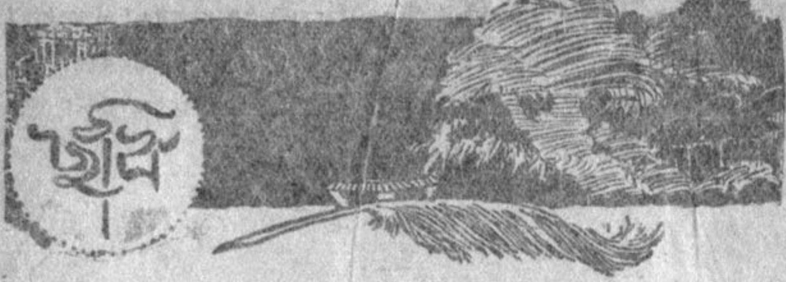
শূন্য সাগরের কূলে প্রেমিক, প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে—আঁধারে হারিয়ে-যাওয়া "সাগরিকার" বিদায়-পথের দিকে চাহিয়া; সম্মুখে সিন্ধুস্নাতা চন্দ্র উঠিতেছে তাহারি অন্তরের বঞ্চিত কামনার রূপ নিয়া।

অন্তরের সাথী আজ অন্দরে সুপ্তিমগ্ন তবুও মন বারে বারে ফিরে যায় অতীতদিনের পথে—"আরেক ফাল্‌গুনে"র হাসিকান্নার মাঝে—উতল অভিসারে—

ধরণার ব্যাকুল স্নেহ আজ শুষ্ক শাখায় শাখায় লুটাইয়া কাঁদিতেছে—যদি তাহার হারিয়ে-যাওয়া হাজার "মুকুল" আবার এই আষাঢ়-উষায় রূপ ধরিয়া আসে।

পরিচয় লিপি

আজ "ভুজনে" থাকার দিন। তাই অন্তরের "বিধবা" বধূ আবার ধরণীর রূপ-উৎসবে সাজিতে চায়—তাই বঞ্চিত বিদ্রোহী মন বেদনার "বালুবেলায়" দাঁড়াইয়া আষাঢ়ের আকাশকে অন্তরের জ্বালাশ্বাসে আরো ক্ষুব্ধ করে—তাই আজ সকল গতানুগতিক "প্রচেষ্টা"র বাহিরে ফুটিয়া আছে আর এক পৃথিবী, রূপে রসে ভরা !—অন্তরের "পূজা"য় অনন্ত সুন্দর।



এখন পাল তুলে যমুনার মধ্য দিয়ে চলেছি! * * * এই নদীর উপরে মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধ্যাটা কি চমৎকার! * * * সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপ্‌সা জগৎ চোখের সাম্‌নে বিস্তৃত পড়ে ছিল—তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার অপরূপ জগৎ যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠেনি—অল্পদিন হল সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে—প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতিবিস্ময়পূর্ণ ছম্‌ ছম্‌ নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন; যখন সাতসমুদ্র তেরোনদীর পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত—যখন রাজপুত্র এবং পাত্তরের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্যনিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্ত্তী অর্দ্ধচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্তৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর এবং মনে করা যেতেও পারে আমি সেই—রাজপুত্র—একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি—

ছিন্নপত্র—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝড়

—নজরুল ইস্‌লাম।

(পশ্চিম তরঙ্গ)

ঝড়—— ঝড়———ঝড় আমি——আমি ঝড়———
শন্———শন্———শন শন শন্——কড়কড় কড়্
কাঁদে মোর আগমনী আকাশ বাতাস বনানীতে।
জন্ম মোর পশ্চিমের অস্তগিরি-শিরে,
যাত্রা মোর জন্মি আচম্বিতে
প্রাচী'র অলক্ষ্য পথ-পানে।
মায়াবী দৈত্য-শিশু আমি
ছুটে চলি অনির্দ্দেশ অনর্থ-সন্ধানে।

জন্মিয়াই হেরিনু, মোরে ঘিরি' ক্ষতির অক্ষৌহিনী সেনা
প্রণমি বন্দিল—"প্রভু! তব সাথে আমাদের যুগে যুগে চেনা,
মোরা তব আজ্ঞাবহ দাস—
প্রলয় তুফান বন্যা, মড়ক দুর্ভিক্ষ মহা-মারী সর্ব্বনাশ।"
বাজিল আকাশ-ঘণ্টা, বসুধা-কাঁসর;
মার্ত্তণ্ডের ধূপদানী—মেঘ বাষ্প ধূমে ধূম ভরাল অম্বর!
উল্কার হাউই ছোটে, গ্রহ উপগ্রহ হ'তে ঘোষিল মঙ্গল;
মহাসিন্ধু-শঙ্খে বাজে অভিশাপ-আগমনী কলকল কল্ কলকল কল্
"জয় হে ভয়ঙ্কর, জয় প্রলয়ঙ্কর" নির্ঘোষি' ভয়াল
বন্দিল ত্রিকাল-ঋষি।
ধ্যান-ভগ্ন রক্ত-আঁখি আশীষ দানিল মহাকাল।

উল্লম্ফিয়া উঠিলাম আকাশের পানে তুলি' বাহু,
আমি শিশু-রাহু।

হেরিলাম সেবা-রতা মহীয়সী মহালক্ষ্মী প্রকৃতির রূপ,
সহসা সে ভুলিয়াছে সেবা, আগমন-ভয়ে মোর
প্রস্তর-শিখার সম নিশ্চল নিশ্চুপ।

অনুমানি' যেন কোন্ সর্ব্বনাশা অমঙ্গল ভয়
জাগি' আছে শিশুর শিয়র-পাশে ধ্যানমগ্না মাতা, শ্বাস নাহি বয়।
মনে হ'ল ঐ বুঝি হারা-মাতা মোর! ঐ মৌনা জননীর শুভ্র শান্ত কোলে
—প্রহ্লাদকুলের আমি কাল-দৈত্য-শিশু—
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম 'মা আমার' ব'লে।

নাহি জানি কোন্ ফণী-মনসার হলাহল-লোকে—
কোন্ বিষ-দীপ-জ্বালা সবুজ আলোকে—
নাগ-মাতা কদ্রু-গর্ভে জন্মেছি-সহস্র-ফণা নাগ
ভীষণ তক্ষক শিশু। কোথা হয় নাগ-নাশী জন্মেজয়-যাগ,—
উচ্চারিছে আকর্ষণ-মন্ত্র কোন্ গুণী,—
জন্মান্তর-পার হ'তে ছুটে চলি আমি সেই মৃত্যু ডাক শুনি'।
মন্ত্র-তেজে পাংশু হয়ে উঠে মোর হিংসা-বিষ ক্রোধ-রুক্ষ প্রাণ;
আমার তুরীয় গতি—সে যে ঐ অনাদি উদয় হ'তে
হিংসা-সর্প-যজ্ঞ মন্ত্র-টান।
ছুটে চলি অনন্ত তক্ষক ঝড়—
শন্—শন্—শনশন শন্,—
সহসা কে তুমি এলে হে মর্ত্ত্য-ইন্দ্রাণী মাতা,
তব ঐ ধূলি-আস্তরণ
বিছায়ে আমার তরে জাতকের জন্মান্তর হ'তে?
লুকায়ে ও অঞ্চল-আড়ালে, দাঁড়ালে আড়াল হয়ে মোর মৃত্যু-পথে!
ব্যর্থ হ'ল অঞ্চল-আড়াল; বহ্নি-আকর্ষণ
মন্ত্র-তেজে ব্যাকুল ভীষণ
রক্তে রক্তে বাজে মোর—শনশন শন্
শন্——শন্——ঐ শুন দূর
দূরান্তর হ'তে মাগো ডাকে মোরে অগ্নি ঋষি বিষ-হরী সুর।
জননী গো চলিলাম অনন্ত চঞ্চল,
বিষে তব নীল হ'ল দেহ, বৃথা মাগো শাব-দাহে পুড়ালে অঞ্চল!

ছুটে চলি মহা-নাগ,   রক্তে মোর শুনি আকর্ষণী।
মমতা-জননী
দাহে মোর পড়িল মুরছি'।
আমি চলি প্রলয়-পথিক—দিকে দিকে মারী-মরু রচি'।

ঝড়——ঝড়——ঝড় আমি——আমি ঝড়—
শন্——শন্——শনশন শন্——কড়কড় কড়—
কোলাহল-কল্লোলের হিল্লোল-হিন্দোল
দুরন্ত দোলায় চড়ি'—'দে দোল্ দে দোল্'
উল্লাসে হাঁকিয়া চলি   তালি দিয়া মেঘে
উন্মদ উন্মাদ মোর তুফানিয়া বেগে।
ছুটে চলি ঝড়—গৃহ-হারা শান্তি-হারা বন্ধ-হারা ঝড়
স্বেচ্ছাচার-ছন্দে নাচি'। কড়কড় কড়
কণ্ঠে মোর লুণ্ঠে ঘোর বজ্র-গিটকিরি,
মেঘ-বৃন্দাবনে মুক্ত   ছুটে মোর বিজুরির আলা-পিচ্‌কিরি।
উড়ে সুখ-নীড়, পড়ে ছায়া-তরু, নড়ে ভিত্তি রাজ-প্রাসাদের,
তুফান-তুরগ মোর উরগেন্দ্র-বেগে ধায়।
আমি ছুটি অশান্ত-লোকের
প্রশান্ত-সাগর-শোষা উষ্ণশ্বাস টানি'।
লোকে লোকে প'ড়ে যায় প্রলয়ের ত্রস্ত কাণাকাণি!
ঝড়——ঝড়——উড়ে চলি ঝড় মহাবায়ু-পক্ষীরাজে চড়ি,'
পড়-পড় আকাশের ঝোলা সামিয়ানা
মম ধূলিধ্বজা সনে করে জড়াজড়ি!
প্রমত্ত সাগর-বারি অশ্ব মম তুফানীর খর ক্ষুর বেগে
আন্দোলি' আন্দোলি' ওঠে। ফেনা ওঠে জেগে
ঝটিকার কশা খেয়ে অনন্ত তরঙ্গ-মুখে তার।
আমি যেন সাপুড়িয়া,   মারি মন্ত্র-মার—
ঢেউএর মোচড়ে তাই মহাসিন্ধু মুখে
জল-নাগ-নাগিনীরা আছাড়ি পিছাড়ি মরে ধুঁকে!

প্রিয়া মোর ঘূর্ণীবায়ু   বেদুইন-বালা
ঘূর্ণি চলে ঝঞ্ঝা-চুম্ব মম আগে আগে।

ঝর্ণা-ঝোরা তটিনীর তটিনী-নাচন-সুখ লাগে
শুষ্ক খড় কুটো ধূলি শীত-শীর্ণ বিদায়-পাতায়
ফাল্গুনী-পরশে তার।—আমার ধমকে নুয়ে যায়
বনস্পতি মহা মহীরুহ, শাল্মলী পুন্নাগ দেবদার,
ধরি রবে তার
ঝাপটি পল্লব-ঝুঁটি, শাখা-শির ধ'রে দিই নাড়া;
গুমরি' কাঁদিয়া ওঠে প্রণতা বনানী,
চচ্চড়্ ক'রে ওঠে পাহাড়ের খাড়া শির-দাঁড়া!

প্রিয়া মোর এলোমেলো গেয়ে গান আগে আগে চলে;
পাগলিনী কেশে-ধূলি, চোখে তার মায়া-মণি জ্বলে।
সাগরীর ঘূর্ণী তার ঘূর্ণী-ধাঁধাঁ লাগায় নয়নালোকে মোর।
ঘূর্ণীবালা হাসির হর্‌রা হানি' বলে—'মনোচোর!
ধরত আমারে দেখি—'
ত্রস্ত-বাস হাওয়া-পরী, বেণী তার দুলে ওঠে সুকঠিন মন ভাঙে ঠেকি'।
পাগলিনী মুঠি মুঠি ছুঁড়ে মারে রাঙা পথ-ধূলি,
হানে পা'র ঝাঁ ঝাঁ কুলুকুচু, পদ্ম-বনে আলুথালু খোঁপা পড়ে খুলি।
আমি ধাই পিছে তার দুরন্ত উল্লাসে;
লুকায় আলোর বিশ্ব চন্দ্র সূর্য্য তারা পদভর ত্রাসে
দীর্ঘ রাজপথ-অজগর মচ্‌ড়িয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
ধরণী কূর্ম্মপৃষ্ঠ দীর্ণ জীর্ণ হয়ে ওঠে মত্ত মোর নির্ম্মম ঘর্ষণে।
পশ্চাতে ছুটিয়া আসে মেঘ ঐরাবত সেনাদল
গজগতি দোলাছন্দে, স্বর্গে বাজে বাদল-মাদল!
সপ্ত সাগর শোষি' শুণ্ডে শুণ্ডে তারা—
উপুড় ধরণী-পৃষ্ঠে উগারে নিযুত লক্ষ বারি-তীর-ধারা।
বয়ে যায় ধরা ক্ষত-স্থলে
সহস্র পঙ্কিল স্রোত-ধার।
চণ্ডবৃষ্টি প্রপাত-ধারা-স্থূলে
বরষার বুকে দোলে জল-মালা-হার।

আমি ঝড়, ঝঞ্ঝোকের সেনাপতি, খেলি মৃত্যু-খেলা
ঘূর্ণিয়া প্রিয়া-সাথে। দুর্য্যোগের হলাহলি মেলা
ধায় মম অশ্রান্ত পশ্চাতে।

মম প্রাণ-রঙ্গে মাতি নিখিলের শিখী-প্রাণ মুহু মুহু মাতে।
শ্যাম স্বর্ণ পত্রে পুষ্পে কাঁপে তার অনন্ত কলাপ।—
দারুণ দাপটে মম জেগে ওঠে অগ্নিস্রাব-জলন্ত-প্রলাপ
ভূমিকম্প-জরজর থরথর ধরিত্রীর মুখে।
বাসুকী-মন্দার সম মন্থনে মন্থনে মম সিন্ধু-তট ভরে ফেনা-থুকে।
জেগে ওঠে মম সেই সৃষ্টি-সিন্ধু-মন্থন-ব্যথায়
রবি শশী তারকার অনন্ত বুদ্‌বুদ! উঠে ভেঙে যায়
কত সৃষ্টি কত বিশ্ব আমার আনন্দ-গতি-পথে।
শিবের সুন্দর ধ্রুব-আঁখি
যমের আরক্ত মোর মশাল-নয়ন—দীপ মম রথে।
জয়ধ্বনি বাজে মোর স্বর্গদূত "মিকাইলের" * আতশী-পাখায়
অনন্ত-বন্ধন-নাগ-শিরস্ত্রাণ শোভে শিরে। শিখী-চূড়া তায়
শনির অশনি ঐ ধূমকেতু-শিখা;
পশ্চাতে দুলিছে মোর অনন্ত-আঁধার-চিররাত্রি-যবনিকা!
জটা মোর নীহারিকাপুঞ্জ-ধূম পাটল পিঙ্গল,
বহে তাহে রক্ত-গঙ্গা নিপীড়িত নিখিলের লোহিত নিকাশ।

ঝড়—— ঝড়——ঝড় আমি——আমি ঝড়—
কড়কড় কড়্
বজ্র-বায়ু-দন্তে-দন্তে ঘর্ষি চলি ক্রোধে।
ধূলি-রক্ত বাহু মম বিন্ধ্যাচল সম রবি-রশ্মি-পথ রোধে।
ঝঞ্ঝনা-ঝাপটে মম
ভীত তূর্ণ সম
সহসা সৃষ্টির কোলে নিবৃত্তি লুকায়।
আমি ঝড়, ঝুনুমের ঝিঞ্জির-মঞ্জীর বাজে ব্রস্ত মম পা'য়।
ধাক্কার ধমকে মম থান থান নিষিদ্ধের নিরুদ্ধ-দুয়ার,
সাগরে জোয়ার জাগে, মড়ক ভুয়াকি ধরে আমার ধুয়ার।
কৈলাসে উল্লাস ঘোষে ডম্বরু ডিডিম্
ভ্রিম্ ভ্রিমি ভ্রিম্!

---

* মিকাইল—স্বর্গীয় দূত, ইনি সৃষ্টির নিয়ন্তা।

অম্বর-ডঙ্কার ডামাডোল
সৃজনের বুকে আনে অশ্রু-বন্যা ব্যথা-উতরোল।
ভাণ্ডারে সঞ্চিত মম দুর্ব্বাসার হিংসা ক্রোধ শাপ।
ভীমা উগ্রচণ্ডা ফেলে উল্কারূপী অগ্নি-অশ্রু, সহিতে না পারি মম তাপ।

আমি ঝড়, পদতলে আতঙ্ক-কুঞ্জর, হস্তে মোর মাভৈঃ-অঙ্কুশ।
আমি বলি, ছুটে চল্ প্রলয়ের লাল-ঝাণ্ডা হাতে,—
হে নবীন পরুষ পুরুষ!

স্কন্ধে তোল্ উদ্ধত বিদ্রোহ-ধ্বজা, কণ্টক-অশঙ্ক রে নির্ভীক!
পুরুষ ক্রন্দন-জয়ী, দুঃখ দেখে দুঃখ পায় —ধিক্ তারে ধিক্!
আমি বলি, বিশ্ব-গোলা নিয়ে খেল্ লুকোলুকি খেলা।
বীর নিক্ বিপ্লবের লাল ঘোড়া,
ভীরু নিক্ পায়ে-ধাওয়া পলায়ন-ভেলা!
আমি বলি, প্রাণানন্দে পিয়ে নে রে বীর,
জীবন-রসনা দিয়া প্রাণ ভ'রে মৃত্যু-ঘন ক্ষীর!
আমি বলি, নরকের 'নার'* মেখে নেয়ে আয় জ্বালা-কুণ্ড সূর্য্যের হাম্মামে,
রৌদ্রের-চন্দন-শুচি উঠে বস্ গগনের বিপুল তঞ্জামে!

আমি ঝড় মহা-শত্রু স্বস্তি শান্তি-শ্রীর,
আমি বলি, শ্মশান-সুষুপ্তি শান্তি,
জয়নাদ আমি অশান্তির।

পশ্চিম হইতে পূবে ঝঞ্ঝনা-ঝাঁঝর
ঝঞ্ঝা-জগঝম্প ঘোর বাজায়ে চলেছি ঝড়
ঝনাৎ ঝনাৎ ঝন্,
ঝনর্ ঝনর্ ঝন্, ঝনন্ ঝনন্ শন্
শনশনশন্—
হুহু হুহু হুহু——
সহসা কম্পিত-কণ্ঠ ক্রন্দন শুনি কার—'উহু! উহুউহুউহু!'
সজল কাজল-পক্ষ কে সিক্ত-বসনা একা ভিজে—
বিরহিণী কপোতিনী, এলোকেশ কালোমেঘে পিজে।
নয়ন-গগনে তার নেমেছে বাদল, ভিজেছে দু-চোখের কাজল,

* 'নার'—অগ্নি।

মলিন করেছে তার কালো আঁখি-তারা
　　　　　　　বায়ে-ওড়া কেতকীর পীত পরিমল।
এ কোন্ শ্যামলী পরী পুবের পরীস্থানে কেঁদে কেঁদে যায়—
　　নবোদ্ভিন্ন কুঁড়ি-কদম্বের ঘন যৌবন-ব্যথায় ?
　　　　জেগেছে বালার বুকে এক বুক ব্যথা আর কথা,
কথা শুধু প্রাণে কাঁদে,
ব্যথা শুধু বুকে বেঁধে, মুখে ফোটে শুধু আকুলতা।
　　কদম্ব তমাল তাল পিয়াল-তলায়
দুর্ব্বাদল-মখমলে শ্যামলী আল্‌তা তার মুছে মুছে যায়।
　　　　　　　বাঁধে বেণী কেয়া কাঁটা-বনে।
বিদেশিনী দেয়াশিনী একমনে দেয়া-ডাক শুনে!
　　　　দাদুরীর আদুরী কাজরী
শোনে আর আঁখি-মেঘ-কাজল গড়ায়ে
　　　　　　　দুখ-বারি পড়ে ঝরঝরি।
ঝিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্　রিমি ঝিমি রিম্ ঝিম্
　　　　　　　　বাজে পাঁইজোর!
কে তুমি পুরবী বালা ? আর যেন নাহি পাই জোর
　　চলা-পায়ে মোর।　ও বাজা আমারো বুকে বাজে।
ঝিল্লির ঝিমানী-ঝিনিঝিনি
　　　　　　শুনি যেন মোর প্রতি রক্ত-বিন্দু মাঝে!
আমি ঝড় ? ঝড় আমি ? না না আমি বাদলের বায়!
　　　　　　　　বন্ধু! ঝড় নাই!
　　　　　　　　　　কোথায় ?

　　　　ঝড় কোথা ? কই ?——
বিপ্লবের লাল ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ——
　　　　　　ঐ শোনো শোনো তার হ্রেষার চিক্কুর,
　　　　　　　　ঐ তার ক্ষুর-হানা মেঘে!—
না, না, আজ যাই আমি, আবার আসিব ফিরে
　　　হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর! তুমি থেকো জেগে।

তুমি রক্ষী এ রক্ত অশ্বের,
হে বিদ্রোহী অন্তর্দেবতা!—শুন শুন মায়াবিনী ঐ ডাকে ফের
পূবের হাওয়ায়—!
যায়—যায়—সব ভেসে যায়——
পূবের হাওয়ায়——
হায়!——

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই ঘরের কোণে তোদের থলি থালি আঁকড়ে বসে থাকিস্‌নে—বেরিয়ে পড়্‌ প্রাণের সদর রাস্তায় ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

কাল্গুণী

আভা

—শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় অতি সন্তর্পণে অর্দ্ধ বন্ধ দ্বার ঠেলিয়া বিভাকর মহেন্দ্রনাথের ঘরে উপস্থিত হইল, পরে তাঁহার শিয়রপ্রান্তে আসিয়া ডাকিল 'ছোট্ দা'।

মহেন্দ্রনাথের চোখ দুটী তখন কেবলমাত্র তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল, বিভাকরের ডাক কাণে আসার সঙ্গে তিনি চোখ মেলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে তাঁহার চোখের উপরে চোখ রাখিয়া প্রশ্ন করিল—'কেমন আছেন আজ ?'

মহেন্দ্র উত্তর করিল—'রোজ যেমন থাকি।'

'আজ ও জ্বর এসেছিল তা হলে ?'—অসমাপ্ত কথায় থামিয়া গিয়া বিভাকর চিন্তিত ভাবে তাঁহার ললাট স্পর্শ করিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রৌঢ় একটু কৌতূহলের সঙ্গেই বলিলেন 'ভাবছ কি, মানুষের ভাবনা এর কি কিছু করতে পারবে ? দুমাস ত দেখ্‌ছ, ভেবে কিছু করতে পারলে কি ?

বিভাকর তাহার এই অব্যর্থ উত্তরে নিজেকে যেন একটু সচেতন করিয়া লইয়া বলিল—'না, তা কিছু নয়, তবে একটু সময় মেপে দেখছি।'

তাহার এই আশ্বাসবাণীতে মহেন্দ্রনাথ তাঁহার রোগ পাণ্ডুর মুখে একটু হাসিয়া বলিলেন—'যা হবে, তা হবে, আর সেও ত একটা নতুন কিছু নয়, দেখ বিভু বাঁচার প্রলোভণ আমার অত বেশী নেই, তোমার এ আশ্বাস বাণীর আমার বিশেষ দরকার নেই।'

বিভাকর স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, এ কথার পর সহসা উত্তর দেবার মত আর যেন সে কিছু খুঁজিয়া পাইল না।

খাণিকক্ষণ সমস্ত ঘরটা যেন নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। একটু পরে মহেন্দ্রনাথ আবার ডাকিলেন—'বিভু !' বিভাকর চমকিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিল 'কেন ছোট্ দা।'

প্রৌঢ় স্থির স্বরে বলিলেন—'তোমরা যতই বল, আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি,

আমার ডাক এসেছে, কেন আর টানা হেঁচ্‌ড়া কর, কাল হতে ডাক্তার বাবুকে আসতে বারণ করে দিও।"

ইহার পর আরও দুই দিন অতীত হইল, সেদিন অপরাহ্নে বিভাকরকে নির্জ্জনে ডাকিয়া ডাক্তারবাবু স্বেচ্ছায় বিদায় লইয়া গেলেন; আর তিনি বারণ করার অপেক্ষাও রাখিলেন না।

সুদীর্ঘ ছয় মাস কাল এই রোগীটিকে লইয়া সকলে ব্যস্ত থাকিলে ও আজ এই বিদায়োন্মুখ যাত্রীটির জন্য সকলের অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বেদনার নিশ্বাস ও অশ্রুজল তাঁহার গতির পথে কোন বাধা দিতে পারিল না।

* * *

সপ্তাহ পরে সেদিন মহেন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত ঘরটি দখল করিয়া বিভাকর নিবিষ্ট মনে এই সমস্ত বিষয়ই ভাবিতেছিল, অনেক দিনের অনেক কথা আজ একে একে তাহার মনের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল—সে যেদিন সদ্য পিতৃহীন হইয়া বিধবা মায়ের সঙ্গে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সেদিন তিনি কত না স্নেহের সঙ্গেই তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছিলেন। আজন্ম অবিবাহিত চির-কঠোর প্রকৃতির যে এতখানি কোমলতা থাকিতে পারে, ইহা এই ঘটনার পূর্ব্বে তাহার কখনো আভাষ ও অনুভব করে নাই; সম্পর্কে তিনি মায়ের মাতুল মাত্র, কিন্তু স্নেহ হিসাবে অনেকের চাইতে বড়, বেশীরকম উপরেই বুঝি তাঁর স্থান ছিল। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বিভাকরের সমস্ত অন্তঃকরণ করুণ সুরে ভরিয়া উঠিল, সে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উদাস ভাবে বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিল।

তখন অপরাহ্ণ। দিগন্তের প্রারম্ভ হইতে মেঘ-সঞ্চার হইয়া সমস্ত আকাশখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, পলাশগাছটি তার রঙিন ফুলের ডালিটা মাথায় লইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল,—সম্মুখের মাঠের উপর লক্ষ্যহীন ভাবে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া শেষে অনেকখানি অন্যমনস্ক ভাবেই সে মৃতের ক্যাস-বাক্সটি টানিয়া লইয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল। উদ্দেশ্যহীন ভাবেই সে তাহার কতকগুলি চিঠি কয়খানি খাতা টানিয়া লইয়া নাড়া চাড়া করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, কিন্তু পাতার পর পাতা বদল করার সঙ্গে সঙ্গে খাতার একটি পাতার ভিতরে তার দৃষ্টি আসিয়া অনেকখানি উৎসুক ভাবে থামিয়া পড়িল, কি যেন একটা নূতন তথ্য আবিষ্কারের আশায়।

বিভাকর দেখিল—সেখানকার অক্ষরগুলি যেন সজীব হইয়া বলিতেছে—

'জগতটাকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, বাস্তব সেখানে পূর্ণ মাত্রায় রাজত্ব করছে, আর যখন মনটাকে দেখি তখন লক্ষ্য করি, কেবল কল্পনার একাধিপত্য।

. . . আমি চিরদিন কল্পনাপ্রবণ, আর সে কল্পনাটাকে চিরদিনই ঠেলে ধরেছি বড় উঁচুতে, তাই সংসারী হওয়ার প্রবৃত্তি আমার কাছে দাঁড়াতে পারে নি, সংসারী হই ও নি, মন্দ কি, আছি ত বেশ। . . .

. . . সে এসেছিল এক আষাঢ় সন্ধ্যায়; তখন মেদিনীপুরে কাজ ছিল আমার। বর্ষণ ক্লান্ত আকাশের কোলটা সেদিন গেরুয়া পরেই যেন দাঁড়িয়েছিল। শ্রদ্ধা নারী জাতিকে? সে আমার অসম্ভব বলেই ধারণা ছিল, কিন্তু সেদিন সে এক নিমিষে কেমন যেন সব উলটে দিয়ে দাঁড়াল! এমন চোখ নিয়ে এর আগে ত আর কাউকে দেখিনি! . . .

. . . কলেরায় মরা মাকে কোলে নিয়ে তাকে সেদিন বড় কান্নাটাই কাঁদতে দেখেছিলাম, কিন্তু কান্নাতে কি মানুষ এত সুন্দর হয়? সঙ্গীরা সব ফেলে গিয়েছে।—এই হৃদয়হীনদের জগন্নাথ দেখা দেবেন? বিশ্বাস হয় না। . . .

. . . মা ত তার গেল, বিশ্বটা খুঁজলে ও আর সন্ধান মিলবে না। কিন্তু সে যায় কোথা, কাজেই আমার ছোট বাসাটি তার আশ্রয় হয়ে দাঁড়াল। . . .

. . . দিন গুলো বড় সুন্দর চলছে; কোথায় ছিল এত হরষ-ভরা বিশ; চিরদিন ত তার দৈন্যের দিকটাই দেখে এসেছি, এত পূর্ণ সে! এমন করে আগে ত টের পাইনি! না বিদায় দিতে হবে যে, তার দাদা আসছে তাকে নিতে। . . .

. . . যাচ্ছ যাও। তোমাকে বেঁধে রাখ্‌বার মত অধিকার যে আমার নেই। আমি নিঃস্ব, রিক্ত, তোমার শ্রদ্ধার পূজো তুমি নিয়ে যাও, আমি চাইনি। একটু শ্রদ্ধা নিয়ে কি করব, আমি কি চাই তা যে আমিই জানিনা, সমস্ত প্রাণ বড় শ্রান্ত। . . .

. . . আবার আষাঢ় ফিরে এসেছে, ওই যে আকাশের ভিতর হতে ওর দীর্ঘ-শ্বাসের শব্দ আসছে, বাতাসটা বড় করুণ বড় বিষণ্ণ। . . .

. . . অনেক দিন কেটে গেল, নয় কি! কিন্তু কি উজ্জ্বল স্মৃতি! মলিন হতে চায় না, দীর্ঘ সাধনায় দিনের পর দিন কেটে গেল।

আত্মার স্বত্বা আছে? সাধকের সাফল্য আছে? এ কি ঠিক বুঝ্‌তে পারি?

গোলমাল লাগে—না—না—আমার প্রাণ চীৎকার করে বলছে—আছে, আছে . . . সেখানে ঠিক তুমি আমার আগে গিয়ে আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। . . .

এমন করে নীরব অশ্রু আর কত ঢালব! অনুভূতির ব্যথা বুকটাকে আমার বিষিয়ে তুলেছে—'

পৃষ্ঠা কয়টি শেষ করিয়া বিভাকর স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, বাহিরে তখন অশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িতেছিল ঝম্ ঝম্ ঝম্! আজ এই বৃষ্টির শব্দ তাহার কাণের কাছে স্বর্গগত আত্মার আকুল কান্নার মতই বাজিয়া উঠিল।

ঝঞ্ঝা তোমার আরো মনোহর লাগে
বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে
যেন গো অস্ত আকাশে।

"গীতিমালা।"

সাগরিকা

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশি।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। একে একে জুলিয়াদের ছোট ছোট নৌকাগুলি এবং দূর সমুদ্রের পাখীগুলি বাসায় ফিরিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের তরঙ্গ-রেখার শিরে সহস্র মানিক জ্বলিয়া উঠিল। তীরের সন্ধ্যাচরের দল এতক্ষণ বাসায় ফিরিয়া গিয়াছে—মাঝে মাঝে দু'একটি লোক এখনও এদিকে ওদিকে পড়িয়া আছে! আমি এই সৈকত-শয্যার এক পাশে কাণ পাতিয়া পড়িয়া আছি—একটি মাত্র পদধ্বনির সুধা-পূর্ণ-ইঙ্গিতের জন্য আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় শ্রবণ শক্তি লাভ করিয়া উৎসুক হইয়া আছে। একবার একটি শব্দ শুনিলাম কিন্তু তাহা দূরে মিলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার একটি শব্দ ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল, আরো নিকটে! যাহার অপেক্ষা করিতেছিলাম সে-ই। সাগরিকা আসিয়া কিয়দ্দূরে আমার পাশে বসিল। আমাদের মধ্যের এই দূরত্ব টুকু এতদিনেও ঘুচিল না!

আমি বলিলাম—সাগরিকা আজ যে আমি যাচ্ছি।

সে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার এখানকার কাজ কি সারা হল?

এই কি উত্তর? এতদিনের বন্ধুত্বের বিচ্ছেদে অন্তত একটিও দীর্ঘশ্বাস পড়িবে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জনে যদিই বা সে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িয়া থাকে,—তাহা মিশিয়া গেল।

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—তোমার এখানকার কাজ কি সারা হ'ল?"

কেমন করিয়া বলি যে কাজ শেষ হইয়াছে। আমার স্বাস্থ্যোন্নতি হয় তো কিছু হইয়াছে ছুটিও শেষ, তাই বলিয়া কাজ শেষ এমন কথা বলি কি করিয়া? সাগরিকার হৃদয়ের এক তিলও যে জয় করিতে পারিলাম না! বস্তুত তার কতটুকুই বা জানি? এমন কি তার নামটুকু পর্য্যন্ত না।

'সাগরিকা' আমার মনগড়া নাম। ছুটিতে সমুদ্র তীরে বেড়াইতে আসিয়া তাহার সহিত এই ক্ষীণ পরিচয়টুকু হইয়াছে। কোনদিন দিনের বেলায় তাহাকে দেখি নাই বাস্তবিক সে দোষ তাহার নহে কারণ আমার মত একজন বিদেশী

অপরিচিতের সাথে দিনের বেলা তাহার মেলা-মেশা অসম্ভব। সে সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাতারার মত এই সাগর বেলায় উদয় হইত। তাহার পরিচয় আমাকে দেয় নাই এমন কি তাহার নামটি পর্য্যন্ত আমাকে বলে নাই। তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া নিরাশ হইয়া তাহাকে সাগরিকা বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছিলাম! ইহাতে সে রাগ করিত না বোধ হয় খুসিই হইয়াছিল।

সাগরিকার সাথে আমার দিন পনোরর পরিচয় কিন্তু আজ ও তাহার কিছুই জানিনা! সে আমার কাছে ওই সাগরের মতই রহস্যময় রহিয়া গেল। সন্ধ্যা যখন নিবিড়, স্থান যখন সমুদ্রতীর, বাতাসটি যখন সুপ্তনীরের স্বপ্ন-মাখানো, হৃদয় যখন নবীন এবং পার্শ্বে যখন নবীনা, তখন অনেক অসম্ভব এবং হাস্যকর বস্তুও সম্ভবপর হইয়া উঠে। এম্নিতর এক সন্ধ্যায় সাগরিকাকে বলিয়াছিলাম তাহাকে দেশে লইয়া যাইব।

সে আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি যাহারা শোনে নাই তাহারা বুঝিতে পারিবে না। খুব নির্জ্জন সমুদ্রের মাঝে যেথানে কঠিন পাথরে লাগিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙিয়া পড়ে—সেইখানে ঠিক এই রকম শব্দ উঠে।

সে হাসিয়া বলিল, মানুষের প্রয়োজনের জন্য হ্রদ, নদী পুষ্করিণীর জল আছে। কিন্তু সমুদ্রের জল তাহার সব প্রয়োজনের বাহিরে। কর্ম্ম অবসানের বেলায় সে সমুদ্রতীরে বসিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া সমুদ্রকে তাহার কাজে লাগাইবে এমন হইতে পারে না। আমি বোধ করি বলিয়াছিলাম, ভালবাসাও মানুষের প্রয়োজনের বাহিরে। সে নদীর নালার জলকে কাজে লাগায় কিন্তু ভালবাসে সমুদ্রকেই। এবার গম্ভীরভাবে সে উত্তর দিল বন্ধু, ভালবাসা এবং ভাল লাগা বড় নিকট প্রতিবেশী—তাহাদের মধ্যে ভুল করিও না। ভাল বাসা এবং ভাল লাগার তফাৎ অনেক খানি। মানুষের ভাল লাগিতে পারে অনেককেই কিন্তু সে একজনের বেশি ভালবাসিতে পারে না। বস্তুত নদী, নালাকেই সে ভালবাসে আর এই সমুদ্র লাগে তাহার ভালো।

আমি বলিলাম স্বীকার করিতেছি তোমাকে আমার ভাল লাগে—কিন্তু কোনো দিন সেই 'লাগা' কি 'বাসায়' পরিণত হইতে পারে না?

সে অধীর ভাবে উত্তর দিল।—"না না, আমাকে তুমি লইয়া গিয়া সংসারের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিবে, প্রতিদিনের কাজের পাকে ঘুরাইবে—ইহা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই সমুদ্র তীর তোমার ভাল লাগে কিন্তু ইহাকেও তো ছাড়িয়া যাইবে? এই সমুদ্রতীরের ঝিনুক গুলিকে ভাল লাগে বলিয়াই কি ইহাদের

বাড়ী লইয়া যাইবে? আমিও এই রকম এই সমুদ্রতীরের সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন; যদি এখান হইতে কাড়িয়া আমাকে বাড়ী লইয়া যাইতে তবে দেখিতে সেখানে আমার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য কমিয়া গিয়াছে।

নির্জ্জন সমুদ্রতীরবাসিনী অপরিজ্ঞাতা এই মেয়েটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। এমনি ভাবে তাহার সহিত কথা বলিতে বলিতে রাত্রি গভীর হইয়া উঠিয়াছে। তীরে কোথাও জনপ্রাণী নাই; আকাশে নিঃশব্দ সঞ্চরনে পা টিপিয়া টিপিয়া গ্রহ তারাদের বৈতালিক চলিতেছে। দূর দূরান্তের সমুদ্রের ঢেউ গুলির গম্ভীর ধ্বনি নিস্তব্ধতার সঙ্গে এমন সুনিপুন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে তাহা শোনা যায় বটে কিন্তু স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে না। এমনি গভীর রাতে আমাদের আলাপ শেষ করিয়া আমরা দু'জনে দু'দিকে চলিয়া গিয়াছি।

পরদিন আবার নিয়মিত স্থানে নিয়মিতভাবে তাহার সহিত দেখা হইয়াছে। তর্কে তাহাকে পরাস্ত করিবার জন্য আমার সমস্ত বিদ্যা টুকু পুঁথির তূপ হইতে বাহির করিয়াছি। কিন্তু সমুদ্রতীর-সঞ্চারিনী সেই অপরিচিতাকে কিছুতেই পারিয়া উঠি নাই। সে বলিয়াছিল,—তোমাদের শিক্ষা যে উৎস হইতে তাহা যেমন অগভীর তেমনি ব্যবহারের দায় সঙ্কীর্ণ।

তাহার শিক্ষা সমুদ্রের নিকটে—গভীরতার তল সেখানে নাই, ব্যবহারের সম্পূর্ণ বাহিরে তাহার সার্থকতা, এবং যে ভাষার টীকা নিস্তব্ধ নিশীথের মৌন নক্ষত্র জাল জ্যোতিরিঙ্গিতে মাত্র করিয়া থাকে।

আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম—বন্ধু, যদি মিলন হয় তবে কেন আবার বিচ্ছেদ আসে?

সে উত্তর দিয়াছিল,—মানুষের যতটুকু জানা উচিত তাহার বেশী জানিয়া সে বিপদে পড়ে। চোখ-আঁটা ঘোড়ার মত বর্ত্তমানের পথটুকু ধরিয়া গেলেই তাহার সুখ। এদিকে ওদিকে ভবিষ্যৎ অতীতের মহা অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া কেন সে মিছা ভাবিয়া মরে।

আমি বলিলাম—ওই দুইটা কাল যখন বিধাতা দিয়াছেন তখন অবশ্যই তাহারা দ্রষ্টব্য।

সে তাহার কাল চোখ দুটি দূর সমুদ্রের দিকে নিবিষ্ট করিয়া বলিল—কিন্তু ভবিষ্যৎ তো আমাদের ফাঁকি দিয়া যাইতে পারে না। বর্ত্তমানের সীমা পার না হইয়া কি অতীতের রাজ্যে যাইবার তাহার সম্ভাবনা আছে? আর অতীত তো দেখা দিয়াই গিয়াছে।

আমি বলিলাম, কিন্তু বন্ধু, মানুষের স্বভাবই এই যে সে অসম্ভবকে চায়! নইলে আমি কি তোমাকে লইতে চাহিতাম?

ইহা শুনিয়া সে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল কিন্তু তারপরেই গম্ভীর হইয়া বলিল—বন্ধু, জগতে যদি সুখ পাইতে চাও তবে বর্ত্তমানকেই একমাত্র কাল বলিয়া জেনো।

"কিন্তু এই বর্ত্তমানের ক্ষীণ ভেলা টুকুকে আশ্রয় করিয়া কি এত বড় কাল পারাবার পার হওয়া যায়?"

"কাল পারাবার যখন অনন্ত তখন বুঝিতে হইবে তাহা পার হইবার জন্য নয়। তাহাতে ডুবিয়া মরিবার জন্য।"

কিছুক্ষন চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার আরম্ভ করিল—এই যে কদিনের আমাদের আলাপ এই টুকুই কি যথেষ্ট নয়? এই যে কদিনের আনন্দ টুকু ইহাকেই চরম বলিয়া জানিয়া সুখ পাও বন্ধু।

আমি হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, আমি কি ভাবিতেছি।

আমি বলিলাম—তোমার মধ্যে কোথায় যেন একটু নিষ্ঠুরতা আছে। তুমি পরের মনের কথা বুঝিতে পারো না, তাই ভাবিতেছি।

সে বলিল—আমি জানি কোথাও আমার একটু নিষ্ঠুরতা আছে; কিন্তু তাই বলিয়া পরের মনের কথা বুঝিতে পারি না এমন কথা বলিও না। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস এবং আমিও তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু তার বেশী সাধ্য নাই। এই বলিয়া সমুদ্রের একটা দমকা বাতাসের মত সে অন্ধকারের দিকে দৌড়িয়া চলিয়া গেল। আর কেহ হইলে ভাবিতাম কিন্তু আমি সাগরিকাকে যে জানি! অনেকক্ষন একলা বসিয়া রহিলাম, সমুদ্রের জলের দুইটা নিশাচর পাখী কর্কশ চীৎকার করিয়া উঠিল।

* * *

আজ বিদায়ের দিন। সাগরিকাকে বলিলাম—বন্ধু আজ যাচ্ছি।

সে অনায়াসে কহিল—এখানকার ছুটি বুঝি ফুরালো?

বিদায়ের দিন অতি পাষাণের মনও একটু নরম হয় কিন্তু তাহার কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও তাহার নাম জানিতে পারিলাম না। সে বলিল—আমার নাম নাই। সমুদ্র আমাকে যে নাম দিয়াছে তাহা আর কেহ শুনিলে হাসিবে সুতরাং বলিব না। তাহার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম সে বলিল—জগতে যেখানে সমুদ্র আছে সেইখানেই তাহার নিবাস।

—এমন অদ্ভুত মেয়েও দেখি নাই!

কয়েকদিন আগে তাহাকে আমার নামের প্রথম অক্ষর লেখা একটি সোনার আংটি স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ দিয়াছিলাম। সে তাহা লইতে কোন দ্বিধা করে নাই। মনে মনে খুসী হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম আমার শূন্য আঙুলের দিকে চোখ পড়িলে তাহাকে মনে পড়িবে। আজ অতি ভরসায় বুক বাঁধিয়া তাহার একটি স্মৃতি চিহ্ন চাহিলাম। সে প্রথম খুব খানিকটা হাসিয়া উঠিল কিন্তু শেষে আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহার একটি আংটি কাগজে মুড়িয়া আমার হাতে দিল। কাগজ খুলিবার স্বর আমার সহিল না, সেই মোড়ক শুদ্ধ আংটি লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলাম। চোখ বন্ধ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়কে একাগ্র করিয়া সেই একটি আংটির মধ্যে সাগরিকাকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিলাম। একটি মাত্র শঙ্খের মধ্যে সাত সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়, আর এই আংটিতে মানব মনের মহারহস্য উদ্ঘাটিত কি হইবে না? অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করিয়াছিলাম—সাগরের লোনা বাতাসে বুক ভরিয়া উঠিল। মুখ উঠাইয়া চোখ খুলিয়া দেখি পাশে সাগরিকা নাই! বিনা সম্ভাষনে এই বিদায়ের দিনে চলিয়া গিয়াছে! পায়ের শব্দটুকু পর্য্যন্ত হয় নাই। সম্মুখে ওই মহারহস্যময় মহাসাগর;— তীরে এই ক্ষুদ্র মানব হৃদয়টি; কিন্তু রহস্যের গভীরতা যে কোথায় বেশী কে তাহা অনুমান করিবে?

সাগরিকা গিয়াছে কিন্তু তাহার স্মৃতিটি তো রাখিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি মোড়ক খুলিয়া ফেলিলাম।

—একি! এ যে আমারি আংটি! ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম আমার নামের প্রথম অক্ষরটি লেখা আছে। নিষ্ঠুরা সমুদ্র-সৈকত-বিহারিণী। তোমার চিহ্ন তো দিলেই না আমি যেটুকু দিয়াছিলাম তাহাও ফিরাইয়া দিয়া গেলে। তখন তাহার কথা মনে পড়িল—"বর্ত্তমানের চেয়ে অধিক জানিয়া সুখ নাই!" হয়তো তাই সে এই সোনার আংটিটি ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে। এ যে অতীতের স্মৃতি ভাণ্ডারের সিংহ দ্বারের সোনার চাবি। মনের তখন কি রকম অবস্থা হইয়াছিল তাহা মনে নাই কতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলাম তাহাও জানিনা। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কি যেন ভাবিয়া আংটিটি লইয়া সম্মুখের গর্জ্জমান সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। সাগরিকাকে যাহা দিতে পারি নাই সাগরকে তাহা দিলাম।

তখন সুদূর অস্তাচলের শিখরে অর্দ্ধচন্দ্র উঠিতেছে। সেই আলোতে দিগন্তের

শেষ হইতে এই তীর পর্য্যন্ত তরঙ্গের শিরে শিরে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার একটি অপরূপ সেতু রচিত হইয়াছে। স্বর্গীয় এই আলোক-পথ কি মানুষকে মহা-রহস্যের পর পারে লইয়া যাইতে পারে—? জানিনা।

আসল কথা, পুরুষ, মেয়ের কাছে রহস্য, মেয়ে, পুরুষের কাছে রহস্য, এই যদি না হবে, তাহলে এই দুটো জাতের ভেদ জিনিষটা প্রকৃতির পক্ষে নেহাৎ একটা অপব্যয় হত।

"ঘরে বাইরে"

আরেক ফাল্‌গুনে

—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী।

এই রঙীন্ ফাল্‌গুনে কল্পনার জাল বুনে পাঠাই, কোথায় কে জানে। বসন্তে অনেক বেতারে চিঠি আসে, যদিও বেনামী, তবু মনের সেতারে তার উত্তর বাজে—সেই সুর কার কাছে ভেসে যায় কে জানে?

যিশু বলেছিলেন, তোমার এক গালে যদি কেউ চড় মারে তাকে আরেক গাল ফিরিয়ে দিয়ো। কিন্তু এই বসন্তের বাণী বলে—তোমার এ গালে চুমু যে দিল, তারে ওগালও ফিরিয়ে দাও!

আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে পাশের বিছানায় চাইলুম—একটি তরুণ ঘুমিয়ে রয়েছে। চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে আমার চোখে হঠাৎ যেন স্বপ্নলোক ভেসে উঠল! . . .

তার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে হ'ল ছেলেবেলায় সে কেমন সুন্দর ছিল, আর তাকে আরেকজনের কত মিষ্টি লাগ্‌ত। ছুটির দিনের দুপুর বেলায় সে তার মার মানা না মেনে, বাবাকে ফাঁকি দিয়ে বইয়ের গাদা হ'তে অদূরের আমবাগানে বসে পড়্‌তে যেত; সেখানে এসে মিশ্‌তো তার কিশোর বন্ধু। তখন তারা দুজনে লুটোপাটি দুষ্টমি করে বেড়াত সারা পাড়াময়; হয় ঘুড়ি ওড়াত, নয় মাছ ধর্‌ত, নয় কাঁচা আম পেড়ে খেত দুজনে। এক একদিন ঘুম পেলে বইয়ের গাদায় মাথা দিয়ে দুজনকে বুকে জড়িয়ে দুজনে ঘুমিয়ে থাক্‌ত।

কিন্তু এক-একদিন কেমন যেন হত। সেদিন ফাগুনের উতলা হাওয়ায় সারা বাগান সোঁ সোঁ করে উঠ্‌ত, তখন তাদের মনের বাঁশীও যেন বনের বাঁশীর সুরে বাজ্‌তে চাইত। সেদিন তারা কলরব, চপলতা, দুষ্টুমি ভুলে যেত, অকারণে উদাস হয়ে যেত তাদের মন।

তারা অবাক চোখে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাক্‌ত যেন প্রশ্ন কর্‌ত—একি, একি! হয়ত বুঝ্‌ত কিম্বা ঠিক বুঝ্‌ত না—হ'লেই বা ছেলেমানুষ, বিশ্বের অন্তরের সঙ্গে তাদের অন্তরের যে যোগ রয়েছে; অমৃত-প্রবাহিনী যে তাদের

মনেও পথ কেটে চলেছে—একটি জায়গাতে যে তারা সবার সমান, সকলের সমবয়সী।

সারা গাঁয়ের মধ্যে কোন বালিকার নয়, কোনো কিশোরীর নয়, ছুটি ছেলে ছুজনের প্রেমে পড়েছিল। তারা ভালবাসত, কিন্তু কেমন ছিল তাদের ভালবাসা কে বলবে? যদি বলি ভায়ের ভালবাসা অনেক বাকী থাকবে, যদি বলি বন্ধুর প্রীতি, তাও নয়, যদি বলি নরনারীর প্রেম, তাহলেও ঠিক বলা হবে না! এই সব প্রেমেরই কিছু কিছু নিলে, বোধ করি, ছেলেবেলার ভালবাসা পূর্ণ হয়। তাদের ভালবাসা ছিল মার স্নেহের মতো ব্যগ্র ব্যাকুল সুন্দর; প্রাণের প্রতি প্রীতির মতোই অগোচর, নিবিড়, মধুর।

বিরহে অর্থ-না-বোঝা বেদনায় তাদের মন ঝুরত, মিলনে কারণ না-জানা খুসিতে সারা দেহমন জলে উঠ্‌ত, একে একে কতদিনের স্বপ্নই ভেসে এল ভেসে গেল। মনে-পড়া একটি দিনের কথা—সে হ'চ্ছে জীবনের একটি দিন।

সে দিন কিসের খুসিতে উথ্‌লে উঠেছিল তাদের বুক, একজন আনন্দের আবেগে আরেকজনের গায়ে ঢলে পড়্‌ছিল, সব অঙ্গ যেন হাসি হয়ে ঝরে ঝরে পড়্‌তে চাইছিল। সহসা কি যে ঘট্‌ল! উৎস হঠাৎ থম্‌কে গোপন পথ নিলে, সূর্য্যের গতি যেন স্তব্ধ হল, সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী যেন একাকার হয়ে গেল! . . . তখন সে কোন্ প্রেরণায় একজন আরেকজনকে সহসা চুমু দিয়েছে গলা জড়িয়ে!

সেই তাদের জীবনের প্রথম চুম্বন—কোথা থেকে এল, কেন এল, কেউ জানে না। এ তাদের কল্পনার অতীত ছিল, অথচ এত সহজ হয়ে প্রকাশ হল। এই প্রথম ও পরমকে যে দিন তারা পেল ছুজনেরই মুখের হাসি গেল মিলিয়ে, সমস্ত উচ্ছলতা সহসা গেল স্তব্ধ হয়ে—অকারণে গম্ভীর হয়ে পড়্‌ল ছুজনে! ছুজনে একবার ছুজনের দিকে চাইলে, ছুজনেই যেন অপরাধী, আর তারা কথা বল্‌তে পারলে না সেদিন, কেমন যেন হয়ে তারা চলে গেল যেন প্রণয়ের মধ্যে সে দিন তারা ফিরে গেল! বসন্ত ও যৌবন সেদিন তাদের স্পর্শ করেছিল, ফাল্গুনের দেবতা আপনি চুমো দিয়েছিলেন। . . .

কিন্তু এর সঙ্গে আমার কি করে প্রথম মিলন হ'ল তাই বলি। সে ছিল আরেক ফাল্গুন। আমাদের গাঁয়ের মাইনর স্কুলের সব বিদ্যা যখন হজম

হয়ে গেল তখন ঠিক হ'ল মামাদের গ্রামের হাই স্কুলে ভর্ত্তি হব। সে হচ্ছে বিশমাইল দূরে। ট্রেণে যেতে হয়, মামার বাড়ী থেকেই পড়্বো। ভর্ত্তি হবার জন্য, অনেক অশ্রুপাত করে মা ছ'দিনের মাত্র ছুটি দিলেন, ভর্ত্তি হয়েই তাঁর কোলে ফিরে আস্তে হবে এই সর্ত্তে।

আমার তখন বয়স হবে চোদ্দ। নতুন গাঁয়ে গিয়ে সবই আমার স্বপ্নের মতো ঠেক্তে লাগ্‌লো, অচেনা ছেলেদের কেমন রহস্যময় মনে হল।

বিকেল বেলা একলাটি মাঠের দিকে বেড়াতে গেছি, ছেলেরা খেল্‌ছিল। খেলার আনন্দে তারা মত্ত, আমায় দেখ্‌ছিল না। তাদের মধ্যে তার সঙ্গে প্রথম চোখাচোখি হ'তেই মনে হ'ল এত গুলোর মধ্যে সে হচ্ছে একটি। তাকে দেখ্‌বার পর থেকেই গ্রামটির কেমন এক মোহ আমাকে ঘিরে ধর্‌ছিল।

পরদিন সকালে মামা যখন পাড়া বেড়াতে ডাক্‌লেন, গিয়ে দেখি সেই ছেলেটি তাঁর সঙ্গে রয়েচে। অল্পক্ষণেই বুঝ্‌লুম ছেলেটি মামার ভক্ত, মামাও তাকে ভালবাসেন। সে আমার সমবয়সী অথচ মামা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে একটুও ব্যস্ততা দেখালেন না।

আমরা বেড়াতে বেরুলুম, মামার একদিকে আমি একদিকে সে। দুজনেই মামার সঙ্গে গল্প কর্‌ছিলুম, কিন্তু দুজনের ভেতরে কোন কথাই হল না, কেবল মাঝে মাঝে চোখাচোখি হচ্ছিল। মামা বাধা হয়েও যে মিলনের কারণ হয়েছিলেন এতেই আমার মনে গোপন আনন্দের সঞ্চার কর্‌ছিল।

সারাদিনের মধ্যে তাকে একা পেলুম না। পরদিনও তার দেখা পেলুম না। দশটার সময় তাকে স্কুলে যেতে দেখ্‌লুম তাকে একটি কথা বল্‌তে সাধ যাচ্ছিল, তার সঙ্গে মিল্‌তে মন কেমন কর্‌ছিল—কেন যে অত কাছে পেয়েও আলাপ করিনি সেই অতৃপ্তির ব্যথাই বুকের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ কর্‌ছিল।

সেদিনই আড়াইটার ট্রেণে বাড়ী ফির্‌তে হবে; ষ্টেশনে গেলুম, তখনো ঢের দেরী আছে। আপ্‌ট্রেন ও ডাউনট্রেণ সেখানে মেলে—আমি যাবো ডাউনে প্লাটফরমে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি সে আসছে। আমি অবাক আনন্দে চাইতেই সে একান্ত পরিচিতের মতো আমার বুকে এসে আত্ম সমর্পন করলে! . . .

তার সঙ্গে আমার একটিও কথা হয়নি, কেবল কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে মাত্র। সে কিসের নির্ভরতায় আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল, সে কি

জেনেছিল সেই বুকের আড়ালে। তারই কামনা গুঞ্জরিত হচ্ছে। সে কিসে দেখেছে যখন আমি তাকে চোখে চেয়েছি, তখনই বুকেও চেয়েছি।

সে কাছে থেকেও কতদূরে ছিল, অথচ কত সহজে আপনাকে ধরা দিল। আমিও তাকে বুকভরা স্নেহে বুকে টেনে নিলুম, বাহু দিয়ে বাঁধ্‌লুম। সেও আমায় দুটি হাতে ধর্‌ল জড়িয়ে, আমি তার চুলে দিলুম হাত বুলিয়ে যেন অমৃতের প্লাবনে আমরা স্নান কর্‌লুম।

আমি আদর করে বল্‌লুম—তোমার নামটি কি ভাই?

সে দুটি হাতে কণ্ঠবেষ্টন করে বল্‌লে—অপূর্ব্ব। তোমার?

—আমার নাম অসীম।

সে মধুর হেসে বল্‌লে—বেশ তো।

আমি তার দুটি হাত চেপে বল্‌লুম—অপূর্ব্ব তুমি আমার ভাই হবে?

—হবো, তুমিও আমার ভাই তাহ'লে!

—হাঁ, আজ থেকে আমরা দুটি ভাই, কেমন?

সে হাসি মুখে মাথা নাড়্‌লে। আমি তার মাথাটি আমার গালে চেপে ধর্‌লুম!

তার পর সে আপট্রেণে কোথায় গেল, আমি ডাউনট্রেনে উঠ্‌লুম; আমি মুখ বাড়িয়ে রইলুম, সে হাত নাড়্‌তে নাড়্‌তে বিদায় নিল। . . .

আজকের ফাল্‌গুনে সেই আরেক ফালগুনের স্বপ্ন এসে আমায় স্পর্শ কর্‌ছে। এই ছোট জীবনটুকুতেও ত কম হাসা কাঁদা হয়নি, কিন্তু সে সব মিলিয়ে জাগ্‌ছে একটি স্বপ্নময় স্মৃতি—তাই আজকের ফাল্‌গুনে আমাকে বিধুর ক'রে তুলেছে। স্মৃতির যবনিকার আড়ালে দেখ্‌তে পাচ্ছি একটি ছোট্ট কচি হাসি মুখ। আমার সকল স্বপ্নের স্বপ্ন সেই প্রথম প্রিয়ের উদ্দেশে বয়ে চলেছে—ওগো প্রিয়, তোমার স্নেহ অতুল, তোমার প্রকাশ সহজ, তুমি পরম সুন্দর।

* * *

কতদিনের পর ছেলেবেলার সেই বন্ধু আজ এসেছে। অপূর্ব্বর ঘুম ভাঙলো, একটু হেসে বল্‌লে—কি অসীম, এমন করে চেয়ে আছো যে। রাগ করেছ নাকি?

আমি হেসে বল্‌লুম—তোমার প্রতি পূর্ব্বে রাগ ছিল, পরেও আছে। রাগ করেছি বই কি।

মুকুল

—শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

দুঃখময় জগতের সকল আকর্ষণ ছিন্ন করে, মা চলে গেলেন!

মুকুল অভিমান-ক্ষুব্ধস্বরে বল্লে "মা কথা কইছে না কেন দিদি?"

হায়রে অবোধ শিশু! কি করে বোঝাব আমি, মার স্নেহ ভালবাসা সব শেষ হয়ে গেছে!——মা আমাদের চির জনমের মত ছেড়ে চলে গেছে! আমি তাকে কোলের কাছটিতে টেনে নিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লুম "মুকু! আয় ভাই মার সঙ্গে আমরাও এ পৃথিবী ছেড়ে যাই!"

মুকুল কিছু বুঝ্‌তে না পেরে মার কাছটিতে সরে গিয়ে আবার ডাক্‌তে লাগ্‌ল "মা! মা!——ওমা!——মা!"

আমি আর থাক্‌তে না পেরে মার মৃতদেহের বুকে মুখ লুকিয়ে চীৎকার করে কাঁদ্‌লুম "আমাদের কার কাছে ফেলে রেখে গেলি মা? আমরা তোকে ছেড়ে কেমন করে থাক্‌ব? মুকুর কথাও আর তোর একটুও মনে রইল না—এমনি পাষাণী তুই?"

মুকুল তার ছোট হাত দুখানা দিয়ে "আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলে তারপর বিজ্ঞের মত সান্ত্বনার ছলে বল্লে "তুমি মিথ্যা কথা বলছ দিদি! মা তা কি পারে?——আমাদের ফেলে চলে যেতে? মা ঘুমিয়েছে, আবার জাগ্‌বে। আবার কথা কইবে, আবার আমাদের কোলে নেবে। তুমি কেঁদনা বলছি;—যদি কাঁদ, আমিও মায়ের মত চুপ করে থাক্‌ব, আর কথা কইব না——"

ওরে অবোধ! বল্ তুই——আবার বল মা ঘুমিয়েছে! আমরা দুজনে চীৎকার করে কাঁদি——আর আমরা মায়ের এই মহাঘুম ভেঙে দিই!

তখন মনে হল মুকুলের এখন যে আমিই শুধু ভরসা। আমাকে এরকম উতলা হ'তে দেখ্‌লে সেও অস্থির হয়ে পড়্‌বে। সমস্ত ব্যথা বেদনা বুকের মধ্যে চেপে রেখে জোর করে হাস্‌বার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা কর্‌লুম। বল্লুম "মুকু! দাদা আমার! ভাই আমার! মা যদিই চলে যায়, আমিত

রয়েছি! ভয় কি তোর? আমি তোকে সব দুঃখ যাতনার আড়াল করে লুকিয়ে রেখে দেব!"

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। আমাদের দেখ্‌বার কেউ নেই বলে পাড়ার পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায়—তিনি আমাদের সম্পর্কে কাকা হন—আমাদের বাড়ীতে এসে অভিভাবক হয়ে রইলেন। তাঁর নিজের বল্‌তে সংসারে কেউ নেই। কাকীমা চিররুগ্ন ছিলেন——বছর খানেক হল তিনিও মারা গেছেন। এখন শুধু আমাদের দুটি ছেলে মেয়েকে নিয়ে কাকা থাকেন। মুকুল বড় হয়েছে, পাঠশালায় পড়ে। আমাকে সে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে। বেশ সুখেই আমাদের দিন কাটে।

কিন্তু ভগবানের বোধ হয় এটুকুও আর সহিল না। সেই তিন বছরেরটি থেকে মুকুলকে আমি চোখে চোখে রেখে এসেছি——তাকেও ছেড়ে আস্‌তে হল! আমার অনুপস্থিতিতে তার ও কাকার কতই না কষ্ট হবে। মুকুল—আমার মুকুল——তাকে ছেড়ে গিয়ে আমিই বা কেমন করে থাক্‌ব? মুকুল আমাকে জোর করে ধরে রইল। বল্‌লে "যেতে দেব না—আর কেনই তুমি যাবে? তুমি আমাদেরই আপনার, না, যাদের সঙ্গে জীবনে পরিচয় তাদের?" আমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লুম তোর দিদি যে বড় দুর্ব্বল মুকু! তার যে নিজের ইচ্ছে বলেও কিছু নেই!" মুকুল বল্‌লে "যদি যেতেই হবে, তবে বলে যাও, আবার তুমি আস্‌বে? খুব শীগ্‌গির আবার এসে আমায় আদর করবে? সেখানে গিয়ে আমাদের ভুলে যাবে না?" আমি তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্‌লুম "ভুলে যাব মুকুল? ভুলে যাব তোকে? তোকে যেদিন ভুল্‌ব সেদিন যেন আমি মরি। আস্‌ব বই কি ভাই। কতবার আস্‌ব। তুমিও আমার কাছে যাবে—গিয়ে দেখে আস্‌বে।" . . .

একটা মাস আমি মুকুলকে না দেখে আছি। কি করে যে আছি তা বল্‌তে পারি না। জানি না আরও কত দিন—কত যুগের পর তাকে ফের দেখ্‌তে পাব! সেদিন তার চিঠি পেলুম। আঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখেছিল "দিদি তুমি আস্‌বে রোজই সকাল হলে মনে করি আজ হয়ত তোমার দেখা পাব, তারপর সমস্ত দিন কেটে যায়, রাত আসে, আর ভাবি আর বোধ হয় জীবনে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না! আমার যে তোমার জন্যে বড্ড মন কেমন করছে দিদি!"

চিঠিখানা আমি কতবার যে পড়্‌লুম তার ঠিকানা নেই! আমার মুকুলের

হাতে লেখা চিঠির মধ্যে তার কি এক ব্যগ্র ব্যথিত কাতর আহ্বান মূর্ত্তি পেয়েছিল। মুকুল আমায় ডেকেছে। কিন্তু হায়রে। কেমন করে আমি যাব? এঁরা বড়লোক—জমিদার—সম্ভ্রান্ত। এঁদের বাড়ীতে বউ এসে বাপের বাড়ী কেউ ফেরে না। মৃত্যুর পূর্ব্বে এঁদের বাড়ী ছেড়ে যাবার অধিকার নেই কারও। যদিই বা কেউ যায় আর ফেরে না। সব জানি, সব বুঝি। কিন্তু মনকে প্রবোধ দিতে পারিনা যে। আমার আজীবনের পরিচয়, ভালবাসা, কিছু নয়, আর এই 'আপন করে নেওয়া' পরের ঘরটিই আমার ইহকাল পরকাল সব? মুকুলকে লিখে দিলুম তুমি আমায় দেখে যাও আর পারত নিয়ে যেও। সে চিঠির জবাব সে দিলে না। সে যে বড় অভিমানী ক্রমে আরও দু তিনমাস কেটে গেল। তবু কাকা কিম্বা মুকুল কারুর কোন খবর পেলুম না। তবে কি তাদের কোন অসুখ করেছে? কিছুই বুঝতে পারছিনা। যদি পাখীর মত উড়ে যেতে পারতুম!—

* * *

জানালার ভিতর দিয়ে দেখ্‌ছিলুম মেঘে ছাওয়া আকাশের বুকের একটিমাত্র তারা বিষাদ কাতর চোখে উদাস হয়ে চেয়ে ছিল। আজ উৎসব শেষে সবাই যখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু একলা বসে প্রতীক্ষা কর্‌ছে কবে আবার সব জাগ্‌বে—আবার কখন খেলা হবে। . . .

কে যেন ডাক্‌লে—দিদি!

ঠিক মুকুর কণ্ঠস্বর। মুকু। মুকু তুই কি আমায় উদ্ধার করে লুকিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিস? দাঁড়া ভাই, আমি যাব। আমি ফিরে যাব আমাদের ছোট ঘরটিতে। এখানকার বদ্ধ হওয়ায় প্রাণ আমার হাঁকিয়ে উঠচে।

তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলে বেরিয়ে এলুম। কই কোথায় মুকুল? কোথায় মুকুল? . . . আঃ, ঐ যে সে আমার আগে আগে ছুটে চলেছে। মনে তখন জাগ্‌ছিল মুকুল আমায় নিতে এসেছে আর আমি মুকুর সঙ্গে এ কারাগার থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। পথের বাঁকে একটা গাছের আড়ালে সে লুকিয়ে পড়ে ডাক্‌লে "দিদি।" আমিও তখনি ছুটে সেখানে গিয়ে তাকে ঝাপ্‌টে ধর্‌তে গেলুম হঠাৎ কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গেল! গভীর অন্ধকার যেন মুকুলকে আমার সাম্‌নে থেকে লুকিয়ে ফেল্‌লে!

চোখ খুলে দেখ্‌লুম আমি এক মাঠের মাঝখানে গাছতলায় শুয়ে আছি,

আমার কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে, আর আমার স্বামী কাপড় ভিজিয়ে জল দিয়ে তা মুছে দিচ্ছেন,—কিন্তু মুকুল কোথায় গেল?

স্বামী বল্লেন "স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে 'মুকুল' 'মুকুল' বলে চীৎকার করে ছুটে এলে। এত জোরে এসেছ যে আমিও তোমায় ধরতে পারিনি। মুকুলকে না দেখ্‌তে পেয়ে কি বড্ড কষ্ট হচ্ছে তোমার? আজ এই অবস্থায় বাড়ী ফিরে গেলে কেউ কিছু বলতে পারে। চল আমি তোমায় সঙ্গে করে দুদিনের জন্যে তোমাদের বাড়ী হয়ে আসি।'

আমি ইচ্ছা করে এতদিন তাঁকে নিতান্ত অপরিচিতের মত ভেবেই দূরে থেকে এসেছি। তাঁর এই স্নেহ-প্রবণমূর্ত্তিও আগে কখনো আমায় চোখে পড়ে নি!

ঘরে ফিরে এসে ডাকলুম 'মুকু!' কই কোথায় মুকুল? সে ত কখনো আমার ডাক শুনে লুকিয়ে বসে থাকে না! অভিমান করেছে? কিন্তু কাকাও যে বাড়ী নেই! কোথায় সব? ভিতরে গিয়ে দেখ্‌লুম পদ্মমালা, কথামালা, ফার্ষ্টবুক, তিনখানা তিনজায়গায় পড়ে রয়েছে। ভাঙা লাটাই, দুখানা ছেঁড়া ঘুঁড়ি আর খানিকটা বেলের আঠা—সমস্তই রয়েছে। কিন্তু মুকুল কই? সে যে আমার অপেক্ষায় বসে থাকবে বলেছিল! সেত কই এখনো দিদি বলে ছুটে আসছে না? অজ্ঞাত আশঙ্কায় প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল। তবে কি মুকুল নেই?

আর কিছুতেই নিজেকে খাড়া করে রাখ্‌তে পার্‌লুম না। ঘরের মেঝের লুটিয়ে পড়ে কাঁদলুম "মুকুল। মুকুল আমার।"

স্বামী এসে বললেন "শোন। স্থির হও। মুকুল ভাল আছে।"

"ভাল আছে? ভাল আছে সে? সত্য বলছ? আর কাকা—কাকাই বা কোথায়?"

এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে। চৌধুরীদের বাড়ীর যতীন আমায় বল্‌লে খবর পেয়েছে একটু ভাল আছে ——"

সেদিন হাসপাতালের এক নির্জ্জন কক্ষে মুকুল শুয়ে ত একবার অস্ফুটস্বরে বিড় বিড় করে বলছিল "দিদি—এখনো এলে না—এখনো সময় হল না তোমার?"

কাকা পাশে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন "দিদি আসবে বৈ কি—আমি আজই লোক পাঠাচ্ছি আন্‌বার জন্যে——তুমি একটু ঘুমোও মুকুল—লক্ষীটি!"

আমি তখনি গিয়ে তার মাথার শিয়রে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লুম "মুকুল ভাই। এই যে আমি এসেছি। কথা ক'ভাই।"

মুকুল উল্লসিত হয়ে বল্লে "দিদি এসেছ? এসেছ তুমি? আর আমার অসুখ নেই! আমি এবার খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠ্‌ব।"

আমি আস্‌ব বলেই যেন আমার প্রতীক্ষায় কোনও রকমে বেঁচে ছিল। তার ঠিক ছটি দিন পরে একেবারে জন্মের মতই সে ভাল হয়ে উঠ্‌ল।

মায়ের গচ্ছিত ধন মার কাছেই ফিরে গেল। জানি না কত সুদীর্ঘ বছরের পরে আবার আমি গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলব . . . ?

সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা; তারি সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সে-ই ত বৈরাগী, সে-ই ত পথিক, সে-ই ত কবি-বাউলের চেলা।

"ফাল্গুনী"

বাল্যু-বেলা

বসন্তের হাওয়া লেগে তখনও সব ফুল ফোটেনি। শীতের আড়ালে আড়ালে এক একবার বসন্তের শান্ত অঞ্চল দেখা যায়। নিমগাছের কচি কচি পাতাগুলি তখনও একটু একটু লাল, একেবারে সবুজ হয়ে ওঠে নি। এমনি ধারা এক সন্ধ্যাকালে সুপ্তি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌ল, হাঁ, চিরকাল, চিরকাল এমনি ক'রে তোমাকে আদর করতে পার্‌ব।

তার চোখের দিকে চেয়ে আমার মনে হ'ল-চার বৎসর পরে আমি যেন আবার বেঁচে উঠ্‌লাম! এ চার বৎসর কেমন করেছিলাম তা ভুলে গেলাম। মনে হ'ল সেই পুরাতন মাটির উপরই আমি দাঁড়িয়ে আছি। গাছ পাতা ধুলা জল সবই চেনা চেনা মনে হ'ল। শান্তির আশায় বুক ভরে উঠ্‌ল। মনে হ'ল এত কালের সমস্ত দুঃখ আমাকে যেন এই দিনটির জন্য এই শুভক্ষণটির জন্য বারে বারে আঘাত করে বাঁচিয়ে রেখেছিল। একেবারে নিজ্জিব হয়ে মরতে দেয়নি। সুপ্তির হাত দুখানি তখনও আমার গলার উপর পড়েছিল। আমি তার হাত সরিয়ে দিয়ে বল্‌লাম, যদি মনে হয় চিরকাল এমনি ক'রে আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না, তাহলে কাজ নেই। সুপ্তি, আমাকে তেমনি ফিরে যেতে দাও আমি যদি জান্‌তে পারি আমার কিছুই পাওয়ার নাই, কিছুই আশা কর্‌বার নাই, সেই দুঃখের মধ্যেও একটা শান্তি আছে। আমি ত তাই নিয়ে বেশ ছিলাম, এ তুমি আজ আমাকে কি দেখালে? বল, সত্যি করে বল, আমাকে তেমনি আগের মতই ভালবাস? তা যদি না হয়, আমায় তাও বল। আমি কি চাই জান? হয় জান্‌তে চাই, তোমার জন্য আমার কিছু কর্‌বার নাই তোমার হয়ে আমার কিছুই ভাববার নাই; নয়ত চাই তোমার জীবনের দুঃখ ভাবনা আমার হাতে তুলে নিতে। যদি স্পষ্ট করে না বুঝ্‌তে পেরে থাক অন্ততঃ মিথ্যে করে বল, তুমি আমাকে ভালবাসনা, আমার সেও ভাল। বুঝ্‌তে পারছ, এমন করে থাকা আমার কত বড় যন্ত্রণা?

সুপ্তি আমার হাত দুখানি তার হাতের মধ্যে ধরে ছিল। আমি তার খুব কাছে বসেছিলাম। সে আমার দিকে চেয়ে বলল, পার্‌বনা যে তা'

বলতে। মিথ্যে করে বললে কিছু লাভ হবে? এখনও বিশ্বাস করনা, আমি তেমনি ভালবাসি তোমাকে?

আমি বললাম বিশ্বাস? সুপ্তি, বিশ্বাস করাটা খুব সোজা মানুষের কাছে, যখন কিছু পাওয়া যায় একজনের কাছ থেকে। কিন্তু পাওয়ার আর যখন চিহ্ন থাকেনা, তখনই অবিশ্বাস দুকূল ছাপিয়ে মানুষের মনে এসে আঘাত করে। আর তার ভিতরে বিশ্বাসকে খাড়া রাখতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। তিল্ তিল করে সব শেষ হয়ে যায় ঐ একটুখানি বিশ্বাসকে ধরে বসে থাকতে। তাও রেখেছি। বিশ্বাসটুকু হারাতে পারিনি বলেই তোমার কাছে এত কাতর হয়ে একটা সত্য কথা শুনতে চাইছি। তোমরা বুঝ্‌তে পারনা, পুরুষ যদি ভালবাসে, সে কতখানি ভাল হয়ে যায়। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম উপদেশ, নীতিশাস্ত্র যে জীবনকে ছেঁকে তুলতে পারে না, পুরুষের প্রাণঢালা ভালবাসা তাকে একেবারে খাঁটি করে ফেলে। একটুখানি ছলনার কথা তখন তার মনে আসেনা, একটা প্রকাণ্ড প্রলোভনও তাকে চঞ্চল করতে পারেনা। সে ভাবে যাকে ভালবেসেছি, তাকে সব দিয়েছি। সে প্রেমের কাছে তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা হার মেনে যায়, পুরুষ তখন কেবলই দিতে চায়। তার মান দিতে চায়, তার সুখ, স্বচ্ছন্দতা, স্বাস্থ্য, চিন্তা, সব কিছু দিয়ে সে ঐ প্রেমকে বড় করতে চায়, মহৎ করতে চায়!

সুপ্তি কথা শুনতে শুনতে নীচু হয়ে আমার পায়ে হাত দিল। সে বল্‌ল, জানি, জানি, তুমি আমাকে যে রকম ভালবাস, এ পৃথিবীতে এমন করে আমাকে কেউ ভালবাসে না। এটা যেদিন থেকে উপলব্ধি করেছি, সেদিন থেকে আমি আশ্চর্য্য রকমের একটা শান্তিতে আছি। এক এক সময় লোকের কাছে নানা ভাবে, তোমার কথা বলে ফেলি। সেদিনই একজন আমার মুখে তোমার কথা শুনে জিজ্ঞাসা করছিলেন, উনি বুঝি আপনার খুব বন্ধু? আমি তাকে আর কিছু বলে বোঝাতে না পেরে বল্‌লাম, উনি যে আমার কি নয় তাত জানি না।

আমি বিদায় হব বলে উঠ্‌লাম। সে খুব কাছে এসে বল্‌লে, দাও।

আমি বল্‌লাম, না থাক্। তুমি চেয়েছ তাতেই আমার সব পাওয়া হয়েছে।

সে তবু জোর করে আমাকে বুকে নিয়ে বল্‌ল, তবু দাও।

* * * *

তার কাছ থেকে বিদায় হয়ে এসে সারা পথ চোখের নিমেষে ফুরিয়ে গেল। যখন নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম, তখন খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে। নৌকাগুলি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে সার্ দিয়ে বাঁধা রয়েছে। মাঝিরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট একখানি চাঁদ জলের উপর লাফালাফি করছে, তারই সঙ্গে আশে পাশের নৌকা থেকে ছোট দুচারটি আলোর ছায়া নাচ্‌তে চাইছে। একটা নৌকায় তখনও একজন মাঝি কেরাসিনের বাতির কাছে বসে একখানি বড় পুঁথি নিয়ে সুর করে পড়্‌ছে, একজন উবুড় হয়ে শুয়ে তামাক খেতে খেতে মন দিয়ে, তাই শুন্‌ছে। আমাকে তীরে এসে দাঁড়াতে দেখে হেঁকে জিজ্ঞেস কর্‌ল কোথায় যাবেন বাবু?

আমি প্রায় নিরাশ হ'য়ে পড়েছিলাম। মনে করেছিলাম, আজ আর পার হতে পার্‌ব না। মাঝির কথায় একটু আশ্বাস পেলাম, চেঁচিয়ে বল্‌লাম, শিবতলা যাব।

যে শুয়েছিল, সে উঠে বসে বলল, আসুন বাবু, দেড়টাকা লাগ্‌বে।

জলের দিকে নাম্‌তে নাম্‌তে বল্‌লাম, তাই হবে, চল।

আমি নৌকায় উঠে বস্‌লাম। নৌকা ছেড়ে দিল। উজান বেয়ে চলেছি আমরা তা বুঝ্‌তে পারলাম। মাঝি খুব প্রাণপণে দাঁড় টান্‌ছিল। আমি নৌকার চালের উপর বসেছিলাম। জলের উপর সেই চাঁদের খেলা, দাঁড়ের পাশে ডুবে গিয়ে আবার ছপ্ করে ভেসে ওঠা! এমনি করে তার তামাসা দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেক দূর গেলাম। আনন্দে শান্তিতে প্রাণ ভরে ছিল। মনে মনে ভাবছিলাম, কাল সকাল থেকে, সব একেবারে নূতন হবে, পদ্ধতি নূতন হবে, নূতন আগ্রহ! ভাব্‌তে ভাবতেই মনটা যেন কেমন আকুল হয়ে উঠ্‌ল। আবার একটা অশান্তি দুর্ভোগ যেন বুকের উপর এসে চেপে বস্‌ল! অসহ যন্ত্রণা! সেই তেম্‌নি ধারা আগের মত অসহায় অবস্থা। বুকের ভিতর যেন সব জায়গায় ব্যথা। কোথাও যেন একটু ছোঁবার যো নাই। একেবারে বিষিয়ে উঠ্‌ল। মনে হ'ল ঐ স্মৃপ্তি ভুলে গেছে আমাকে। অমনি যেন প্রাণ আমার চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, ও মিথ্যে কথা, না সে ভুলে যায় নি, এই যে সে বল্‌ল, সে ভুলে যায়নি, এই যে সে বল্‌ল, সে ভুল্‌তে পারে না। চারিদিক থেকে মনের ভিতর প্রশ্ন কর্‌তে লাগল, 'তবে কেন ও এমন করে? কেন তোমাকে ছেড়ে আসে? নিশ্চয় তার একটা মোহ এসেছে, সত্য হোক্

মিথ্যা হোক্ একটা কিছুতে তাকে একবারে পাগল করে তুলেছে। ভালমন্দ বিচার তার হারিয়ে গেছে। তা নইলে স্নিগ্ধ অমন ছট্‌ফট্ করে কার জন্য—!'

আরেক্‌জন কে বল্‌ল, 'না না, পাগল হয়েছ তুমি? ঐ লোকটি স্নিগ্ধর কাছে সহানুভূতির আশায় এসে একদিন দাঁড়িয়েছিল। সে বলেছিল, তার জীবন কেমন দুঃখময়। স্নিগ্ধ তাকে তাই জীবনের আস্বাদ ফিরিয়ে দিতে চায়। তার ভালবাসা দিয়ে তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে চায়। এ ও ত হ'তে পারে?'

সকলকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে একজন ভারী গলায় বল্‌ল, 'যে কারণেই হ'ক, তোমার দিন ফুরিয়েছে। হয়ত স্নিগ্ধও তা জানেনা। সে ভাবছে তোমাকে সে আগের মতই ভালবাসে? কিন্তু মনে পড়ে নাকি, এমনি ধারা তোমারই এক দুঃখের সময় সে সহানুভূতির মাধুরী নিয়ে এসে তোমার পাশে দাঁড়িয়েছিল? এমনি করেই ত তোমাকে নিয়ে সে পাগল হয়েছিল। তখন কি সে কিছু জান্‌ত? কোনও ভয়, কোনও বাধা তাকে ফেরাতে পেরেছে? অমনি করেই ত তোমাকে পেয়ে, তোমার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে বলে ছিল—জীবন দেবতা, এতদিন পরে তোমার দেখা পেলাম। বাসিফুলে কি তোমার পূজা হবে না? সেই তুমি আজ ভিখারী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছ?'

একখানি ছোট মেঘ এসে জলের উপরে চাঁদের ছায়াটিকে ঢেকে দাঁড়াল। আমি পাগলের মত হয়ে গেলাম। জীবন মরণ দুদিকে সরে দাঁড়াল। আমি মাঝি দুটোকে জলে ফেলে দিলাম। তারা একেবারে প্রস্তুত ছিল না। ভয়ানক স্রোত। তারা পেছনে পড়ে রইল। আমার নৌকা স্রোতের মাঝে পড়ে তীরের মত বেগে ছুটে চল্‌ল। আমি দাঁড়িয়ে শুধু দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, দুধারের অন্ধকার, আর উপরের আকাশ আমাকে ধরে রাখ্‌বার জন্য আমার সঙ্গে ছুটে চলেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে নৌকার উপর পড়ে গেলাম। তারপর যে কি হ'ল তা আর জানিনা!

সকাল বেলাকার রোদ এসে যখন চোখের উপর পড়্‌ল, তখন আমার জ্ঞান ফিরে পেলাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম। আমি এক বালুবেলার উপর শুয়ে আছি। চারিদিকে ধূ ধূ বালির চর! কিছুদূরে সবুজ বনানীর মাথা ছাড়িয়ে দু একটা নারকেল গাছ প্রভাত-বাতাসের তালে তালে দুলছে।

মাথার পাতাগুলি শির শির করে কাঁপ্‌ছে। নদীতে একখানি নৌকা নাই। বিস্তীর্ণ একটা জলের প্রান্তরের উপর মেঘমুক্ত আকাশ বুক পেতে অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

উঠ্‌লাম। উঠে দেখ্‌লাম, কিছুই আমার সঙ্গে নাই। অতীতটা যেন জলে ভেসে গিয়েছে। আমার নিঃসঙ্গ বর্ত্তমান আমাকে এই বালুবেলার উপর ফেলে রেখে চলে গেছে!

তখনও রোদের তাপে বালু তাতে নি। ধীরে ধীরে গাছের সারি লক্ষ্য করে চল্‌তে লাগ্‌লাম। ভয়ানক তৃষ্ণা পেয়েছিল। কোথাও একটু পরিষ্কার জল নাই। এখানে এসে আবার তৃষ্ণা পাবে ভগবানের যেন একথা জানা ছিলনা। অনেক কষ্টে বনের ভিতরে এলাম। একটু দূরে গিয়েই দেখ্‌লাম একটি প্রকাণ্ড বাড়ী। তাতে মনুষ্যবাসের কোন চিহ্ন নাই। এ ঘর ও ঘর করে সব ঘরগুলিতে ঘুরে বেড়ালাম। চোখের পাতা ভরে ঘুম এল। একটি আমের গাছে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানিনা। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হ'ল বাড়ীটা যেন মানুষে ভরে উঠেছে। লোকের নিশ্বাসের শব্দ পেলাম। চোখ খুলতে সাহস হ'লনা। ভয় হ'ল চোখ খুললেই কেউ বুঝি আমাকে দেখে ফেলবে। চোখ বুঁজে পড়ে রইলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। অনেক সাহস করে চোখ খুল্‌লাম। চেয়ে দেখি এ ত আর শূন্য পুরী নয়! ঘরে ঘরে নরনারী বসে আছে। আলো নাই তবে রাত্রের স্বাভাবিক একটি আলো সব ঘরেই এসে পড়েছে। কত রাত্রি তা ঠিক করতে পার্‌লাম না। আমি নিঃশব্দভাবে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে উঠে মনে হোল বোধ হয় এরা ডাকাতের দল। রাত্রে এসে এখানে থাকে। আবার মনে হ'ল, এতগুলি লোক, এদের মধ্যে কি কেউ আমকে দেখেনি! যদি দেখে থাকে, আমাকে মেরে ফেল্‌লনা কেন? ডাকাতই যদি হবে, তাহলে কি আমাকে না মেরে রাখ্‌ত? ডাকাত হলই বা। আমাকে দেখে তাদের ভয় কি? আমার কাছে কিছু নেই ও যে তাদের লোভ হবে। জল্পনা কল্পনা করে আস্তে আস্তে পা ফেলে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লাম। এক এক ঘরে একজন পুরুষ আর একজন করে নারী। দুজনে যেন কি মোহে বিভোর হয়ে একেবারে আত্মহারা হয়ে আছে। পুরুষ নারীর কাণের কাছে মুখ রেখে বল্‌ছে,—সব তোমারই জন্য। আমার ধন, ঐশ্বর্য্য রত্ন, সম্পদ এ সব তোমার। নারী মুগ্ধ

হয়ে তাই শুনছে। তার চোখের পাতা বর্ত্তমান সুখের আবেশে একেবারে ঢুলে পড়েছে। সে পুরুষের বুকের উপর মাথা রেখে তার গলার হার নিয়ে খেলা করেত করতে বলছে, তুমি আমায় ভবিষ্যত ভুলিয়েছ, আমার অতীতকে তুচ্ছ করতে শিখিয়েছ, আমার সুখকে চিনতে দিয়েছ, যৌবনকে জানতে সাহস দিয়েছ। তুমি, ওগো তুমি, দাও আমার গলায় তোমার এই গলার হার। আমি তোমার হয়ে থাকি।

একঘরে একজন পুরুষ প্রশ্ন করল, কিন্তু সে? সে কি ভাবছে তোমাকে?

নারী আবেশ-জড়িত কণ্ঠে উত্তর করল, সে? সে এখনও আমাকে ভালবাসে। তাকে যে আমি পাগল করে রেখে দিয়েছি। আমিই তার ধ্যান জ্ঞান। সে যদি কিছু বলতে আসে, আমি বলব, এই তোমার মন? এই তোমার আমার উপর বিশ্বাস? অমনি সে ক্ষেপে উঠবে। তার আহত মন বিষিয়ে—উঠবে, সে বলবে, মিথ্যে কথা বলছ আমার কাছে? শেষকালে তুমি এই করলে? আমি হেসে বলব, পাগল তুমি? বারে বারে এত অবিশ্বাস করলে কি ভালবাসা যায়? একবার তার হাতে ধরে তার চোখের দিকে তাকাব। সে অমনি সব ভুলে যাবে। অমনি আমার পায়ের উপর মুখ রেখে বলবে, বেশ, তাই হোক, তোমার যাতে আনন্দ হয় তাই কর। আমার নিজের বলে আর কিছু থাকবে না। তোমারই জন্ম আমার সব হোক্। তারপর পুরুষের ঠোঁটদুটি আঙুল দিয়ে টিপে ধরে বলল, জাননা? যদি কোনও দিন তোমার কাছে থেকে চলে যেতে হয়, তখন গিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়ে বলব, দেখত আমাকে অবিশ্বাস করেছিলে বলে, আমি কোথায় চলে গিয়েছিলাম! সে আমার চোখের জল দেখে অধীর হয়ে উঠবে। আমি তখন কেঁদে বলব, ওগো ঠাঁই দাও আমাকে তোমার পায়ের তলায়। আমি ফিরে এসেছি। আবার সে সব ভুলে আমারই জন্ম মরবে। একটি ত জীবন, এমনি করেই কেটে যাবে।

পুরুষটি সকল শুনে বলল, তবু তারা একদিন তোমাদের পাগল করেছিল এটা ত ঠিক্?

হাঁ করেছিল। সে ভালবাসা দেখিয়ে। কিন্তু জান ত, শুধু ভালবাসার কান্নায় পেট ভরে না। সমস্ত প্রাণের ভালবাসা ঠাঁই দিতে হলে অনেক আয়োজন চাই। প্রথম ঐ ভালবাসাটারও একটি মোহ থাকে। মনে হয় ওতে সব আছে। যতদিন তার বুকে আনন্দে নিজেকে ভুলে চোখ্ বুঁজে

পড়ে থাকা যায় ততদিন বেশ চলে যায়। তারা আমাকে সুখ দেবে বলে সারাদিন পরিশ্রম করে যে সম্পদ আহরণ করে তাতেও দিন বেশ চলে যায়। মাঝখানের একটি অন্ধকার রাত্রে মশাল জেলে যখন তোমরা ডাকাতি করতে বের হও, তখন তারা আমাদের রাখ্‌তে পারে না। এক একবার পেছন থেকে তাদের আর্ত্তনাদ শুনে ছট্‌ফট্‌ করে উঠি তারপর একবার তোমাদের হাতে এলিয়ে পড়্‌লে আর কিছুই মনে থাকে না। তোমাদের দেওয়া সুখের মোহকে বেশ স্পষ্ট করে দেখ্‌তে পাই। চোখে দেখি, পৃথিবী ভ'রে ভালবাসা ছাড়া পাবার মত আরও কত কি আছে, ভোগের ভাণ্ডার পূর্ণ, প্রতিদিন জীবনকে বল্গাহারা ঘোড়ার মত ছুটিয়ে নিয়ে যাবার কত প্রচুর আয়োজন রয়েছে।

নারীর কথা শেষ হতেই, আমি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ঘরে ঘরে এই ধরণের নানা সাজে, নানাভাবের দৃশ্য দেখে আরও যেন শ্রান্তি অনুভব করতে লাগ্‌লাম।

দালান ছেড়ে বনের পথে নাম্‌লাম। সেই বালুতটের উপর এসে দাঁড়ালাম। একটা গরম বাতাস সেই বালির চরে থম্‌থমে হয়ে রয়েছে। আর দেখ্‌লাম, অগণ্য প্রাণহীন পুরুষের দেহ ঐ শূন্য বেলার উপর শেষ নিশ্বাস ফেলে শূন্য হাত বুকে রেখে পড়ে আছে। এইখানে এসে প্রাণ শেষ করবার জন্যই যেন তারা সারা পথ চলে এসেছে। আমি সেই মৃতের শ্মশানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, এ কিসের পরিণাম ?—

চাঁদের জোছনা কেঁপে উঠ্‌ল। মৃতেরা সব কোথায় মিলিয়ে গেল। বালুবেলার উপর জোছনায় পলি পড়্‌ল, তার উপরে ফুটে উঠ্‌ল, ম্লান মুখের সহস্র সাদা ফুলের রাশি।

সেই শূন্য পুরীটার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম, সমস্ত বাড়ীটা দাউ দাউ করে, জ্বলছে! আর বনের উপান্তে নরনারীর আর্ত্তকণ্ঠের চীৎকারে আকাশ প্রতিধ্বনিত হচ্চে! একটা গাছের পাতা নড়্‌ছে না। সব স্থির। শুধু বাতাসের পর বাতাস সেই আগুনের উপর ছুটে গিয়ে বল্‌ছে,—তারা নাই, তারা নাই!

পূজা

—শ্রীসুনীতি দেবী।

তার স্বপ্নলব্ধ দেবতার প্রতিষ্ঠা তাকে একাই কর্‌তে হয়েছিল। পাথরের ওপর পাথর গেঁথে সে ধীরে ধীরে মন্দির গড়ে তুল্‌লে। পূজার সমস্ত উপকরণ সে একাই সংগ্রহ করল। সেই বিজন-বনের নিরালা কোণে তার নিভৃত-পূজা বেশ সমারোহেই সে সম্পন্ন করত।

উষার উদয়ে সে ফুল তুলে আন্‌ত,—কতক মালা গেঁথে দেবতার গলায় পরা'ত, কতক বা স্তূপাকৃতিতে তাঁর চরণে অর্ঘ্য সাজিয়ে দিত। দুটি বেলাই শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের শব্দে ও স্তব-স্তুতি ও বন্দনায় মন্দিরের নির্জ্জনতা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ত। ধূপের ধোঁয়ার মলীনতা ভেদ করে আরতির প্রদীপ-শিখা প্রতি সন্ধ্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত।

বাইরের পৃথিবী থেকে পূজা আস্‌ত না বলে তার নিজের পূজার আড়ম্বর ক্রমেই বেড়ে গেল। শেষে অশেষ সজ্জার মধ্যে দেবতা ঢাকা পড়্‌লেন। নৈবেদ্য ও ফুলের পাহাড়ের মধ্যে দেবতার সিংহাসনও চাপা পড়ে গেল। ধূপ-ধূণার ধোঁয়া ক্রমে গাঢ়তর হয়ে ক্ষীণ-শিখা প্রদীপের আলোটুকুকে ম্লান করে ফেল্‌ল।

*   *   *   *

দিন শেষে কাল বৈশাখীর ঝড় গর্জ্জন করে উঠ্‌ল! দরজার ফাঁক দিয়ে হু হু করে হাওয়া এসে মন্দিরের প্রদীপ নিভিয়ে দিল! পূজারী দরজার আগল বন্ধ করে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ঝড় আর থামে না। মন্দিরের চূড়া সশব্দে খসে পড়্‌ল! পূজারী সভয়ে পূজার উপকরণগুলি চেপে ধর্‌ল। কিন্তু সব ত হাতে ধরে না, অনেক আয়োজনের জিনিষ যে এসব!

এবার মন্দিরের গাঁথনি আল্‌গা হয়ে এল। সব ভেঙ্গে পড়্‌ল। প্রচণ্ড হাওয়ায় ফুলের রাশ উড়ে গেল, দেবতার দেহের সজ্জা ও ভূষণ ছিঁড়ে গেল। পূজারী পাগলের মত বাতাসের গতি অনুসরণ করে ছুটল—যদি কিছু অন্ততঃ

কুড়িয়ে আন্‌তে পারে! কত যত্নে কত স্থান থেকে আহরণ-করা উপকরণ তার, সব কি হারাবে? নিরাভরণ দেবতা শূন্য আকাশের তলায় পড়ে রইলেন সে কথা সে ভুলে গেল।

শ্রান্ত হয়ে যখন সে ফিরে এল, তখন ধূলি-ম্লান দেবতার দিকে আর তার চোখ ফেরাতে ইচ্ছা হল না। আর তার শক্তি নাই যে নূতন মন্দির গড়ে তোলে, আর তার সাধ্য নাই যে নূতন সজ্জা সে সংগ্রহ করে।

কি দিয়ে আর পূজা করবে সে? তবে দেবতায় তার কাজ কি?

সে দেবতাকে দুই হাতে তুলে ধরে পাশের ঝরণাতে ফেলে দিল। স্রোতের আঘাতে পাথরের বুকে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে দেবমূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়্‌ল।

* * * *

অসহ্য বেদনা হতে যখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল, তখন অবাক হয়ে দেখ্‌ল সমস্ত পৃথিবী তার দেবতাকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে! পাখীর গানে যে স্তব উঠেছে, তার কাছে তার নিজের কণ্ঠস্বর লজ্জা পেল। আলোর আরতিতে ও ধরণীর বুকভরা পত্রপুষ্পের অর্ঘ্যে তার দেবতার পূজা তখন আরম্ভ হয়ে গেছে!

পূজারী বল্‌ল—আমায় বঞ্চিত করে তুমি আজ সবার হলে? অভিমানে সে চোখ বন্ধ করতে গিয়ে দেখ্‌ল, তার অন্তরের সিংহাসনে প্রসন্নমূর্ত্তি তার দেবতা! বাইরের ঘর ভেঙ্গে, সব আয়োজনের বাধা দূর করে, তুচ্ছ উপকরণ ঠেলে ফেলে দেবতাকে সে একেবারে বুকের মধ্যে পেল। অশ্রুজলে অভিমান ভেসে গিয়ে সেদিন তার পূজা সার্থক হল।

সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে 'পাব'র সঙ্গে 'ছাড়্‌ব'র বিয়ে হয়ে গেছে যে—তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।

"ফাল্গুনী"।



শান্তিহীনা

— শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৬

বংশীর বাড়ী হইতে বিভাকে লইয়া গাড়ীখানা যখন ফিরিয়া আসিল, রাত্রি তখন প্রায় নয়টা। বংশী আসে নাই ; ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই ছিল না, তথাপি নিভা যেন একটুখানি চিন্তিত হইয়া পড়িল,—মনের ভুলে বিভাকে একটা কি যেন প্রশ্নও করিতে গেল, কিন্তু লজ্জায় এবং অভিমানে কণ্ঠে তাহার স্বর জোগাইল না। বংশীর না আসার কারণটা বিভার মুখ হইতে শুনিবার জন্য সে যেন মনে মনে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াই নীচে নামিবার সিঁড়ির একপার্শ্বে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অমরেশ জিজ্ঞাসা করিল, বংশী এলো না ?

বিভা মুখ ভারি করিয়া বলিল, কাল সকালে আসবে। বল্লে, পুতুলের বিয়েতে এত খরচ করবার কি দরকার ?

অমরেশ তাহাকে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না। ধীরে ধীরে নিভার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, নিভা কোথায় রে ?

নিভা তখন সিঁড়ি ধরিয়া নিচে পলায়ন করিতেছিল।

কৈলাস বলিল, নূতন ঠাকুর এসেছে। বোধকরি রান্নাঘরেই গেলেন। ডাক্‌বো ?

হ্যাঁ, তাকে একবার ডাকো ত কৈলাস। বলিয়া অমরেশ একটা চেয়ারের উপর বসিয়া বিভার চুল গুলা হাতে করিয়া আঁচড়াইয়া দিতে লাগিল।

দাদার আহ্বানে সিঁড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিভা বলিল, কি বল্‌ছিলে দাদা ?

হাঁরে নিভা, এ ছেলে খেলায় কি লাভ হবে বল্ ত ? একটা পুতুলের বিয়েতে এত খরচ না-ই বা হলো ?

নিভা বলিল, আমি জানি নে। ইচ্ছা হয় করো, না হয় বন্ধ করে দাও। ঘর-দোর সাজালুম, এ কথা আগে বল্‌লেই হতো।

ইহা যে নিছক রাগের কথা অমরেশ তাহা বুঝিল। বলিল, ঘর-দোর সাজালি, তার আর কি হলো ? তবে কি না,—শুনেছিস্, বংশীও ঠিক ওই কথাই বলেছে।

তা জানি। যারা গরীব, খরচের নাম শুনলে তারা আঁত্‌কে ওঠে। এ খরচ যদি তোমার গায়ে লাগে, তুমি বরং আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে' দিও। আমার বন্ধুদের সব নিমন্ত্রণ করে' ফেলেছি।

অমরেশ বলিল, না না, সেকথা বলিনি নিভা! বাজে খরচ, তাই বল্‌ছিলুম।

নিভা বলিয়া উঠিল, ছোট বোনের আব্দারটা বাজে খরচ, আর নিজের দশ গণ্ডা বাড়ী থাক্‌তে পরের বাড়ীর ভাড়া মেটানো বুঝি আসল খরচ ?

রাগের মাথায় কথাটা বলিয়া ফেলিয়া নিভার চোখ-মুখ একেবারে লাল হইয়া উঠিল। সে আর মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। হন্ হন্ করিয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিল, বিভা!

বিভা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

অমরেশ বলিল, বটে ? আমি টাকা খরচ করেছি, আর তুই করিস্ নে? তোর খোস্‌বয় আর পোষাকে কত টাকা যায় বল্ ত ?

টাকা খরচের কথা উঠায় নিভার রাগ যেন আরও বাড়িয়া গেল। সহসা থমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এবার থেকে আমায় খরচের টাকা দাও ত' তোমায় অতি বড় দিব্যি থাক্‌লো।

মার্ব্বেল-বারান্দা হইতে কথাগুলা বলিয়াই নিভা তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল এবং কেদারায় না বসিয়া মেঝের কার্পেটের উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

পুতুলের বিবাহ খরচ সম্বন্ধে যে-কথাটা বংশী বলিতে বলিয়াছিল, সেটা যেন বিভার না বলিলেই ভাল হইত,—হয়ত এই অপরাধের জন্য তিরস্কার করিবার নিমিত্ত দিদি তাহাকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছে, বিভার মনে এই সন্দেহই হইতেছিল। অবশেষে ভয়ে-ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করিল, কি বল্‌ছিলে দিদি?

নিভা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, শুন্‌লি দাদার কথা?

বিভা কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া দিদির মুখের পানে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। না জানি, তাহার এই রাগের সময় কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে,—তার চেয়ে চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই ভালো।

কিয়ৎক্ষণ পরে নিভা কহিল, কাল সকালে ওঁদের বারণ করে দিয়ে আস্‌বি। হয়ত বাড়ীর সবাইকে নিয়েই কাল হাজির হবেন।

বিভা কিছু বুঝিতে না পারিয়াই প্রশ্ন করিল, কে দিদি?

কে আবার? এতক্ষণ ছিলি কোথায়? যাদের নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলি? —হাঁরে, কাল সত্যিই তারা আস্‌বে নাকি? তোর বংশীদাদা?

হ্যাঁ।

তার দিদি? তার বাবা?

হ্যাঁ, সব।

তারা কেমন রে?

বিভা এইবার দিদির গলা জড়াইয়া তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল, না দিদি, আস্‌তে তাদের বারণ করো না। দেখ্‌বে কেমন সুন্দর—

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দরজার নিকট কৈলাস আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, কি বল্‌ছো কৈলাস?

খাবার আন্‌বে কি না তাই জিজ্ঞেসা কর্‌ছিলুম।

নিভা বলিল, দাদার খাওয়া হলো?

দাদাবাবু খাবেন না। বল্‌লেন, মাথা ধরেছে।

অমরেশের এই মাথা ধরিবার হেতুটা যে কি, সে কথা বুঝিতে নিভার বিশেষ বিলম্ব হইল না।

মিছামিছি এমন রাগ কর্‌লে আমি কি করি বল ত? এই বলিয়া নিভা ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

রাস্তার একটা গ্যাসের আলোক, উন্মুক্ত জানালার পথে অন্ধকার ঘরের মধ্যে

আসিয়া পড়িয়াছিল। স্তিমিত চন্দ্রালোকের মত সেই আলোকচ্ছটায় নিভা দেখিল, টেবিলের উপর তাহার দুই প্রসারিত হস্তের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া অমরেশ একটা চেয়ারে বসিয়া আছে। তাহার এই অভিমানক্ষুব্ধ নিস্তব্ধ মূর্ত্তির দিকে নিভা মিনিটকয়েক্ তাকাইয়া রহিল,—সহসা কোনো কথা বলিতে পারিল না; ইহা যে তাহারই কটুভাষণের ফল, তাহা জানিয়া মনে-মনে সে যেমন অনুতপ্ত তেম্‌নি দগ্ধ হইতে লাগিল।

মুখে কোন কথা না বলিয়া নিভা প্রথমে আলোর সুইচ্‌টা টিপিয়া দিল। কিন্তু অমরেশ মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়াও দেখিল না।

নিভা ডাকিল, দাদা!

অমরেশ সাড়া দিল না, যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়াই রহিল।

এইবার একটুখানি কাছে সরিয়া গিয়া নিভা বলিল, দাদা, খাবে এসো।

ধরা-ধরা গলায় অমরেশ তেমনি হেঁটমুখেই উত্তর দিল, মাথা ধরেছে, খাব না!

নিভা আর থাকিতে পারিল না, অনুশোচনায় তাহার কান্না পাইতেছিল। বলিল, তোমার পায়ে ধরি দাদা, আর আমি তোমায় কিছু বল্‌বো না।

হ্যাঁ, বল্‌বি নে! যা যা আমি খাব না, যা।—বলিয়া অমরেশ পাশ ফিরিয়া মাথাটা তাহার হাতের মধ্যে বেশ ভাল করিয়া গুঁজিয়া লইল।

নিভা মুখে কিছুই বলিতে পারিল না, কিন্তু তাহার চোখ দিয়া দরদর করিয়া খানিকটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। টেবিলের উপর হাত রাখিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ নিভার কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া অমরেশ মুখ তুলিয়া চাহিতেই নিভার আনত সজল চক্ষু দুইটার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িয়া গেল। বলিল, নিজে ঝগ্‌ড়া করে আবার কান্না হচ্ছে কেন শুনি?

কাঁদতে আমার বয়ে গেছে! খাবে তো খাবে, না খাবে, না খাবে। এই বলিয়া নিভা সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল।

এইবার তাহার দুর্জ্জয় অভিমানের পালা সুরু হইবে ভাবিয়া অমরেশ খপ্‌ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, বল্ তোর দিব্যি তুই ফিরিয়ে নিলি, তাহলে আমি খেতে যাচ্ছি। বল্, তুই রাগিস্ নি।

না রাগি নি, এসো। বলিয়া নিভা তাহাকে চেয়ার হইতে উঠাইয়া দিল।

অমরেশ বলিল, তবে তুই দিব্যি দিলি কেন?

তুমি আমার খরচের কথা তুল্‌লে কেন ?

তুই কেন বল্‌লি নে,—বেশ করবো, তাতে তোমার কি ?

কথায় কথা বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া নিভা থামিয়া বলিল, এবার থেকে তাই বল্‌বো, এসো বিভা এখনও খায়নি।

সে রাত্রির মত এই দুই ভ্রাতা ভগিনীর বিবাদ একপ্রকার মিটিয়া গেল। অমরেশ ও বিভাকে খাইতে দিয়া নিভা তাহাদের সম্মুখে বসিয়া রহিল। বলিল, নূতন বামুন-ঠাকুর রেঁধেছে দাদা ? কাল পারবে ত ?

অমরেশ বলিল, মন্দ রাঁধে নি। কাল সকালেই বোধ করি বংশীরা সকলেই আস্‌ছে। তোর বন্ধু কে কে আস্‌বে ?

তিন চার জনের বেশী নয়। খরচ বেশী হবে না তোমার।

অমরেশ মুখ তুলিয়া বলিল, আবার সেই কথা ?

নিভা চুপ করিয়া রহিল।

বিভা বলিল, কাল অনেক ফুল এনে দিতে হবে দাদা, দেবে ত ?

অমরেশ বিভার দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমার মেয়ের বিয়ে, তা আবার দেব না ? নিশ্চয়ই দেব।

পরদিন সকালেও বংশী দেখা দিল না। দুপুরে আহারাদির পর অমরেশ বলিল, বোধকরি তারা খেয়ে-দেয়ে আস্‌ছে। আমি ফুল নিয়ে আসি, ওরা এলে বসিয়ে রাখিস্‌ নিভা।

নিভা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, হাঁা, বসিয়েই রাখ্‌বো দাদা, দাঁড় করিয়ে রাখ্‌ব না। তুমি যাও।

অমরেশ চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই বংশী আসিয়া ডাকিল, অমরেশ !

বিভা ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। বলিল, সকালে এলে না যে বংশীদাদা ? দিদি কোথায় ?—

আবার দিদি কেন রে ? আমি নিজেই এলুম।

না, তা হবে না। এক্ষুনি নিয়ে এসো, চল। বলিয়া বিভা তাহার হাতে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

বংশীর গলার আওয়াজ শুনিয়া নিভা ঘরের ভিতর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; এইবার বাহিরে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল, দাদা আপনাকে বসতে বলে গেছেন, আসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

জুতা খুলিয়া বংশী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। নিভা তাহার নূতন জুতা

জোড়াটার দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, পায়ে দিয়েই এলেন না কেন ? নইলে আবার সেদিনের মত কেউ যদি ফেলে দেয় ?

বংশী একটুখানি হাসিল।

বিভা বলিল, এসো বংশীদাদা, এই ঘরটা দিদি কেমন সাজিয়েছে দেখ্‌বে এসো।

পাশের ঘরটা টেবিল, চেয়ার ছবি, এবং বড় বড় আয়না দিয়া বেশ ভাল করিয়া সাজানো হইয়াছিল। বংশী জিজ্ঞাসা করিল, এ ঘরে কি হবে ?

বিভা বলিল, ওই দেখ্‌ছো না, কোনে টেবিল-হারমোনিয়াম রয়েছে, দিদি ওইখানে ব'সে গান করবে, আর তোমরা এই চেয়ারে ব'সে শুন্‌বে।

বংশী বলিল, তারপর ?

তারপর, এই টেবিলে তোমাদের খাবার ধরে দেবে, তোমরা খাবে।

আমরা ত ক্রিশ্চান নই, আমরা যে মাটিতে বসে খাই।

পশ্চাৎ হইতে নিভা উত্তর দিল, ক্রিশ্চানের বাড়ী নেমন্তন্ন যখন নিয়েচেন তখন খেতেই হবে।

বিভা বলিল, ধেৎ! আমরা বুঝি ক্রিশ্চান ?

উনি ত সেই কথাই বল্‌তে চান। বলিয়া নিভা গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বংশী অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত বলিল, না, না, আমি সেকথা বল্‌তে চাই নে।

নিভা বলিল, তবে ?

বংশী বলিল, না থাক্‌। এ বেশ হয়েছে। তবে কি না, বিলাসিতা জিনিষটাকে মানুষ যত বেশী পরিত্যাগ ক'রে সংযমী হতে পারে, অন্তরের আনন্দ যেন তত বেশী বেড়ে যায়।

কথাটা নিভা যে জানিত না, তাহা নয়; তবে আজ যেন ইহাই সে এই ব্যক্তিটির নিকট হইতে নূতন করিয়া শুনিল। এ বাড়ীর প্রত্যেকটি জিনিষে, এমন্‌ কি তাহার নিজের সাজ-পোষাক এবং অলঙ্করণেও বিলাসিতার চিহ্ন পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া আছে,—ইচ্ছা করিলেই ত আজ এই মুহূর্ত্তেই তাহাদের পরিত্যাগ করা যায় না! গতরাত্রে তাহার দাদাও বুঝি এই কথাটাই আভাসে ইঙ্গিতে তাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল, এবং এই লইয়া দাদার সহিত ঝগড়া করিয়া সমস্ত রাত্রি সে ঘুমাইতে পারে নাই, মনের সহিত বোঝাপড়া করিয়া নিনিদ্রই

কাটাইয়াছে। আজও যেন তাহাকে ইঙ্গিত করিয়াই বংশী একথাটা বলিয়াছে, ইহাই তাহার মনে হইতে লাগিল।

বিভা বলিল, এ রকম ক'রে সাজানো তোমার মনে লাগ্‌ছে না বংশীদাদা?

বংশী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

কথাটা বলিয়াই তাহার মনে হইল, নিভা নিশ্চয়ই ইহার একটা-কিছু প্রতিবাদ করিবে কিন্তু প্রতিবাদ করা দূরে থাক্‌, সে বরং তাহার আরও একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা, এই পাশের ঘরটা ত খালি পড়েই রয়েচে, ঘরখানাও বেশ বড়, এইটা আপনি সাজিয়ে দিন্ না? উঠুন্, আর সময় নেই।

সেদিন বিশ্বনাথ ঠাকুরের কাছে এই মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথাই বংশী বেশ মনযোগ দিয়াই শুনিয়াছিল এবং তখন হইতে তাহার প্রতি বংশী কেমন যেন আপনা হইতেই শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিতেছিল। বাহিরে সে যত বড় খাম্‌খেয়ালী হউক্ না কেন, ভিতরে সে যে এতখানি প্রাণবন্ত, সে তাহা জানিত না। বংশী একবার নিভার মুখের পানে হঠাৎ তাকাইয়া ফেলিল। আজ কেন যে সেই খামখেয়ালী চঞ্চল মেয়েটিকেই এমন শান্ত সংযমী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কে জানে! বলিল, আমি কি পার্‌বো?

কেন পার্‌বেন না? চলুন।

বিভা বলিল, চল বংশীদাদা।

এ অনুরোধ বংশী অবহেলা করিতে পারিল না। তাহাকে ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিতে হইল।

সে ঘরে আসবাব পত্র কিছুই ছিল না। চার-পাঁচটা বড় বড় জানালার পথে প্রচুর আলো-বাতাস প্রবেশ করিতেছিল। ঘরে ঢুকিয়াই নিভার মুখের পানে তাকাইয়া বংশী বলিল, কিছুতেই ছাড়্‌বে না?

দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে নিভা কহিল, না।

তবে দেখি। এসো।

এই বলিয়া তাহারা কাজে লাগিয়া গেল।

সর্ব্বপ্রথমে অমরেশের ঘর হইতে তাহার নিজের আঁকা কয়েকটি ল্যাণ্ড্‌-স্কেপের ছবি, বংশী, নিভা ও বিভা, ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল। টুলের উপর দাঁড়াইয়া বংশী ছবি টাঙ্গাইতে লাগিল, নিভা তাহার হাতের কাছে পেরেক, হাতুড়ি তুলিয়া দিতেছিল।

নিভা বলিল, বন্ধুর আঁকা ছবিগুলি না হয় টাঙ্গালেন, তারপর কি হবে?

একটা পেরেকের উপর হাতুড়ি ঠুকিতে ঠুকিতে বংশী বলিল, শেষ পর্য্যন্ত দেখই না কি-হয়। আর একটা পেরেক্ দাও ত ?

পেরেক্‌টা হাতে দিতে গিয়া বংশীর হাতে তাহার হাত ঠেকিয়া গেল। কিন্তু সামান্ত এই স্পর্শ টুকুর মধ্যে কেশাগ্রভাগ হইতে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত যে এমন ভাবে শিহরিয়া উঠিতে পারে, ইহা তাহাদের উভয়েরই জানা ছিল না। নিভা কেমন যেন বিহ্বল হইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল, তাহ'লে বল্‌বে না ?

বংশী বলিল, কি ?

এরপর কি হবে ?

হ্যাঁ বলি।—এই বলিয়া অন্তমনস্ক হইয়া বংশী এত জোরে জোরে হাতুড়িটা পেরেকের উপর ঠুকিয়া ফেলিল যে, পেরেকটা দেয়ালের গায়ে একেবারেই বসিয়া গেল।—এই যাঃ! এটা গেল, আর একটা দাও।

নিভা আর একটা পেরেক লইয়া হাত বাড়াইল, বংশী কিন্তু তাহা ধরিতে পারিল না, তাহার হাতটা কাঁপিতে কাঁপিতে পেরেক্‌টা মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

পুনরায় সেটি কুড়াইয়া লইয়া বংশীর হাতের ভিতর জোর করিয়াই গুঁজিয়া দিল।

ছবিখানা টাঙানো শেষ হইলে, বংশী টুল্ হইতে নামিয়া বলিল, একটা চাকর ডাক্‌লে হতো না ? আমরা দেখিয়ে দিতুম।

চাকর সে অনায়াসেই ডাকিতে পারিত, কিন্তু ডাকিল না ; বলিল, আর কি পার্‌ছেন না ? আচ্ছা আমি টাঙিয়ে দিচ্ছি, আপনি পেরেক্ তুলে দিন।

অবশেষে বংশীকেই রাজি হইতে হইল। এহাত সেহাত করিয়া কোনরকমে এই পনর মিনিটের দুঃসাধ্য কর্ম্মটা উভয়ে মিলিয়া ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে শেষ করিল।

সতরঞ্চ, গালিচা, চাদর, বালিস, দিয়া ঘরের মেঝের উপর ঢালা বিছানা হইতেছিল, এমনসময় অমরেশ ফিরিয়া আসিল। বলিল, এ আবার কি হচ্ছে রে ? এ ঘরে কি হবে ?

নিভা বলিল, আমার সাজানো ঘরটা কারও পছন্দ হলো না।

অমরেশ বলিল, হাঁরে বংশী, 'দিদি কোথায় ? বাবা এলেন না ?

ঘর-দোর ছেড়ে দিয়ে তারা আবার কি জন্ত আস্‌বে অমরেশ ?

বিভা কাছেই বসিয়াছিল, বলিল, না বংশীদাদা, তা হবে না,—আমার

মেয়ের বিয়ে, তার মাসী আস্‌বে না? বিয়ে কেমন করে হবে বল ত? তাহ'লে তোমার যখন বিয়ে হবে, আমরা কেউ যাব না!

অমরেশ বলিল, ওরে, ও-সব থাক্। কি কি করতে হবে বল্, আমি করে দিচ্ছি; তুই বরং বাড়ী গিয়ে ওদের নিয়ে আয়।

বংশী বলিল, না আন্‌লে চল্‌বে না, আচ্ছা যাই। তুই ফুলগুলো এই ঘরের যেখানে সেখানে ছড়িয়ে দে, টেবিল-হারমোনিয়ামটা এই ঘরে এনে রাখ্, আর ধূপের ধোঁয়ায় ঘরটা একেবারে অন্ধকার ক'রে দে। বুঝ্‌লি?

হ্যাঁ, আমি সব ঠিক ক'রে রাখ্‌ছি। নীচে দরজায় আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, নিয়ে যা। বলিয়া অমরেশ একপ্রকার জোর করিয়াই বংশীকে বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে নিভার নিমন্ত্রিত মহিলা বন্ধু কয়েকজন আসিয়া জুটিল।

চাকরদের লইয়া বংশীর পরামর্শ মত অমরেশ ঘরখানা সাজাইয়া চারিটা ধূপদানিতে প্রচুর পরিমাণে ধূপ জ্বালাইয়া দিয়া বংশীর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

বেলা পড়িয়া আসিল, তথাপি বংশীর ফিরিবার নাম নাই।

অমরেশ কৈলাসকে ডাকিয়া বলিল, আমি এই কাগজে ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, তুমি একবার বংশীবাবুর বাড়ীতে যাও দেখি। গাড়ী নিয়ে গেছে, এখনও ফিরলো না কেন কি জানি।

কৈলাস বলিল, গাড়ী ত কেউ নিয়ে যায় নি বাবু, নহিস কোচুয়ান ত আস্তাবলে গাড়ী খুলে' দিয়েছে।

না তুমি দেখনি, গাড়ী সে নিশ্চয়ই নিয়ে গেছে,—আমি যে বল্লুম তাকে!

কৈলাস হাত জোড় করিয়া কহিল, আজ্ঞে না দাদাবাবু, আমি এইমাত্র আস্তাবলে গিয়েছিলুম।

তা হ'লে সে বোকা হয় ত গাড়ী না নিয়েই গেছে, তুমি একবার যাও, দেখে এসো তার কেন এত দেরী হচ্ছে। একলা বাড়ী ফেলে যদি তারা আসতে না পারে, তুমি বরং থেকো সেখানে।

যে আজ্ঞে। বলিয়া কৈলাস বাহির হইয়া গেল।

ভাল পোষাক বাহির করিয়া দিবার জন্ম বিভা অনেক্ষণ হইতে দিদির পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বন্ধুদের জলখাবার ধরিয়া দিয়া নিভা তাহাকে ঘরের

ভিতর লইয়া গিয়া বলিল, ছি, বিভা, আজ তোর মেয়ের বিয়ে, আজ আর তোকে দামী পোষাক পর্‌তে হয় না। তোর দায়ে আজ আমি কি পরেচি দেখেছিস্?—এই বলিয়া নিভা তাহার নিজের সাড়ী এবং ব্লাউজ্ দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইয়া দিল।

জলযোগের পর বন্ধুরা বলিল, অনেক দিন তোমার গান শুনিনি নিভা, গান গাও।

নিভা আজ গান গাহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল কিন্তু তথাপি সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহার এক বন্ধু জোর করিয়া হারমোনিয়মের সম্মুখে বসাইয়া দিল।

একজন বলিল, গা না ভাই, দেরী কর্‌চিস্ কার জন্যে?

আর একজন বলিল, জানিস্ বলেই খোসামুদি করি।

নিভা চাবি টিপিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অনর্থক পোঁ, পোঁ, করিতেছে দেখিয়া, একজন বন্ধু অনুনয়ের সুরে তাহার গলা জড়াইয়া বলিল, গাও না লক্ষীটি, বাবাঃ! এত সাধাসাধি! বলিয়া সে তাহার কানে-কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া আর একটা কি কথা বলিল, শুনিতে পাওয়া গেল না।

ঈষৎ হাসিয়া নিভা বলিল, গাই। তাহার মনে হইতেছিল, আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সে তাহার কণ্ঠস্বরে যে রস, যে মধু, সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা ত ইহাদের সুমুখে ঢালিয়া দিবার জন্য নয়! অবশেষে এই সব অরসিকের কাছে রস-নিবেদন করিবার জন্যই কি সে এই বাদ্যযন্ত্রটা এই ঘরে রাখিতে বলিয়া চলিয়া গেল!

ধূপের ধোঁয়ায় এবং ফুলের সৌরভে সমস্ত ঘরখানা আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। নিকটস্থ ধূপদানি হইতে একটি শুভ্র সুরভিত ধূম্রশিখা, নিভার অসম্বৃত অঞ্চলপ্রান্ত বহিয়া তাহার এলো-খোঁপার ফাঁকে-ফাঁকে সর্পিল গতিতে ঘুরিয়া মরিতেছিল!

নিভা ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল,—

'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে ভরা বসন্তের এই সঙ্গীতে?

* * *

সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরি রিক্ত রাতে,
নয়নের আড়ালে তার নিত্য জাগার আসন পাতে,

ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথার রঙে মনকে সে রয় রঙ্গিতে।—

না গো না দেয়নি ধরা,—

এই পর্য্যন্ত গাহিতেই হঠাৎ বাহিরে কিসের গোলমালে তাহার গান বন্ধ হইয়া গেল। অমরেশ উন্মাদের মত একখানা জামা গায়ে দিতে দিতে ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়াই ডাকিল, নিভা! নিভা! সর্ব্বনাশ হয়েছে,—বংশীর বাবা বুঝি—কৈলাস, জল্‌দি, যাও, যাও, ট্যাক্সি নিয়ে এসো। তাই ত বলি, তার এত দেরী—বলিতে বলিতে আবার সে ঝড়ের মত ছুটিয়া সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল।

ক্রমশঃ

দুনিয়ার যত রকম আনন্দ আছে তার মধ্যে এই বিচ্ছেদের ব্যথাটাই হচ্চে সব চেয়ে বেশী আনন্দময়!

'ব্যথার দান'

220

শুদ্ধ শাসন প্রচেষ্টা

—শ্রীআনন্দসুন্দর ঠাকুর।

ক্লাবের চামড়া মোড়া আরাম চৌকীতে হেলান দিয়ে, তাঁর দ্বিতীয় সিগারটি জ্বালিয়ে মিষ্টার নিউবেরী বল্লেন "আর এই সহরের করপোরেশনের ব্যবস্থাই বা কি? নেহাৎ রদ্দি—যাচ্ছে তাই।"

মিষ্টার ডিক্ ওভারএণ্ড, তাঁর হুইস্কি ও সোডার জন্যে ঘণ্টা বাজিয়ে, সে কথায় সায় দিলেন—"রদ্দি কি বলছ, একেবারে জঘন্য।"

সিগারের দুটি টানের মাঝখানে নিউবেরী বল্লেন "যত বাজে লোকের আস্তানা।"

ছাই দানীতে ছাই ফেল্‌তে ফেল্‌তে ওভারএণ্ড বল্লেন "আরে চোরের আড্ডা, বল।"

নিউবেরী বলে উঠ্‌লেন "তোমার অলডার ম্যান্‌রাই বা কি?".

ওভারএণ্ড তান ধরলেন "ট্রেজারারটি ত ঘুষখোরের সর্দ্দার।"

নিউবেরী চৌকী থেকে মাথা তুলে দালান ও পথের দিকে সন্তর্পণে চেয়ে মুখের কাছে হাত এনে বল্লেন "যা বলেছ, তা তোমার মেয়রই বা কি বাদ যান" এবার গলার স্বর যথাসম্ভব নামিয়ে ওভারএণ্ডের কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লেন। "কিন্তু এই সব জোচ্চুরী, বদমাইসির বিরুদ্ধে জোর গলায় প্রতিবাদ করবার দিন এসেছে।"

ওভারএণ্ড ঘাড় নেড়ে বল্লেন—"এ ত জুলুম।"

নিউবেরী বল্লেন, "শুধু জুলুম নয়, একেবারে মগের মুল্লুক।"

* * * *

ক্লাবঘরের এক কোণে বসে রবিবার সন্ধ্যায় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, শাসন প্রণালী প্রভৃতির আলোচনা করছিলেন। তাঁরা কেউ এ বিষয়ে বাদানুবাদ করছিলেন না; গরম হয়ে কোন কথা বল্‌বার মত তাঁদের প্রবৃত্তিও ছিল না। বিশ্রামের দিনে আরাম চৌকীতে বসে সিগার ধরিয়ে সন্ধ্যেবেলা মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়; সেই বিষণ্ণতায় সেকালের তুলনায় একাল যে কত খারাপ সেই সত্যটাই বার বার করে

মনে পড়ে অবশ্য এতে তাঁদের একালের উপর রাগ হচ্ছিল মনে করলে, ভুল করা হবে। একালের জন্তে মনে মনে তাঁরা চঃখিত হচ্ছিলেন মাত্র।

তাঁদের যৌবনে, সেকালের ব্যবস্থা কি রকম ছিল, তা তাঁদের মনে আজও জাগে। তাঁদের ছেলেবেলায় লোকে কংগ্রেসে যেত কেবল দেশের প্রতি কর্তব্যের খাতিরে, দেশ ভক্তির প্রেরণায়। সে সময় জোচ্চুরীও ছিল না; ঘুষের কারসাজিও কেউ জানত না। আর "সেনেট" এইবার সম্ভ্রম ও ভক্তিতে গদগদ হয়ে তারা কেবলই বলতে লাগল "আর সেনেট, আমরা যখন ছোট ছিলুম তখন সেনেট ?"—

কিন্তু দুজনের কেউই সেনেট সম্বন্ধে তাঁদের মনের ভাব বোঝাবার মত বড় কথাটা কোন মতেই খুঁজে পেলেন না; তাঁরা কেবলই বলতে লাগলেন "আর সেনেট ?" শেষে মাথা নেড়ে হুইস্কি ও সোডার গেলাসে খুব গভীর চুমুক দিতে লাগলেন।

সেনেট, কংগ্রেসের কথা বলতে ক্রমে ব্যবস্থাপক সভার কথা উঠল। তখনকার দিনে মানুষ ছিল বটে! সত্য কথা বলতে কি, খুব ছেলেবেলার কথা হ'লেও সে সব ভোলবার নয়। নিউবেরী বছর দশেক বয়সে, একবার তাঁর বাপের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন এক জনকে আজও তাঁর মনে আছে অবশ্য তাঁর নামটি কি তা মনে পড়ছে না; তিনি একটি বক্তৃতা করেছিলেন বিষয়টি অবশ্য ঠিক স্মরণ নেই আর বিষয়ের স্বপক্ষে কি বিপক্ষে সে কথা তিনি ভুলে গেছেন কিন্তু যাই হোক সেদিন তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সে দিনের কথা কি আর ভোলা যায়? এত দিন হয়ে গেল অথচ মনে হয় সে যেন পরশুদিনের ঘটনা!

"আর আজকালকার ব্যবস্থা, লোকজনের কথা মনে হলে" নিউবেরী বললেন "লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়!" এ লজ্জা যে তাঁরও লাগে এ কথা জানাবার জন্যেই যেন কথা না কয়ে ডিক্ কেবলই মাথা নাড়তে লাগলেন।

দেশের কথা প্রসঙ্গে ক্রমে সহরের কথা উঠল। কি ঘুষের কাণ্ড কি বাজে লোকের বদমায়েসি। সব চেয়ে কষ্ট ও লজ্জার কথা যে আজ প্রায় ত্রিশ, চল্লিশ বছর ধরে এই জঘন্য ব্যবস্থা মাথায় ক'রে এ সহরে তাঁরা ব্যবসা কাজ কর্ম্ম করেছেন অথচ কিছুই লক্ষ্য করেন নি—কি বাস্তই তাঁরা ছিলেন!

তাঁরা বার বার বললেন, একথা, শুধু তাঁদের মনেই প্রথম জেগেছে

তা নয়, দেশের বুকের উপর দিয়ে এক নতুন সুর বাতাসে ভাসছে, তাঁদের কথায় তা শুধু প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মাত্র।

হঠাৎ একটা মুহূর্ত্ত এল যখন নাকি একই সময়ে সবায়ের মনে হল যে কর্পোরেশনের বন্দোবস্ত নেহাৎ রকি! কথাটা খুবই কড়া কিন্তু সবাই না বলে যে পারছে না তাদের সহ্যের ত একটা সীমা আছে? যেমন অলডার ম্যান, তেমন মেয়র—আরে ছ্যাঃ!

ঠিক এই সময় তাঁর প্রকাণ্ড ভুঁড়ি ও বিপুল দেহ নিয়ে মেয়র ম্যাকৃগ্রীণ ক্লাব-ঘরের মধ্যে দিয়ে চলে গেলেন। পাকা টোপা কুলের মত তাঁর লাল গোল চোখ দুটো চার দিকে ঘুরিয়ে তিনি বেন বেশ বুঝ্লেন যে এখানকার সভ্যেরা এমন সব তর্ক, আলোচনা করছে যা করবার তাদের না আছে অধিকার না আছে প্রয়োজন।

হাত ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে গলার স্বর নামিয়ে নিউবেরী তাঁকে শুভ ইচ্ছা জানালেন। ডিকও তার অনুসরণ কর্‌লেন—তাঁদের অবস্থা দেখে মনে হল যে নির্ভয়ে জোর গলায় বদমায়েসের চরিত্র আলোচনার মুহূর্ত্তে হাতে হাতে ধরা পড়ার মত সংলোকের দুঃখের বিষয় আর কিছুই নেই।

কোন জবাব না দিয়ে গলার মধ্য থেকে একটা অদ্ভুত রকমের ঘড় ঘড় শব্দ কর্‌তে কর্‌তে মেয়র চলে গেলেন; তাঁর ব্যবহারে তাঁর মনের ভাব আদৌ বোঝা গেল না; তিনি হচ্ছেন—রাজনীতিজ্ঞ লোক, ধরা দেবার পাত্র ত নন।

মেয়র চলে গেলে নিউবেরী বল্‌লেন—লোকটা শুনতে পায় নি কি? ডিক নীচু গলায় বল্‌লেন "চুলোয় যাক, না পেলে ত বাঁচি গেল।"

এ দিকে মেয়র তার দল বলের আড্ডায় আড্ডায় ঘুরে ঘুরে খবর দিলেন যে "এবার নতুন নির্ব্বাচনে গোলযোগ হবার সম্ভাবনা, সবাই একটু পা চাকা দেবার বন্দোবস্ত কর, দরকার হলে সাম্‌নে এস" এই হল তাঁর উপদেশ।

সম্ভ্রান্ত পল্লীর কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল যে নাগরিকোচিত কর্ত্তব্যের প্রেরণায় রোজ রোজ বহু লোক উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছে।

পবিত্র সোডা প্রভৃতি নানা কারখানার মালিক মিষ্টার ফিস্‌ বল্‌লেন "কি ঘেন্নার কথা কর্‌পোরেশনের লেকে গুলো সব চোরের আণ্ডীল! সে দিন একটা কাজে (এই সোডা কারখানা গুলোর এসেস্‌মেন্টের জন্যে আর কি) তাদের অফিসে গেলাম, কি বলব লোক গুলো সত্যিই ঘুষ নেয়!"

পিটার বললেন "বলেন কি, অ্যাঁ বলেন কি ? খুব মোটা বলে পিটার বেশী কথা বলতে পারতেন না।

কিস্ জোর গলায় বললেন "বলব কি, সত্যি তারা ঘুস নেয়—আমি ছোট খাতাঞ্চিকে এক পাশে ডেকে বললাম যে আমার এই কাজটি দয়া করে আপনাকে করে দিতে হবে, বলে তার হাতে টাকা পঞ্চাশ গুঁজে দিলাম, লোকটা সটান তার পকেটে পুরলে।"

পিটার [illegible] স্বরে বললেন "এ্যা, পকেটে [illegible] [illegible]লেন কি ?"

কিস্ বললেন "নিলে না, [illegible] ! সত্যি এ সবের [illegible] জন্যে তাদের একটা শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত।"

পিটার রেগে উঠল "আমি বলিয়েছেন,একেবারে শ্রীঘরে দাও পাজি কোথাকার" বলে হাঁপাতে লাগল।

কিস্ বলতে লাগলেন "আর ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধা দেখেছ? সেদিন সেই কাজেই একবার ডেপুটীর কাছে গেলুম তাকে কাজের কথা বলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট হাতে দিতে গেলুম, ব্যাটা রেগে আমার মুখে সেটা ছুঁড়ে মারে আর কি ! নিলে না অথচ রোখ কত, ব্যাটা ছোট লোক।"

পিটার ভীষণ বিস্মিত হল, প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম। "নিলে না অ্যাঁ বলেন কি ?"

সহরের সব সম্ভ্রান্ত ঘরে কাজের অবকাশে এই ধরণের কথা বার্ত্তা চলতে লাগল। আর নয় দেশের একটা গতি করতেই হবে।

চারদিকের এই দুরবস্থা দুর্নীতির মধ্যে একটা আশার জ্যোতি দেশ-হিতৈষীদের মনে সাহস সঞ্চার করেছিল। সেটা হচ্ছে, যে নতুন নির্ব্বাচনের সময় এসে পড়েছে ; শুধু তাই নয় এইবারেই ট্রাম কোম্পানীর নিজের দোসরা বন্দোবস্ত হবে—সে অনেক লক্ষ টাকার খেলা, সহরের আলোর বন্দোবস্ত সম্বন্ধে পাকা ব্যবস্থা হতে পারে আর গোরস্থানের জন্যে নতুন জমি কেনবার কথাও ত চলছে। সব চেয়ে সুখের বিষয় যে সহরের মধ্যে মানুষের মত মানুষ যাঁরা তাঁদের সবায়েরই এ সব বিষয়ে খুব আগ্রহ ছিল কারণ উক্ত কোম্পানীগুলির বেশীর ভাগ শেয়ার তাদেরই হাতে। কয়লার কারবারে লক্ষপতি ব্রাউন, এ্যাস্ফাল্ট কোম্পানীর বোলডার, জমিওয়ালা ফার্গুসও এবং দেশের মুকুটমণি স্বরূপ যত ব্যবসাদার এই আগ্রহ ও উৎসাহের উদ্দীপনায়

দেশের জন্যে প্রাণপাত কর্‌তে প্রস্তুত হলেন। দেখা গেল যে দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের চিন্তা বন্যার মত অকস্মাৎ সবায়ের ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে।

ব্রাউন বুঝ্‌লেন যে খনির মুখ থেকে একটাকায় সহরের জন্যে যে কয়লা নেওয়া হয় তা নেহাৎ খারাপ। নতুন কাউন্সিল হলে তিনি তিন টাকায় ভাল জাত কয়লা দেবার প্রস্তাব কর্‌বেন। বোলডার দেখ্‌লেন যে রাস্তা ঘাটের দুর্দ্দশায় যে কোন সহর-হিতৈষীর চোখে জল আসে; স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি তিন টাকার মালের বদলে পাঁচ টাকার ভাল ...ধর ও ... সরবরাহ করতে রাজী আছেন। নগর-প্রীতির এই হিড়িকে প্রত্যেকেই স্বার্থত্যাগে প্রত্যেককে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌লেন—সস্তার লোভে কর্‌পোরেশনের কর্তারা যে এতদিন দেশের সর্ব্বনাশ করছিলেন তা যে সবায়ের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার!

সপ্তাহ দুয়ের মধ্যে এই আন্দোলন একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ কর্‌ল "শুদ্ধ শাসন সঙ্ঘে"র প্রতিষ্ঠায়। দেশের নেতাস্বরূপ নিঃস্বার্থ দেশ প্রীতি-প্রণোদিত কতিপয় ভদ্রমহোদয় ক্লাবের দোতালার হলে সমবেত হলেন, আলোওয়ালাদের তরফ থেকে এলেন ফিস্, দেশ প্রীতির দোহাই দিয়ে এলেন ফারলঙ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তরফ থেকে তিন জন ভদ্রগোছের অধ্যাপক সঙ্গে এলেন ডাক্তার বুমার। এই তিন জন অধ্যাপক সম্বন্ধে তাঁর ভারি উঁচু ধারণা ছিল কারণ যে কোন ব্যবসাদারের সঙ্গে বসে সোডা হুইস্কি খেতে ও কাজের কথা আলোচনা কর্‌তে এঁদের একটুও বাধ্‌ত না। গির্জ্জার তরফ থেকে ডাক্তার ম্যাকৃটিগকেও সেখানে দেখা গেল—সিগারের ফিকে নীল ধোঁয়া ভরা ঘরের এক কোণে বসে তিনি চোখ মিট মিট কর্‌ছিলেন—হেগেল-দর্শনের সঙ্গে সেণ্ট পিটারের সাদৃশ্যতত্বের এতদিনের মীমাংসার সব খেই তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

পিটার চুপি চুপি নিউবেরীকে বল্‌লেন—কি সুন্দর, দেশের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে এমন ক'রে দেশের গণ্যমান্য লোক সব একত্র হয়েছেন—এ দৃশ্য জীবনভোর মনে রাখ্‌বার মত।"

সভাপতির আসন গ্রহণ করে ফিস্ সবাইকে উদ্দেশ করে বল্‌লেন, যে তাঁরা যে স্বেচ্ছায় এই স্বাধীন ও মহৎ আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন এজন্য দশের ও দেশের কাছে তাঁরা ধন্যবাদার্হ। অনেকের কাছে দুষ্ট বিবেচিত হওয়ায় খবরের কাগজওয়ালাদের বাদ দিয়ে তাঁরা এই বন্ধ ঘরে সমবেত হয়েছেন এর ফলে এবার থেকে কোন দলের গুপ্ত ফন্দিতে কাজ চালাবার পথ বন্ধ হবে।

এ সঙ্ঘের উদ্দেশ্য যে যা কিছু হবে তা দিনের আলোতে সবায়ের সামনেই ঘটবে; লুকো ছাপা কিছুই থাকবে না, তাই এই রাতের বেলা সভা আহ্বান করা হয়েছে। যে মুহূর্ত্তে সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী ও তা সাধনের উপায় নির্দ্ধারিত হবে সে মুহূর্ত্তেই সহরের সর্ব্বজন ও প্রত্যেক দলের কাছ থেকে সমস্ত বিষয়ে মতামত গ্রহণ করতে এ সভা পশ্চাৎপদ হবে না। তিনি বলতে লাগলেন "দেশের মত, পরামর্শ সবই আমরা আহ্বান করব—দেশবাসীর আদেশ আমরা মাথা পেতে নেবো—আমাদের কাছে ছোট বড়র ভেদাভেদ নেই—ধনী নির্ধন আমাদের চালনা করবার অধিকার সকলেরই। সবাই আমাদের সাহায্য করতে পারেন, সেই জন্যে এক থেকে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা ধার্য্য করেছি—গরীবের এক টাকা সামান্য হলেও যেমন গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না—পাঁচ টাকার বেশী দাবী করে বড়লোকের রক্তশোষণেও আমাদের আকাঙ্ক্ষা নেই। তবে সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য বা কর্ম্মীরা এ দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবেন। গুজব উঠেছে যে আমায় সভাপতি করা হবে এবং তা যদি সত্য হয় তবে আমিই সর্ব্বপ্রথম এ নিয়মের কাছে মাথা হেঁট করব—নিজেকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করব—এমনি করেই নিজেকে মুছে ফেলে দেশের কাজে হাত দোবো।" তিনি এ কথাও জানালেন যে তিনি আশা করেন যে বোগডার, ফারলঙ, বুমার, নিউবেরী প্রভৃতি তাঁর দেশহিতৈষী বন্ধুবর্গ এ অঙ্গীকার করতে দ্বিধা করবেন না।

উচ্চ করতালি ও বিরাট হর্ষধ্বনিতে যখন সভা ফিসের মন্তব্য অনুমোদন করলে ফিস্ তখন ঈষৎ গর্ব্বিত দৃষ্টিতে সবায়ের দিকে চেয়ে বললেন—"কারো কিছু বলবার থাকলে তিনি স্বচ্ছন্দে তা বলতে পারেন—আলোচনা করবার অধিকার সবায়েরই, আমি সভাপতি বলে আলোচনা একচেটে করতে চাই না, প্রত্যেকেই জানুন যে—"

"তা হলে দেখুন সভাপতি মহাশয়" ডিক্ বলবার উপক্রম করলেন—তাঁকে বলবার অবকাশ না দিয়ে ফিস্ বলতে লাগলেন—"এক মিনিট অপেক্ষা করুন মিষ্টার ওভারএণ্ড—আমি বলতে চাই যে সবাই এটা জানুন যে এখানে নির্ভয়ে আলোচনা—" কথা শেষ হবার আগেই নিউবেরী বলে উঠলেন—"তা হলে কি বলতে পারি—" তাকে থামিয়ে ফিস বললেন—"ক্ষমা করবেন মিঃ নিউবেরী আপনার আগে একটা কথা বলতে চাই—আমাদের আলোচনা যত কম কথায় হয় ততই ভাল কারণ সময় যত কম, বক্তব্য বিষয় তার চেয়ে ঢের বেশী—আর আপনাদের কারো কিছু বলবার আছে?"

এবার নিউবেরী বল্লেন—"সঙ্ঘ ও সঙ্ঘের কর্মীদের সম্বন্ধে কি ঠিক করেছেন জানতে পারি কি?

ফিস্ সাগ্রহে বল্লেন "নিশ্চয় পারেন—এখানে ঢাকাঢাকি কিছু নেই—" এই বলে সঙ্ঘের কর্মীদের একটি তালিকা পড়লেন—দেখা গেল ফিস্ থেকে আরম্ভ করে ডিক্, নিউবেরী ফারলঙ পর্যান্ত কেউই উচ্চ পদ থেকে বাদ পড়েন নি। তার পর হঠাৎ সকলের দিকে ফিরে বল্লেন "আশা করি উক্ত কর্মীদের নিয়োগ সম্বন্ধে আপনাদের কোন আপত্তি নেই—বেশ, বেশ, আপনাদের অনুমোদনে খুসী হলুম, কাল তা হলে পুরো তালিকাটা বাইরে টাঙ্গিয়ে দেবো'খন।

হঠাৎ সভা নীরব হয়ে গেল—দেখা গেল ফিস্ এবং নিউবেরী, ফারলঙ এবং ডিক্ প্রত্যেকেই পকেট থেকে কি সব কাগজপত্র বার করে, কানে কানে ফিসফাস করতে লাগলেন।

পরে নিউবেরী বল্লেন "দেখুন আমি কেজো লোক এবং সেই হিসাবেই বলছি যে খবরের কাগজগুলোকে আমাদের দলে আনা কি উচিত নয়?

কয়েকজন সমস্বরে চেঁচালেন "নিশ্চয়ই।"

সব চীৎকার ডুবিয়ে ডাক্তার বুমারের গম্ভীর গর্জ্জন বেজে উঠল—"খবরের কাগজ আমাদের মস্ত বড় সহায়—আমরা এমন কাগজ চাই ঘুষ দিয়ে যাকে সত্যের পথ থেকে বিচলিত করা যায় না—ধর্ম্মের অস্পষ্ট আহ্বান যেখানে অর্থের স্পষ্ট ইঙ্গিতকেও আমোলে আনে না—এই উদ্দেশ্যে সহরের কোন নামজাদা কাগজ কিনে ফেলাই আমারমতে শ্রেষ্ঠ পন্থা।

ডিক প্রস্তাব করলেন—"কাগজের চেয়ে সম্পাদকীয় সঙ্ঘকে কেনাও ত চলতে পারে?"

বুমার সে কথা স্বীকার করলেন তবে কাগজওয়ালাদের ঘুষ নেওয়ার মত জঘন্য ব্যাপার দমন করতে হলে কাগজ কেনা উচিত কি সম্পাদকীয় সঙ্ঘকে হাত করা উচিত তা তিনি ঠিক করে বলতে পারলেন না।

ফিস্ ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—"এই সব রাজনৈতিক দলাদলি আর খবরের কাগজওয়ালাদের সঙ্গে গোপন বন্দোবস্তের ওপর আমার ঘৃণা ধরে গেছে—এ সব কুপ্রথার সংস্কারের ভার আমাদের হাতে। এজন্যে আমার মনে হয় একটা কমিটি করে তার উপর ভার দেওয়া হোক এবং ট্রেজারার মশায় এঁদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যা কর্ত্তব্য স্থির করলে আশা করি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।"

যাই হোক ঘণ্টা দুয়ের আলোচনায় "শুদ্ধ-শাসন-সঙ্ঘ" সংগঠিত হল। সুউচ্চ কণ্ঠে মিঃ ফিন্ বার বার সবাইকে জানালেন যে শুদ্ধ, সত্ত্ব, পবিত্রাই এ নবগঠিত সঙ্ঘের আদর্শ।

এ কথা বলা বাহুল্য যে পূর্ব্বোক্ত সভা গোপনে গড়ে উঠেছিল। দল হিসাবে তাঁদের খুব বাহাদুরী ছিল কারণ প্রকাশ্যে যখন সভা হল তখন দলপতি থেকে চুণো পুঁটিটি পর্য্যন্ত যে যার ভূমিকা যথাযথ অভিনয় করে গেলেন।

এইবার শুদ্ধ-শাসন-সঙ্ঘের প্রকৃত কাজ আরম্ভ হল—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অপবিত্রাতার বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিরুদ্ধে শুদ্ধ সত্ত্ব পবিত্র আলোর দল ধর্ম্ম যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কোথায় যে এই অনাচারীর দল গোপনে কাজ করছিল তা কেউ জানত না বা জানবার চেষ্টাও করলে না কিন্তু সভা সমিতি আথড়া আসর সর্ব্বত্র সবাই এ কথা বলতে লাগল যে আড়ালে আবডালে, তলে তলে অনাচারীর দল কাজ করছে—যে কোন মুহূর্ত্তে, যে কোন সূত্রে তারা সহরের মহা অনিষ্ট সাধন করতে পারে—সে অনিষ্ট যে কত বড় তা কেউ বলতে পারলে না কিন্তু ঘরে বাইরে সবাই আঁতকে উঠতে লাগল। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শুদ্ধ সত্ত্ব পবিত্রতার বিরুদ্ধে কে যে লড়ছে, কি করেই বা লড়ছে শেষ পর্য্যন্ত তা কোন মতেই জানা গেল না।

খবরের কাগজের কথা প্রথমে ধরা যাক। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আরম্ভেই এ কথা বারংবার বলা হয়েছে যে কাগজওয়ালাদের ব্যবহার এত অস্বচ্ছ ও কাগজ এত মিথ্যা দুষ্ট যে শুদ্ধ-সঙ্ঘের কাজ চালাতে হলে নিজেদের একটা কাগজ থাকা দরকার, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে "শুদ্ধ শাসন" কথা দুটি প্রকাশ্যে উচ্চারিত হল সে মুহূর্ত্তে দেখা গেল যে সহরের প্রত্যেক কাগজ শুদ্ধ-শাসনের স্বপক্ষে, উপরন্তু বহু বৎসর ধরে তারা যে এ বিষয়ে চেষ্টা করছে তা তারা জানাতে ত্রুটি করলে না।

শুদ্ধ-শাসনের আদর্শ প্রচারের চেষ্টায় কাগজগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দীতা জেগে উঠল। কেউ বললে "যদি শুদ্ধ-শাসন চান তবে ৫০৲ টাকা পাঠিয়ে অবিলম্বে আমাদের গ্রাহক হোন", কেউ লিখলে "কোন সে ভীরু যে শুদ্ধ শাসনের পক্ষপাতী নয়—যার সাহস থাকবে তিনি আমাদের চাঁদার খাতায় নাম সই করে টাকা পাঠাতে দ্বিধা করবেন না—উপযুক্ত ব্যবহার ছাড়া আমাদের হাতে টাকার অপব্যবহার হবে না এ আশা তাঁরা রাখতে পারেন।" কেউ ধমক দিয়ে, কেউ আদেশ দিয়ে কেউ বা উদ্ধত রকমের কলম বাজীতে

পাঠকদের ভীত করে তুললেন। কাগজওয়ালারা যে এইখানেই ক্ষান্ত হলেন তা নয়—মাঝে মাঝে তাঁরা সহর-হিতৈষীদের ছবি ছাপ্‌তে লাগলেন—একদিন বের হল ফিসের ছবি, তার তলায় তাঁর এক উক্তি উদ্ধৃত ছিল—"দেশের শাসনভার দেশের লোকের হাতে এবং সেটা তাদেরই জন্যে।" কোন দিন বা নিউবেরীর ছবি বেরল, তলায় ছিল তাঁর বাণী—"মানুষ মাত্রেই স্বাধীন এবং মুক্ত।"

গোড়াতেই শুদ্ধ শাসন কর্ম্মীদের কথায়ও ব্যবহারে বেশ বোঝা গিয়েছিল যে নতুন কর্পোরেশনে কয়েকজন অলডার ম্যানের এবার আর স্থান হবে না। তারা জাতিতে হীন, ব্যবসায়ে ছোট; দেশের বুকে বসে এতদিন জনসাধারণের রক্ত শোষণ করছিল এবং তাদের না তাড়ালে দেশের যে পরিত্রাণ নেই এ সব কথা কাগজওয়ালারাও বল্‌তে ত্রুটি করলে না।

বিপদ হল যে কারা এই অলডার ম্যানদের সাহায্য করে শুদ্ধ-শাসনে বাধা দিচ্ছে তা খুঁজে পাওয়া গেল না। যে সব আড্ডা আখ্‌ড়া তাদের সাহায্য করছে বলে সবায়ের বিশ্বাস ছিল, কার্য্যকালে দেখা গেল নিজ সভ্যের চেয়ে শুদ্ধ শাসনে আগ্রহ তাহাদেরই বেশী।

সবচেয়ে বিস্ময়কর হ'ল যে মেয়র ম্যাকগ্রাথ নিজেকে শুদ্ধ-শাসনের পক্ষপাতী বলে সগর্ব্বে প্রচার করতে লাগলেন, এমন কি সংঘভুক্ত হয়ে কাজ নিতেও স্বীকৃত হলেন ব্যাপারটা অবশ্য খুবই অদ্ভুত কিন্তু কেউ যদি মিঃ ফিস্ ও মিঃ বোলডারের গোপন কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পেতেন তবে তাঁর বিস্মিত হবার কারণ থাকৃত না।

মিঃ বোলডার বল্‌লেন একি, ম্যাকগ্রাথের নামও যে তালিকাভুক্ত হয়েছে! ব্যাপার কি?

ফিস্ বল্‌লেন "ওকে না হ'লে কি চলে—সাত সাতটা ওয়ার্ড একেবারে ওর মুঠোর মধ্যে।"

বোলডার জিজ্ঞাসা করলেন "ওকে কি বিশ্বাস করা যায় মনে করেন?

ফিস্ আশ্বাস দিলেন "সে আমি ঠিক করে নেবোখন্ আট ঘাট সব বাঁধা যাবে কোথায়।"

পূর্ব্বতন প্রণালীর উপর নাগরিকরা এতে বিরক্ত হয়েছিল যে অলডার ম্যানেদের কাউন্সিল তুলে দিয়ে একটা বোর্ড স্থাপনের পরামর্শ চলতে লাগল; যাতে সেটা সেনেট কর্ত্তৃক মঞ্জুর হয় সে চেষ্টারও ত্রুটি হল না—তবে এই

বোর্ড ও কাউন্সিলের মধ্যে তফাতটা যে কি তা অনেকেই বোঝেনি বলে মনে হল।

নিজে কিছু ঠিক কর্তে না পেরে নিউবেরী একদিন এ বিষয়ে—সরাসরি ফিস্‌কে প্রশ্ন করে ফেল্‌লেন। ফিস্ গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন "অবশ্য এক কথায় ব্যাপারটাকে বোঝান শক্ত; তবে প্রধান তফাৎ হচ্ছে মাইনের; কাউন্সিলের অলডারম্যানের মাইনে যেখানে পনের শ থেকে দুহাজার, বোর্ডের মেম্বারের সেখানে পাঁচ হাজারের একটি পয়সা কম নয়—কাজেই পাঁচ হাজারে আপনি ভাল লোক পাচ্ছেন। পনের শ টাকায় যে কাজ করে পঞ্চাশ কি একটাকা ঘুষ নেওয়া তার পক্ষে কিছু আশ্চর্য্য নয় কিন্তু পাঁচ থেকে দশ হাজার যার মাইনে তাকে তা দিতে গেলে সে হেসে উড়িয়ে দেবে না কি? পাঁচহাজারীর পদ যেমন উঁচু তার শিক্ষা দীক্ষা, নজরও ত তেমনি?"

নানাদিক থেকে নানা দল সংঘকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এল—সহরের মেয়ে ভোটাররাও যে পুরুষদের চেয়ে পিছয়ে নেই একথা জানবার জন্যে মিসেস ক্ল্যামার একদিন সংঘের অফিসে এসে বল্‌লেন "শহরের সমস্ত মেয়ে ভোটারদের প্রতিনিধি হয়ে আমি এসেছি, বলুন কি আমাদের করতে হবে। এইটি ছিল মিসেসের প্রিয় বুলি—তিনি যে কেন আর কেমন করেই বা সমস্ত মেয়েদের প্রতিনিধি হলেন ত আজও অনেক চেষ্টায় তা কেউ ধরতে পারলে না। তিনি বলতে লাগ্‌লেন "আমরা মেয়েরা আপনাদের সাহায্য করতে চাই; দেখুন, অবস্থা বুঝে কাজ করবার শক্তি বা বুদ্ধির আমাদের অভাব নেই, শুধু আপনারা বলে দিন আমরা কি করব। আমরা নিজে বুঝে চলতে পারি যদি আপনারা—পুরুষরা আমাদের চালান—পথ দেখিয়ে শুধু নিয়ে যান। আচ্ছা আমরা নিজেদের মধ্যে কি একটা সভা ডাক্‌তে পারি না?" ফিস্ বল্‌লেন—"সে ত বেশ কথা"।

ব্যস্ত হয়ে মিসেস ক্ল্যামার অনুরোধ করলেন—"তা দেখুন, সভায় বক্তৃতা দিয়ে মেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্যে জন চারেক পুরুষকে কি পাঠাতে পারেন না?" ফিস বল্‌লেন—"খুব পারি।"

মেয়েরাও যে শুদ্ধ-শাসনের জন্যে পুরুষদের পাশে এসে লড়াই করতে রাজী হয়েছেন এতে সহরময় হৈ হৈ হতে লাগ্‌ল। দোকান, হোটেল, রেস্তোরায় মেয়েরা সকাল, দুপুর, বিকেল নানারকম সাজ পোষাকে জমায়েৎ হয়ে কেবলই জটলা করতে লাগল। সে এক দৃশ্য!

কিন্তু এই কথা বারংবার প্রচার করলেন যে মেয়েদের আবির্ভাবে সংঘের কাজ আরও পবিত্র হয়ে উঠল। মেয়েরা প্রায় সকলেই পাঁচটাকা দিয়ে সভ্য হতে দ্বিধা করলেন না, কেবল কয়েকজন বিদেশী নিম্নস্তরের স্ত্রীলোক এক টাকার বেশী দিতে রাজী হল না—সামান্ত হলেও সে দান অস্বীকার করবার সঙ্কীর্ণতা যে কিসের আছে অতি বড় শত্রুতেও এ অপবাদ তাকে দিতে পারলে না।

সংঘের সাহায্যে কেবল যে মেয়েরা এলেন তা নয় ডাক্তার বুমারের কথায় জানা গেল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও শুদ্ধ-শাসন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। "সৎপন্থা" নাম দিয়ে তারা একটা সমিতি স্থাপন করেছে। শোনা গেল একজন পূর্ব্বতন অল্ডারম্যান নাকি সৎপন্থীদের হাতে খুব লাঞ্ছিত হয়েছেন তারা এমন বা কিছু একজনের খোঁজেও আছে। অবশ্য বুমার খুব আশ্বাস দিলেন যে সৎপন্থীর দলপতিরা তাঁর কাছে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুত হয়েছে যে তারা এমন কোন অভদ্র আচরণ করবে না যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কলঙ্ক লাগে।

নিউবেরী বললেন "তাহলে কাল বোধ হয় রাস্তায়—তাদের গলা পাচ্ছিলুম।"

বুমার গম্ভীর ভাবে বললেন—"হুঁ, কাল যে তারা শোভা যাত্রা করেছিল।"

নিউবেরী বললেন—হ্যাঁ, আমি যে শুনলুম—রা, রা, রা, রা, রা, সৎপন্থী কী জয়, শুদ্ধশাসন কী জয়, রা, রা, রা, রা, রা, আরও কি সব বলে তারা খুব চীৎকার করছে। বাস্তবিক তাদের উৎসাহ দেখে আমার মনে নতুন শক্তি জাগল।"

বুমার বললেন—"রাস্তার সব রকম বদমায়েসি গুণ্ডামি বন্ধ করবার জন্যে এবার ছেলেরা দল বেঁধেছে। কর্পোরেশন নির্ব্বাচনের সময় এবার আর কাউকে টুঁ শব্দটি করতে হবে না।"

পিটার বললেন "শুনলুম শোভাযাত্রা করে ছেলেরা দুখানা ভাড়াটে গাড়ী আর একখানা দুধ বোঝাই গাড়ী নাকি উল্টে দিয়েছে ?"

ডিক্ বললেন "কে যেন বলছিল তাদের মধ্যে দুজনকে নাকি পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে!"

সবাইকে আশ্বস্ত করে বুমার বললেন "হ্যাঁ ভুল করে দুজন ছাত্র হকিষ্টিক দিয়ে উল্টোন গাড়ীর শার্সি ভাঙছিল, এই সময় একদল পুলিশ গুণ্ডা মনে করে তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল—থানায় গিয়েই তারা ভুল বুঝতে পারলে—পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিছু আগে আমার কাছে টেলিফোনে দুঃখ প্রকাশ

করছিলেন। গাড়ী ছুটো নাকি তাঁরা অলডারম্যান বিল্গিকিনের বলে সন্দেহ করেছিল—ছেলেরা যে আজ অলডারম্যান স্কেপ্‌গোটকে জলে ডোবাবে বলে বেরিয়াছে—ছোটলোকের সাজা হওয়া ভাল, তবে কোন রকমে যাতে শান্তি ভঙ্গ না হয় সে বিষয়ে তারা খুব চেষ্টা করবে বলে আমার কাছে কথা দিয়েছে—তা ছাড়া ছেলেদের মাঝে মাঝে নির্দ্দোষ আমোদ করবার স্বাধীনতায় আমার বিশ্বাস আছে।”

চারিদিক থেকে এইরকম নানা শুদ্ধ ও শান্তিময় চেষ্টার ফলে অজ্ঞাত বিপক্ষদল হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বিলিকিন, স্কেপ্‌গোট প্রভৃতি নীচজাতীয় অলডারম্যান প্রাণের দায়ে করপোরেশনের আশা পরিত্যাগ করে হঠাৎ বুদ্ধিমত্তার ও উদারচিত্ততার পরিচয় দিয়ে সহর বাসীর ধন্যবাদ ভাজন হল।

নির্ব্বাচন দিনে শুদ্ধশাসন সংঘের জয়ের কথা বিস্তারিত বলা বাহুল্য মাত্র এ রকম শুদ্ধ সত্ত্ব পবিত্র নির্ব্বাচন সহরের ইতিহাসে এই প্রথম। শুদ্ধশাসনের স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রদের সংগঠা সমিতি প্রভৃতির সভ্যেরা নানারকম হাতিয়ার নিয়ে সেদিন নির্ব্বাচন কেন্দ্রে পাহারায় ছিল—শুদ্ধশাসনের বিপক্ষকারীকে সন্দেহ মাত্রই সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল এবং তাদের কোনরকম বল প্রয়োগ বা গুণ্ডামির অন্যায় চেষ্টা লাটির আঘাতে ভদ্রভাবে নিবারণ করা হ'ল। সহরের নিম্নস্তরের বর্ব্বরদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখ্‌বার জন্যে সেই সমাজেরই বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক গাঁইতি বা টাঙ্গি হাতে তাদের মধ্যে ঘুরছিল। সহরের নামজাদা ব্যবসাদার, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতির মোটার সহরের চারিদিক ঘুরে পাহারা দিচ্ছিল যাতে অন্য কোনরকম গাড়ীতে চড়ে বিপক্ষ দলেরা ভোটদিতে না আস্‌তে পারে।

গোড়া থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে জয় কোন দিকে এবং তার ফলে অজ্ঞাতকারী বিপক্ষদল এমন হেরে গেল যে কে যে বিপক্ষ তা খুঁজেই পাওয়া গেল না! ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল কিন্তু শুদ্ধ-শাসনের মন্ত্রে উন্মত্ত নাগরিক দল তখনও রাস্তায় ভিড় করে চেঁচাতে লাগল—"জয় শুদ্ধশাসনের জয়।" খবরের কাগজ গুলোর অফিসের সামনে বড় বড় পর্দ্দায় করপোরেশনের নব নির্ব্বাচিত মেয়র থেকে ছোট বড় বহু লোকের ছবি ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে নাগরিকদের দেখান হল—ম্যাকগ্রাথ, ফিস্‌ থেকে পিটার, ডিক্ সবায়ের ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেরই জয় ধ্বনিতে সহরের আকাশ

বাতাস ঘন ঘন কেঁপে-উঠ্‌তে লাগ্‌ল—মাঝ রাত পর্যাস্ত জয় ধ্বনি করে ক্লান্ত নাগরিক দল বাড়ী ফিরে গেল।

সেদিন রাত্রে সহর হিতৈষীদের অভ্যর্থনার জন্যে ক্লাবে একটা বিরাট ভোজের আয়োজন হয়েছিল সহরবাসীর অর্থে—এমন কি তাদেরই আগ্রহে; কিন্তু মেক্‌গ্রাথ থেকে আরম্ভ করে পিটার, নিউবেরী পর্য্যন্ত শুদ্ধশাসন সংঘের সবাইকে সেখানে দেখ্‌তে পাওয়া গেলেও সহরের অন্যকোন লোকের পাত্তা পাওয়া গেল না। *

একটা দিন কলের জলে না নেয়ে দৈবাৎ কেউ যদি গঙ্গায় স্নান করেই থাকে ত কি যে মহাপাপ হতে পারে আমি ত ভেবেই পাইনে।

'নব-বিধান।'

---

* রচয়িতা—Stephen Leacock.

বিপ্রলব্ধা

—শ্রীঅহল্যা গুপ্ত।

নারায়ণপুরের মিত্র বাড়ীতে আজ বড় ধুম। হরিহর মিত্রের কন্যা হাসির আজ বিবাহ। তাই মিত্র বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য।

অপরাহ্নের স্নিগ্ধছায়া পুকুরের কাল জলে ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছে! খিড়কির বাগানে মাধবী ফুল তুলিতে ব্যস্ত। অজিত একটা পেয়ারা গাছের কচিফল গুলির দিকে চাহিয়াছিল।

মাধবী অজিতের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, গন্ধরাজ ফুলগুলো পেড়ে দাও না অজিত।

অজিত মাধবীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হবে?

মাধবী হাসিয়া বলিল, গন্ধরাজ দিয়ে বরের মালা গাঁথব, আর বেলফুল দিয়ে হাসিদির জন্য মালা তৈরী করব। তারপর লুকিয়ে গিয়ে হাসিদির চোখটিপে ধরে গলায় মালাটা পরিয়ে দিয়ে পালিয়ে আসব! আর গন্ধরাজের মালাটা—

অজিত বিষাদ ভরা দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, থাক্‌না মাধবী। কত ফুলের মালা আসবে, তোমার আমার মালা কি কেউ দেখ্‌তে পাবে?

মাধবী বায়না ধরিল, তা হোক্‌, তুমি পেড়ে দাও, কেউ দেখুক না দেখুক হাসিদি' ত আদর করে পরবে?

অজিত মাধবীর অপেক্ষা প্রায় পাঁচ ছয় বছরের বড়। এতক্ষণ যাহা মনের ভিতরে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল তাহা আর পারিল না। মাধবীর কপালের উপর হইতে একগোছা চুল সরাইয়া দিয়া নেহাৎ অন্যমনস্কভাবে যেন বলিল, তোমার হাতের মালা বিয়েতে পরতে নেই। তারপরই ভুল করিয়াছে ভাবিয়া বলিল, তাহোক্‌ তুমি মালা গাঁথ, আমি ফুল পেড়ে দিচ্ছি।

মাধবী ফুল পাইবার উৎসাহে অজিত যাহা বলিয়াছিল, তাহা একেবারে ভুলিয়া গেল।

অজিত যখন ফুল আনিয়া তাহার অাঁচলে ঢালিয়া দিল, তখন মাধবী সমস্ত ফুল গুলি আঁচলে ভরিয়া তুলিয়া তাহাতে নিজের মুখখানা ভরাইয়া দিল।

সগ্ন ছিন্ন গন্ধরাজের শ্বেত স্তূপের উপর মাধবীর গৌর ললাট খানি অজিতকে আবার মনে করাইয়া দিল, মাধবী বিধবা।

মাধবী যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন অজিত জোর করিয়া মুখের উপর হাসি আনিয়া বলিল, দেখ মাধবী, ফুলগুলো আমাকে দাও। ভারী মজা হবে, একটি একটি করে জলে ভাসিয়ে দি, দেখ্‌বে একটার পর একটা ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ভাস্‌তে থাক্‌বে। কাল সকালে এসে দেখ্‌বে, সারারাত ধরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে ফুলগুলি তীরে এসে লেগেছে। বেশ মজা হয় না?

মাধবী যেন কথাগুলির অর্থ বুঝিতে পারিল না। অবাক হইয়া অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অজিত তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, রাগ কর্‌লে? আচ্ছা বেশ তুমি মালা গাঁথ, আমি পর্‌ব সে মালা।

মাধবীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কেন অজিত, মালা যে হাসিদিকে দেব।

অজিত মাধবীর হাতখানি কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, মাধবী, তুমি জাননা বিধবার হাতের মালা পর্‌লে ওদের অমঙ্গল হয়। তাই বল্‌ছিলাম, তোমার হাতের মালা আমি পর্‌ব, অমঙ্গল হলে আমার হবে।

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, আমার হাতের মালা পর্‌লে হাসিদির অমঙ্গল হবে?

অজিত বুঝাইয়া বলিল, তোমার হাতের নয়, বিধবার হাতের ব'লে। তুমি বিধবা কি না।

মাধবী আর বেশী কথা বলিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অজিত মাধবীকে এ কথাগুলি বলিতে যাইয়া ব্যথা পাইয়াছে।

অজিত ধীরে ধীরে বলিল, বাড়ী যাবে মাধবী? সন্ধ্যে হয়ে এল যে।

মাধবী উত্তর করিল না। ফুলগুলি আঁচলে জড়াইয়া লইল। সন্ধ্যার স্তব্ধ ছায়ার মতই ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। পুকুরের ধারে আসিয়া, একটু দাঁড়াইল। কিছু ভাবিতেও যেন তাহার কষ্ট হইতেছিল। ঘাটের সিঁড়িগুলি নামিয়া গিয়া আঁচলের ফুলগুলি জলে ভাসাইয়া দিয়া উঠিয়া আসিল।

অজিত তাহার হাতখানি ধরিতেই সে একবার অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া আবার চলিতে লাগিল।

২

অন্ধকার ঘরে বসে কি করছ মাধবী? বলিয়া মায়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। কোনও শব্দ না পাইয়া আবার বলিল, আলোটা জ্বাল্ না মাধু, চুলটা তোর বেঁধে দিই। কোনও উত্তর না পাইয়া মায়া মাধবীকে খুঁজিয়া লইল। আদর করিয়া বলিল, বিকেলে চুল বেঁধে দিতে পারিনি ব'লে রাগ করেছিস্ বোন্?

মায়া তাহার গালটা মাধবীর গালে ছোঁয়াইতেই মায়া চমকিয়া উঠিয়া ডাকিল মাধবী! মাধবীর সাড়া নাই।

মায়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইল। আদর করিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত চোখে চুম্বন করিতে করিতে মায়া বলিল, মাধুদিদি আমার, কি হয়েছে বোন্?

মাধবী তাহার প্রাণভরা স্নেহ স্পর্শে তাহার বুকে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মায়ার চোখের জল মাধবীর কপালে পড়িয়া মাধবীর কপালে জলের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। মায়া আদর করিয়া ডাকিল, কি হয়েছে বোন্ মাধবি?

মাধবী দিদির গলা ছাড়িয়া দিয়া বলিল, দিদি আমি বিধবা কেন?

মায়া মাধবীর প্রশ্ন শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভাবিল মাধবীর ক্ষুদ্র প্রাণে এ বিষ কে ঢালিয়া দিল?

মায়ার মুখ ফুটিয়া আর কোনও কথা বাহির হইল না। মাধবীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, মিথ্যে কথা বোন্, মিথ্যে কথা।

মাধবী ধরা গলায় বলিল, তবে আমার হাতের মালা বিয়েতে দিতে নেই—কেন?

মায়া তাহার নিজের মুখটি মাধবীর ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরিল। মাধবী মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল, বল তাহলে আমার মালা বিয়েতে পরলে অমঙ্গল হবে কেন?

মায়া মাধবীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, চুপ্ কর্ মাধবী, আর চুলটা বেঁধে দি।

৩

ছোট খাট সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া মিত্র পরিবারের আরও কয়বছর কাটিয়া গিয়াছে।

একদিন অজিতের পড়িবার নির্জ্জন জানালায় বসিয়া মাধবী মেঘভরা আকাশের দিকে চাহিয়াছিল।

অজিত ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, মাধু।—

মাধবী হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, কি বল।

একটা কথার উত্তর দিবে মাধু, মাধবী বলিল, উত্তর দেবার মত হলে নিশ্চয় দেব।

না দেবার মত কিছু আমি তোমায় কখনও জিজ্ঞেস করব না। বল্‌বে মাধবী তুমি ওরকম গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ কেন? তোমাকে এরকম দেখে কাকীমার, বাড়ীর সকলের কত কষ্ট হয় তাকি তুমি বোঝ?

মাধবী হাসিয়া বলিল, গম্ভীর হ'লাম কোথায়, বা-রে!

অজিত মাধবীর সে হাসিকে স্তম্ভিত করিয়া ডাকিল, মাধবী। এ কি করছ? এ রকম ছলনার মানে কি?

মাধবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষীণহাসি হাসিয়া ধীরে বলিল, মানে? মানে আমি বিধবা।

অজিত বলিল, বিধবা বলে কি নিজেকে এমন করে মারতে হবে?

মাধবী বলিল, হ্যাঁ হবে, আমার নিজের জন্যে না হোক, সমাজের সমস্ত বিধানকে পরিপূর্ণ করে তোল্‌বার জন্যে।

সমাজ? সে সমাজ জাহান্নমে যাক্‌।

মাধবী তেমনি শান্তভাবে বলিল, আমি এই ক'বছরে কত বড় হ'য়ে গেছি, তা ভেবে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই। ভুলে যাচ্ছ, এ সব বিধি ব্যবস্থা যাঁরা করেছেন, আমরা তাঁদের পুত্রকন্যা। তাঁরা যদি আমাদের দুঃখ ব্যথা দেখে তা সহ্য করতে পারেন, আমরা নিজেরা তা পারব না?

অজিত যেন কথা বলিয়া কূল পাইল না। মাধবীর কথার ধরণে তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে উচ্চকণ্ঠে বলিল, তারা স্বার্থপর।

—তুমি, আমি কম?

অজিত বলিল, মাধবী, অমন করে উল্টো তর্ক করো না। এসব কথা কে তোমাকে শেখালে?

মাধবী এবার সত্যই হাসিয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ হাসিয়া যখন তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল, তখন সে মিনতি করিয়া বলিল, রাগ করো না আমার ওপর। তুমিও রাগ করবে আমার ওপর? আমি জানি তুমি আমাকে সুখী করবার ইচ্ছায় আর সব দিক্‌ দু হাতে ঠেলে দিতে চাও।

অজিত মাধবীর কাছে আসিয়া একবার তাহার হাতখানি ধরিতে যাইয়া

আবার থামিয়া গেল। মাধবী তাহা লক্ষ্য করিয়া ডাকিল, অজিত। কি করতে চাও।

বহুদিন পরে মাধবীর মুখে অজিত তাহার নাম শুনিল। অজিত বলিল, মাধবী, এ হতে দেব না। আমি তোমায়—

মাধবী অজিতের মুখে হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, চুপ্ কর। আর বলোনা। বলোনা আমার কাছে ওসব কথা। তোমরা কি জান না, তোমারা কি ভুলে যাও, আমি বিধবা কিন্তু আমিও মানুষ? আমার চোখের সাম্‌নে সব দেখ্‌তে পাব, সব শুন্‌তে পাব, কেবল আমিই কিছু কর্‌তে পার্‌ব না।

পরের ছেলেকে যখন আদর ক'রে, বুকে ধরে মানুষ করে তুলি, তখন সবাই বলে বেশ, বেশ। কিন্তু তারা কি একবারও ভাবে না আমার নিজের সন্তান থাকৃলেও আমার এমনি ভাল লাগ্‌ত। পরের ছেলেকে সব করতে পারি, কিন্তু আমার বলে বলতে পারি না। এর চাইতে আর বেশী কি চাও তোমরা অজিত?

অজিত একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল, একটা কথা সত্যি ক'রে বল্‌বে মাধবী আজ? তুমি কি আমাকে—

মাধবী বাধা দিয়া বলিল, থাক্ আর না। আমি তোমার ছোট হ'লেও, আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনের ভিতর আমি যা' জান্‌তে পেরেছি তারই জোরে বল্‌ছি, আমি সত্য বল্‌তে পারব। তোমার কাছে কিছু বলতে বাধা নাই। কিন্তু বলে কি হবে? আমি যে তোমাকে আমার জন্য লাঞ্ছনা সইতে দিতে পারব না। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। তোমার মনুষ্যত্বকে পূজা করি। কিন্তু তাই বলে আমার দুঃখের মাঝখানে তোমাকে টেনে আন্‌তে পার্‌ব না যে।

অজিত বলিল, বুঝি না তোমাদের এ সব কথার মানে। আমার কাছে তোমার ব্যথাটাই বড়, কারণ আমার ব্যথাটাও আমার কাছে মস্ত বড়। আর কিছু বল্‌ব না। একটি কথা শুধু বলি, বিধবার পক্ষে যা অন্যায় তা যদি তুমি মনে মনেও ভেবে থাক তাহলেও কি পাপ হয়না?

মাধবী উত্তর করিল, পাপ? আমার কি পাপ? তোমাকে ভালবাসি বলে ত আমার কখনও পাপ করছি বলে মনে হয়নি। আর তার জন্য আমার ভাবনা কর্‌বার কোনও কারণ নাই।

অজিত কি বলিতে যাইতেছিল, বলিতে পারিল না। টেবিলের উপর হইতে একখানি বই লইয়া আবার রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মাধবী অশ্রুভরা নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। বেদনায় তাহার বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছিল।

(আগামী বারে সমাপ্য)



(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩২

নগেন্দ্রনাথ অসিতের পরিচয় দিবার সময় বীরেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন—He has dropped from the sky—'

কথাটি পরিহাস-ছলে ব্যবহৃত হইলেও ইহাতে মিথ্যা ছিল না। অসিতের অতি পরিচিত বন্ধুগণও জানিত না, তাহার গৃহ কোথায় ছিল বা তাহার আত্মীয়-স্বজন কোথায় আছে, এমন কি তাহার বিবাহে তাহার একমাত্র ভগিনী রাধা ছাড়া আর কোন আপনারজনকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না!

Middle Avenueএর একটি বৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলের অংশটি অসিত কিছুকাল পূর্ব্বে ভাড়া লইয়াছিল এবং এইখানেই সে তাহার নব-পরিণীতা-বধূকে লইয়' গৃহ-প্রবেশ করিল।—বধূকে বরণ করিয়া লইল রাধা।

গাড়ী হইতে নামিয়া উপরে আসিয়াই কতকটা কৌতুকের সুরে দীপ্তির চোখের দিকে চাহিয়া অসিত বলিল—এই 'হারেম্'টা তোমার জন্যে ঠিক করেছি অসুবিধা যা হবে তার নালিশ শোন্‌বার কেউ নেই, সব মুখ বুজে সইতে হবে; তাছাড়া শ্বশুর শাশুড়ীর বালাই নেই শুধু আমার ছোটবোন রাধা আছে, তা ও আর বেশী দিন থাক্‌বে না, সুতরাং বুঝ্‌তেই পার্‌ছ তোমাকে কি অসহায় অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছি?—

দীপ্তির মুখে অল্প একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল কিন্তু তাহা অসিতের কথায় বা আপনার মনের কোন খেয়ালে তাহা বোঝা গেল না। দীপ্তিকে রাধার হস্তে সমর্পণ করিয়া অসিত কোন কাজে তাহার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

দীপ্তির হাত ধরিয়া একটি চেয়ারে বসাইয়া তাহার মুখটি দুই হাতে ধরিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে রাধা হাসিয়া বলিল—ভয় লাগ্‌ছে?—

দীপ্তি তাহার বড় বড় চোখ দুটি রাধার মুখের উপর তুলিয়া বলিল—ভয়, কিসের?

রাধা। অমন শুধ্‌ন দেখাচ্ছে যে!

দীপ্তি হাসিয়া বলিল—কাল রাতে বিয়ে হয়েছে আজ শুধ্‌ন দেখাবে না?—

রাধার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে একবার দীপ্তির চোখের দিকে চাহিয়া কি যেন পড়িতে চেষ্টা করিল তাহার পর বলিল—আমি অনেক কনে দেখেছি ভাই, কিন্তু ঠিক তোমার মত কা'কেও দেখিনি!

দীপ্তি। নতুন কনেরা আমার মত হয় না?—

রাধা। না তারা হয় খুব ভয় পায় নয় খুসীতে তাদের চোখ মুখ উছ্‌লে ওঠে।

দীপ্তি। আমার কি আছে?

রাধা। জানি না।

দীপ্তি মাথা নীচু করিয়া সাড়ীর আঁচল লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

এই সময় অসিত ঘরে পুনরায় প্রবেশ করায় রাধা হাসিয়া বলিল—বাবা, বাবা! তোমার আর তর্‌ সয় না—আমরা একটু গল্প করছি—'

অসিত। তা কর্‌না, তোকে বারণ করেচে কে? আমি শুধু একবার দেখ্‌তে এসেছিলাম, ঘরটা কেমন দেখাচ্ছে।—আজ ভারী সব নতুন নতুন ঠেক্‌ছে; না রাধা? তোরা গল্প কর্‌, আমি এখানে একটু চুপ্‌ করে বসে থাকি, কিছু মনে করিস্‌ নি, আমাকে ভুলে যেতেও পারিস্‌, আমি কোন কথা ক'ব না।

রাধা হাসিয়া বলিল—বউ পাগলা বুড়ো! নাও, ঢের হয়েছে, এইখানেই ব'স, আমি একটু কাজ কর্ম্ম দেখে আসি।

অসিত। না, তা হবে না তুই ব'স্‌ নইলে আমি এক মিনিটও টি'ক্‌তে পার্‌ব না।

কথা বলিতে বলিতে অসিত একটি সিগারেট্‌ বাহির করিয়া দীপ্তির দিকে চাহিয়া বলিল—যদি খাই তোমার খারাপ লাগ্‌বে?

দীপ্তি মাথা নাড়িয়া জানাইল—না। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

রাধা দুই জনকে দেখিয়া একবার কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল—তোমার না হয় বসে থাক্‌লেই চল্‌বে কিন্তু আমার চলে কি করে? সকলকে ডেকেছ বিকালে এখানে খাবার জন্তে, তার জোগাড় কর্‌তে হবে না?

কথা কয়টি বলিতে বলিতে উঠিতে গিয়া সে দেখিল, তাহার আঁচলটি দীপ্তি

চাপিয়া ধরিয়া আছে! এবং মিনতিপূর্ণ চোখে নীরবে সে তাহাকে থাকিবার জন্ম নিবেদন জানাইতেছে!

রাধা হাসিয়া অসিতকে বলিল—দেখ্‌ছ দাদা, বৌ আমাকে এরই মধ্যে কত ভালবেসেছে!

অসিত এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—হিংসেয় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

কথাগুলি বলিবার সময় সে একবার দীপ্তির মুখের দিকে তাকাইল, কিন্তু সেখানে এমন কিছুই সে দেখিতে পাইল না যাহাতে তাহার মনে হইতে পারে, দীপ্তি তাহাকে অনেকখানি নিকটতর করিয়া লইয়াছে। কল্যকার দীপ্তির সহিত আজিকার দীপ্তির কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই! সে তেমনই স্তব্ধ, আপনার চিন্তায় আপনি বিভোর, মাঝে মাঝে শুধু সে চারিদিকে ভয়চকিত চাহনি দিতেছে। সে চাহনিতে একান্ত নিরুপায়ের বেদনা সুস্পষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে!

অসিত কি মনে করিয়া উঠিয়া বলিল—আচ্ছা তোরা ব'স্, আমি আমার ঘরটা একবার গুছিয়ে আসি।

অসিত চলিয়া যাইবার পর দীপ্তি মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল। রাধা তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—তোমার খুব আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে, না ভাই? বিয়ের পর বৌ ঘরে এল কিন্তু আমি ছাড়া আর কোন আত্মীয় তোমাকে আদর ক'রে বরণ ক'রে নিতে এল না! আমাদের আত্মীয় অনেক আছেন কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ অনেকদিন আগে ছিঁড়ে গেছে। হয়ত আমি ছাড়া আর কেউ এ বাড়ীতে আস্‌বেও না কোন দিন। দাদার কাছে সব শুন্‌তে পাবে। অনেক দুঃখ বিপদ এড়িয়ে এই মানুষটা পা রাখ্‌বার মত একটু জায়গা করে নিতে পেরেছে। আগেকার দিনগুলোর কথা মনে হ'লে আমার বুক ফেটে যায়। সে সব কথা আজ আর এই সুখের মধ্যে আন্‌তে চাই না। একদিন সব জান্‌তে পারবে। তুমি এই ঘরের লক্ষী, তোমার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে এ ঘরকে পবিত্র করে তোল—আর কি বলব ভাই, আমায় চুমু খাবে না? এমন মিষ্টি মুখখানি তোমার!

রাধা তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি দীপ্তির মুখের উপর চাপিয়া ধরিল।

বিদ্রোহ সেই খানেই প্রবল হইয়া উঠে, যেখানে মানুষ বিদ্রোহ দমনের জন্ম পাশবিক শক্তির প্রয়োগ করে। কিন্তু বিনা বিচারে এবং প্রতিবাদে মানুষ যখন তাহার সমস্ত অধিকারের দাবী বিদ্রোহীর হস্তে সমর্পণ করে, বিদ্রোহী সেখানে

অত্যন্ত ছোট হইয়া যায়, বিদ্রোহ করাও অসম্ভব হইয়া উঠে। দীপ্তি তাহার ভ্রান্তি এবং কর্ম্মফলকে উপহাস করিয়া এই গৃহের প্রত্যেকটি কাজ প্রত্যেকটি অধিকারের দাবীকে অস্বীকার করিবার জন্য তাহার মনকে নির্ম্মম করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কোন করুণা বা স্নেহের দুর্ব্বলতার ভিতর দিয়া এ গৃহের কোন কিছুকে এতটুকু শান্তি সে দিবে না, ইহাই ছিল তাহার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু এখন বুঝিল তাহা কত দুঃসাধ্য!

অসীম ক্ষমতাশালী বিষয়-বুদ্ধিমান স্বার্থপর অসিত, করুণা-প্রার্থীর মত বলিতেছে—'এ বাড়ীর সমস্তই যেন নতুন নতুন ঠেকছে! এখানে একটু বসি, খুব ভালো লাগ্‌বে—'

রাধা বলিতেছে—'তুমি এই ঘরের লক্ষ্মী, তোমার সোনার-কাঠি ছুঁইয়ে এই ঘরকে পবিত্র ক'রে তোল—'

ফুলের মালার গ্রন্থি ফাঁসির মত নিবিড়ভাবে যেন দীপ্তির গলায় চাপিয়া বসিতে লাগিল। সে চাহে মুক্তি! কিন্তু স্নেহের সঙ্গে বিদ্রোহ সম্ভব হইবে কি প্রকারে? অন্তরের বিপুল অশান্তি চাপিয়া দীপ্তি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

নারীর মন নারীই ভাল বোঝে। দীপ্তির এই স্তব্ধতার মধ্যে রাধা যেন দেখিতে পাইল, এই বিবাহের মন্ত্রটি, ঠিক ভাবে বলা হয় নাই। অনেকখানি অনিচ্ছার ভাব রহিয়া গিয়াছে। এ কথা প্রথম হইতেই তাহার মনে হইয়াছিল। মন্ত্র যেখানে হার মানে, মানুষের স্বাভাবিক শক্তি সেখানে হয়ত কিছু কাজ করিতে পারে এই আশায় দীপ্তির হাতখানি আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—মা'র স্নেহ পাইনি কোন দিন, খুব আশা হচ্ছে, তুমি আমাদের এ অভাব ঘুচিয়ে দেবে—'

দীপ্তির নিষ্ঠুর মনের কাছে আহতের আরক্ত আঁখি যেন দীনভাবে নিবেদন জানাইয়া গেল—সবাই মেরেছে, তুমিও মেরো না—একটু শান্তি দাও—'

যে বেদনা আপনার বুকে দিনরাত্রি গুমরিয়া মরিতেছিল, সহসা তাহা এক ঝলক জলের আকারে তাহার চোখে আসিয়া দেখা দিল। এইবার প্রথম সে রাধার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে বলিল—কি আশ্চর্য্য ভাই, তোমাকে ঠিক আমার মনীষা মাসীর মত দেখ্‌তে। তেমনই ছোট্ট তুমি, তেমনই মিষ্টি তোমার মুখের কথাগুলি!

রাধা আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—তোমার মনীষা মাসীর মত আমার দেখ্‌তে? তবে ত আমায় ভাল বাসতেই হবে, কিছুতেই ঠেলতে

পারবে না।—মিষ্টি? না না আমি মিষ্টি নই, আমার হাড় পাঁজর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে, আমার জোর ক'রে বলবার কোন শক্তি নেই, তাই হয়ত আমাকে মিষ্টি লাগে। আমি বেঁচে আছি সবার দয়ার ওপর; সকলের দয়া কুড়িয়ে, সকলকে তুষ্ট ক'রে আমি চলেছি। তবু পারি কি চলতে? পারি না। মানুষ যে আরো চায়, কিন্তু আরো দেবার ক্ষমতা আমার দিন দিন কমে আসছে—আমি যে কিছুই পাই না।

এ মানুষের কাছে মানুষের কান্না! দীপ্তির বিমুখ মন ধীরে ধীরে ঘুরিয়া আসিয়া রাধাকে বুকে তুলিয়া লইতে চাহিল। দুইজন দুইজনের চোখের দিকে চাহিয়া একবার দেখিয়া লইল। হাসি-কান্না-মাখা মুখে রাধা বলিল—কি দেখ্ছ ভাই?—

দীপ্তি। কি দেখ্ছি জানি না, হয়ত জানি। হয়ত বুঝি না, হয়ত বুঝি, তবু ইচ্ছে করছে তোমার সব কথা তোমারই মুখে শুনি। আমি এখনও তোমাদের সংসারে নিজেকে মেশাতে পারি নি, তবু যদি বল—তোমাদের বাড়ীর বৌকে নয়, দীপ্তিকে, অত্যন্ত সাধারণ একটা মেয়েকে'—'

রাধা ম্লান হাসিয়া বলিল—সাধারণ মেয়ে? তাহলে আমি কি এতক্ষণ তোমার কাছে থাকতাম? বলতে ত আমি চাই, কিন্তু শোনবার লোক আজ প্রায় পনের বছরের মধ্যে পাইনি, এতদিনের না-বলা কথা আজ হঠাৎ যদি বলি সে কেমনতর ঠেকবে যে! আমাদের বাড়ীর বৌ ভেবে ত তোমার কাছে আসিনি, আমি এসেছি একটি মানুষের কাছে, যদি সে আমায় ভালবাসে, যদি সে আমার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দেয়।—বড় দুর্লভ ও জিনিসটা পাওয়া, তার কারণ বোধ হয় সবাই শুধু পেতেই চাই, দেবার কথা কারো মনে থাকে না।

—আমার প্রথম মেয়ে আমার স্বামীর পদাঘাত বুকে নিয়ে অসময়ে আমার কোলে এল। কিন্তু পৃথিবীর আলো-বাতাস তার সইল না—তখন আমার পুতুল-খেলার বয়স কাটেনি।

—তারপরেও তিনটি সন্তান এই স্বেচ্ছাচারী স্বামীর অত্যাচারে পৃথিবীতে এসেই বা আসবার পূর্ব্বেই বিদায় নিয়েছে।—শেষের দুটিকে পেয়েছি, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছি কিন্তু এত কষ্টেও বেঁচে থাকার জন্যে স্বামীর অশ্রদ্ধা আমার ওপর বেড়েই চলেছে। গরীবের স্ত্রীর পক্ষে মা-হওয়া নাকি অন্যায়। টানাটানির সংসারে মুখের সংখ্যা যদি বেড়েই চলে অসুবিধে হবে না?—

কথা কয়টি শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র শ্বেত হাসি রাধার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল।

দীপ্তি কোন কথা না বলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মন-গড়া সংগ্রামের কাছে এই নারীর অসংখ্য নির্য্যাতন এবং অপমানের তীব্রতা তাহার চোখের সম্মুখে অত্যন্ত ভীষণ ভাবে ফুটিয়া উঠিল। সে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া রাধার হাত ধরিয়া বলিল—মানুষ হয়ে এত অত্যাচার সইতে পারে আমার জানা ছিল না। তুমি সইলে সব?—

রাধা ম্লান হাসিয়া বলিল—সইব না? সহ্য করা ছাড়া আমরা আবার কি করতে পারি?

দীপ্তি। কিছু না?

রাধা। না।—কিন্তু বিয়ের কনের কাছে এসব কথা বলা ঠিক নয়, তোমাকে আর একজন লোকের কথা বলি। তুমি মক্‌বুল আলীকে নিশ্চয়ই খুব চেন?—

দীপ্তি। মক্‌বুল আলী? সে কে?

রাধা হাসিয়া বলিল—চেন না, তোমার স্বামী।

দীপ্তি। আমার স্বামী?

রাধা। হাঁ গো হাঁ শ্রীঅসিত বিশ্বাস। ওরই নাম ছিল মক্‌বুল আলী। ঐ নাম নিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে ও বিলেত পালায়।

দীপ্তি। খালাসী হয়ে! কেন?

রাধা। কি করবে? সহায় সম্বলহীন নিগৃহীত বালক। কিন্তু বুকে তেজ ছিল, শক্তি ছিল, তাই আজ ও উঠে দাঁড়িয়েছে। নইলে আমার মতই ধুলোয় এতদিনে মিশে যেত।

—ওর বাবা ছিলেন সুধাপুরের জমিদার, আমার বাবা তাঁর ছোট ভাই। ও আমার জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে। ওর বাবাকে আমার বাবা বিষ খাইয়ে মারেন। যে লোকটা এ সমস্ত জানত, আমার বাবা তার মুখ বন্ধ করেছিলেন—আমাকে আর কিছু নগদ টাকা দিয়ে। আমি খুনীর মেয়ে, খুনীর স্ত্রী। সে যাক গে। তারপর শোন:—

জ্যাঠামশায় মারা যাবার পর আমার বাবা লোক-দেখান স্নেহ দেখিয়ে আমার ভাইএর অভিভাবক হলেন; ও তখন সহরে পড়্‌ত। তারপর কিছুদিনের মধ্যে তার মাসহারা বন্ধ হ'ল। কূল কিনারা কিছু না দেখ্‌তে পেয়ে আমার

ভাই খালাসীদের সঙ্গে ভাব করে ঐ ছদ্ম নাম নিয়ে দেশ ছাড়ে। তারপর এই পনের বছরের পর ওকে ফিরে পেয়েছি—পেয়েছি ভাই, তুমিই ওকে ফিরিয়ে এনেছ।

—তখনকার ওর সব চিঠি আমার কাছে আছে ভারী মিষ্টি; একবার লিখে ছিল—জানিস্ রাধা, লক্ষপতির ছেলে হ'য়ে চোরের মত পুলিশের নজর এড়িয়ে একটা জঘন্য হোটেলে কাজ নিয়েছি। যখন খিদে পায়, মানুষের ফেলে-দেওয়া আধখানা খাবার খাই। মন্দ যাচ্ছে না দিনগুলি। যত দুঃখ পাচ্ছি, বাঁচ্‌বার জন্যে ততই ইচ্ছে করছে। ফির্‌ব কিনা, জানি না, যদি ফিরি তোর আশীর্ব্বাদেই ফির্‌ব, আর তোর জন্যেই ফির্‌ব। তোর আর আমার কথা যখন মিলিয়ে দেখি, মনে হয় আমি ঢের ভাল আছি, আমার জন্যে বাইরের খোলা আলো-বাতাস কেউ বন্ধ করতে পারে নি, কিন্তু তোর তাও নেই।

—আমার বাবা মা আত্মীয় স্বজন সকলকে ছেড়েছি; ঐ দুঃখী ভাই আমার একমাত্র সম্বল।—ঐ না দাদার পায়ের শব্দ? ও আস্‌ছে!—হাস হাস, চেষ্টা ক'রেও একবার হাস—বলিতে বলিতে রাধা দুই হাতের মধ্যে মুখ রাখিয়া হাসিতে হাসিতে চোখ মুছিতে লাগিল।

রাধার এই অভিনয়ের করুণ মাধুরী দীপ্তির মনের উপরও অনেকখানি রেখাপাত করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে উদাসীনতার আভাষ তাহার মুখে ফুটিয়া ছিল, এখন তাহা অনেকখানি সরিয়া গিয়াছে এবং সে নিজেও ইহা অনুভব করিতে ছিল।

এই সময়ে অসিত ঘরে ঢুকিয়া বলিল—না রাধা, এবার সত্যি আমার হিংসে হ'চ্ছে কিন্তু খিদে পেয়েছে তার চেয়ে বেশী।

রাধা। ওমা তাইত! বেলাও ত কম হয়নি! চল ভাই বৌদি তোমায় স্নান করিয়ে আনি।

দীপ্তিকে লইয়া চলিয়া যাইবার সময় অসিতকে দেখিয়া অবাক হইয়া রাধা বলিল—ওকি! অত ধূলো মাখ্‌লে কি করে? ফুর্ত্তিতে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলে নাকি?

অসিত হাত ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল—প্রায় তাই। দীপ্তির জন্যে দক্ষিণ দিকের ঘরটা সাজিয়ে এলাম। আমার ঘরটা হবে Common room, ওরটা হবে ওর Private—

রাধা। মানে?

অসিত। মানে আর কি? বিয়ে করেছে বলে কি একটা ঘরও নিজের জন্যে থাক্‌বে না নাকি?

দীপ্তিকে টানিয়া রাধা বলিল—চল ভাই দেখে আসি।

মাঝের একটি হল্ এবং ছোট একটি ঘর পার হইবার পর দীপ্তিকে লইয়া রাধা অসিতের ঘরে আসিয়া দেখিল, বহু যত্নে যে সমস্ত সামগ্রী আসিত তাহার ঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা সমস্ত সে পাশের ঘরটিতে আনিয়া রাখিয়াছে! একটি বিছানা, লিখিবার টেবিল একটি, আয়নাযুক্ত বড় আলমারি এবং ঘরের এক কোণে Japanees screenএর আড়ালে ছাড়া-কাপড় রাখিবার আলনা ইত্যাদি এবং দেওয়ালে লর্ড লেটনের আঁকা একখানি ছবি—'Wedded', ইহা ছাড়া আর কোন সরঞ্জাম নাই!

রাধা অবাক হইয়া বলিল—কি আশ্চর্য্য ভাই! বিয়ের আগের দিন পাশাপাশি দুখানা খাট রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই দিকে তাকিয়েছিল, আজ তার একটিকে সরিয়ে ও-ঘরে রেখেছে!

দীপ্তির সর্ব্ব শরীরের ভিতর দিয়া হিম-শীতল এক স্রোত যেন তাহাকে অসাড় করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া গেল! দীপ্তির মুখের দিকে চাহিয়া রাধা বলিল—এর মানে কি ভাই?—

রাধার কথায় সহসা দীপ্তি তাহার পূর্ব্বের মনের অবস্থা ফিরিয়া পাইল। অল্প একটু হাসিয়া বলিল—বিয়ে একটা বন্ধন কিনা, তাই উনি হয়ত করুণা ক'রে আমাকে মুক্তির মধ্যে রাখ্‌তে চাইছেন।

দীপ্তির কথার অর্থ না বুঝিয়া রাধা হাসিয়া বলিল—তাই? না দুটো বিছানা পাশাপাশি থাক্‌লে অনেকটা জায়গা বাজে খরচ হয়, সেই জন্যে একটাকে বিদেয় দিয়েছে?—

দীপ্তি। তাও হ'তে পারে।

রাধা। কিন্তু খাবার সময় বিছানা নিয়ে তর্ক কর্‌লে ত আর পেট ভর্‌বে না, চল এখন স্নান কর্‌বে।—বিছানা রহস্যটা তুমিই বুঝো, ওতে আমার হাত নেই।

রাধা কথা কয়টি বলিয়া দীপ্তির গাল একটু টিপিয়া দিল।

আহারের পর বসিবার ঘরে আসিয়াই রাধা মাথা-ধরার অছিলায় কপাল টিপিতে টিপিতে তাহার ঘরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল; এবং অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসিয়া থাকিয়াও বলিবার মত কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া অসিত

বলিল—একটা কথা ভাবছিলাম দীপ্তি, তোমার শরীর যদি না ভাল থাকে তাহ'লে যাদের আজ বিকেলে এখানে খেতে বলেছি তাদের বারণ করে পাঠাই।

দীপ্তি মাটির দিকে তাকাইয়া বলিল—আমার শরীর ভালই আছে।

অসিত। তাহ'লে ওরা আসুক ?—

দীপ্তি মাথা নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

তাহার পর আবার নীরবতা ধীরে ধীরে দুইজনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং বহুক্ষণ ধরিয়া এই প্রাণান্তকারী নীরবতার কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অসিত বলিল—আমার একটু কাজ আছে দীপ্তি, সেগুলো একটু দেখ্‌ব, তুমি তোমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর, কাল থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ত জিরবার ফুর্‌সুৎ পাও নি।—'

দীপ্তি ইহারই পথ চাহিয়া ছিল কিন্তু ছুটী পাইয়াও সে উঠিতে পারিল না! কিসে যেন তাহাকে ধরিয়া রাখিল!

দীপ্তির নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া অসিত বলিল—বাড়ীটা প্রকাণ্ড নয়, বেশী গোলমাল লাগ্‌বে না তোমার।—ঐ হল্‌টার বাঁ দিকেই রাধার ঘর কিন্তু তোমার ঘরে যাবার আলাদা দরজা নেই, আমার ঘরের ভিতর দিয়েই যেতে আস্‌তে হবে।

অসিত তাহার ঘরে আসিয়া বহুক্ষণ কাজের এবং ব্যস্ততার ভান করিয়াও যখন দেখিল, দীপ্তি আসিল না, তখন সে রাধার ঘরের কাছে আসিয়া বলিল—ওরে রাধা, জানিস্ আমি ব্যবসাদার মানুষ, একরাশ কাজ ঘাড়ে চাপান আছে। তুই দীপ্তির কাছে একটু থাক্‌না। বেচারী একলাটি রয়েছে!—

রাধা ঘরের বাহিরে আসিয়া রাগের সুরে বলিল, বাবা, কি ছেলে! খালি কাজ আর কাজ; বৌটাকে একটু দেখ্‌তে পার না? চিরকাল কি আমি থাক্‌ব নাকি?

অসিত। এখন ত দেখ্‌, পরের কথা পরে হবে।

রাধা বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিল দীপ্তি তেমনি বসিয়া আছে। অনেক রকমের অনেক কথা তাহার মনে উঠিলেও সে হাসিয়া বলিল—কি অত্যাচার ভাই!—তা তুমি ওর কাগজ পত্তর সব কেড়ে নিতে পার্‌লে না? চল আমার ঘরে।

দীপ্তি যেন বাঁচিয়া গেল। কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি রাধার মুখের উপর তুলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপরাহ্নে, অসিতের নিমন্ত্রিত কয়েকটি বন্ধু এবং তাহাদের স্ত্রী আসিয়া নবদম্পতিকে শুভইচ্ছা জানাইয়া কিছু কিছু যৌতুক দিয়া বহুক্ষণ আলাপ এবং জলযোগ করিয়া যখন বিদায় লইল তখন অনেকটা রাত হইয়াছে, এবং রাতের মতই একটি কালো ছায়া নিবিড় হইয়া দীপ্তির মনের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা অসিতের দৃষ্টি এড়াইল না।

তিনজনে বসিয়া গল্প করিবার পর রাধা তাহার ঘরে গেলে, দীপ্তির মনের ভয় মুখে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া অসিত বলিল—দীপ্তি তোমার বিশ্রামের সময় হয়েছে, আর একমিনিটও তোমাকে এ রকম ভাবে বসে থাকতে দিতে পারি না।—এস।

আপনার অজ্ঞাতসারে দীপ্তির কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল—কোথায়?

অসিত। তোমার ঘরে। এস আর দেরী নয়।

দীপ্তি উঠিয়া কম্পিত পদে অসিতের অনুসরণ করিয়া চলিল। অল্প একটু পথ কিন্তু ইহারই মধ্যে যেন তাহার জীবনের মহাযাত্রার নির্দ্দেশ রহিয়াছে!

দীপ্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের কাছে আসিয়া অসিত বলিল—এই তোমার ঘর, সব জিনিস তোমার হাতের কাছেই পাবে। তোমার বিছানাতেই আলোর সুইচ্ আছে, ইচ্ছা করলেই জাল্‌তে বা নিভাতে পারবে।

কথা বলিতে বলিতে দীপ্তিকে লইয়া তাহার ঘরে আসিয়া দেখাইল—এইখানে জলের কুঁজো আছে—তোমার ড্রেসিং টেবিল ঐ জানালার ধারে, ঐ ছোট কুটুরিটা কাপড় ছাড়্‌বার ঘর, তার পরেই স্নানের ঘর। এই ঘরটায় বেশ আলো-বাতাস আসে, বিশেষ কষ্ট হবে না বোধ হয়। আর তোমার আর আমার ঘরের মাঝে ঐ পর্দ্দাটা ফেলা থাকল, ভয় পেও না, ওটা ঠেলে আমি তোমার ঘরে আসব না—কালকের ঘটনার পর আমার মনে হয়েছে, স্নেহ দিয়েও আমরা মানুষের ওপর অনেকখানি অত্যাচার করে ফেলি। কিন্তু ভুল আমার যখন জান্‌তে পেরেছি তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি আসি—

কথা শেষ করিয়া পর্দ্দা সরাইয়া তাহার ঘরে যাইবার সময় একবার দীপ্তির মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে অসিত বাহির হইয়া গেল।

অসিত চলিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ দীপ্তির কিছু করিবার শক্তি যেন ছিল না। আপনার কোন ভাবনা সে যেন ভাবিতেও পারিতেছিল না। শুধু বার বার তাহার মনে হইতে ছিল—আশ্চর্য্য মানুষ! এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মন বেদনায় ভরিয়া উঠিতে ছিল। কিন্তু এ ত মুক্তি নয়, এ যে বন্ধনকে আরও

কঠিন করিয়া দিল! বুঝি অত্যাচার করিলে মুক্তি সম্ভব এবং সহজ-লব্ধ হইত!

দীপ্তি অসহায় ভাবে বিছানায় আসিয়া আলো নিভাইয়া দিল, কিন্তু সেখানে শুইতে পারিল না। ঘরের মাটিতে অবসন্নভাবে লুটাইয়া পড়িল। প্রবল একটা ক্রন্দনের বেগ তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। দীপ্তি প্রাণপণে তাহা চাপিল কিন্তু নীরব অশ্রু বাধা মানিল না তাহা তাহার গণ্ড ভাসাইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার বেদনাহত মন যখন বাহিরের সমস্ত জিনিসকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা ফিরিয়া পাইল তখন দেখিল অসিতের ঘরের আলো ও নিভিয়া গিয়াছে এবং কে যেন তাহার ঘরের মধ্যে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রান্তপদে চলিয়া বেড়াইতেছে!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যায়, সে চলার বিরাম নাই! দীপ্তির চোখে তন্দ্রাও আসে না, তাহার মাথার মধ্যে ঐ চলার শব্দ যেন লাগিয়াই রহিল।

পৃথিবীর সমস্ত শব্দ থামিয়া গিয়াছে, রাত্রির গভীর স্তব্ধতা, বহুদূরের এমনি আর একটি চলার শব্দের প্রতিধ্বনি বহিয়া আনিয়া দীপ্তির বুকে ধাক্কা দিয়া গেল! সে শব্দ এমনই শ্রান্ত, এমনই বিরামহীন, হতাশার বেদনায় পূর্ণ।

দীপ্তির বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠিল—মাগো', একি অভিশাপ মাথা পেতে নিয়েছি! . . .

সকাল বেলা চা খাইবার সময় অসিত দীপ্তির সহিত অত্যন্ত সহজ ব্যবহার করিল। তাহার কথায় এমন কিছুই প্রকাশ পাইল না যাহাতে মনে হইতে পারে কোন বিষয়ে বিরক্ত বা অসন্তোষ তাহার বুকে বাসা বাঁধিয়াছে।

বেলা দশটার মধ্যেই সে কাজে বাহির হইবার জন্য সাজিয়া খাইবার ঘরে আসিয়া রাধা এবং দীপ্তিকে বলিল—'শ্যামের বাঁশী' বেজেছে, কিছু দাও নাকে মুখে গুঁজে ছুট দিই।

বয়, টেবিলের উপর সমস্ত সামগ্রী রাখিয়া গেলে, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত আহারে লাগিয়া গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—তোমাদের খাওয়া কি যখন খুসী?—

রাধা হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়ই।

দীপ্তি একটি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তাহার দিকে চাহিয়া অসিত বলিল—চল্লাম দীপ্তি, আবার সেই রাতের বেলায় জ্বালাতে আসব তোমাদের।

হাসিতে হাসিতে সে ঘরের বাহির হইয়া টুপি ও ছড়ি লইয়া সিঁড়িদিয়া নীচে নামিতে লাগিল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার মটরের শব্দ বহুদূরে গিয়া মিশিয়া গেল।

সমস্ত দিন রাধা এবং দীপ্তি ইচ্ছামত গল্প করিয়া কাটাইল। দুই জনেই যেন এই অপ্রতিহত অবসরটুকু প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে ছিল। রাধা বলিল—আমি বোধ হয় এই প্রথম পনের বছর পরে সমস্ত শরীর মন দিয়ে একটু বিশ্রাম কর্‌লাম। নিজেকে নিয়ে একা থাকা এর আগে হয়ে উঠে নি।

দীপ্তি। আমি হ'লে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম।

রাধা। অত সহজ নয়। মানুষের শরীর মন যে কি দিয়ে গড়া তা কেউ জানে না। সব স'য়ে যায়। আমিও ভাবতাম, পাগল হয়ে যাব, কিন্তু হইনি দিব্যি আছি।

সন্ধ্যার পর অসিত ফিরিয়া দুই জনের নিকট হইতে সমস্ত দিনের ঘটনার বিবরণ চাহিল।

রাধা বলিল—আমরা দুজনে সমস্ত দিন অনেক কিছু বলেছি বা করেছি কিন্তু তোমার কথা ভাবা বা তোমার কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা, এ আমরা ভুলেও করিনি।

অসিত। বটে—ভুলেও না?—আমি বিশ্বাস করি না। আচ্ছা দীপ্তি, তুমিই বল, সত্যি কি তাই?

দীপ্তি মহা বিপদে পড়িল। কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। অসিত পুনরায় বলিল—বল, বল্‌বে না?—

নিরুপায় হইয়া দীপ্তি বলিল—আজ বিশেষ কোন কথা হয় নি, তবে কাল অনেক হয়েছিল।

অসিত হাসিয়া বলিল—অনেক কথা? মানে সব বাজে। তোমাকে রাধাটা যা তা সব বলেছে নিশ্চয়ই?—আর তুমিও সব বিশ্বাস করেছ?—

দীপ্তি মাথা নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

দীপ্তির মুখের এই কয়টি কথাতেই অসিত মনে মনে অত্যন্ত সুখী হইয়া উঠিল। সে কথার পর কথার জাল বুনিয়া দীপ্তির মনকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। দীপ্তির আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া ছেলে মানুষের মত বলিল—ওর যা তা কথা কেন বিশ্বাস কর্‌লে তুমি?—

দীপ্তি আর কোন উত্তর দিল না, তাহার কপালে অশান্তির রেখা দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অসিতের মুখের হাসিও ম্লান হইয়া গেল।

দুইজনের কথার মধ্যে রাধা কখন চলিয়া গিয়াছে। সে থাকিলে বোধ হয় অনেকখানি শান্তি দুইজনে পাইত—অন্তত কথা বলার জন্য এমন করিয়া ভাবিয়া মরিতে হইত না। ব্যথিত কণ্ঠে অসিত বলিল—আমি অপরিচিত হলে বোধ হয় তুমি এর চেয়ে সহজ ভাবে কথা বল্‌তে পার্‌তে না দীপ্তি?—

দীপ্তির চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। সে তাহা থামাইবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আমার শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না, আমার ব্যবহার গুলো—

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অসিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া দীপ্তির পাশে আসিয়া বলিল—না আমি কোন অপরাধ নিই নি, তোমাকে কোন দিক দিয়েই আমি সাহায্য কর্‌তে পার্‌ছি না এই কথাটা ভেবেই কেবল খারাপ লাগ্‌ছে আর কিছু না। তুমি যাও তোমার ঘরে রাধাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব কি?

দীপ্তি বলিল—না—আমি একা থাক্‌তে চাই—

অসিত। কাল তুমি সমস্ত রাত জেগে কাটিয়ে ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়েছিলে। আজ মনটাকে হাল্কা করে একটু ঘুমাতে চেষ্টা করগে। শরীর ভাল থাক্‌লে অনেক অশান্তির হাত এড়াতে পার্‌বে, কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়্‌লে হয়ত তা সহজ হবে না দীপ্তি।

দীপ্তি ধীরে ধীরে তাহার ঘরে চলিয়া গেল। অসিত তাহার ঘরে আসিয়া বসিল এবং পূর্ব্ব রাত্রির মত নবদম্পতির আর একটি রাত্রি কাটিল।

তাহার পর আরও কয়েকটি দিন এবং রাত্রি এমনই নিরানন্দ ও অশান্তির ভিতর দিয়া কাটিবার পর একদিন সকালে রাধা হাসিতে হাসিতে বলিল—আমার পরওয়ানা এসেছে, এবার যেতে হবে।

অসিত। যাবি ঠিক করেছিস্‌?—

রাধা। হাঁ।

অসিত। তোর ছেলে মেয়েদের নিয়ে যদি এখানেই থাকিস্‌ তাহ'লে কি হয়?—

রাধা। তা হ'তে পারে না, তার কারণ ত তোমায় বলেছি। তবে মাঝে মাঝে আমায় নিয়ে এসো, তাতেই হবে।

রাধা তখন তাহার ঘরে জিনিস পত্র গুছাইতেছে, দীপ্তি আসিয়া বলিল—তুমি কেন যাবে?—কার কাছে যাবে?—

রাধা। কার কাছে?—কেন সবাই ত রয়েছে, আমার অন্ধ স্থবির শাশুড়ী, দেবতার মত ভাসুর, বালিকা বিধবা একটি ননদ, আর আমার দুঃখ-সাগর মন্থন করা দুটি ছেলে মেয়ে। এরা সবাই আমার পথ চেয়ে আছে। আমি না থাকলে সবার ভয়ানক কষ্ট হয়, অসুবিধার শেষ থাকে না।

দীপ্তি। আর তোমার স্বামী?—ইচ্ছে করে, এই নিগ্রহ মাথায় তুলে নেওয়ার মধ্যে কি সার্থকতা আছে?

রাধা। সে কথা আমার ভাববার দরকার নেই ভাই, আমি জানি, শত চেষ্টাতেও এই পনের বছরের একটি দিনের গ্লানি ও মুছে ফেলতে পারব না। তাই আমি মুক্তির কথা ভাবিও না।

রাধা চলিয়া যাইবার পর অসিত দীপ্তিকে বলিল--এখন দুপুরে একা থাকতে ত তোমার কষ্ট হবে, যদি বল আমি অফিস যাবার সময় তোমাকে তোমার মার কাছে রেখে আসতে পারি আবার ফেরবার সময় নিয়ে আসব, যাবে?—

দীপ্তি সম্মতি জানাইল। এইভাবে একান্ত আপনার হইয়াও অপরিচিতের মত ইহাদের দিন কাটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে কোন বন্ধু আসিয়া অল্প কিছুক্ষণের জন্য দুইজনকে প্রফুল্ল করিয়া দিয়া যায়। এই ক্ষণিকের অতিথিদের আগমন প্রতীক্ষায় দুই জনে পথ চাহিয়া থাকে, কেহ আসিলে বা আসিবার কথা হইলে উভয়েই অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠে। ঐ সময়টুকুর জন্য তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রকৃত স্বামী-স্ত্রীর মত ব্যবহার করে।

কিন্তু উভয়েই বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছিল—মানুষের শক্তি এবং সহের সীমা আছে। এবং এই কথাটি অসিত একদিন রাত্রে দীপ্তিকে তাহার ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবে বলিয়া ফেলিল।

দীপ্তি তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অসিতের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—আমিও তাই ভাব্‌ছি।

অসিত। কি ভাব্‌ছ?

দীপ্তি। এরকম করে বেশী দিন চলতে পারে না, একদিকে এসে দাঁড়াতে হবে।

অসিত। কোন দিকে?—

দীপ্তি। সেটা কাল আমি আপনাকে বল্‌তে পারব বোধ হয়, আজকের মত আমায় ছুটি দিন, এই একটি রাত মাত্র, তারপর—

অসিত। তারপর কি দীপ্তি?

দীপ্তি। হয় আমাকে বা আমার যা কিছু সমস্তই আপনার খুব কাছে পাবেন, নয়, আমি আর এখানে থাকব না। আপনার কাছ থেকে একেবারে দূরে গিয়ে দাঁড়াব।

অসিত। তোমার বিচারের প্রতিবাদ আমি করব না। তা সে যেমনই হ'ক। শুধু আমাকে এই অসহায় অবস্থার বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেল দীপ্তি তোমার কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ থাকব। দিনের পর দিন দেখ্‌ছি আমার চোখের সাম্‌নে শুখিয়ে উঠ্‌ছ! তোমার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিতে পারি না।—এ যে সহ্য করা যায় না দীপ্তি।

অসিতের এই কথায় দীপ্তি এই প্রথম চোখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহা আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে!—কি সুন্দর পুরুষ, কি নির্ম্মম ইহার স্নেহের বন্ধন! দীপ্তির সমস্ত শক্তি যেন ইহার চোখের দৃষ্টিতে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

পরদিন সকালে বাহিরে যাইবার জন্য সাজিয়া দীপ্তি চা খাইতে আসিল। অসিত বলিল—সকালেই যাবে কার কাছে?—

দীপ্তি। না আমার এক বন্ধুর কাছে এখন একবার যাব, সেখান থেকে বাড়ী যাব। সন্ধ্যাবেলা ফিরব।

অসিত। ড্রাইভারকে গাড়ীর জন্যে বলে দেব কি?

দীপ্তি। না, কাল মাকে গাড়ী পাঠাবার জন্যে বলে এসেছিলাম, একটু পরেই আস্‌বে।

অসিত। দীপ্তি, কাল তোমাকে ঐ কথাটা বলে ফেল্‌বার পর আমার মনে হ'ল, আমি অন্যায় করেছি। এত অল্পে তোমাকে বিরক্ত করা আমার উচিত হয়নি।—থাক্ দরকার নেই, তুমি যেমন আছ থাক আমি আর কিছু চাই না, তুমি যেও না, যেটুকু তোমায় পেয়েছি—

কথা বলিতে বলিতে অসিত থামিয়া গেল। তাহার নিজের কথা তাহার কাণে যেন অদ্ভুত ঠেকিতে ছিল! কিছু সংযত হইয়া বলিল—আমাকে এমন দুর্ব্বল কেউ কোন দিন দেখেনি, তোমার কাছে যে ভাবে কথা বল্‌ছি এমন ক'রে আর কারো কাছে বলিনি কোন দিন।—'

দীপ্তি। কেন নিজেকে এমন করে অপমান করছেন?

অসিত। অপমান? তুমি যেদিন থেকে এ বাড়ীতে এসেছ, সেদিন থেকে আমি একেবারে বদ্‌লে গেছি দীপ্তি! আমি নিজেকে দেখে নিজেই এখন অবাক হয়ে যাই! আগে বল্‌তাম জীবনটা 'ব্যবসাদারী'তে চলে, এখন মনে হয় ওটা মস্ত ভুল! দুঃখ অপমান সব সহ্য করা যায় সব অগ্রাহ্য করা যায়।— ভালবাসার মানুষকে পেলে। ভালবাসার শক্তি আমি প্রাণে মনে অনুভব করছি দীপ্তি।

দীপ্তি নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘরের বাহিরে কে বলিয়া উঠিল—গাড়ী আয়া হুজুর——

অসিত ম্লান হাসিয়া বলিল—যাও। কিন্তু এই শেষ, একথা আমি বল্‌ব না—তুমি বল্‌লেও না।

ক্রমশঃ

শ্রী—

সংগ্রহ

কেবল সাজ সজ্জা নহে, আচার ব্যবহারে এ সকল কথা আরো অধিক খাটে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশী প্রথা হইতে যাঁহারা নিজেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহারকে সদাচার সদ্ব্যবহারের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে কিসে? যে ইংরাজের আচার তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা তাঁহারা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়াছেন।

এঞ্জিন কাটিয়া লইলেও গাড়ি খানিকক্ষণ চলিতে পারে—বেগ একেবারে বন্ধ হয় না। বিলাতের ধাক্কা বিলাত-ফেরতের উপর কিছুদিন থাকিতে পারে—তাহার পরে চলিবে কিসে?

* * *

দেশী দরিদ্রেরও সমাজ আছে। দরিদ্র হইলেও সে ভদ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু বিলাতী-সাজা দরিদ্রের কোথায়ও স্থান নাই। বাঙালী-সাহেব কেবলমাত্র ধনসম্পদ্ ও ক্ষমতার দ্বারা আপনাকে দুর্গতির উর্দ্ধে খাড়া রাখিতে পারে। ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইবামাত্র সেই সাহেবের পুত্রটি সর্ব্বপ্রকার আশ্রয়হীন অবমাননার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন তাহার ক্ষমতাও নাই, সমাজও নাই। তাহার নূতন লব্ধ পৈতৃক গৌরবেরও চিহ্ন নাই, চিরাগত পৈতামহিক সমাজের ও অবলম্বন নাই! তখন সে কে?—

'নকলের নাকাল'

———



আলোচনা

একরকম মাছিকে লোকে কাণা-মাছি বলে। এই কাণা-মাছি মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। শতবার তাহাকে তাড়াইয়া দিলেও, সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মানুষের মুখে চোখে বসিয়া তাহাকে প্রায় পাগল করিয়া তোলে। এক এক সময় কাণা মাছির উপর মানুষ এত চটিয়া যায় যে উন্মাদের মত সে তখন তাহাকে একেবারে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে। সকলরকমে বিফলমনোরথ হইয়া মাছির জাতের উপরই হাড়ে হাড়ে চটিয়া থাকে।

আজকাল দেখা যায় কতগুলি মানুষ 'প্রেমের-গল্প' শুনিলেই ক্ষেপিয়া ওঠে। কোনও পুস্তকে বা পত্রিকায় যদি প্রেমের গল্প বেশী থাকে, তাহাহইলে সে পুস্তক বা কাগজ খানাকে পর্য্যন্ত তাহার পাঠ্য-জিনিষের তালিকা হইতে বাতিল করিয়া দেয়। তাহাদের কথায়, ভাবায় মনে হয়, তাহারা যেন প্রেম জিনিষটাকেই অত্যন্ত অবহেলার চক্ষে দেখে। প্রেমকেও ন্যাকামী বলে, যে প্রেমের গল্প বা কবিতা লেখে, তাহাকে ন্যাকা বলে।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যাহাদের ন্যাকা নাম দেওয়া হয় বা যাহাদের লেখাকে ন্যাকামী বলা হয়, এই দুইটিকেই মানুষ আপন মনের অহঙ্কারের অগোচরে বারে বারে জীবনে স্বীকার করিয়া লয়। প্রেম যুগে যুগে মানুষের জীবন-যাত্রার পদচিহ্ন বুকে আঁকিয়া রাখিয়াছে, প্রেমই মানুষকে মরণ তরীতে আশ্রয় দিয়া অমর করিয়া রাখে।

প্রেমের উপর মানুষের এই চটিয়া যাওয়ার ভিতর একটি প্রকাণ্ড ও প্রত্যক্ষ সত্য নির্ভীকভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মানুষ জীবনের কর্ম্ম-চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নাম হীন শতনামেও অব্যক্ত পরমনতোর তলায় বসিয়া তাহার অবসন্ন প্রাণমন লইয়া বিশ্রাম করিতে চাহে। কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার উত্যক্ত হইয়া আপন অভিমানে লাফাইয়া উঠে। মানুষ চাহিয়া দেখে, তাহার চলা, ফেরা, আহার-বিহার, নিদ্রা ও জাগরণকে তুচ্ছ করিয়া আপন মহিমায় দীপ্ত অক্ষয় আকাশের মত এই প্রেম সমস্ত সুর ও বেসুরকে বুকে দোলাইয়া সবার উচ্চে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ধরিতে যাইয়া মানুষ ছুঁইতে পারে নাই।

তাহাকে মারিতে চাহিয়া মানুষ গুহাতলে আশ্রয় লইয়াছে, মানুষ মরিয়াছে, কিন্তু আকাশ মরে নাই। তাহাকে উপেক্ষা করিবে বলিয়া মানুষ চোখ ফিরাইয়া লইয়াছে, কিন্তু মনের-গহন-কুৎসিত অন্ধকারে উন্মাদ হইয়া মানুষ আবার চোখ তুলিয়া ঐ আকাশেরই দিকে চাহিয়াছে।—কিছুতেই এই অমৃতের ব্যাপ্তি হইতে মানুষ মুক্তি পায় নাই।

এই প্রেমকে লইয়া তাই মানুষ এত সুরে এত ছন্দে, এত ত্যাগে ও আনন্দে ভাবার সূত্রে গাঁথিয়া গিয়াছে। আজকের মানুষও তাহাকে উপলব্ধি করিয়া তাহার সমাপ্তি দেখিতে চাহে। তাহার এই চেষ্টার ভিতর যাহা কিছু শেষ হইয়া যায় তাহার মূল্যও কম নয়। সমস্ত অসারতা, বিফলতা বা আনন্দকে বা মিলাইয়া তুলিয়া যে নিরবচ্ছিন্ন প্রসন্নতা মানুষকে সবার অধীন করিয়াও মুক্তির চন্দন-চিহ্ন কপালে আঁকিয়া দেয়, তাহাই মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করিয়া বাছিয়া লওয়ার নামহীন-চিহ্ন।

গান থামিয়া যায়, সুর বাতাসের গায় বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু সেই সুরের স্মৃতির সমাপ্তি নাই। গানের তিনটী বিকাশ। গানের ভাষা তাহাকে পরিচয় করাইয়া দেয় যে সে জীবন্ত, সে আছে। গানের ভাব তাহার ভিতরে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহাই বুঝাইয়া দেয়। আর গানের সুর সেভাব বা জ্ঞানকে ব্যক্ত করে। তাই তাহার সমাপ্তি নাই। গানের তালে, শমে গানের শেষ হয় না। তাল শম প্রভৃতি সকল কিছু থামিয়া যায় কিন্তু সুরকে জড়াইয়া ধরিয়া, গানের রচনা ও জ্ঞান লোক হইতে লোকান্তরে বাঁচিয়া থাকে। এই ব্যক্ত করিবার চেষ্টা যেদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা কেহ জানেনা, ইহার যে সমাপ্তি কখন হইবে তাহাও কেহ জানে না।

প্রেমের গল্পগুলি মানুষের জীবনের গান। ইহার ভিতরে রচনা আছে, জ্ঞান আছে, প্রকাশ করিবার চেষ্টা আছে। এই চেষ্টা অমর হইয়া রহিয়াছে। নানা ভাষায়, নানা ভাবে, নানা সুরে এই গান, এই প্রেম সকলদেশে জন্ম, জীবন ও মরণের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ ও সত্য হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রেমকে যাহারা লুটিয়া লইতে চাহিয়াছে, তাহাদের লুঠ্-করা-ধন-নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। যাহারা তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহিয়াছে, তাহারা অবসাদের দৈন্যে জর্জ্জরীত হইয়া রহিয়াছে। যাহারা প্রেমকে জীবনের ভিতর আনন্দের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছে তাহারা সকল ব্যথার প্রদীপ জ্বালাইয়া অনন্ত ও অবিনশ্বরের আরাধনা করিতে পারিতেছে। এই আরাধনার ভিতরই মানুষের বাঁচিবার চেষ্টা চলিয়াছে। আহার, বস্ত্র, গৃহ ও সম্পদ আহরণ করিবার আয়োজন চলিয়াছে। মানুষ যে বাঁচিয়া আছে, তাহার যে জ্ঞান লাভ হইতেছে, তাহার যে ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা ও শক্তি আছে এ সকলই অনন্ত যাহা, অমৃত যাহা তাহাকে স্বীকার করিবার আরাধনায় তাগিদ্। তাই জীবনের সমস্ত দিক্‌দিয়া মানুষের প্রেম সবার উপরে অক্ষয় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই প্রেমকে বারে বারে অস্বীকার করিয়াও বাঁচিতে না পারিয়া মানুষ প্রেমকে উপহাস করে, বন্দনা করে, স্বীকার করে। মানুষের জীবনের

ছোট বড় অনেক সংগ্রামের ভিতর যাহা ঘটিয়া উঠে তাহাই গল্প। এই গল্পগুলি, মানুষের মনের গানের অনন্তকালের অসমাপ্ত সুর। এই সুরের ভিতর কোথাও শ্রান্তি নাই। ক্ষীণধারা স্রোতের মত গর্ত্তে পড়িয়া হারাইয়া যাওয়ার মত এই সুর-ধারা নয়! এই প্রেম অসত্যের সহিত সন্ধি করেনা, অপ্রেমের সহিত দ্বন্দ্ব করে না, সুবিধা ও সুযোগের সহিত দেনা-পাওনার ব্যবস্থা করেনা। আত্মার সমস্ত স্বাধীনতা ও তাহার সমস্ত সৃষ্টিকে আপনার প্রেমের ভিতর পর্য্যবসিত করিয়া দিয়া আত্মা যে অধীনতায় অভ্যস্ত হয় তাহা সুন্দর এবং শিব। যাহাকে ভালবাসে তাহার ভিতর-নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া মানুষ যে চির-যৌবন-উল্লসিত মানুষকে খুঁজিয়া পায়, সে মানুষ ফুল দেখিয়া হাসে, বাতাসে আনন্দের সঙ্গীত শোনে, আকাশের গায়ে অভিমানে মেঘের বজ্রনির্ঘোষ শুনিয়া সে তাহাকে নিজের জ্ঞানের কথা গান করিয়া শুনাইতে চাহে। নিজের চারিধারের গোচর পৃথিবীকে করপুটে ধারণ করিয়া অগোচরের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে।

নিজের জীবন ও পরের জীবনের কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া কল্পনার আলোকের সম্মুখে বসিয়া মানুষ যে প্রেমের গল্প রচনা করিয়া যায় তাহা সত্য, স্বাভাবিক ও অমর। গল্প না পড়িয়া, গল্প না লিখিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে, কিন্তু জীবনের পদে পদে যে অজস্র গল্প গড়িয়া চলে, তাহার বিরাম নাই। বিরামহীন এই খণ্ডগল্প গুলিকেই কবি ও লেখক ভাষায় গাঁথিয়া নাম-করণ করে। এবং সেগুলিকে অস্বীকার করিবার শক্তি নাই বলিয়াই প্রেমের গল্প কতগুলি মানুষকে কাণা-মাছির মত বিরক্ত করিয়া তোলে। এই মানুষগুলির অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষার ভিতরও হয়ত এই গল্পগুলি লেখা হইয়া গিয়াছে, লেখা হইতেছে—বা লেখা হইবার সম্ভাবনা আছে। মানুষের আত্মঅভিমান এত শক্তিমান যে তাহা মানুষকে আত্মহত্যা করিতে পর্য্যন্ত উত্তেজিত করে। প্রেম সে আত্মঅভিমানকেও জিনিয়া দেয় বলিয়াই প্রেমের গল্প রচনা হয় আর তাহা যে উপেক্ষার বস্তু নহে তাহা মানুষকে অন্ততঃ মনে মনে স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

লোহার শিকল ছিন্ন করবার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু ফুলের শিকল দ'লে যাবার মত নির্দ্দয় শক্তি ত নেই আমার।

'ব্যথার-দান'

দুজনে

—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাঁধে তোমার মাথা আমার আজ
রাখ্‌ব ক্ষণেক তরে
চেরি ফুলের মধুর বাসে যবে
যাবে গো মন ভরে' !
রাতের গানে আর প্রেমেরি গানে
ভরবে মোদের মন ;
দেখ্‌তে দাও গো স্বপন মোরে সখী
শুধু খানিকক্ষণ !
বেশি কথা বল্‌ব না ক' আজি,
বল্‌ব দু'চার কথা ;
জোছনালোকে তোমার পাশে বসি'
সুখ যেন সে ব্যথা !
এমন গভীর সুখের সময় প্রিয়ে
চেয়ো না চুম্বন ;
দেখ্‌তে দাও গো স্বপন মোরে সখী
শুধু খানিকক্ষণ !
চুমা বাচাল, গোপন কথা সে যে
ফেলে প্রকাশ করি !
মৌন থাকা বড়ই মধুর সখী
মনের মাঝে ধরি
সেই কথাটি, তোমার কাণে যাহা
বল্‌তে অসীম সুখ।
এস প্রিয়ে ঘুমাই ধীরে দোঁহে
বুকের পরে বুক !
দেখ চেয়ে আকাশতলে আজি
কাঁপচে কেমন তারা,
স্বপন আজি দেখ্‌তে গো সাধ মম
হয়ে আপন হারা !
তোমার সাথে কইতে দু'চার কথা
চাইছে আমার মন,
'আজকে প্রিয়ে ঝরণাধারে বসি'
চেয়ো না চুম্বন !*

---

* মূল রচয়িতা জাপানী কবি Yone Noguchi.

সমাচার

বাংলার কৃতী সন্তান সর্বজনপ্রিয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ যখন শোকে অভিভূত, তখন তাহার বুকে আর এক শক্তিশেল আসিয়া আঘাত করিল—'আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পাটনায় দেহত্যাগ করিয়াছেন!'

এ আঘাত যে কত বড় এবং কত নিদারুণ, দেশবাসী মাত্রেই তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে।

অতি অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে যখন তিনি বিচারপতির আসন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাংলা দেশ তখন তাঁহার সমস্ত শক্তিকে দেশের কাজে নিয়োজিত দেখিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলার সে আশা পূর্ণ হইল না।

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী, আদর্শ কর্ম্মবীর, দুর্জ্জেয়, মহাশক্তি সম্পন্ন এই অতি-মানবের অভাবে বাংলার বুকে যে শূন্যতা বিরাজ করিতেছে তাহা কোন কিছু দিয়াই পূর্ণ হইবার নহে।

* * * *

চিত্ররেখা। ছোট গল্পের বই।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বাণী-মন্দির, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ৯২ পৃষ্ঠা। দাম আট আনা।

পরলোকগত সমাজপতি মহাশয়ের সাহিত্যে যে কয়েক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনা প্রকাশিত হইত, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। চিত্ররেখায় প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যে প্রকাশিত তাঁহার কয়েকটি গল্প স্থান পাইয়াছে। রচনার স্নিগ্ধতায়, ভাষার লালিত্যে ও ঘটনার মাধুর্য্যে পরিপুষ্ট এমন খুব কম গল্পই আমরা পড়িয়াছি। রচনা নৈপুণ্য প্রত্যেকটি গল্পে পরিস্ফুট।

* * * *

আপনার জন। শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত। বাণী-মন্দির, ঢাকা। প্রথম খণ্ড, মূল্য ছয় আনা।

স্বামীজি 'আপনার জন' স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার কোন প্রিয়জনের নিকট যে সব সারবান্ পত্র লিখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহারই কয়েকখানি কিছু কিছু পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার পরিচিত প্রিয়জনকে যে সব জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন সেইগুলি সাধারণের নিকট সহজলভ্য করিয়া প্রকাশক মহাশয় সকলের ধন্যবাদার্হ। আশাকরি বাঙালীর ঘরে ঘরে বইখানি পঠিত হইবে।

বিষয় সূচী

পরিচয়লিপি

এবারে তিনটি লেখক ও একটি লেখিকার নূতন লেখা আমরা কল্লোলে প্রকাশ করিতেছি।

প্রথম গল্পটি 'সংক্রান্তি'। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা। কয়েক মাস পূর্ব্বে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁহার 'শুধু কেরাণী' বলিয়া একটি গল্প প্রকাশিত হয়। লেখকের শক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা এ গল্পটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম তাহার পরেই—'গোপন চারিণী' বলিয়া যে গল্পটি প্রকাশিত হয় তাহা লেখকের রচনা-শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পরিচয় দেয়। এই লেখকের প্রথম গুণ, ইঁহার বক্তব্য বিষয়ে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা। আজ যিনি ছোট গল্প লিখিতেছেন, আমরা আশা করি তিনি ক্রমে আরও ক্ষমতাশালী লেখক হইবেন এবং উপযুক্ত সময়ে তাঁহার রচিত উপন্যাস পড়িয়াও জনসাধারণ মুগ্ধ হইবে। 'সংক্রান্তি'তে অখিলের চরিত্রটি খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। সুখ দুঃখের সহিত জড়াইয়া মানুষ গড়িয়া ওঠে, অখিলও তাহাই চেষ্টা করিতেছিল। দুর্ভাগ্য তাহাকে সকল রকমে কাঙ্গাল করিল। অখিল মরিতে বসিল। ঠিক সেই সময়েই ছবির নিকট হইতে সাহায্য করিবার জন্য কাতর নিবেদন আসিল। অখিল তাহার সব অপরাধ ভুলিয়া গিয়া তাহার কাছে গিয়া আবার দাঁড়াইতে চাহিল। তাই সে আবার বাঁচিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বুঝি ছবির জীবনকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সমারোহহীন মৃত্যু আসিয়া অখিলকে সরাইয়া লইয়া গেল।

'গুমোট' গল্পটি শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা। এই লেখকের রচনার ভিতর যে কবি-প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আশা হয়, ইনিও ভবিষ্যতে প্রসিদ্ধ লেখক হইবেন। খুব সাধারণ খুঁটি-নাটি জিনিসকে গল্পের ভিতর এমন সুন্দর করিয়া নাড়া চাড়া করিয়াছেন যে, তাহাতে বুঝা যায়, লেখক মানব-চরিত্রের গুমোটের অনেক দিক বেশ ভাল করিয়াই অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছেন। নিপুণ রচনায় তাহাই পুনরায় প্রকাশ করিতে পারা যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচায়ক। প্রতিদিনিয়ত ঘরে ঘরে ভুল বুঝার যে গুমোট

বাধিয়া ওঠে, তাহার ভিতর যে বাস্তবিক একটা তুচ্ছ আত্ম-অভিমান ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তাহাই লেখক এই গল্পটিতে বুঝাইতে পারিয়াছেন।

বাদল বেলাগুলি সাধারণতঃ মানুষকে ব্যথাতুর করিয়া তোলে। শ্রীযুক্ত বিজয় সেনগুপ্তের 'বাদল-বেলা' লেখাটিতে সে ভাবটি সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। ভালবাসিয়া মানুষকে কত বিষয় ভাবিতে হয় এবং নিজের সঙ্গে কত রকমে বোঝাপড়া করিতে হয় সেই কথাই এই লেখক কথারছলে গাঁথিয়া গিয়াছেন। ইনি সুলেখক, তাই লেখাটি এত স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযুক্তা সুষমা মুখোপাধ্যায় 'প্রতীক্ষায়' গল্পটি লিখিয়াছেন। ইহার লেখার ভিতরও রচনা-শক্তির আভাস পাওয়া যায়। একটি পুরাতন বিষয় লইয়া ইনি গল্পটির অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু তবুও গল্পটি সুন্দর হইয়াছে।

মানুষ আশায় বাঁচিয়া থাকে, আশা করিতে পারে বলিয়াই বাঁচিতে পারে। এই আশার দিন গণিয়া যে অন্তরজ্বালা ও অশান্তি সহ্য করিতে হয় তাহার ভিতরেও মানুষের বাঁচিয়া যেন সুখ আছে।

লক্ষ্যহারা পথিকের অন্তরের বিলাপধ্বনি মর্ম্মর ধ্বনির মত পৃথিবীর বনপথে জাগিয়া ওঠে, তবুও মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া আশার আশ্বাসটি তাহার শেষ নিশ্বাসের বায়ু স্পর্শেও নিভিয়া যাইতে দিতে চাহে না।

লেখিকার চেষ্টা আরও সফল হউক, ইহাই আমরা কামনা করি।



শ্রাবণ—অদূরে শ্রাবণ-প্লাবনে ধন্যা জলময়ী গ্রামখানি। শ্রাবণের ধারাস্রোতে বেষ্টিত হইয়া সমস্ত শস্যক্ষেত্রগুলি শ্যামল দ্বীপের মত দেখাইতেছে। ধরণীর শুষ্ক বৈরাগ্যের সকল চিহ্ন আজ শ্যাম-সমারোহে কে যেন মুছাইয়া দিয়াছে। সকল শূন্যতা কিসে যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বিলখাল ভাসাইয়া জলস্রোত ধানের ক্ষেত ছাপাইয়া দিয়াছে। বৃষ্টি-ধারার সঙ্গে সঙ্গে দিক্‌ হারাণ সজল বাতাস ধানের শিস্‌গুলি নুয়াইয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কৃষাণেরা অর্দ্ধেক জলে ডুবিয়া ধান কাটিতেছে। তাহারই অপূর্ব্ব শব্দ আর্দ্র সঙ্গীতের মত বাজিয়া উঠিতেছে।

গরু মহিষ গৃহপালিত পশুগুলি মাথা জাগাইয়া ভাসিতে ভাসিতে ওপার হইতে এপারে আসিতেছে। কৃষাণ রমণীর স্নেহসিক্ত কণ্ঠধ্বনি ঝাপ্‌টা বাতাসে দোল খাইয়া দিগন্তে মিশাইয়া যাইতেছে।

যতদূর দৃষ্টি যায়, আকাশের মেঘাবরণের তলে শুধু জাগে ধরণীর শ্যাম-মূর্ত্তিখানি।

দীঘির পাড়ের আম্র-কানন—মাঠের ধারের নারিকেল-কুঞ্জ—গ্রামের প্রান্তে তালবন শ্রাবণ-আকাশের কাজল মেঘে মুখ রাখিয়া প্রবাসী গ্রামবাসীদের আগমন-প্রতীক্ষা করিয়া চাহিয়া আছে।

জল-স্থল, মেঘ আকাশ ভরিয়া পরিপূর্ণতার উচ্ছ্বল আনন্দ যেন সম্ভাবনার যৌবন সঞ্চারে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

* * শুধু চলার গতি, আকাঙ্ক্ষার বেগ রাখিয়া উঠিবার বিপুল আগ্রহ শ্রাবণ ভরিয়া ধ্বনিয়া উঠিতেছে।

অভাবিত

—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

১

মনেরে শুধাই যবে,
ভেবেছিস্ এম্‌নি হবে,
শিয়রে নিব্‌তে বাতি
পোহাবে ঝড়ের রাতি,
পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে
ভাঙা তোর বেড়ার ফাঁকে
হরষের বার্ত্তা পূরে
পাঠাবে গানের সুরে;
ভেবেছিস, নাইক দেরি
সুদূরে দিগন্তেরি
সরিতে যবনিকার,
সহসা না-জানি কার
পলকে উঠ্‌বে ফুটে
তরুদের পত্রপুটে
শিশিরের ঝলমলানি;
আকাশের বক্ষে হানি'
আলোকের হাজার কশা,
নিয়ে তার ক্রতশ্বসা
চঞ্চল অশ্বটিরে
দেবে ডাক ফিরে ফিরে
দুয়ারে স্তব্ধ গতি
অজানা কোন্ সারথি;

ভেবেছিস্ বাহির হ'য়ে
চোখে তার চাইবি যবে,
পলকের পরিচয়ে
সকলিই জানা হবে,
খিরিয়া বক্ষটিতে
ছিলি যা রাত্রিবেলায়,
প্রভাতে সেই অতিথে
দিবি সব অবহেলায় ;
শেষে তুই নিমেষ-পাতে
আপনি চল্‌বি সাথে।

চাহি' সেই শুভক্ষণে
বুঝি গো রাত্রি জাগো ?
মন মোর আপন মনে
শুধু কয়, না গো, না গো !

২

মনেরে শুধাই ডেকে,
ভেবেছিস্ আপনা থেকে
যা হবার সকল হবে ?
চোখে তোর নিদ্রা রবে
আঁধারের চুমোর মত ;
সুদূরের নিমেষ-হত
তারারা রাখবে জ্বালা
দীপালির আলোর মালা
সারারাত পথের তলে ;
শিশিরের অশ্রুজলে
ভেবেছিস্ পথচাওয়া তোর
রবে সেই পথের পাথর
মিনতির ভাষায় ছেয়ে
প্রিয় তোর আপ্‌নি চেয়ে

চিনিবে তার ইসারা ;
ভেবেছিস্ নদীর ধারা
আপনি উজান ব'বে,
তরী তার ভা সবে যবে
নীরবে স্রোতের সনে
বুঝি তোর অন্বেষণে ;
সহসা জাগ্‌বে বায়ু,
নিশা তার আপন আয়ু
ওড়াবে আপন হাতে
আলোকের ঘূর্ণাবাতে।
ভেবেছিস্, হৃদয়লীনা
আপনি বাজ্‌বে বীণা,
বাতাসের পরশ লেগে ;
ফুলেরা আপনি জেগে
সুদূরের অতিথিরে
নেবে তোর স্বপ্নতীরে ;
সেথা সে প্রার্থীরূপে
শিয়রে জাগ্‌বে চুপে।

আজিকে ঘুমের ধ্যানে
বুঝি সে আশায় জাগো ?
মন মোর কানে কানে
শুধু কয়, না গো, না গো !

৩

শুধু কয়, না গো, না না,
কি যে চাই নেই তা জানা,
কি যে চাই আপনি ভাবি ;
আপনার হিয়ায় নাবি,
ডুবি তার অতল তলে।

যে চলে অস্তাচলে
যে চলে রাতের তীরে
তারে আর চাইনে ফিরে ;
যে আসে আলোর পারে,
উদয়ের উদার দ্বারে,
পরিচয় যাহার সাথে
পলকের নয়ন পাতে,
ভিতরে ডাক্‌লে তাকে
বাহিরে শূন্য থাকে
এমনি বিড়ম্বনা ;
ওগো মোর আপনমনা

ভাষা কি বুঝ্‌বে গীতের ?
আশা মোর অভাবিতের।
আশা মোর ভয়ের মত,
ফণা তার লক্ষ শত
আপনার বক্ষে হানে,
আপনার মরণ টানে
আপনি এগিয়ে চলে ;
আশা মোর অশ্রুজলে
আপনার তরুণ রাখে ;
আশা মোর কাঁপ্‌তে থাকে
আপনার সুরের দাপে,
হাওয়াতে যেমন কাঁপে
স্তিমিত কোণের বাতি ;
আশা তার প্রলয়-রাতি
আপনি সৃষ্টি করে,
আপনার চিতার 'পরে
লেলিহান জিহ্বা মেলি
করে সে নৃত্যকেলি ;

মরণের মূল্য ছেড়ে
লভে সে অমৃতেরে।

বলি তায়, সেই আশাতে
তুমি কি মরণ মাগো ?
কি যে কয়, কোন্ ভাষাতে,
মনে হয়, না গো, না গো !

প্রেম ধূলাও নয়, সোনাও নয়। প্রেমকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তোমারই মধ্যে সে তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

"আয়না"

সংক্রান্তি

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

কম্বলের তলা থেকে অখিল সমস্ত শুন্‌তে পাচ্ছিল। নীচে মেসের ঝি তার নিত্য-নিয়মিত কলহ বাধিয়েছে ঠাকুরের সঙ্গে। পাশের 'সীটে'র প্রৌঢ় খিট্‌খিটে ভদ্রলোক তাঁর হাঁপানির একঘেয়ে একটানা কাশিতে কান ঝালাপালা করে তুলছেন। তারি ফাঁকে ফাঁকে, পাশের ঘরের ছাত্রের জ্যামিতি মুখস্থ-করার শব্দ, মেসের পেছনে ছাই-গাদায় একপাল কাকের কোলাহল ও নীচে ক্রুদ্ধা ঝি, বাসন-কোসনের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ায় তাদের করুণ ধাতব আর্তনাদ এসে পৌছোচ্ছিল।

একঘেয়ে কাশির অস্বস্তিকর শব্দে সমস্ত গা নিশ্‌পিস্‌ করলেও কম্বল ছেড়ে তার উঠ্‌তে ইচ্ছা করছিল না। কালকের অত হাঁটাহাঁটিতে পায়ের সমস্ত শিরা উপশিরায় টান ধরেছিল। ছেঁড়া, শতছিদ্র, মোটালোমের কম্বলটা মুড়ি দিয়ে সে চুপ ক'রে শুয়েই রইল। খানিক বাদে কাশির বেগ থাম্‌লে ভদ্রলোক খেঁকিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "কি, আজ ঘর ঝাঁট্‌ দেবার পালা কার মশাই? বেলা আট্‌টা বেজে গেল, আপনি যে নবাব—" আবার নতুন করে কাশির বেগ আসায় কথা আর তাঁর শেষ হ'ল না, কিন্তু সেই অসমাপ্ত কথার ঝাঁজ্‌টা অখিলের তেতো মনটাকে আরো তেতো করে তুললে। কম্বলের ভেতর থেকেই সে বলে উঠ্‌ল, "পারব না আমি ঝাঁট দিতে।" তারপর বল্‌লে, "আমার জ্বর হয়েছে।"

প্রৌঢ়ের কাশির বেগ তখনও থামেনি। তিনি উত্তর দিতে পারলেন না, কিন্তু কম্বলের ভেতর থেকে তাঁর চোখের দৃষ্টি যদি সে দেখ্‌তে পেত তা হলে উত্তরটা বুঝ্‌তে তার দেরী হ'ত না।

পুনর্ব্বার কাশির বেগ থাম্‌লে ভদ্রলোক তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন, "জ্বর ত আপনার রোজই হয়, কিন্তু ভাতের থালায় কারুর চেয়ে কম উৎসাহ কোন দিন দেখ্‌লুম না! তাও যদি দু-তু'মাসের টাকাটা বাকী না থাকৃত।—আচ্ছা বেহায়া লোক যাহোক্‌!"

এই সত্য অপবাদের কোন উত্তর না দিয়ে, অখিল তাড়াতাড়ি কম্বল

ফেলে, ছেঁড়া গা'র কাপড়টা গায় দিতে দিতেই বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে গেল। অসহ্য এই দুর্মুখ বুড়োর সঙ্গ! কেমন ক'রে সে যে এতদিন বুড়োকে দু'ঘা না দিয়ে, সংযত হয়ে আছে সে নিজেই ভেবে পায় না। মানুষের কি দুর্দিন আসে না? মেসের পাওনা সেকি ইচ্ছে করে দেয় না? মানুষের——'

রান্নাঘরে ঠাকুরকে গিয়ে বললে, "ঠাকুর একটু ঘুঁটের ছাই দিতে পার?"

ঠাকুর ভাতের প্রকাণ্ড ডেকচি উনোনে চাপাতে চাপাতে বললে, "ঘুঁটের ছাই সব ফেলে দিয়েছি বাবু; এত বেলায় কি আর থাকে!"

অখিল ধমক দিয়ে বললে, "কে তোমায় ফেলে দিতে বলেছিল?"

ঠাকুর তার ধমকে ভ্রূক্ষেপ না করে উনোনে খোঁচা দিতে লাগল। আরো চটে উঠে সে বললে, "তোমার কি কথা কানে যায় না নাকি?"

ঠাকুর উনোনে খোঁচা দিতে দিতেই গম্ভীরস্বরে বললে, "কাজের সময় বক্‌বক্ করবেন না বাবু। ঘুঁটের ছাই নাই বলছি, মিছে গোলমাল করবেন না।"

অসহ্য এই ছোটলোক ঠাকুরের অহঙ্কার ও আস্পর্দ্ধা! সে এবার চীৎকার ক'রে বললে "বক্‌বক্ করব না কি? তোমার যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোমার আস্পর্দ্ধা আমি বার করে দিতে পারি, জানো?

ঠাকুর তথাপি নির্ব্বিকার ভাবে তরকারীর চুব্‌ড়ি সরাতে সরাতে বললে, "যাও, যাও। তোমার মত ঢের বাবু দেখেছি।" তারপর সামনে এসে হাত নেড়ে একটু উত্তেজিতস্বরে বললে, "আমি কি তোমার কেনা গোলাম নাকি? যাও, কি করতে পার করগে' যাও। আমি ভয় করি না।"

মেসের দুচারজন কলতলায় মুখ ধুচ্ছিল, তারা এসে অখিলকে ধরে বললে, "আরে, কি করেন অখিলবাবু! ওদের সঙ্গে কি ওরকম ব্যবহার করে?"

অখিল তখন নিরুপায় ক্রোধে ফুলছিল; কিছু না বলে ধীরে ধীরে চলে গেল। শুনতে পাচ্ছিল ঠাকুর বলছে, "এরকম করলে আমি এখানে চাকরী করতে পারব না বাবু। ভাল কথায় বললুম—এত বেলা হয়ে গেছে এখন কি আর ঘুঁটের ছাই থাকে?"

কলতলা থেকে মুখচোখে জল দিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অখিল ভাবছিল—এবার যদি বুড়ো আবার ঘরঝাঁট দেবার কথা বলে, আর আপত্তি করবে না। আর পারা যায় না ঝগড়া করে'—না চাইলেও ঝঞ্ঝাট কোথা থেকে তার কপালে এসে জোটে!

কিন্তু বুড়োকে ঘরে গিয়ে না দেখ্‌তে পেয়ে একটু স্বস্তি বোধ হ'ল। তাড়াতাড়ি, বুড়ো আস্‌বার আগেই কাগজপত্রগুলো নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ছাতে বস্‌তে হ'বে। কিন্তু কালকের রাত্তের আধপোড়া সিগারেটটা কেরাসিন কাঠের টেবিলটার ওপর রেখেছিল; সেটা পাওয়া গেল না। ক্রমাগত খুঁজে খুঁজেও না পাওয়াতে তার বিরক্তি বেড়ে যাচ্ছিল। পৃথিবী সুদ্ধু সবাই তার সঙ্গে বাদ-সাধ্‌তে চায়! টেবিলের জিনিষপত্র উল্‌টে পাল্‌টে কিছুতেই সেটাকে পাওয়া গেল না। ক্রমশঃ তার জেদ ও রাগ বেড়ে চলেছিল। দরকারের সময় একটা আধপোড়া সিগারেটও কি পাওয়া যায় না? না, পাওয়া চাই-ই। বিছনার ভেতর সিগারেট ছিল না; তবু সেটাও উল্‌টে ফেলে দিলে। রাগে তার ইচ্ছা হচ্ছিল, টেবিল চেয়ার সমস্ত ঘরের আসবাব-পত্র গুঁড়িয়ে চুরমার করে ফেলে। তার সাথে কারসাজি ক'রে যেন তারা মজা দেখ্‌ছে!

বুড়ো কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে অখিল টের পায় নি। বুড়ো ভদ্রলোক এবার খেঁক্‌শেয়ালের মত গলায় চাৎকার ক'রে সবাইকে ডেকে বল্‌লেন, "দেখে যান মশাইরা, অখিলবাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে যান। আপনারা ভাবেন বুঝি খিট্‌খিটে বুড়ো ইচ্ছা ক'রে ঝগড়া বাধায়। আচ্ছা দেখুন ত, এরকম লোকের সঙ্গে কি ক'রে একঘরে বাস করা যায়! উনি ত একদিনও ঘর পরিষ্কার করবেন না; কিন্তু এমনি করে সমস্ত ঘর ছন্নভন্ন কর্‌লে, আরেকজন থাকে কি করে?" দুচারজন এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। অখিল কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রাগে টেবিলের ওপরকার ময়লা, পুরোণ খবরের কাগজ গুলো টেনে মাটিতে ফেল্‌তে লাগ্‌ল। বাইরের একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি হয়েছে অখিলবাবু, কিছু হারিয়েছে কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার সিগারেটটা।"

আরেকজন বল্‌লেন, "আপনার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে,—ঐটে কি?"

সত্যিই, আধপোড়া সিগারেটটা পায়ের কাছেই পড়েছিল, অখিল সেটা কুড়িয়ে নিলে। একজন বলে উঠ্‌লেন, "ঐটুকুর জন্যে এত কাণ্ড!"

একটা হাসির রোল উঠ্‌ল। কাগজ আর দোয়াত কলম নিয়ে অখিল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। বুড়ো পেছন থেকে বলে উঠ্‌লেন, "বলি, জিনিষপত্রগুলো আমাকে গুছিয়ে রাখ্‌তে হ'বে নাকি?"

সত্যিই ত! সে ফিরে এসে কাগজ পত্র জিনিষ ইত্যাদি বিছনার ওপর গাদা ক'রে রেখে বেরিয়ে গেল। লোকগুলো হাস্‌ছিল।

নিজেকে সমস্ত পৃথিবীর দ্বারা বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত জেনে নিজেকে ঘা দেওয়ার একটা তীব্র বেদনাভরা আনন্দ আছে। সে নিজেকে অমনি করে পীড়া দিচ্ছিল। দোতালার ছাদের যে কোণটায় একটা ভাঙ্গা টুলের ওপর সে বসেছিল সেখান থেকে সমস্ত মেসের দৃষ্টিপথের আড়ালে থাকা যায় ও উত্তরের সমস্ত উন্মুক্ত সহরের দৃশ্য চোখে পড়ে। শীতের দিনে প্রথম রোদের খানিকটা কিরণও সেখানে পড়ে। সামনেই নতুন বাড়ীটা তৈরী শেষ হয়ে গেছে। সকাল বেলা আর মিস্ত্রিদের গোলমালের উপদ্রব নেই। এই নিরিবিলি জায়গা-টিতে বসে সে অতীত জীবনের কাঁটাগুলোকে নাড়া দিয়ে নতুন করে পুরাতন বেদনার স্বাদ গ্রহণ করছিল। বড় বড় দুঃখ নয় খুব গভীর বেদনার কাহিনী নয়, তার মনে আসছিল শুধু জীবনের ছোটখাট, তুচ্ছ, অকিঞ্চিতকর বঞ্চনার, বেদনার, অপমানের, ক্ষোভের স্মৃতি।

সে তখন ছোট; তার মামাত বোনের বিয়ের জন্য বরপক্ষীয়েরা মেয়ে দেখতে এসেছিল। তার মামা মেয়ের গুণ বর্ণনা করবার সময় একটু বাড়িয়ে বলছিলেন, "কাজে কর্ম্মে দেখে নেবেন মেয়ে আমার কি রকম দুরস্ত। মেয়েরা শুধু বিবি সেজে বই মুখে ক'রে বসে থাকবে, সে আমি মোটেই দেখতে পারি না। বাড়ীর অর্দ্ধেক রান্না ত ও একলাই করে—

হঠাৎ মামার কথার মাঝে সে বলে উঠেছিল, "বাঃ রাণীদি ত একদিনও রাঁধে না।"

ওইটুকু ছেলের এই অস্বস্তিকর সত্যবাদিতার আস্পর্দ্ধায় ঘরসুদ্ধ লোক এমন কি বরপক্ষীয়েরাও এমন ক'রে তার দিকে চেয়েছিল যে, সে দৃষ্টি ছুঁচের মত তার মর্ম্মে বিঁধে চিরকালের মত দাগ দিয়ে গেছল।

এমনি আরও অনেক কথা তার মনে পড়ছিল! তার এই বাইশ বছরের জীবনে কত দুঃখই না সে পেয়েছে। কত লাঞ্ছনা, কত অবিচারের কোন প্রতিকার না-করতে পেরেই না নিষ্ফল অভিমানে আজ সে সংসারের ওপর বীতরাগ হয়ে উঠেছে!

সামনের নতুন বাড়ীটাতে কথাবার্ত্তার শব্দ শুনে সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তাহলে এর মধ্যেই নতুন বাড়ীতে ভাড়াটে এসেছে! একটি স্থূলকায়া বর্ষীয়সী মহিলা সামনের উঠোন দিয়ে চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ বাদেই মৃদু চুড়ির আওয়াজে চমকিত হয়ে সে চেয়ে দেখলে, একটি কিশোরী সুন্দরী মেয়ে উঠোনের কোণ থেকে তার দিকে চেয়ে আছে। তার মনে হ'ল অপরূপ

সুন্দর ওই মেয়েটির দাঁড়াবার ভঙ্গিটি! তার মনের রাত্রির অসহ্য গুমোটের মাঝে ওই মেয়েটির সকৌতুক দৃষ্টিটি যেন স্নিগ্ধ এক পশ্‌লা বৃষ্টির আশীর্ব্বাদের মত এলো . . . বর্ষীয়সী মহিলাটি আবার উঠোনটি পার হয়ে গেলেন। যেতে যেতে একবার তার দিকে চাওয়াতে, সে একটু লজ্জিত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে। মেয়েটিও খানিক বাদে চলে গেল। এতক্ষণ বাদে কাগজ কলম তুলে নিয়ে সে লিখ্‌লে,—"আজ একটি ছোট্ট মেয়ের চাউনি পেয়েছি। আমায় অনেক দুঃখ দিলে দেবতা, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক যাতনার বেদনা; কিন্তু এইটুকুর জন্যে আজ তোমায় প্রণাম করছি। একটি কিশোরীর সকৌতুক চাহনি,—তার ভেতর বিপুল কোন ইঙ্গিত নেই, কোন আশাতীত আশ্বাস নেই, তবু এই চাহনিটুকুর জন্যে তোমায় প্রণাম দেবতা! কত চাহনিই এ জীবনে দেখ্‌লুম,—ঘৃণার বিষে ক্রূর, অবজ্ঞার আঘাতে কঠিন, লালসার উগ্রতায় মৃত্যু-ফেনিল, আর আজ জীবনের মরুপথে এই একটি স্নিগ্ধ অসঙ্কোচ নিষ্পাপ চাহনি। তুমি সংসারে বীভৎস ব্যাধি দিয়েছ, মানুষের হৃদয়ে নির্ম্মমতা দিয়েছ, পৃথিবী-জোড়া হাহাকার দিয়েছ, কিন্তু কিশোরীর চোখে এই অসীম রহস্যও দিয়েছ, আর আমায় সে রহস্যের আনন্দ উপলব্ধি করবার ক্ষমতা দিয়েছ—তোমায় বারবার নমস্কার দেবতা!"

লেখা শেষ করে অখিল ভাবলে না হতাশ হ'লে চলবে না, আবার নতুন উৎসাহে কাজের খোঁজ করতে হ'বে। জীবনে অনেককিছু করবার আছে। কিন্তু মেয়েটিকে আর একবার দেখ্‌বার ইচ্ছে হচ্ছিল। সে সেইখানে দাঁড়িয়ে গুন গুন ক'রে গাইতে লাগ্‌ল—

"দুখের রাতে নিখিল ধরা যখন করে বঞ্চনা—
তোমারে যেন না করি সংশয়।"

হঠাৎ যেন বজ্রাহত হয়ে সে চুপ ক'রে গেল। বর্ষীয়সী মহিলাটি উঠোনে নেমে তীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে বল্‌ছিলেন, "কোথাকার ছোটলোকরে! ভদ্দরলোকের বাড়ীর মেয়েছেলের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা, গান গাওয়া,—কি এসব! ডাক্‌ ত ওঁকে, এখুনি একবার গিয়ে ভদ্দরলোকের বাড়ীর মেয়েছেলের দিকে নজর দেওয়া বার করে আসুক। এতদিন ত ওপাড়ায় ছিলুম, এমন ছোটলোক ত কখন দেখি নি গা!—ডাক্‌ না পটল।"

শেষটা আর সে শুন্‌তে পার্‌লে না। লজ্জায়, ঘৃণায়, ভয়ে তার গা কাঁপ্‌ছিল। মেসে দারিদ্র্য ও নানা কারণে তার যথেষ্ট সুনাম আছে, তার ওপর ভদ্র লোক

এসে এই কথা জানালে যে কি ব্যাপার ঘটবে তা কল্পনা ক'রে তার হৃদয়ের স্পন্দন যেন থেমে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক আস্‌বার আগেই একটা কিছু করা দরকার। কম্পিত হাতে খাতা পত্র তুলে নিয়ে, দ্রুতপদে নিজের ঘরে ঢুকে, সেগুলো রেখে সে ছেঁড়া চটিটা পায়ে লাগিয়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে গেল।

মেস্‌ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে কিছুদূর যেতেই পেছন থেকে কে ডাক্‌লে, "বাবু"

চম্‌কে সে ফিরে দেখ্‌লে তাদের পাড়ার বুড়ো দর্জ্জি। অনেকদিন আগে তার কাছ থেকে একটা পাঞ্জাবী করিয়ে নিয়েছিল; মজুরী এখনো দেওয়া হয় নি।

"এখনো পাইনি, পেলেই দিয়ে দেব।" বলে সে এগিয়ে চল্‌ল।

পেছন থেকে ডেকে দর্জ্জি বল্‌লে, "পালান কেন বাবু? দেব দেব ত বল্‌ছেন আজ ছ'মাস—দশ আনা পয়সার জন্যে আর কতদিন তাগাদা করা যায়? স্পষ্টই বলে দিন না, দিতে পারব না; পালাবার দরকার কি?"

"সত্যি পেলেই দেব"—বলে সে এগিয়ে গেল।

পেছন থেকে দর্জ্জির উচ্চস্বর শোনা গেল—"আচ্ছা এইবার রাস্তায় ধর্‌লে জামা কেড়ে নেব।"

অভুক্ত ক্লান্ত দেহে বিকেল পর্য্যন্ত সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল। এর পরে সে মেসে কি ক'রে মুখ দেখাবে ভেবে পাচ্ছিল না। এতক্ষণে সেখানে কি জানাজানি, কি কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে, তার নামে কত কুৎসা রটনা হয়েছে ভেবে তার চোখ দিয়ে জল আস্‌ছিল। যদি বা সে মুখ দেখাতে সাহস ক'রে তবু মেসের মেয়াদ তার আজ থেকে যে ফুরালো এ একেবারে নিশ্চিত। একে তার ছ'মাসের টাকা বাকী, তার ওপর এই ঘটনা সেখানে তার আর জায়গা নেই। কোন খানেই বা আছে সে ভেবে পেল না। কিন্তু ভগবান জানেন সে নির্দ্দোষ। কাল রাত থেকে কিছু খাওয়া না থাকায় ও সমস্তদিনের বেড়ানর পরিশ্রমে তার ভয়ানক ক্ষুধা পাচ্ছিল। কিন্তু একটু বিশ্রামের জায়গা যাকে কেউ দিতে রাজী নয় তার ক্ষুধার আবেদনে কে কান দেবে? আর সে কোন্‌ লজ্জায় চাইবে? এক বন্ধুর কাছে বহুদিন আগে কুড়ি টাকা ধার করেছিল। আজ ঘুরতে ঘুরতে তার সাম্‌নে গিয়ে পড়েছিল। ইচ্ছা ছিল একটা মিথ্যা ওজর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবে, কিন্তু বন্ধুই নীরব অবজ্ঞায় তাকে উপেক্ষা করে সাম্‌নে

দিয়ে চলে গেছল। মিথ্যা ওজর সে অনেকবার শুনেছে। বন্ধু চলে গেলে মনে হয়েছিল, তাকে আজকের দুঃখ জানিয়ে একটা টাকা চাইলে সে কি দিত না। বড়লোকের ছেলের একটা টাকায় কি আসে যায়?

কিন্তু আজ না হয় সে বাঁচ্‌ল, তারপর কাল, তারপর পরশু, তারপর বাকী জীবন কি এমনি করেই কাটাতে হবে? কিসের আশায়?

দেশ থেকে মা চিঠি দিয়েছেন, "তোমার ভগ্নীপতি মারা গেছেন, লীলার ভয়ানক অসুখ, চলে এসো।"

কাল আবার চল্‌তে ফির্‌তে পাওনাদারদের তাগাদা আরম্ভ হ'বে। মাথা রাখ্‌বার ঠাঁই গোঁজবার চেষ্টায় হায়রাণ হয়ে ফির্‌তে হ'বে। আর যদিও না মেস থেকে তাড়িয়ে দেয় মেসের লোকের টিট্‌কারি, গালিগালাজ, ঐ হাঁপানি রোগীর দাঁতখিঁচুনি শুন্‌তে হবে দিনের পর দিন। এই যে ছেঁড়া চটিটার ভেতরে একটা পেরেক উঠে পা ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিচ্ছে এইটেই পায় দিয়ে চাকরীর সন্ধানে ফিরতে হবে, সভয়ে পাওনাদারদের চোখ এড়িয়ে। মার কাতর চিঠি আস্‌বে বারে বারে। সদ্য বিধবা বোনের মিনতি আস্‌বে। কিন্তু কেন আর? সংসার ত তাকে বারবার অপমান করে জানিয়ে দিলে সে অনাবশ্যক, একেবারে অনাবশ্যক পৃথিবীর ভার। তবু সে কোন্ আশায় আর এ ঘৃণা জীবনের মেয়াদ বাড়াতে চায়?

পার্কের চেয়ার থেকে উঠে সে আবার চল্‌ল। খানিকদূর গিয়ে চটি জুটো পা থেকে খুলে ফেলে দিলে। পা দিয়ে রক্ত পড়্‌ছিল। যে বন্ধু তার সঙ্গে অবজ্ঞায় রাস্তায় কথাও কয় নি তার কাছেই চল্‌ল আবার।

বন্ধুর বাড়ির দরজায় গিয়ে যখন সে দাঁড়াল তখন সে মনে মনে একটা দৃঢ় সঙ্কল্প করেছে। অনেক ডাকাডাকি ও মেজাজী চাকর-বাকরকে বিস্তর সাধাসাধির পর বন্ধুর দেখা মিল্‌ল। বন্ধু ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করলে, "কি মনে করে? টাকা কড়ির কিছু সুবিধে হ'ল এতদিনে।"

বন্ধু আরাম কেদারায় বস্‌ল, কিন্তু তাকে বস্‌তে কোন রকম ইঙ্গিতও কর্‌লে না।

"আমি অন্য দরকারে এসেছি।"

বন্ধু হাই তুলে আলস্য ভেঙে বল্‌লে, "দেড় বছর প্রায় হল না? আর নিয়েছিলে বোধ হয় সাতদিনের কড়ারে মনে হচ্ছে।" তারপর শুষ্ক ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, "এতদিন ত রাস্তায় দেখা হলে পাশ কাটিয়ে যেতে আর নেহাৎ

সামনে পড়ে গেলে মিছে কথা বলতে আবোল তাবোল। আজ শুভাগমন হবার কারণটা শুনতে পাই ?"

"আমায় একটা টাকা যদি দাও ভাই, আমি সমস্ত দিন কিছু খাই নি।"

এই অপ্রত্যাশিত ধৃষ্টতায় বন্ধু অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর চেয়ার থেকে উঠে, পর্দা সরিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বললে, "তোমার কি একটু লজ্জা হ'ল না অখিল ? ছ্যাঃ—"

কাতরকণ্ঠে উচ্চস্বরে অখিল বললে, "তোমার পায়ে পড়ি ভাই, আর কখনো আসব না। আজ শুধু একটি টাকা দাও, আমি কাল থেকে সত্যি কিছু খাই নি !"

বন্ধু ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "খাও নি যখন তখন এখানে না হয় খাবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। টাকা হবে না।"

অখিলের সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল, সে মূঢ়ের মত বললে, "না না আমি মিথ্যে বলছিলুন, আমার খাওয়া হয়েছে ভাই, আমার একটা টাকার বিশেষ দরকার, এই—"

কিন্তু কোন ওজর সে তাড়াতাড়ি খুঁজে পেল না।

বন্ধু তার দিকে ঘৃণায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, "বেড়ে লোক ত তুমি, বলি আজকাল নেশা ভাঙ করছ নাকি ? মৌতাতের খাঁকৃতি পড়েছে বুঝি ?"

সে শুধু একটু হাসলে। ঘড়িতে ঢং করে সাড়ে পাঁচটা বাজ্‌ল।

সত্যিই বন্ধুর পা'দুটো হঠাৎ ধরে ফেলে সে মিনতি করে বললে, "আর কক্ষন চাইব না ভাই। সেই স্কুলের বন্ধুত্বের কথা মনে করেও না হয়—একটা টাকা দাও।"

"আঃ ছাড় ছাড়—এ ত আচ্ছা জ্বালা দেখি !"

একটা টাকা মনিব্যাগ থেকে ফেলে দিয়ে বন্ধু বললে, "যাও দূর হও, এবার এলে দরওয়ানের হাত থেকে অন্য কিছু নিয়ে ফিরতে হবে ?"

টাকাটা নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। দূর সে হবেই, সবার কাছ থেকে পৃথিবীর কাছ থেকে এই জীবন থেকে !

ছটার সময় দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে সুরু করলে। দোকান বন্ধ হবার আগে তার পৌছান চাই-ই। তারপর কাল আসুক পাওনাদারদের তাগাদা মেসের লোকের বিদ্রূপ, মা, দিদির কাতর চিঠি, যত পারে। কিন্তু——

রাস্তার ধারের মেথর পল্লীতে জীর্ণ ঘরে বসে মেথর-যুবক সানাই সাধছিল মনের আনন্দে। এরা ত কেউ মরতে চায় না, কঙ্কালসার শীর্ণদেহ বৃদ্ধ অথর্ব ভিখারী রাস্তার ধারে হাত বাড়ালে। এ-ও ত কাল বেঁচে থাক্‌বে! অনেকখানি পথ, বোধ হয় সময় মত পৌঁছাতে পারবে না মনে হতে অনিচ্ছা সত্বেও মনটা যেন খুশী হয়ে উঠ্‌ল। সে নিজেকে বোঝালে—তার ত সময় মত পৌঁছাতে অনিচ্ছে নেই, তবে যদি নেহাৎ আজ না পারা যায় ত কি হবে—সে ত কাপুরুষের মত সঙ্কল্প ত্যাগ করে নি, আজ না হয় কাল ত আছে। নিজেকে কাপুরুষতার অভিযোগ থেকে মুক্ত করবার জন্য সে জোরে হাট্‌তে সুরু করলে। কিন্তু যখন একটা বড় বাড়ীর সাম্‌নে এসে সে ভেতরের দেওয়াল-ঘড়িতে দেখ্‌লে ন'টা বেজে গেছে, তখন খুশী না হয়ে থাকতে পারলে না। তবু সে দোকানের দিকে হাট্‌তে লাগ্‌ল।

দোকানদার তখন একটা দরজা বন্ধ করে আরেকটায় টান দিয়েছে। সে দোকানের সাম্‌নে পৌঁছেও ফিরল। কাল যথেষ্ট সময় আছে।

কিন্তু তাকে ফির্‌তে দেখে দোকানদার কি মনে ক'রে বল্‌লে, "এইটুকুর জন্যে আর ফির্‌বেন কেন? আসুন।"

সে চমকে ফিরে বল্‌লে, "না থাক্, কালই আন্‌ব না হয়।"

দোকানদার আপ্যায়িত করবার জন্য বল্‌লে, "সে কি বাবু, এইটুকুর জন্যে ফিরে যাবেন? আসুন আসুন।"

"না না, আইন ভেঙে দরকার নেই।"

দোকানদার চার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে চোখ মট্‌কে বল্‌লেন, "কিসের আইন বাবু! এই হাতে কত——"

কথাটা সে আর শেষ কর্‌লে না আর একবার চোখ-মট্‌কে বুঝিয়ে দিলে।

এক টাকার আফিঙ শুনে সে একবার অখিলের মুখের দিকে তাকালে, তারপর হেসে বল্‌লে, "বুঝিছি আমার মামা এক একবারে যে ডেলাটি খেত তাতে একটা হাতি ঘাল হয়ে যায়। নতুন আইন যখন হ'ল তখন মামা ত ভেবেই সারা। আমাদের তখন দোকান হয় নি, শেষে এক একবারে আমরা ছ'ভাই মিলে মামার সঙ্গে দোকানে আসতুম, আপনার নাম ঠিকানাটা না হয় একটু দিয়ে যান। ঐ-ঐ তে হবে।"

দুরন্ত শীতের রাতে, দশটার সময় পথে কেউ বড় ছিল না। এতক্ষণ লক্ষ্যহীন ভাবে সময় কাটাবার জন্তে ঘুরে ঘুরে অখিল মেসের দরজার কাছে এসে

দাঁড়াল। শীতেই হোক্ বা ভয়েই হোক্, তার বুকের ভেতর পর্য্যন্ত কাঁপ ধর্‌ছিল। সকাল বেলার সেই ব্যাপার এতক্ষণে কত ভাবে কতমুখে বিকৃত বর্দ্ধিত হয়ে কি কেলেঙ্কারিতে দাঁড়িয়েছে ভাবতেই তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন শিথিল হয়ে এল। আজ সে আফিঙ পেয়েছে ভালই হয়েছে, নইলে কাল সে কেমন করে সকালে মুখ দেখাত?

মেসের সকলে শীতের দরুণ সকাল-সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল। সে ধীরে ধীরে ভেজান দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে বুড়োও ঘুমিয়েছে। বুড়োর হারিকেনটা সন্তর্পনে জেলে সে বিছানায় চিঠি লিখ্‌তে বস্‌ল। টেবিলের ওপর ডুখানা চিঠি তার নামে রয়েছে। কিন্তু কি হবে আর চিঠি পড়ে? চিঠি লিখেও আর কি হবে? যে মর্‌ল তার আবার কৈফিয়ত কিসের? পৃথিবীর লোক কি ভাব্‌ল-না-ভাবল কি জান্‌ল না-জান্‌ল যে মরে গেল তার তাতে কি আসে যায়? না, কোন কৈফিয়ৎ সে দেবে না। কিসের কৈফিয়ৎ? কার কাছে?--

ক্ষুধায় নাড়িগুলোতে পাক দিচ্ছিল। কালো গুলিটি সে আলোর সামনে তুলে ধর্‌লে। হাত কাঁপ্‌ছিল। জীবনের যত অতৃপ্ত আশা অস্ফুট কামনা অব্যক্ত বেদনা! তার শেষের সঙ্গীরা তার যৌবনের প্রিয়া, তার দুঃখী মা, তার অসহায় বিধবা বোন যে কেউ তাকে একদিনের জন্যেও ভালবেসেছে বা স্নেহ দিয়েছে সবাইকে প্রীতি নিবেদন করে যদি সে শান্ত অবিচলিত মনে সংসার থেকে বিদায় নিতে পারে। . . . কিন্তু একি জ্বালা অন্তরে বাহিরে, একি তীব্র প্রতিহিংসার বিষজর্জ্জরতা, একি বিপুল আক্ষেপ, একি দুর্ণিবার ক্রোধ হিংসা ঈর্ষ্যা যে কেউ আজ সুখে সংসারে নিদ্রা যাচ্ছে সবার ওপর! সে বাঁচ্‌তে চায় প্রাণভরে বাঁচ্‌তে চায় তবু তাকে যেতেই হবে। কি নির্ম্মম কি অযাচিত এই বিদায়! সমস্ত সংসারে সকল সুখীকে যদি সে আজ খুন করে যেতে পার্‌ত . . . কাল তার মৃতদেহের ওপর ওই ঘৃণত বুড়ো হাঁপানির কাশি কাশ্‌বে, ওকে গলাটিপে মেরে পৃথিবীর সমস্ত সুখ আনন্দকে গলা টিপে মেরে সে যেতে পারে না কি?—'

আফিঙটা গিলে ফেলে সে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। শিয়রে আলোটা জ্বলতে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ গেল। কতক্ষণ তার আন্দাজ ছিল না। মাথাটা বোধ হয় ঝিম্ ঝিম্ কর্‌ছিল। আলোতে দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটার দিকে চেয়ে সে পড়্‌তে চেষ্টা কর্‌লে। পয়লা, দোসরা পৌষমাস, পূর্ণিমা, নীলকালিতে ছুটির তারিখ সব

পড়তে পারলে। আঙুলগুলো একবার মুড়লে। আর খানিকবাদেই হাত পা খিঁচুনি, গোঙানি সুরু হবে। খুব কষ্ট হবে কিনা সে ভাবছিল। কোথায় টাইমপিস্‌টা টিক্‌টিক্‌ করছিল। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় . . . না তাড়াতাড়ি আরত গুণতে পারছে না! সে উঠে বস্‌ল। সে ত যাচ্ছেই তার আগে চিঠি দুটো পড়লে দোষ কি?

প্রথমটায় মা লিখেছে, " . . . লীলাকে আর রাখতে পারলুম না বাবা, কাল সকালে সব ফুরিয়ে গেছে . . . চিঠি পেয়েই চলে এস।"

আলোটার উজ্জলতা বোধ হয় ছিল না পড়তে কষ্ট হচ্ছিল। দ্বিতীয়টা খুললে। হাতের অক্ষর দেখে অবাক হয়ে গেল। অক্ষরগুলো মনে হচ্ছিল যেন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। এই বোধ হয় শেষের সূচনা। কিন্তু লেখা-গুলো যে ভয়ানক চেনা! আলোটা আরো উজ্জল করে দিয়ে বেশ একটু কষ্ট করেই যে চিঠিটা আগ্রহ সহকারে পড়লে। সে লিখেছে এতদিনের নীরবতার পর!—

'জানি তোমার কাছে ক্ষমা পাবার আশা করা আমার অনুচিত, তবু এই দুর্দ্দিনে তোমায় ছাড়া কাউকে মনে পড়্‌ল না। . . . হয় ত তুমি ভুলে গেছ, মনে রাখ্‌বার মত কোন কিছু তোমায় কখন দিই নি . . . সেদিন যে আঘাত পেয়েছিলে তাও বোধ হয় এতদিনে মুছে গেছে কিন্তু আমি ভুলি নি . . . নারী যাকে ভালবাসে তাকে হয় ত ভুলতে পারে কিন্তু যাকে আঘাত দেয় তাকে কখন ভুলতে পারে না . . . হয় ত বাচালতার মত শোনাচ্ছে, তবু না বলে যে পারি না। তা বলে মনে কোরো না, এতদিন বাদে তোমার কাছে আবার প্রেমভিক্ষা করতে এসেছি . . . তোমার প্রেমের অত অযোগ্য আমি নই—নিজের জন্তও কোন নিবেদন নিয়ে আজ আসি নি নিজের জন্তে চাইবার আর কিছু নেই . . . কিন্তু একবারটি এস, এই বিদেশে আমি একলা মেয়েমানুষ এই শয্যাগত রোগীকে নিয়ে সে কি অসহায় আছি বলতে পারি না। আত্মীয় স্বজন কেউ চিঠি লিখ্‌লেও আস্‌বে না তুমিও বোধ হয় জান . . .'

চিঠি পড়ে, কি, আফিঙের দরুণ, বোঝা গেল না, মাথাটা ভয়ানক ঝিম্‌ঝিম্‌ করছিল। শেষটুকু পড়ে উঠতে পারবেনা ভাবতে আবার তার বুক কেঁপে উঠলো। প্রাণপণে চেতনা সংগ্রহ করে চিঠির ওপর নিবিষ্ট করে সে পড়তে লাগল।—

'সব ইতিহাস এই চিঠিতে বলা যায় না, এইটুকু শুধু জেনে রাখ যে, তাঁর স্বেচ্ছা-

কত অমানুষিক অত্যাচারের ফলেই আজ তাঁর এই নিদারুণ ব্যাধি ও আমার এই ভয়ানক অবস্থা। একলা আমি রোগীর কাছে থাকব না অন্য বন্দোবস্ত করব .. তিন বছরের ছেলেটা আমার, অযত্নে মরতে বসেছে . . এই দুঃসময়ে কারুর কাছে আবেদন করবার আমার নেই কারুর কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশাও নেই। একদিন তুমি যাকে ভালবেসে ছিলে আজ তার মিনতিতে তাকে ভালবাসতে আর না পার সেই পুরাতন প্রেমের স্মৃতিটুকুর জন্যেও তার সব অপরাধ সব ত্রুটি ক্ষমা করে একবার তার সাহায্য করতে আসতে পারবে নাকি! এস তোমার পায়ে পড়ি, আমার ছেলেটাকে বাঁচাও . . .

সে আর পড়তে পারলে না তার ছবি এতদিনের নিষ্ঠুর নীরবতা ভঙ্গ করে তাকে চিঠি লিখেছে, তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে চিঠি লিখেছে, আর সে যেতে পারবে না! যার মূল্যে তার জীবনের মূল্য তার এই কাতর মিনতিকে সে কেমন করে উপেক্ষা করবে! তাকে বাঁচতেই হবে।

নিজের জীবনের আশঙ্কায় সে এইবার বিচলিত হল। ধরা কাতর গলায় ডাকলে, "পূর্ণ বাবু পূর্ণ বাবু!"

বৃদ্ধ নিজের বিছানায় পাশ ফিরে শু'ল।

এই খিটখিটে বৃদ্ধের কাছে কোন আশা নেই জেনে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলে সূর্য্য বাবু।—" কটুকণ্ঠে একজন উত্তর দিলেন, "রাতদুপুরে কি ডাকাডাকি!"

কান্নাধরা গলায় সে বললে, "একবারটি খুলুন সূর্য্য বাবু! বড় দরকার।"

"এত রাত্রে কোন দরকার নেই, যান্।"

"আমি আফিঙ খেয়েছি সূর্য্যবাবু আমায় বাঁচান।"

"আর ন্যাকামি করতে হবে না যান! সকাল বেলা যে কেলেঙ্কারী—"

অখিল আর শুনলে না। এই নির্ম্মম নির্ব্বিকার লোকগুলোর কাছে আবেদন বৃথা।

সে উর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে বেরিয়ে গেল দরজা খুলে। জ্ঞান হারাবার আগে তাকে নিজেই ডাক্তারের কাছে পৌঁছুতে হবেই। দুরন্তশীতের এই গভীর রাতে পথে কেউ ছিল না। ডাক্তারের বাড়ী বেশী দূর নয়। সে ছুটতে চেষ্টা করলে কিন্তু পায়ে শক্তি ছিল না। সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে আসছিল। সে চীৎকার করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু যে ক্ষীণ স্বর তারকণ্ঠে দিয়ে বেরুল তা শোনবার মত লোক পথে ছিল না। টলতে টলতে

সে এগিয়ে চল্‌ল। তার ছবি তাকে এতদিন বাদে ডেকেছে, তাকে যে যেতেই হবে।

আপাদমস্তক র‍্যাপারে ঢেকে নিস্তব্ধ পথ দিয়ে দুটি মজুর দ্রুতপদে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাক্‌লে, "আমায় ধর।"

একজন দাঁড়াল।

আর একজন তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে, আবার দাঁড়ায় দেখছিস্‌ না বেটা মদ খেয়েছে, কোন মতে ডাক্তারের বাড়ীর বন্ধ দরজার পাশে গিয়ে সে লুটিয়ে পড়্‌ল। সমস্ত সহর নিস্তব্ধ, দূরে কোথা থেকে শুধু গোটাকতক নিদ্রাহীন কুকুরের কলহ-কোলাহল তার কানে ক্ষীণভাবে এসে পৌঁছেছিল।

শিথিল দুর্ব্বল হাতে ডাক্তারের দরজায় ঘা দিয়ে সে কাতরকণ্ঠে ডাক্‌তে চেষ্টা কর্‌ল, ডাক্তার বাবু! কণ্ঠ থেকে সে স্বর বাইরে পৌঁছিল না বোধ হয়।....
আবার সে আঘাত দিলে, আবার, আবার। কিন্তু সে আঘাত ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আস্‌ছিল। তার হাতের মুঠোয় তখন ছিল তার ছবির চিঠি।

মানুষ বিনাশশীল, তাহার প্রেমও বিনাশশীল তাহা হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে অবিনশ্বর করিতে হইলে নিজের উপর অমর বিশ্বাসের প্রয়োজন।

"আয়না"

গুমোট

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

ভাঙা ধ্বসে-পড়া একটা একতলা বাড়ীতে গরীব এক কেরাণী আর তার মমতাময়ী প্রিয়া একটি সুন্দর খোকাকে ঘিরে আনন্দ-জাল বয়ন করত আর তাদের ছোট দুটি হৃদয়-পেয়ালায় অমৃত পরিবেশন করত।

কিন্তু একদিন মেঘ্‌লা আকাশের কালো গুমোট্ তাদের খুশীভরা জীবনের ওপর ছায়া ফেল্‌লে।

খুন্‌শুটি তাদের প্রায়ই হয়, অভিমানে তাদের হাসি-কান্না দিয়ে তারা নব নব প্রেমের খেলা আবিষ্কার করে। ছেলেটি হয়ত মেয়েটির ঘোম্‌টা খুলে ফেলে চুলের খোঁপার হাল্কা বাঁধুনিটা এলো ক'রে সারা মুখে কালো চুলগুলি ছড়িয়ে দেয়, মেয়েটি 'যাও' বলে অভিমান করে আর কখন্ খিক্ কোরে হেসে ফেলে। . . .

ছেলেটি হয়ত পড়্‌ছে, মেয়েটি কাছে দাঁড়িয়ে নানান্ কথা কইছে, আর কথা কইবার ফাঁকে ফাঁকে একটা দড়ি দিয়ে ছেলেটির পাঞ্জাবির সঙ্গে চেয়ারের পায়াটা বেঁধে দিচ্ছে। ছেলেটি মেয়েটির কথার মধুপান করতে করতে এত মশ্‌গুল যে কিছুই টের পাচ্ছে না। মেয়েটি পাৎলা রাঙা দুটি ঠোঁটের আড়ালে একটি দুষ্টু হাসি চেপে রেখে চলে যায়, ছেলেটি প'ড়েই চলে।

পড়া সাঙ্গ কোরে হঠাৎ তাড়াতাড়ি উঠ্‌তে গিয়ে চেয়ার শুদ্ধু উল্‌টে পড়ে যায়, মেয়েটি ঝর্ণার মত খিল খিল ক'রে হাসে, ছেলেটিও অপ্রতিভ হয়ে দড়ির বাঁধন খুলে মেয়েটিকে ধরে, তার লাল গালে আস্তে দুটি চড় ও পিঠে ছোট্ট মিষ্টি একটি কিল মারে, মেয়েটি হাত তালি দিয়ে হাসে ও অবশেষে একটি মধুর চুমায় এই অভিনয়টির শেষ হয়।

কোনোদিন বৃষ্টি নেমে আসে সারা আকাশ অন্ধকার ক'রে, শিল পড়ে, মেয়েটি তার ক্ষীণ কটিতে আঁচলটা বেঁধে চুলগুলি ঝুঁটি ক'রে মাথায় জড়িয়ে নিয়ে ছেলেটির সঙ্গে শিল কুড়োতে উঠোনে ছুটে আসে, জলে ভিজার আনন্দে দুজনে মাতাল হয়ে শিল কুড়োয়, চেঁচামেচি করে; আর ওপরে জান্‌লায় দেড় বছরের ছোট খোকাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবা-মা'র কাণ্ড দেখে আর নব-নব অর্থহীন অস্ফুট কথায় আনন্দ জানায়।

খোকাকে একটা চেয়ারে দাঁড় করিয়ে দুজনে হাত বাড়িয়ে সামনে দাঁড়ায়। মা বলে—আমার কোলে, বাবা বলে—আমার কোলে।

দুষ্ট খোকা চেয়ারটিতে তার ছোট-ছোট পা ফেলে নাচে, কারো কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে না, তারপর মা-বাবা দুজনেই খোকাকে জড়িয়ে ধরে' তাকে চুমায় আচ্ছন্ন ক'রে দেয়, খোকা বাচারী ভারী বিব্রত হয়ে পড়ে। খোকাকে চুমু দেবার ফাঁকে ছল কোরে নিজেদের মধ্যেও একটু বিনিময় হয়। শ্বশুর ভাসুরহীন এই দূর প্রবাসে একা একা এই দুটি ছেলে মেয়ে খুশীর হাট খুলে সারা দিন রাত বেচাকেনা ক'রে আর দিনের পর দিন কাটায়।

কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে সেদিন অফিস সকালেই ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটি ঘরে ঢুকে দেখে মেয়েটি মেজের উপুড় হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চোদ্দ লাইন্ মিলিয়ে-মিলিয়ে কবিতা লিখ্‌ছে! মেয়েটি কল্পনায় এত দিল্‌ভোল্ ছিল, ছেলেটি যে ঘরে ঢুকে উঁকি মেরে তার কবিতার খানিকটা দেখ্‌ছে তা টেরই পেলে না। ছেলেটি তাড়াতাড়ি নীচু হ'য়ে বল্‌লে 'বেশ কবিতা লিখ্‌ছ ত'! মেয়েটি অত্যন্ত লজ্জায় উঠে বসে তাড়াতাড়ি কাগজটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌লে। ছেলেটি অনেক সাধাসাধি করতে লাগ্‌ল লেখাটা দেখাতে, মেয়েটি কিছুতেই রাজী হ'ল না। ছেলেটি অত্যন্ত রাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপ ক'রে বল্‌লে, ভারী তো বিদ্যে, তা আবার কবিতা লেখা হচ্ছে!

মেয়েটি অভিমানে সারা মুখখানি রাঙা ক'রে বল্‌লে, আচ্ছা বেশ, আমার ছাই লেখাই ভালো! বলে কাগজটা বা'র ক'রে তক্ষুনিই টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে রাগ করে খোকাকে নিয়ে অন্তঃঘরে চলে গেল।

সামান্য একটি ঘটনা, তারপর থেকে এই দুটি স্বামী-স্ত্রী কথা বন্ধ ক'রে আছে আজ পাঁচ দিন। কেউ কারু সঙ্গে কথা কয় না, তবুও ঠিক তেমনি নির্ব্বিবাদে সংসারের কাজ চুকে যায়। এই অতল অভিমানের মধ্যেও তাদের খেলা চলে। দিনের মধ্যে তারা চোখে চোখ মিলাতে ভয় করে, কেউ কারুর কাছে এক মিনিটের জন্যও বসে না।

রাতে ছেলেটি একলা তক্তপোষের ওপর ঘুমিয়ে পড়্‌লে মেয়েটি মেজের মাদুর বিছিয়ে শোয়, মাঝরাতে ছেলেটি উঠে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে বলে' খোকাকে নিজের কাছে তুলে নেয়, আর একটা কাঁথা মেয়েটির গায়ে বিছিয়ে দিয়ে খোকাকে বুকে নিয়ে ঘুমোয়। কেউ কারু সঙ্গে কথা না কইলেও খোকাকে উপলক্ষ্য

ক'রে তারা কথার খেলা করে। ছেলেটি খোকাকে কোলে নিয়ে সুর ক'রে পদ্য মেলায়—

মুখটি যেন হাঁ-ড়ী,
চল্‌ল বাপের বা-ড়ী,
গুড়ি রাগের ঝাঁ-জে,
পদ্য মেলে না-যে!

মেয়েটি আবার তখুনি খোকাকে কোলে ক'রে তেমনি সুরে বলে—

খেয়ে দুটি ভা-ত
সকাল থেকে রা-ত
যেজন কলম পি-ষে,
পদ্য জানে কি সে?

সকাল বেলায় ছেলেটির কাছে মেয়েটি একটা সিকি কি আধুলি ছুঁড়ে দেয়, ছেলেটি পয়সাটা কুড়িয়ে একটা ধামা নিয়ে বাজার করতে যায়, বাজার ক'রে এনে ধামাসুদ্ধ সমস্ত মাছ তরকারী রান্নাঘরে মেয়েটির কাছে ঢেলে দিয়ে আসে, মেয়েটি অল্প একটু হেসে ছড়ানো জিনিষগুলি গুছোতে থাকে।

রবিবারের দুপহর। ছেলেটি চেয়ারে হেলান্ দিয়ে একখানি বাংলা উপন্যাস পড়্‌ছে, আর মেয়েটি ঘরে খোকাকে ঘুম পাড়াচ্ছে মুখে-মুখে ছড়া বানিয়ে, ছেলেটি একমনে সেই সব শুনছে ও মনে মনে ভারী খুশী হচ্ছে। মেয়েটি বলছে মিষ্টি সুরে—

খোকা এখন ঘুমো,
চোখের পাতায় চুমো!
খোকন্ আমার মাণিক,
নীল আকাশের খানিক!
খোকন্ আমার সোনা,
কপাল চাঁদের কোণা!

তারপর আবার সুর-ফের্তায় গাইছে—

টুলটুলে তোর মিশ্‌মিশে চোখ
তুলতুলে তোর গাল,
কোন্ পটুয়া আঁক্‌ল ঠোঁটে
ভোরের মেঘের লাল!

হঠাৎ ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে কড়া নড়ে উঠ্‌ল, ছেলেটি তাড়াতাড়ি দর্‌জা খুলে দিতেই দেখ্‌তে পেলে তাদের বাড়ীর সামনে একটি গাড়ী দাঁড়িয়ে, ও একটি সুবেশা তরুণী প্রফুল্ল মুখে দাঁড়িয়ে বাড়ীর চেহারা দেখ্‌ছেন। ছেলেটিকে দেখেই তরুণী একটু হেসে বল্‌লে, চিন্‌তে পাচ্ছেন-না?

ছেলেটি বল্‌লে, হাঁ পাচ্ছি বৈকি, আসুন। কোথেকে?

তরুণী বল্‌লে, কল্‌কাতা এসেছিলুম বোনের বাড়ী, এখুনিই পাঁচটার ট্রেনে যেতে হবে আবার। তা, পাপ্‌ড়ি আছে তো এখানে? না, বাপের বাড়ী?

ছেলেটি বল্‌লে, আছে আসুন। বলেই একছুটে মেয়েটির কাছে এসে হাজির হয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে, ওগো তোমার সই এসেছে।—

কে সই? বলে' মেয়েটি চম্‌কে সন্ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে চল্‌ল। এগিয়ে দেখে পাপ্‌ড়ি! খুব প্রফুল্ল হয়ে মেয়েটি তরুণীটির হাত ধরে অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে নিয়ে বসাল আর ছেলেটি তরুণীটির ঠাকুর-পোর সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে গল্পগুজব করতে লাগ্‌ল।

এই সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণীটির সঙ্গে মেয়েটির আলাপ ও ভাব হয় সেবার ট্রেনে কল্‌কাতা আস্‌বার সময়। ভাব এতদূর গড়ায় যে, তারা সই পাতিয়ে বসে 'পাপ্‌ড়ি'।

প্রায় একবছর পরে তরুণীটির সঙ্গে তার দেখা। তাদের এই নগণ্য নোংরা ভাঙা বাড়ীতে এই ধনীর গৃহিনীটির যথেষ্ট অভ্যর্থনা হচ্ছে না বলে মেয়েটি ভারী পীড়িত হচ্ছিল, তবুও তার স্নেহ সেবা ও হাসি দিয়ে সমস্ত বজায় রাখ্‌ছিল সে। খানিকক্ষণ আলাপ ক'রে, খোকার ঘুম ভাঙিয়ে তাকে চুমু খেয়ে, মেয়েটির ভরন্ত গালদুটো একবার টিপে দিয়ে তরুণী বল্‌লে—এবার উঠি, উনি একেবারে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। আজ পাঁচটার ট্রেন ধর্‌তে না পার্‌লে একেবারে সর্ব্বনাশ। এবার থেকে চিঠি লিখো কিন্তু।—'

তরুণী উঠ্‌তে যাচ্ছে দেখে মেয়েটি বল্‌লে, বা, মিষ্টিমুখ ক'রে যাবে না বুঝি?

তরুণী 'না না' বলে আপত্তি জানালেও মেয়েটি মানা মান্‌লে না।

চাবির রিঙ ও চুড়ীর আওয়াজ শুনে ছেলেটি বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মেয়েটি একটি টাকা ছেলেটির হাতে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে, কিছু খাবার কিনে নিয়ে এস। ছেলেটি তখুনিই খাবার কিন্‌তে ছুট্‌ল।

খাবার কিনে এনে ছেলেটি ডাক্‌লে—খোকা—'

মেয়েটি বেরিয়ে এসে খাবারের ঠোঙাটি হাত থেকে নিয়ে বললে, পাপ্ড়ি নাকি মিষ্টি খায় না, তুমি কিছু কমলানেবু কিনে আন! নেবু না পেলে একটা লেমনেড্ নিয়ে এস।

ছেলেটি তক্ষুণি নেবু আন্তে ছুটল।

নেবু নিয়ে এলে মেয়েটি একখানি সাজানো থালা তার হাতে দিয়ে বললে এথানা বাইরে ঠাকুরপোকে দিয়ে এস। আমি নেবু নিয়ে যাচ্ছি।

দোরের গোড়া পর্য্যন্ত এসে মেয়েটি তরুণীকে বিদায় দিলে, তরুণী গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ল, রাঙা মুখ বাড়িয়ে বললে—চিঠি লিখো কিন্তু এবার; আর ছুটী হলে পূজোর, ওঁকে নিয়ে আমাদের ওখানে একবার বেড়িয়ে এস।

গাড়ীটা চলে গেল।

মেয়েটি সদর দরজাটা বন্ধ কোরে দেখ্‌লে বাড়ীতে আবার তেমনিই একটি নীরব আনন্দে কাঁপ্‌ছে, কে যেন এসে দমকার মত সমস্ত গুমোট উড়িয়ে দিয়ে গেল! তাদের কথা কওয়া যে এমন ভাবে সুরু হবে, এ-কথা মেয়েটি কোনো দিন ভাবে নি। এতদিনের চুপ কোরে থাকার পর এখন সে ছেলেটির কাছে কেমন ক'রে যে এগোবে ভেবে পাচ্ছিল না, একটি আনন্দময় লজ্জায় তার সমস্ত গতিটি নিথর হয়ে পড়েছে।

ছেলেটিও উৎসুক হয়ে মেয়েটির প্রতীক্ষা করছে ঘরে বসে কিন্তু মেয়েটি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছে, তাকে এই লজ্জা থেকে কে বাঁচায়! কি ক'রে সে তার মুখের পানে চাইবে তারপর?—

সে আস্তে আস্তে ঘরে এসে ঢুকল তার সমস্তটি দেহ হাসির রঙে ছুপিয়ে, তার পরিপূর্ণ চোখে ঠোঁটের টানে গালের কাঁপনে হাতের তালে বুকের দোলায় সবখান থেকে হাসি ঝরে পড়্‌ছিল।

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে কাছে এসে হেসে তার হাসিটিকে অভ্যর্থনা ক'রে মেয়েটির দুটি হাত কাঁধে জড়িয়ে নিয়ে তার সমস্ত গুমোট্ মুছে দিল—অনির্ব্বচনীয় আনন্দভরা ছোট্ট একটি———'

ঘুমুবে? এখানে নয়। যাও কবর স্থান পড়ে আছে।...

"১৯২৩"

বাদল বেলা

—শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত।

(১)

সকাল।

কদিন মেঘ-মেঘ ক'রে কাল বিকাল থেকে যে বর্ষণ সুরু হয়েছে, তার আর ক্ষান্ত হবার নামটি নেই! আকাশের মুখ অত্যন্ত বিরস; যেন কোন গভীর বিষাদের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ঝির্ ঝির্ ক'রে জল পড়্‌ছে যেন উচ্ছ্বসিত রোদন সম্বরণ করবার ব্যর্থ প্রয়াস! . . . সারা বিশ্ব জুড়ে যে রোদন আজ জেগেচে, সে কার তরে কে জানে! বেদনার ভারে গুমরে-ওঠার মত একটা হাওয়া বয়ে গেল!

বসে আছি। কোনো কাজ আজ ভালো লাগ্‌চে না। পাশেই একখানা নভেল খোলা পড়ে রয়েছে; তিন পরিচ্ছেদ পড়েছি, আর পারি নি। মেঘে-ছাওয়া আকাশের দিকে চেয়ে আমার কেবলি মনে পড়্‌ছে—এমন দিনে তারে বলা যায় , . ,

কিন্তু কাকে?—কি যে বল্‌ব তা অস্পষ্টভাবে মনে জাগ্‌লেও যাকে বল্‌ব সে কই? কেই বা সে?

পাশের ঘর থেকে শব্দ আস্‌ছে সেলাইয়ের কল চালানোর। ক্ষমা কি যেন সেলাই কর্‌তে বসেছে। কদিন থেকে সে কি-একটা সেলাই করবে বলেছিল, বোধ হয় কাজের চাপে হয়ে ওঠে নি। আজ বাদলার অবসরে কাজ শেষ করতে বসেছে।

আজ আমার অন্তরে যে-কথাটি উঁকি দিয়ে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, সে কথা কি ক্ষমাকে বলা যায় না? কেমন ক'রে বল্‌ব, আর বল্‌লেই বা সে বুঝবে কি? কি জানি! আমার ত মনে হয় আমি বল্‌তেই পারব না, কেননা আমি বেশ জানি অনেক কথা খুব সহজ মনে হলেও আসলে তা ভারী শক্ত, কিছুতেই বলা যায় না; বল্‌তে গেলেই তার গভীরতা সব যেন কোথায় হারিয়ে যায়। তা ছাড়া বা-ও বা বল্‌ব, তাও নিশ্চয়ই না বুঝে সে হেসে উঠ্‌বে। সে হাসির আঘাতে

আমার সকল চিন্তা এমন বিকৃত হয়ে যাবে যে, তার বেদনা আমার পক্ষে বিষম হয়ে উঠ্‌বে।

ক্ষমার হাসি আমি বড় ভালবাসি; কিন্তু এখানে তার হাসি আমি সইতে পারব না; তার বিপুল মাধুরীই আমাকে দারুণ ব্যথা দেবে।

এই সে-দিন সে আমায় বল্‌ছিল, তুমি যে কি ছাই-পাঁশ বল আমায়! আমি বাপু অত বুঝ্‌তে পারি নে; সোজা ক'রে কি বলা যায় না?—

এই সরল স্বীকারোক্তির মাঝে একটা সহজ সুষমা আছে সত্যি, কিন্তু কেন যে সে আমার কথা বোঝে না, তা বুঝ্‌তে পারি নে!

ক্ষমাকে আজ পাঁচ বছর হ'ল পেয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয়, তাকে হয়ত আমি মোটেই পাই নি! যাকে পাবার জন্যে এককালে আমার সারা চিত্ত উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল, তাকে হয়ত আমি পাই নি। আমাকে ফাঁকি দিয়ে সে যে আমার মনের নাগালের বাইরে কোথায় পালিয়ে রইল, তার আর সন্ধানই পাওয়া গেল না! . . .

নিতান্ত আজগুবি হ'লেও এই চিন্তাকে আজ আমি কিছুতেই মন থেকে দূর ক'র্‌তে পার্‌ছি নে, বারে বারে ফিরে এসে আমার মনকে পীড়া দিচ্ছে।

হয়ত এই অদ্ভুত ধারণা আমার মনে এমন ক'রে ঠাঁই পেত না যদি ক্ষমার সঙ্গে আমার একান্তভাবে চেনা-চিনি হ'ত। এটাই আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ র'য়ে গেল যে! . . .

অনেকদিন এমন হয়েছে যে ক্ষমার হাতদুটি আমার হাতের মধ্যে নিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আছি। কালো তার নয়নের নিবিড় তিমিরের তলে কি যেন গভীর রহস্যের বাসা, সেই রহস্য ভেদ ক'র্‌তে পার্‌লেই আমি ক্ষমার সন্ধান পাব, এই আশায় কতদিন অমনি ক'রে ব'সে থেকেছি। কিন্তু যাকে খুঁজেছি, সে কোথায়! ক্ষমার হাসির আড়ালে, তার কথার অমিয়-ধারায়, তার দেহভরা মাধুরীর তলে আমার ক্ষমা কোথায় হারিয়ে গেছে!

আমার ভাবনার জাল ছিন্ন ক'রে হয়ত কখন ক্ষমার কথা কানে এসেছে—অমন ক'রে কি দেখ্‌ছ গো?—

কে একজন লিখে গেছেন,—প্রত্যেক মানুষ একটি দ্বীপ, সেই দ্বীপের চারিধারে বিচ্ছেদের অনন্ত সমুদ্র; সেই সমুদ্র পার না হ'তে পার্‌লে একজন মানুষের সঙ্গে আর একজনের নিবিড় পরিচয়ের কোন উপায় নেই।

আমার কিন্তু আরো মনে হয় যে, মানুষ তার জীবনের কোন এক সময়ে

এই অনন্ত বিচ্ছেদ-সমুদ্র পেরিয়ে যায় ;—হয়ত ও-পারের কূলে পৌঁছেই ফিরে আস্‌তে হয়, কিন্তু অন্যের তটে আঘাত সে ক'রে আসে নিশ্চয়ই, তা সে আঘাত যতই ক্ষীণ হ'ক্‌। নইলে এই অসীম বিরহের বন্ধনে একা মানুষ বাঁচতে পারে না।

তাই আমি ভাবচি যে, ক্ষমাকে হয়ত একবার ক্ষণেকের জন্যে পেয়েছিলুম, তাকে বোধ হয় সত্যি ক'রে পাওয়া যায় যদি আমার গভীর কথাটি তাকে গভীর সুরে শুনিয়ে দিতে পারি। ক্ষমা যে আমার কথা বোঝে না সে আমারি দোষ, আমি জানি না কেমন ক'রে বল্‌তে হয় !

কিন্তু আমিই বা কি ক'রব ? মনুষ্যের ভাষা এত দরিদ্র যে, তাতে মনের কোন গোপন খবরই বলা চলে না। ভাষায় প্রকাশ ক'র্‌তে গেলেই সব ভাব অত্যন্ত তরল হ'য়ে যায়, যতই না কেন সে গভীর হ'ক। কাজেই হাসি যে আসবে তাতে আর বিচিত্র কি ? অন্য কেউ ব'ল্‌লে আমারি হয়ত হাসি পেয়ে যেত।

২

বিকাল।

জোরে বৃষ্টি সুরু হ'ল। জলের ধারা সব ঐ গাছের ছায়ার তলে যেন দলে দলে নাচন জুড়ে দিয়েচে। আমার সুমুখে সবুজ তৃণ-আস্তরণে-ছাওয়া মাঠ আপনার অসীম উদারতায় বুক পেতে দিয়ে আছে, যেন তার কিছুতেই বিরক্তি নেই।

চেয়ে আছি।

মানুষের মনের সঙ্গে বাহ্য প্রকৃতির যে একটা অন্তরের মিল আছে, তা বোধ হয় সব চেয়ে ভালো বোঝা যায় বর্ষার দিনে। আকাশ যখন মেঘে ভারী, মনও তখন ঠিক তেমনি ভারী হ'য়ে থাকে ; কেন, তা জানা যায় না।

আমার মনে হয়, এই রকম দিনে মন সকল বাধা বন্ধ থেকে মুক্তি পেয়ে একেবারে মানুষের মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ায়। সে যেন একটা বোঝাপড়া ক'র্‌তে চায়। কাজের দিনে মনকে ত আমরা তেমন স্ফূর্ত্তি পেতে দিই না, তাই সে এমনি একটি অবসরের প্রতীক্ষায় সব কথা গোপনে রেখে দেয়। মনে হয় যে, মানুষের দৈনন্দিন কড়া-ক্রান্তির হিসাবের বাইরে অথবা জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি কথার বাইরে আর যে সব কথা মনের তলায় তলিয়ে থাকে, তারা কেমন যেন বেদনার বর্ণে রঞ্জিত। অবশ্য এই রকম কথার সব যে দুঃখের

কাহিনী হবে তা নয়; যদি সত্যিকারের সুখের কাহিনীও হয়, তবু তার তলে যেন গোপন ব্যথা লুকিয়ে থাকে!

সেই জন্যেই মন যখন ছাড়া পেয়ে মানুষের মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন মানুষ নিজের মধ্যে অত্যন্ত একটা ভার অনুভব করে। এ-ছাড়া ত আমি আজ আমার এই রকম বিকল-চিত্ততার কোন হেতু খুঁজে পাচ্ছি নে।

খানিক আগে ব'সে ব'সে লিখ্‌ছি, এমন সময় ক্ষমা এল; ব'ল্‌লে—কি করা হচ্ছে?

বল্লুম,—দেখ্‌তেই পাচ্চ। তারপর প্রশ্ন ক'র্‌লুম,—আজকের মেঘলা দিন তোমার কেমন লাগ্‌ছে?

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার পাশে ব'সে ক্ষমা ব'ল্‌লে,—খাসা দিনটি।

তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। কি সুন্দর তার মুখখানি! এই পাঁচ বছরেও আমার কাছে তার সৌন্দর্য্য একটুও কমে নি, বরং আজ বাদলের স্নিগ্ধ আলোকে তাকে আমার ভারী ভালো লাগ্‌ল। হয় তো সে আগের চেয়ে আরো দেখ্‌তে ভাল হ'য়েছে কিম্বা এ-ও হ'তে পারে যে, এত লক্ষ্য ক'রে তাকে বহুদিন দেখি নি, তাই আজ তাকে নতুন করে ভাল লাগ্‌ল।

আজ বাদলের দিনে যখন নিখিল-বিশ্ব কাজ থেকে অবসর নিয়েছে, এমন সময়ে দু'জনে এই রকম পাশাপাশি বসে থাকৃতে থাকৃতে তখন আমার মনে হল ক্ষমাকে যেন নিতান্ত কাছে আজ পেয়েছি! বল্লুম,—ক্ষমা, আজ বহুদিন পরে তোমাকে আমার কাছে পেয়েছি।

ক্ষমা যেন একটু অবাক্ হয়ে ব'ল্‌লে,—কেন, এতদিন আমি ছিলুম কোথায়?

ঐ তো মুস্কিল! এ কথার আমি কি জবাব দেব? নিজে যদি ভালো করে বুঝি, তা হ'লে হয়ত বোঝাতেও পারি। কিন্তু এটা বরাবরই ঝাপ্‌সা র'য়ে গেল, অথচ পীড়া দিতেও কসুর ক'র্‌লে না। . . .

সকাল বেলা ভাব্‌ছিলুম আমাদের প্রত্যেকের চারিধারে যে বিপুল বিচ্ছেদ-সমুদ্র আছে, হয়ত তা পেরিয়ে অন্যের মনের তট স্পর্শ ক'রে আসা যায়। এখন কিন্তু আমার মনে হ'চ্চে, তাতেই বা কি! অন্যের মনের নাগাল পাব, এই আশাতে আনন্দ থাকৃতে পারে, কিন্তু নাগাল যদিই বা পাওয়া গেল, তখন তার ভেতরে প্রথম মুহূর্ত্তের উন্মাদনা ছাড়া আর কি রইল? যে মুহূর্ত্তটিকে পরমতম লাভ ব'লে মনে হ'ল, তারি মধ্যে যে চরমতম লোকসানের অবস্থিতি, তার কি? আমার কাছে সমস্তই যেন প্রহেলিকায় পরিণত হ'তে চলেছে।

পাওয়া অথবা না-পাওয়া, এর কোন্‌টা যে ভাল তা আমি কিছুই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছি নে!

অন্য দিনে কাজের চাপে এ সব কথা মনেও হয় না, কিন্তু আজ অবধি ছুটির ভিড়ে মন অবোধ শিশুর মত নানা প্রশ্নে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকার পর ক্ষমা উঠে যাবার উপক্রম করতেই বাধা দিয়ে বল্‌লুম, কোথায় যাচ্ছ?

ক্ষমা ব'ল্‌লে, যাই কাজ আছে। তুমি ত আর কথা কইছ না, তার চেয়ে আমি কাজ সেরে রাখিগে।

আমি বল্‌লুম, কাজ তো রোজই আছে, আজ না হয় একটু গাফিলিই কর্‌লে। কেউ তো বকৃতে আস্‌ছে না।

—তা ত বুঝ্‌লুম, কিন্তু কর্‌তে হবে কি?

—একটা গান কর।

একটু হেসে ক্ষমা বল্‌লে, ঠাট্টা হ'চ্চে বুঝি? বুড়ো বয়সে এখন আমি গান গাইতে পারি নে।

ব'ল্‌লুম, না, না, সত্যি বলছি তুমি বেশ গাও; ঠাট্টা নয়। বেশ ভাল দেখে একটা।—

ক্ষমা গান ধর্‌লে,—

'নিদ্ নাহি আঁখি পাতে!
আমিও একাকী, তুমিও একাকী
আজি এ বাদল রাতে . . .

গান শেষ হ'লে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, এ কি হ'ল? তুমি আর আমি এই ত ব'সে রয়েছি, একাকী কোথায় হ'ল?

হয়ত কথাটা ক্ষমা ভাল বুঝ্‌লে না; সে বল্‌লে, কেন, গানটা কি ভাল নয়? আমার তো বেশ লাগে।

শুনে মনে হ'ল, হয়ত আমি যা ভাবছি ঠিক সেই কথাই ক্ষমার মনে জাগ্‌ছে আরো অস্পষ্ট ভাবে; সেও বুঝি আপনাকে নিতান্ত একাকী অনুভব করছে আমারি মত! . . .

আমরা দু'জনেই নীরব। একটু পরে ক্ষমা উঠে গেল; মনে হ'ল একটা দীর্ঘশ্বাস তাকে ঘিরে রয়েছে! . . .

আজ আমাদের দু'জনেরি মনের মাঝে জাগ্‌ছে হয়ত এই-ই কথা, কিন্তু কেউ কাউকে বোঝাতে পার্‌ছি না ; এ কি কম দুঃখ ?

শুনেছি কাছের মিলন খণ্ড, পূর্ণ মিলন লাভ ক'র্‌তে হ'লে বিচ্ছেদের অগ্নি-পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া চাই। কিন্তু এই যে অন্তরের নিগূঢ় বিরহ, এর মাঝে কোথায়, কেমন ক'রে মিলন সম্ভব ?

দূর হোক, আর ভাব্‌ব না। যতই কথাগুলো নিজের কাছে সরল ক'রে তুল্‌তে চাচ্ছি, ততই সব যেন আরো জটিল হ'য়ে উঠ্‌ছে। মনের তলায় যত কথা তলিয়ে থাকে, তাদের নাড়া দিতে যাওয়া মহা বিপদ !

সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে ; দিনের ম্লান আলো আরো মলিনতর হ'য়ে এল। যূথী-বনের গন্ধে ভরা মৃদু বাতাসে আমার চারিদিক সুবাসে বিহ্বল ক'রে তুল্‌ছে।

দূরে অন্ধকার ক্রমেই জমাট হ'য়ে আস্‌ছে। মনে হ'চ্ছে, বর্ষার আহ্বানে যেন কোন বিরহিনী ঘন বনের তলে তলে ছায়ার ঘোমটা মাথায় তুলে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে। আপনার রিক্ততার ভারে ব্যথিত হ'য়ে সে আজ বার হ'য়েছে কি জানি কিসের আশায় ! . . .

আমি ভাবচি, আমার এই বাদল বেলা কাটে কি ক'রে ?—

---

* * * তাই মনে হয় পৃথিবীতে এমনি যে দিন আর ফেরানো যায় না, অন্ধকারের ঢাকা দিয়ে শরীরটাকে ভুলে যেন তাকে ফিরে পাওয়া সম্ভব।

"রুদ্ধগৃহ"

২৮৫

বিধবা

—শ্রীঅহল্যা গুপ্ত।

৪

একদিন বৈকালে রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া তরকারী কুটিতে কুটিতে মিত্র-বাড়ীর বড়-বৌ প্রমদা মেজ-বৌ মায়াকে বলিলেন, দেখ মেজবৌ, মাধবী এখন বড় হয়েছে, যার তার সঙ্গে তাকে আর মিশ্‌তে দেওয়া ভাল দেখায় না।

মায়া কিছুদিন হইতে প্রমদার মুখে এরূপ কোনও কথা শুনিবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছিল। তাই কিছুমাত্র আশ্চর্য্য না হইয়া উত্তর করিল, যার তার সঙ্গে ও আর কোথায় মিশ্‌বে? অজিত বাড়ীর ছেলে, তার সঙ্গেই যা' একটু অধিক কথা বলে।

প্রমদা যেন খুব ব্যস্ত এইভাব দেখাইয়া বলিতে লাগিল, তা' অজিতের সঙ্গেই বা কেন কথা কইবে? অজিত ত আর ছোট ছেলেটি নেই।

অজিতের মা ইন্দিরা সেখানে বসিয়া ডাল বাছিতেছিল। প্রমদা বৌ হইলেও ইন্দিরা তাহার কথাটা সহ্য করিতে পারিল না, সে বলিয়া উঠিল, তাতে দোষের কি হয়েছে বড়-দি? অজিত পুরুষ হলেও তারও ত নিজের একটি সম্মান-জ্ঞান আছে। সে ত আমাদেরই ঘরের ছেলে, সে যদি এই শিক্ষাটুকুও না পেয়ে থাকে তাহলে সে আমাদের অপরাধে। আর মাধবী যে আমাদেরই মত মেয়ে সে কথা একেবারে ভুলে যাও কেন? তার কথা অমন করে ভেবে নিজেদেরই এমন অপমান করছ কেন?

বড়-বৌ প্রমদা এবার চটিয়া গেল। মনের ঝাঁঝ মিটাইয়া বলিল, তোমাদের বক্তৃতা করতে হয় হাটে দাঁড়িয়ে করলেই পার। লোকের কাছে খুব বাহবা পাবে।

ইন্দিরাও ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে বলিল, তুমি একথা বলবে তা আমি অনেক আগেই জানতাম। নেহাৎ নিজের জাতের অপমানটা সইতে পারি না, তাই তোমার কথায় এ বিবাদ করেছিলাম। মাধবী বিধবা বটে কিন্তু সে-ও ত মেয়ে।

মায়া তাহার মেজ-জায়ের কথা শুনিয়া একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে ইন্দিরার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, চুপ কর মেজ-দি, চুপ কর। বড়-দি ত আমাদের জন্যই বলেছেন।

এমন সময় অজিত সেখানে উপস্থিত হইতেই প্রমদা তাহাকে আদর করিয়া বলিল, কি যে চেহারা হচ্ছে ছেলের! খাওয়া দাওয়া ত একবারে ছেড়ে দিয়েছ অজিত। আজ বিকেলে জলখাবার খেয়েছ?

অজিত হাসিয়া বলিল, খেতে পাই নি বলেইত দেখ্‌তে এলাম, তোমরা বাড়ীতে আছ কি না!

প্রমদা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন, কেউ দেয় নি?

মায়া ছোট-বৌ, তাহারই খাবার দিবার কথা। সে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, একেবারে ভুলে গেছি বড়দি। কথায় কথায় কিছুই মনে নেই।

বড়-বৌ রাগ করিয়া বলিল, আমরা না হয় কাজে ব্যস্ত থাকি কিন্তু মাধবীও ত অজিতের এসব ছোট খাটো জিনিসগুলো দেখ্‌তে পারে। অষ্টপ্রহর কেবল বসে বসে ভাব্‌লে ত আর দিন চলে না।

অজিত দেখিল, জলখাবার ত মিলিল-ই না, বরং সকল দোষ সেই জন্ম-অপরাধিনী মাধবীর ঘাড়েই পড়িল। সে নিজেই সকল দোষ মাথায় লইয়া বলিল, আমিই মাধবীকে বারণ করে দিয়েছিলাম, তার কারণ সবাই এটাকে নিয়ে—'বলিতে বলিতে অজিত থামিয়া গেল।

গতিক দেখিয়া ইন্দিরা অজিতকে লইয়া আপনার ঘরে আসিয়া বলিল, অজিত, তোমাকে আজকাল এমন দেখি কেন? বুঝ্‌তে পারছ, তোমার এ অবস্থাটা যে কেবল আমি লক্ষ্য করেছি তা নয়, বড়-দিও ত সেই কথাই বল্‌লেন।

অজিত একটু ভাবিল। তাহার পর মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, মা বিধবাদের কি আবার বিয়ে হতে পারে না!

ইন্দিরা জোর করিয়া বলিল, কেন হতে পার্‌বে না? আমার ত ইচ্ছে মাধবীকেও মায়া বিয়ে দেয়।

অজিত সাহস পাইয়া বলিল, আমি ত পড়া শেষ করেছি। কাজকর্ম্মও করছি। তাহারপর কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, বাবা কি বিধবার বিয়ে হওয়া অন্যায় মনে করেন?

ইন্দিরা উত্তর করিল, তা ঠিক জানি না, তবে নিজের ছেলেকে যদি বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিতে হয়, তাহলে তোমার বাবা কেন, অনেক বাবারই মত বদ্‌লে যাবে।

মা, একটা কথা বল্‌লে রাগ করবে না বল? তোমরা মাধবীর কষ্ট কিছু বুঝছ?

হাঁ বাবা বিধবার একটু কষ্ট সহ্য করতে হয়।

মা, তুমিও এই কথা বল্‌লে? অজিত উত্তেজিত হইয়া বলিল, তাহলে তোমরা সবাই একদলের। তোমাদের আশী বছরের বুড়োরা পঞ্চমপক্ষের স্ত্রী এনে শিশু পত্নীর চিত্তজয় করবার জন্য প্রহসন করতে পারে, আর তোমাদেরই মেয়ে বোন্ শুধু নির্জ্জলা একাদশী করে, পূজা অর্চ্চনা করে তাঁদের ধর্ম্ম রক্ষা করবে?

এবার ইন্দিরা অজিতের মাথায় হাত দিয়া বলিল, তুই যদি চাস্ আমি মাধবীকে তোর সঙ্গে বিয়ে দেব। পারবি?

অজিত বলিল, তুমি যদি সহায় থাক, তুমি যদি বল্‌তে পার অন্যায় হবে-না, তবে আমি নিশ্চয় পারব।

কিন্তু অজিত—

অজিত রুখিয়া বলিল, কিন্তু কি? যখন এসব কথা ভাবি না তখন বেশ থাকি কিন্তু এসব বিধি-নিষেধের কথা যখন ভাবি তখন শিরায় শিরায় যেন আগুনের ফুল্‌কি জল্‌তে থাকে। মাধবী বলে নয়, এ রকম সমস্ত বিধবারই কথা এক সঙ্গে মনে পড়ে যায়, আর মনে হয়—

ইন্দিরা বাধা দিয়া বলিল, অজিত, এত পাগল হোস্ নে। এ সংসারটা পাগলের জায়গা নয়। জোর যদি থাকে, সময় এলে তা দেখিও।

৫

তাহার পর একদিন রাত্রে ছাদে বসিয়া ইন্দিরা বলিল, মায়া ওটা আমাদের মজ্জাগত সংস্কার কিনা তাই ভয় হয়। কিন্তু আবার মনে হয়, আমরা মেয়েরাই এ সব নিয়ে বেশী নিন্দে রটাই।—

মায়া বলিল, মাধবী আমার বোন বলে আমার সাহস আরও বেশী। অন্যের কথা নিয়ে অনেকে উপদেশ দিতে পারে, কিন্তু নিজের বেলা যেন সকলের হাত-পা গুটিয়ে আসে।

ইন্দিরা কি ভাবিল। মায়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, জানি একটা সম্পর্কও আছে। তা হলেও আমি কোনও বাধা দেখি না। এ কাজে কেউ যদি বাধা

দিতে আসে, আমরা দুজনে অন্ততঃ সে বাধাকে এড়িয়ে যাবই। পারব না মেজদি ?

ইন্দিরার স্বামী ঘরে আসিয়া ডাকিলেন, মেজবৌ।

তাহাদের কথা থামিয়া গেল। ইন্দিরা ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার স্বামী খুব হাসিতেছে। সে একটু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার ?

বিনয় বলিল, এ বয়সেও জ্যোৎস্নারাত্রে মন কেমন করে দেখ ছি!

রাত্রে ইন্দিরার শরীরটা যেন ভয়ানক খারাপ বোধ হইতে লাগিল। সে শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

বিনয় অনেক ঠাট্টা তামাসা করিয়া যখন কোনও উত্তর পাইলনা তখন ইন্দিরার কপালে হাত দিয়া দেখিল তাহার ভয়ানক জ্বর! সারারাত্রি ইন্দিরা কেবলই ছট্‌ছট্ করিয়া কাটাইল।

রাত্রিশেষে সে আরও যেন কাতর হইয়া পড়িল। মাধবী ঘরে আসিলে বিনয় ডাকিয়া বলিল, মাধবী অজিতকে একটু ডেকে নিয়ে এস ত।

অত ভোরে আর কেউ বড় উঠে নাই। মাধবী অনেক ভাবিয়া অজিতের ঘরের দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বড়বৌ ঠাকুরের নাম করিয়া চোখ চাহিতেই দেখিল, মাধবী অজিতের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

সে মায়ার ঘরে গিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়া বলিল, আমার সঙ্গে এস। মায়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাহার সঙ্গে চলিল। তখনও তাহার চোখ জোড়া ঘুম। সে বলিল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ দিদি ?

বড়বৌ উপহাস করিয়া বলিল, তোমার বোনের ঘরে।

মানে ?

মানে আবার কি ? দেখ্‌বে চল না।—

মায়া ও বড়বৌ আসিয়া দেখিল সত্যই মাধবী চোখের জল মুছিতে মুছিতে অজিতের ঘর হইতে বাহির হইয়া ইন্দিরার ঘরের দিকে যাইতেছে। আর অজিত প্রায় পাগলের মত তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া বলিতেছে, মাধবী, আমি তাহলে যাই—

মায়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। আর তাহার বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া বড়বৌ মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

৬

অজিত যখন ডাক্তার লইয়া আসিল, তখন ইন্দিরা একেবারে অজ্ঞান। ডাক্তার বাহিরে আসিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল।

দিনরাত্রি সেবা চলিল। কয়েকদিন পরে ইন্দিরার জ্ঞান হইল। সে মায়াকে কাছে ডাকিল। ইন্দিরার জ্ঞান হইয়াছে শুনিয়া বাড়ীর সকলেই ছুটিয়া আসিল। প্রমদা আসিয়া নানা কথা বলিয়া অনেক চোখের জল মুছিল। মাধবীর আর এ কয়দিন আহার নিদ্রা ছিল না। অজিত ডাক্তার ওষুধ লইয়া ব্যস্ত থাকিত। মাধবী যখন অধিক রাত্রে ক্লান্ত হইয়া ইন্দিরার পায়ের তলায় শুইয়া পড়িত, তখন অজিত জাগিয়া মাধবীর মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিত, বুঝি ইন্দিরার স্নেহধারা হইতে মাধবী বঞ্চিত হয়!

ইন্দিরা মায়াকে কাছে ডাকিয়া বলিল, মাধবীকে ডাক, মাধবী ইন্দিরার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ইন্দিরা বলিল, মাধু কাছে আয়। তাহারপর মায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, বেঁচে থাক্‌তে গেলে মানুষের যত ভয়ের কথা ভাব্‌তে হয়, মর্‌বার পথে যে তা কিছু থাকে না তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

বিনয় কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে ইন্দিরা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, দেখ, সব দোষ আমার নামে দিও। আমি মাধবীকে অজিতের হাতে দিয়ে যেতে চাই।

এমন সময় অজিত আসিয়া একেবারে ইন্দিরার কোলের পাশে বসিয়া পড়িল। তাহার মুখে আর হাসি ধরে না। কত রকমে কত ভাবে সে মাকে ডাকিল। ইন্দিরার মুখেও উজ্জ্বল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করিল, কতক্ষণ এসেছিস্‌ আপিস থেকে?

অজিত হাসিয়া উত্তর করিল, এই মাত্র।

বিনয় ধীরে বলিল, অত কথা বলো না। শরীরটা ত তোমার ভাল নয়।

ইন্দিরা হাসিয়া উত্তর করিল, না, আর বেশী কথা বল্‌ব না। কেবল তোমরা বল অজিতকে মাধবীর সঙ্গে বিয়ে দেবে?

অজিত কথা শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল, মাধবী খাটের কোণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে মুগ্ধের মত চাহিয়া আছে!

বড়বৌ সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলিয়া উঠিল, তাহলে আমাদের এ

বাড়ী ছেড়ে যেতে হয়। এ সব অনাসৃষ্টি আমাদের সঙ্গে বাস করে চলবে না। আর বিয়েরই বা দরকার কি? এমনিই ত বেশ চলেছে।

মায়া বুঝিতে পারিল, কোন্ বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া বড়বৌ এ কথা বলিল। সে নিজে তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল সত্য, কিন্তু বড়বৌকে কিছু বলিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সে ভাবিয়াছিল চুপ করিয়া থাকিবে কিন্তু এ কথা শুনিয়া তাহার বুকের ভিতর বড় জোরে আঘাত লাগিল। সে বলিয়া উঠিল, তোমার মন যা ভাব্‌তে পারে, মানুষের তা কাজে কর্‌তে অনেক দেরী লাগ্‌বে।

ইন্দিরা ডাকিল, বড়দি। বড়বৌ উত্তর করিল, কি?

আমার কথাটা রাখ্‌বে না? তুমি মাধবী আর অজিতের বিয়ে দেবে না?

মায়া ঘোমটা দিয়া বসিয়াছিল। সে বড়বৌয়ের মুখের দিকে চাহিল।

বড়বৌ বলিল, মাধবী যে বিধবা।

মাধবীর মুখ হইতে একটি ক্ষীণ আর্ত্তস্বর ফুটিয়া বাহির হইল, মাগো—

অজিত মায়ের হাতদুখানি ঠোঁটের কাছে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, মা, তোমার আশীর্ব্বাদ পেয়েছি, আর তুমি কিছু ভেবো না। এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হয় তাই যাব। তুমি এখন একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর।

বড়বৌ কান্নার সুরে বলিতে লাগিল, আমাকে বিধবা পেয়ে এত অপমান কর্‌ছ তোমরা?

ইন্দিরা একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, ঠিক ঐ কথাটাই মাধবীও ভাব্‌ছে, কিন্তু মুখ ফুটে বল্‌তে পার্‌ছে না।

বড়বৌ রাগিয়া গিয়াছিল। সে এ কথার পর মাধবীকে একেবারে হিড় হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিয়া অজিতের কাছে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিল, এই নাও তোমার ছেলে আর ছেলের বৌ, এবার হ'ল?—

ইন্দিরা বলিল, ওদের মাথায় হাত দিয়ে তুমি আশীর্ব্বাদ করে দাও। আমি ত উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

বড়বৌ এবার সত্য সত্যই কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বিধবার কি আশীর্ব্বাদ কর্‌বারও ক্ষমতা আছে? তার আ শীর্ব্বাদে যে তোমাদের শাস্ত্রে অমঙ্গল হয়।

এই বলিয়া বড়বৌ অজিতের আর মাধবীর মাথা দুইটি নোয়াইয়া ধরিয়া ইন্দিরাকে বলিল, তুমিই এদের আশীর্ব্বাদ করে যাও।

ইন্দিরা তাহাদের বুকের কাছে টানিয়া লইল। তাহাদের মাথার উপর নিজের মুখটি চাপিয়া রাখিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। অনেকক্ষণ ঐ ভাবে থাকিয়া যখন অজিত মাথা তুলিল, তখন সকলে দেখিল, মাধবীর মাথার উপর সধবার শেষ হাসিটি চিরদিনের জন্ত ফুটিয়া রহিয়াছে। ইন্দিরার শেষ নিঃশ্বাস তাহাকে অবিনাশী করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

ভালবেসে চেপে মারার চাইতে ভালবেসে ছেড়ে থাকাই ভাল।

"মুক্তধারা"



পান্থবীনয়

— শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৭

অমরেশ চলিয়া গেলে নিভার মনটাও কেমন যেন আজিকার এই উৎসব-ক্ষেত্র হইতে কোথায় কোন্ অজানা গলির ভিতর কোন অচেনা বাড়ীর পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। উৎসব, গান, হাসি, আমোদ, তাহার আর কিছুই ভাল লাগিল না। পরীক্ষার ফেলের খবর পাইলে খুব ভালো ছেলে-মেয়ের মনের অবস্থা যেমন হয়, নিভারও যেন আজ তাহাই হইয়া গেল।

তাহার অসমাপ্ত গানখান বন্ধুদের অনুরোধে আবার তাহাকে শেষ করিয়া গাহিতে হইল।

একজন বন্ধু বলিয়া উঠিল, তেমন জম্‌লো না ভাই নিভা,—ও কার কি হয়েছে রে? তোর দাদা যে অমন করে ছুটে গেলেন?

কি জানি, কার কি হলো ভাই, সে-ই জানে।—এই বলিয়া নিভা পুনশ্চ কহিল, আর একটা গান শুন্‌বে নাকি?

বন্ধুরা প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। নিভা আবার গাহিল; কিন্তু যত আগ্রহে ব্যাপারটাকে তরল করিয়া দিবার জন্য সে ভালো করিয়া গাহিতে গেল, গলা

তাহার তেম্নি দ্বিগুণ নিরুৎসাহে নামিয়া আসিল, মাঝে-মাঝে সুর কাটিল, গানের ছত্র ভুলিয়া গেল,—অবশেষে এম্‌নি বিশ্রী বেথাপ্পা রকমে গানটা সে শেষ করিল যে, তাহার নিজের উপরেই নিজের রাগের আর অবধি রহিল না।

বন্ধুরা প্রশংসা ত করিলই না, বরং পাৎলা সিপ্‌সিপে মেয়েটি আর একটি মেয়ের গা-টিপিয়া বক্র কটাক্ষের ইসারায় কি যেন জানাইয়া দিল।

গা-টেপা মেয়েটি বলিয়া উঠিল, গলা তোর খারাপ হয়ে গেছে নিভা।

গলা তাহার সত্যই খারাপ হইয়াছে কি-না অন্যদিন হইলে নিভা তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিত; কিন্তু নিন্দা, প্রশংসা আজ তাহার গায়ে বাজিল না। বরঞ্চ, তাহাতেই সায় দিয়া বলিল, হাঁ ভাই, তাই মনে হচ্ছে।—দাঁড়া ভাই, তোরা একটু বোস্, ঠাকুর রান্নার কি কতদূর করলে আমি একবার দেখে আসি। বলিয়া সে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

চশমা-পরা মোটা এবং কালো মেয়েটির বোধ করি মেঝের উপর ঢালা-বিছানায় বসা কোনো দিন অভ্যাস ছিল না, তাই তিনি এতক্ষণ গান না শুনিয়া ক্ষণে-ক্ষণে বিরক্ত হইয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন; এইবার তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া নিভার পরিত্যক্ত চেয়ারখানার ভিতরে অতি কষ্টে তাঁহার মোটা দেহটি প্রবেশ করাইয়া দিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি গান গাহিতে পারিতেন না; তাই উপহাসচ্ছলে তাঁহার সম্মুখস্থ হারমোনিয়ামের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পাৎলা মেয়েটি বলিয়া উঠিল, তুমি একটা গাও না কমলা-দি!

কথাটা শুনিয়া তিনজনেই হা হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিভা তখন তাহার নিজের ঘরের জানলার পাশে দাঁড়াইয়া উদ্‌গ্রীব চঞ্চল নয়নে রাস্তার দিকে তাকাইয়া অমরেশের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু মিনিট দশেক বৃথাই তাকাইয়া থাকিয়া কাহাকেও যখন দেখিতে পাইল না, তখন সে বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

বুড়ী-মেয়ের মত বিভা রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া নূতন ঠাকুরকে কত-কি বলিতেছিল। সহসা দিদিকে নামিয়া আসিতে দেখিয়া চুপ করিল।

নিভা ঈষৎ হাসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, কি গো কনের-মা, হলো তোমার?

বিভা তাহার অপ্রতিভ ভাব গোপন করিয়া বলিল, তুমি আবার কি জন্যে নেমে এলে দিদি? হলে ডাকব, যাও।

কৈলাসের সন্ধানে নিভা একবার এদিক ওদিক তাকাইল, কিন্তু তাহাকে ডাকিতে পারিল না। অবশেষে নিজেই সে বাহিরের ঘর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেল, কিন্তু সেখানেও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কৈলাস কি দাদার সঙ্গে গেছে না কি রে বিভা?

বিভা বলিল, না। সে বাজারে গেছে মিষ্টি আনতে।

সে যে কতক্ষণ গিয়াছে নিভা তাহা জানিত না, তথাপি বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল, গেছে সে কি আজ না কাল? ফিরবে কখন্ তার ঠিক নেই।

না দিদিমণি, বেশী দেরী ত আমার হয় নি।

নিভা পিছন ফিরিয়া দেখিল, মিষ্টির চুপ্‌ড়ি হাতে লইয়া কৈলাস তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বলিল, ওটা নামিয়ে রেখে এসে একবার শোনো ত কৈলাস!

কৈলাসকে সঙ্গে লইয়া নিভা পুনরায় উপরে উঠিয়া আসিল এবং তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কহিল, ওদের বাড়ীতে তুমি কি দেখ্‌লে কৈলাস?

কৈলাস প্রথমে কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কাদের বাড়ীতে দিদিমণি? কখন?

গাঁজা-টাঁজা খেয়েছ নাকি? বংশীবাবুদের বাড়ী। তুমিই গিয়েছিলে না?

কৈলাস একটুখানি অপ্রতিভ হইয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমি ত বাড়ীর ভেতরে যাই নি দিদিমণি। বংশীবাবুকে ডাক্‌তেই তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন, আমি ত যেতে পারব না কৈলাস, বাবার যে হঠাৎ কি হলো কিছু বুঝ্‌তে পারছি না। তার চেয়ে তুমি বরং অম—এই আমাদের দাদাবাবুকে একবার—। এই পর্য্যন্ত বলেই উনি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেলেন। কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

নিভা তাহার মুক্তা-পঙ্‌ক্তির মত দাঁত দিয়া হিঙ্গুল বরণ পাৎলা ঠোঁটটি একবার চাপিয়া ধরিল। বলিল, দাদা ত এখনও ফিরলো না। এদের আমি তাড়াতাড়ি খাইয়ে বিদেয় করি। দাদা যদি তখনও না ফেরে ত,—আচ্ছা যাও। দেখ ত ঠাকুরের সব হলো কি না! রাঁধ্‌তে এত দেরী করলে কিন্তু চল্‌বে না বাপু, ওকে বলে দাও।

কৈলাস বোধ করি তাহাই বলিবার জন্য চলিয়া গেল।

নিভা আর একবার তাহার ঘরের জানালা হইতে পথের দিকে উঁকি মারিয়া

বন্ধুদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের হাসি-তামাসার যোগ দিয়া জোর করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

আহারাদি শেষ করাইয়া ঘরের গাড়ী দিয়া তাহাদের বিদায় করিতেই রাত্রি প্রায় ন'টা বাজিয়া গেল।

দাদা তখনও ফিরিতেছে না দেখিয়া নিভা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, বিভা, তুই খেয়ে নে ভাই, আমি একবার কৈলাসকে নিয়ে দেখে আসি। কেমন?

বিভা বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, আর আমি বুঝি যাব না? আমি একলা বাড়ীতে থাকি কেমন ক'রে বল ত?

নিভা সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, বেশী পাকামি করিস্ নে বিভা। ঠাকুর রইলো, দুটো চাকর রইলো, একটা ঝি রইলো,—বেশ থাক্‌তে পারবি।

কিন্তু এই বোন্‌টাকে একা ঘরে ফেলিয়া সত্যই সে যাইবে কি-না কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। না-জানি সেখানে কি বিপদ ঘটিয়াছে,—এই ছোট মেয়েটা সেখানে গিয়াই বা কি করিবে! সে নিজেও অবশ্য কিছুই করিবে না তবুও—

উপায়হীনের উত্তেজনার মুহূর্তে যেমন রাগ করিবার পাত্রাপাত্র বিচার থাকে না, নিভাও তেম্‌নি বিভার উপর রাগ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু নিভা যখন রাগ করে, বিভার মুখখানি তখন ভয়ে-ভাবনায় একেবারে শুকাইয়া যায়। তখন তাহার এই দিদির শান্ত-সুকুমার মুখের উপর এমন একটা বিজলী-তীব্র জ্যোতির্ম্ময় মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে যে, সভয়ে তাহাকে মুখ ফিরাইয়া লইতে হয়। জলন্ত অগ্নিশিখার মত সত্যই তাহা এত বেশী সুন্দর যে, একবার দেখিয়া সাধ না মিটিলেও কাছে বসিয়া মানুষে সেদিকে তাকাইয়া থাকিতে পারে না।

নিভার সে রাগ থামিতে-না-থামিতেই সিঁড়ির উপর কাহার জুতার শব্দ হইল। উৎকন্ঠিতা নিভা সেই দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিল,—তাহার দাদা।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রেমাস্পদের চিঠি আসিলে সৈনিক-প্রিয়া সে পত্রখানি খুলিতে যেমন ইতস্তত করে,—লড়াই এ না-জানি তাহার কোন্ অঙ্গ আহত হইয়া গেল, এই ভাবিয়া সে যেমন ঘন-স্পন্দিত বুকের উপর চিঠিখানি কিয়ৎক্ষণ চাপিয়া রাখে,—নিভাও তেম্‌নি তাহার দাদার মুখের পানে তাকাইয়া সন্দেহ-

কোলায় দুলিতে লাগিল,—আসিবামাত্র তাড়াতাড়ি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

অমরেশ নিজেই বলিল, বিপদের উপর বিপদ দেখেছিস্ নিভা? একে বেচারীর চাকরী নেই, তার ওপর হঠাৎ আজ তার বাবার বাঁ-হাতটা 'প্যারালাইজ্ড্' হয়ে গেল।

প্যারালাসিস্?

হাঁ। কাল রাত থেকে জ্বর হয়েছিল! বুড়ো মানুষ, কি যে হবে,—সে না হয় পাকা ফল হয়েই রয়েছে, কিন্তু বংশীর অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ্।

বাড়ীতেও ত কেউ নেই, এক দিদি ছাড়া?

না। বলিয়া অমরেশ কাপড় জামা ছাড়িবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল।

আমাদের খাবার নিয়ে এসো ঠাকুর। বলিয়া নিভা একটুখানি আড়ালে চলিয়া গেল।

খাইতে বসিয়া অমরেশ বলিল, কাল আমাদের ওই রাম-ধনা চাকরটাকে বংশীর বাড়ী পাঠিয়ে দি, দিন কতক কাজকর্ম্ম ক'রে দিক, তা নইলে ওদের বড় কষ্ট হবে। না, তুই কি বলিস নিভা?

নিভা বলিল, দেখ ত! চাকর পাঠাবে, তার আমি কি বলব? আমায় কি জিজ্ঞেস কর্‌ছো?

অমরেশ মুখ তুলিয়া নিভার আরক্তিম মুখের পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, বা, এতেই রাগ হয়ে গেল তোর?

নিভা বলিয়া উঠিল, হবে না? তোমার বন্ধুর বাড়ীতে বিপদ, চাকর পাঠাবে না ডাক্তার পাঠাবে, আমি কি তোমায় বারণ করব নাকি?

অমরেশ ধীরে ধীরে বলিল, না রে না পাগ্‌লী, তা নয়। সেদিন বংশীর বাড়ীর ভাড়াটা মিটিয়ে দিলুম, তুই বল্‌লি, পরের বাড়ীর ভাড়া মেটানো, তাই তোকে একবার কথাটা জিজ্ঞেস কর্‌লুম বই তো নয়! তুই বংশীকে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারিস্ নে তা আমি জানি, কিন্তু ওরা বড় গরীব রে! দু'বেলা ভাল ক'রে খেতে পায় কি না কে জানে!

পাতের লুচিগুলা নিভা হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল,—সেগুলো খাইতে তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না।

অমরেশ আবার বলিল, বিশ্বাস না হয়, কাল তুই আমার সঙ্গে চ একবার,

স্বচক্ষে তাদের অবস্থাটা একবার দেখেই আস্‌বি। আর এই বিপদের সময় আমাদের সকলেরই একবার যাওয়া উচিত।

বেশ, যাব। বলিয়া নিভা চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন প্রাতে ঘরের গাড়ী ডাকিয়া রামধনাকে সঙ্গে লইয়া অমরেশ বলিল, আয় নিভা, শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নে।

নিভা যেমন বসিয়াছিল, তেমনি অবস্থাতেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চলো।

অমরেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, সে কি রে? অম্‌নি সাদা কাপড় পরেই?

তাতে কি হয়েছে দাদা, চলো না? বলিয়া নিভা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই, অমরেশ বলিল, না, না, সে হ'তে পারে না নিভা, সে হতেই পারে না। এ তুই আমার উপর রাগ করে পরেছিস্। না না, লক্ষ্মী দিদি আমার, ভাল কাপড় পরে আয়। এই বলিয়া অমরেশ তাহার হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিল।

নিভা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, রাগ কেন কর্‌ব দাদা, এতে রাগের তুমি কি দেখ্‌লে—

আমি কি আর সেদিন সত্যি সত্যিই বলেছিলুম রে? রাগের মাথায় তোর সাজ-পোষাক, টয়লেটের কথা বলে ফেলেছিলুম বই ত না! যা ভাই যা, আর কষ্ট দিস্‌ নে। বলিয়া অমরেশ তাহার হাতে ধরিয়া এমন সকরুণ ভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইল যে, নিভা আর তাহা সহ্য করিতে পারিল না। দাদা তাহার সহিত ঝগ্‌ড়া করে, তাহাকে উপহাস করে, দুটা মন্দ কথা বলে,—সমস্তই সহ্য হয়; কিন্তু, তাহার মুখের পানে অমন করিয়া এই যে একান্ত দুটি স্নেহপ্রবল চোখের মিনতিকাতর করুণ-চাওয়া, ইহাকে ত উপেক্ষা করা যায় না! বাধ্য হইয়া নিভাকে আবার তাহার ঘরে ফিরিতে হইল এবং আল্‌মারি খুলিয়া তাহার একখানি দামী সাড়ী ও ব্লাউস সযত্নে পরিধান করিয়া সে যখন বাহির হইয়া আসিল, সত্য কথা বলিতে গেলে, তখন তাহাকে আগেকার চেয়ে কোনও অংশেই মন্দ দেখাইল না।

আজ আর বংশীর রুদ্ধ-দরজা বাহির হইতে ডাকাডাকি করিয়া খোলাইতে হইল না; দোর খোলাই ছিল।

অমরেশ আগে চলিল, তাহার পশ্চাতে নিভা এবং সবার পশ্চাতে রামধনা

গিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। নিভার সাজ-সজ্জার জাঁক-জমক দেখিয়া ভুলি কুকুরের বাচ্চা দুইটা খেউ-খেউ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। ভয়ে একটুখানি বিব্রত হইয়া সে পিছু হাটিতেই তাহারা সভয়ে ছুটিয়া গিয়া ভাঙা বৈঠকখানা ঘরে মায়ের কোলের কাছে গিয়া মুখ লুকাইল। নিভা একবার এই কদর্য্য পল্লীর মধ্যে দরিদ্রের এই ভাঙা পুরাতন বাসগৃহটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিল। এরূপ স্থানে আসিবার সৌভাগ্য তাহার এই প্রথম। দেখিল, প্রাচীর ভাঙা, স্যাঁৎসেতে উঠান, ঘরের ভিতর পায়রার বাসা,—এম্‌নি সব দারিদ্র্যের আরও কত চিহ্ন। অনভ্যস্ত হইলেও এই কদর্য্যতাকে সে আজ কোন প্রকারেই নাক সিঁটকাইয়া ঘৃণা করিতে পারিল না।

একটি বিধবা তরুণী তাহার অনবদ্য রূপ ও সৌন্দর্য্য লইয়া বৃদ্ধ রুগ্ন পিতার হাতের উপর ফ্লানেল দিয়া বোতলের সেক্ দিতেছে। নিভা ভাবিল, এই বুঝি বংশীর সেই দিদি। যাহার নাম জানে, অথচ চিনে না, তাহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের পূর্ব্বে মানুষ, তাহার চেহারার একটা খস্‌ড়া মনের মধ্যে ঠিক করিয়া রাখে। নিভাও গায়ত্রীর সম্বন্ধে এম্‌নি একটা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, সাধারণ বিধবারা যেমন হইয়া থাকে, এ ও বুঝি তেম্‌নি একটি মেয়ে। কিন্তু গায়ত্রীর এই অপরূপ রূপের ঐশ্বর্য্য, তাহার সে মন-গড়া সাধারণত্বকে ছাপাইয়া উঠিয়া প্রথমেই তাহার গলায় যেন একগাছা পরাজয়ের মালা দিয়া বরণ করিয়া লইল। গায়ত্রী এতক্ষণ তন্ময় হইয়া পিতার সেবা করিতেছিল, অন্যদিকে তাকাইবার অবসর ছিল না। এইবার পায়ের শব্দে সে মুখ ফিরাইতেই, অমরেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন উনি?

ভালোই। এসো। বলিয়া গায়ত্রী তাহার হাতের বোতলটা মেঝেতে নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমরেশ নিভার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, এ আমার বোন, নিভা।

বল্‌তে হবে না, চিনেছি। এসো ভাই। বলিয়া গায়ত্রী তাহার হাতে ধরিয়া বংশীর ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া হাতল-ভাঙা চেয়ারখানা দেখাইয়া দিয়া বসিতে বলিল।

নিভা বসিতে ইতস্তত করিতেছিল, গায়ত্রী বলিল, গরীবের ঘর,—জানি নে, কি মনে করবে ভাই। তবে—

স্বচক্ষে তাদের অবস্থাটা একবার দেখেই আস্‌বি। আর এই বিপদের সময় আমাদের সকলেরই একবার যাওয়া উচিত।

বেশ, যাব। বলিয়া নিভা চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন প্রাতে ঘরের গাড়ী ডাকিয়া রামধনাকে সঙ্গে লইয়া অমরেশ বলিল, আয় নিভা, শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নে।

নিভা যেমন বসিয়াছিল, তেমনি অবস্থাতেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চলো।

অমরেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, সে কি রে? অম্‌নি সাদা কাপড় পরেই?

তাতে কি হয়েছে দাদা, চলো না? বলিয়া নিভা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই, অমরেশ বলিল, না, না, সে হ'তে পারে না নিভা, সে হতেই পারে না। এ তুই আমার উপর রাগ করে পরেছিস্। না না, লক্ষ্মী দিদি আমার, ভাল কাপড় পরে আয়। এই বলিয়া অমরেশ তাহার হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিল।

নিভা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, রাগ কেন করব দাদা, এতে রাগের তুমি কি দেখ্‌লে—

আমি কি আর সেদিন সত্যি সত্যিই বলেছিলুম রে? রাগের মাথায় তোর সাজ-পোষাক, টয়লেটের কথা বলে ফেলেছিলুম বই ত না! যা ভাই যা, আর কষ্ট দিস্‌নে। বলিয়া অমরেশ তাহার হাতে ধরিয়া এমন সকরুণ ভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইল যে, নিভা আর তাহা সহ্য করিতে পারিল না। দাদা তাহার সহিত ঝগ্‌ড়া করে, তাহাকে উপহাস করে, দুটা মন্দ কথা বলে,—সমস্তই সহ্য হয়; কিন্তু, তাহার মুখের পানে অমন করিয়া এই যে একান্ত দুটি স্নেহপ্রবল চোখের মিনতিকাতর করুণ-চাওয়া, ইহাকে ত উপেক্ষা করা যায় না! বাধ্য হইয়া নিভাকে আবার তাহার ঘরে ফিরিতে হইল এবং আলমারি খুলিয়া তাহার একখানি দামী সাড়ী ও ব্লাউস সযত্নে পরিধান করিয়া সে যখন বাহির হইয়া আসিল, সত্য কথা বলিতে গেলে, তখন তাহাকে আগেকার চেয়ে কোনও অংশেই মন্দ দেখাইল না।

আজ আর বংশীর রুদ্ধ-দরজা বাহির হইতে ডাকাডাকি করিয়া খোলাইতে হইল না; দোর খোলাই ছিল।

অমরেশ আগে চলিল, তাহার পশ্চাতে নিভা এবং সবার পশ্চাতে রামধনা

গিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। নিভার সাজ-সজ্জার জাঁক-জমক দেখিয়া ভুলি কুকুরের বাচ্ছা দুইটা ঘেউ-ঘেউ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। ভয়ে একটুখানি বিব্রত হইয়া সে পিছু হাটিতেই তাহারা সভয়ে ছুটিয়া গিয়া ভাঙা বৈঠকখানা ঘরে মায়ের কোলের কাছে গিয়া মুখ লুকাইল। নিভা একবার এই কদর্য্য পল্লীর মধ্যে দরিদ্রের এই ভাঙা পুরাতন বাসগৃহটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিল। এরূপ স্থানে আসিবার সৌভাগ্য তাহার এই প্রথম। দেখিল, প্রাচীর ভাঙা, স্যাঁৎসেতে উঠান, ঘরের ভিতর পায়রার বাসা,—এম্‌নি সব দারিদ্র্যের আরও কত চিহ্ন। অনভ্যস্ত হইলেও এই কদর্য্যতাকে সে আজ কোন প্রকারেই নাক সিঁটকাইয়া ঘৃণা করিতে পারিল না।

একটি বিধবা তরুণী তাহার অনবদ্য রূপ ও সৌন্দর্য্য লইয়া বৃদ্ধ রুগ্ন পিতার হাতের উপর ফ্লানেল দিয়া বোতলের সেক্ দিতেছে। নিভা ভাবিল, এই বুঝি বংশীর সেই দিদি। যাহার নাম জানে, অথচ চিনে না, তাহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের পূর্ব্বে মানুষ, তাহার চেহারার একটা খস্‌ড়া মনের মধ্যে ঠিক করিয়া রাখে। নিভাও গায়ত্রীর সম্বন্ধে এম্‌নি একটা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, সাধারণ বিধবারা যেমন হইয়া থাকে, এ ও বুঝি তেম্‌নি একটি মেয়ে। কিন্তু গায়ত্রীর এই অপরূপ রূপের ঐশ্বর্য্য, তাহার সে মন-গড়া সাধারণত্বকে ছাপাইয়া উঠিয়া প্রথমেই তাহার গলায় যেন একগাছা পরাজয়ের মালা দিয়া বরণ করিয়া লইল। গায়ত্রী এতক্ষণ তন্ময় হইয়া পিতার সেবা করিতেছিল, অন্যদিকে তাকাইবার অবসর ছিল না। এইবার পায়ের শব্দে সে মুখ ফিরাইতেই, অমরেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন উনি?

ভালোই। এসো। বলিয়া গায়ত্রী তাহার হাতের বোতলটা মেঝেতে নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমরেশ নিভার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, এ আমার বোন, নিভা।

বল্‌তে হবে না, চিনেছি। এসো ভাই। বলিয়া গায়ত্রী তাহার হাতে ধরিয়া বংশীর ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া হাতল-ভাঙা চেয়ারখানা দেখাইয়া দিয়া বসিতে বলিল।

নিভা বসিতে ইতস্তত করিতেছিল, গায়ত্রী বলিল, গরীবের ঘর,—জানি নে, কি মনে করবে ভাই। তবে—

এমন সময় বারান্দা হইতে কম্পিতকণ্ঠ বৃদ্ধ রত্নেশ্বরের ডাক শোনা গেল, গায়ত্রী! মা!

যাই বাবা। বলিয়া পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়া গায়ত্রী নিভার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে বেদনা-পরিম্লান সকরুণ দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া বলিল, আজ যে তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুদণ্ড আলাপ-পরিচয় করব, তার সময় নেই ভাই।—বংশী! জল গরম হলো? ভাতের হাঁড়িটা হয়েছে তো নামিয়ে দিস্। পারবি? না, যাব?—বলিতে বলিতে গায়ত্রী বাহির হইয়া আসিল।

নিভা সমস্তই শুনিল, কিন্তু বলি-বলি করিয়াও প্রত্যুত্তরে একটা কথাও তাহার বলা হইল না। বাহিরের বারান্দার দিকে তাকাইয়া কাঠের একটা পুতুলের মত সেই ভাঙা চেয়ারের উপর নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া সে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারই চোখের সুমুখে ধূমায়মান একটা গরম জলের ডেক্‌চি কাপড়ের খুঁটে অতি সাবধানে চাপিয়া ধরিয়া বংশী বারান্দার উপর ঠাই করিয়া নামাইল। হয়ত ভাতের হাঁড়িটাও সে নিজেই নামাইয়া আসিয়াছে। নিভার ইচ্ছা করিতেছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহার হাত হইতে ডেক্‌চিটা সে কাড়িয়া লয়, কিন্তু উঠিয়া গিয়া কথাটা কার্য্যে পরিণত করা দূরে থাকুক্, সে একবার নড়িয়া বসিতেও পারিল না। এমন কি, পাছে তাহার সহিত চোখাচোখি হইয়া যায়, এই লজ্জায় নিভা তখন নিতান্ত অন্যমনস্কের মত বংশীর টেবিলের উপর বইএর গাদা হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া অনর্থক সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

অমরেশের সহিত কথা বলিতে গিয়া বংশীর নজর পড়িল, নিভার দিকে। বলিল, নিভাও এসেছে যে দেখ্‌ছি।

অমরেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

এইবার নিভা মুখ তুলিয়া বংশীর দিকে তাকাইল।

বংশী আর কোন কথা না বলিয়া হেঁট মুখে ডেক্‌চির জলটা কম্পিত হস্তে বোতলে পুরিতে লাগিল।

নিজের উপরেই বিরক্তি ও লজ্জায় নিভা নিমেষেই যেন এতটুকু হইয়া গেল। মনে হইল, সে যেন সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগতের প্রাণী! এখানকার এই লোকগুলির সঙ্গে আজ যেন তাহার কোথাও কোনো সূত্রেই এক হইয়া মিলিবার

উপায় নাই! এই বংশীর, এই গায়ত্রীর সেবা দেখিয়া, কষ্ট দেখিয়া, তাহারও মধ্যে এক সেবারতা নারী ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহারও প্রতি-মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল, এই মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে গিয়া সেও তাহাদের সহিত এমনি করিয়া সেবা-শুশ্রূষা করে, কিন্তু কেমন করিয়া যাইবে, গেলেও সে পারিবে কি-না, এই সব কথা ভাবিতে গিয়া সে যেন তুঁষের আগুনে পুড়িতে লাগিল। তাহাদের চোখের সুমুখে এমন ভাবে সাজ-সজ্জা করিয়া চেয়ারে বসিয়া থাকিতে তাহার মাথা কাটা যাইতেছিল, অথচ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে গেলেই তাহার মনে হইতেছিল, এই ভাঙা চেয়ারটার সহিত তাহার দেহটাকে কে যেন টানিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সে যে নিতান্ত আনাড়ি এবং এখানে,—আজ এই অনভ্যস্ত কাজের মাঝে আজ যে তাহার কিছুই করিবার নাই, কোনো হাত নাই, কোনো অধিকার নাই, এই কথাটা যতই সে বার বার মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার নিজের অক্ষমতাটুকু তাহারই চোখের সুমুখে ফুটিয়া উঠিয়া অনুক্ষণ তাহাকে লজ্জা এবং পীড়া দিতে সুরু করিল। তাহার দাদা এ কি করিল! কেনই বা তাহাকে এমন সখের পুতুল সাজাইয়া এখানে ইহাদের এই বিপদের মাঝে টানিয়া আনা, আর কেনই বা তাহাকে এরূপ নিঃসহায় ভাবে বসাইয়া রাখা! . . . কি জানি বংশী আজিকে তাহাদের এই বিপন্ন মুহূর্ত্তে তাহার এই উৎসব-সজ্জা দেখিয়াই হয়ত রাগে তাহার মুখের পানে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না! . . সিল্কের ব্লাউস, শাড়ী, তাহার মনে হইতেছিল, এইখানে টানিয়া ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া দিয়া দিদির একখানা ওই সাদা কাপড় পরিয়া কোমর বাঁধিয়া তাহাদের কাছে গিয়া বসে।

অমরেশ বলিল, এই রামধনা চাকরটাকে রেখে যাচ্ছি বংশী, কাজ-টাজ ওকে দিয়েই করাস্।

বংশী বলিল, কোনো দরকার ছিল না।

অমরেশ তাহার কোনো কথা শুনিল না। চাকরটাকে সেইখানেই রাখিয়া দিয়া ঘণ্টা দেড়েক পরে নিভাকে লইয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে অমরেশ বলিল, দেখ্‌লি ত? যা বলেছিলুম সত্যি কি-না।

হুঁ। বলিয়া নিভা জানালার নিকট সরিয়া গিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

অমরেশ অনেক প্রশ্ন করিল, হুঁ, হাঁ, বলিয়া নিভা কতক্ বা উত্তর দিল, কতক বা দিল না,—সারা পথটা গুম্ হইয়া সে যেন কি ভাবিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

প্রতীক্ষায়

—শ্রীসুষমা মুখোপাধ্যায়।

বিষ্ণুপুর গ্রামের বুক চিরে যে পথটা বরাবর গিয়ে মিশেছে নদীর সঙ্গে, সেই পথেরই ধারে এক নির্জ্জন জায়গায় ছিল শিবু বাগ্দীর জীর্ণ পৈতৃক কুঁড়েখানি। শিবচরণের ধন-দৌলত ছিল না, আত্মীয় স্বজনও না; শুধু ছিল তার বুক-জুড়ান ধন অন্ধের যষ্টি—মা-হারা ছেলে, রঘুনাথ।

ভোরের আলো গায়ে মেখে যখন জগৎ হেসে উঠ্‌ত, নদীর কালো জল সূর্য্য-কিরণে চিক্‌মিক্‌ ক'রে উঠ্‌ত, শিবু তার বাপের রেখে যাওয়া এক জোড়া 'হেলে' গরু আর একটা পুরান লাঙ্গল নিয়ে মাঠে চ'লে যেত। যাবার আগে তার ছোট্ট ছ বছরের ছেলে রঘুনাথকে রেখে যেত তারই এক স্বজাতি প্রতিবেশীর কাছে। আবার যখন সাঁঝের আলোতে আকাশের পশ্চিম দিকটা রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ত আবীরের মত, সুনীল আকাশে দু একটা তারা মিট্‌মিট্‌ করত তখন শিবু তার লাঙ্গল ও গরু নিয়ে কুটীরে ফির্‌ত। তারপর ছেলেটিকে সেই প্রতিবেশীর কাছ থেকে নিয়ে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়্‌ত।

রাত্রে যখন সে শুয়ে থাকৃত তখন অতীতের অনেক কথা—আনন্দের ও দুঃখের স্মৃতি তার চোখের সাম্‌নে ভেসে বেড়াত। তার মনে পড়্‌ত রঘুনাথের মার কথা, যেদিন সে বার বছরের আদরকে বিবাহ ক'রে ঘরে আনে সেদিনের কথা তার বেশ মনে জেগে আছে। তার পর তার মনে পড়্‌ত—মাঠ থেকে পিতার কাছ থেকে ছুতো ক'রে বাড়ী এসে বুক অবধি ঘোমটায় ঢাকা আদরের নোলক-পরা কাল মুখখানাকে দেখা ও জোর ক'রে সেই ঘোমটা খুলে দেওয়া। সেদিন আর এদিন!

শিবু শুয়ে শুয়ে এই সব কথা ভাবে আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। তার পর তার মনে পড়ে সেই দুর্দ্দিনের কথা যেদিন তার আদরের আদর ইহকালের দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে এক বছরের শিশু রঘুনাথকে তার পিতার কোলে দিয়ে পরকালের যাত্রী হ'ল। সব কথা মনে ক'রে শিবুর মনটা বেদনায় ভ'রে ওঠে। আর দুচোখ বেয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে জল ঝরে তার বুক ভাসিয়ে দেয়।

তখন সে ঘুমন্ত রঘুনাথকে বুকের মাঝে চেপে ধ'রে চুমায় চুমায় তার সারা অঙ্গ ভরিয়ে দেয়। এমনি ক'রেই দিন কাটে।

২

রঘুনাথ এখন সাত বছরে পা দিয়েছে। আদরের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে রঘুনাথ বেশ লেখাপড়া শেখে—বিদ্বান হয়। তাই পরলোকগতা স্ত্রীর কথার অবমাননা না ক'রে এক ঠিক-দুপুর বেলা গামছা মাথায় ক'রে রঘুনাথকে সঙ্গে নিয়ে কানা পণ্ডিতের পাঠশালে এসে হাজির হ'ল। তারপর কিছু টাকা পণ্ডিতের পায়ের কাছে রেখে দিয়ে প্রণাম ক'রে বললে—"দেখ বাবাঠাকুর, রঘু যেন আমার বিদ্বান মানুষ হয়—তোমার ভরসায় একে দিয়ে গেলুম।

নগদ টাকা দেখে আনন্দে অধীর হ'য়ে শিবুকে অজস্র আশীর্ব্বাদ ক'রে পণ্ডিত মশায় তাকে বিদায় দিলেন।

পরদিন থেকে শিবু নূতন আশায় নূতন উদ্যমে কাজে লেগে গেল। ভোরের বেলা খাইয়ে দাইয়ে রঘুনাথকে পাঠশালায় পাঠিয়ে দিয়ে আপনার কাজে যায় আবার ঠিক সাঁঝের বেলায় তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

পাঠশালের শিক্ষা যখন রঘুনাথের শেষ হ'য়ে গেল তখন পাঁচ জনের কথায়, পণ্ডিত মশায়ের পীড়া-পীড়িতে ও নিজের সামান্য উপার্জ্জনের ওপর নির্ভর ক'রে এক শুভ দিনে শিবচরণ তাকে ওপাড়ার বামুনদের ছেলের সঙ্গে কলিকাতায় লেখাপড়া শেখ্‌বার জন্যে পাঠিয়ে দিলে। আশা, ছেলে বড় হ'লে বিদ্বান হবে—মার ইচ্ছা পূরণ করবে।

যাবার দিন যখন রঘুনাথ পিতার হাত ছেড়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ল, শিবচরণের বুকের একখানা পাঁজর যেন খসে গেল। যতক্ষণ গাড়ী দেখা গেল, ততক্ষণ শিবচরণ গাড়ীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার পর নীরবে দুফোঁটা চোখের জল ফেলে ঘরে ফিরে এল। তখন তার মনে হ'ল সেইদিনের কথা যেদিন পাড়ার এক কথক ঠাকুরের গানে সে শুনেছিল—

"পিতার আদেশ ল'য়ে, পদধূলি শিরে ধরি চলিলেন রাম বনবাসে।"

৩

সেদিন একটু বেলা অবধি শিবচরণ ঘুমিয়ে পড়েছিল—হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল ডাক পিয়নের ডাকে। ছুটে বাইরে এসে শিবচরণ জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাই পিয়ন, আমার রঘুর চিঠি নিয়ে এসেছ?

পিয়ন চিঠি দিয়ে চ'লে গেল। সেদিন আর শিবচরণের কাজে যাওয়া হ'ল না। সে চিঠিখানা নিয়ে ছুটল কানা পণ্ডিতের বাড়ী। অসময়ে শিবচরণকে দেখে পণ্ডিত মশায় বল্লেন, "কিরে শিবু এমন অসময়ে যে? রঘু ভাল আছে ত?"

হাঁপাতে হাঁপাতে শিবচরণ বল্লে, "বাবা ঠাকুর, রঘু আমায় চিঠি দিয়েছে—কি লিখেছে দেখ দিকি?"

রঘুনাথের চিঠি প'ড়ে পণ্ডিত মহাশয় তাকে বল্লেন, এ যে রঘু নিজে লিখেছে, সে বেশ ভাল আছে—লেখাপড়াও ভাল হ'চ্ছে।

শিবু বল্লে, "বাবা ঠাকুর, এ আমার রঘুর লেখা? সে ভাল আছে?" পণ্ডিত মশায়কে একটি প্রণাম ক'রে শিবু ঘরমুখো হ'ল।

পথে যেতে যেতে তার দেখা হ'ল কানাইয়ের পিসির সঙ্গে। তাকে দেখে শিবু বল্লে, দেখ্‌ছিস্ দিদি—রঘু আমার চিঠি লিখেছে—কেমন লেখা দেখ! যেন মুক্তা ঝ'রে পড়ছে। বলে চিঠিখানা তার কাছে এগিয়ে দিলে।

কানাইয়ের পিসি বল্লে, সে ভাল আছে ত?

হ্যাঁ দিদি তোমাদের আশীর্ব্বাদে সে একরকম ভালই আছে।

ঘরে গিয়ে শিবু মঙ্গলা গাইকে বল্লে—দেখ্‌ছিস মুঙ্গলি, আমার রঘুর চিঠি এসেছে! বেশ লেখা নয়? দেখ্ মুঙ্গলি রঘু যখন বড় হবে অনেক টাকা আন্‌বে তখন তোকে আমি পেট ভ'রে খাওয়াব, কি বলিস্? এখন গরীব, কোথায় পাব বল্?"

এমনি ক'রে চিঠির নেশায় শিবচরণের দিন কতক কেটে গেল। তার পর আর কিছু ভাল লাগ্‌ল না—কাজে যেতেও ইচ্ছা করে না—বাড়ীতে থাক্‌তেও ইচ্ছা করে না—তার মনটা বড়ই ফাঁকা ফাঁকা মনে হ'ল। রঘুনাথও আস্‌ছে না তার চিঠিও আস্‌ছে না—তার মন একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল।

তার পর একদিন বামুনেদের ছেলে গরমের ছুটীতে বাড়ী এসেছে শুনে তাকে গিয়ে সে রঘুর কথা জিজ্ঞাসা করলে। বামুনদের ছেলে যখন বল্লে—যে রঘু একেবারে অধঃপাতে গেছে—তার অনেক বদ সঙ্গী জুটেছে,—এই জন্যেই সে বাড়ীতে আস্‌তে চাইলে না ইত্যাদি।

তখন শিবচরণ চোখে অন্ধকার দেখ্‌লে। সেখানে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না ক'রে কাণা পণ্ডিতের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে ধ'রে বল্লে—"বাবা ঠাকুর, রঘুর আর লেখা পড়া শিখে কাজ নেই—সে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসুক—

তাকে এক্ষুনি চিঠি লিখে দাও। রঘুনাথের অধঃপতনের কথা শুনে পণ্ডিতমশায় বড় দুঃখিত হ'লেন এবং যাতে করে রঘু শীগ্‌গির বাড়ী আসে সেই ব্যবস্থা করবেন বলে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে শিবচরণকে বিদায় দিলেন। মা কালীর কাছে জোড়া-পাঁঠার মানত করতে করতে শিবচরণ ঘরে ফিরে এল।

* * * *

রঘুনাথ যখন পণ্ডিতের চিঠি পেলে তখন সে রোগ-শয্যায় শুয়ে। শরীরের ওপর অত্যাচারে অযত্নে সে একেবারে এত বদ্‌লে গেছে যে তাকে আর চিন্‌তে পারা যায় না! তার এখানে থাক্‌তে বড় ভয় হয় এবং বিদেশে তার ওপর যত্ন কর্‌বার কেউ নেই জেনে সে বাবাকে লিখে দিলে যে সে দুই একদিনের মধ্যে যাচ্ছে। তারপর তার মনে পড়্‌ল তার স্নেহময় পিতার কথা। অনুতাপে মনটা পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেল—সে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল। নিজের অবস্থা সে বুঝ্‌তে পার্‌লে ; মনে হ'ল এ জনমে বুঝি আর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না!

শিবচরণ রঘুনাথের আশায় তার ঘরের দাওয়ায় চুপ ক'রে বসে আছে। রঘুনাথ আসে না। সে পুত্রের সকল অপরাধ ক্ষমা করেছে। ছেলে ঘরে আস্‌ছে বলে—তার প্রিয় কত জিনিসই সে জোগাড় ক'রে রেখেছে—পাছে ছেলে কষ্ট পায় সেই জন্য। সকাল গেল—দুপুর এল ছেলে আসে না!—দুপুর কেটে গেল—বিকাল এল—সন্ধ্যা এল—রঘুনাথ আসে না! শিবচরণের প্রাণ অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল সে পুত্রের প্রতীক্ষায় একবার ঘর একবার দোর করতে লাগ্‌ল। বাড়ীর কাছে যারই পায়ের শব্দ পায় অমনি তাকে রঘুনাথ মনে ক'রে ছুটে যায়—কিন্তু ফিরে আসে হতাশ হ'য়ে—ভাঙ্গা হৃদয় নিয়ে।

সারারাত গেল রঘুনাথ এল না!—শিবু ঠায় দাওয়ায় বসে। ভোরের দিকটা একটু ঠাণ্ডা বাতাসে সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল—পিয়নের ডাক্‌কে পুত্রের ডাক মনে ক'রে ছুটে এল বাইরে! পিয়ন্‌কে দেখে থম্‌কে দাড়াল। কি একটা অজানা আশঙ্কায় তার মন দুরদুর ক'র্‌তে লাগ্‌ল। পিয়ন্ তাকে 'তার' দিয়ে ব'ল্‌লে "কলিকাতা থেকে আস্‌ছে তোমার ছেলের বাসা হ'তে।"

কাঁদতে কাঁদতে শিবু বল্‌লে "ভাই রঘু ভাল আছে ত?"

পিয়নও শিবুর কান্না দেখে কেঁদে ফেলে ব'ল্‌লে,—"না ভাই, তোমার রঘু আর নেই—হঠাৎ পরশু মারা গেছে। তারে লেখা রয়েছে।"

পিয়ন্ চ'লে গেল। শিবচরণ সেখানে আছ্‌ড়ে পড়্‌ল।

* * * *

রঘুনাথের মৃত্যু-সংবাদ শুনে পণ্ডিতমশায় শিবুকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার ঘরে এলেন। কিন্তু শূন্য ঘর দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। তিনি অনেক খুঁজ্‌লেন কিন্তু শিবুর দেখা পেলেন না। মনে করলেন পুত্রের শোকে শিবু নদীর জলে ডুবে মরেছে।

মাস ছয়েক পরে পণ্ডিত মশায় পাঠশালে ছেলেদের পড়াচ্ছেন এমন সময় আধখানা ছেঁড়া কাপড় পরে—ধূলা মাখা গায়ে—উস্কোখুস্কো চুলে শিবুকে আস্‌তে দেখে বিস্মিত হ'লেন। সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে—তার চেয়ে সন্তর্পণে পেট-কাপড় থেকে রঘুনাথের চিঠিখানা বার ক'রে শিবচরণ চুপি চুপি পণ্ডিত মশায়কে জিজ্ঞাসা করলে—"বাবাঠাকুর—রঘু আমার কবে আস্‌বে লিখেছে দেখ ত? পণ্ডিত মশায়ের প্রাণটা হাহাকার ক'রে উঠ্‌ল; সারা প্রাণ নিঙড়ে দু' ফোঁটা অশ্রু তাঁর দুই চোখের কোণে মুক্তা বিন্দুর মত টলমল করতে লাগ্‌ল।

প্রাণটা যাহার বিশ্ব যোড়া,
তারি বেশী কপাল পোড়া,
প্রীতির সুধার ধারে ঝরে কলঙ্ক।

"নারী—পঙ্ক"



(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩৩

সকাল বেলাটা সাধারণত বিকাশ এবং জীবন, গল্প বা কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া কাটায়। এই প্রথা তাহাদের মধ্যে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। বিশেষত মুনি থাকিতে একদিনের জন্যও ইহার ব্যাতিক্রম হয় নাই। মুনি চলিয়া যাইবার পর বিকাশ এবং জীবনের ব্যাক্তিগত কয়েকটি অবস্থাবিপর্য্যয়ে, সকাল বেলাকার এই অবসরটুকু একসঙ্গে বসিয়া উপভোগ করিবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে বিকাশকে বাহিরে কোথাও না যাইতে দেখিয়া জীবনও বাড়ীতে থাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সেদিন বিকাশকে বিশেষ প্রফুল্ল দেখিয়া সে সাহস করিয়া তাহার কাছে বসিয়া হাল্কা ভাবের নানা কথা পাড়িয়া দিল। বিকাশও তেমনি সহজভাবে সমস্ত কথার উত্তর দিতেছে দেখিয়া জীবন হাসিয়া বলিল—তুমি আজকাল গোয়েন্দা-গিরি আরম্ভ করেছ নাকি বিকাশ?—

বিকাশ কিছু বুঝিতে না পারিয়া হাসিয়া বলিল—গোয়েন্দাগিরি মানে?

জীবন। মানে সন্দেহজনক কিছু কিছু দেখেছি, তাই জিগ্‌গেস কর্‌ছি।

বিকাশ। কি সন্দেহ জনক দেখ্‌ছ শুনি?—

জীবন। এই ধর গভীর রাত্তে যদি কেউ তোমার ঘরে আসা-যাওয়া করে?—

বিকাশ। গভীর রাত্তে আমার ঘরে কা'কেও আস্‌তে দেখেছ নাকি?

জীবন। ঠিক রাতে নয়, তবে তাকে ভোর-ভোর গা-ঢাকা দিতে দেখে মনে হয়েছিল, ও গভীর রাতেই আসে।

বিকাশ। ও বুঝেছি তুমি কাকে দেখেছ। কিন্তু সেই প্রথম আর শেষ। তুমি তাকে কি করে দেখ্‌লে?

জীবন। আগে বল ও কে, তারপর আমিও বল্‌ব। তোমার গোয়েন্দার

ওপর আমিও কিছু গোয়েন্দাগিরি করেছি। ওকে জোগাড় করলে কোথা থেকে?

বিকাশ। আমি ওকে জোগাড় করি নি, ওই আমায় যোগাড় করেছিল। অদ্ভুত!

কথা কয়টি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকাশের কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। জীবন ব্যস্ত হইয়া বলিল—দোহাই বিকাশ, ঐ দাগগুলো আর কপালের ওপর কেল না। অনেক কষ্টে ও-জায়গায়টা একটু পরিষ্কার হয়েছে, তাকে আর—নোংরা ক'র না।

বিকাশ। তুমি ঐ লোকটির সম্বন্ধে কি জেনেছ, শুনতে চাই।

জীবন। তুমি কি জেনেছ আগে শুনি।

বিকাশ। আমি কিছুই জানি না। ওর নাম পর্য্যন্ত আমি জিগ্‌গেস করি নি।

বিকাশের গলার স্বর নকল করিয়া জীবন বলিল—অদ্ভুত!

বিকাশ। কেন?

জীবন। একসঙ্গে রাত্রিবাস করলে অথচ তুমি তার কিছুই জান না?

বিকাশ। না, তার কোন দরকার বোধ করি নি। অবশ্য তার ওপর আমার কোন আক্রোশ নেই, কারণ আর একজনের খুসীর খোরাক জোগাবার জন্যেই সে এসেছিল।

জীবন। এই আর একজনটি কে?

বিকাশ। যিনি আমার মায়ের স্থান পূর্ণ করতে চাইছেন।

জীবন। তাহ'লে তুমি চটেছ তাঁরই ওপর?

বিকাশ। হ্যাঁ।

জীবন। তাঁর অপরাধ তোমার কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করে—

বিকাশ বাধা দিয়া বলিল—তাঁর আশঙ্কায় কোন হেতু ছিল না।

জীবন। সেই জন্যেই তুমি তাঁর কাছে যাওয়া বন্ধ করেছ বুঝি?

বিকাশ। ভাবছি আমার ওপর তাঁর বিশ্বাস যে দিন জন্মাবে সে দিন যাব।

জীবন আবার বিকাশের গলার স্বর নকল করিয়া বলিল—অদ্ভুত!

বিকাশ হাসিয়া বলিল—তা না হয় হ'লাম, তুমি কি জেনেছ বল।

জীবন। আমি শুরকিগঞ্জ থেকে ফিরে তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, সে

নাব্ছিল। আমাকে দেখে সে দাঁড়াল, আমিও দাঁড়ালাম। সে বল্ল—কাল রাতে এখানেই ছিলাম. আপনি বিকাশের বন্ধু, না ?

আমি বল্লাম —এখন পর্য্যন্ত তাই বলেই আমার বিশ্বাস।—কেন ?

সে বল্ল, কাল রাতে বিশেষ করে একটা কথা মনে হ'ল, সারটিফিকেট দেখিয়ে বন্ধুত্ব হয় না, ওটার প্রয়োগ চাক্‌রীর বাজারেই প্রশস্ত।

বিকাশ। তুমি ওকে জান্তে ?—

জীবন। ঠিক জান্‌তাম না, তবে ওকে বিমলের কাছে মাঝে মাঝে আস্‌তে যেতে দেখেছি। বিশেষ পরিচয় ছিল না, তবে নামটা শুনেছি. মুকুল দেব।

বিকাশ ঔৎসুক্য ভরা কণ্ঠে বলিল—মুকুল দেব! তুমি ঠিক জান ?

জীবন হাসিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল—ঐ নামের সঙ্গে তোমার কিছু জড়িয়ে গেছে নাকি ?—অমন করে উঠ্‌লে যে ?

বিকাশ। সেদিন রাত্রে যদি শুন্‌তাম, তাহ'লে হয়ত তার সাম্‌নেই এমনি করে লাফিয়ে উঠ্‌তাম।

জীবন। এমনি নামমাহাত্ম্য ? তা একবার ভদ্রতার খাতিরে না হয় জিগ্‌গেস কর্‌তে—কে আপনি ?—

বিকাশ। সেদিন সে ক্ষমতাটুকুও আমার ছিল না। মনে হয় তাকে বস্‌তেও বলিনি। সে চুপ করে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বলেছিলাম যখন যাবেন, দয়া করে আমার চাকরকে বলে দেবেন দরজাটা যেন বন্ধ করে দেয়—

জীবন। তারপর ?

বিকাশ। তারপর আমি শুয়ে পড়্‌লাম আর মনে হ'ল, সে উঠে আমার ঘরের বাইরে চলে গেল।

জীবন। কিন্তু যায় নি।

বিকাশ। তা জানি। আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লে সে আবার ঘরে এসে আমার মাথার কাছে বসে বাতাস করেছে সমস্ত রাত, আমি ভেবেছিলাম তুমি। ভোরে তাকে দেখে বিরক্ত হয়েছি, সে বিরক্তি আমার মুখে ফুটে উঠ্‌তে দেখে সে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছে—আপনার মা'র আদেশে এতখানি ধৃষ্টতা আপনার কাছে প্রকাশ ক'রে ফেলেছি।

তারপর সে চ'লে গেছে, আমি ফিরেও তাকাই নি।—কিন্তু তুমি ওর নাম ছাড়া আর কিছু কি ওর সম্বন্ধে জান না।

জীবন। এ যে দেখি তোমার ছেড়ে দিয়ে ভেড়ে ধরা! যা হ'ক ছেলে বাবা! কিন্তু ওকে তা যদি বলি—তা হ'লে এখুনি ছুট্‌বে ওর কাছে। কয়েক বছর আগে বিমল তার যে শিল্পী-বন্ধুকে দিয়ে তোমায় মার্বেলায় মূর্ত্তি করিয়ে দিয়েছিল, ও সেই। সেটার একখানা কপি আজও ওর Studio-তে আছে। বিমলের সঙ্গে ওর ওখানে একদিন গিয়েছিলাম।

বিকাশ কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—চল এখন ওর কাছে যাই—

সহসা বিকাশের যেন বাকরোধ হইয়া গেল। সে তাহার চেয়ারে বসিয়া সাম্‌নের একটি বড় আয়নার দিকে অপলক চোখে তাকাইয়া আছে দেখিয়া জীবনও সেই দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

বিকাশের চোখ ক্রমেই বিস্ফারিত হইয়া যাইতেছে। জীবন কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিকাশের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—দীপ্তি—মিসেস্ বিশ্বাস, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! ওঁকে এনে বসাও।

কিন্তু বিকাশের উঠিবার কোন লক্ষনই দেখা গেল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া জীবন নিজেই দীপ্তির কাছে আসিয়া বলিল—ভিতরে আসুন—'

আয়নার উপর চাহিয়া বিকাশ দেখিল, পিছনের দিক হইতে দীপ্তি ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তাহার দৃষ্টিও আয়নায় প্রতিফলিত বিকাশের মুখের উপর নিবদ্ধ।

বিকাশ সহসা উঠিয়া দীপ্তির দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত সহজ সুরে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—এস, বিশেষ দরকার ছিল কি? আমাকে ডেকে পাঠালেই পার্‌তে।—বস, ভাল আছ ত?

বিকাশের মুখের দিকে চাহিয়া দীপ্তি বলিল—কতকগুলো কথা জিগ্‌গেস কর্‌তে এসেছি, তোমার সময় হবে কি?

আপনাকে এখানে অনাবশ্যক মনে করিয়া বিকাশের দিকে চাহিয়া জীবন বলিল—তোমরা বস, আমি স্নানটা সেরে নিই গে।

জীবনের দিকে ফিরিয়া দীপ্তি বলিল—ভয়ানক দরকারে পড়ে ওঁর কাছে এসেছি, কিছু মনে কর্‌বেন না জীবনবাবু—'

জীবন চলিয়া যাইতে যহেতে বলিল—না-না, কি মুস্কিল?—এর মধ্যে মনে করা-করির কি আছে?

দীপ্তিকে তখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিকাশ বলিল—বস, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে! কি কথা বলতে এসেছ?—'

বিকাশের পাশে একটি চেয়ারে বসিয়া দীপ্তি কিছুক্ষণ আপনার চিন্তাগুলিকে নাড়াচাড়া করিতে করিতে সহসা মাথা তুলিয়া বলিল—আমি জানতে এসেছিলাম, জীবনের সমস্ত ভুলেরই সংশোধনের উপায় বা পথ আছে কিন্তু আমি যে ভুল করেছি তাকে সংশোধন করবার কি কোন উপায়ই নেই?—

বিকাশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ভুল করেছ বলে তোমার মনে কি ধারণা জন্মেছে দীপ্তি?

দীপ্তি। হাঁ। আমার এ ভুল আমি নিজেই আর সহ্য করতে পারছি না। এই ভুল করবার পূর্ব্বে আমি অনেকের কাছেই সাহায্য চেয়েছি কিন্তু পাই নি, দিদির কাছেও না।—আজ তোমার কাছে এসেছি।

বিকাশের বুকের মধ্যে যেন কে দারুণ এক আঘাত দিয়া গেল। সে ম্লান হাসিয়া বলিল—আমি কি করতে পারি বল।

দীপ্তি। আমায় পথ বলে দাও। নইলে বাঁচা দায় হয়ে উঠবে।

বিকাশ বলিল—দীপ্তি, অপরাধ করলে মানুষের কাছে, দেবতার কাছে ক্ষমা পাওয়া যায়; কিন্তু ভুলের শাস্তি পেতেই হবে,—ভুলের ক্ষমা নেই।

দীপ্তি আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ক্ষমা নেই?—

বিকাশ। না, দীপ্তি।

বিকাশের মুখের কথা শেষ হইলে দেখা গেল দীপ্তি জানালার বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার চোখের ভিতর দিয়া যেন তাহার উন্মত্ত প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে।

বিকাশ বলিল—যে ভুলকে আশ্রয় ক'রে তুমি জীবনের পথ চলতে সুরু করেছ, সেই ভুল পথেও শান্তি আছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে, তারপর একদিন ঐ ভুলকেই তোমার ভাল লাগবে, তোমার নিজের হাতে গড়া ঐ ভুলও একদিন সত্য সুন্দর হয়ে উঠবে, বিশ্বাস রেখে চলে যাও।

দীপ্তিকে তখনও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া বিকাশ বলিল—পারবে না দীপ্তি?—শুধু নিজের কথা ছাড়া আমার কথাও একবার ভাব।—সব সহ্য করতে চেষ্টা করছি, সব সহ্য করব, কিন্তু তুমি যদি এখন কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ কর, আমার মন গ্লানিতে ভরে যাবে।—যা

আমার একান্ত আপনার ছিল তা-ই ডাকাতি করে নিতে পারব না। তাতে আমার ভালবাসার অপমান হবে।

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া দীপ্তি বলিল—ঠিক বিয়ের আগে আর বিয়ের পরও আমি ঐ ভাবনাটা ভাবছিলাম, কত বার ভেবেছি ছুটে তোমার কাছে চলে আসি!—কিন্তু এখন সে কথা ভাবি না। এখন শুধু ভাবি কি করে নিজেকে নিয়ে আমার জীবনের এই এতগুলো দিন কাটাতে পারব—শুধু আমি একা, এখানে আর কেউ থাক্‌বে না—তুমিও না। এই কথাটাই জান্‌তে এসেছি তোমার কাছে। তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি আমার পথ করে নেব।

বিকাশ। আমার মতামতকে খুব বড় মনে কর কি?—

দীপ্তি। প্রথমে করতাম, এখনও করি, শুধু মাঝের কটা দিন বিশ্বাস হারিয়ে ছিলাম।

বিকাশ। আমার অনুমতির ওপরই কি সব নির্ভর করছে দীপ্তি?

দীপ্তি। হাঁ, তুমি যা বল্‌বে আমি তাই শুনব, কোন বিচার-বিবেচনা আর করতে পারি না।

বিকাশ কিছুক্ষণ দীপ্তির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—সমস্ত সুখ তুমি আমার কেড়ে নিয়েছ, তার বদলে কিছু শান্তি আমায় দিয়ে যাও।

দীপ্তি। বল কি করব? তোমাকে কোন দিক দিয়ে একটু শান্তি দিতে পেরেছি মনে হ'লেও বাঁচ্‌তে পারব, হয়ত সব সহ্য হয়েও যাবে।

বিকাশ বলিল, তোমার স্বামীর ঘর ভরে দাও, তার বুক ভরে দাও, তার জীবনে শান্তি সুখ তৃপ্তিকে পরিপূর্ণ করে ধরে রাখ্‌তে চেষ্টা কর।—তোমার কাছে এই একটি ভিক্ষা চাইছি দীপ্তি, তোমার কাছে আর কিছুই চাইবার নেই, কিছু আশা করবারও নেই আমার।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দীপ্তি বলিল—কথাগুলো সবদিক দিয়ে ভেবে বলেছ কি আমায়?—

বিকাশ। হাঁ—পারবে না?

দীপ্তি। পারব।

কথাটি শেষ করিয়াই দীপ্তি উঠিতে গেল কিন্তু সহসা তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল অনুভব করিল এবং চলিতে গিয়া একটু টলিয়া পড়িল।

বিকাশ হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে গেলে সে হাসিয়া বলিল—না থাক্‌ দরকার হবে না। আমি আসি—

বিকাশ বলিল—এস।

দীপ্তি দ্বারের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আমাকে একটু কাগজ দাও না, একটা চিঠি লিখ্‌ব।

বিকাশ তাহাকে তাহার টেবিলে লইয়া গেলে একখানি কাগজ লইয়া দীপ্তি কি লিখিতে বসিল। বিকাশ মুগ্ধের মত তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। তাহার মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে। কিম্বা দীপ্তি এবং তাহার মধ্যে যে বিচ্ছেদ-পারাবার অনন্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার ধারণা হইয়াছিল তাহা ভ্রান্তি মাত্র।

লেখা শেষ করিয়া চিঠিখানি খামে বন্ধ করিয়া সেখানি বিকাশের হাতে দিয়া দীপ্তি বলিল—আজ সমস্ত দিনটা আমার হাতে আছে। এখন আমি একবার মা'র কাছে যাব, সেখান থেকে দিদির কাছে আসব। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেইখানেই থাক্‌ব। এর মধ্যে যদি তোমার মতের বদল হয় তাহ'লে এই চিঠিটা খুলে প'ড়। যদি কিছু বলবার থাকে, আমাকে দিদির ওখানেই পাবে। কিন্তু সন্ধ্যার পর আর আমার সময় হবে না।

বিকাশ। আমার মতের বদল না হ'লে এটা খোলবার দরকার নেই কি?—

দীপ্তি। না।

বিকাশ চিঠিখানি হাতে লইয়া কি ভাবিল, তাহার পর সেখানি একটি হাত-বাক্‌সে রাখিতে গেলে দীপ্তি পুনরায় বলিল—মনে রেখো, উত্তর দেবার থাকলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে, তার পরে নয়।

বিকাশ বলিল—আচ্ছা।

প্রতিদিনের মত সেদিনও বাড়ী আসিয়া দীপ্তি সকলকে লইয়া কিছুক্ষণ হাসি গল্প করিয়া ঠিক আহারের সময় বলিয়া বসিল—আমি আজ দিদির সঙ্গে খাব।

করুণা বলিলেন—সে জানে তুই আজ আস্‌ছিস?—

দীপ্তি। জানাব আবার কি?—দেখি না, রাক্ষুসীটা মুখের ভাত কেড়ে খেলে কি ক'রে?—তোমার-গাড়ীটা এখন ওখানে গিয়েই পাঠিয়ে দেব, কিন্তু আবার সন্ধ্যার সময় যেন যায়।

হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া ড্রাইভারকে বলিল—চল, বড়-দিদিমণির বাড়ী। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার গাড়ী মাধার বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিল।

ভিতরে আসিয়া মায়াকে দেখিতে পাইয়া হাসিয়া বলিল—দিদি পোড়ারমুখী, তোকে আজ একটু জ্বালাতে এসেছি, তোর হুকুম মানি না।

মায়া অবাক হইয়া গেল; বিবাহের পর দীপ্তি এই প্রথম তাহার কাছে আসিল। কিন্তু বিস্ময়ের ভাব যথাসম্ভব গোপন করিয়া সে বলিল—গিলেছিস, না, না ?

দীপ্তি। না, তোর সঙ্গে খাব। ভয়ানক খিদে পেয়েছে।

কমলা তখন স্নান সারিয়া তাহার ঘরে যাইতেছিল। দীপ্তির কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবাক হইয়া সেই ঘরে আসিতেই দীপ্তি ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া বলিল—তোর ধোয়া মুখটা নোংরা করে দিই।

কমলা দীপ্তির মুখচুম্বন করিল।

দীপ্তি বলিল—আজ আমার ছুটি, তোদের সঙ্গে এখানে খুব চেঁচামেচি করব।

বাস্তবিক করিলও তাই। কিন্তু তাহার সমস্ত কথা সমস্ত কাজের মধ্যেই এমন একটি অস্থিরতা ধীরে ধীরে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল যাহা লক্ষ্য করিয়া মায়া এবং কমলা কয়েকবার দৃষ্টি বিনিময় করিয়াছে।

বেলা যতই বাড়িয়া যাইতেছিল দীপ্তির অস্থিরতাও ততই বাড়িয়া উঠিতে-ছিল। কয়েকবার গাড়ী বা লোক চলাচল দেখিবার উপলক্ষ্য করিয়া সে পথের ধারের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ কাটাইয়া দিয়াছে। তাহার পর বেলা পড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পাইল—অন্যমনস্কতার মধ্যে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ওঠা।

কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া আসার সঙ্গে অবসাদে যেন তাহার শরীর ভাঙিয়া আসিল। আকাশের শেষ আলোক-শিখা যখন মিলাইয়া গেল, দীপ্তির শরীর হইতে সমস্ত রক্তবিন্দুও সেই সঙ্গে যেন শুখাইয়া গেল!

কিছুক্ষণ পলকহীন চোখে সামনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মায়াকে বলিল—এবার যাই, দেরী হয়ে যাচ্ছে—'

কমলা বলিল—আবার কবে আসবি ?

দীপ্তি। ঘর-সংসার ফেলে কি রোজ রোজ আসা যায়? আমি এখন ঘোর সংসারী। তোরাই এবার একদিন যাস্।

নীচে নামিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিবার সময় তাহার চোখ দুটি আর একবার দূরে বহু দূরে অন্ধকারের মধ্যে যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই সময় পাশের কোন একটি বাড়ীর ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল।

দীপ্তি চকিত ভাবে পিছন ফিরিয়া মায়া এবং কমলাকে বিদায় চাহনি দিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কমলা বলিল—আমার যেন কি মনে হ'চ্ছে মায়া!—

মায়া। কি মনে হ'চ্ছে শুনি?

কমলা। ও আজ ঠিক আমাদের কাছেই আসে নি।

মায়া বলিল—সে তুই এখন বুঝ্‌লি?

* * *

অফিস হইতে ফিরিয়া ঘরের আলো না জ্বালিয়া ক্লান্তভাবে অসিত একটি চেয়ারে বসিয়াছিল। আজ সে মন দিয়া কোন কাজই করিতে পারে নাই। সমস্ত দিনটা তাহার অত্যন্ত অশান্তির ভিতর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। গৃহে ফিরিয়া দীপ্তিকে না দেখিতে পাইয়া সে আরও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দীপ্তির সম্বন্ধে দারুণ একটা সংশয়ও ধীরে ধীরে বোঝার মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিতে ছিল. এই সময়ে দীপ্তিকে তাহার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল;. কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না।

অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে অসিতকে দেখিতে পাইয়া দীপ্তি ধীরে ধীরে তাহার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অত্যন্ত নিকটে দাঁড়াইল।

অসিত কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, দীপ্তি—

দীপ্তি বলিল—আমি এসেছি।

অসিত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—এসেছ?

দীপ্তি বলিল—হাঁ।

অসিত। এই আমার জন্তে আবার যদি কোন গ্লানি মনে জাগে তোমার কোন দিন?—

দীপ্তি। তা'হ'লে এতদিন যেমন ক'রে আমার বিচার না ক'রে আমার সব দিক দিয়ে অনুগ্রহ করেছ, সহানুভূতি দিয়ে আমার সব কাজেই প্রভুত্বের চেয়ে দরদ দেখিয়েছ তেমনি ব্যবহার তখনও যেন পাই! আবার সব সহজ হয়ে আসবে।

দীপ্তিকে চেয়ারে বসাইয়া নিজে তাহার পাশে বসিয়া অসিত তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, তোমার কাছে আমার অনেক শিক্ষা হ'ল দীপ্তি। আগে ভাব্‌তাম তোমাকে পেলেই আমি সুখকেও পাব, এখন মনে হয় তোমাকে সুখী কর্‌তে না পারলে আমার তা পাবার আশা নেই।

দীপ্তি ধীরে ধীরে তাহার মুখখানি অসিতের মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—নাও, এখন আর আমার কোন সঙ্কোচ নেই।

৩৪

বিবাহের পর দীপ্তি যেদিন পিতৃগৃহ হইতে বিদায় লইল সেদিন করুণা বীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে অত্যন্ত অবসন্ন দেখিয়া সহস্র চেষ্টা করিয়াও মায়া বলিতে পারিল না, সেও আজ যাইতে চায়। বহুবার বলিবার জন্য আসিয়াছে কিন্তু বলা হয় নাই। সেই সময়ে বীরেন্দ্রনাথ হয়ত বলিয়াছেন—মায়া বেশ মেয়ে যা-হোক! আমার মাথার পাকাচুলগুলোর ওপর monopoly বসিয়ে এখন তোল্‌বার নাম নেই!

করুণা বলিয়াছেন—হাঁ, খেটে খেটে বেচারী হয়রান্ হ'ল, এখন তোমার পাকাচুল তুলতে বসুক! আয় মায়া আমার কাছে বস্।

মায়ার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু পরের দিন সকালে আর পারিল না। করুণাকে বলিল—ছোট মাসী, আমি যদি আজ না যাই, বিকাশ এসে ফিরে যাবে।

করুণা কিছুক্ষণ মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—যা—

মায়াকে তাহার জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতে দেখিয়া সুবর্ণ আসিয়া বলিলেন—তুই আজই যাবি না কি?

মায়া বলিল—হাঁ, মা।

সুবর্ণ বলিলেন—আমি ভাবছি আমিও যাই, কি বলিস?

মায়া ভীত ভাবে বলিল—তুমি যাবে?—না মা সে হ'তে পারে না—

সুবর্ণ। পারে না মানে? উনি এসেছেন, তা ছাড়া ঘরবাড়ী ফেলে এখানে আর কতদিন থাকব?

মায়া। তা হোক মা, এতদিন যখন কেটেছে তখন আর কিছুদিনও কাটতে দাও।

সুবর্ণ বলিলেন—আমি গেলে তোর পড়ার ক্ষতি হবে মায়া?

সুবর্ণের গলা জড়াইয়া মায়া বলিল—তুমি গেলে বিকাশ আর আসবে না। ও যদি না আসে আমার কাছে, তাহ'লে হয়ত আমাকেই ওর কাছে যেতে হবে; সেটা আমি এখন করতে চাই না মা।

সুবর্ণ কি ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা। তাহ'লে ওঁকে একটু বেশী ছুটোছুটি করতে হয়, তা আর উপায় কি?

মায়া অবাক হইয়া গেল।

সুবর্ণের মুখে এমন সুরের কথা সে বেশী শুনিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কোথাও কোন প্রতিবাদের আভাস পাইলে যে মানুষ একদিন জ্বলিয়া উঠিতেন, তিনিই এত বড় একটা ব্যাপারকে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইলেন!

মায়া আদর করিয়া বলিল—তোমার রাগ হ'ল না?—

সুবর্ণ বলিলেন—দূর্ পাগ্‌লা মেয়ে, তোর কথাই ঠিক মনে হচ্ছে, আমি আরো কিছুদিন এখানে থাকি।

কিন্তু যাহার জন্য এত তাড়াতাড়ি করিয়া মায়া বাড়ী ফিরিল, তাহাকে সে কিছু দিন দেখিতে পাইল না! প্রতিদিন যে আসে, তাহার অনুপস্থিতি বিশেষ করিয়া মনে লাগে। চিঠি লিখিয়াও কোন ফল হয় নাই। বিকাশ উত্তরে লিখিয়াছে—মেলাই কাজ ঘাড়ে পড়েছে। অনেক দিন হিসেব-পত্তর কিছুই দেখ্‌তে পারিনি, সেগুলো একটু গুছিয়ে নিতে হচ্ছে।—সময় পেলেই যাব।

চিঠির প্রত্যেকটি কথা কেমন অদ্ভুত বলিয়া মায়ার মনে হইল। এ যেন বিকাশের চিঠি নয়! তবু সে অপেক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার এই অপেক্ষার সময়টুকু ক্রমেই সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে দেখিয়া দারুণ একটা অশান্তিতে তাহার মন ছাইয়া গেল। বারে বারে সে ছোট-মেয়ের মত কমলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে—ও কেন আসে না? আমার ওপর রাগ হয়েছে, কি করেছি আমি?—

কমলা অবাক্ হইয়া যায়। সে বলে—মানুষকে মুগ্ধ করবার জন্য করবার সব উপকরণ তোর আছে, কিন্তু তোকে যখন এমন ছেলে-মানুষের মত কথা বল্‌তে শুনি তখন তোকে আর মায়া বলে মনে হয় না, আমাদের মতই সাধারণ মেয়ে মনে হয়।

বিবাহের রাত্রে যে মানুষটিকে সে বিকাশের নিকট পাঠাইয়া ছিল তাহারও কোন সন্ধান মিলিল না! কিন্তু ইহার জন্য মুকুলকে সে দোষী করিতেও পারিল না কারণ সে নিজেই তাহাকে বলিয়াছে—আপনি আজ ওর কাছে আছেন জান্‌লেই আমি অনেকটা শান্তি পাব। আমাকে খবর দেবার জন্য ব্যস্ত হবেন না।

এই কথা কয়টি সে যে কেন বলিয়াছিল তাহা ভাবিয়া মায়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

তাহার পর দীপ্তির সেদিনকার বিস্ময়কর আবির্ভাবে সে অনেকখানি শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, তবু ইহা লইয়া বেশী চিন্তা করিবার অবসর তাহার ছিল না। তাহার অধ্যয়নের দিনগুলি ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া পরীক্ষার দিনগুলি নিকটতর হইয়া আসিতেছিল।

আরো কিছুদিন কাটিবার পর একদিন আপনার শরীর মন অত্যন্ত অবসন্ন অনুভব করিয়া সে শ্রীশকে বলিয়া ফেলিল—শ্রীশদা, তোমাকে আর ভোগাতে চাই না। তোমার ছুটি।

শ্রীশ অবাক হইয়া বলিল—মানে?

মায়া বলিল—আর এক লাইনও পড়্‌ব না, যা হয় হবে। এই শেষ হপ্তাটা বই আর নোট্‌স্ সব ভুলে যাব।

শ্রীশ হাসিয়া অঙ্গুলি দিয়া শূন্যে গোলাকার একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকিয়া দিল।

মায়া বলিল—বয়ে গেল।

শ্রীশ। তাহ'লে আমার আর আস্‌বার দরকার নেই ত?

চন্দ্রকুমার তখন কি একখানা বই লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ইহাদের কথা শুনিতেছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন—দরকার নেই মানে?—না শ্রীশ, সে হবে না বাবা, তুমি যেমন আস, তেমনি এস, ওটা পড়ে পড়্‌বে, না পড়ে ব'য়ে গেল।

শ্রীশ বিরক্তির সুরে বলিল—কিন্তু এই দোটানার মধ্যে পড়ে প্রাণ আমার বেরিয়ে গেল মেসোমশাই।

মায়া হাসিতে লাগিল। চন্দ্রকুমার বলিলেন—তা ছেলে হয়ে যখন জন্মেছ তখন ওকথা বলে আর কষ্ট পাও কেন? এই দেখ না আমাকে—কোথায় শুরকিগঞ্জ আর কোথায় কর্পূরী-টোলা! তবু ঐ যাকে বলে মাকুর মত সমানে টানা আর পড়েন বুনে বুনে চলেছি; কোথাও একটু ঢিচ থাক্‌বার জো নেই!

মায়া হাসিয়া বলিল—একবার রেখে দেখ না মজাটা।

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—মেসোমশাই মজা ঢের দেখেছেন, আমিও কম দেখ্‌লাম না।

মায়া বলিল—সত্যি তোমার কষ্ট হয়?

শ্রীশ। তা হ'লে আর কি করছি বল্ ?

মায়া অভিমান করিয়া বলিল—তা হ'লে থাক্, তুমি এস না, যা সময় পেলে এস।

শ্রীশ বলিল—আমি তোর হুকুমের চাকর কিনা, তুই বলবি তবে আমি আসব!

চন্দ্রকুমার তাঁহার সরল মনের উচ্চ হাসির শব্দে ঘর খানি ভরিয়া দিলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। শ্রীশ চলিয়া যাইবার পর মায়া এবং কমলা তাহাদের ঘরে কোন কাজে ব্যস্ত আছে, এবং চন্দ্রকুমার তেমনি তাঁহার চেয়ারে বসিয়া বইএর পাতা উলটাইতে ছিলেন, এমন সময় দরজার কাছে কাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া চন্দ্রকুমার বলিয়া উঠিলেন—কে বিকাশ নাকি? এস এস—অনেক দিন আস নি মায়াটা বড় ভাবছিল—তা ভাল আছ?—

তাঁহার এই অনর্গল কথার মাঝখানে আগন্তুক সরিয়া আসিয়া বলিল—আমি মুকুল, মায়াদেবী আছেন কি?

চন্দ্রকুমার। আছে আছে, মায়া কমলা দুজনেই আছে, যান ঐ ঘরে।

কথাগুলি বলিবার সময় তিনি ব্যস্ত ভাবে একটি ঘরের দিকে হাত বাড়াইয়া দেখাইলেন।

কিন্তু মুকুল বিপদে পড়িল। কি করিয়া না জানাইয়া ভিতরে ঢুকিবে?

তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া চন্দ্রকুমার বলিলেন—আচ্ছা আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।

তিনি উঠিয়া আসিয়া ঘরের সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—ওরে মায়া, মুকুলবাবু এসেছেন তোর সঙ্গে দেখা করতে—

চন্দ্রকুমারের কথা শুনিয়া ঘরের ভিতর হইতে মায়া যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই ভাবেই পর্দ্দা সরাইয়া বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার মাথার চুল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সামনের দিকে ফেলা। এক পাশের চুল আঁচড়ান শেষ হইয়াছে আর এক পাশের চুলগুলি তখনও তাহার বাঁহাতের আঙুলে জড়ান এবং চিরুনিটি তখনও চুলের মধ্যেই ধরা আছে!

মুকুল বলিল—আপনি ব্যস্ত ছিলেন?—

চুলগুলি পিঠের দিকে ফেলিয়া মায়া বলিল—থাকলেও, আপনি আমার ক্ষতি করতে পারবেন ভাববেন না।—ভাল আছেন?

কথাগুলি বলিবার সময় জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন মায়ার মুখে আসিয়া

দেখা দিল! সাজ-সজ্জাশূন্য নিরাভরণা নারীর শরীরে এমন রূপ-মাধুরী প্রকাশ পাইতে পারে তাহা শিল্পী মুকুলের যেন জানা ছিল না। সে এমন করিয়া মায়ার দিকে চাহিয়া রহিল যেন সে একখানি মূর্ত্তি বা ছবি দেখিতেছে? সাধারণ মানুষের কল্পনাশক্তি যে রূপকে ধারণা করিতে পারে নাই, মায়া তাহারই যেন জীবন্ত প্রতিমা!

চন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া মায়া বলিল—ইনি আমার বাবা মুকুলবাবু, তবে ওঁর পরিচয় ঠিক আমি আপনাকে দিতে চাই না এখন, দুদিন গেলেই জান্‌তে পার্‌বেন।

মুকুল হাসিয়া বলিল—সেই পরিচয় সব চেয়ে ভাল।

মায়া বলিল—আর বাবা, আমি মুকুলবাবুর সম্বন্ধে তোমায় কিছু বল্‌তে পার্‌বনা, কারণ আমি বিশেষ কিছুই জানিনা, তবে মেসোমশাই বিমলবাবু আর শ্রীশদা এঁর নামে পাগল হয়ে ওঠেন—

চন্দ্রকুমার হাসিয়া বললেন—নিশ্চয়ই গুণীলোক সন্দেহ নেই।

মুকুলকে লইয়া ঘরে আসিয়া মায়া দেখিল, কমলা-ঘরের সমস্ত এলো-মেলো অগোছাল ভাবটা সরাইবার জন্য ক্ষিপ্রহস্তে সমস্ত জিনিস লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছে।

মায়া হাসিয়া বলিল—Too late কমল। মুকুলবাবু সব দেখে ফেলেছেন—এইটে আমার পড়্‌বার ঘর মুকুলবাবু। মানে Nursery—আর ঐ বর্ষীয়সী মেয়েটি আমার Governess—

কথা কয়টি বলিয়া মায়া কমলার দিকে তাকাইল।

কমলা হাসিয়া বলিল—সে উনি সব বোঝেন।

মুকুল হাসিয়া ফেলিল।

মায়া বলিল—কি বোঝেন?

মুকুল। উনি কি ভেবে বলেছেন তা জানি না। তবে আপনার Governess যে কোথাও নেই, তা মনে হয়।

মায়া। একদিনের অত্যাচারে আমায় অনেকখানি পরিচয় আপনার কাছে ধরা পড়ে গেছে দেখ্‌ছি! তা ভালই হ'ল মনে হয়, কি বলেন?

এই সময় কমলাকে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িতে দেখিয়া মায়া কঠিন ভাবে বলিল ব'স্‌ চুপ্‌ ক'রে, আমার দরকার আছে।

মুকুল বলিল—এর আগে আপনার কাছে আসা উচিত ছিল হয়ত। কিন্তু বিশেষ কিছুই বল্‌বার ছিল না বলে তেমন চাড় হয়নি।

মায়া শুনিবার জন্য মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু বাহিরে সহজ কৌতুকের ভাব বজায় রাখিয়া বলিল—অত রাত্রে আপনাকে একজন অপরিচিত মানুষের কাছে পাঠিয়েছি মনে ক'রে এখন এমন হাসি পায়! আপনি তার দেখা পেয়েছিলেন?

মুকুল। হাঁ, তখন কোন একটা তারের যন্ত্র বাজাচ্ছিলেন যার নাম আমি জানি না।

মায়া। তারপর?

মুকুল। আমাকে দেখে তিনি বাজনা থামালেন। কিন্তু আমাকে কোন প্রশ্ন কর্‌লেন না। আমি নিজেই আপনার পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য জানালাম।

মায়ার চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিতেছিল, শুনিবার আগ্রহে তাহার নিশ্বাস পতনের শব্দও যেন দ্রুত হইয়া আসিল!

মুকুল বলিল—কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন—তারপর তাঁর শোবার ঘরে যাবার সময় বল্‌লেন—'যাবার সময় আমার চাকরকে দয়া ক'রে বলে দেবেন সে যেন দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়—'

কমলার মুখ দিয়া অস্ফুট একটু শব্দ শোনা গেল—ও—'

মায়া বলিল—বলুন—'

মুকুল বলিল—আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম, তারপর আমার মনে হ'ল আপনার কথা। আমি নীচে নেমে এসে দেখি চাকরটা ঘুমচ্ছে। তাকে না জাগিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলাম। তারপর উপরে এসে একটা ঘরে চুপ ক'রে বসে রইলাম। তখন রাত প্রায় একটা হবে, ঘুমের ঘোরে বিকাশ একবার বলে উঠ্‌ল—মা গো—

—আমি আস্তে আস্তে উঠে তার ঘরে এসে তার মাথার কাছে একটা চেয়ারে বসে তাকে বাতাস কর্‌তে লাগ্‌লাম।

—সে বল্‌ল—কে জীবন?—

—আমি তার কপালে হাত দিতেই সে সেখানা ধরে রইল, তারপর আবার ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

মায়া আর কোন কথা না বলিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া মুকুল পুনরায়

বলিল—কিন্তু সকাল বেলা আমার মুখের দিকে চাইতেই বিরক্তিতে তাঁর মন ভ'রে গেল মনে হ'ল। তারপর আমি চলে এসেছি।

মায়া বলিল—খুব আঘাত পেয়েছেন কি ?

মুকুল বলিল—না আমাদের শুভ ইচ্ছাটাই অনেক সময় আর একজনের কাছে অত্যাচার বলে মনে হয়; এর মধ্যে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই।—উনি আপনার কাছে এসেছিলেন কি ?—

মায়া বলিল—না।

মুকুল। আপনি ওঁকে খুব স্নেহ করেন তাই একটা কথা আপনাকে বলা দরকার মনে করি—আপনি ওঁর সম্বন্ধে কোন ভয় মনে রাখবেন না।

মায়া বলিল—আপনি ঠিক কি ভাবে কথাটা বলছেন তা আমি বুঝতে পারলাম না।

মুকুল বলিল—আপনি হয়ত ওঁর দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সাহায্যটা সব ক্ষেত্রে দরকার হয় না। অনেক মানুষ তাদের সবচেয়ে দুর্ব্বলতা বা দুঃখের সময় মনে সবচেয়ে বেশী শক্তি সঞ্চয় ক'রে নেয়। বিকাশকে সেই মানুষ আমার মনে হ'ল।

মায়া তাহার কৃতজ্ঞতা-ভরা দৃষ্টি মুকুলের মুখের উপর তুলিয়া বলিল—আমি বুঝতে পেরেছি। মনটা খুব হাল্কা হ'য়ে গেল।

মুকুল বলিল—এখন আমি আসি—

অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুকে যেমন করিয়া কথা বলে তেমনি সুরে মায়া বলিল—এখন কোথায় যাবেন ?—

মুকুল বলিল—পথে। এই সন্ধ্যার অন্ধকারে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বেশ লাগে। বাইরের আলো নিভে যায়, ঘরের আলো জ্বালা হয়; বাইরের কোলাহল থেমে যায়, ঘরের কোলাহল সুরু হয়; সবাই ঘরে ফেরে। তারপর সে আলোও নেভে, সে কোলাহলও নীরব হ'য়ে আসে। আমিও ঘরে ফিরি।

মায়া বলিল—আবার কবে আসবেন ?

মুকুল বলিল—ঠিক বলতে পারব না, মানুষের কাছে আসা-যাওয়া সম্বন্ধে আমি আজও অভ্যস্ত হ'য়ে উঠতে পারিনি, শুধু বিমল ছাড়া। আপনাদের সঙ্গে ত ওর অনেক দিনের পরিচয়, না ?—

মায়া বলিল—হাঁ।

মুকুল। আমার সঙ্গেও তার অনেক দিনের পরিচয়। আমার কাজের

ভিতর দিয়ে যতটুকু নিজেকে বাইরে প্রকাশ করতে পেরেছি, তার মধ্যে বিমলের সহানুভূতির হাত অনেকখানি আছে। ওর কাছে কৃতজ্ঞতায় আমার জীবন বিকিয়ে আছে।

মুকুল বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু মায়ার মনও আর ঘরে রহিল না। সেও বোধ হয় মুকুলের অনুসরণ করিয়া এই রহস্যময় মানুষটির পিছনে পিছনে ছায়ার মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল!

এক সময় সে আপনার মনে বলিয়া উঠিল—বাইরের আলো নিভে যায়, ঘরের আলো জ্বলে ওঠে—বাইরের কোলাহল থামে, ঘরের কোলাহল সুরু হয়, তারপর সে আলোও নেভে, সে কোলাহলও থেমে যায়—আমি ঘরে ফিরি—কিছু বুঝ্‌লি ঐ কথাগুলো শুনে কম্‌লি ?—

কমলা বলিল—ঠিক না বুঝ্‌লেও ফাঁকা কবিত্ব বলে মনে হ'ল না। তোর কি মনে হয় ? ভারি অদ্ভুত মানুষটি—না রে ?—

মায়া বলিল—কি জানি ?

মায়ার কথার সুরে অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া কমলা তাহাকে আর কোন প্রশ্ন করিল না। কিন্তু সমস্ত সন্ধ্যা তাহাকে ঐ ভাবেই থাকিতে দেখিয়া তাহার কেমন অদ্ভুত ঠেকিল এবং মায়াকে লইয়া কৌতুক করিবার বাসনাও ঐ সঙ্গে তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল—রাত্রে শুইবার সময় সুযোগ বুঝিয়া সে মায়ার কানের কাছে মুখ আনিয়া দুষ্টামি করিয়া বলিল—ঝুল্‌বি না কি এবার ?—

একজন অপরিচিত মানুষ পরিচয়ের ভিতর দিয়া যখন আর একজনের জীবনে রেখাপাত করিয়া যায়, তখন সে যে সমস্ত ভাব বা ভাবনা কথায় বা কাজে প্রকাশ করিয়া ফেলে তাহাকে আশ্রয় করিয়াই সাধারণ মানুষ অনেক সময় বুঝিতে পারে ঐ ব্যক্তিগত পরিচয়টি পরস্পরের মধ্যে কতখানি শান্তির, তৃপ্তির বা দুঃখের হইয়াছে। এই মানসিক উচ্ছ্বাস সম্বন্ধে মায়া চিরদিনই অত্যন্ত সতর্ক এবং সজাগ। কোন প্রকারেই কাহারো কাছে নিজেকে সে ধরা দিতে চাহে না। অসাবধানতাবশতঃ ধরা পড়িয়াও সে অত্যন্ত সহজে আপনাকে বাঁচিয়ে লইয়া আসিতে পারে। এই একটিমাত্র বিষয়ে সে মানুষ দূরের কথা দেবতাকেও বোধ হয় বিশ্বাস করে না। কমলার ঐ ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় সুরে এক নিমেষে সে বদলাইয়া গেল।

কোন একটা হাস্যকর ব্যাপার শুনিলে মানুষ যেমন করিয়া হাসে, বহুক্ষণ ধরিয়া সে তেমনি হাসিতে লাগিল।

বলিল—কিন্তু সকাল বেলা আমায় মুখের দিকে চাইতেই বিরক্তিতে তাঁর মন ভ'রে গেল মনে হ'ল। তারপর আমি চলে এসেছি।

মায়া বলিল—খুব আঘাত পেয়েছেন কি ?

মুকুল বলিল—না আমাদের শুভ ইচ্ছাটাই অনেক সময় আর একজনের কাছে অত্যাচার বলে মনে হয়; এর মধ্যে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই।—উনি আপনার কাছে এসেছিলেন কি ?—

মায়া বলিল—না।

মুকুল। আপনি ওঁকে খুব স্নেহ করেন তাই একটা কথা আপনাকে বলা দরকার মনে করি—আপনি ওঁর সম্বন্ধে কোন ভয় মনে রাখ্‌বেন না।

মায়া বলিল—আপনি ঠিক কি ভাবে কথাটা বল্‌ছেন তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

মুকুল বলিল—আপনি হয়ত ওঁর দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে সাহায্য কর্‌তে চেয়েছিলেন; কিন্তু সাহায্যটা সব ক্ষেত্রে দরকার হয় না। অনেক মানুষ তাদের সবচেয়ে দুর্ব্বলতা বা দুঃখের সময় মনে সবচেয়ে বেশী শক্তি সঞ্চয় ক'রে নেয়। বিকাশকে সেই মানুষ আমার মনে হ'ল।

মায়া তাহার কৃতজ্ঞতা-ভরা দৃষ্টি মুকুলের মুখের উপর তুলিয়া বলিল—আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। মনটা খুব হাল্কা হ'য়ে গেল।

মুকুল বলিল—এখন আমি আসি—

অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুকে যেমন করিয়া কথা বলে তেমনি সুরে মায়া বলিল—এখন কোথায় যাবেন ?—

মুকুল বলিল—পথে। এই সন্ধ্যার অন্ধকারে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বেশ লাগে। বাইরের আলো নিভে যায়, ঘরের আলো জ্বালা হয়; বাইরের কোলাহল থেমে যায়, ঘরের কোলাহল সুরু হয়; সবাই ঘরে ফেরে। তারপর সে আলোও নেভে, সে কোলাহলও নীরব হ'য়ে আসে। আমিও ঘরে ফিরি।

মায়া বলিল—আবার কবে আস্‌বেন ?

মুকুল বলিল—ঠিক বলতে পারব না, মানুষের কাছে আসা-যাওয়া সম্বন্ধে আমি আজও অভ্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে পারিনি, শুধু বিমল ছাড়া। আপনাদের সঙ্গে ত ওর অনেক দিনের পরিচয়, না ?—

মায়া বলিল—হাঁ।

মুকুল। আমার সঙ্গেও তার অনেক দিনের পরিচয়। আমার কাজের

ভিতর দিয়ে যতটুকু নিজেকে বাইরে প্রকাশ করতে পেরেছি, তার মধ্যে বিমলের সহানুভূতির হাত অনেকখানি আছে। ওর কাছে কৃতজ্ঞতায় আমার জীবন বিকিয়ে আছে।

মুকুল বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু মায়ার মনও আর ঘরে রহিল না। সেও বোধ হয় মুকুলের অনুসরণ করিয়া এই রহস্যময় মানুষটির পিছনে পিছনে ছায়ার মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল!

এক সময় সে আপনার মনে বলিয়া উঠিল—বাইরের আলো নিভে যায়, ঘরের আলো জ্বলে ওঠে—বাইরের কোলাহল থামে, ঘরের কোলাহল সুরু হয়, তারপর সে আলোও নেভে, সে কোলাহলও থেমে যায়—আমি ঘরে ফিরি—কিছু বুঝ্‌লি ঐ কথাগুলো শুনে কম্‌লি?—

কমলা বলিল—ঠিক না বুঝ্‌লেও ফাঁকা কবিত্ব বলে মনে হ'ল না। তোর কি মনে হয়? ভারি অদ্ভুত মানুষটি—না রে?—

মায়া বলিল—কি জানি?

মায়ার কথার সুরে অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া কমলা তাহাকে আর কোন প্রশ্ন করিল না। কিন্তু সমস্ত সন্ধ্যা তাহাকে ঐ ভাবেই থাকিতে দেখিয়া তাহার কেমন অদ্ভুত ঠেকিল এবং মায়াকে লইয়া কৌতুক করিবার বাসনাও ঐ সঙ্গে তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল—রাত্রে শুইবার সময় সুযোগ বুঝিয়া সে মায়ার কাণের কাছে মুখ আনিয়া দুষ্টামি করিয়া বলিল—ভুল্‌বি না কি এবার?—

একজন অপরিচিত মানুষ পরিচয়ের ভিতর দিয়া যখন আর একজনের জীবনে রেখাপাত করিয়া যায়, তখন সে যে সমস্ত ভাব বা ভাবনা কথায় বা কাজে প্রকাশ করিয়া ফেলে তাহাকে আশ্রয় করিয়াই সাধারণ মানুষ অনেক সময় বুঝিতে পারে ঐ ব্যক্তিগত পরিচয়টি পরস্পরের মধ্যে কতখানি শান্তির, তৃপ্তির বা দুঃখের হইয়াছে। এই মানসিক উচ্ছ্বাস সম্বন্ধে মায়া চিরদিনই অত্যন্ত সতর্ক এবং সজাগ। কোন প্রকারেই কাহারো কাছে নিজেকে সে ধরা দিতে চাহে না। অসাবধানতাবশতঃ ধরা পড়িয়াও সে অত্যন্ত সহজে আপনাকে বাহিরে লইয়া আসিতে পারে। এই একটিমাত্র বিষয়ে সে মানুষ দূরের কথা দেবতাকেও বোধ হয় বিশ্বাস করে না। কমলার ঐ ইঙ্গিতপূর্ণ কথার সুরে এক নিমেষে সে বদলাইয়া গেল।

কোন একটা হাস্যকর ব্যাপার শুনিলে মানুষ যেমন করিয়া হাসে, বহুক্ষণ ধরিয়া সে তেমনি হাসিতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া কমলা বলিল—মরণ আর কি ! হাস্‌ছিস্ যে ?—

মায়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—তোর কথাটা ঠিক Typical School mistressদের মত হ'ল কমলা যাদের কেউ বিয়ে করেনি, বা ভালবাসেনি, তারা ঐ ছুটো সম্বন্ধে ভারী সন্দেহ করে। ছুটো ছেলে মেয়ের নাম একজায়গায় হ'লেই তাদের সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই তাঁরা দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পান্। কিন্তু তুই School mistressও ন'স্, ভালবাসাও পেয়েছিস্, বিয়েও হবে, তবু সন্দেহ কর্‌ছিস্ কেন বুঝ্‌তে পারলাম না !

কমলা কোন কথা না বলিয়া মুখ ভার করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল।

মায়া বুঝিল আপনাকে ঢাকিতে গিয়া কমলাকে সে আঘাত করিয়াছে। কথাটিকে হাল্কা করিবার জন্য সে আবার বলিল—একজন মেয়ের জীবনে যতগুলি দেবতার আবির্ভাব হয়, পেশাদারী etiquette বজায় রাখ্‌বার জন্যে যদি সবগুলিকে অন্ততঃ একবার ক'রেও জীবন-দেবতা বানিয়ে হৃদয়-আসনে বসাতে হয়, মানে আমি যদি তাই করি, তাহ'লে—

কমলা রাগ ভুলিয়া হাসিয়া উঠিল।

মায়া বলিল—তাহ'লে সত্যি আমার যিনি জীবন-দেবতা তিনি আমার মুখ দর্শন্ করবেন না।

কমলা বলিল—করবেন না-ই ত।

কমলার গলা জড়াইয়া মায়া চুপি চুপি বলিল—সে ভারী রাগী মানুষ বাবা !

কমলা। আচ্ছা মায়া, এমন ক'রে মনের কথা চেপে রেখে তোর কি হয় ?

মায়া। সুড়সুড়ুনি থেকে তোরা বঞ্চিত হ'স্। সেটা দেখ্‌তে আমার খুব ভাল লাগে।

কমলা আবার কথা বন্ধ করিল এবং অনেক সাধ্য-সাধনার পরও যখন সে কথা কহিল না, তখন মায়া অন্য উপায় অবলম্বন করিল, বলিল—আচ্ছা কম্‌লি, সুধীরবাবু না একুশে তারিখে ছাড়া পাবেন ?

কথাটি বলার আশ্চর্য্য ফল ফলিল ! কমলা ভারী গলায় উত্তর দিল—হাঁ।

মায়া যেন আপনার মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল—বেশ হবে, উনিশে আমার পরীক্ষা শেষ হবে তারপর একদিন প্রাণ ভ'রে জিরিয়ে নিতে পারব, তারপর শ্রীশদার সঙ্গে সেই দিন ভোরে হুগলি যাব।

কমলা। তুই যাবি ?

মায়া। যাব না ? বা রে !

কমলা। শ্রীপদার বন্ধুরাও নিশ্চয় যাবেন তাহ'লে ?

মায়া। তাতে তোর অসুবিধে হবে না কি ?

কমলা। হাঁ। আমি ভাবছিলাম সে জেল থেকে বেরিয়ে দেখবে—আমি একা তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

মায়া। তার আর কি ?—কালই তাহ'লে তুই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দে, যে সেদিন কারো হুগলি যাবার অধিকার নেই, যদি কেউ জোর ক'রে যায় সে বিয়ের চিঠি পাবে না।

কমল হাসিয়া বলিল—তোর মুণ্ডু।

মায়া। আচ্ছা তোরা ত সব যে যার ব্যবস্থা নিজে নিজে ক'রে নিলি, উর্মি কি করছে বলত ?

কমলা। ওর থিওরি ত জানিস্, 'বর' জিনিসটাকে ও পাকা আমের মনে করে। একদিন সেটা ওর নাকের ওপর পড়ে থেবড়ে যাবেই এ বিশ্বাস ওর আছে।

মায়া। যদি ঠিক পাকা না হয় ?

কমলা। ও পাকিয়ে নেবে।

মায়া। যদি এঁঠো হয় ?

কমলা। ধুয়ে খাবে।

মায়া। তাহ'লে আমাদের ভাবনার কিছু নেই, কি বলিস ?—

কমলা হাসিয়া বলিল—না, তুই যত খুসী এঁঠো ছড়াতে পারিস্।

ক্রমশঃ

শ্রী—

পূবের হাওয়া

—নজরুল ইস্‌লাম

(ঝড়—পূর্ব্ব তরঙ্গ)

আমি ঝড় পশ্চিমের প্রলয়-পথিক
অসহ যৌবন-দাহে লেলিহান-শিখ
দারুণ দাবাগ্নি সম নৃত্য-ছায়ানটে
মাতিয়া ছুটিতেছিনু, চলায় দাপটে
ব্রহ্মাণ্ড মন্থন করি'। অগ্রে সহচরী
ঘূর্ণী-হাতছানি দিয়া চলে ঘূর্ণী পরী
গ্রীষ্মের গজল গেয়ে পিলু-বারোঁয়ায়
উশীরের তার-বাঁধা প্রান্তর-বীণায়।
করতালি-ঠেকা দেয় মত্ত তালী-বন
কাহারবা-দ্রুত তালে।—আমি উচাটন
মন্মথ-উন্মদ আঁখি রাগ-রক্ত ঘোর
ঘূর্ণিয়া পশ্চাতে ছুটি, প্রমত্ত চকোর
প্রথম-কামনা-ভীতু চকোরিণী পানে
ধায় যেন দুরন্ত বাসনা-বেগ-টানে।
'সহসা শুনিনু কার বিদায়-মন্থর
শ্রান্ত শ্লথ গতি-ব্যথা, পাতা-থরথর
পথিক-পদাঙ্ক-আঁকা পূব-পথ-শেষে।
দিগন্তের পর্দ্দা ঠেলি' হিম-মরু-দেশে
মাগিছে বিদায় মোর প্রিয়া ঘূর্ণী পরী
দিগন্ত ঝাপ্‌সা তার অশ্রু-হিমে ভরি'।
গোলে-বকৌলির দেশে মেরু-পরীস্থানে
মিশে গেল হাওয়া-পরী।
অযথা সন্ধানে
দিক্‌চক্র-রেখা ধরি' কেঁদে কেঁদে চলি
শ্রান্ত অশ্বশ্বসা-গতি। চম্পা-একাবলী

ছিন্ন ম্লান ছেয়ে আছে দিগন্ত ব্যাপিয়া,—
সেই চম্পা চোখে চাপি ডাকি পিয়া পিয়া!
বিদায়-দিগন্ত ছানি নীল হলাহল
আকণ্ঠ লইনু পিয়া, তরল গরল-
সাগরে ডুবিল মোর আলোক-কমলা
আঁখি মোর ঢুলে আসে—শেষ হ'ল চলা। . . .
জাগিলাম জন্মান্তর-জাগরণ-পারে
যেন কোন্ দাহ-অন্ত ছায়া-পারাবারে
বিচ্ছেদ-বিশীর্ণতনু, শীতল-শিহর
প্রতি রোম-কূপে মোর কাঁপে থরথর!
কাজল-সুস্নিগ্ধ কার অঙ্গুলি-পরশ
বুলায় নয়নে মোর, ঢুলায়ে অবশ
ভার-শ্লথ তনু মোর ডাকে—"জাগো পিয়া!
জাগোরে সুন্দর মোরি রাজা শ্যাঁবলিয়া!"
জল-নীলা ইন্দ্র-নীলকান্তমণি শ্যামা
এ কোন্ মোহিনী তন্বী যাদুকরী বামা
জাগাল উদয়-দেশে নব মন্ত্র দিয়া
ভয়াল আমারে ডাকি'—"হে সুন্দর পিয়া!"
——আমি ঝড় বিশ্ব-ত্রাস মহা-মৃত্যু-ক্ষুধা,
ত্র্যম্বকের ছিন্নজটা,—ওগো এত সুধা
কোথা ছিল অগ্নি-কুণ্ড মোর দাব-দাহে?
এত প্রেম-তৃষা সাধ গরল-প্রবাহে?—
আবার ডাকিল শ্যামা, "জাগো মোরি পিয়া!"—
এতক্ষণে আপনার পানে নিরখিয়া
হেরিলাম আমি ঝড় অনন্ত সুন্দর
পুরুষ কেশরী বীর! প্রলয়-কেশর
স্কন্ধে মোর পৌরুষের প্রকাশে মহিমা!
চোখে মোর ভাস্বরের দীপ্তি-অরুণিমা
ঠিকরে প্রদীপ্ত তেজে! মুক্ত ঝোড়ো কেশে
বিশ্বলক্ষ্মী মালা তার বেঁধে দেয়/হেসে!

এ কথা হয় নি মনে আগে,—আমি বীর
পরুষ পুরুষ-সিংহ, জয়-লক্ষ্মী-শ্রীর
স্নেহের তুলাল আমি ; আমারেও নারী
ভালোবাসে, ভালোবাসে রক্ত-তরবারী
ফুল-মালা চেয়ে ! চাহে তারা নর
অটল-পৌরুষ বীর্য্যবন্ত শক্তি-ধর !

জানিনু যেদিন আমি এ সত্য মহান্—
হাসিল সেদিন মোর মুখে ভগবান্
মদন-মোহন-রূপে ! সেই সে প্রথম
হেরিনু সুন্দর আমি সৃষ্টি-অনুপম !
যাহা কিছু ছিল মোর মাঝে অসুন্দর
অশিব ভয়াল মিথ্যা অকল্যাণকর
আত্ম-অভিমান হিংসা দ্বেষ-তিক্ত ক্ষোভ—
নিমেষে লুকাল কোথা স্নিগ্ধ শ্যাম ছোপ
সুন্দরের নয়নের লাগি মোর প্রাণে !
পূবের পরীরে নিয়া অস্তদেশ পানে
এইবার দিনু পাড়ি। নটনটীরূপে
গ্রীষ্মদগ্ধ তাপশুষ্ক মারী-ধ্বংস স্তূপে
নেচে নেচে গাই নবমন্ত্র সাম-গান
শ্যামল জীবন-গাথা জাগরণ-তান !

* * *

এইবার গাহি নেচে নেচে—
রে জীবন-হারা, ওঠ্ বেঁচে।
রুদ্র কালের বহ্নি-রোষ
নিদাঘের দাহ গ্রীষ্ম-শোষ
নিবাতে এনেছি শান্তি-সোম,
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম্ !
জেগে ওঠ্ ওরে মূর্চ্ছাতুর !
হোক্ অশিব মৃত্যু দূর !

গাহে উদ্‌গাতা সজল ব্যোম,
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম্!
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম্!
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম্!!

* * *

এস মোর শ্যাম সরসা
ঘনিমার হিঙ্গুল-শোষা
বরষা প্রেম-হরষা
প্রিয়া মোর নিকষ-নীলা!

নয়নের কাজল গুলি'
ওলো আয় রাঙিয়ে তুলি
সবুজের জীবন-তুলি,
মৃতে কর্ প্রাণ-রঙীনা॥

আমি আজ পূবের হাওয়া
বাঁচনের নাচন-পাওয়া,
কায়্‌কায় কাজ্‌রী গাওয়া,
নটিনীর পা-ঝিন্‌ঝিন!

নাচি আর নাচ্‌না শেখাই
পূরবের বাইজীকে ভাই,
ঘুঘুরের তাল দিয়ে যাই—
এক্ দুই এক্ দুই তিন॥

বিল ঝিল তড়াগ পুকুর
পিয়ে নীর নীল কম্বুর
থইথই টই টুম্বুর!
ধরা আজ পুষ্পবতী!

শুশুনির নিদ্রা শুষি'
রূপসী ঘুম-উপোসী!
কদমের উদ্‌মো খুশী
সেথায় আজ শ্যাম্ যুবতী॥

হুরীরা দূর আকাশে
বরুণের গোলাপ-পাশে
ধারা-জল ছিটিয়ে হাসে
বিজুলির ঝিলিমিলিতে!
অরুণ আর বরুণ রণে
মাতিল ঘোর্ স্বননে
আলো-ছায় গগন বনে
"শার্দ্দূল বিক্রীড়িতে।"

(শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে)

উল্লাস্ ভীম
মেঘে কুচ্‌কাওয়াজ
চলিছে আজ,
সোন্মাদ সাগর
খায়রে দোল্!
ইন্দ্রের রথ
বজ্রের কামান
টানে উজান
মেঘ ঐরাবত
মদ-বিভোল্॥
যুদ্ধের রোল
বরুণের জাঁতায়
নিনাদে ঘোর,
বারীশ্‌ আর্ বাসব
বন্ধু আজ?
সূর্য্যের তেজ
দহে মেঘ-গরুড়
ধূম্র-চূড়,
রশ্মির কলক
বিঁধিছে বাজ॥

বিশ্রাম হীন
যুঝে তেজ-তপন ;
দিক্-বারণ-
শির-মদ-ধারায়
ধরা মগন !
অম্বর-মাঝ
চলে আলো-ছায়ায়
নীরব রণ
শার্দ্দূল শিকার
খেলে যেমন ॥
রৌদ্রের শর
খরতর প্রখর
ক্লান্ত শেষ,
দিবা দ্বিপ্রহর
নিশী-কাজল !
সোল্লাস ঘোর
ঘোষে বিজয়-বাজ
গরজি-আজ
দোলে সিংহবি—ক্রীড়ে দোল্ ॥

(সিংহ-বিক্রীড় ছন্দে)

নাচায় প্রাণ রণোন্মাদ, বিজয় গান, গগন ময় মহোৎসব !
রবির রথ অরুণ-যান কিরণ-পথ ডুবায় মেঘ- মহার্ণব ॥
মেঘের ছায় শীতল কায় ঘুমায় থির দীঘির জল অথই থই !
তৃষায় ক্ষীণ 'ফটিক্ জল ফটিক্ জল' কাঁদায় দিল্ চাতক ঐ ॥
মাঠের পর সোহাগ-ঢল জলদ্-দ্রব্ ছলাৎছল ছলাৎছল্ !
পাহাড়-গায় ঘুমায় ঘোর অসিত মেঘ- শিশুর দল অচঞ্চল ॥
বিলোল-চোখ হরিণ চায় মেঘের গায়, চমক খায় গগন-কোল !
নদীর পায় চখীর ডাক "কোয়াক্কো" বনের বায় খাওয়ায় টোল।

স্বয়ম্ভুর   সতীর শোক   ধ্যানোন্মাদ   নিদাব-দাব তপের কাল
নিশেষ আজ !   মহেশ্বর   উমার গান   চুমার ঘায় রাঙায় লাল !

(অনঙ্গশেখর ছন্দে)

এবার্ আমার   বিলাস সুরু   অনঙ্গশেখরে ।
পরশ সুখে   শ্যামার বুকে   কদম্ব শিহরে ।
কুসুমেষুর   পরশ-কাতর   নিতম্ব-মন্থরা
সিনান্-শুচি   সযৌবনা   রোমাঞ্চিত ধরা ।
ঘন শ্রোনীর,   গুরু উরুর,   দাড়িম-ফাটার ক্ষুধা
যাচে গো আজ   পরুষ-পীড়ন   পুরুষ-পরশ-সুধা ।
শিথিল-নীবি   বিধুর বালা   শয়ন-ঘরে কাঁপে,
মদন্-শেখর   কুসুম্-স্তবক   উপাধানে চাপে !
আমার বুকের   কামনা আজ   কাঁদে নিখিল জুড়ি',
বনের হিয়ায়   তিরাব জিয়ায   প্রথম কদম কুঁড়ি ।
শাখীরা আজ   শাখায় শাখায়   পাতায় পাতায় বাঁধা,
কুলায় রচে,   মনে শোনে   শাবক শিশুর কাঁদা ।
তাপস-কঠিন   উমার গালে   চুমার পিয়াস জাগে,
বধূর বুকে   মধুর আশা   কোলে কুমার মাগে !
তরুণ চাহে   করুণ চোখে   উদাসী তার আঁখি,
শোনে কোথায়   কাঁদে ডাহুক   ডাহুকীরে ডাকি !
এবার আমার   পথের সুরু   তেপান্তরের পথে,
দেখি হঠাৎ   চরণ রাঙা   মৃণাল-কাঁটার ক্ষতে ।
ওগো আমার   এখনো যে   সকল পথই বাকী,
মৃণাল হেরি'   মনে পড়ে   কাহার কমল-আঁখি !

—ক্রমশঃ

প্রাপ্ত পত্র

—শ্রীসুশান্ত সেন।

কল্লোল সম্পাদক সমীপে,—

কাগজ পড়া আমার বহুকালের অভ্যাস। বাংলা মাসিক প্রায় সবগুলিই নিয়মিত পড়ে থাকি। এগুলিতে মাসে মাসে যে সব গল্প ও উপন্যাস বা'র হয়, তার কয়েকটি নিয়ে দু' চারটে কথা লিখ্‌তে চাই,—যদি পছন্দ হয় ত ছাপাবেন।

যে কাগজগুলো এখন আমার হাতের কাছে রয়েছে, তাদের কথাই আজ বলি। অবশ্য আমার মন্তব্য, যে অন্যের মন্তব্যের সঙ্গে সবই মিল্‌বে, তার কোনও মানে নেই,—তবে মনে হয়, যা ভাল, তা সবারই কাছে ভাল।

সম্প্রতি একটি নূতন লেখকের লেখা পড়্‌লাম, লেখকের নাম শ্রীযুক্ত বিজয় সেনগুপ্ত, গল্পের নাম পানওয়ালী (বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১)। লেখার ভিতর তেমন ঘটনা-বৈচিত্র্য নেই,তবে প্রকাশ করবার ভঙ্গী এবং মনস্তত্বের বিশ্লেষণ করবার বেশ একটু ক্ষমতা আছে, তাঁর লেখায় যতটা আনন্দ দিয়েছে, তার চেয়ে আশ্বাস দিয়েছে বেশী। বঙ্গবাণীর এই সংখ্যাতেই আর একটী গল্প বেরিয়েছে, রোগীর জগৎ; লেখক—শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে। গল্পের প্লটটি বিশেষত্বহীন নয়। বংশগত যক্ষ্মার বিষে একটী নির্দ্দোষ তরুণ জীবন কেমন ক'রে সব দিক্‌ দিয়ে ব্যর্থ হয়ে এই পৃথিবীর কোল থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল,—এই কাহিনীটি লেখকের আন্তরিকতার গুণে বেশ করুণ হয়ে ফুটে উঠেছে।

আষাঢ়ের প্রবাসীতে গল্প বেরিয়েছে চারটি, কিন্তু আমি বল্‌ব দুটির কথা। 'রুদ্ধগৃহ' গল্পটি শ্রীযুক্তা শান্তা দেবীর। বহুদিন পরে প্রবাসীতে তাঁর এই গল্পটি পেয়ে খুশী হলাম। বাংলার মহিলা লেখিকাদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান আছে। এই রুদ্ধগৃহে তাঁর সে বিশিষ্টতা তিনি অক্ষুণ্ণই রেখেছেন। এই রুদ্ধগৃহের মধ্যে দুটি মিলন-প্রয়াসী হৃদয় তাদের অসীম ও অসাধারণ বিরহ নিয়ে চিরকাল আবদ্ধ হয়ে রইল। কাছে পেয়েও কেউ কাউকে পেল না। চির বিরহের গভীর বেদনাটি তিনি এই রুদ্ধ গৃহের রহস্যের মধ্যে প্রথমে আবদ্ধ রেখে পরে অতি নিপুণ ভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শেষের প্রকাশ-ভঙ্গীতে একটু যেন ত্রুটি থেকে গেছে বলে মনে হ'ল।

তারপর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিশপ্ত' গল্পটি। এটি আধুনিক বাংলার জীবন নিয়ে নয়। আমি ঐতিহাসিক নই, কাজেই এতে ইতিহাস যতটুকু আছে তার সম্বন্ধে কোনও কথা বলবার অধিকার আমার নেই,—তবে গল্পটির আখ্যানভাগ বেশ সুন্দর এবং বিশেষ ক'রে শেষের দিকটা বেশ করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী হয়েছে।

জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে শ্রীযুক্ত ভূপতি চৌধুরী 'রাতের ছবি' বেশ দরদ দিয়ে এঁকেছেন। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শিকলির দাম' ও এই সংখ্যায় বেরিয়েছে। তাঁর ভারতীর এই লেখাটি ঠিক গল্প নয়, প্লটও এতে বিশেষ কিছু নেই, তবে মস্ত বড় দরদী বুক নিয়ে তিনি এই 'শিকলির দাম' লিখেছেন। অত্যাচার এবং নিপীড়নের মধ্য দিয়ে যে সব জাতিকে এই শিকলির দাম দিতে হয়, তারাই এর মর্ম্ম প্রাণে প্রাণে অনুভব করবে।

দুঃখের বিষয়, আষাঢ়ের ভারতবর্ষে গল্পের মত গল্প একটিও নেই। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় এম এ মহোদয়ের 'চিররাত্রি' গল্পটি কাণার মধ্যে ঝাপ্‌সা। লেখকের ভাষা ভাল, কিন্তু গল্পটি সাজাবার দোষে ভাল জমে নি। তবে মাঝে মাঝে এক একটা জায়গা বেশ ফুটেছে। দূরে থেকেও বিমলের সঙ্গে আভার প্রতিদিনকার এক হবার চেষ্টা, পাঠকের মনে বেশ একটা করুণ দাগ দিয়ে যায়। ভাল করে লিখ্‌লে গল্পটি বোধ করি ভালই হ'ত।

এইবার মধুরেণ সমাপয়েৎ করি। একটি গল্পের মত গল্প পড়্‌লাম,—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের—'ইজ্জৎ'। বৈশাখের সংহতিতে গল্পটি বেরিয়েছে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈরাগ্য-যোগ' নিশ্চয়ই পড়েছেন। শুনেছি ইনি ভাগলপুরে থাকেন। দুঃখের বিষয়, ইনি লেখেন খুব কম, কিন্তু যখনই যা লেখেন, আমি খুব আগ্রহ সহকারে পড়ি, কেন না, বাজে লেখা তাঁর হাত থেকে বড় একটা বেরোয় না। এই 'ইজ্জৎ' গল্পটার কথাই বলি। গল্পটি নূতন ধরণের। সামান্য কয়েকটা কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে কয়েকটি বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্র তিনি অতি নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ভারতের শ্রমিকদের শুধু বাইরের দুঃখ-দৈন্যের কথা নয়, যুগ-যুগান্তের পরাধীনতার অন্তরের দারিদ্র্যও যে তাদের কত বেশী,—এই-সবকথা তিনি এক অসামান্য মুন্সিয়ানার সঙ্গে এই সামান্য গল্পটির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আজ এই পর্য্যন্ত। উপন্যাসের কথা বলা আজ হল না, ভবিষ্যতে যদি ভরসা দেন, ত এরকম চিঠি আরও পাঠাতে চেষ্টা করব। নিবেদন ইতি।

কে লইবে ?

জাতিহীন, জাতিহীন আমি ;
গৃহ-হারা পথিকের মত—
যুগ যুগ ধরি, মানুষের অন্তরে বাহিরে
ঠাঁই খুঁজি' ভ্রমি নিশি দিন।

আজও কেহ দিল না ত ঠাঁই ;
কেহ রাখিল না মোরে
বুক পাতি সারাটি জীবন।
যেদিন সুরের মাঝে
জন্ম নিল মানুষের মন,
একক নিঃসঙ্গ করি
কে দিল ভাসায়ে মোরে
পৃথিবীর ধূলি-পথে
সেই জানে আমারে লইয়া
একা তার কেন কাটিল না,
কেন দিল বুক খালি করে'
মানুষের চিরসঙ্গী ক'রি !

তারপর হ'তে
রাত্রিদিন হৃদয়ে হৃদয়ে ফিরি।
কত জনা দিল ঠাঁই,
আমারে লইয়া
কাটাল জীবন কত নীরব ব্যথায়,
পলে পলে,
বিষণ্ণ আনন তুলি স্নিগ্ধ নেত্রে
চাহি মোর পানে ;

সে মুখের কাতরতা হেরি,
শূন্য জীবনের হাহাকার শুনি,
আমি দুঃখ, আমারও হৃদয়
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যেত।
আমারে লইয়া
দুর্বিসহ জ্বালা ? ক্ষোভে শোকে
প্রাণ ফেটে যেত, তবু ভাবিতাম
যদি, যদি মোরে বন্ধু বলি
চির সাথী করি রাখে,
তারে দিব বিমল আনন্দ,
নিখিলের অন্তহীন-সুখ-দুখে-ভরা
জীবনের প্রচ্ছন্ন যৌবন,
শ্রান্ত হিয়া রহিবে বিভোর
বাক্যহীন অসীম শান্তিতে।

আশা পুরে নাই ;
কেহ দিল অভিশাপ,
কেহ দিল ফিরায়ে আমারে
দ্বার হ'তে, সুখোল্লাস প্রহরী
ডাকিয়া। কেহ বা জীবনে
দুঃখেরে বরণ করি মরণ আনিল।
মোরে লয়ে কেহ রহিল না সুখে।
কেহ বুঝিল না,
আমি তারে কত দিতে পারি,
দিনে দিনে আমি তারে,
অলীকের মোহ-স্বপ্ন হ'তে,
আপনার অভিমান, ব্যর্থ-আশা হ'তে,
কত তারে দিতে পারি ফিরে !

দুঃখ হ'য়ে এসেছি জীবনে,
শান্তি হ'য়ে ফিরে যেতে চাই ;

শান্ত করি নব নব জীবন-বিকাশে
ফিরে যেতে চাই, যার দুঃখ
তারি বক্ষ মাঝে, নব নব
যাত্রী লয়ে চিরানন্দে চিন্ময় হইয়া,
ধূলি পথে উড়াইয়া বিজয়-কেতন
ধরিত্রীর স্তব্ধ রাজ-পথে।

কে ঘুচাবে মোর দুঃখ?
আমি দুঃখ, আমারে কে লবে
সুখ বলি? কে মাগিবে অহোরাত্র
সুদীর্ঘ দিবস, ক্লান্তিহীন চেতনায়,
আপনার মিথ্যা দুঃখ ভুলি,
কে লইবে জীবনে ডাকিয়া
ঠাই-হারা এ চির-দুঃখেরে?

তাদের দেশ—শুন্‌ছে বড় হয়ে উঠ্‌ছে, তবে তাদের অবস্থা এমন হয় কেন! কারখানায় কলে গাধার মত খেটে তাদের সভ্য হবার কোন লক্ষণই দেখ্‌তে পাচ্ছে না। ধোঁয়ায় ধূসর বাস, আধপেটা খেয়ে ক্ষীণ দেহ, প্রাণে স্ফূর্তি নেই—শরীরে বল নেই—এ কি রকম সভ্য হওয়া।

"শিকলির দাম"

নিয়মিত লেখক

কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙলাদেশে সাময়িক পত্রিকার বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। বাঙলা ভাষার প্রতি এই সমাদর ও সাহিত্যের প্রতি এই শ্রদ্ধা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এই পত্রিকাগুলির প্রচার দেখিয়া মনে হয় বাঙালী পাঠকের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে। কাগজগুলি অল্প বা বহু সংখ্যায় যে বিক্রয় হইতেছে তাহাতে মনে হয়, যাহারা বাঙালীকে এতদিন নিরক্ষর করিয়া রাখিয়া তাহাদের ধারণা-শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের বুদ্ধিকে নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের চেষ্টা ও উদ্দেশ্য বিফল হইতে চলিয়াছে। এতকালের নিস্তেজ জাতি, পড়িতে পারিয়া, বুঝিতে পারিয়া, ধারণা করিতে পারিয়া, পরমুখাপেক্ষা ছাড়িতে বসিয়াছে। জাতি আজ নিজের বিষয় চিন্তা করিতে পারে, সৌন্দর্য্য ও আনন্দের রস গ্রহণ করিতে পারে, বিদেশের খবর জানিতে পারে, নিজের অবস্থার বিষয়ও ভাবিতে পারে, ইহাই জাতির পক্ষে পরম সৌভাগ্য। যে জাতি তাহার নিজের দেশের ভাষার সমাদর করিতে শিখিয়াছে, সে জাতি তাহার দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইবেই। এই আকর্ষণ তাহাকে ক্ষুদ্রতা হইতে বাহিরে টানিয়া আনে এবং সমগ্রভাবে মহৎ যাহা কিছু তাহাই উপলব্ধি করিতে শিক্ষা দেয়। এই উপলব্ধির ভিতর দিয়াই সাধনা ও উন্নতি আরম্ভ হয়।

তাই বাঙলার পাঠক-সমাজকে পরিচালিত করিবার ভার অনেক পরিমাণে এই সাময়িক পত্রিকাগুলির। ইহার মধ্যে মাসিক পত্রিকাগুলি বহু বিষয়ের আলোচনা করে বলিয়া ইহার স্থান সর্ব্বাগ্রে এবং দায়িত্বও সেই পরিমাণে অধিক।

আজকাল মাসিক পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপনে তাঁহাদের নিয়মিত লেখক লেখিকার একটি প্রকাণ্ড ফর্দ্দ দেখা যায়। এবং ফর্দ্দগুলি মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, একই ব্যক্তি প্রায় সকল মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত লেখকের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। তাহার হয়ত একটা কারণ এই যে, তাঁহারা প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়া সাধারণে পরিচিত। কিন্তু অনেক পত্রিকার এক বৎসরের মাসিক সংখ্যাগুলি পড়িয়া, দেখা যায় যে ফর্দ্দে লিখিত অনেক লেখকের কোনও রচনাই প্রকাশিত হয় নাই। অথবা কোনও লেখকের মাত্র একটি

লেখা এক বৎসরে সেই কাগজে বাহির হইয়াছে। নিয়মিত লেখক বা লেখিকা বলিয়া যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাহা এই কারণে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। শুনা যায় অনেক স্থানে এই সকল লেখকদের অনুমতি না লইয়াও তাঁহাদের নাম দেওয়া হয়। সুতরাং এরূপ বিজ্ঞাপন না দেওয়াই উচিত।

এই সকল বিজ্ঞাপন দেখিয়াই সাধারণ পাঠক-পাঠিকা পত্রিকাগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঐ সকল উল্লিখিত লেখকের রচনা পাঠ করিতে পারিবেন বলিয়া হয়ত গ্রাহক শ্রেণীভুক্তও হন; কিন্তু তাঁহাদিগকে যদি সেই সকল লেখকের রচনাদি নিয়মিত ভাবে দেওয়া না যায়, তাহাতে পাঠকদের অত্যন্ত ঘৃণিতভাবে প্রবঞ্চনা করা হয়। এই লোকঠকানোর চেষ্টা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও আসিবার কোনও কারণ ছিল না। অধিক সংখ্যায় গ্রাহক পাইবার প্রলোভনেই হয়ত এই নূতন দুর্নীতি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে। ইহার জন্য যাহারা দায়ী তাঁহাদের এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ অসত্য বিজ্ঞাপন প্রচার না হয় তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। পাঠকেরা একবার বৎসরের জন্য গ্রাহক হইয়া পড়িলে একেবারে নিরুপায়,—তাঁহাদের অগ্রিম টাকা দিয়া কাগজ লইতে হয়। কাজেই একবার গ্রাহক হইয়া আর কিছু বলিবার বা প্রতিবাদ করিবার কোনও উপায় থাকে না। সেইজন্যই মাসিক পত্রিকার কর্তৃপক্ষদের পাঠক সমাজের প্রতি আর একটু শ্রদ্ধা রাখিয়া যতদূর সম্ভব সরলভাবে তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া, নিজ নিজ ক্ষমতা ও উপায়োপযোগী বিজ্ঞাপন দ্বারা পত্রিকার বিষয় অবগত করান উচিত। কোনও পত্রিকা এককালে নিজেদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী উন্নতি করিতে না পারিলেও পাঠক-সমাজ অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত সেই পত্রিকার উন্নতির জন্য অপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন না। পত্রিকার পরিচালকেরা যে পত্রিকার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহা পাঠকেরা মাসের পর মাস পত্রিকার সংখ্যাগুলি পাঠ করিয়া কিছু ধারণা করিতে পারেন। সম্পাদন বিভাগের নিবিড় ও নীরব চেষ্টা যে পত্রিকায় প্রতি ছত্রে প্রকাশ পায় তাহা পাঠকেরা দেখিয়া সুখীই হন এবং সেইজন্য স্বভাবতই সেই পত্রিকার প্রতি তাঁহাদের মনে একটা অনুরাগ ও মমতা জন্মায়। এই ভাবে যে প্রত্যেক পত্রিকার একটি শুভাধ্যায়ী পাঠক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় তাহাই পত্রিকার জীবনবল ও সার্থকতার চিহ্ন।

নানাপ্রকারের 'ভোল্' দেখাইয়া, অনিচ্ছাকৃত অসত্য আচরণের আশ্রয় না

লইয়াও পত্রিকার যে গ্রাহক সংখ্যা বাড়িতে পারে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বাঙালী পাঠক-সমাজ বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে, তাঁহাদের সে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। সে বিশ্বাসের যাঁহারা অপব্যবহার করেন তাঁহাদের জন্য যে অপমান সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, একদিন যে, ভাবেই হউক সে বোঝার নীচে তাঁহাদের লাঞ্ছিত হইতে হইবেই। দেশের লোক যতখানি প্রবঞ্চক হইয়া ওঠে তাহার জন্য এইরূপ অৰ্দ্ধ-সত্য বিজ্ঞাপনদাতারা যে কিছুটা পরিমাণে দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংগ্রহ

. . . মেঘলা আকাশের নীচে নিবিড় সন্ধ্যায় মধ্যে, কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য,—মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত! . . .

. . . মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই অবিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, সবশুদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদি-অন্তশূন্য প্রশ্নোত্তরহীন মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মত অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করচে। এক এক সময়ে কোথাকার কোন ছিদ্র দিয়ে জগতের বড় বড় প্রবাহ হৃদয়ের মধ্যে পথ পায়—তার যে একটা ধ্বনি শোনা যায়—সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য।

. . . অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ইহজীবনে দুটো মানুষে কতটুকু অংশ রেখায় রেখায় সংলগ্ন? যাকে দশ বছর জানি তাকে দশটা বছরের কত সুদীর্ঘ অংশই জানিনে . . . সে কথা ভেবে দেখ্‌লে সবাইকে অপরিচিত বলে বোধ হয় . . . এ রকম ভেবে দেখ্‌লে কোনো কোনো প্রকৃতিতে বৈরাগ্যের উদয় হয় কিন্তু আমার আরও বেশি করে দেখ্‌তে, বেশি করে জান্‌তে ইচ্ছা করে। তখন যেন সদ্যজাত হৃদয় দিয়ে আপনাকে সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষকে এবং বর্ত্তমান ঘটনাকে অনন্তকালের চিত্রপটের উপরে প্রতিফলিত দেখতে পাই। . . . পুরাতনকে বার বার নূতনের মতই দেখি . . .।

— ছিন্নপত্র

সমাচার

মুক্তির ডাক—শ্রীমন্মথ রায় বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

বাংলা ভাষায় একাঙ্ক নাটক বা ছোট নাটিকার অত্যন্ত অভাব। মুক্তির ডাক একখানি একাঙ্ক নাটক, এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ। ইহাতে ইতিহাসের একটু অস্পষ্ট ছায়া আছে। নামগুলিও ঐতিহাসিক। অল্প একটু ছোট জিনিষের ভিতর নাটকখানি খুব জমিয়াছে। শুধু পড়িতেও ভাল লাগে। অম্বার চরিত্রটি ঘিরিয়া নাটকের অন্য চরিত্রগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রভু বুদ্ধের শান্ত আশ্রয়ে কতকগুলি পরিশ্রান্ত মানুষ পরম শান্তি লাভ করিল ইহাই মুক্তির ডাকে দেখান হইয়াছে। এই নাটকখানি ষ্টার থিয়েটারে একরাত্রি অভিনীত হইয়াছিল। আশা করা যায় এই পুস্তকখানি সাধারণের আদৃত হইবে।

বাণী—(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা) বৈশাখ হইতে প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক, প্রিণ্টার ও প্রকাশক—শ্রীহরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জেমসেদপুর, ৭৫ নং ষ্টেট মাইল রোড হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা ⁄০ মফঃস্বলে বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

বাণীর উদ্দেশ্য—"—লাভ করা নয়—সাহিত্য চর্চ্চা ও প্রচার করা। দেশের ও দশের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফল নামমাত্র মূল্যে পাঁচ জনের হাতে তুলিয়া দেওয়া। ইত্যাদি"

গৌড়-প্রভা—(মাসিক পত্রিকা) সম্পাদক শ্রীননিলাল চক্রবর্ত্তী বি, এ, সহকারী সম্পাদক—শ্রীযতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্ ও শ্রীমন্মথনাথ ভক্তিবিনোদ। ১ নং বেলিলিয়স কার্ট বাই লেন, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা ⁄১০ বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা মাত্র। আশ্বিন মাস হইতে বর্ষারম্ভ।

যুবক—(মাসিকপত্র ও সমালোচনা) সম্পাদক শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক। শান্তিপুর, রামনগর পাড়া, ৭১ নং হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার—(মাসিকপত্র) বঙ্গীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের একমাত্র মুখপত্র। সম্পাদক—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাস বি, এল্ ও শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২৲। কার্য্যালয়—পোঃ আঃ জনকা, মেদিনীপুর।

জিনবাণী—বঙ্গ-বিহার অহিংসা ধর্ম্ম পরিষদের মাসিক মুখপত্র। সম্পাদক—শ্রীপান্নালাল বাকলীওয়াল, সহকারী সম্পাদক—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শ্রাবক এম-বি। প্রতি সংখ্যা ।০, বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। ১০-১৯ নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড, পোঃ আঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।



মেঘ-কজ্জল আকাশ, তাহারই নিম্নে ভাদ্রের ভরা নদী কূল ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। ভরা স্রোতের উপর ভাসিয়া চলিয়াছে কোন বহুনীড় মহীরুহের ভগ্নশাখার সহিত কোন্ শিশু-পাদপের অপরিপুষ্ট শাখা,—শাখায় লগ্ন রহিয়াছে কোথাকার এক জীর্ণ পর্ণশালার ঝঞ্ঝাদীর্ণ আবরণ।

কূল ভাঙ্গার গান গাহিয়া উন্মত্ত আবেগে সে খরস্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে—অঙ্গে তাহার গৈরীক উত্তরীয়, কণ্ঠে তাহার নিরুদ্ধ কণ্ঠের অস্পষ্ট আর্তনাদ, ললাটে কাজল মেঘের কৃষ্ণ-ছায়ার রুদ্র-তিলক, শিরে বহিয়া চলিয়াছে ছিন্ন-ভিন্ন শাখাপত্রের বিজয়-মালা।

দুঃখের বরষার হাজার আঘাতের রেখা এখনও তরঙ্গের উপর তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিতেছে—আর তাহারই উপর একটি নীড়-হারা পাখী মেঘলোকের হারিয়ে-পাওয়ার অন্তরধ্বনি শুনিয়া ধরণীর দিকে স্তব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে—আজ কোন্ পথে তার যাওয়া—কোন্ অকূলে তার ভাসা!

পরিচয়লিপি

যে সকল লেখক-লেখিকা আমাদের কল্লোলে রচনাদি দিয়া থাকেন তাঁহাদের লেখার পরিচয় বারম্বার দিয়াও মনে হয় পরিচয় দিতে যাইয়া তাহা যেন আড়ষ্ট হইয়া পড়ে।

যাঁহারাই গভীর ভাবে চিন্তা করেন এবং ভাষার দ্বারা চিন্তার নির্জ্জনতার মধ্য হইতে তাহারই ছন্দকে গাথিয়া ফেলেন, সামান্য ভাবকে অসামান্য রূপে ব্যক্ত করেন, ক্ষুদ্রতাকে অপূর্ব্ব ক্ষমতা বলে বড় করিয়া লন, তাঁহারাই কবি, তাঁহারাই সাধক।

তাই যাঁহারা গল্প লেখেন, কবিতা লেখেন, কোনও প্রকারের নিবিড় চিন্তা-লব্ধ রচনা ভাষায় প্রকাশ করেন, তাঁহাদের সকলকেই যেন কবি বলিতে ইচ্ছা হয়।

এই কবিদের রচনাগুলিকে ঘড়ি ঘণ্টা ধরিয়া পড়িয়া, আলস্যের অবসরটুকুকে কাটাইবার জন্য বা সাময়িক একটি কৌতূহলকে চরিতার্থ করিবার জন্য পাঠ করিয়া কবিদের যাঁহারা বিচার করেন তাঁহারা নির্ব্বোধ না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা যে অরসিক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

খুব বিজ্ঞ ব্যক্তি হয়ত গাছের রস, খাদ্য, বিশিষ্টতা, এমন কি মূল হইতে পাতা পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া বলিতে পারেন, এই গাছে যে ফুল ফোটে তাহা হনলুলু বা কামস্কাট্‌কার অমুক গাছেরই ফুলের মত কিন্তু বলিতে পারেন না অমন সুগন্ধ, অমন রূপ লইয়া ফুলটি ফুটিল কেমন করিয়া।

তেমনি কবির লেখাকে অবজ্ঞা করিয়া বা সাহিত্যের বিজ্ঞানাগারে ফেলিয়া বিচার করিতে গেলে গাছের বাকলের রং কি বা তাহার পাতার কয়টা শির থাকে তাহা জানিতে পারা যায়, কিন্তু তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া যে রৌদ্র জল ও শীতের স্পর্শকে অবলম্বন করিয়া ফুলটি ফুটিল তাহাকে চেনা হইল না, গাছের ঐ সৃষ্টির সৌন্দর্য্যটুকুকে জানা হইল না।

কবির লেখার প্রত্যেক অক্ষর, প্রত্যেক শব্দ-প্রয়োগ, প্রতিটি ছত্র কত দীর্ঘ কালের অনির্ব্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ! তাহা অন্যান্য কথাবার্ত্তা বা কাজকর্ম্মের মত ক্ষণিকের প্রয়োজন জনিত নহে।

ভাদ্রের সংখ্যায় যতগুলি কবি লিখিয়াছেন তাঁহাদের লেখার পরিচয় তাঁহাদের এক একটি লাইনে, সেইগুলিই বিশেষ ভাব হইয়া হয়ত সমগ্র রচনাটিতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

'অম্লান পুষ্পে' কবি লিখিয়াছেন

—তবু সে সবার হতে—
তুমি বহুগুণ বড় চিরদিন,⋯

'চোখের চাতকে' কবি লিখিয়াছেন—

⋯দেখার খেলা করি, চেয়ে চেয়ে কথা কই।

'কালোমেয়ের' কবি লিখিয়াছেন—

⋯তবু অর্দ্ধস্ফুট-যৌবনা কিশোরী এক মেঘ্‌লা-করা দুপহরে অনাদিকালের সেই মধুর ভুল আবার নতুন করে' করে' বস্‌ল;⋯

'পোড়োবাড়ী'র কবি লিখিয়াছেন—

⋯মেয়েটি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তো—এই দুই মাতা-পুত্রের অসীম স্নেহ মমতায় অপূর্ব্ব স্বর্গীয় খেলা—আর তার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌তো কি এক করুণ হাহাকার!⋯

'মেঘদূতের' কবি গাহিয়াছেন—

⋯যেন কোন্ নিবিড় বেদনে,
আছাড়ি পড়িল স্বর্গ-মর্ত্ত্যের উরসে।

⋯স্মৃতি-স্বপ্ন চেতনা বিরাগী
শুধু ধায়—শুধু চায়
পাগলের প্রায়—
আশার বন্ধন মাঝে বেঁধে নিতে মত্ত দুরাশায়।

কর্ম্মবীরের পরিচয় তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের ঘটনাগুলির ভিতর, কিন্তু কবির পরিচয় তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার রচনার ভিতর।

অম্লান পুষ্প

—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

এই মোর ভীরু আশা,
আজিকে নিষ্ঠুর হাতে ভেঙে তুমি দাও এর আরামের বাসা,
এর নিজ হাতে-গড়া নয়ন-অঞ্জন দাও মুছে
বিহ্বল স্বপ্নের, যাক্ ঘুচে
সব শান্তি সব নিশ্চিন্ততা
নিবিড় নিদ্রায় মোহনীড়।
আজি যথাতথা

এরে লয়ে' ফিরি আমি গিরি মরু শ্মশানে মশানে।
দিন অবসানে
যখন ডাকিবে এরে পাতাঘেরা বনানীর কোল
দেবে দোল ঘনঘন দেবে দোল,
করতালি খরতালে কলরোল তুলি' কালবৈশাখীর ঝড়,
যদি আশ্রয়ের শাখা বেদনায় টুটে মড়মড়
ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরে যদি আর্ত্তকণ্ঠ হ'তে
ক্লান্তিতে এলায়ে যায় ডানা—কোনো বিজন পর্ব্বতে
তৃণতরুশষ্পহীন প্রস্তরের ত্রস্ত বক্ষ'পরে
তীরসম পড়ে মূর্চ্ছাতুর,—বিদ্যুতের শানিত খর্পরে
আঁধারের বক্ষ চিরি শিলাসম কুলিশ-শীতল
ধারার প্লাবন বহে ডুবাইয়া এর বক্ষতল
নিঃশ্বাসের সঘন আহুতি, যদি টুটে গিরিশিলা
সে ধারা-বেগের মুখে, খরগতি চির নৃত্যশীলা
উপল-আহত পথে চলে তার নির্ম্মম ক্রীড়ায়
ডুবায়ে ভাসায়ে পলেপলে,—তবে শিরায় শিরায়

বাজে যে ছন্দের দোলা,—তার সনে মিলাইয়া সুর
তার সারা বক্ষ ভরি' জাগে কোনো অবোধ শিশুর
অকারণ হাসিসম মুখরিত সোহাগের ভাষা
অজানা মায়ের মুখ হেরি'—সেই আশা,
আমার সে আশা।

নহে এ ত নহে,—
এই যে আশার বাণী প্রাণপণে কে আমারে কহে
মোর বক্ষমাঝে বসি—ভয়েরে সে প্রাণপণে চায়
সভয়ে রাখিতে দূরে, সুনিবিড় পল্লব-প্রচ্ছায়
আপনারে ঢাকা দিয়া। ভয়েরে এ ভয়,—
এই চোখ বুজে থাকা, নয় নয় আমার এ নয়,—
এই শুধু ডেকে বলা, হে মরণ তুমি কোথা নাই,
নাই ঝড় নাই রাত্রি,—এ ধরার সকল খানাই
সবুজ আশ্বাসে ভরা, এই শুধু আপনারে লয়ে
সুন্দর রঙীন প্রবঞ্চনা, এই মায়াভরা স্বপ্নের নিলয়ে
সুকোমল শয্যা পরে' নিভৃত নিদ্রায় রাজবালা—
তার তরে নহে নহে এই মোর বরণের মালা
বহু অশ্রু বহু দুঃখ বেদনার স্মৃতি দিয়ে গড়া,
এ মালা পরাব যারে গোপনে সে দেবে মোরে ধরা
আমারই দুঃখের মাঝে তিলে তিলে সঞ্চারিয়া তার
সুকোমল স্নিগ্ধ স্পর্শ,—জুড়াইয়া সকল ব্যথার
ব্যাকুল মর্ম্মের দাহ, কুড়াইয়া আপন আঁচলে
সব ব্যর্থতার রাশি—পলে পলে মৌন লীলাচ্ছলে
অশ্রুর নিষেকে মোর জীবনের মরুর ধূলা,
ফুটায়ে অম্লান-পুষ্প আনন্দের।

ভেঙে যাক্ ভেঙে যাক্, এ কোলকুলায়
নিরুপায় ভীরুতার! আর তবে আয়,
তামস-গভীর রাত্রি, অজানা দিগ্‌দেশ যাত্রী ঝড়,
আমার বক্ষের 'পরে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ রোষ ভেঙে পড়,

অম্লান পুষ্প

—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

এই মোর ভীরু আশা,
আজিকে নিষ্ঠুর হাতে ভেঙে তুমি দাও এর আরামের বাসা,
এর নিজ হাতে-গড়া নয়ন-অঞ্জন দাও মুছে
বিহ্বল স্বপ্নের, যাক্ ঘুচে
সব শান্তি সব নিশ্চিন্ততা
নিবিড় নিদ্রার মোহনীড়।
আজি যথাতথা

এরে লয়ে' ফিরি আমি গিরি মরু শ্মশানে মশানে।
দিন অবসানে
যখন ডাকিবে এরে পাতাঘেরা বনানীর কোল
দেবে দোল ঘনঘন দেবে দোল,
করতালি খরতালে কলরোল তুলি' কালবৈশাখীর ঝড়,
যদি আশ্রয়ের শাখা বেদনায় টুটে মড়মড়
ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরে যদি আর্ত্তকণ্ঠ হ'তে
ক্লান্তিতে এলায়ে যায় ডানা—কোনো বিজন পর্ব্বতে
তৃণতরুশষ্পহীন প্রস্তরের ত্রস্ত বক্ষ'পরে
তীরসম পড়ে মূর্চ্ছাতুর,—বিদ্যুতের শাণিত খর্পরে
আঁধারের বক্ষ চিরি শিলাসম কুলিশ-শীতল
ধারার প্লাবন বহে ডুবাইয়া এর বক্ষতল
নিঃশ্বাসের সঘন আহুতি, যদি টুটে গিরিশিলা
সে ধারা-বেগের মুখে, খরগতি চির নৃত্যশীলা
উপল-আহত পথে চলে তার নির্ম্মম ক্রীড়ায়
ডুবায়ে ভাসায়ে পলেপলে,—তবে শিরায় শিরায়

বাজে যে ছন্দের দোলা,—তার সনে মিলাইয়া সুর
তার সারা বক্ষ ভরি' জাগে কোনো অবোধ শিশুর
অকারণ হাসিসম মুখরিত সোহাগের ভাষা
অজানা মায়ের মুখ হেরি'—সেই আশা,
আমার সে আশা।

নহে এ ত নহে,—
এই যে আশার বাণী প্রাণপণে কে আমারে কহে
মোর বক্ষমাঝে বসি—ভয়েরে সে প্রাণপণে চায়
সভয়ে রাখিতে দূরে, সুনিবিড় পল্লব-প্রচ্ছায়
আপনারে ঢাকা দিয়া। ভয়েরে এ ভয়,—
এই চোখ বুজে থাকা, নয় নয় আমার এ নয়,—
এই শুধু ডেকে বলা, হে মরণ তুমি কোথা নাই,
নাই ঝড় নাই রাত্রি,—এ ধরার সকল খানাই
সবুজ আশ্বাসে ভরা, এই শুধু আপনারে লয়ে
সুন্দর রঙীন প্রবঞ্চনা, এই মায়াভরা স্বপ্নের নিলয়ে
সুকোমল শয্যা পরে' নিভৃত নিদ্রায় রাজবালা—
তার তরে নহে নহে এই মোর বরণের মালা
বহু অশ্রু বহু দুঃখ বেদনার স্মৃতি দিয়ে গড়া,
এ মালা পরাব যারে গোপনে সে দেবে মোরে ধরা
আমারই দুঃখের মাঝে তিলে তিলে সঞ্চারিয়া তার
সুকোমল স্নিগ্ধ স্পর্শ,—জুড়াইয়া সকল ব্যথার
ব্যাকুল মর্ম্মের দাহ, কুড়াইয়া আপন আঁচলে
সব ব্যর্থতার রাশি—পলে পলে মৌন লীলাচ্ছলে
অশ্রুর নিষেকে মোর জীবনের মরুর ধূলা,
ফুটায়ে অম্লান-পুষ্প আনন্দের।

ভেঙে যাক্ ভেঙে যাক্, এ কোল কুলায়
নিরুপায় ভীরুতার। আয় তবে আয়,
তামস-গভীর রাত্রি, অজানা দিগ্‌দেশ যাত্রী ঝড়,
আমার বক্ষের 'পরে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ রোষ ভেঙে পড়,

আহত শত্রুর মত। আয় ওরে মুক্ত বক্ষে কেশে,
শুধু নিমেষের মতো বুকে তোরে নিই ভালবেসে,
পরশি পরম পরিচয়ে। ধীরে ধীরে
নিবিড় গভীর সুরে বাজুক আমার শিরে শিরে
শার্দ্দূল-বিক্রীড় ছন্দে আষাঢ়ের মেঘমন্দ্র-গীতি,
দুলুক মৃত্যুর দোলে বক্ষ মোর,—আঁধারের প্রীতি
সুনিবিড় কেশজালে আমারে বাঁধুক দৃঢ় করে',
চেতনা ডুবিয়া যাক তলহীন রসের সাগরে
যতিহীন রতি বেদনার। একটি নিমেষ—
তারপর নিশ্বসিয়া সকলি করিয়া দিই শেষ,
দুহাতে ঠেলিয়া দূরে ফেলে দিই পানশেষে শূন্যপাত্র সম
তোর ও বিধুর ক্লান্ত দেহটিরে দারুণ দুর্দ্দম
ঘৃণাভরে।
তার পরে
ফিরে যাই আপনার চিরস্থির ধ্যান মৌনতার
নিভৃত বক্ষের তলে। কানে কানে তার
বলি মৃত্যু আছে আছে, বলি রাত্রি আছে আছে সেও,
আছে পাপ আছে ক্ষুধা, আছে আছে চির অবজ্ঞেয়
ব্যাধি-সম সহস্র বিকার, পথে পথে,—
তবু সে সবার হতে—
তুমি বহুগুণ বড় চিরদিন, আজি সর্ব্বনাশা
প্লাবনের বক্ষ ভরি' ফুটিয়াছে এ অমর আশা
বিকশিত কমলের সম ;
তোমারে নমামি নমোনমঃ।

চোখের চাতক

—শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত।

পাতা ঝরার সময়। রিক্তপত্র শাখে শাখে তখন মৃত্যু-মর্ম্মর উঠ্‌ছে।

ওই মেয়েটির একটি নাম দোব ক'দিন থেকে ভাব্‌চি। আজো মেয়েটি জানলায় এসে বসেছে। মনে মনে ভাবি—মেয়েটির নাম যেন রাত্রি। দলিত কাজলের মতো কালো আয়ত বিষণ্ণ দুটি চোখ ওই শীতের সন্ধ্যার মতো সজল ম্লান, তার মুখখানি ঘিরে পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের মতো ঘন চুলগুলি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে' আছে। এই মেয়েটির নাম আমি রাত্রি রাখ্‌লাম, এই নামটি নিয়ে শুয়ে শুয়ে খেলা কর্‌তে ভারী ভালো লাগে।

কাল রাতে ও-বাড়ী থেকে একটা কাতর খিন্ন আর্ত্তনাদ অন্ধকার চিরে-চিরে আমার বুকে এসে লাগ্‌ছিল। হয়ত ঐ মেয়েটিই কাল চেঁচিয়ে কেঁদেছে, তার স্বামী হয়ত তাকে মেরেছে কাল!...জানি না, কিন্তু ওকে দেখে আজ এই কথাটাই কেন জানি বারে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন তিমির রাত্রির দুর্য্যোগ-অভিসারে মেয়েটি যেন একটি পাখী।

ওকে দেখে আবার আশা হচ্ছে, পৃথিবীকে ভাল লাগ্‌ছে, নীল আকাশের কোল ভরে' হাওয়ায় যেন মিঠা মাটীর গন্ধ ভাস্‌ছে, মনে হচ্ছে কাকে যেন ভালোবাস্‌তে শিখ্‌লাম।

অসুখ হলে মাথা বাস্তবিকই বিগ্‌ড়ে যায়। মনে হচ্ছে কে যেন পাশে এসে বস্‌ল। তার কালো চুলগুলি মুঠি করে' একবার স্পর্শ কর্‌লাম তার আঁচলের খানিকটা হাওয়ায় বুকের ওপর এসে পড়ল। কত কথা বলতে চাইলাম, পার্‌লাম না, শুধু একটি ক্ষীণ উচ্চারণ কেঁপে কেঁপে ঝরে' গেল, রাত্রি।

ভাব্‌চি, ঐ যে চিলটা দুই ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে, কত দূরে কোন্‌ গাছের চূড়ায় ওর নীড়?—

মেয়েটি তেমনি বসে' আছে আর আমাকে দেখ্‌ছে। আমি ওর সঙ্গে কথা কইতে চাই, কিন্তু কথা আসে না, চুপ করে' শুয়ে শুয়ে আমিও দেখি।

দেখার খেলা করি, চেয়ে চেয়ে কথা কই। আমি মেয়েটির সমস্ত কথা বুঝতে পারছি।

মেয়েটি বলছে—তুমি এমনি করে দিন-রাত শুয়ে থাক কেন? কি তোমার অসুখ?

ঝাপসা আকাশে সন্ধ্যাতারাটি জ্বলছে, মনে হচ্ছে যেন রাত্রির চোখ। আমি চিনতে পেরেছি। চেয়ে থাকতে থাকতে কান্নায় চোখ ভরে' এল। আমার জানলাটাও বন্ধ করে দিতে চাইলাম। শীর্ণ জীর্ণ হাত দুটো বাড়িয়ে নাগাল পেলুম না।

সকাল বেলায় একটি কুষ্ঠব্যাধি-জর্জ্জর রমণী গ্যাসপোষ্টের তলায় বসে' হাত পেতে ভিক্ষা করে। আজ দেখেছি, একটি ভদ্রলোক এ-পথ দিয়ে হেঁটে যেতে ভিখারিণী একটু এগিয়ে এসে কঁকিয়ে তার প্রার্থনা নিবেদন করলে, ভদ্রলোকটি ঘৃণায় ক্রোধে অন্ধ হয়ে তার হাতের লাঠিটা দিয়ে মেয়েটির গায়ে এক ভীষণ ঘা মারলে, রমণী মা-গো বলে' মাটিতে পড়ে কাৎরাতে লাগল। আমি শুয়ে শুয়ে এই দৃশ্যটি দেখেছি। কত দেখলাম এই পথের চলাচল!—ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া শ্রান্ত হয়ে মাটীতে মুখ থুবড়ে পড়ে' গেছে, মুনিব তাকে রেহাই দেয় নি, তাকে ফের চলবার জন্য চাবুকের পর চাবুক চালিয়েছে। বড়লোকের মোটরগাড়ী পথের ঘুমন্ত কুকুরকে মাড়িয়ে দলে' পিষে চলে' গেছে, কুকুরটা কাতর মর্ম্মভেদী সুরে গোঙাতে গোঙাতে চুপ করেছে। কত দেখলাম। আজকে আবার দেখলাম নিঃসহায়া ব্যথিতা নারীর চোখে সুগভীর অতল বেদনার ছায়া! জীবনে কত পাপ কত দারিদ্র্য কত অত্যাচার কত রোগ, তারপর আবার এই দুঃখিনী নারীর চোখে রহস্যনিতল নিবিড় ব্যথার স্বপ্ন!

সে রাতেও ঘুম এলো না।

জানি, বেশী দিন আর বাঁচবো না। জীবন-দেবতা জন্মের থেকেই রোগকে আমার চিরসাথী করে' দিয়েছেন, মুক্ত আনন্দ ছন্দিত প্রাণের পরিচয় পেলুম কৈ? মনে হচ্ছে, জীবনে আজ যেন কিসের সৌরভ উঠছে! এই জীবনে কি যেন পেলুম! মনে হচ্ছে, কে যেন আমাকে ভালবাসে।

মাঝরাতে চেয়ে দেখি, ওদের বাড়ীর জানলা খোলা! হাওয়ায় একসঙ্গে শাড়ীর আঁচল ও চুল উড়ছে! অন্ধকারে কালো চোখের তারা যেন মিশে আছে। অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে কথা কইলাম।

ডাকিয়ে বল্লাম—এত রাতে যে?

মেয়েটি তেমনি জবাব দিলে—ঘুম আসচে না।

অতি কষ্টে ধীরে ধীরে মাটীর প্রদীপটি জ্বালালুম। বল্লুম—তোমাকে বরণ করতে এ দীপ উজ্জ্বল করলুম, রাত্রি।

মেয়েটি ধীরে ধীরে জানলা দুটো বন্ধ করে' চলে' গেল। স্বামীর পাশে গিয়ে ধীরে ধীরে শুল হয়ত!

হাওয়াতে বাতিটা নিবে গেল। অন্ধকারে কে যেন এল। চিনলাম। সে বল্লে—আলোটা নিবিয়ে দিলাম। এসো, ঘুমুও, আর রাত জেগো না।

বল্লাম—না না, আলোটা জ্বালাই, তোমাকে ভালো করে' একটু দেখি, তোমার সঙ্গে কথা কই।

সে বল্লে—তা হলে তোমার শরীর আরো খারাপ হয়ে যাবে। এই আমি আমার হাত মেলে রেখেছি, এর ওপরে মাথা রেখে শোও লক্ষ্মীটি, আমি তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দোব।

শীতের হাওয়া শাখায় শাখায় হী-হী করছে।

*　　　*　　　*

কতদিন তাকে দেখি না। মনে হয় বিরহের ছন্দে যেন ক্লান্ত দিনের রাগিনী বাজছে। জানলা দুটো আর খোলে না। আমার খোলা জানলা হাতছানি দিয়ে ঐ জানলাকে ডাকে,—জবাব মেলে না। বসন্ত পৌঁছুবার আগেই হয়ত চললাম।

একদিন ওদের জানলা খুলে গেল। একজন ভদ্রলোক, তাঁর পকেটে বিশেষ কোনো যন্ত্রের মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার ভঙ্গী দেখে বুঝলুম, ইনি ডাক্তার। বলে বোঝালেন যে, রোগীর ঘরে জানলাগুলো খোলা থাকলে রোদ আর বাতাস যথেষ্ট আসতে পারে, ওদের বন্ধ করে রাখলে রোগীর অপকার হ'তে পারে।

তাকে আবার দেখলাম। চেহারাটি শীতের পাতার মতন রঙহারা শুকনো, বড় বড় দুটি চোখে দুই অগাধ কান্নার সমুদ্র। চেয়ে বল্লে—কেমন আছ? তোমায় অনেক দিন দেখি নি।

বল্লাম, তোমাকে এত রোগা ম্লান দেখাচ্ছে কেন?

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, খাটের উপর সেই স্থূলতনু লোকটি বেজায় শীর্ণ হয়ে বিছানায় লুটিয়ে রোগ-যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। মেয়েটি তার পাশে গিয়ে বসল, গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ভালো লাগছে হাত বুলিয়ে দিতে?

হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে। বুকের উপর তোমার হাতখানি খুব জোরে চেপে ধর। কি নরম ঠাণ্ডা তোমার হাত।

রেখেছি।

আমি হয়ত বেশীদিন আর বাঁচবো না।

ছিঃ, এ কথা বল্‌তে তোমার একটুও কষ্ট হয় না?

না না, আমি ভালো হব বৈ কি। কেমন সুন্দর এই আকাশ, এই শীতের মধ্যাহ্ন!

তুমি চুপ করে' থাক লক্ষ্মীটি।

বালিশটা থেকে মাথাটা আমার তোমার কোলের উপর তুলে নাও। আচ্ছা, তুমি নাইতে খেতে যাবে না? আমি কি স্বার্থপর? আমার জন্যে তোমাকে খালি খাটিয়ে নিচ্ছি।

তুমি একটু ঘুমোও, আমি স্নান করে খেয়ে আবার তোমার পাশে এসে বস্‌ব।

মেয়েটি স্বামীর শয্যাপার্শ্ব থেকে ধীরে ধীরে চলে গেল। তার যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলাম।

* * *

উঃ, কি মর্ম্মভেদী আকুল কান্না উঠছে মেয়েটির বুক থেকে। সেই বিকৃতাকৃতি স্বামীর বুকটা দুই শুভ্র সুগঠিত বাহু দিয়ে বেষ্টন করে রাত্রি চীৎকার করে কাঁদ্‌ছে।

এ কি, এই ত আমি, তুমি কাঁদ্‌চ কেন? এই ত তোমাকে ধরে আছি—তোমার হাত তোমার চুল, তোমার পিঠ। আমি ত যাইনি কোথাও।

তুমি কোথায় গেলে, তোমার ছেড়ে আমি কেমন করে থাকব···

বাঃ, তুমি কি পাগল হলে? এই যে আমি সব দেখ্‌ছি, ঐ আল্‌নায় তোমার শাড়ী, আমার ওভারকোট, ঐ ঝাড়াধূলোর গলি, ঐ স্তিমিত আকাশ! ওঠ ওঠ, আমি ত যাই নি, শুধু শুধু কেন কাঁদ্‌ছ?—

না না, চলে গেছি, আমি চলে গেছি, দূরে বহুদূরে গ্রহতারা আকাশ পৃথিবী সমস্ত কিছু পেরিয়ে আমি চলে গেছি।

অনেক কষ্টে এবার আমার ঘরের জান্‌লা ছটো বন্ধ করে দিলুম।

আমি বলি—কি অসুখ, তা ত জানি না। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা কর্‌লে, বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

মেয়েটি বলে—তোমার এত অসুখ, কৈ, কাউকেও ত তোমাকে সেবা করতে দেখি না ?

আমি বলি—আমার কে আছে যে সেবা করবে ?

মেয়েটি কান্নাছলছল চোখে তাকায়, বলে—কেউ নেই ?—

আমিও তেম্‌নি তাকিয়ে বলি—না, কেউ নেই।

মেয়েটির দুটি চোখে একটি আকাঙ্ক্ষা শিশিরের মতো টলমল্‌ করে' উঠে' বলে—তুমি ভারী দুঃখী, না ? আমার ভারী সেবা করতে ইচ্ছে হয় তোমাকে—যাব ?

আর তাকাতে পারি না। চোখ বুজে আসে। সত্যি মনে হয়, সে যেন এসেছে। তার চুলের ঘ্রাণ পাই। কপালে সে আল্‌গোছে হাত বুলিয়ে দেয়। তার চুড়ীর গানটি শুনি। ছড়ানো চুলগুলির উপর তার আলোটি এলিয়ে থাকে। এই সে পা দুটি গুটিয়ে নিয়ে কাঁধের কাছে আরো একটু ঘেঁষে বস্‌ল, কপালে থেকে এই আমার চুলগুলি সরিয়ে দিলে! এই মুখটি মুখের কাছে এনে শুধোচ্ছে, কেমন আছ ?

আবার তাকালাম। দেখি মেয়েটি তেম্‌নি বসে' আছে। বল্‌লাম, তুমি অমন চুপ ক'রে বসে আছ কেন ? তোমার ঘরের কাজ শেষ হয়ে গেছে?

মেয়েটি বল্‌লে—ভালো লাগে না।

কি দেখ্‌ছ বসে ?

তোমাকে দেখ্‌ছি।

কিন্তু আমার মাঝে ত দেখ্‌বার মতো কিছু নেই!

আছে, তুমি জান না। তুমি রাগ কর্‌ছ ? তা হলে আমি উঠি ?'

কাকুতি পুরে চেয়ে বলি—না না উঠো না ; কিন্তু আমি যে তোমাকে দেখ্‌ছি।

হঠাৎ পিছনে কার তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনে মেয়েটি চমকে উঠে দাঁড়াল। একটি লোক জান্‌লার সাম্‌নে এসে মেয়েটির হাতখানা ধরে টেনে তাকে সামনে ধাক্কা মেরে কর্কশ অসভ্য ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন যে, পথের সামনে বাড়ীর বৌ'র জান্‌লার সাম্‌নে এমন ভাবে বসে থাকা নিতান্ত গর্হিত দুষ্কর্ম, বিশেষত আঙুল দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন, যখন সামনেই একটা ছেলে চোখে ওৎ পেতে চেয়ে রয়েছে। জান্‌লা দুটো সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল!

পোড়োবাড়ী

—শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

প্রকাণ্ড এক জীর্ণ পুরাতন অট্টালিকা, আর তারই গা থেকে ঝোলানো এক সরকারী আলো, চিরন্তন প্রহরীর মত খাড়া আছে—রাত্রির মসী গাঢ় অন্ধকারে ঐ সরুগলির পথিকদলকে পথ দেখাবার জন্য।

নিত্য সন্ধ্যার পর মিউনিসিপ্যালিটির একটা মাহিনা-করা কুলি এসে সেই আলোটা জ্বেলে দিয়ে যায়—আবার শেষরাত্রে ঐ আকাশের গায় ফুটে-ওঠা রাত্রের অসংখ্য তারকার ক্ষুদ্র একটিরই মত সে আপনা হ'তেই নিভে যায়। আজ কত দীর্ঘকাল থেকে যে সে ঐ দীর্ঘ ভগ্ন প্রাচীরের গায় তেমনি একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে—এ মুলুকের কেউ তা' জানে না—জানবার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাও হয়ত কারও নেই। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র আলোটাই যে আজ এ পাড়ার এবং বিশেষ ক'রে ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটার অনেক কিছু ঘটনারই বেশ নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে পারে, সে বিষয় কোনও সন্দেহই নেই।

দুপুর রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ।

সন্ধ্যার পর থেকে ঝড় জলের বিরাম নেই। এই অবিশ্রান্ত ধারাপাতে বাড়ীটার চারিদিক ভরে অজস্র জলরাশি টলমল করছে। সমস্ত পল্লী, সমস্ত শূন্য অট্টালিকা নিস্তব্ধ ঝাঁ ঝাঁ করছে—আর মাঝে মাঝে কেবল সেই নিবিড় স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিশ্রী করুণস্বরে ডেকে উঠ্ছে—হৃষ্টহৃদয় ভেকের দল, রাত্রির প্রহরী শৃগাল, আর কয়েকটা রাতচরা পাখী।

জলটা একটু ধ'রে এসেছে কিন্তু ঝড়ের বেগ ঠিক তেমনিই আছে।

একটা রাতচরা পাখী একবার বিশ্রী বিকট চীৎকার ক'রে ঐ আলোটার পাশের একটা জানলায় এসে বস্‌ল। কয়েকবার সে ফিরে ফিরে ঐ শূন্য ঘরটার পানে চাইল, তারপর তার দৃষ্টিটাকে ঐ জলন্ত আলোটার পানে ফিরিয়ে সে জিজ্ঞাসা ক'রলো—হাঁ ভাই আলো, এ বাড়ীতে কি কেউ থাকে না?

গোঁ গোঁ শব্দ ক'রে একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টা ছুটে চলে গেল। ভাঙ্গা জান্‌লাগুলো তা'র তীব্র আঘাতে ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠ্‌লো। ক্ষীণ আলোটা একবার কেঁপে কেঁপে থেমে গেল।

পাখী আবার জিজ্ঞাসা করলো,—বল না ভাই।

আলো উত্তর দিল,—না।

পাখী আবার বল্লো, কেন থাকে না? এত বড় বাড়ী, এমন চমৎকার ছিল! আহা, আগে ছিল নিশ্চয়?

আলো উত্তর দিল,—হাঁ, একদিন থাক্‌তো বটে; তবে আজ আর কেউ থাকে না। আজ শুধু থাকে কয়েকটা চামচিকে, তোমারই মত কয়েকটা রাতচরা পাখী, সাপ শেয়াল এই সব। মানুষের নাম গন্ধও আজ পাঁচ বছর থেকে এ বাড়ীতে নেই।

কেন, কেউ আসে না কেন?

সবাই বলে এটা ভূতের বাড়ী।

ভূতের বাড়ী? কেমন করে জান্‌লো?

রোজ রাত্তিরে এ বাড়ীতে যেন কে একজন কাঁদে।

রোজ রাত্তিরে? কৈ, আজ ত কাঁদ্‌চে না?

কাঁদ্‌ছিল এতক্ষণ; এখন চুপ ক'রেছে।

এ বাড়ীর গল্প আমায় কিছু বল্‌বে ভাই?

সে যে অনেক; অত ত একদিনের মধ্যে আমি ব'লে শেষ করতে পারব না ভাই?

কেন?

এখুনি যে আমার আয়ু ফুরিয়ে যাবে; ভোর যে এসে পড়ল ভাই।

আচ্ছা, সংক্ষেপে যেটুকু পার বল, না হয় আবার কাল শুন্‌বো।

দূর থেকে একটা পেঁচা বিকট চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো।

অদূরের জলভরা বন ভেদ ক'রে একটা শেয়ালের চ'লে যাওয়ার শব্দ হল—ছপ্, ছপ্, ছপ্! . . .

আবার তেম্‌নি ঝড়ের দাপটে আলোটা কেঁপে কেঁপে যখন স্থির হ'ল তখন সে তার গল্প আরম্ভ করলো——

—এই যে দেখ্‌ছো এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা, এক দিন এতে লোক আর ধরত না। এই বাড়ী যিনি তৈরী করেছিলেন, জুয়ো খেলে তাঁর পয়সা হয়েছিল অগাধ। কিন্তু ওসব পয়সা কি আর থাকে ভাই? তাই আজ এর এই শোচনীয় পরিণাম।

তাঁর কিন্তু ছেলেপুলে কিছুই ছিল না, তাই তিনি এক পোষ্য নিলেন, আর সেই পোষ্যই তাঁর সমস্ত অর্থ উড়িয়ে দিল।

অবশ্য অনেক ধুমধাম ক'রে পূজাপার্ব্বণ যথেষ্টই একদিন এ বাড়ীতে হয়েছে ও কাঙালীর দলও সাথে সাথে একদিন এই শীর্ণ গলির দুটি ধারে পাত পেতেছিল।

সেই পোষ্যের ছিল এক ছেলে, বড় সুন্দর, বড় সবল! আর সব চেয়ে বড় অমায়িক ছিল তার স্বভাব। কিন্তু সে যখন এই পৃথিবীর আলো হাওয়ার মধ্যে এসে পৌঁছুল, তা'র পিতার অবস্থা তখন অত্যন্ত হীন হয়ে এসেছে। কোনও রকমে দুবেলা দুটি কেবল পেট ভরে খেতে পায়।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার পিতা মাতা দুইই যখন তার কাছ থেকে চির বিদায় নিলেন—তখন তার বয়স ছিল প'নের কি ষোল।

কোনও রকমে গ্রামের স্কুল থেকে লেখাপড়া শিখে সে এখানকারই পাটের আড়তে খাতালেখার এক কেরাণীর চাকরী নিল।

হঠাৎ একদিন দেখ্‌লাম তাদের বাড়ীটা অনেক লোকে ভ'রে উঠেছে, বাড়ী ভ'রে কোলাহলের একটা তীব্র প্রতিধ্বনি উঠ্‌ছে এবং আর এক রাত্রে দেখ্‌লাম সেই ছেলেটি একটি ছোট্ট মেয়েকে বিয়ে ক'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলো। সেদিনও ছিল এম্‌নি এক দুর্য্যোগের রাত্রি। ফুটফুটে সুন্দর সে মেয়েটি যেন আধফোটা পদ্মের কলি। আমার তাকে ভারি ভাল লাগ্‌তো; তাই রাত্রে সে যখন তা'র স্বামীর পাশটিতে শুয়ে থাক্‌তো, ঐ জান্‌লার ফাঁক দিয়ে আমি তা'র মুখের ওপর আমার খানিকটা আলো ছড়িয়ে দিতাম। সেই আলো মাখা মুখ দেখে স্বামী তা'র আরও অধিক হৃষ্টমনে তাকে বুকে টেনে নিত।

ছেলেটি ঐ মেয়েটিকে ভালবাস্‌তো বড় নিবিড় ভাবে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ছেলেটি যখন তা'কে সাগ্রহে বুকের পাশে টেনে নিত, মুখে তার অজস্র চুমোর রাশি ঢেলে দিত, মেয়েটি তখন লজ্জায় রাঙা হ'য়ে দুহাতে তাকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করতো; আবার একটু পরেই কিন্তু অমনি অত্যাচারের জন্য সে উন্মুখ আকাঙ্ক্ষায় হাঁপিয়ে উঠ্‌তো এবং ধীরে ধীরে আপনিই সে ঐ ছেলেটির পানে এগিয়ে যেতো।

নিজের গালের ওপর মেয়েটির নরম গালখানি চেপে ধরে ছেলেটি বল্‌ত,—আঃ, তোমার গালটি কি নরম!

মেয়েটি লজ্জায় হাসি হেসে ব'লতো, আর তোমার?

ছেলেটি তার গালকে আরও একটু জোরে চেপে ধরে উত্তর দিত,—হুঁ, শুধু হাড়!

প্রেমিক ছেলেটির ঐ আদরের অত্যাচারে মেয়েটি যদি কোনোদিন রাগ করে সরে যেতো, ছেলেটি অম্‌নি অভিমানে মুখ ফিরিয়ে শুতো। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়েটি যখন কথার অভাবে হাঁপিয়ে উঠে ছেলেটিকে ডাক্‌তো, সে আরও নিবিড় অভিমানে তারই তরুণ বুকখানি ভরে তুলে আরও একটু দূরে সরে যেতো। মেয়েটি ছল ছল চোখে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে ফেরাতো—আবার তার সেই মধুর আদরের অত্যাচার সইবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে। সেই অত্যাচারের মধ্যেই যে ছিল তা'র জীবনের সব চেয়ে বড় আনন্দ!

এক একদিন মেয়েটি তার বক্র হাসি হেসে বল্‌ত,—আচ্ছা, আমি যদি মরে যাই তুমি কি কর?

ছেলেটি বল্‌ত'—পাগল হয়ে যাই।

মেয়েটি কপট অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বল্‌ত'—ছাই!

ছেলেটি বল্‌ত,—বেশ, দেখো।

আচ্ছা, আমি ম'লে তুমি কি কর?

মেয়েটি অম্‌নি তাড়াতাড়ি ছেলেটির মুখে হাত চাপা দিয়ে বড় বড় চোখ দুটিকে টেনে আরও বড় ক'রে বল্‌তো,—খবরদার, আর নয়।

ছেলেটি অম্‌নি হেসে বল্‌তো, বাঃ রে! নিজের বেলায় বুঝি দোষ নেই।

ছল ছল চোখে মেয়েটি উত্তর দিত, এবারটি ক্ষমা কর লক্ষীটি!

ছেলেটি দু'হাতে ঐ মেয়েটির আরক্ত মুখখানি নিজের মুখের কাছে তুলে ধরে তার দুই উন্মুক্ত চোখের দিকে চেয়ে থাক্‌তো। কি যে অপূর্ব্ব মোহ পুঞ্জীভূত ছিল তার স্বচ্ছ টানাটানা দুটি চোখ ভ'রে তা' সে কিছুতেই ভেবে উঠ্‌তে পারতো না।

এম্‌নি নানা প্রেমালাপের মধ্য দিয়ে তাদের রাত্রির প্রথম প্রহরটা কেটে যেতো; তার পর তারা দু'জনে পাশাপাশি বিছানার উপর ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ত।

আলোটা আবার কেঁপে উঠ্‌লো।

পাখী ব'ল্‌লো, তার পর?

আলো বল্‌লো,—এম্‌নি ক'রে বেশ সুখ শান্তির মধ্য দিয়েই তাদের প্রথম যৌবনের ছোট ছোট রঙীন দিনগুলি কেটে যায়—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। মেয়েটি বেশ বড় হ'য়ে উঠ্‌লো। মাঝে তার একটি সন্তানও হয়েছিল—কিন্তু সেটি মুকুলেই ঝ'রে গেল! . . .

ক্রমে একটা বড় অদ্ভুত পরিবর্ত্তন যেন তাদের উভয়ের মধ্যে ঘনিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! তাদের সেই প্রেমালাপের অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি ত আর দেখি নে; ছেলেটির প্রাণভরা সোহাগের উচ্ছসিত ধারায় ত' আর মেয়েটি রাতে দিনে তেম্‌নি সিক্ত ও আরক্ত হ'য়ে ওঠে না। ছেলেটিরও মুখ দেখে বোঝা যায় মনে যেন তার আর তেমন সুখ নেই, শান্তি নেই, আনন্দ নেই। যেন এই একঘেয়ে জীবনটা আজ তার কাছে অত্যন্ত তিক্ত ও বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। অভাবের দারুণ অত্যাচারে আর শুষ্ক সংসারের নিষ্করুণ পীড়নে আজ তা'র ক্ষুদ্র মনটা অত্যন্ত তরুণ হলেও বুঝি বা সেটা অতি অকালেই শুখিয়ে উঠেছে।

অবসরের মুহূর্ত্তে মেয়েটি এখন প্রায়ই শুক্‌নো মুখে গালে হাত দিয়ে ঐ জান্‌লায় বসে থাকে—মনে মনে যেন কত কি ভাবে, সে ভাবনার যেন কূল নেই, কিনারা নেই। মাঝে মাঝে অম্‌নি ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার চোখ দু'টা জলে ভ'রে ওঠে; রাঙা গাল বেয়ে তার ধারার পর ধারার গড়িয়ে পড়ে, তার পর তারা আপনিই আবার সেইখানে শুখিয়ে দাগ কেটে ব'সে থাকে—নির্ম্মল চাঁদের গায়ে ক্ষীণ কলঙ্কের রেখার মত! অনেকক্ষণ সে এম্‌নি ভাবে ব'সে থাকে, তার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যত্র চ'লে যায়।

রাত্রে প্রায়ই সে স্বামীর পাশে শুতে এসে দেখে স্বামী তার বহুপূর্ব্বেই ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বামীর নিদ্রা কপট কি সত্য তা' পরীক্ষা করিবার জন্য সে দুএকটা হয়ত খুট্‌-খাট্‌ শব্দ করে, তারপর হয়ত একবার তার বুকে হাত দেয়। কিন্তু তাতেও যখন তার নিদ্রা ভাঙ্গে না তখন সে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ে—ক্ষুধিত অন্তরের তীব্র জ্বালাকে বুকে চেপে রেখে। তারপর অনেকক্ষণ বিনিদ্র নয়নে এপাশ ওপাশ ক'রে অনেক ভেবে ভেবে সে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু এর কারণটা সে কিছুতেই নির্ণয় ক'রে উঠ্‌তে পারে না।

হঠাৎ একরাত্রে দেখ্‌লাম তাদের বাড়ীর নীচেয় একটি সুন্দর যুবক ভাড়াটে

এসেছে। তারও সংসার বেশী বড় নয়, স্ত্রী, নিজে, আর তারই একটি ছোট্ট কচি ছেলে। স্ত্রীটি অবশ্য উপরের ঐ মেয়েটির মত অত সুন্দরী নয়, কিন্তু ছেলেটি বড় সুন্দর—যেন রাজপুত্তুর!

তারপর থেকে নীচের বৌটির সঙ্গে মেয়েটির খুব আলাপ হয়ে গেল। বৌটি প্রায়ই এসে মেয়েটির সঙ্গে গল্প কর্‌তো, তাদের পরস্পরের স্বামীর গল্প, তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেমের কাহিনী, ঘর সংসারের কথা—এই সব। আর উপরের মেয়েটি ঐ খোকাকে নিয়ে কত সব আদর কর্‌তো, খেলা করতো।

মেয়েটি দেখ্‌তো, বৌটির কত গয়না; কত ভাল ভাল কাপড়; কত আসবাব পত্র; বিলাসের কত বিভিন্ন সামগ্রী। মাঝে মাঝে মেয়েটিও নীচে গিয়ে দেখ্‌তো, খোকা কত রকম ভাল ভাল খেলনা পুতুল নিয়ে খেলা করে—চারিদিকে কেমন তার দামি দামি পোষাক। নীচের বৌটি তার খোকাকে সেই সব পোষাকে সাজাতে কতই না ব্যস্ত; তা'তে তা'র কতই না আনন্দ।—মেয়েটির ক্ষুদ্র বুকটা নাড়া দিয়ে এক একটা দীর্ঘশ্বাস উঠ্‌তো।

খোকা দুষ্টুমি করলে বৌটি মাঝে মাঝে তাকে বকৃতো। আপন মনেই হয়ত বল্‌তো,—নাঃ, আর পারি না বাবু তোকে নিয়ে! আবার পরক্ষণেই খোকা যখন ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানে কেঁদে উঠ্‌তো তখন কী ব্যাকুল অন্তরেই না সে তাকে অতি স্নেহে, অতি যত্নে তার বুকের উপর চেপে ধ'রে চুপ করাতে যেতো।

মেয়েটি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তো—এই দুই মাতা পুত্রের অসীম স্নেহ মমতার অপূর্ব্ব স্বর্গীয় খেলা—আর তার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌তো কি এক করুণ হাহাকার!

একদিন সন্ধ্যাবেলা ছেলেটি যখন আফিস থেকে ফির্‌ল, তার স্ত্রী তখন একটি ছোট্ট ছেলেকে আদর কর্‌ছে; ছেলেটি জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—নীচের বুঝি?

একটু সলজ্জ হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল,—হাঁ!

খোকা তখন বৌটির বুকের কাপড় টেনে তাকে ব্যতিব্যস্ত কর্‌ছিল।

বৌটি মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বল্‌লে, আঃ ছি, অমন করেনা দুষ্টু ছেলে কোথাকার!—

ছেলেটি একবার তারদিকে বক্র কটাক্ষ হেনে চ'লে গেল। বৌটির দুই

চক্ষু মুহূর্ত্তে যেন একটু সরস হ'য়ে উঠ্‌লো। সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হয়ত মেয়েটি ভেবেছিল স্বামী তার এই খোকাকে উপলক্ষ ক'রে ঠাট্টার ছলে আরও কিছু বল্‌বে,—হয়ত সে আগের মত আবার তাকে তেম্‌নি ক'রে জুটো সোহাগের তামাসা করবে। কিন্তু হায়রে—সব আশাই তার মিথ্যা!

তারপর আরও কিছুদিন এম্‌নি ক'রে কেটে গেল।

হঠাৎ একরাত্রে শুন্‌লাম কেরাণী ছেলেটি বল্‌ছে,—বেশ ত, ওর পয়সা আছে, ও যা' খুসী তাই কর্‌তে পারে। আমার পয়সা নেই, পার্‌বো না ব্যস্‌! পূজোর কাপড় চাই! পয়সা কোথায় যে দেবো? খেতে পয়সা জোটে না আবার সখ!—আমি বুঝেছি আজকাল আমায় তোমার ভাল লাগে না, নয়? বেশ, না লাগে যা' খুসী তাই কর না কেন?—আমারই ভুল হয়েছে তোমায় বিয়ে করা।

মেয়েটির মুখ দেখে বুঝ্‌লাম, তীব্র এক অব্যক্ত বেদনায় তার বুকের ভিতরটা ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যাচ্ছিল। দু'চোখের উদ্‌গত অশ্রু প্রবাহকে অতিকষ্টে চেপে সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে-যাচ্ছিল এমন সময় ছেলেটি ডাক্‌লো—শোনো!

মেয়েটি থম্‌কে দাঁড়াল।

আমি ভাড়াটেদের চ'লে যাবার জন্যে নোটিস্‌ দিইছি।

অশ্রুসিক্ত চোক্‌ দুটি স্বামীর পানে ফিরিয়ে সে বল্‌লে,—কেন?

কারণ সেদিন আমি কমলকে ওপর থেকে নেমে যেতে দেখেছি।

হঠাৎ মেয়েটির আপাদ মস্তক একবার মুহূর্ত্তের জন্য কেঁপে-কেঁপে উঠ্‌লো। তারপর সে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আবার খুব জোরে আলোটা কেঁপে উঠ্‌লো।

তারপর?

আমার যে যাবার সময় হ'য়ে এলো ভাই!

পাখী উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌লে, বল না, না, ঐ টুকু শেষ ক'রে যাও।

আলো আবার বল্‌লে, তারপর দিন আর রাত্তিরে সেই মেয়েটিকে আমি দেখ্‌তে পাই নি। ছেলেটিও নাকি আর তাকে।—

আলো থর্‌ থর্‌ ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো!

ও কি আলো-ভাই, অত কাঁপ্‌ছো যে?

দপ্ ক'রে আলোটা নিভে গেল; সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক নিবিড় কালো আঁধারে ভ'রে উঠ্‌লো! . . .

পরদিন রাত্রে ঠিক তেমনি সময় সেই রাতচরা পাখীটা যখন তার পূর্ব্ব-রাত্রের শোনা গল্পের শেষ অংশটা শোন্‌বার অভিপ্রায়ে সেই আলোটার কাছে ফিরে এলো, তখন সে দেখ্‌লো প্রকাণ্ড অট্টালিকা আজ ভূতলে লুটোচ্ছে! সেই ভগ্নপ্রাসাদের ভগ্ন স্তূপের নীচে সরকারী আলোটা চাপা প'ড়ে গেছে; . . . বাইরে তা'র আর কোনও চিহ্নই নেই!

গভীর হতাশায় পাখীটা একবার করুণ চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো! সে চীৎকারের তীব্র শব্দে রাত্রির নিবিড় মৌনতা যেন মুহূর্ত্তের জন্য কেঁপে কেঁপে উঠ্‌লো!

ভগ্নপ্রাসাদের একটা অর্দ্ধভগ্ন প্রাচীরের গায় অবস্থিত একটা অশ্বত্থ গাছের উপর এসে পাখীটা বসল। অনেকক্ষণ সে চুপ করে সেইখানে ব'সে ব'সে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লো। হঠাৎ তার চোখে পড়্‌ল একটা অতি জীর্ণ মানুষের কঙ্কাল—তারই পায়ের নীচের একটা কাঠ থেকে সেটা ঝুলে পড়েছে! মাঝে মাঝে বায়ুভরে সেটা দুলে দুলে উঠ্‌ছে! . . .

আর একবার তার বিশ্রী বিকট চীৎকারে সমস্ত নিস্তব্ধ পল্লী-বুকটা কাঁপিয়ে দিয়ে রাতচরা পাখী উড়ে গেল।

প্রাণের দুঃখ না যাক্ কিন্তু যাবে দুঃখের প্রাণ।

'ঘুমের ঘোরে'

কালো মেয়ে

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

"কালো কুশ্রী মেয়েটি। মা তার চাকরাণী। বাবুদের বাড়ীর একটি ঘরে তারা মায়ে-ঝিয়ে থাকে, কাজ করে, খেতে পায়। কিন্তু সে যে কিশোরী—তার বুকেও যে অনাদি নারীর অসীম উন্মুখ রহস্য! হোক্ না সে কালো, হোক্ না সে গরীব ছোটজাত চাকরাণীর মেয়ে, থাক্ না তার গায়ে ময়লা, ছেঁড়া কাপড়খানি, হাতে তার সস্তা কাঁচের চুড়ি মাত্র, তার কালো চোখে আছে যে অনন্ত রাত্রির অপরূপ স্বপ্ন, তার মুঞ্জরিত কৈশোরের গতি ভঙ্গিতে নিখিল সৃষ্টির আনন্দ ছন্দ—"

নিরঞ্জন তার নতুন গল্পটা পড়্ছিল বৈঠকখানা ঘরটায় বসে। আমরা তক্তপোষের ওপর কেউ কাৎ, কেউ চিৎ ও কেউ উবুড় হয়ে শুন্ছিলুম।

"জীবনের ফাগুন তার এল একদিন চুপে চুপে তার অগোছাল হৃদয়-বাসরে, তার কালো বুকে কৌতুকময়ী অভিসারিকার মত। তারপর চারদিকে ফুলের আগুন লাগিয়ে দিলে—হেসে, না বলে কয়ে, অকস্মাৎ। সে বাসন মাজ্তে মাজ্তে কি অস্ফুট এক আনন্দে চম্‌কে ওঠে! সংসারের নীরস একঘেয়েমির মাঝে কোথা থেকে এল এ দুরন্ত দখিন হাওয়া, তার হৃদয়বনে অর্থহীন মর্ম্মর তুলে! দিকে দিকে কি অজানা সুগন্ধের চমক দিয়ে, সে নিজেকেই বুঝ্তে পারে না . . . হোক্ না সে কালো, হোক্ না সে চাকরাণীর মেয়ে, তবু সেই অর্দ্ধস্ফুটযৌবনা কিশোরী এক মেঘলা-করা দুপহরে অনাদিকালের সেই মধুর ভুল আবার নতুন ক'রে ক'রে বস্‌ল! সে ভালবাস্‌লে—ভালবাসলে তার মনিবের বড় ছেলেকে। পৃথিবী ধন্য হ'ল।—

—কিন্তু হায়! সে যে চাকরাণীর মেয়ে, সে যে কালো; তার জীবনের ফাগুন তার ভেতরটাই রঙে রঙে রাঙিয়ে দিলে;—বাইরে তার কালো দেহে ময়লা ছেঁড়া কাপড়খানি তেমনি সমস্ত কথাকে আড়াল করে রইল।

—তেমনি সে বাসন মাজে, তেমনি সে হেঁসেল ধোয়, তেমনি সে সংসারের নিত্য কাজ করে, আর তার অন্তরে একটি বিরহিনী, তৃষিতা, বঞ্চিতা নারী

নিশিদিন করুণ চোখ মেলে চেয়ে থাকে। তরুণ ছেলেটির পায়ের শব্দে তার বক্ষে কিসের দোলা লাগে, তার সাধারণ কাজের অছিলার ডাকে তার বুক কাঁপিয়ে কিসের ঝঙ্কার ওঠে . . . কিন্তু কেউ তা জানে না।—

—তরুণ ছেলেটি তার যৌবনের ভালবাসা দিয়ে একটি সুন্দরী মেয়ের অর্চ্চনা করে। সে মেয়েটি সুন্দর মুখে একটি সন্ধ্যা-তারার মত টীপ পরে রেশমের বাসন্তী সাড়ী দুলিয়ে রোজ কলেজে যায়—সে মার্জ্জিতা, সে শিক্ষিতা, সে সুন্দরী। তার জন্যে ছেলেটি পাগল। সে ছেলেটির জীবনের তপস্যা, তার আনন্দ। তরুণ ছেলেটি স্বপ্নেও জানে না কোথায় একটি কালো মেয়ে সমস্ত অন্তরের প্রেম দিয়ে তার আরাধনা করছে, কোথায় এক কুরূপা সতী তপস্যা করছে নিভৃত অন্তরের মন্দিরে তার মহেশ্বরের জন্যে।

—একদিন কিন্তু ছেলেটি রুক্ষ চুল, শুষ্ক মুখ, উদাস দৃষ্টি নিয়ে এসে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ল। তার সমস্ত স্বপ্ন চুর্‌মার করে দিয়ে তার নিষ্ঠুর প্রিয়া তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যে দৃষ্টিতে একদিন ছিল কোমল অভিনন্দন আজ তাতে আছে শুধু কঠিন উপেক্ষা।

—সমস্ত রাত নিঃশব্দে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে সে ভাবলে—এই সংসার, এই পৃথিবীর নিষ্ঠুর সত্য। এখানে প্রেমের মর্য্যাদা নেই, মূল্য নেই। তারপর ভাবলে—আজ যদি একটা হৃদয়ও থাক্‌তো আমার আশ্রয় নেবার মত, আজ যদি একজনও আমায় ভালবাসত! কারুর বুকেও যদি বুক রেখে বুঝ্‌তে পারতুম, তার হৃদয়ে আমার সঙ্গে একতালে স্পন্দন উঠ্‌ছে!—

—কালো মেয়ে তখন তার ভাঙা ঘরের মেজেয়, ছিন্ন বিছানায় শুয়ে, জানালা দিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছিল, কোন্ জন্ম-জন্মান্তরে ঐ নক্ষত্রপুঞ্জের কোন্ নামহীন তারকায় সে তাকে পাবে—নিশ্চয় পাবে! যুগ-যুগান্তর যদি অপেক্ষা করতে হয় তাতেও দুঃখ নেই। একদিন সে ওই বুকের ওপর মাথা রেখে বল্‌তে পারবে, তুমি আমার তুমি শুধু আমার . . . সেদিন থাক্‌বে না সে এমন কালো, সেদিন সে এমন ঝি'র মেয়েও থাক্‌বে না।"

* * * *

"বাঃ! বেশ হয়েছে ছবিটা ত!"

ননী বল্‌লে,—"এক গ্লাস জল খাওয়াও ত ভাই।"

নিরঞ্জন হেঁকে বল্‌লে,—"ওরে দুখে! কে আছিস্, একগ্লাস জল আর এক ডিবে পান এনে দে ত।"

একটি কালো ময়লা কাপড়-পরা বছর পোনেরোর মেয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বললে, "জুথে নেই। কি আনতে হবে?"

"জুথেকে ডেকে একগ্লাস জল আর এক ডিবে পান দিতে বল।"

আমরা সকলেই দরজার পাশে তাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলুম। অচিন্ হেসে বললে, "ওহে নিরু, এই তোমার মডেল নাকি?"

নিরঞ্জন হেসে বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

"তবে আর শেষটা ট্র্যাজিডি কেন থাকে ভাই, কমিডিই করে ফেল না। অসবর্ণ বিয়ের ধূমধাড়াক্কা ক'রে আমরাও একটু স্ফূর্ত্তি করি। একটা নতুন কিছু হোক্।"

নিরঞ্জন হোঃ হোঃ করে হেসে বল্‌লে, "ওরে বাবা! ঐ বাবা মেয়েকে! ওর গুণের যে সীমা নেই; কত বল্‌ব।—যাদের বাড়ীতে ওর শুভাগমন হয় তাদের সামাল সামাল; কাপড়-চোপড় গয়না-গাটি রোদে দেওয়া আঁবের আচার পর্য্যন্ত কিছুতে ওর অনাশক্তি নেই। এই বয়সেই ওর কোঁদলকে ভয় করে না পাড়ায় এমন রণরঙ্গিণী কেউ নেই। আরো কত বল্‌ব। ওর মা ওর বিয়ের যোগাড় কর্‌লে এক ছোড়ার সঙ্গে—সে মটরের মিস্ত্রীর কাজ ক'রে বেশ দুপয়সা কামায়। তা সে বেচারা প্রথমে রাজী হয়েছিল; শেষকালে ওর রং ঢং দেখে, আর এখানে সেখানে ওর হাল চাল শুনে একেবারে সটান চম্পট দিয়েছে আর এদিক মাড়ায়নি। ওর মাত যখন তখন চেলাকাঠ পিটে রক্তারক্তি ক'রে দিচ্ছে, তবু কি লজ্জা আছে! তাই মা কাল বলে দিয়েছেন ওকে দেশে পাঠিয়ে দাও ভদ্রলোকের বাড়ী আর ওকে রাখা যায় না। শুধু ওর মা আমাদের অনেককালের ঝি বলেই—"

ননী বল্‌লে "বেশ মডেলটি।"

যে বড়, সে জীবনে মরণে সমান বড়।

'স্মৃতি-তর্পণ'

কাজল-আঁখি এনা

—শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

সাত-পাহাড়ের রাজা রুরু যে দিন সজন হরের ছেলে সজনের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ের কথা দিলে, সেদিন কাজল-আঁখি এনাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না!

একথা শুনে রুরু প্রথমে হেসেছিল, কিন্তু অধীর সজনের ভ্রূকুটি যত কুটিল হ'তে লাগ্‌ল, রুরুর চোখে হাসির লেখা মিলিয়ে গিয়ে কপালে রাগের রেখা ততই ফুটে উঠ্‌ল, সে এনাকে তল্লাস কর্‌বার হুকুম দিলে।

এনাকে খুঁজে পেলে, সন্ধানী কুলন। ফারবিস পাহাড়-তলীর গভীর জঙ্গলে, কীর্ত্তনীয়া রণজীর সঙ্গে সে বসেছিল। সে যে উত্তরের এক পাহাড়ী, একথা ছাড়া, রণজী সম্বন্ধে অন্য কোন কথা কারো জানা ছিল না; কারণ রণজীকে চেন্‌বার উপায় ছিল না, আত্ম-গোপনের ব্রত নিয়ে সে হরিণ চামড়ার মুখোষ পরে থাকৃত; শুধু নাক মুখ ও চোখের কাছে মুখোষে কয়েকটা কাটা ছিল। এ ব্রত নাকি সে ভাঙ্গতে পার্‌বে না। সে অঞ্চলের নরনারী তার মত মিষ্টি গলা আর কখনও শুনে নি। তার কণ্ঠে যেন মধু ঝর্‌ত আর সেই গানের সঙ্গে সে বাজাত বীণা, সে বীণার ঝঙ্কার শুনলে মানুষ বাহ্ন হয়, লোকে তাই তার নাম রেখেছিল, "বীণকার"।

একবার সজন তাকে উপহাস করেছিল এবং সভার মাঝে বলেছিল যে, ব্রতের কথা সে বিশ্বাস করে না, লোকটা আসলে একজন গুপ্তচর।

দমকা হাওয়ার মতো বর্শা আর তলোয়ারের ফলা শূন্যে চম্‌কে উঠ্‌ল কিন্তু রণজী তার মাঝখানে অটল অচল দাঁড়িয়ে রইল! এবার সে বীণায় ঝঙ্কার দিলে; আঘাত-বেদনায় তারের বুক ফেটে সুরের কান্না ঝরে পড়্‌ল এবং সেই অব্যাহত নিস্তব্ধতার মধ্যে রণজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হোল।—প্রাচীনকালের এক মধুময় গাথা। রণজীর গান যখন শেষ হোল তখন অস্ত্রগুলো সব ঘুমিয়ে পড়েছে।

সন্ধানী কুলন যখন বীণকারকে দেখ্‌লে, তখন তার মুখের মুখোষ খসে, তার পায়ের কাছে পড়েছিল।

ঝড়ে-পড়া শালের একটা ডালের উপর শুয়ে, কাজল-আঁখি এনা, আলস-লালসে মন্দ মন্দ দুলছিল। রণজীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে চেয়েছিল, তার অপূর্ব্ব আভায় তার চোখদুটি জ্বলছিল।

গদগদ কণ্ঠে সে বলছিল, "প্রভু আমার, আমার রাজা"; কথাগুলির মধ্যে এমন একটা মধুর শিহরণের উদ্দীপনা ছিল যে, কুলনের বুকেও কাঁপন জাগল, সে-ও তরুণ, সেও তো স্বপন-বিলাসী। রণজীর এক গানের উত্তরেই এনা তাকে এই বাণীতে অভিনন্দিত করছিল।

সেদিক থেকে সরে এসে কুলন একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল কিন্তু রণজী তার সাড়া পেয়েছিল। হাল্কা গানের রেশের মত বাতাস চিরে তীরটি যুবার শ্বেত পাথরে কোঁদা দুটি কাঁধের মাঝখান ভেদ করে বুক ফুঁড়ে গাছের গায়ে গিয়ে বিঁধল! . . .

রণজী এগিয়ে এসে তাকে দেখে গম্ভীর ভাবে বললে "সুন্দর ও তরুণ, তোমায় ব্যথা দিয়ে তীর ছুঁড়ে, আমিও ব্যথা পেলুম।"

চুপি চুপি এনা বললে, "এ যে কুলন; আমাদের সন্ধানী কুলন!"

রণজীর পিছু পিছু আহত লোকটীর কাছে সে ত্রস্তপদে ছুটে এসেছিল।

মুখ থেকে এক ঝলক রক্ত ও গাঁজলা সরিয়ে মুখ না ফিরিয়ে কুলন বললে, "হাঁ, আমি কুলন, এই আমার শেষ সন্ধান, এনা!"

তীরবিদ্ধ হয়ে তার মুখ ফিরাবার আর উপায় ছিল না।

তাকে মেরে ফেলবার জন্যে রণজীকে বর্শা উঠাতে দেখে এনা বললে, "আহা, ওকে ছেড়ে দাও রণজী, ওকে ছেড়ে দাও, ও হয়তো আবার বাঁচবে।"

"ওর মরণ যন্ত্রণা কমাবার জন্যেই একাজ করছিলুম, যাক্, তোমার যেমন অভিরুচি, এনা", এবার দুজনে বনের গহন গভীরে আত্মগোপন করলে।

হরকরার দল, পরে, কুলনকে খুঁজে পেয়েছিল। সে তখন মরে গেছে।

বেলা শেষে রুরু চিলকোঠা থেকে এনার গানের আওয়াজ পেয়ে তাকে ডেকে পাঠিয়ে বললে যে, সজনের সঙ্গে কাল তার বিয়ে হবে। এনা কিছুই বললে না; কিন্তু আকাশে চাঁদ দেখা দিতেই সে বনের কিনারে গিয়ে লক্ষ্মী-পেঁচার মত তিনবার ডাক দিলে।

পরদিন সকাল বেলা মদিরোৎসবের শেষে রুরু বললে, "এ বিয়ের মজলিসে গান করবে কে? বীণকার কোথায় গেল?"

কিন্তু তাকে তো কেউই দেখে নি। একটা বুড়ো বললে যে, কাল চন্দ্রোদয়ে-

তাকে সে দেখেছিল শাদা একটা ঘোড়ায় চেপে উত্তরের তারার দিকে ছুটে চলেছে !

ত্বপুর বেলা সজনের সঙ্গে এনার বিয়ে হয়ে গেল। এনার সৌন্দর্যে নিমন্ত্রিতেরা সজনের দিকে ঈর্ষ্যায় আড়চোখে চাইলে কিন্তু অনাগত আশঙ্কায়-বিষণ্ণ হয়ে বুড়োরা চুপ করে রইল।

সজন বল্লে, "আমায় গান শোনাও, এনা।"

এনা গাইলো। সে এক প্রেমের গান। গান শেষে তার সোনা-বাধান ছোট বীণাটা একপাশে রেখে যখন সে সজনের চোক থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিলে তখন সজন শুধু হেসেছিল।

"তুমি হাস্‌ছ কেন সজন ?"

"তুমি যে গান করেছ তা তুমি নিজেই কিছু জানো না বলে হাসলুম, তবু যা গেয়েছ, তাই হবে।"

নীচু হয়ে এনা আবার তার বীণাটি উঠিয়ে নিলে; তার নত মুখখানি তুল্‌তেই চোখ ছুটি তার আগুনের দীপ্তিতে ভরে উঠ্‌ল। আচম্বিতে সে হেসে উঠল !

"কি গো, কাজল-আঁখি এনা, তুমি যে হাস্‌লে এবার ?"

"কীর্ত্তনীয়া রণজী, রাজা রণজী, এখানে এসেছে; আমায় সে নিতে এসেছে, আমি যে তার স্ত্রী।—"

একলাফে সজন সোজা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তার আগেই নেকড়ে বাঘের চামড়ায় তৈরী শক্ত ফাঁস তার চারদিকে জড়িয়ে পড়েছিল আর কোমরে বাঁধা সোনার হাতল দেয়া লম্বা ছুরিখানা টেনে বার কর্‌বার আগেই তার হাত পা বাঁধা পড়্‌ল !

নীচু হয়ে রণজী তাকে তুলে নিয়ে হরিণ চামড়ার বিছানার ওপর ফেলে দিলে। এতক্ষণ এনা সেখানেই শুয়েছিল। তারপর তীব্র পরিহাসের স্থরে বল্লে "সজন, এ বাসর তোমার, কিন্তু এ কনে আমার, বুঝ্‌লে ?"

বাইরে, বর্শা ও তলোয়ারের ঝঞ্ঝনা, নর-নারীর আর্ত্তরব ও ভীষণ চীৎকার—সব হঠাৎ থেমে গেল। পাহাড়ীরা দলে কম ছিল, তা না হোলে তারা রুরুর প্রাসাদ-ছুর্গ ধূলিসাৎ করে দিত। বিপদ দেখে রুরু সন্ধির প্রস্তাব করলে এবং রনজীকে অনুরোধ কর্‌লে যে, সে যেন তার বাঞ্ছিত এনাকে নিয়ে চলে যায়।

পাহাড়ী-রাজা রণজী, কীর্ত্তনীয়া রণজী, দুর্দ্দমনীয় রণজী, এমনি করেই তার প্রিয়া কাজল-আঁখি এনাকে লাভ করেছিল।

কিন্তু রাজার মত রণজী ভালবাসতে পারে নি, কারণ সে ছিল কবি আর সীমাহীন ছিল তার স্বপন-বিলাস, তাই তার প্রেমে না ছিল সংযম, না ছিল গাম্ভীর্য্য; সে ছিল শুধু অগাধ আবেগের উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহ।

পাহাড়পুরের অধিরাজ যে দিন মারা গেলেন, দূতেরা দুর্দ্দমনীয় রণজীর কাছে ছুটে এল—অধিরাজের শূন্য আসনে অধিকার যে একা তাঁরই। এনাকে এ সংবাদ দেবার জন্যে সে তাকে খুঁজলে কিন্তু সে তখন হয় বনে না পাহাড়ে ঘুরছে—তাই প্রিয়াকে না দেখেই তাকে পূবমুখে যাত্রা করতে হ'ল।

অধিরাজের দুর্গে বসেই রণজী শুনলে যে, সজনের প্রতিহিংসার আগুনে তার জন্মভূমি আজ শ্মশান এবং তার সাধের কাজল-আঁখি এনা সজনের অন্তঃপুরে বন্দিনী . . .

এক রাত আর একদিনে রণজী তার নিজের দেশে ফিরে এল। তার আহ্বানে পাহাড়ীরা স্ব-গোষ্ঠী তার পতাকাতলে সমবেত হোল এবং ঢালু পাহাড়ে উভয় পক্ষের অস্ত্র পরিচয় হয়ে গেল।

বেলা শেষে মাটীতে লুটিয়ে পড়া কত মাথার মুকুটের মরা সোনা হলদে বালিতে মিশিয়ে গেল কিন্তু সেদিক কেউ ফিরেও চাইলে না। যেখানে দীঘল ঘাসের ঘন বন সবুজ শোভায় দুলত সেখানে কত নারীর হৃদয় ধুলায় পড়েছিল। সে বুকে না ছিল আনন্দের স্পন্দন, না ছিল ব্যথার দোল। সেই ধূসর নিস্তব্ধতায় সেগুলি এত নিথর হয়ে পড়েছিল যে, ফুলের নিঃশ্বাসে যারা কেঁপে উঠে এমন সব চঞ্চল পতঙ্গ গতিহীন হয়ে তার উপর পাখার ভরে বসে ছিল।

বর্শা তলোয়ারের ঝঞ্ঝনা থেমে গিয়েছিল, বল্লমের বদলে বন্য বাজের পাখার তীব্র শীস নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। রক্ত পল্বলের মধ্যে যেখানে এতক্ষণ তীর বর্ষণ হচ্ছিল এখন সেখানে দাঁড়কাকের দল জটলা করতে লাগল।

এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক এর মধ্যে একা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সৈন্য সামন্তেরা পাহাড়-তলীর নদীর ওপারে চলে গিয়েছিল এবং মাঝে মাঝে ভীত পলাতক শত্রুর বুক লক্ষ্য করে বর্শা বিঁধে ও শালের গুড়িতে দীর্ঘ চুল দিয়ে মেয়েদের বেঁধে মজা করছিল।

যে একা দাঁড়িয়েছিল সে রণজী।

মৃতের মধ্যে রণজী খুঁজতে লাগল। যারা মুখ উপর দিকে করে পড়েছিল

আগে সে তাদের মধ্যে দেখ্‌লে। তারপর বর্শা, বল্লম বা পিঠের উপর তার মেরে যারা মুখ নীচু করে পড়েছিল তাচ্ছিল্য ভরে তাদের উল্‌টে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

কিন্তু সজনের মৃতদেহ সে কোথাও দেখ্‌তে পেলে না!

সে রাত্রে তার চরেরা এক বন্দী স্ত্রীলোককে তার কাছে হাজির করলে। সে বৃদ্ধা কিন্তু একটা খবরের দামে সে নিজের জীবন কিনে নিলে এবং সে খবর এনার।

ঢালু পাহাড়ের বুকে সজন উপস্থিত ছিল না। এনার পিতার অধিকৃত নিকটবর্ত্তী এক বন-দুর্গে সে অপেক্ষা করছে।

রুক্ষ প্রথম থেকেই রণজীকে ঘৃণা করত এবং এখন সেই বৃদ্ধের অট্টহাস্য তার শিকারী কুকুরের দীর্ঘ উচ্চ চীৎকারকেও ছাপিয়ে উঠ্‌ছে। স্ত্রীলোকটি বল্‌লে যে, যখন সে চলে এল তখন হরিণ চামড়ার বিছানায় শুয়ে এনা সজনের দীর্ঘ চুল নিয়ে খেলা কর্‌ছিল।

স্ত্রীলোকটি আরো বল্‌লে যে, এনা গান কর্‌ছিল।

রণজী বল্‌লেন, "কি গান সে গাইছিল?

"সে গানে বাতাসের মিলন, ঢেউয়ের মিলন, দিন রাত্রি, জীবন মৃত্যুর অপূর্ব্ব সম্বন্ধের কথা আছে আর এক এক কথার শেষে সে গাইছিল—

"কাজল-কালো আঁখির আভায়,
প্রিয় আমার,
জ্বালিয়ে রাখি তোমার প্রেমের শিখা।
মূর্ত্ত আমার প্রেমের স্বপন,
ওগো, আমার মানস-মোহন,
এনার বুকে তোমারই নাম লিখা॥"

তখন রণজী বুঝ্‌তে পার্‌লে হরিণ চামড়ার বিছানায় শুয়ে সজন হরের ছেলে সজনের কালো চুল নিয়ে খেলা কর্‌তে কর্‌তে কাজল-আঁখি এনা তাকে কোন গান শুনিয়েছে। রণজীর হৃদে চুল নিয়ে খেলা কর্‌তে কর্‌তে তার গিরি দুর্গে হরিণ চামড়ার বিছানায় শুয়ে কাজল-আঁখি এনা যে তাকেও এই গান শুনিয়েছিল।

দুর্দ্দম রণজী ফির্‌ল এবং মৃত ও মরণাহত সমাচ্ছন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে একা দেশের দিকে যাত্রা কর্‌লে কিন্তু রাজা যখন তার নিজের দুর্গে ফিরে গেল তখন পুরনারীরা তাকে সেখানে ঢুক্‌তে দিলে না; কারণ সে তখন নেকড়ে

বাঘের মত চীৎকার করে একটা রক্তমাখা বল্লম আস্ফালন করছিল ; মাঝে মাঝে সে পাগলের মত অট্টহাস্য করছিল আর পশ্চিমাকাশে একটা তারার দিকে চেয়ে তাকে আহ্বান করছিল, "এনা, এনা, এনা !"

সুতরাং এরপর তাকে রাজপদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোল। লোকে তাকে বলত "হাস্যুড়ে", কারণ সে আর বল্লম ছুঁড়্‌তে পার্‌ত না, বোকার মত কেবলই হাসত আর সব সময়ে তার মুখে গাঁজলা ভাঙ্গত। শেষকালে সে গাছের মূল তুলে খেত এবং সব শেষে সে বুনো শূয়রের পায়ের চাপে মারা পড়্‌ল।

এই হচ্চে দুর্দ্দমনীয় রণজীর কাহিনী যে সেই কাজল-আঁখি এনার প্রেম ও সৌন্দর্য্য থেকে মৃত্যুহীন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে চেয়ে ছিল, যে নারী দুজন লোককে একই গান শুনিয়েছে।*

বিজেতার আসন পাওয়া মানুষের সাধনার ফল, তাকে তা তুমি স্বেচ্ছায় দিতে পার না।

'দানের মর্য্যাদা'

---

* রচয়িতা Fiona Macleod.

সিঁদেল চোর

—শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত।

সিঁদ কেটে সে চুরি করত ব'লে লোকে তাকে সিঁদেল চোর বলে ভারী গালাগাল দিত। কিন্তু সে ছিল সেয়ানা, তাই সে কোন দিন ধরা পড়ে নি।

একদিন দুপুর রাতে ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে এল, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের হুঙ্কার আর বিদ্যুতের চমক। চোর শুয়ে শুয়ে ভাবলে কি করা যায়? আজকের রাতটাই যে বৃথা গেল! তার বরাৎ ছিল ভাল, ঘণ্টাখানেক বাদেই বৃষ্টিটা ধরে এল, তবে কালো কালো মেঘগুলো আকাশটাকে খুবই শাসাচ্ছিল। সুযোগ বুঝে চোর চুরি করতে বের হ'ল।

যে বাড়ীর ওপর তার সুনজর পড়্‌ল, সে বাড়ীর ভিতরে ঠাকুর-দালানে তখন রামায়ণ কি মহাভারত কি বেদ না হয় গীতা পাঠ হচ্ছিল। লোকে লোকারণ্য। চোর বেজায় রকম ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেল। তার পেটে ছিল অসীম বুদ্ধি, তাই সে সাম্‌লে নিয়ে এক কোণে বসে পড়্‌ল। সবাই যখন একাগ্রচিত্তে পুণ্যপুথি শুনচে, চোরের মনটা তখন অন্যদিকে ব্যস্ত ছিল। প্রথমে ছিল বোঁচ্‌কার দিকে পরে হ'ল পালাবার ভাবনায়। উঠে যেতে পারে না লোকে কি বল্‌বে ভয়ে, অগত্যা চুপচাপ বসেই রইল।

চোরের মন খারাপ হয়েছে, শাস্ত্র আর পুণ্যপুথি সৈয়াতে দায়ে ঠেকে শুনে বেচারার মন খারাপ হয়ে গেছে। বসে বসে সে ভাবে কত পাপ না জানি সে করেছে, আর ভারী বিমর্ষ হয়ে পড়্‌ছে।

তাকে চুরি ছাড়্‌তে হ'ল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, না খেয়ে মর্‌বো সেও ভাল, তবু জীবনে আর চুরি কর্‌বো না। একটা নামাবলি আর রুদ্রাক্ষের মালা কিনে নিয়ে সে ধর্ম্ম-চর্চ্চায় মনোযোগ দিলে।

কিন্তু মন স্বস্তি পায় না। এত যে পাপ করেছে, তার ত প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না। সে অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলে, সেই ব্রাহ্মণকে কিছু স্বর্ণদান করবে, আর অতি গোপনে তার অতীত জীবনের পাপ স্বীকার করে একটা ব্যবস্থা নেবে। তার জেলেরও ভয় ছিল।

ব্রাহ্মণ সোনা পেয়ে খুশী হয়ে বাড়ী গেল।

পরদিন ভোর না হতেই ব্রাহ্মণ এসে চোরের বাড়ী দেখা দিলে। চোর ভক্তিভরে প্রণাম করতে গেল। ব্রাহ্মণ পা সরিয়ে নিয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন, তবে রে ব্যাটা চোর, জোচ্চুরি করবার আর জায়গা পেলি না? জাহান্নামে যা, জাহান্নামে যা। পেতল দিয়ে ব্রাহ্মণকে ঠকান!—

চোর তো অবাক। বল্‌লে, ঠাকুর কি হয়েছে? আর ঠাকুর, তিনি তখন রেগে অগ্নিশর্ম্মা, মুখ দিয়ে কথা বের হয় না।

অনেকক্ষণ পরে চোর বুঝ্‌তে পারলে, যে সোনাটা সে পোদ্দারের দোকান থেকে কিনে এনেছিল, সেটা আসলে সোনা ছিল না। যা হোক্, ব্রাহ্মণকে রূপোর টাকা দিয়ে খুশী করে সে নাইতে গেল।

এক একটা ডুব দেয় আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ঐ শা—পোদ্দারের বাড়ী সিঁদ কেটে তবে কথা।

সেদিন তার মালা জপা হ'ল না, নামাবলি গা থেকে খসে পড়্‌ল। মরচে-ধরা অনেক পুরাণো সিঁদ কাঠিটা ঘসে, মেজে, শান দিয়ে সাফ করতেই ব্যস্ত ছিল, সমস্ত দিনে আর কোন কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠ্‌ল না।

একদিন ভোর বেলা নাম জপ করতে করতে নামাবলি গায় দিয়ে সেই ধার্ম্মিক চোর গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছে, পথে দেখ্‌তে পেলে সেই ঠাকুরটি কার এক ক্ষেতে ভারী ব্যস্ত! সে দাঁড়াল। দুহাত জোড় করে বললে—পেন্নাম হই গুরুঠাকুর। তিনি কি একটা আশীর্ব্বাদসূচক কথা আওড়াতে যাচ্ছিলেন, চোর আর একটু এগিয়ে বল্‌লে—ঠাকুর মশায়, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি। স্মিত হাস্যে ঠাকুর বললেন—বল।

সে বল্‌লে—দ্বিতীয় ভাগে পড়েছিলেম—না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়।

তিনি রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন—ব্যা-ব্যা-ব্যাটা চোর, আ-আমায় এসেছেন নী-নী-নী-নী—

সব কথাগুলো চোরের কানে ঢুকলো না, কারণ সে দ্বিতীয় ভাগের কথাটা বলে আর একটুও দাঁড়ায় নি।

তার বহুকেলে পুরোণো স্বভাবটা সেদিন আবার এসে কাঁধে চাপল। এবার সে স্থির প্রতীজ্ঞ হ'ল, আর জীবনে কখনো চুরি করবে না, তাই আস্‌বার সময় সিঁদ কাঠিটা ঠাকুরের বাড়ীতেই রেখে এল।

মেঘ-দূত

—দীপঙ্কর।

ওগো স্নিগ্ধ আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
অবিশ্রান্ত নিরলস
কোন্ বাণী শুনাইছ গম্ভীর ভাষায় ?
রুক্ষ পৃথ্বী দীর্ণ পিপাসায়
মূর্চ্ছি পড়ি' ছিল কোথা চক্ষু অগোচরে !
আচম্বিতে মেঘের অম্বরে,
জাগিল মৃদঙ্গ মন্দ্র গুরু গুরু ডম্বরু নিক্কণ
উন্মত্ত ঝঞ্ঝার নৃত্য—রাগদীপ্ত স্তম্ভিত গর্জ্জন
ছুটাইল যত বন্ধ বাধা
ফুটাইল পৃথ্বীগাত্রে স্তব্ধ রোমাঞ্চন ;—
আধা স্বপ্ন জাগরণ আধা
আকুল করিল বক্ষ ! যেন কোন্ নিবিড় বেদনে
আছাড়ি পড়িল স্বর্গ মর্ত্ত্যের উরসে !
চমকি শিহরি শীর্ষ স্পন্দনে স্পন্দনে
চুম্বিল অম্বর ডাল লতাগুল্ম উন্মত্ত পরশে !
উর্দ্ধে চলে মেঘে মেঘে মুক্ত হানাহানি
নিম্নে চলে কানাকানি
বনে বনে মর্ম্মরে মর্ম্মরে—
কোন্ বাণী কোন্ ব্যথা আজি স্তরে স্তরে
ব্যপিয়া ফেলিল এই বিশ্ব বপুখানি !

* * *

গভীর তমিস্র ভেদি আঁখি ধায় আকুল সন্ধানে !
কোথা পথ—আছে কি গো পথ
বনস্পতি অরণ্যানি উত্তুঙ্গ গন্ধ

কি সঙ্কেতে কি ইঙ্গিতে কি বুঝায় কে বা তাহা জানে !
চায় কান বুঝে নিতে কোন্ গান—কি সঙ্গীত বাজে
মেঘে মেঘে ঝঞ্ঝার ঝঙ্কনে !
কোন প্রয়োজনে
এ বিরাট লীলা-নাট্য ধরিত্রীর মাঝে
বর্ষে বর্ষে আষাঢ়-তাণ্ডবে উঠে জাগি ?
স্মৃতি স্বপ্ন চেতনা বিবাগী
শুধু ধায়—শুধু চায়
পাগলের প্রায়
আশার বন্ধন মাঝে বেঁধে নিতে মত্ত দুরাশায় !

জীবনে মরণে কর্ম্মে ও জ্ঞানে থাকিব না পরাধীন,
আমার আদেশ না পাইয়া যেন কাটেনা আমার দিন।
'ঘুমের ঘোরে'



(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩৫

কিন্তু মায়ার প্রতিজ্ঞা রহিল না। প্রতি দিনের মত পরের দিন সকালে খাতা-পত্রের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে দেখিয়া এবং পূর্ব্ব দিনের কথা স্মরণ করিয়া কমলা হাসিয়া বলিল—ঠিক এই জন্যেই মায়া, তোকে কেউ বিশ্বাস করে না।

একটি বই-এর পাতায় দাগ দিতে দিতে মায়া চোখ না তুলিয়া বলিল—কেউ মানে?—

কমলা। ব্যক্তিগতভাবে নির্দ্দেশ করা শক্ত।

মায়া তাহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—সাধারণভাবেই না হয় বলে ফেল কথাটা—

কমলা বলিল—যে আসে কাছে—

মায়া বই বন্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—তারা গেলে যে প্রাণ বাঁচে—সঙ্গে সঙ্গে তারা কিছু কৃতজ্ঞতাও নিয়ে যেতে পারে।—কিন্তু তোমাদের ঐ নাছোড়বান্দা 'কেউ' মানুষগুলির কাছে আস্‌বার প্রয়াস মনটাকে এমন বিরক্তিতে ভরিয়ে তোলে যে, তাদের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতার সম্বন্ধও বজায় রাখা কঠিন হ'য়ে ওঠে।

কথাটা কমলা পরিহাস ছলেই বলিয়াছিল, কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিতও ছিল না। কিন্তু মায়ার ঐ উক্তি শুনিয়া সে বিশেষ অশান্তি এবং আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। মায়ার কথার সুরে তীব্র একটা নিষ্ঠুরতার আভাস রহিয়াছে ইহা বুঝিয়াও সে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। প্রশ্ন করিলেই সে উত্তর দিবে এমন ধারণা মায়ার সম্বন্ধে কাহারও মনে নাই, কমলাও ইহা বিশেষ ভাবেই জানে। কিন্তু সে যদি কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় তবে তাহার

মধ্যে গোপন করিবার কোন প্রয়াস থাকে না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিবার প্রয়োজনও হয় না।

একখানি খাতার ভিতর হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া সে কমলাকে বলিল—তুই তখন রান্নাঘরে ছিলি, একজন ভদ্রলোকের বেয়ারা এই চিঠিটা আমায় দিয়ে গেল।

খামের উপরকার লেখা দেখিয়া কমলা বুঝিতে পারিল, কে লিখিয়াছে। ইহাতে সে অধিকতর আশ্চর্য্য হইল এবং বিস্ময় চাপিতে না পারিয়া বলিল—বিমলবাবু তোকে এমন কিছু লিখ্‌তে পারেন যা তোর ভাল লাগ্‌বে না? তুই ওঁর সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ কিছু না বল্‌লেও এটা আমি চিরদিনই বুঝি যে, তোর চোখে যা সুন্দর হ'বে তাই উনি করেন। তোকে তৃপ্তি দেবার জন্যে তিনি নিজের সম্বন্ধে কত সময়—

মায়া তাহাকে থামাইয়া বলিল—বাস্। ঐখানেই পূর্ণচ্ছেদ ফেল। তোমার কথা আমি মানি। বিমলবাবুর সম্বন্ধে ঐ বিশ্বাসও এই চিঠি পাওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার মনে ছিল।—কিন্তু এই আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার সে বিশ্বাস মারা গেছে। আর এই চিঠিখানা তোকে শোনাবার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও শেষ হয়ে যাবে।

কথা বলিতে বলিতে খাম হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া মায়া কমলাকে বলিল—তুই নিজে পড়্‌তে চাস?—

কমলা অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিয়া ছিল, বলিল—না।

মায়া পুনরায় চিঠিখানি খামে বন্ধ করিয়া বলিল—বেশ, তাহ'লে মোটামুটি শুনে যাও, আমি বিমলবাবুর ভাব, আর আমার ভাষাতেই বল্‌ছি :—

দীপ্তির বিয়ের রাত্রে পাগলের মত আমি যাকে খুঁজে বেড়িয়েছি, তাকে তিনি জানেন; বিবাহের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়ে কোন কাজে যে তাকে পাঠিয়েছি, তাও তিনি দেখেছেন; সেই লোকটি যে আমার কাছে এসেছিল তাও তিনি জেনেছেন।—তারপর এই সর্ব্বজ্ঞ পরম করুণাময় বন্ধু আমার বল্‌ছেন, পৃথিবীর অন্য যে কোন মানুষের কাছে যদি আমি যেতাম, বা অন্য যে কেউ আমার কাছে আস্‌ত, তিনি কিছু মনে কর্‌তেন না।

—এর কারণ দেখিয়ে তিনি বল্‌ছেন, মুকুলকে আমি জানি। এই 'জানি' কথার নীচে লাইন টানা আছে কমলা মনে রাখিস্। তারপর তিনি বল্‌ছেন, সে তোমায় যে আঘাত দেবে তাও আমি জানি, তাই অত্যন্ত স্বার্থপরের মত

বল্‌ছি, তোমার সে আঘাত সে দুঃখ আমার বুকে সহ্য হবে না। কোন নারীকে জয় করতে মুকুলের তিন দিনের বেশী সময় লাগে না।—কোন বিজিত নারীকে সে সাত দিনের বেশী সহ্যও করে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, দারুণ অবজ্ঞার হাসির রেখা মুখে টানিয়া মায়া আবার বলিতে লাগিল :—

তারপর এই প্রেমময় বলছেন, ব্যক্তিগতভাবে মুকুলের প্রতি আমার কোন অশ্রদ্ধা নেই ; ওকে আমি ভালবাসি ; ওর বিশেষ কতকগুলি গুণে আমি মুগ্ধ ; ওর প্রতি তোমার মনে বিদ্বেষ আনবার জন্যে এ চিঠি লিখ্‌ছি না ; নিজেকে বাইরের আঘাত থেকে বাঁচান মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ; তুমি আঘাত পেলে আমিও আঘাত পাব ; একথা তুমি না বিশ্বাস করলেও আমি করি ; আমি ভয় পেয়েছি, তাই তোমাকে সাবধান করতে এসেছি।

মায়া চুপ করিল, কিন্তু তাহার মুখে ঘৃণার চিহ্ন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে দেখিয়া কমলা বলিল—কিন্তু তুই অবিচার করছিস মায়া!—ও ভালবাসে তোকে ; ভয়ানক ভালবাসে, তাই—

কমলার কথা শেষ হইল না। মায়া তাহার চোখের দিকে তাকাইতেই সে সব যুক্তি ভুলিয়া গেল।

মায়া বলিল—দেখ্‌ কম্‌লি, ঠিক জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত আমার ধারণা ছিল—বাঙালী জাতের মধ্যে পুরুষ কেউ নেই। আবশ্যকের তাগিদে আর কর্ত্তব্যের খাতিরে যারা নারীর স্বামী বা সন্তানের পিতা হয় তাদের কথা আমি ভাবছি না। আমার ঐ 'পুরুষ' কথাটার আড়ালে যে চিন্তা বা কল্পনা অপ্রকাশিত থেকে যাচ্ছে তা ঠিক ক'রে তোর কাছে বল্‌তে পারছি না।—এই কল্পনার পুরুষকে আমি দেখেছি, সেই সঙ্গে ভ্রান্ত ধারণাটাও আমার কেটে গেছে। বিমলবাবু আজ বিকালে আস্‌বেন লিখেছেন, তিনি এলে এই কথাটাই বুঝিয়ে বল্‌তে চেষ্টা করব।

কমলা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিল—মানে ?—

মায়া। মানে বিমলবাবুর চিঠিতে আমার প্রতি তাঁর প্রাণের ভালবাসা আছে যেমন সত্য, তেমনি আরো দুটি সত্য আছে। প্রথমটি হচ্চে—পুরুষত্বে বিমলবাবু মুকুলের চেয়ে হীন, একথা তিনি নিজেও জানেন। দ্বিতীয়—আমাকে বিমলবাবু বিশ্বাস করেন না, একথা আমি জান্‌তে পেরেছি।

কমলা। অমন সুন্দর চিঠিখানার ঐ অর্থ করলি মায়া!—নিশ্চয়ই তোর মাথা খারাপ হ'য়েছে।

মায়া। তা হ'বে, কিন্তু যেটুকু এখনও বোঝ্‌বার শক্তি আছে, তাই থেকেই বল্‌ছি, এমন অপমানের চিঠি লেখ্‌বার পূর্ব্বে তাঁর ভাবা উচিত ছিল, তিনি কা'কে লিখ্‌ছেন।

কমলা আর থাকিতে পারিল না, চোখ মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল—কিন্তু বিশ্বাস কর্‌ মায়া, মেয়েমানুষের এত তেজ ভাল নয়। ও তেজ চূর্ণ যে দিন হবে—

তাহার কথা শেষ না হইতেই মায়া বলিয়া উঠিল—মায়া সেদিন নতুন ক'রে জন্মাবে।—আর বোধ হয় তা হয়েও গেছে।

কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ার মুখে এমন একটি শান্ত শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল যে কমলা চোখ ফিরাইতে পারিল না।

মায়া যেন স্বপ্নের ঘোরে বলিতে লাগিল—কি স্বাস্থ্য-সমুন্নত উদ্ধত, গর্ব্বিত, শক্তিশালী পুরুষ!—

কমলা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—একবারটি বল্‌ শুধু, কার কথা ভাবছিস্‌?

মায়া বলিল—অনেকের কথাই।—বিশেষ ক'রে এখন দুজনের কথা মনে পড়্‌ছে। দুই বন্ধু তারা। একজন জাগাল আমার নারীত্ব, আর একজন জাগাল আমার মাতৃত্ব!—বুঝ্‌তে পারছিস্‌ না কমলা?—জীবন আর বিকাশ। কিন্তু আমার প্রেম রইল আজও ঘুমিয়ে! সে জাগ্‌লেই আমার সব সাধ মেটে।

ইহার পর বহুক্ষণ মায়াকে কোন কথা বলিতে না শুনিয়া এবং পড়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেখিয়া কমলা উঠিয়া তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

প্রতি দিনের মত শ্রীশ হাজিরা দিতে আসিলে তাহাকে বিস্ময়ের অবকাশ না দিয়া মায়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া দিল। মনের মত উত্তর শুনিয়া খুশী মনে বার বার বলিতে লাগিল—ওটা না বুঝিয়ে দিলে সত্যি আমি নিজে পেরে উঠ্‌তাম না শ্রীশদা; এবার সব পেপারে ফুল্‌ মার্কস্‌ রেখে নিও—

কয়েক ঘণ্টা এই ভাবে কাটাইবার পর কমলার তাড়া খাইয়া মায়া স্নান করিতে গিয়াছে, তাহার পর আহারের সময় ছেলেমানুষের মত চেঁচামেচি করিয়া খাইয়াছে এবং এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম না লইয়া আবার নোটস্‌ খুলিয়া বসিয়াছে।

এই ভাবে বরাদ্দ সময়ের উপর প্রায় চার ঘণ্টা উপরি খাটিয়া শ্রীশ বিদায় লইবার সময় বলিল—আজ তুই আমাকে একেবারে কাহিল ক'রে ছেড়েছিস্ মায়া—

মায়া হাসিয়া বলিল—কালও ঠিক এমনি, বুঝ্‌লে ?—

শ্রীশ বলিল—হাঁ, শুধু ঐ conspiracy-টা ছাড়া।

মায়া অবাক হইয়া বলিল—conspiracy ?—

শ্রীশ। হাঁ, আজ ক'দিন ধরে মাসীমা, মেসোমশাই, মা, বাবা তোর সম্বন্ধে একটা কিছু কর্‌তে চেষ্টা করছেন বুঝ্‌তে পারছি. কিন্তু ঠিক যে কি তা জানি না।—আমাকে দলে নেন নি।

মায়া। তাই বুঝি আজ তোর না হ'তেই বাবা চলে গেলেন ?

শ্রীশ। সম্ভবতঃ ; একটু সাবধানে থাকিস্, 'শতমুখীর' তীরগুলো সাঁই সাঁই ক'রে আজ কাল যে ভাবে চারধারে ছুটে বেড়াচ্ছে, তাতে চোট্ না লাগাটাই আশ্চর্য্যের কথা। দীপ্তিকে বেশ একটু খাল করেছিল, এখন অনেকটা ভাল।

মায়া শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—আবার নতুন কিছু না কি ?

শ্রীশ। না, নতুন কিছুই না, খুব পুরোণ। কিছু দিন থেকে অমল খুব বেশী রকম দীপ্তির কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেছিল।

মায়া। উদ্দেশ্য ?—

শ্রীশ। উদ্দেশ্য, পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা, বন্ধুত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার প্রতিশ্রুতি এবং চেষ্টা ইত্যাদি ইত্যাদি। দীপ্তি এটাকে সাধারণ আর স্বাভাবিকভাবেই নিতে চেষ্টা করেছিল প্রথমটা কিন্তু পরে জান্‌তে পারে সেটা খুব সাধারণ আর স্বাভাবিক নয় ; তখন থেকেই ওকে এড়িয়ে চল্‌তে চেষ্টা ক'রে, কিন্তু সেটা অসিতের দৃষ্টি এড়ায় নি।

মায়া। সর্ব্বনাশ !

শ্রীশ। মটেই তা নয়, কোন্ মানুষের মধ্যে কি আছে বোঝা বড় শক্ত। সব পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, তোকে মোটামুটি ব্যাপারটা বলে যাই।

—দীপ্তির কাছে অমলের আসার সঙ্গে সঙ্গে শতমুখীদের সহস্র জিভ্ লক্ লক্ করে বেরিয়ে এসে চারদিকে বিষ ছড়াতে থাকে, তাতেই বাবা আর মা নীল হ'য়ে উঠ্‌ছিলেন, দীপ্তির ত কথাই নেই। এটাও অসিত দেখেছে কিন্তু দীপ্তিকে নিজের থেকে কিছু বল্‌তে না শুনে কয়েকদিন চুপ ক'রেই ছিল,

শেষে আর না পেরে একদিন দীপ্তিকে বলে—তুমি যদি আমাকে চিরদিন স্বামীত্ব দিয়েই রাখ্‌তে চাও, আমার আপত্তি করবার কিছু নেই, কিন্তু স্ত্রীর বন্ধুত্ব না পেলে পুরুষের শক্তি অনেকখানি পঙ্গু থেকে যায়।

—এই কথার পর দীপ্তি অমল সম্বন্ধে সব কথা অসিতকে বলে। অসিত তাতে হেসেই সারা হয়। বলে এই নিয়ে ভাব্‌ছ দীপ্তি! তারপর প্রতি দিনের মত অমল এলে অসিত কথায় কথায় অমলকে জিগ্‌গেস করে—দেখুন, আমি আপনার ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না, জান্‌বার সৌভাগ্যও হয় নি; আচ্ছা আপনি ত অনেক দিন বিলেতে কাটিয়েছেন, ওখানে এক জাতের সভ্য অবস্থাপন্ন মানুষ আছে, যাদের পেশাদার Gossip বলে, এখানে সে রকম মানুষ বিশেষ আছে কি?—যারা বন্ধুত্বের আড়াল দিয়ে মানুষের দুর্ব্বলতার খবর শুনে গিয়ে Scandal mongers-দের কাছে সে সব trust বিক্রী করে?

—অমল বলে, আপনার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না!

—অসিত উত্তর দেয়, এটা খুব প্লেন্ জিনিস, এখানে কি হয় ঠিক জানি না, আমার একটি ইংরেজ বন্ধু ভারি এক মজার কাণ্ড করেছিলেন।—তাঁর ঠিক বিয়ের পরই, তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে নানা কথা বাইরে থেকে শুন্‌তে পান, তাতে তিনি একজনকে ডেকে বলেন, আচ্ছা আপনি কত টাকা দামের জুতো পায়ে দেন?

লোকটি অবাক হয়ে উত্তর দেয় দু' পাউণ্ড।—কেন?—

আমার বন্ধু, টেবিলের ওপর দু' পাউণ্ড রেখে নিজের পায়ের জুতো খুল্‌তে খুল্‌তে বলেন—আমারটা মাত্র বারো শিলিং! তা আপনি ঐ দু' পাউণ্ড নিন, আর এটাও—বলেই তিনি সেই বারো শিলিং-এর জুতোটি আচ্ছা ক'রে বা কতক সেই লোকটির মুখে লাগিয়ে দিয়ে আবার বলেন—আপনাদের দলে ফিরে গিয়ে বল্‌বেন, Scandal mongering-এর দাম দু' পাউণ্ড বারো শিলিং পেয়েছি—ভারি মজার গল্প না?—

—অমল বেশ একটু তেতে উঠে বলে, আপনি কি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বল্‌ছেন—এ কথাটা?

—অসিত বলে, নিশ্চয়।—আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন বলেই বলেছি; খুব amusing না? আপনার ফ্রেণ্ডস্‌দের বল্‌বেন, তাঁরা নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন।

মায়া। কি ছেলেরে বাবা!—তারপর?—

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—তারপর থেকে অমল আর আসে নি। দীপ্তি ভয় পেয়ে

আমাকে ডেকে নিয়ে সব কথা বলে, আমিও প্রথমটা বেশ একটু ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিলাম, তারপর অসিতের কথাবার্ত্তা শুনে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি।

—আমি বল্‌লাম, আপনার এই গল্পটার ফল যদি খুব ভাল না হয়, কি করবেন ?

—সে দিব্যি সহজ ভাবে উত্তর দিল, গল্পটাকে সত্যি করে দেব।—তার ছেলে-মানুষীরও অন্ত নেই, দীপ্তিকে সেদিন বল্‌ল, দেখ, বন্ধু পাওয়া সব সময় বরাতে ঘ'টে ওঠে না। শ্রীশদা ত রয়েছেন, half a loaf is better than no bread, ও'র ওপর দিয়েই যদি বন্ধুত্বের অভাব মেটাতে চেষ্টা করি আমরা, কি হয় ?—সেই দিন থেকে বিকেল বেলাটা ওখানেই কাটাচ্ছি।

মায়া খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল—কেমন লাগ্‌ছে ?

শ্রীশ বলিল—পুরুষের উপযুক্ত শরীর ওর আছে একথা আগেই মনে হয়েছিল, এখন দেখ্‌ছি মনটাও পুরুষের উপযুক্ত।

মায়া। শতমুখীদের তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ আর ওঠে নি ?

শ্রীশ। না, উল্টে এই নিয়ে তাদের মধ্যে খুব একটা হাসি তামাসা হয়ে গেছে।—বেচারী অমল! সে যেখানে যায় সেখানেই শোনে, অসিত তাকে নাকি জুতিয়ে ল্যাট্‌ ক'রে দিয়েছে!—খুব সম্ভবত অসিতকে আর ঘাঁটাতে ওরা সাহস করবে না।

মায়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিল—আচ্ছা শ্রীশদা, তটিনীকে আর ফিরে পাওয়া যায় না, না ?—

শ্রীশ অবাক হইয়া গেল। বলিল—কেন ? হঠাৎ তাকে মনে পড়্‌ল যে ?

মায়া বলিল—সব সময়েই পড়ে কিন্তু কা'কেও তার কথা বলি নি কোন দিন, কি সুন্দর জীবন ছিল, আর তুমি কি ক'রে দিলে!

যেন তীব্র আঘাত পাইয়া শ্রীশ বলিয়া উঠিল—আমি ?

মায়া। হাঁ, তুমি ছাড়া আর কা'কেও ত দায়ী করতে পারি না।—ফুলের মত নির্ম্মল জীবনটা তার কি ভয়ানক বিষিয়ে উঠেছে আজ! তার জীবন একজনের হাতে যেমন নষ্ট হয়ে গেছে অন্যের জীবন নষ্ট ক'রে ও যেন সেই দুঃখের প্রতিশোধ নেয়।—মনে পড়ে না তটিনীকে ?

শ্রীশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মায়া অত্যন্ত কঠিন ভাবে বলিতে লাগিল—নিজের খেয়ালটাকেই বড় ক'রে দেখ্‌লে ; যে তোমার হাতে জীবন বিসর্জ্জন দিল

শেষে আর না পেরে একদিন দীপ্তিকে বলে—তুমি যদি আমাকে চিরদিন স্বামীত্ব দিয়েই রাখ্‌তে চাও, আমার আপত্তি কর্‌বার কিছু নেই, কিন্তু স্ত্রীর বন্ধুত্ব না পেলে পুরুষের শক্তি অনেকখানি পঙ্গু থেকে যায়।

—এই কথার পর দীপ্তি অমল সম্বন্ধে সব কথা অসিতকে বলে। অসিত তাতে হেসেই সারা হয়। বলে এই নিয়ে ভাব্‌ছ দীপ্তি! তারপর প্রতি দিনের মত অমল এলে অসিত কথায় কথায় অমলকে জিগ্‌গেস করে—দেখুন, আমি আপনার ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না, জান্‌বার সৌভাগ্যও হয় নি; আচ্ছা আপনি ত অনেক দিন বিলেতে কাটিয়েছেন, ওখানে এক জাতের সভ্য অবস্থাপন্ন মানুষ আছে, যাদের পেশাদার Gossip বলে, এখানে সে রকম মানুষ বিশেষ আছে কি?—যারা বন্ধুত্বের আড়াল দিয়ে মানুষের দুর্ব্বলতার খবর শুনে গিয়ে Scandal mongers-দের কাছে সে সব trust বিক্রী করে?

—অমল বলে, আপনার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না!

—অসিত উত্তর দেয়, এটা খুব প্লেন্‌ জিনিস, এখানে কি হয় ঠিক জানি না, আমার একটি ইংরেজ বন্ধু ভারি এক মজার কাণ্ড করেছিলেন।—তাঁর ঠিক বিয়ের পরই, তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে নানা কথা বাইরে থেকে শুনতে পান, তাতে তিনি একজনকে ডেকে বলেন, আচ্ছা আপনি কত টাকা দামের জুতো পায়ে দেন?

লোকটি অবাক হয়ে উত্তর দেয় দু' পাউণ্ড।—কেন?—

আমার বন্ধু, টেবিলের ওপর দু' পাউণ্ড রেখে নিজের পায়ের জুতো খুল্‌তে খুল্‌তে বলেন—আমারটা মাত্র বারো শিলিং! তা আপনি ঐ দু' পাউণ্ড নিন, আর এটাও—বলেই তিনি সেই বারো শিলিং-এর জুতোটি আচ্ছা ক'রে ঘা কতক সেই লোকটির মুখে লাগিয়ে দিয়ে আবার বলেন—আপনাদের দলে ফিরে গিয়ে বল্‌বেন, Scandal mongering-এর দাম দু' পাউণ্ড বারো শিলিং পেয়েছি—ভারি মজার গল্প না?—

—অমল বেশ একটু তেতে উঠে বলে, আপনি কি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বল্‌ছেন—এ কথাটা?

—অসিত বলে, নিশ্চয়।—আপনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন বলেই বলেছি; খুব amusing না? আপনার ফ্রেণ্ডদের বল্‌বেন, তাঁরা নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন।

মায়া। কি ছেলেরে বাবা!—তারপর?—

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—তারপর থেকে অমল আর আসে নি। দীপ্তি ভয় পেয়ে

আমাকে ডেকে নিয়ে সব কথা বলে, আমিও প্রথমটা বেশ একটু বাব্‌ড়ে গিয়েছিলাম, তারপর অসিতের কথাবার্ত্তা শুনে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি।

—আমি বল্‌লাম, আপনার এই গল্পটার ফল যদি খুব ভাল না হয়, কি করবেন?

—সে দিব্যি সহজ ভাবে উত্তর দিল, গল্পটাকে সত্যি করে দেব।—তার ছেলে-মানুষীরও অন্ত নেই, দীপ্তিকে সেদিন বল্‌ল, দেখ, বন্ধু পাওয়া সব সময় বরাতে ঘ'টে ওঠে না। শ্রীশদা ত ব'লেছেন, half a loaf is better than no bread, ওঁর ওপর দিয়েই যদি বন্ধুত্বের অভাব মেটাতে চেষ্টা করি আমরা, কি হয়?—সেই দিন থেকে বিকেল বেলাটা ওখানেই কাটাচ্ছি।

মায়া খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল—কেমন লাগ্‌ছে?

শ্রীশ বলিল—পুরুষের উপযুক্ত শরীর ওর আছে একথা আগেই মনে হয়েছিল, এখন দেখ্‌ছি মনটাও পুরুষের উপযুক্ত।

মায়া। শতমুখীদের তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ আর ওঠে নি?

শ্রীশ। না, উল্টে এই নিয়ে তাদের মধ্যে খুব একটা হাসি তামাসা হয়ে গেছে।—বেচারী অমল! সে যেখানে যায় সেখানেই শোনে, অসিত তাকে নাকি জুতিয়ে লাট্‌ ক'রে দিয়েছে!—খুব সম্ভবত অসিতকে আর ঘাঁটাতে ওরা সাহস করবে না।

মায়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিল—আচ্ছা শ্রীশদা, তটিনীকে আর ফিরে পাওয়া যায় না, না?—

শ্রীশ অবাক হইয়া গেল। বলিল—কেন? হঠাৎ তাকে মনে পড়্‌ল যে?

মায়া বলিল—সব সময়েই পড়ে কিন্তু কা'কেও তার কথা বলি নি কোন দিন, কি সুন্দর জীবন ছিল, আর তুমি কি ক'রে দিলে!

যেন তীব্র আঘাত পাইয়া শ্রীশ বলিয়া উঠিল—আমি?

মায়া। হাঁ, তুমি ছাড়া আর কা'কেও ত দায়ী করতে পারি না।—ফুলের মত নির্ম্মল জীবনটা তার কি ভয়ানক বিষিয়ে উঠেছে আজ! তার জীবন একজনের হাতে যেমন নষ্ট হয়ে গেছে অন্যের জীবন নষ্ট ক'রে ও যেন সেই দুঃখের প্রতিশোধ নেয়।—মনে পড়ে না তটিনীকে?

শ্রীশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মায়া অত্যন্ত কঠিন ভাবে বলিতে লাগিল—নিজের খেয়ালটাকেই বড় ক'রে দেখ্‌লে; যে তোমার হাতে জীবন বিসর্জ্জন দিল

তার কথা একবার ভাবলেও না ; প্রাণ দিয়ে যে বল্‌ল ভালবাসি, অবিশ্বাসের হাসি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিলে ও একটা মানসিক উচ্ছ্বাস বা spasm, যার সাহায্যে যে-কোন মানুষকে খুশীমত কাছে আনা যায়।—তোমার সে সময়কার সব কথা আমার বিশেষ ক'রে মনে আছে। মনে পড়ে, তখন আমাদের বোঝাতে, যে বলে ভগবান মঙ্গলময়, সে মিথ্যাবাদী . . . তার চেয়ে বড় মিথ্যা-বাদী যে বলে, তোমায় ভালবাসি—

শ্রীশ একখানি হাত তুলিয়া ধীরে ধীরে আপনার কপালে বুলাইতে লাগিল।

মায়া বলিল—আমার কথায় অভিমান ক'র না। আমি চিরদিন তোমার কথাই বিশ্বাস ক'রে এসেছি ; চিরদিন করব, শুধু বল, সে ধারণা সে বিশ্বাস আজও তোমার মনে আছে ?—

মায়ার কথায় কয়েক মুহূর্ত শ্রীশ যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার প্রবাহিত জীবন-ধারা পুরাণো দিনের ফেলে আসা অনাদৃত সৈকত সীমার জন্য পরিপূর্ণ আবেগে আপনারই বুকে আকুল উচ্ছ্বাস জাগাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে! যেন কোন্ মন্ত্রবলে কতশত ভুলে যাওয়া মুছে যাওয়া স্মৃতি এক নিমিষে রূপ ধরিয়া তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে! সে মাধুরী, সে সৌরভ সে রস উপভোগ করিবার শক্তি যেন তাহার নাই, যাহার কথা ভাবিতে তাহার হৃদয়ের প্রতি শিরায় যেন টান পড়ে। মায়ার প্রশ্নের উত্তরের বিনিময়ে সে শুধু একবার একান্ত দীন ভাবে তাহার চোখের দিকে চাহিল।

মায়া তেমনি অবিচলিত নির্ম্মম কণ্ঠে বলিল—বল বিশ্বাস আছে ?—

শ্রীশ বলিল—না।

পরক্ষণেই মায়ার দিক হইতে ফিরিয়া শ্রীশ ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

শ্রীশ চলিয়া যাইবার পর মায়া তাহার ঘরে আসিয়া অবসন্নভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিল। অত্যধিক পরিশ্রমে এবং চিন্তায় তাহার শরীর মন শ্রান্তিতে ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ বিশ্রাম করিতেও পারিল না। বিমলের কথা মনে হইবা মাত্র জোর করিয়া আপনাকে সংযত করিয়া কৌতুকভরা কণ্ঠে কমলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল—হলা পিয় সখি অনসূয়ে! তুমি কোথায় গেলে ?—

পাশের ঘর হইতে ইহার উত্তর আসিল—হলা অনামুখি শউন্তলে, আমায়

কেন ডাকিতেছ ? তোমার দুষ্মন্তের পথ চাহিয়া এখানে বসিয়া বসিয়া সেলাই করিতেছি, আসিলেই খবর দিব।

মায়া হাসিয়া উত্তর দিল—মরণ আর কি ; কথার ছিরি দেখ না !—এই শোন্, আমি এখন স্নান কর্‌তে যাচ্ছি তারপর কেশ-বিন্যাস, তারপর বেশ পরিবর্ত্তন। আমার কাছথেকে সাড়া না পেলে আমার ঘরের এই ড্রপ্‌সিন্‌টা তুলিস্ নি, বুঝ্‌লি ?

কমলা বলিল—হঠাৎ শরীরটার ওপর এত দরদ যে ? চান কর্‌বি, চুল বাঁধ্‌বি, কাপড়টাও বদ্‌লাবি ! তোর হল কি ?

মায়া। তোর একটা দার্জ্জিলিং-এর ল্যাপ্‌চা ছোঁড়ার সঙ্গে বিয়ে হবে, তুই না হয় ও সব বাদ দিতে পারিস্ কিন্তু আমি বাঙালী।

এই কথার পর দুই ঘর হইতে দুইটি মিষ্ট হাসির সুর উঠিয়া বাড়ীটি ভরিয়া দিল।

মায়া তাহার কাজ সারিয়া লইবার জন্য চলিয়া গেলে চেয়ারে বসিয়া থাকিতে থাকিতে কমলা যেন কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বহু জনাকীর্ণ সহরের অবরুদ্ধ আলোবাতাস এবং চারি পাশের শ্রীহীন প্রাচীরের সীমা অতিক্রম করিয়া সে আসিয়া বসিল, ছবির ফ্রেমের মত এক বাতায়ন তলে। সম্মুখে তাহার কুয়াসার আবরণে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপরেখা ! পাহাড়ের কোলে আলো-ছায়ার লুকোচুরি, মেঘের খেলার বিরাম নাই, অপ্রত্যাশিত বর্ষণ। এই স্বপ্নপুরীর শোভায় ও সৌন্দর্য্যে মন তাহার যখন পরিপূর্ণ ; তাহার কানের কাছে কে বলিয়াছে—চল না কা'কেও না বলে একটু পালাই, যেদিকে খুশী, দুচক্ষু যায়।—'

সে উঠিয়াছে। তাহার পাশে পাশে মুগ্ধচিত্তে নিঃশব্দে চলিয়াছে। কঠিন পাথরের উপর সবুজ মখমলের আস্তরণের মত গুল্ম এবং পাহাড়ী ফুলের অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিবার সময় কাহার হাতের নিবিড় কঠিন কম্পিত স্পর্শে সে জ্ঞান হারাইয়াছে ! মনের কথা প্রকাশ করিতে না পারিয়া, কাহার মুখের দিকে সে শুধু একবার চাহিয়াছে। পাগল হওয়ার আঘ্রাণে কাহার উদ্বেলিত বক্ষের স্পন্দন সে আপনার অতি নিকটে অনুভব করিয়াছে !—কে আদর করিয়া তাহাকে ডাকিয়াছে—কমলা—'

এমনি স্বপ্ন-মাধুরীভরা জীবনের ছবি একটির পর একটি তাহার মনের দ্বারের কাছে উঁকি দিয়া আধ ঘুম আধ জাগরণের মধ্যে তাহার প্রাণ পুলকে

ভরিয়া দিতে ছিল। ধীরে ধীরে সে যেন স্বপ্ন-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে! অফুরন্ত সুখ, অনির্ব্বচনীয় পরিপূর্ণ শান্তি! . . .

তাহার পর কোথায় গেল সে রূপ-হাসি-গানের জগৎ, কোথায় গেল সে স্বপ্নপুরী! কোথায় গেল বুকভরা তৃপ্তি, কোথায় রহিল তরুণ প্রাণের সহস্র রঙ্গিন কল্পনা! আত্মীয়ের গঞ্জনা, অনাত্মীয়ের বিস্ময়, বন্ধুর বিদ্রূপ, শত্রুর প্রাণান্তকারী জ্বালাভরা উপহাস . . . সহস্র জিহ্বার তীব্র-হলাহলে প্রাণের মুঞ্জরিত আশালতা পুড়িয়া নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে! অবসাদের ভারে প্রিয়ের মুখে চোখ তুলিয়া তাকান হয় নাই! দিনের পর দিন সে একটি চাহনি একটি হাসির আভাস দেখিবার আশায় আশায় থাকিয়া অভিমানে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।—তাহার পর কত দিন কাটিয়া গিয়াছে। প্রিয় তাহার দেশের সেবায় জীবন দান করিয়াছে, তাহার কথা ভাবিবার আর সময় নাই! . . . কিন্তু এইবার এতদিন পরে—

সহসা কমলার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। কিন্তু সেই স্বপ্নরাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিতে অনেক সময় লাগিল। তাহার চারিপাশের দেওয়াল, ছবি, চেয়ার টেবিল সমস্তই কেমন বিসদৃশ ঠেকিতে লাগিল। উহাদের সে চিনে না! জোর করিয়া চোখ মেলিতে গিয়া দেখিল দরজার কাছে একজন মানুষ ঘরের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে! সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিমলের কথা মনে হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া মানুষটির কাছে আসিয়া দেখিল বিমল নয়, মুকুল! হাসিয়া বলিল—আসুন ভিতরে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন নাকি?—

মুকুল বলিল—না, কয়েক সেকেণ্ড হবে।

কমলার সহিত মুকুল ঘরে ঢুকিতেই অপর দিক হইতে মায়াও সেই ঘরে আসিয়া মুকুলকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

মুকুল বলিল—খুব আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছি আপনাকে নিশ্চয়ই?

মায়া হাসিয়া বলিল—হাঁ।

মায়ার মাথার চুলে একটি সদ্যছিন্ন সোনন-চাঁপার দিকে চাহিয়া মুকুল বলিল—আপনাকে একটা জিনিস্ দেখাতে এসেছি।—যখন স্কুলে কাজ শিখ্‌তাম, মাষ্টাররা আমাদের মরচেধরা মনের ওপর যে শিরিষ কাগজ ঘস্‌তেন, তার নাম আমরা দিয়েছিলাম Memory drawing—একটা কোন জিনিস কিছুক্ষণ আমাদের সামনে ধরে সেটাকে আবার লুকিয়ে রেখে তাঁরা বলতেন, আঁক।

—ক্লাসে এ বিদ্যায় আমার বেশ একটু হাত যশ ছিল একথা আপনিও বিশ্বাস করবেন!—কমলা দেবী, আপনি তাহ'লে Judge হ'ন?—

অত্যন্ত হাল্‌কাভাবে কথাগুলি বলিতে বলিতে মুকুল তাহার জামার পকেট হইতে একটি মোড়ক বাহির করিল।

কমলা বলিল—কিন্তু আমি ত ছবির কিছুই বুঝি না।

মুকুল বলিল—ছবি যদি সত্যি হয়, ও দেখ্‌লেই বোঝা যায়, গলতি যেখানে থাকে সেইখানেই বোঝ্‌বার অসুবিধে, ব্যাখ্যারও শেষ থাকে না। যাই হোক্‌ দেখুন।

মোড়কের উপরকার কাগজ খুলিয়া মুকুল একখানি ছবি মায়া এবং কমলার মাঝখানে ধরিল। সঙ্গে সঙ্গেই কমলা বলিয়া উঠিল—ও মা! এ যে-এ যে ঠিক! ও মায়া দেখ্‌!—

মায়া দেখিল, এক নারীমূর্ত্তি, আলুলায়িত কেশগুচ্ছে মুখের দুইপাশ ঢাকা, মধুর একটি হাসির শান্ত শ্রী, চোখের পাতা নীচু, হাতে মায়ার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ফুলের মধ্যে একটি—দোলন চাঁপা!

ছবিখানি হাতে লইয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে মায়া বলিল—অল্প কয়েকটি রেখার ভিতর দিয়ে এতখানি প্রকাশ করা যেতে পারে, ভারি আশ্চর্য্য লাগে!

মুকুল বলিল—রেখা জিনিসটা সংক্ষিপ্ত হ'লেও ভাবায় খুব বেশী। একটু হাসি, চোখের চাহনি একটি, এ সব কত ক্ষণিক, অথচ ওর ভিতরকার সব ইতিহাসটুকু যেন ঐ রেখার বুকে লেখা থাকে, আর সে সব একেবারেই দুর্ব্বোধ্য ঠেকে না, খুব সহজ মনে হয়, নয় কি?—

কমল বলিল— আচ্ছা এই ফুলটাই আঁক্‌লেন কেন?—

মুকুল। বিশেষ কিছু ভেবে আঁকি নি; আমার নিজের ঐ ফুলটা খুব ভাল লাগে আর ভারি একটা সহজ সৌন্দর্য্য ওর আছে, তা ছাড়া এটা আমি দেখেছি চেষ্টা ক'রে কিছু আঁকতে বা গড়্‌তে গেলেই জিনিসটা কেমন যেন আড়ষ্ট হ'য়ে যায়!

কমলা। কেন তা হ'বে? সুন্দর করতে চেষ্টা কর্‌লে খারাপ কেন হ'বে বুঝ্‌তে পার্‌লাম না!

মুকুল। তা ঠিক বোঝাতে পার্‌ব না, কিন্তু মানুষ যখন খুব সাজ-পোষাক করে এই কথাটাই তখন আমার মনে হয়; সাজা বা সাজানোর মধ্যে রূপ অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায়। খুব চট্‌ছেন নিশ্চয়ই?—

কমলা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—ভয়ানক চটেছি।—এর পর আর ভাল

ক'রে হয়ত সাজ্‌তে পার্‌ব না। মানুষের ভুল ভেঙে দেওটা অন্যায় মুকুলবাবু।—সাজ্‌লে যদি খারাপ দেখায় তাহ'লে ছবির মত দেখাব কি ক'রে?

তিন জনেই হাসিয়া ফেলিল।

মায়া মুকুলকে বলিল—বসুন।

মুকুল একটি চেয়ারে বসিতে গেলে কমলা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—না না, এ ঘরে না মায়া, তোমার ঘরে যাও; এখানে চারিদিকে সব জিনিস এলো মেলো রয়েছে—মানে মুকুলবাবুর মতে সুন্দর রয়েছে, এখন আমার কুরুচির পরিচয় ওদের ওপর কিছু দিতে চাই—ভাগো শিগ্‌গির এখান থেকে, এই ধূলো উড়্‌ছে—

কমলা চেয়ার টেবিল ঝাড়-পোঁছ্‌ আরম্ভ করিল। মায়া বলিল—তোর কাজ কি আর সারা হয় না! এতক্ষণ কর্‌ছিলি কি?—

কমলা। ঘুমাচ্ছিলাম। মুকুলবাবু, আপনি ঐ ঘরে যান না, আমি কাজগুলো সেরে নিই—

মুকুলকে লইয়া যাইতে যাইতে মায়া বলিল—কে তোর সঙ্গে পার্‌বে!

ঘরে আসিয়া মায়ার নির্দ্দেশিত চেয়ারে বসিয়া মুকুল বলিল—আমি আপনার কাছথেকে একটি অনুমতি নিতে এসেছিলাম।

মায়া বিস্মিত হইয়া বলিল—অনুমতি! কিসের?

মুকুল। এই ছবিখানা আমি আপনাকে দিতে চাই, তার।

মায়া হাসিয়া বলিল—আমি ত ভাবছিলাম এটা চেয়ে নেবো। ভিক্ষে করায় ভারি একটা লোভ আছে।

মুকুল। লোভ নয়, আনন্দ। যাদের চাইবার দরকার হয় না, সব আপনা হ'তে হাতে এসে পৌঁছায় তাদের মাঝে মাঝে এটা হয়। কিন্তু আমি এটা আপনাকে দিতেই এসেছি নিজের থেকে। যাদের ভাললাগে, পরিচয় পাই, কিছু না দিয়ে তাদের কাছথেকে বিদায় নিতে পারি না।

মায়া। বিদায়, কেন?—

নিজের মুখের ঐ দুটি কথার মধ্যে যে একটি আবেগ মিশ্রিত ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল, তাহাতেই তাহার মুখখানি রুডাইয়া দিল। মুকুলের কাছেও ইহা ধরা পড়িয়াছে কি না তাহা দেখিবার জন্য চকিত ভাবে মুকুলের চোখের দিকে চাহিতেই মায়া দেখিল, অগোচর ভাবে তাহার মন যেন কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিল—পরিচয়ের কথা কি বলছিলেন? কি পরিচয় পেয়েছেন আমার?—

মুকুল বলিল—অসম্পূর্ণ। সমস্ত পরিচয়ের মধ্যে এইটাই সবচেয়ে তৃপ্তির। অসম্পূর্ণ পরিচয়ে বিস্ময় আর শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ মাত্রায় থেকে যায়, লাভ ক্ষতি মান অভিমানের অবসর হয় না।

মায়া। সেইটাই কি সব? আপনি কি তাই ভালবাসেন বা চান?—

মুকুল। না।

মায়া। তবে?—

মুকুল কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—সে আমি ত ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু ঐটুকুর বেশী কিছু মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাশা করবার অধিকার আমার নেই।

মায়া প্রতিবাদের সুরে বলিল—অধিকার?—

মুকুল বলিল—হাঁ।

কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই মুকুলের মুখের সমস্ত আনন্দের ভাবটি ম্লান হইয়া গেল; মায়ার মনে পড়িল সেই প্রথম দিনের কথা।—করুণার স্নেহের আহ্বানে ঠিক এমনি একটি অসহায় বেদনার ছায়া মুকুলের মুখে সে দেখিয়াছিল। তাহার চোখের সে চাহনিটি মায়ায় চির গর্ব্বিত নিষ্ঠুর মনের উপর গভীর দাগ কাটিয়া গিয়াছিল, যে ক্ষতের দিকে তাকাইয়া, যে বেদনাকে লইয়া আপনার মনের মত করিয়া সে উপভোগ করিয়া আসিয়াছে, প্রাণপণে অন্যের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল এতদিন, তাহাকেই আজ এত নিকটে পাইয়াও এত আপনার অনুভব করিয়াও একান্ত নিরপেক্ষভাবে বসিয়া থাকিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল।

কিন্তু ধরা যাহারা দেয় নাই বা ধরা দিবার অবসর যাহাদের ঘটিয়া উঠে নাই, মনের গোপন কথাটির খবর তাহারা জানিবে বা জানাইবে কি প্রকারে?

একান্ত নির্লিপ্তভাবে মায়া বলিল—কোথাও বেড়াতে যাবেন বুঝি?—

মুকুল মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হাঁ, তাই একরকম। মাঝে মাঝে এমনি কিছুদিনের মত পালাই।

মায়া উৎকণ্ঠার সুরে আবার বলিয়া ফেলিল—কিছুদিনের মত?

মুকুল। হাঁ।

মায়া। কোথায় যাবেন?—

মুকুল। এখনও তা ঠিক করি নি, আজ রাতে ভাব্‌ব। পাগল ভাব্‌ছেন?—

মায়া স্নিগ্ধ চোখে মুকুলের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার কি তাই মনে হয়, যে আমি—

মায়াকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া মুকুল বলিল—আচ্ছা দেখুন ত আমাকে ভাল ক'রে, আমাকে কি মনে হয় আমি বাঙালী?—দেখুন আমার যে চোখ, একি বাঙালীরই সম্ভব?—মুখ নাক আমার শরীরটা কি বাঙালীর মতই?—আপনি আমায় বেশী দেখেন নি, তবু আপনার কি মনে হয়? এমন কিছু কি আমার মধ্যে আছে যা অন্য যে কোন দেশের মানুষের থাকা সম্ভব, শুধু বাঙালীর ছাড়া?—

প্রত্যেকটি প্রশ্নের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুকুলের চোখের দৃষ্টির তীব্রতা যেন বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার গলার স্বর অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং প্রত্যেকটি প্রশ্ন অদ্ভুত রকমের উদ্বেগপূর্ণ।

মায়ার অসমাপ্ত কথাটি তাহার নিজেরই বুকে গুমরিয়া উঠিল—পাগল! পাগল! সঙ্গে সঙ্গে থর্ থর্ করিয়া তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল।

মুকুল বলিতে লাগিল—বলুন, আমি কা'কেও কোন দিন জিগ্‌গেস করি নি, আমার জিগ্‌গেস কর্‌বার কেউ নেই! আপনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন তাই যাবার বেলায় আপনাকেই বিশ্বাস ক'রে একটি কথা জিগ্‌গেস ক'রে যাচ্ছি! বলুন, আমি নিজের কাছ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর পাই নি—আমি জানি না!

মায়ার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। মুকুল বলিতে লাগিল—আমাকে ভাল ক'রে দেখুন, কথা বল্‌তে বল্‌তে আমার কাঁধ দু'টি যে রকম করে নাড়াই, চল্‌বার সময় আমার শরীর যে ভাবে দোলে, আমার চুলের রং—এ সবই কি বাঙালীর? বলুন, আমার সময় অল্প; বেশী থাক্‌লেও তাকে আমার অল্প ক'রেই নিতে হবে, দুদিনের পরিচয়ই আমার চিরদিনের সম্বল। খুব অল্প সময় মায়াদেবী, এই শেষ সন্ধ্যাটুকু।—

মায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কিন্তু তাহার বুকের উপর হইতে যেন এক জগদ্দলশীলা নামিয়া গেল। আপনাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই যেন তাহার মন বার বার তাহাকে বলিতে লাগিল—পাগল নয়—পাগল নয়। দুঃখী ব্যথাতুর—পরিত্যক্ত! করুণা এবং আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কথা কহিবার শক্তি তাহার ছিল না তাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মুকুল বলিল—বলুন, আমাকে কোন ক[illegible] কি বল্‌তে পারেন না?

মায়া বলিল—কি বল্‌ব? আমি বুঝ্‌তে পারছি সব, কিন্তু বল্‌বার কিছুই পাচ্ছি না!

মুকুল হতাশাভরা কণ্ঠে বলিল—কি আশ্চর্য্য এই পৃথিবী! কত সুন্দর কত নিবিড় তার পরিচয়ের সম্বন্ধ! একের সঙ্গে আর একজন কত ঘনিষ্ঠভাবে বাঁধা! একজনকে আঘাত দিলে আর একজন ব্যথা পায়! মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধু স্ত্রী, প্রিয়া . . . সম্বন্ধের আর শেষ নেই! তুমি আমার আমি তোমার এই কথাগুলোর কি অপূর্ব্ব সুর! দেশের নামে, মানুষের নাম, ধর্ম্মের নামে, জাতির নাম, সঙ্ঘ, সম্প্রদায়, এমন কত শত ছোট বড় জিনিস, মানুষে মানুষের সম্বন্ধকে সহস্র স্নেহের হাত দিয়ে ঘিরে রেখেছে, কিছুতে একজন আর একজনকে ছাড়ে না! শত্রুকে যে আঘাত করে, সে শুধু তাকে আপনার করতে পারে না বলেই, যে মুহূর্ত্তে জয় করে, সেই মুহূর্ত্তেই মিলন! কি সুন্দর এই সম্বন্ধ, না মায়াদেবী?—

মুকুল কিছুক্ষণ তাহার উন্মত্ত দৃষ্টি দিয়া মায়াকে দেখিয়া বলিল—বড় সুন্দর লাগে আমার—আমি জৈন, আমি মুসলমান, আমি হিন্দু, আমি বৌদ্ধ, এমন কত নাম দিয়ে মানুষ আপনার পরিচয় গর্ব্বের সঙ্গে জগতে প্রচার করে। সবাই নিজের নিজের পরিচয় জানে।—কিন্তু আর না, আপনাকে আমি কষ্ট দিচ্ছি, যদিও মানুষকে জ্বালাতন করতে আমার খুব ইচ্ছে করে, মানুষের কত ছোট খাট তুচ্ছ কথা জান্‌তে চাই, কিন্তু পরিচয় হবার পূর্ব্বেই আমায় সরে যেতে হয়, তাই কিছুই আমার জানা বা শোনা হয় না।—আমায় বিদায় দিন, অপরাধ যদি করে থাকি তা ভুলবেন না, এই আমার অনুরোধ। মানুষের অশ্রদ্ধা জিনিসটাই আমার একমাত্র বন্ধন মায়াদেবী।

মুকুল চলিয়া যাইবার জন্ম উঠিয়া দাঁড়াইল।

মুকুলের কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার চোখের উপর চোখ তুলিয়া মায়া চাহিল।

মুকুল ম্লান হাসিয়া বলিল—বিদায়—

মায়া বলিল—না।

মুকুল। না? কিন্তু কালই যে আমি যাচ্ছি—

মায়া। তা হ'লেই বা কিন্তু বিদায় দেব কেন? যখন ফিরবেন, যে দিন ফিরবেন, আমার কথা যদি মনে হয় আস্‌বেন আমার কাছে।

মুকুলের মুখে আবার তেমনি ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আপনার চোখের অশান্ত বাষ্পবারি রোধ করিবার জন্য মুখ ফিরাইতে গিয়া মায়া দেখিল, বসিবার ঘরে প্রবেশ করিবার দ্বারের কাছে কে দাঁড়াইয়াছিল, সে ধীরে ধীরে নীচে নামিবার সিঁড়ির দিকে চলিয়া গেল।

মুকুল বলিল—সম্ভবত আপনার কাছে কেউ এসেছিলেন। আমি আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করে দিলাম যে!

মায়া বলিল—উনি বিমল বাবু।

মুকুল। বিমল! ও চলে গেল যে! ডেকে দেব?

মায়া হাসিয়া বলিল—না।

ভয় চকিত দৃষ্টি মায়ার মুখের উপর রাখিয়া মুকুল বলিল—বড় অন্যায় হল আমি জান্‌তাম না—

মায়া। কোন অন্যায় আপনার হয়নি।

মুকুল সহজ স্বরে বলিল—হ'লেও আর উপায় নেই, একবার কমলাদেবীকে ডেকে দিন তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।

মায়া কমলাকে ডাকিয়া লইয়া আসিলে মুকুল বলিল—ঘরে ঢুকেই আপনাকে নমস্কার করেছিলাম যাবার সময়ও সেটা সেরে নিচ্ছি—

কমলা হাসিয়া বলিল—সে ত হ'ল, এখন বলুন কাল আবার আস্‌ছেন কি না?

মায়া বলিল—উনি কাল এখান থেকে চলে যাচ্ছেন, কিছুদিন বাইরে থাক্‌বেন। এই ছবিটা আমায় দিয়ে গেলেন।

কমলা। বেশ ভাগ-বাটুয়া হ'ল ত! ও পেল ছবি, আর আমি পেলাম নমস্কার, বা! চিঠি লিখ্‌বেন ত পৌঁছে?

মুকুল অবাক হইয়া বলিল—চিঠি?

কমলা। হাঁ লিখ্‌বেন না?

মুকুল। ওটা আমার আসে না কোন দিন, আমি চিঠি লিখতে পারি না।

কমলা। পারেন না, পার্‌বেন। বিদেশে থাক্‌লে ঘরের জন্যে মন কাঁদেনা?

মুকুল। ঘর?

কমলা। হাঁ, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু—যারা আপনাকে ভাল বাসেন, অল্প কয়েকটি কথার ভিতর দিয়ে যাদের আপনি অনেকখানি কাছে টেনে এনেছেন আপনার এই সবার কাছ থেকে দূরে থাক্‌বার চেষ্টাটা যাদের মনে ব্যথা দেয়, যারা আপনাকে কাছে পেতে চায়, জানি না, আপনি এইটাকে সহ্য করেন

কি না, কিন্তু মানুষ চিরদিনই মানুষ, নতুন নতুন পরিচয়ের মোহ সে সহজে কাটাতে পারে কি? মানুষের কাছে মানুষ যদি ধরা দেয়, সেটা কি খুব অপরাধের হয়? অন্যের কথা আমি জানি না, কিন্তু আমার এ দুর্ব্বলতা আছে। মানুষকে কাছে পেয়েও যদি ধরে রাখ্‌তে না পারি খুব কষ্ট হয়।

কমলা সহসা থামিয়া গেল। মুকুলের বুভুক্ষিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

মায়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে টেবিলের উপরকার বই ইত্যাদি লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছে।

কমলার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি নামাইয়া ধীরে ধীরে মুকুল বলিতে লাগিল—আমাকে উদ্দেশ ক'রে এমন কথা বিশেষ কা'কেও বল্‌তে শুনি নি, কিন্তু শোন্‌বার ইচ্ছে এত করে—আমিও মানুষ, কমলাদেবী, সাধারণ মানুষের মত আমারও সব পেতে ইচ্ছে করে, সকলকে ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে, সকলের কাছে থেকে, সকলকে সাহায্য ক'রে, সকলের দুঃখ-সুখের ভাগ নিয়ে, সকলকে তৃপ্তি দিয়ে আনন্দ দিয়ে আমিও চল্‌তে চাই—

কমলা। তবে?—

মুকুল। আর কোন প্রশ্ন আমায় কর্‌বেন না, আমার এই অনুরোধটুকু রাখুন।

কমলা একবার মুকুলের দিকে চাহিয়া বলিল—আচ্ছা রাখ্‌লাম। কিন্তু কিছু অত্যাচার সহ্য কর্‌তে হ'বে।

মুকুল হাসিয়া বলিল—অত্যাচার?—

কমলা। হাঁ।—আপনাকে কিছু খাওয়াতে চাই, না বল্‌তে পাবেন না। বল্‌বার অধিকারও আপনার নেই, কারণ আমি আপনার খুসীর ওপর হাত দিই নি।—মায়া তুই ওঁকে বসিয়ে রাখ্‌ একটু, আমি আস্‌ছি।

কমলা চলিয়া গেল।

মুকুল মুখ তুলিয়া মায়ার দিকে চাহিয়া বলিল—আচ্ছা এটা কি আপনার মনে হয়েছে কোন দিন যে, একজন মানুষ আর একজনের সঙ্গে পরিচয়ের ভিতর দিয়ে নবজন্ম লাভ করে?—

মায়া বলিল—আমি এটা বিশেষ ক'রেই মানি আর বিশ্বাস করি, তাই কোন পরিচয়কেই অসম্পূর্ণ থাকতে দিতে ব্যথা পাই। এই পরিচয়টা দুঃখ বা অপমানের হ'লেও তা সহ্য হয়। একজনকে পরিপূর্ণ ভাবে জানা, পরিস্কার ক'রে বুঝ্‌তে

পাওয়া কি কম লাভ? তাকে কি উপেক্ষা করা যায়?—তবে মানুষকে পাওয়া না পাওয়াটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। ও দুটো জিনিস অন্ধের মত, বিশ্বাস ওদের চোখ, সেই ওদের পথ দেখায়, ওদের ওপর আমাদের ইচ্ছের কোন হাত নেই।

মায়ার এই কয়টি কথায় গম্ভীর নির্লিপ্ত এবং উদাস সুর মুকুলের বুকে বাসনা-বেদনার প্রদীপটি জ্বালিয়া দিল সেই সঙ্গে অমানুষিক একটা অভিমান এবং যা কিছু সমস্তের উপর অবজ্ঞায় যেন তাহার মন ছাইয়া গেল! হিংস্র দৃষ্টি মায়ার চোখের উপর তুলিয়া সে বলিল—কি হবে কথার পর কথার জাল বুনে? পরস্পরকে কাছে টান্‌বার এ আয়োজন বৃথা, সম্পূর্ণ বৃথা মায়া দেবী। আমার পরিচয় চান?—কি পরিচয় পাবেন?—এই রক্ত মাংসের শরীরটার সৃষ্টির প্রথম দিন হতে আপনাদের ভগবান আমার সব পরিচয় কেড়ে নিয়েছেন। আমার জন্ম-দায়িনী, পথের ধারের আবর্জ্জনার স্তূপ!—আমি জানি সেই আবর্জ্জনার স্তূপের মধ্যেই আমার জীবনের উৎস লুকান ছিল, সেই আমার পৃথিবীর প্রবেশ দ্বার, সেই আমার জননীর কোল—সেই পথ আমার একমাত্র আপনার, আমার গৃহ, আমার সব। এই পথকে আশ্রয় ক'রে যে সব মানুষ পৃথিবীতে আসে তাদের জন্যে করুণা ক'রে আপনারা যে আশ্রম ক'রে রেখেছেন তারই একটিতে আমি বড় হয়েছি। আমি নাম-গোত্র-বংশ হীন, কি পরিচয় আমার আশা করেন আপনারা? আমার এই মুকুল নাম কে রেখেছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁকে প্রণাম করি, কর্ম্ম জগতে প্রবেশ করতে হ'লে, জগতের মানুষের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করতে হ'লে কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করতে হয় এই সাঙ্কেতিক শব্দও তিনি আমায় একটি কাগজে লিখে দিয়েছিলেন—পিতা—শঙ্কর দেব, মাতা মৃণ্ময়ী···এই সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার ক'রে নির্বিঘ্নে, নিরাপদে আমি পৃথিবীর পথ দিয়ে চলেছি কিন্তু ফাঁকি দিয়ে চলেছি মায়াদেবী, কি বিরাট কি জঘন্য এই প্রবঞ্চনা! প্রত্যেকটি নিশ্বাস ফেলি আর এ প্রবঞ্চনার কথা আমার বুকে আগুন জ্বাল্‌তে থাকে, তাই কা'কেও নিতে পারি না, নিজেকে কারো হাতে দিতেও লজ্জা পাই।

বড় দুইটি অশ্রুবিন্দু মায়ার চোখ হইতে বাহির হইয়া তাহার গালের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল কিন্তু সে তাহা ঢাকিবার বা মুছিবার কোন চেষ্টা করিল না।

মুকুল বলিল—আর আমাকে দুর্ব্বোধ্য লাগ্‌ছে কি?—

মায়া। না। কাল সকালেই আপনি যাবেন?—

মুকুল। সকাল?—অত দেরী করবারও সার্থকতা আছে মনে হয় না। আজ রাতেই বিদায় নিতে পারি।—পৃথিবীর সব জায়গা আমার কাছে সমান, পৃথিবীর সব মানুষ আমার কাছে সমান, আমি কারো নই। আমার কেউ নয়।

মায়ার চোখ ছাপিয়া আবার অশ্রু-বন্যা নামিল। মুকুল তাহা দেখিয়া বলিতে লাগিল—তবু কি সুন্দর! কি সুন্দর এই পৃথিবীর মানুষ, কি সুন্দর তার হাসি, কি সুন্দর তার চোখের জল!—আমার সব মনে আছে, সব মনে থাকবে। বাইরে থেকে যা পাই, যক্ষের সম্পত্তির মত তা একা আমি আগ্‌লে নিয়ে রাত জাগি। বিদায় দিন আমায়—

মায়া বলিল—যান, কিন্তু আপনাকে কাছে পাবার আপনার কথা শোন্‌বার ক্ষুধা আমার মনে রয়ে গেল।

মুকুল অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—কি সুন্দর মানুষের মুখের কথা! আমার বাসনাকে বুক ভরে অনুভব করবার অধিকার আমার আছে, তাকে প্রকাশ করবার নয় মায়াদেবী—আপনাদের সকলকে প্রণাম জানাচ্ছি।

আর কেহ কোন কথা বলিল না, শুধু নিরবে দুই জনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে কমলা একরাশ খাবার লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—সব খেতে হবে, একটি যদি ফেল্‌বেন, মজা টের পাবেন। মায়া তুই খাওয়া, আমি ঠাকুরকে কতকগুলো কথা বুঝিয়ে দিয়ে আসি।

মুকুল হাসিয়া বলিল তাহ'লে ঐ রইল সব। আমি হাত গোটালাম।

কমলা বিষম রাগিয়া উঠিয়া বলিল—তা আর নয়?—

মুকুল। আপনি বসুন আমি খাচ্ছি, জুলুমটা একতরফা হ'বে কেন?

মায়া এবং কমলা দুই জনে তাহাদের এই নব পরিচিত বন্ধুটিকে ঘিরিয়া সহস্র আদর আব্দার অনুযোগের ভিতর দিয়া এমন একটি মায়াজাল বিছাইয়া দিল যে, মুকুল মনে মনে বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছিল এ জাল ছিন্ন করিবার শক্তি মানুষের নাই। এত আনন্দ সে কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আজ কেন করিল, ইহাই তাহার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হইতেছিল।

আহারের পর বিদায় লইবার জন্য সে উঠিয়া দাঁড়াইলে কমলা আবার বলিল—চিঠি দেবেন?—

মুকুল। মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়কে নিবিড় ক'রে তোল্‌বার ও একটা যন্ত্র, না কমলা দেবী?

কমলা। অত শত বুঝি না, আপনাকে যতটুকু জেনেছি তাতে বিশেষ ক'রে ভাল লেগেছে। বিদেশে যাচ্ছেন, অসুখ বিসুখ আপদ বিপদের অন্ত নেই, খবর না পেলে অনেক রকমের কথা মনে জাগ্‌বে। মানুষ একবার যাকে আপনার ক'রে ভাবে, তাকে সহজে কি মন থেকে বিদেয় দিতে পারে?—

স্বপ্নাবিষ্টের মত মুকুল বলিতে লাগিল—লিখ্‌ব কিনা জানিনা কিন্তু আমার খুব লিখ্‌তে ইচ্ছে করবে, আর আপনাদের কথা সব সময় আমার মনে থাকবে।

কমলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—অমন ক'রে কথা বল্‌ছেন কেন? এ যেন চির বিদায় নেবার সুর!—

মুকুল। তা-ই।

কমলা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—কেন?—

মুকুল। আমার একটা বদ্‌ রোগ—যতদিন মানুষের কাছে অপরিচিত থাকি, বেশ থাকি, ভালবাসা পেলেই আর টিঁকতে পারি না। আপনাদের ভালবাসা আমায় দেশ-ছাড়া করছে।

কমলা অভিমানের সুরে বলিল—এই কথা?—বেশ আমরা আর আপনাকে বিরক্ত করব না, আপনি থাকুন।

মুকুল হাসিয়া বলিল—তা আর হয় না, আমিও ভালবাস্‌তে সুরু করেছি।

কমলা। এ কি রকম যুক্তি। ভালবাস্‌লে মানুষ দূরে যায়?—

মুকুল। আমার জীবন সব যুক্তি তর্কের বাইরে। আপনাদের কোন বিধি বিধান আমার জন্যে নয়।

কমলা। স্নেহ, বন্ধুত্ব?—

মুকুল। বিধাতার উপহাস বলে মনে হয়।

কমলা। আপনাকে ভাললাগ্‌তে আমার মোটেই সময় লাগে নি কিন্তু আপনাকে বুঝ্‌তে আমার দেরী হবে।

মুকুল। এই সঙ্গে আমার আর একটা কথা মনে রাখ্‌বেন—সব চেয়ে বেশী দুঃখ পাই মেয়েদের কাছে এসে দাঁড়ালে।

কমলা। কিন্তু অশ্রদ্ধা ত করেন না?—

মুকুল। অশ্রদ্ধা ?—প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মাথাটা আপনাদের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়্‌তে চায়।

কমলা। এ কোন দেশী যুক্তি!

মুকুল। বলেছি ত, আমার মধ্যে কোন যুক্তি তর্ক নেই।—সব চেয়ে বেশী আনন্দ যেখানে আছে, হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেলে—ব্যথায় বুক টন্ টন্ ক'রে ওঠে!—এ ব্যথা আমার কোন্ যুক্তির অধীন ?—

সহসা মাথা নোয়াইয়া মায়া এবং কমলাকে নমস্কার করিয়া মুকুল ঘরের বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল।

মায়া এবং কমলা মুকুলের সহিত বাহিরে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

কয়েক ধাপ নামিয়াই কমলা ছেলে-মানুষী সুরে বলিল—মুকুলদা, তুমি একটু দাঁড়াও না ভাই, আমি একটা জিনিস তোমায় এনে দিই, একটু দেরী হবে, সেটা খুঁজে বার্ কর্‌তে হবে কি না।—যেও না আমি না-আসা পর্য্যন্ত—

সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

বিস্ময়-স্তম্ভিতভাবে মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল মুকুল—ও কি ?—

মায়া হাসিয়া বলিল—বিশেষ কিছুই না, খুব স্বাভাবিক আত্মীয়তায় একটা সাঙ্কেতিক শব্দ মাত্র—যার ভিতর দিয়ে স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা এমনি কতকগুলো মানুষের পূজার ভাব আমরা প্রকাশ করি।—নেওয়া না-নেওয়া আপনার ইচ্ছে।

মুকুল। কি সুন্দর!—

মায়া। কোন্‌টা ?—

মুকুল। ওর মুখের ঐ কথাটা—মুকুলদা . . . পৃথিবীর মানুষের আজ আমি আত্মীয় . . . আমি ভাই!—এতদিন মনে হ'ত আমি বেঁচে আছি মৃতের পৃথিবীতে—সুখ শান্তি তৃপ্তি স্বার্থ এই সবের মধ্যে সবাই অনন্তকাল ধ'রে মরে আছে, আমাকে তাই কেউ দেখ্‌তে পায় না!—

দুইজনে ধীরে ধীরে আরও কয়েকটি ধাপ নামিয়া আসিল। সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া কমলার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে মায়া সহসা মুকুলের হাতের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল—মুকুল—

ভয়-বিহ্বল দৃষ্টি মায়ার মুখের উপর তুলিয়া মুকুল চাহিয়া রহিল।

আজ সন্ধ্যার প্রত্যেকটি কথা, মানুষের প্রত্যেকটি ব্যবহার, তাহাকে যেন মন্ত্র

মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়া ছিল! এমন করিয়া জগতের পরিচয় সে কোন দিন পায় নাই, মানুষের স্নেহকে, মানুষকে, এত কাছে সে কখনও অনুভব করে নাই। কোন নারী স্পর্শ দিয়া এমন করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইবার প্রয়াস করে নাই! এমন সুরে কেহ তাহাকে ডাকে নাই! বিস্মৃতির অতল গহ্বর হইতে হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া লইবার জন্য যেন তাহার জননী তাহাকে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল . . . জন্মপথিকের হারাণ পথিক-বধূর এ যেন আনন্দের আর্ত্তনাদ! প্রিয়ের সন্ধান সে পাইয়াছে . . . তাহার হাতখানি নিবিড় ভাবে ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে যেন টানিয়া লইয়া চলিয়াছে! কিন্তু কোথায়, তাহা যেন সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না! কিছু বুঝিবার ক্ষমতাও যেন তাহার নাই!—সে আবার শুনিল—মুকুল—

বিদ্বেষপূর্ণ চাপা কণ্ঠে মুকুল বলিল—কি চাও?—

মায়া। তোমাকে ছেড়ে দিতে পার্‌ব না।

মুকুল। কি করবে?—

মায়া। ধরে রাখ্‌ব।

মুকুল তাহার মুখে অমানুষিক হাসির রেখা টানিয়া বলিল—অসম্ভব। কোন আশ্রয়, কোন বন্ধন আমি সহ্য করতে পারি না।

মায়া। কিন্তু আমরা মানুষ, মাটির পৃথিবীতে আমাদের বাস। আমাদের ওপর দিয়ে চলে যেতে পার, কিন্তু দাগ মুছে নিতে পার না পথিক।

মায়ার কথায় সহসা মুকুল উৎফুল্ল হইয়া বলিল—পথিক—পথিক! চমৎকার—নাম! সত্যি আমি পথিক। আমি ভালবাসি পথকে, তাই শুধু সামনের দিকে এগিয়ে চলি।

মায়া। আর পথ ভালবাসে পথিককে সে কথা মনে রেখো, পথিকের পায়ের চিহ্ন তার বুকে আঁকা হ'য়ে যায়।

মুকুল অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল—কিন্তু আর নয়, আর একটি কথা নয়—এই শেষ।

মায়া সরিয়া আসিয়া বলিল—যাও।—তোমার পথ আট্‌কাব না।

মুকুল। ব্যথা পেলে?—

মায়া। ভয়ানক।—প্রকাশ করতে পারছি না।

মুকুল ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—কিন্তু ওটা তোমায় আমি দিতে চাই নি।

মায়া। তা জানি।

দুই জনেই কিছুক্ষণ নিরব হইয়া রহিল। সহসা মায়া মুখ তুলিয়া বলিল—বিদায় বেলায় তোমায় কাছে একটা অনুরোধ জানাচ্ছি—আমাকে এমন কিছু দিয়ে যাও, যা ভুলব না কোন দিন, যার দাগ কলঙ্কের মত অক্ষয় হ'য়ে থাকবে।—'

কথা বলিতে বলিতে মায়া মুকুলের কাঁধের উপর তাহার কম্পিত হাত দুইটি রাখিয়া চোখ বন্ধ করিয়া মুকুলের দিকে মুখ বাড়াইয়া দিল।

মুকুল সরিয়া আসিয়া বলিল—বেশ, তাই দিলাম, নাও। এ দান আমার তুমি ভুলতে পারবে না কোন দিন।

মায়া কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল—কি পেলাম?—

মুকুল বলিল—উপেক্ষা।—এটা দিয়ে আমিও আজ রিক্ত হয়ে গেলাম।

* * * *

কমলা তাহার নিজের একখানি ছবির উপর নাম সহি করিয়া সেখানি বাতাসে শুখাইতে শুখাইতে সিঁড়ির উপর হইতে ডাকিল—মুকুলদা বড় দেরী ক'রে ফেলেছি না? কি করব খুঁজে পাচ্ছিলাম না।—

নীচে নামিয়া সিঁড়ির উপর মায়াকে স্তব্ধভাবে একা বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কমলা বলিয়া উঠিল—ও কি! তুই একা যে!—মুকুলদা কোথায়?—

মায়া। চলে গেছেন।

কমলা। এটা না নিয়েই!—

মায়া। হাঁ। কিন্তু যাবার সময় মস্ত বড় একটা জিনিস দিয়ে গেছেন—

মায়ার গলা জড়াইয়া কমলা বলিল—কি ভাই?—

মায়া বলিল—উপেক্ষা।—ওটার ভাগ আমি কা'কেও দিতে পারব না।—

৩৬

মায়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া শ্রীশ যখন সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল তখন যে কেহ তাহাকে দেখিলে ভাবিত, বুঝি মানুষটা সহসা উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে! আপনার মানস-কল্পিত ভয় বা বিষদৃশ্য কোন বস্তুর ছায়া তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য তাহার দিকে তাহারই মত উন্মত্ত আবেগে ছুটিয়া আসিতেছে ইহা যেন সে বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া আপনাকে লইয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিতেছে!

শ্রীশ পথে নামিয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টি দিয়া একবার চারিধার দেখিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।—কিন্তু ইহা চলা নয়, ছুটিয়া

চলা। পলায়ন করাই যেন তাহার উদ্দেশ্য; গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে ভাবিবার কথা তাহার মনে নাই।

তাহার কাণের কাছে এক নারী বিচারকের মত নির্ম্মম নিষ্ঠুর অবিচলিত কণ্ঠে বলিতেছে—তুমি দায়ী—তুমি . . . তুমি সর্ব্বনাশ করেছ তার . . . খেয়ালী পুরুষ! প্রেমের মর্য্যাদা, জীবনের মূল্য বলে তোমার কাছে কিছু নেই? . . . তার হাত দিয়ে যত অন্যায় অকল্যাণ ঘটেছে তুমি সেসবের মূল—

ছুটিয়া চলিবার চেষ্টায় বহু পথিকের সহিত তাহার সংঘর্ষ হইতেছে! প্রত্যেকের নিকট হইতে সে কিছু না কিছু কটু উক্তি সংগ্রহ করিয়া লইতেছে; কিন্তু সেসবের প্রতি তাহার মন নাই। ফুট্‌পাথের ভিড়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পথে নামিলেই কোন না কোন প্রকারের গাড়ী তাহার এত নিকট দিয়া চলিয়া যাইতেছে যে পথের লোক তাহা দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে!—লোকটা কি অন্ধ?—না কালা!—হাসি বিদ্রূপের তীক্ষ্ন দু' একটা শরও তাহাকে বিদ্ধ করিয়া যাইতেছে।

একটা চৌমাথা পার হইয়া কিছু দূর গিয়া শ্রীশ সাহসা থামিয়া পড়িল। একবার ভাবিতে চেষ্টা করিল, কোথায় আসিয়াছে।—চারি ধারে দোকান, ভিড় করিয়া মানুষ দাঁড়াইয়া আছে, গোলমাল, পণ্যদ্রব্য লইয়া ক্রেতার সহিত বিক্রেতার বচসা, মাল বোঝাই শকট, অপরিস্কার, অপরিসর পথ, তাহার দুই পাশে আবর্জ্জনার পর্ব্বতের মত ভাঙ্গা রং ওঠা ইট বাহির করা অট্টালিকা আকাশে গিয়া মাথা ঠেকাইয়াছে! ধূলা এবং ধোঁয়ায় চারিধার ঢাকা, সূর্য্যের আলো যেন মানুষের নিকট হইতে এখানে প্রবেশ করিবার ছাড়্‌পত্র পায় নাই, পাইবার আশাও নাই।—কিন্তু এখানকার মানুষকে এমন জীবন্ত বলিয়া তাহার মনে হইল যাহা আর কোথাও কোন দিন সে দেখে নাই। বাহিরের খোলা আলো-বাতাসের মধ্যে এমন করিয়া মানুষকে দেখিবার বা অনুভব করিবার সুযোগ তাহার হয় নাই।

সকলে এখানে ঠকাইতেছে, ঠকিতেছে, ক্রয় করিতেছে, বিক্রয় করিতেছে, অর্থ দিতেছে অর্থ গ্রহণ করিতেছে; সমস্তের মধ্যেই এমন একটা বিবাক্ত সজীবতা আছে, যাহা বুঝি মানুষেই সম্ভব।—লাভ করিতে হইবে, বাঁচিতে হইবে, ইহাই যেন চীৎকার করিয়া সকলে বুঝাইতে চায়! . . . লোভ যেন ইহাদের ধর্ম্ম, হিংসাকে গুপ্ত অস্ত্রের মত প্রত্যেকে প্রত্যেকের বুকে আমূল

বসাইয়া দিতেছে! প্রেম, আলো, মনুষ্যত্ব, এই সমস্ত কথা যেন ইহারা কোন দিন শুনে নাই! . . .

দেখিতে দেখিতে শ্রীশের মনে হইল, ইহারাই বুঝি মানুষের যথার্থ রূপ! সভ্যতা, দয়া, মায়া, এ সমস্ত যেন বাহ্যিক আবরণ, যাহার প্রচলন এ রাজ্যে নাই! থাকিলেও হাস্যোদ্দীপক হইবে।—এ যেন সম্পূর্ণ নূতন এক সৃষ্টি!—এই ঠেলাঠেলি হানাহানির মধ্যে আপনাকে যেন অশরীরি বলিয়া শ্রীশের মনে হইল! সে সকলকে দেখিতেছে কিন্তু কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না!

নানা প্রশ্ন শ্রীশের মনে আসিয়া জমা হইতে লাগিল। সে ভাবিল—মায়া যদি এখানে থাকিত সে ইহাদিগকে দেখিয়া কি ভাবিত?—অবনতি?—অধঃপতন?—কাহাকে সে দোষী করিত?—আমাকে?—

কথাটি মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া গেল—সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তাহার পর কখন সে আবার আলো-বাতাসের রাজ্যে আসিয়াছে জানিতে পারে নাই। অস্তমিত সূর্য্যের গৈরিক আলোকে আকাশ উদ্ভাসিত, সেই আভা সমস্ত পথে গৃহগাত্রে, মানুষের সর্ব্ব শরীরে আসিয়া পড়িয়াছে! মানুষের মুখে হাসি, চোখে করুণা! হঠাৎ দেখা-হওয়া বন্ধুর হাত ধরিয়া বন্ধু বলিতেছে—ভাল আছ ভাই?—

শ্রীশের মন ভরিয়া উঠিল। কিছু দূরে দণ্ডায়মান একটি গাড়ীর চালককে নিকটে আসিবার ইঙ্গিত করিয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং গাড়ী আসিলে তাহাতে উঠিয়া বসিয়া বলিল—চল, হাণ্টারফোর্ড ষ্ট্রীট।

কিন্তু গাড়ী চলিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বিস্ময়ে তাহার মন ভরিয়া গেল!—কেন সেখানে যাচ্ছি?—কি প্রয়োজন? . . .

কিন্তু কোন প্রয়োজন যে নাই তাহাও নিজেকে সে বুঝাইতে পারিল না!

গাড়ী চলিতে লাগিল।

শরীর অনেক সময় স্থির হইয়া থাকিলেও মন চির চঞ্চল। যে কোন বিষয় লইয়া তন্ন-তন্ন করিয়া খোঁজ খবর লওয়া তাহার রোগ।—মন প্রশ্ন করে, মনই তাহার উত্তর দেয় এবং বাধা বেদনায় মনই অভ্রষ্ট হইয়া উঠে; শরীরটাও যে সঙ্কুচিত হইয়া উঠে না তাহা বলা যায় না, কিন্তু অধিকাংশ সময় সে সমস্ত মানসিক আঘাতে নিশ্চেষ্ট হইয়াই পড়িয়া থাকে।

শ্রীশ বসিয়া আছে, এবং তাহার মনে প্রশ্ন জাগিতেছে—'কেন যাব ?—'

উত্তর হইল—'নিজের চোখে দেখ্‌ব, আমি তার কি করেছি।'

প্রত্যুত্তর হইল—'ভাল জিনিসই দেখ্‌বে।—বিলাসী, কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ, নিজের নিজের প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যে তার চারপাশে ভিড় ক'রে বসে আছে; আর গানের সুরে, হাসির হিল্লোলে, দেহের ভঙ্গিমায়, চোখের ইঙ্গিতে প্রত্যেককে সে তুষ্ট ক'রে চলেছে।—এদের সকলকেই তার প্রয়োজন, সকলেরই তাকে প্রয়োজন . . . পাণ্ডুর গণ্ডে তার অস্বাভাবিক লালিমা, হাতের ধূমায়িত সিগারেটের কোনে ঠোঁটের রংএর ছোপ লেগেছে . . . পোষাকের পারিপাট্য আছে কিন্তু তাতে শরীরের প্রতি শ্রদ্ধা আর শ্লীলতা প্রকাশ পায় না!—তোমাকে দেখে সে হাসবে; সে হাসি বিষাক্ত ছুরির মত তোমার বুকে লাগ্‌বে।—সইতে পারিবে ?—'

'আর ভাব্‌তে পারি না।—কিন্তু আমাকে যেতেই হবে, আমি দেখ্‌বই তাকে—'

পথ আর ফুরায় না! কত গৃহ কত উদ্যান পিছনে রাখিয়া তাহার গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে, সেও যেন বলিতেছে, যেতেই হবে—যেতেই হবে—'

সহসা একটি পথে আসিয়া সমস্তই তাহার অত্যন্ত পরিচিত ঠেকিল! প্রত্যেকটি গৃহ, প্রত্যেকটি বৃক্ষ, পথের ধারের আলোক-স্তম্ভ, চিঠি ফেলিবার বাক্স, জলের কল, প্রত্যেকটি খুটি নাটি জিনিস তাহার পরিচিত মনে হইল!

ঐ ত সেই ফটকটি সেই পুষ্পিত লতায় ঢাকা! সন্ধ্যার ছায়া-মাখা নিবিড় বৃক্ষের শ্রেণী, সবই পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে!

চালককে গাড়ী ভিতরে লইবার জন্য শ্রীশ আদেশ করিল এবং কেন যে এখান হইতে গাড়ী ফিরাইবার ইচ্ছা তাহার হইল না, তাহা ভাবিয়াও আশ্চর্য্য হইয়া গেল!

আপনাকে আজ যেন যন্ত্র বিশেষ বলিয়া মনে হইতেছিল!

গাড়ী, বারান্দার নীচে আসিয়া থামিতেই শ্রীশের বক্ষের স্পন্দনও যেন থামিয়া গেল।—সে কি করিবে ?—

কিন্তু তাহাকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না। একজন বেয়ারা আসিয়া বলিল—মেম সাহেবের তবিয়ৎ ভাল নেই, মুলাকাত্‌ হবে না।

কি আশ্চর্য্য! তাহার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য এই লোকটা কি করিয়া জানিল ?—হয়ত এ সময়ে যাহারা আসে, তাহারা মেম সাহেবের কাছেই আসে

এ বিশ্বাস চাকরদের মনে বদ্ধমূল আছে। শ্রীশের কেমন লজ্জা করিতে লাগিল।

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া বেয়ারা বলিল—আপনার কার্ড রেখে যেতে পারেন।

শ্রীশ গাড়ী ফিরাইবার আদেশ দিয়া বেয়ারাকে বলিল—তার দরকার নেই।

ধীরে ধীরে আবার সে পথে বাহির হইয়া আসিল কিন্তু বেশী দূর না যাইতেই সে গাড়ী থামাইয়া নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া আপনার মনে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে পথ চলিতে সুরু করিল। তাহার মনের মধ্যে একটা লজ্জা-মিশ্রিত আনন্দ এবং মুক্তির সুর জাগিল—'যা দেখ্‌ব ভেবেছিলাম তা'ত হ'ল না!—'

উত্তর হইল—'তা'তে খুসী হবার কি আছে? ওর আজ অসুখ, আর তোমার সেখানে যাবার অধিকার নেই . . . তোমার জায়গাটা কোথায় তা মনে রেখো—'

এই রূপে আপনার মনের সঙ্গে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত শরীর মন লইয়া শ্রীশ যখন গৃহে ফিরিল, তখন অনেকটা রাত্রি হইয়াছে। আপনার ঘরে প্রবেশ করিতেই মহম্মদ আসিয়া জানাইল—একজন মেমসাব্‌ অনেকবার তাহাকে টেলিফোনে খুঁজিয়াছেন, বড় জরুরী কাম। মেমসাবের ফোন নম্বর ৫৮৩।

শ্রীশ স্তম্ভিত হইয়া গেল! কি আশ্চর্য্য!—কি ক'রে সম্ভব হ'ল?—আজ পাঁচ বছর পরে—'

শ্রীশ ধীরে ধীরে আসিয়া ফোন্ ধরিয়া রিং করিয়া নম্বর বলিয়া কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অতিপ্রিয় আবেগ কম্পিত পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিল—হ্যালো!

শ্রীশ উত্তর দিল—আমি শ্রীশ।

উত্তর পাইল—আমি তটিনী।—একবার এস।

এখন?—

হাঁ এখনই।

এই রাত্রে! . . .

সম্ভব নয়?—'

না।

বিষাদ ভরা কণ্ঠের উত্তর শ্রীশের কানে আসিল—ভুলে গেছি, মনেই ছিল

না! কিন্তু দরকারটা এত বিশ্রী জিনিস, কোন নিয়ম মানে না।—তুমি কি এই মাত্র বাড়ী ফিরলে?—

শ্রীশ উত্তর দিল—হাঁ।—সন্ধ্যা বেলা একবার তোমার কাছে গিয়েছিলাম, মানে দরজা পর্য্যন্ত।

আমার কাছে!—তুমি নিজেই?—

হাঁ, তোমার বেয়ারা বল্‌ল—দেখা হ'বে না।

আর তুমি ফিরে গেলে?—

হাঁ। তোমার হুকুম ছিল দরজা আগ্‌লে।

সে তোমার জন্যে নয়।

তা জানা ছিল না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ এবং বিষাদ মাখা সুর শ্রীশের কানে আসিল—না, তোমার দোষ নেই, তুমি আর কি করবে ফিরে যাওয়া ছাড়া? কিন্তু আজ প্রায় সমস্ত দিন এই চেয়ারটায় বসে আছি ফোন্‌টার দিকে চেয়ে; কত জনের সাড়া পেলাম, শুধু তোমার ছাড়া; আজ অনেকবার তোমায় ডেকেছি।

কি হ'য়েছে তোমার?—

এলে জান্‌বে। কাল এস সকালেই, বেশী দেরী ক'র না। ভয়ানক বিপদে পড়ে তোমাকে ডাক্‌ছি—এ সময়ে কোন অভিমান অপমানের কথা মনে রেখো না শ্রীশ—

শ্রীশ উত্তর দিল—কাল সকালেই আমায় পাবে।

কিন্তু এতটা সময়, এই সমস্তটা রাত কি ক'রে কাটাই বল ত? তটিনীকে তোমার মনে আছে শ্রীশ? সেই তটিনীই তোমায় ডাক্‌ছে, এ তটিনী মিসেস দত্ত নয়, তাকে তুমি ক্ষমা না কর্‌তেও পার। আচ্ছা জীবন কে? তার সম্বন্ধে কিছু জান?

আমার বন্ধু।—কেন?

সে আমাকে মুগ্ধ করেছে! আশ্চর্য্য মানুষ!

এখন আমাকে কিছু বল্‌তে পার না?—

সম্ভব নয়।

আচ্ছা, কালই জান্‌ব সব।

কান্নায় ভেজা গলায় উত্তর আসিল, তুমি আসবে? অনেকটা সাহস পাচ্ছি—আর ভারি আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে মনে করে, যে এত অপমানের পর তুমি আজ

নিজের থেকেই এসেছিলে! অনেক কথাই এই সঙ্গে মনে উঠ্‌ছে, শুয়ে শুয়ে খুসী মত সে সব কথা ভাব্‌ব।—এখন আসি?—

শ্রীশ উত্তর দিল এস।

ক্রমশঃ

শ্রী—

বেত্রসের মত সভ্যশিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি—
বটের মতন খোলামাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরি জাতি!

"মানুষ"

কাহিনী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন বাংলা কবিতার মধ্যে একটী সুর নিয়ত বাজিতেছে—সে রূপ-তৃষাময় যৌবনের অসহ বিকাশের সুর। রূপ-পিয়াসী কবিরা আকাশের দেবতাকে আপনার অন্তরের ক্ষুধা দিয়া মানবের দেহের সীমায় বদ্ধ করিয়াছে; দেহের সীমায় বদ্ধ মানবের মনে যৌবনকে জাগাইয়া তাহাকে আকাশের দেবতা করিয়াছে। যাহাকে ভালবাসিয়াছে তাহাকে ধরণীর মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তমালের অসিত বরণে প্রিয়তমের দেহের বর্ণ মিশাইয়া গিয়াছিল, ধরণীর ধুলার অন্তরে প্রিয়তমের দেহের সুরভি লুকাইয়া ছিল, বাতাসে তাহার আহ্বান বাজিত—সুদূর শূন্য নীলে তাহার দৃষ্টি ফুটিয়া থাকিত। বহু পুরাতন মূক ধরণী তাই সেখানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। তাই প্রাচীন বাংলা কবিতায় তিনটী সুদূর একত্রে সহজ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে—একটী আকাশের দেবতা আর একটী এই মাটির মানুষ আর তৃণ-শস্যভরা এই সবুজ ধরণী।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি জ্ঞানদাসের পদাবলীতে শিবায়ণ এবং নানাবিধ কথা-সাহিত্যে ইহা পরিস্ফুট। এখানে শুধু দুই একটী প্রাচীন বাংলা কবিতার কথা বলিব।

প্রায় পাঁচশো বছর পূর্ব্বে এক বাঙ্গালী কবি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম শ্রীমালাধর বসু। তিনি শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেন। বইখানি মূল সংস্কৃত হইতে অনূদিত। একস্থলে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সঙ্গে লইয়া যমুনা পার হইতেছেন। নৌকা ভার বহিতে না পারিয়া নিয়ত দুলিতেছিল। মনে হইতেছিল ডুবিয়া যাইবে। আহীররমণীগণ ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বার বার অনুরোধ করিতেছেন, এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য। কেহ বলিতেছে তোমাকে পীতবসন পরাইয়া দিব, তোমার চরণে নূপুর বাঁধিয়া দিব। কেহ বলিতেছে তোমার কটীতে মেখলা বাঁধিয়া দিব। তোমার দেহে স্নিগ্ধ চন্দন মাখাইয়া দিব। তবু শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বাক। সমস্ত গোপী চঞ্চল হইয়া বলিল—বল তোমার কি চাই, তাই দিব। শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, 'প্রথম মাগিএ আমি যৌবনের দান।'

বহুদিন পরে জয়নারায়ণ কবি 'আনন্দময়ী' রচনা করেন। তাহার এক যায়গায় বিরহিনী সুনেত্রা প্রিয়তমের জন্ত বিলাপ করিতেছে—আমার অন্তরের পুঞ্জ পুঞ্জ প্রেমকে দুই নখ দিয়া তৃণের মত ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছ। তবুও তোমার পথের দিকে চহিয়া আছি। সাধ যায় তাপসিনী সাজিয়া তোমার নিকটে যাই। যে অঙ্গে তুমি নিজে কুঙ্কুম মাখাইয়া দিয়াছ, তাহাতে তোমার জন্ত ছাই মাখিব। যে দীর্ঘ কেশে তুমি আলসে আপনি বেণী বাঁধিয়া দিয়াছ তাহাতে জটাভার করিব। শীত রাত্রিতে উত্তাপের আশায় যে বুকে লুকাইতে, কঙ্কণ করাঘাতে তাহা বিদীর্ণ করিব। তোমায় প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র করিয়া ফিরিব—কিন্তু হায় গৃহ পরিবাদী! যৌবনকে তুমি আমার সারা দেহে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছ, দরিদ্রের মত শুধু তাহাকে লুকাইয়া ফিরি।

ময়মনসিংহের বহুছড়ায় সুন্দর প্রেমের কাহিনী সব ছড়ান রহিয়াছে। দ্বিজ কানাই রচিত 'মহুয়া ও নদেরচাঁদ' একটি বিয়োগান্ত গীতিকা। একটী বেদে কোন গৃহস্থের গৃহলুণ্ঠন করিয়া একটী সুন্দরী মেয়েকে অপহরণ করিয়া আনে। তাহার নাম দেয় মহুয়া। বেদের ঘরে মহুয়ার যৌবন আসিয়া দেখা দিল। যৌবনময়ী মহুয়া নিত্য কলসী লইয়া সন্ধ্যায় নদীতে জল আনিতে যাইত। একদা এক গোধূলি লগ্নে এক ভিন্-দেশী পথিক নদীর ধারে জল ভরিতে তাহাকে দেখিতে পাইল। মহুয়া তখন জলে যৌবনের ছায়ার খেলা দেখিতে ছিল। ভিন্ দেশী পথিক সেই গোধূলির শুভলগ্নে যৌবনময়ী মহুয়ার নিকট আপনার প্রেম নিবেদন করিল। মহুয়া নয়ন নত করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

আবার সন্ধ্যায় সেই ঘাটে দেখা। ভিন্-দেশী পথিক বলিল—দাও না কলসী, আমি জল ভরিয়া দিই। মহুয়া শুনিল না। তেমনি জল ভরিতে লাগিল। গোধূলির নদীতীর জলভরার স্বরে আকুল হইয়া উঠিল। পথিক আবার বলিল কাল সন্ধ্যার কথা কি মনে আছে? মহুয়া উত্তর দিল—কাল কি বলিয়াছিলে আজ সন্ধ্যায় তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। পথিক জিজ্ঞাসা করিল—বল না কোথায় তোমার ঘর কে তোমার পিতা? মহুয়া উত্তর দিল—আমার কেহ নাই আমি স্রোতের শৈবাল। পথিক সন্ধ্যায় সাহসী হইয়া উঠিল। বলিল—এই প্রথম যৌবন কাহাকে মালা করিয়া গলায় দিয়াছ? উত্তরে জানিল, মহুয়ার বিবাহ হয় নাই। পথিক ও জানাইল—যৌবন ফুরাইতে চলিয়াছে আমিও অবিবাহিত। মহুয়া পথিকের পিতামাতার দোষ দিল। পথিক বলিল—তোমার মত নারী পাইলে বিবাহ করিতাম। মহুয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—ছিঃ তোমার

লজ্জা নাই—গলায় কলসী বাঁধিয়া মর। পথিক উত্তর দিল—কোথায় কলসী পাইব ?—কোথায় বা দড়ি পাইব ! তুমি যদি গহন নদী হও, আমি তোমাতেই ডুবিয়া মরি।

কে জানিত ওরে, সর্ষে গাছেও ফুটিবে এমন ফুল—
বর্ত্তমানের সাদা চোখেতেও ঘুরে অতীতের ভুল !

"সর্ষেফুল"



সাপুড়ীনর

— শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৮

অর্থের চিন্তায় বংশী আবার বড় বেশী অস্থির হইয়া পড়িল। কিন্তু প্রয়োজন যেখানে যাহার যত বেশী হাতের কাছে, প্রাপ্য তাহার তত বেশী দূরে,—ইহা সে জানে; এবং জানে বলিয়াই সমস্ত দিন কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া আপিসে আপিসে ঘুরিয়া বেড়ানোই সার হয়, তবু সে দমিয়া পড়ে না। প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া ডাক্তারখানায় যায়, ফিরিয়া বাজার করে, দশটার পূর্ব্বে যাহা পায়, নাকে মুখে গুঁজিয়া আবার বাহির হয়। কোন দিন বিজ্ঞাপনে কোথায় কিছু থাকে না আবার কোন দিন বা কোনও সওদাগরী আপিসের দরওয়ান-ওয়ালা দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, কিন্তু তাহাদের দাম্ভিকতার বুটের নীচে শির নোয়াইতে ইচ্ছা করে না, তাই, সেইখান হইতেই ফিরিয়া আসে।

কিন্তু মানুষ যাহা চায় না, মানুষকে অনেক সময় দায়ে পড়িয়া তাহাই করিতে হয়। এই ভাবিয়া অতি বড় দুঃসাহসীর মত বংশী কাহারও বা

কাছে গিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু তাহার দাসত্বের যোগ্যতা অন্ত দু'চারটা বড় বড় আপিসে যাচাই হইয়া আসে নাই বলিয়া তাহারা তাহাকে ফিরাইয়া দেয়।

এম্‌নি করিয়া দিনের পর দিন তাহার যতই গড়াইয়া গড়াইয়া চলে, অভাব অনটনের বোঝাটা তাহার ততই ভারী হইয়া উঠে। যেদিন ঘুরিয়া বেড়াইবার মত কোথাও কিছুই থাকে না, বংশী সেদিন হয়ত কোনও পথের ধারে কিম্বা কোনও পার্কের গাছের তলায় গিয়া মাটির উপর চাপিয়া বসে,—ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত আকাশের পানে তাকাইয়া ভাবে, তাহার চেয়েও অসহায় এমনি আরও অনেক হতভাগা পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়ায়; সে শুধু একা নয়। . . .

সেদিন সন্ধ্যায় ছেলেটিকে পড়াইয়া বাড়ী ফিরিতে বংশীর একটুখানি দেরী হইয়া গেল। পিতার শয্যাপার্শ্বে বারান্দার মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া অৰ্দ্ধ শায়িত ভাবে গায়ত্রী তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল দরজার কড়া নড়িতেই ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া গিয়া দোর খুলিয়া বলিল, আজ এত দেরী হলো যে বংশী ?

হাঁা, একটু হয়ে গেল দিদি।—বাবা ঘুমিয়েছেন ?

হাঁা। বলিয়া দোর বন্ধ করিয়া গায়ত্রী তাহার পশ্চাতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, জামা কাপড় না ছাড়িয়াই বংশী তাহার বিছানার উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িয়াছে!

গায়ত্রী টেবিলের উপর হইতে আলোটা নামাইয়া মেঝের উপর জ্বালিতে বসিল। লণ্ঠনের কাঁচটা খুলিয়া পরিষ্কার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, শুয়ে পড়্‌লি যে ?

খুব ঘুরেছি আজ একটু পরে খাব দিদি, কেমন ? এই বলিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িয়া সে একবার তাহার দিদির মুখের পানে তাকাইল।

ঘরটা অন্ধকার হইলেও খোলা জানালার পথে খোলা জ্যোৎস্নার খানিকটা আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই ম্লান আলোকে গায়ত্রীর আনত মুখের অৰ্দ্ধেক খানা বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া গেল। গত কয়েকদিন হইতে উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগিয়া সে বৃদ্ধ রুগ্ন পিতার সেবা করিয়াছে, তাহার উপর সংসারের যাবতীয় কাজ, কাহারও এতটুকু সাহায্য, বিশ্রাম করিবার এতটুকু অবসর সে পায় নাই,—তাই তাহার শান্ত সুন্দর মুখের উপর ক্লান্তি এবং অবসাদের যে রুক্ষ মলিনতা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আজ এই অতর্কিত মুহূর্তে

সর্ব্ব প্রথমে তাহাই লক্ষ্য করিয়া বংশীর দৃষ্টি যেন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু বলিবার মত কোন কথাই সে খুঁজিয়া পাইল না। একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে সে তাহার ব্যথিত দৃষ্টি সেদিক হইতে ফিরাইয়া লইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আলোটা জ্বলিয়া টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া গায়ত্রী বংশীর শয্যার এক পার্শ্বে আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে তাঁহার রুক্ষ চুলগুলার উপর হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, ঘুরে, ঘুরে, কেমন চেহারা হয়েছে দেখেছিস্? বলি হ্যাঁরে, বাঁচ্‌তে হবে, না, না?

বংশী সে কথার কোনও উত্তর দিল না। স্থির নির্ব্বিকারভাবে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ভাত বাড়গে যাও, অনেক রাত হয়েছে।—এই বলিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে জোর করিয়া উঠিতে যাইতে ছিল, গায়ত্রী তাহাকে বাধা দিয়া বলিল. না রাত হয়নি, আর একটুখানি জিরিয়ে নে।

বাধ্য হইয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। গায়ত্রী কহিল, কাল থেকে এত ক'রে আর ছুটে বেড়াস্‌নে বংশী। পায়ে খুব ব্যথা হয়েছে, না রে?

বংশী বলিল, না।

তাই আবার না হয় কখনও? বলিয়া গায়ত্রী একটুখানি পিছাইয়া গিয়া বংশীর একখানা পা একেবারে তাহার কোলের উপর টানিয়া আনিয়া বলিল, হাত বুলিয়ে দি, তুই চুপ ক'রে শুয়ে থাক্।

বংশী তাহার পা দুইটা জোর করিয়া সরাইয়া লইয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, না, না দিদি, তোর পায়ে পড়ি, না—

গায়ত্রী মৃদু হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, দিদি ব'লে অপরাধ হবে? কিছু হবে না, আয় উঠে, না হয় খুব ভক্তি ক'রে, একটা প্রণাম করিস্। এই বলিয়া সে আর কোন কথা না শুনিয়া বংশীর একখানা পা তাহার কোলের উপর তুলিয়া লইয়া হাত বুলাইতে লাগিল।

বংশী আর কোনও প্রতিবাদ করিল না। দাঁতে দাঁত চাপিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

মিনিট দশ পরে বংশী যেন তাহার এ সেবা আর সহ্য করিতে পারিল না. পা দুইটা সরাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, হয়েছে। আমায় আমার খিদে পায় নি?—

গায়ত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে নিজের পায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দিয়া বলিল, কই প্রণাম করলি নে যে!

বংশী তাহার দিদির এই হাস্ত-করুণ মুখের পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিল।

হাঁ, এবার লজ্জা করবে বই কি। আয়, আমার ঘরে বসেই খাবি, আয়, এ ঘরে আর এঁটো তুল্‌ব না। বলিতে বলিতে গায়ত্রী বাহির হইয়া গেল।

পাশের ঘরে বংশীর সুমুখে ভাতের থালা ধরিয়া দিয়া গল্প করিবার জন্ম গায়ত্রী তাহার কাছে আসিয়া বসিল। কিন্তু গল্প সে করিতে পারিল না।

দিনে দিনে তাহাদের দারিদ্র যে কিরূপ উৎকট হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার ইঙ্গিত যে এই অপ্রচুর অন্ন ব্যঞ্জনের মধ্যেও এত বেশী সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বংশীকে তাহার চোখের সুমুখে খাওয়াইতে বসিয়া সেই কথাটাই গায়ত্রী যেন আজ ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিল এবং গল্প করা দূরে থাক্ সে যে এখান হইতে সম্প্রতি উঠিয়া একটু আড়ালে চলিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচে, ইহাই তাহার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার মৌন অবনত মুখখানির দিকে একবার একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া বংশীরও সে কথা বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না! কিন্তু তাহাদের উভয়ের মধ্যেকার এই অপ্রীতিকর মৌনতা হঠাৎ কি কথা বলিয়া যে সে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে বংশী প্রথমে তাহা বেশ বুঝিতে পারিল না, অথচ এমন ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও চলে না। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া বংশী বলিল, আজ ভারি একটা মজা হয়েছে দিদি!—

গায়ত্রী যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল! কি মজা রে?—বলিয়া বংশীর মুখের পানে নীরবে তাকাইয়া রহিল!

বংশী বলিল, তুই লিফ্‌ট কেজ (lift cage) দেখিস্ নি, নয়? আফিসের বড় বড় সাত আট তলা বাড়ী গুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠ্‌তে বড় কষ্ট হয় কিনা, তাই ইলেক্‌ট্রিকের এক রকম খাঁচার মত ঘর থাকে, তিন চারজন লোক তার ভেতরে দাঁড়াতে পারে,—লোকেরা তার ভেতরে উঠে দাঁড়ায়, আর সেইটাই বারে বারে উপর নীচে ওঠা নামা করে। অনেক উঁচুতে যাদের উঠ্‌তে

হয়, তাদের আর কষ্ট ক'রে, সিঁড়ি ভাঙতে হয় না। আমাদের এই বাড়ীটা যদি পাঁচ তলা কি ছ' তলা, কি সাত তলাই হতো—

গায়ত্রী হাসিল। বলিল, আমাদের এটা আর ছ'সাত তলা হয়ে কাজ নাই। বুঝেছি, বল।

বংশীও ঈষৎ হাসিল; কিন্তু একটা দুঃখের প্রসঙ্গ চাপা দিয়া অপরকে হাসাইবার জন্য যে হাসি তাহাতে প্রাণ থাকে না, বংশী তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াও সহসা তাহার হাসি বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইতে পারিল না। তেমনি সহাস্য মুখেই কহিতে লাগিল, আজ একটা অফিসে গিয়ে ঢুকেছি,—দেখি, লিফ্‌ট্ কেজের সুমুখে একজন থুর্থুরে বুড়ো সাদা একটা হাত-কাটা পিরাণের উপর ময়লা একটা চাদর জড়িয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে,—খুব রোগা আর একেবারে কুঁজো হয়ে গেছে সে বেচারা। মুখখানা দেখ্‌লেই দয়া হয়। সেই কেজের সুমুখে যে দরোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, অনেক কষ্টে সে ভয়ে ভয়ে কাছে এগিয়ে হাত জোড় করে, তাকে একটা প্রণাম করে, বললে, আমি পাঁচতলায় যাব চাপরাশী-সাহেব, আমাকে ওই ওতে করে, উঠিয়ে দেবেন ?

ইয়া গালপাট্টাওয়ালা চাপ্‌রাশীটা তখন টুলের উপর বসে বসে 'খইনি' তৈরী কর্‌ছিল। প্রথমে সে কোনও কথাই বল্‌লে না। উত্তরের আশায় বুড়ো লোকটি তখন থর্ থর্ কাঁপ্‌তে আরম্ভ করেছে। তারপর 'খইনি'টা সে মুখে পুরে দিয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ্ ক'রে, এমনভাবে থুথু ফেল্‌লে, একটুখানি সরে না দাঁড়ালে ভদ্রলোকের জামার উপরেই পড়ে আর কি। এইবার তার কথা বল্‌বার ফুরসুৎ হলো। বাঁ হাত দিয়ে গোঁপ জোড়াটা বেশ ক'রে পাকিয়ে নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো, ইয়ে কীকোট্ তুমারা ওয়াস্তে নাহি হায়, উধার যাও। বলে সে তাকে উপরে উঠ্‌বার সোজা লম্বা সিঁড়িটা দেখিয়ে দিলে। আরও ক'জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের ফেলে রেখে একজন সাহেব গট্ গট্ ক'রে লিফ্‌টে চড়ে বস্‌তেই তাকে নিয়ে কেজটা সর্ সর্ করে উপরে উঠে গেল। সে বেচারা বুড়ো তখন একবার 'কেজে'র দিকে আর একবার লম্বা সিঁড়িটার দিকে এমন করে তাকাচ্ছিল দিদি, সে দেখ্‌লেই হাসি পায়। বলিয়া বংশীও বেশ জোরে-জোরেই হাসিতে গেল, কিন্তু পারিল না।

গায়ত্রী বলিল, পাড়া-গাঁ থেকে নতুন কল্‌কাতায় এসেছে বোধ হয় ?

তাই হবে। বলিয়া খাওয়া শেষ করিয়া বংশী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

গায়ত্রীকে তাহার সর্ব্বনাশা চিন্তা হইতে বিরত করিবার জন্যই সে যা'তা একটা হাসির কথা বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে-উদ্দেশ্য কতখানি সফল হইল কে জানে, বরঞ্চ, নিতান্ত অনাবশ্যক এই গল্পের অবতারণা করিয়া উল্টা তাহার নিজের মনটাকেই ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত পীড়িত করিয়া তুলিল।

শোবার ঘরে গিয়া বংশী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, দিদি, তুই খেয়েছিস?

রাত্রে আমি কোন দিন খাই? জানিস নে? বলিয়াই কথাটাকে উড়াইয়া দিবার জন্য সে যেরূপভাবে হাসিয়া উঠিল, সে হাসি দেখিলে কান্না পায়।

বংশী তাহার চেয়ারটা টেবিলের কাছে টানিয়া আনিয়া একখানা বই খুলিয়া চুপ করিয়া বসিল। গায়ত্রী তাহার খাটের বিছানাটা ভাল করিয়া পাতিয়া দিতেছিল। বলিল, আমি ভেবেছিলুম, নিভা ভারী অহংকারী মেয়ে।

বংশী কেমন যেন অন্যমনস্কের মত বইএর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, হুঁ।

গায়ত্রী আবার বলিল, ভেবেছিলুম, যেদিন দেখা হবে, আমি আচ্ছা ক'রে তাকে শুনিয়ে দেব,—তোর জুতো ফেলে দেওয়া আমি বার করব।

বংশী নতমুখে বইএর উপর চোখ রাখিয়াই হাসিতে লাগিল।

হাসি নয়, আমি ঠিক্ তাই করতুম, কিন্তু দেখ্‌লুম, সে বড় ভাল মেয়ে। অমরেশ আর বিভাকে দেখেই আমি তা বুঝেছিলুম।

বংশী তেম্‌নিভাবে মুখ না ফিরাইয়াই ধীরে-ধীরে বলিল, কেমন ক'রে জান্‌লি? কথা ত তার সঙ্গে একটিও কো'স্‌ নি?

দরকার হয় না। দেখ্‌লেই চেনা যায়। আর, এম্‌নি অসময়ে দেখা হলো ছাই, না পার্‌লুম দুটো কথা কইতে, না পার্‌লুম আলাপ-পরিচয় কর্‌তে। আর একদিন তাদের আস্‌তে বলিস্‌ না বংশী?

প্রত্যুত্তরে বংশী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তোর এ ভাঙ্গা ঘরে রোজ-রোজ আসবে কেন সে?

গায়ত্রী বলিল, মেয়েদের কি সে অভিমান সাজে কখনও? গরীবের ঘরে যদি তার বিয়ে হয়, যেতে হবে না?

বইখানা বংশী মনে-মনে পড়িতে পড়িতে বলিল, হাঁ, গরীবের ঘরে বিয়ে সে করবে কি-না? শাড়ী-ব্লাউসের দাম দিতেই ত বেচারার ভিটেয় ঘুঘু চরবে।

কথাটা শুনিয়া গায়ত্রী যেরূপভাবে হাসিল, দেখিয়া মনে হইল যেন সে-সব

সে বিশ্বাস করে না। বিছানার উপর চাদরখানা বিছাইয়া দিয়া বলিল, কাল যদি যাস্,—বলিস্, দিদি বলেছে, তুমি একবার যেও।

বল্‌ব। বলিয়া বংশী আবার জোর করিয়া পড়ায় মন দিল।

দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার সময় গায়ত্রী বলিয়া গেল, বেশী রাত জাগিস্‌নে, বই বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়্।

বংশী বইও বন্ধ করিল, শুইয়াও পড়িল, কিন্তু চোখে তাহার আজ সহজে ঘুম আসিল না বলিয়াই রাত্রি তাহাকে জাগিতেই হইল। খোলা জানালার বাহিরে চাঁদের আলো সাদা কাপড়ের মত ধব্‌-ধব্‌ করিতেছিল। বাড়ীর পাশে আগাছায়-ভর্ত্তি যে জায়গাটা পড়িয়াছিল, তাহারই সেই ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া কোথাও বোধ করি নাম-না-জানা কোনও বুনো-ফুল ফুটিয়াছে, শীতের বাতাসে রহিয়া রহিয়া কেমন যেন একটা তীব্র-মধুর গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল। কিছু দূরে একটা মস্ত বড় পড়ো-বাড়ীর ভাঙা ছাদ ও সিঁড়ির উপর জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই আগাছার জঙ্গল, জন-হীন ভাঙা বাড়ী ও ইঁটের গাদার মধ্যে রাত্রি জাগিবার মত কিছু না থাকিলেও, বিছানার উপর কম্বল মুড়ি দিয়া বংশী বহুক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল এবং এই শীতের রাত্রেও ঘণ্টা দুই তিন ধরিয়া চোখে তাহার নিদ্রার লেশমাত্র ছায়াপাতও হইল না! . . .

প্রতিদিনের নিয়মমত পরদিন সকালেই বংশী ডাক্তারখানায় গেল। রামধনা চাকরটাকে সে দিন দুই তিন পূর্ব্বে বিদায় করিয়া দিয়াছিল; আজ আবার ডাক্তারখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সে আসিয়া হাজির হইয়াছে! বংশী জিজ্ঞাসা করিল, কিরে, তুই আবার এলি যে?

রামধনা বলিল, ফিন্ ভেজ্‌লেন্ হামাকে বাবু।

বংশী যেন একটুখানি রুক্ষ কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, না, না, ভেজাভেজি আর দরকার নেই বাপু,—যা তুই যা।

অমরেশের বাড়ীর চেয়ে কাজে ফাঁকি দিবার সুবিধা এই খানেই বেশী বলিয়া চাকরটা নড়িতে চাহিতেছিল না। বংশী আবার কি একটা তাহাকে বলিতে যাইতেছিল, ঘরের ভিতর হইতে গায়ত্রী বলিয়া উঠিল, ছি বংশী, ও কি করছিস্ তুই? ওকে তাড়াচ্ছিস্ কেন? অমরেশ কি ভাব্‌বে বল্ ত?

না, না, কিছু ভাব্‌বে না,—ওরে তুই যা। বলিয়া বংশী রামধনাকে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল।

রামধনা নলিল, আজি ?

হাঁ। বলিয়া বংশী তাহার নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল এবং জানালাটা খুলিয়া দিয়া তাহার সুমুখে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

বংশী!

ডাক শুনিয়া পিছন ফিরিতেই দেখিল, গায়ত্রী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বংশী জিজ্ঞাসা করিল, ও গেল ?

গায়ত্রী বলিল, হাঁ গেল। কিন্তু এ কি পাগ্‌লামি তোর বংশী? অমরেশ কাল আসেনি, আজ দুপুরে সে নিশ্চয়ই আসবে, তুই তখন থাক্‌বি নে, আমি কি জবাব দেব বল্ ত ?

বংশী বলিল, অনর্থক ঋণের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি দিদি ?

গায়ত্রী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, পাগল! কেউ যদি ভালবেসে তোর সাহায্য করতে আসে, সেটাও কি ঋণ বলে ধরতে হবে নাকি ?—তার চেয়ে তুমি একটি কাজ করো লক্ষ্মী ভাইটি আমার, আজ খেয়ে যখন বেরিয়ে যাবে, ওই পথে অমরেশের বাড়ী হয়ে যেয়ো। একদিনও তার সঙ্গে দেখা হয় না,—কত দুঃখু করে।

বংশী চুপ করিয়া রহিল।

চুপ ক'রে রইলি যে ? কি ভাবছিস কি ?

বংশী বলিল, কিছু ভাবিনি। যাব।

গায়ত্রী কহিল, হাঁ যাস্। যে ভালবাসে তাকে কষ্ট দিতে নিজের কষ্ট হয় না রে ?

বংশী এইবার ঈষৎ হাসিল। বলিল, বাজার যেতে হবে ত ? পয়সা কড়ি কিছু আছে ? না থাক্‌বারই ত কথা।

নিশ্চয়ই আছে। আমায় কি তেমনি ম্যানেজার পেয়েছিস্ বংশী ? আয় নিবি আয়। বলিয়া হাসিতে হাসিতে গায়ত্রী বাহির হইয়া গেল।

বংশীও তাহার পশ্চাতে বাহিরে আসিতেছিল, রত্নেশ্বর বিছানার উপর চুপ করিয়া বসিয়া আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে ছিলেন, সহসা বংশীকে সম্মুখে দেখিয়া ডাকিলেন, বংশী!

বংশী কাছে গিয়া দাঁড়াইল। রত্নেশ্বর বলিলেন, বাঁ-হাতটা ত' গেল। এই বলিয়া তিনি তাঁহার বাঁ-হাতখানা একবার নড়াইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। বলিলেন, তা যাক্। মরবার আগে হয়ত তোদের অনেক

কষ্টই দিয়ে যাব। বলিয়াই নীরবে তিনি বংশীর মুখের পানে হাঁ করিয়া কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। কিন্তু সে দৃষ্টি এমনি ভীষণ যে সেদিকে তাকাইতে হইলে অনেকখানি শক্তির প্রয়োজন। বংশী ঘাড় হেঁট করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিনিট দুই তেমনি নিঃশব্দে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ তিনি একটুখানি সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হাঁ হাঁ ঠিক্ মনে পড়েছে। আজ একটি কাজ করিস্ ত' বাবা। বলিয়াই তিনি মুখ নীচু করিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে সুরু করিলেন।

বংশী জিজ্ঞাসা করিল, কি কাজ বাবা?

রত্নেশ্বর মুখ তুলিয়া বলিলেন, অ্যাঁ? কাজ? বলিয়া তিনি একটা ঢোক গিলিয়া চোখ বুজিয়া কথাটা একবার মনে করিবার চেষ্টা করিলেন। অবশেষে ঠোঁট দুইটা তাঁহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল,—নিতান্ত অসহায় শিশুর মতই অতি কষ্টে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ভুলে, গেছি।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় স্নানাহার করিয়া বংশী বাহির হইয়া যাইতেছিল, রত্নেশ্বর ডাকিয়া বলিলেন, আজ একখানি উৎকৃষ্ট গীতা আমার জন্যে কিনে আনিস্ ত বাবা।—

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ
অর্দ্ধ মাত্রাক্ষরা নিত্যা সানির্বাচ্যপদাত্মিকা।
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্
বেদত্রয়ী পরা নন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞান সংযুতা।

জানিস ত বংশী? আহা, গীতা! গীতা! আনিস্ বাবা একখানা।

আনব। তখন কি এই কথাই বলছিলেন?

কখন্ বাবা?

সেই যে ভুলে গেলেন?

তা হবে। বলিয়া রত্নেশ্বর চুপ করিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বংশী চলিয়া গেল। শাশুড়ীর কাছে সে একটি পয়সাও চাহিতে পারিল না, নিজের কাছে কোন দিন কিছুই থাকে না, অথচ, গীতা তাহাকে আনিতেই হইবে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দিদির কথামত সে অমরেশের বাড়ীর দিকেই চলিতে লাগিল।

এম্‌নি অন্যমনস্ক হইয়া সে পথ চলিতেছিল যে, একটা গরুর গাড়ী চাপা পড়িতে পড়িতে হঠাৎ সে বাঁচিয়া গেল, একজন ঝাঁকা মুটে 'হাটো বাবু' বলিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল. হ্যাট্‌-কোট্‌ পরা একজন বাঙ্গালী বাবু তাহাকে লাঠির গুঁতা দিয়া বলিয়া গেল, আন্ধা হো গিয়া!

বংশী কাহাকেও একটা কথার জবাব পর্য্যন্ত দিল না। মিনিট কুড়ি পঁচিশেক পরে অমরেশের প্রকাণ্ড বাড়ীটার দরজায় গিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিল না। হঠাৎ কি ভাবিয়া সে যেমন আসিয়াছিল তেম্‌নি ভাবে বিপরীত মুখে হন্‌ হন্‌ করিয়া দ্রুতপদে হাঁটিতে সুরু করিয়া দিল। উপরের দিকে একবার সে ফিরিয়াও তাকাইল না, তাকাইলে হয় ত দেখিতে পাইত, নিভা তখন সুমুখের জানালায় বসিয়া পথের লোক চলাচল দেখিতেছিল। হঠাৎ বংশীকে তাহাদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া নিভা প্রথমে ভাবিয়াছিল সে উপরে উঠিয়া আসিবে কিন্তু তাহা যখন সে করিল না, বরঞ্চ যে-পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই ফিরিয়া গেল, তখন তাহার আর সেখানে বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন হইল না। সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জানালার কবাট দুইটা সে এত জোরে বন্ধ করিতে লাগিল যে পথের একজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান পর্য্যন্ত আচম্‌কা সেইদিকে তাকাইয়া ভাবিল, মেয়েটা বুঝি বা অমন সুন্দর জানালাটা আজ ভাঙ্গিয়াই ফেলে! . . .

ক্রমশঃ

পুরাতনের জীর্ণ কাটলের মধ্যে, নবীনের তৃপ্ত জীবন, এমনি প্রাণপূর্ণ নির্দ্দয় তার আবেগে আত্ম প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে।

"বিমাতা"

প্রাপ্ত পত্র

—শ্রীসুশান্ত সেন।

কল্লোল সম্পাদক সমীপে,—

আমার গত মাসের লেখা চিঠিখানা যে আপনাদের ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেন নি, এ জন্য ধন্যবাদ।

ইতিমধ্যে আরও অনেকগুলি গল্প পড়্‌লুম্। গত বারের মত এবারেও তারই কতকগুলি নিয়ে কয়েকটা কথা বল্‌তে ইচ্ছে যাচ্ছে।

আমার কাছে এই ক'দিনে ছোট বড় মাঝারি প্রায় পনেরো ষোলখানা বাংলা মাসিক এসে জমেছে। তা ছাড়া গল্পভরা সাপ্তাহিকও আছে। এই সবে প্রকাশিত গল্পগুলি মোটামুটি সবই আমি পড়েছি। কিন্তু আজ সেগুলির কথা লিখ্‌তে বসে দেখি, দুটী, তিনটি ছাড়া আর কোনটাই তেমন মনের ওপর দাগ কেটে বসে নি।—হয়ত এ আমারই বেয়াড়া মনের বেয়াদবী!

তবে একথা বোধ হয় অনেকেই অস্বীকার করবেন না, যে যা ছাপার অক্ষরে বেরোয় তাই ভাল হয় না। কথাটি যে একেবারে নূতন তা নয়, কিন্তু সত্য। আর জানেন, আজকালকার সভ্য মানুষ ছাতা আড়াল দিয়ে অথবা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রতিপদে সত্যকে এড়িয়ে চল্‌তে পারাকে পরম বাহাদুরী বলে মনে করে। গল্প লেখকরাও—সে দল থেকে বাদ পড়েন না। সবাই ত কিছু আর্টিষ্ট নন!

মুস্কিল হয়েছে এই খানেই। বাংলায় মাসে মাসে যতগুলি গল্প বার হচ্ছে তার অনুপাতে ভাল গল্প লেখকের সংখ্যা বড় কম। ভাল লেখক যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে হয় না, ভাল লেখাও তেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে বার হয় না, অথচ ঐ অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে লেখাই প্রতিমাসে চাই! তাই ছাপার অক্ষরে আবর্জ্জনার স্তূপ জমতে খুব বেশী বিলম্ব হয় না।

ছোট কাগজগুলির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু বড় বড় কাগজগুলি যথা,—প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, বঙ্গবাণী প্রভৃতি, যাদের শুনি আর্থিক অবস্থা সচ্ছল, লোকজন বন্ধু হিতৈষীর অভাব নেই, প্রচারও হাজার হাজার, তাঁদেরও মাঝে মাঝে গল্প সম্বন্ধে এমন দারুণ দৈন্য দেখি যে মনে

হয় যেন কভারের মলাটে যাঁরই নাম থাকুক, সেখানে সমজদার লোকের নিতান্ত অভাব ঘটেছে!

এই ধরুণ শ্রাবনের ভারতবর্ষ কাগজখানা। এটি এবার আর সব কাগজের ওপর টেক্কা দিয়ে আষাঢ় শেষ হতে না হতেই ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত বেগে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে হুমড়ি খেয়ে বাজীমাৎ করেছে! কিন্তু এতে আছে কি? অনেক। তার মধ্যে তিনটি উপন্যাস বাদ দিয়ে, ছোট গল্প ছয়টি। কিন্তু গল্পগুলি কেমন? সে কথা যত কম বলা যায়, ততই ভাল। সেগুলি ধৈর্য্য ধরে পড়্‌তে পারলে আর কিছু হোক না হোক ভারতবর্ষ আফিসের নেপথ্যে সম্পাদক মহাশয়ের গল্প বাছাই কোন্ পদ্ধতি অনুসারে চলে, তার কতকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এই গল্প কয়টার মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মা' গল্পটাই যা একটু ভাল। এই লেখাটির স্বল্প পরিসরে লেখক একটি মেয়ের মধ্যে প্রথমটা সন্তানহীনার বেদনা, পরে সন্তান লাভের আনন্দ, তার পর পুনরায় সন্তানহারার ব্যথা এবং শেষটা একটি অজানা অচেনা কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে স্নেহ-ক্ষুধাতুরার কোলে পাওয়ায় দুদিনের সংশয় ভরা উল্লাস ও আবার তাকে হারানোয় মাতৃ হৃদয়ের অশ্রুপূর্ণ কাতরতার ছবি পর পর আঁক্‌বার চেষ্টা করেছেন।

শ্রাবনের প্রবাসীতে বেশী গল্প নেই। মৌলিক গল্প মাত্র একটি—শ্রীযুক্তা শান্তাদেবীর 'হারানিধি'। গল্পটির ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদটি যদি প্রথমটার মত হ'ত, তাহলে বল্‌তাম চমৎকার। প্রথম পরিচ্ছেদটীর লেখা এত জমেছে যে গল্পের শেষ দুটী পরিচ্ছেদের জন্য রীতিমত আফ্‌শোষ হয়। কর্ত্তা-গিন্নী, পল্লী-ক্ষেন্তি প্রভৃতির কথাবার্ত্তা বেশ স্বাভাবিক হয়েছে। চল্‌তি রেলের কথা-বার্ত্তার মধ্যে প্রথম পুঁটলির পর দ্বিতীয় পুঁটলি, দ্বিতীয় পুঁটলির পর 'বুক ফাটে ত মুখ ফাটে না' বধূর শিশু সন্তানটি, অতিরিক্ত ব্যস্ততায় ষ্টেশনে ফেলে আসার সংবাদ অসামান্য কুশলতার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং তা পরম উপভোগ্য হয়েছে। পূজনীয় শ্বশুর ভাসুরের ভয়ে ঘোমটা-আঁটা বৌটির অসহায় কাতরতা বেশ করুণ হয়ে ফুটেছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পরিত্যক্ত মেয়ের কথা না এনে ঐ রেল কামরার মানুষগুলির কথা আরও কিছু বলে যদি গল্পটি শেষ হ'ত ত বেশ হ'ত। ঝড় বৃষ্টির রাতে ষ্টেশনে একা অতটুকু ঘুমন্ত মেয়ে, যতই নির্ভিক বেপরোয়া হোক না কেন আচম্‌কা ঘুম ভেঙ্গে মায়ের না দেখে যে ভাবে সরাসর এসে উঁচু পা দানি অতিক্রম ক'রে রেলে উঠ্‌তে পারল তা একান্ত

স্বাভাবিক মনে হয় না। প্রথম পরিচ্ছেদের চিত্র যেমন সুন্দর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের কাল্পনিক পরিণতী তেমনি গল্পটির মাঝখানেই সুর কেটে দিয়েছে।

উপরে যে দুটী গল্পের কথা লিখিলাম, শ্রাবণের বঙ্গবাণীর শ্রীযুক্ত অমিয় বসুর 'তিন বারের বার' গল্পটী তার থেকে ঢের খারাপ রচনা। অথচ গল্পটীর বর্ণনীয় বিষয়টি বেশ ভাল। একজন লোক একটি আদর্শকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দু দু'বার চেষ্টা ক'রে বিফল হয়ে শেষ বয়সে নাত্নীর সহায়তায় সফলতা লাভ কর্লেন। কিন্তু লেখাটি সাজাবার কৌশলের অভাবে ভাল জমেনি।

এবারে যতগুলি গল্প পড়্লাম, তার মধ্যে সব থেকে ভাল হয়েছে শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ব্যানার্জ্জী' (সংহতি)। হাসি-কান্না দুইটী বিভিন্ন রসের সমাবেশ গল্পটীতে আছে, অথচ কোথাও বেখাপ হয়নি। এক কথায় এটি একটি নিখুঁৎ গল্প। বাংলার অশিক্ষিত, অসভ্য, সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে কত বড় প্রাণ আছে তার পরিচয় শৈলজাবাবুর এই ব্যানার্জ্জী গল্পটিতে পেলুম এবং গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের মনকে হাসি-কান্নার দোদুল দোলায় দোল দিয়ে যায়। শৈলজাবাবুর আশ্চর্য্য লিপি কুশলতায় একটিও অবান্তর কথা নেই। মনে হয় যেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে গল্পটি লেখা।

আজ এই পর্য্যন্ত। চিঠির চার পাতার মধ্যে আর ত কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখ্লুন না।—নমস্কার।

কোথায় যেন পড়েছি—

নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে যখন প্রথম পরিবর্ত্তনের আরম্ভ হয়, তখন একটা অনিশ্চয়তার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তখন কে কতদূরে যাইবে, তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে না। কিছুদিনের ঠেলাঠেলির পরে পরস্পরের আপোষে সীমানা পাকা হইয়া আসে। সেই অনিবার্য্য অনিশ্চয়তার প্রতি দোষারোপ করিয়া যিনি পূরা নকলের দিকে যান, তিনি অত্যন্ত কুদৃষ্টান্ত দেখান।

* * *

পরিবর্ত্তন কোন্ পর্য্যন্ত গেলে অনুকরণের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা শক্ত। তবে সাধারণ নিয়মের স্বরূপ একটা কথা বলা যাইতে পারে। যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত বেখাপ্ না হয়। তাহাকে বলে গ্রহণ করা। যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহাকে বলে অনুকরণ করা।

* * *

পুরাতনের পরিবর্ত্তন ও নূতনের নির্ম্মাণে দোষ নাই। আবশ্যকের অনুরোধে তাহা সকল জাতিকেই সর্ব্বদা করিতে হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ অনুকরণ প্রয়োজনের দোহাই দিয়া চলে না। সে প্রয়োজনের দোহাই একটা ছুতামাত্র। কারণ সম্পূর্ণ অনুকরণ কখনই সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। তাহার হয়ত একাংশ কাজের হইতে পারে, অপরাংশ বাহুল্য।

৪২৭

পুস্তক ও পত্রিকা পরিচ

কমলের দুঃখ—শ্রীসত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত।
প্রকাশক, রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, কলেজ ষ্ট্রীট
মার্কেট (দোতালা) কলিকাতা। মূল্য ২৲

এই গল্পটী বহুদিন পূর্ব্বে 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তখনই এ লেখাটী বাংলা দেশের চিন্তার ধারার ভিতর বেশ একটু দিয়াছিল। রচনা সুন্দর অথচ ঝরঝরে। পত্রের আকারে লেখা। সা উপন্যাস হইতে ইহার একটী বিশেষত্ব আছে, তাহা সাধারণ কথার ভিতর বড় বড় কথা সহজে বুঝাইয়া দেওয়া।

প্রথমেই একটী লাইন আছে—এমন করে দুঃখকে ফেনিয়ে তুললে দু সাধ ত' ভরে উঠে না?

বইখানির মলাট ও কাগজও সুরুচির পরিচায়ক।

ইলেক্টো—আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসা-সার—কবিরাজ গণেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত দি ইলেক্টো—আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, (দোতলা) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

সকল প্রণালীর চিকিৎসা-প্রবর্ত্তকই মানব-হিত সাধনের জন্য চিকিৎসার পন্থা আবিষ্কার করিয়া জগতের অশেষ বিধ মঙ্গল সাধন করির এই নব প্রণালীর চিকিৎসার উপরও জন সাধারণ নির্ভর করিতে পারেন। এই প্রণালীর চিকিৎসার ঔষধ গুলি সম্পূর্ণ দেশীয় ধাতব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে প্রস্তুত। কয়েকটী মাত্র ঔষধই বিশিষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত হওয়ায় নূতন ও প্রাচীন পীড়ায় সমান ফলপ্রদ।

পুস্তকখানির রচনা প্রণালীও সহজ এবং আমাদের বাঙ্গালীর পরিবারের সকলেই অতি অল্প আয়াসেই এই পুস্তকখানির সাহায্যে এই চিকিৎসা প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন। এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। পুস্তকখানির মূল্য কত তাহা লিখা নাই।

ইস্‌লামের ইতিহাস—কাজী আকরম হোসেন, এম-এ প্রণীত। মোসলে

,কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২॥০

ানির মূল্য বেশী মনে হইলেও তাহার কৈফিয়ৎ আছে। বাঁধাই ত
াগজ ভাল, ছাপাও পরিষ্কার। তাহার উপর এইরূপ একখানি
লাদেশে খুব অভাব ছিল। গ্রন্থ প্রণেতা ও প্রকাশক উভয়েই
াদাই। ইতিহাস সকল জাতির আদরণীয়, খুব আশা করি এই
হিন্দু বা মুসলমান বাঙ্গালী মাত্রেরই অধ্যয়নের সামগ্রী হইবে।
তকে জানিতে হইলে, নিজের জাতির উন্নতি কামনা করিলে,
র ইতিহাসই জানা প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাস হইতেই
সাধারণের যে অপূর্ব্ব ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাই মানব জাতির
সম্পদ।

এই পুস্তক খানিতে ভারতের মুসলমানের ইতিহাস লিপি বদ্ধ নাই।
া করি, গ্রন্থকার সে অভাবও পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

পুস্তকের ভাষা সরল তবে বিষয় গুলি কতদূর ইতিহাস-সম্মত তাহা
হাসজ্ঞ পণ্ডিতগণের বিচার করিবার কথা।

বিজলী—সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়;
সম্পাদক—শ্রীসুবোধ রায়। কার্য্যালয়—১৪।এ শরৎ ঘোষ ষ্ট্রীট্ ইটালী,
লিকাতা।

লী' অনেক হাত ঘুরিয়া, অনেক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পথ করিয়া
ক্ষেত্রে সুপরিচিত দুই জন সম্পাদকের হাতে পড়িয়াছে। প্রথম দুই
দেখিয়া মনে হয়, ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি—কল্পে সম্পাদন বিভাগ
েষ চেষ্টা করিতেছেন। আশা করা যায়, বাঙ্গালী পাঠক বর্গ বাজে ছবির
ও বাহারে লেখার সাপ্তাহিক গুলি হাট বাজারের জন্য রাখিয়া এই উন্নত
রুচির ও সুলিখিত পত্রিকাখানি পড়িবেন।

ব পর্য্যায়ের বিজলীকে আমরা সাদরে সম্ভাষণ করিতেছি। ইহার
প্রচ্ছদ পটের—পরিকল্পনার মতই ইহা অবস্থার দুর্গমতার ভিতর দিয়া আপনার
সাধার্থ্যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া চলুক।

কল্লোল

—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

১

যখন যৌবনের সোনার কাঠির স্পর্শে হৃদয়ের সুপ্ত তন্ত্রী গুলি সাড়া দিয়ে উঠে, মনের পরতে পরতে আশার ছবিগুলি রঙিন্ হয়ে উঠে, আর সমস্ত শরীরে একটা আনন্দের তড়িৎ কম্পন ছুটে যায়; তখন মানুষ ভাব্‌তে পারে না যে এর অন্তরালে একটা ব্যর্থতার হা হুতাশ লুকিয়ে আছে। বিবাহিত জীবনের সুখ সৌন্দর্য্যের ডালি নিয়ে যখন সরলা, রাখাল জেলের কুঁড়ে আলো করতে এল তখন জেলে পাড়ার মেয়ে-মজলিসে তার রূপের বেশ একটা সমালোচনা হয়েছিল। রাখাল ছিল শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন, দূর সম্পর্কীয়া বিধবা পিসীর স্নেহ যত্নের মধ্য দিয়ে যখন তাহার সবল দেহখানি সুন্দর হয়ে উঠছিল; তখন পিসীর ডাক এসেছিল জীবনের পর পার হতে। তার পর কত প্রতিকূল অবস্থার ঘূর্ণাবর্ত্ত প্রলয় হুঙ্কারে তাহার মন প্রাণ বিক্ষোভিত ক'রে গিয়েছে, প্রলোভনের কত অন্ধকারময়ী দানবীমূর্ত্তি তাকে ঘিরে তাণ্ডব নৃত্য করেছে; কিন্তু রাখালের অটল হৃদয়ে বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্য আন্‌তে পারে নি। অমানিশায় পথহারা সমুদ্র-যাত্রীর ব্যাকুল দৃষ্টি যেমন উজ্জ্বল ধ্রুব তারার পানে নিবদ্ধ থাকে, জীবনের পিচ্ছিল পথের শত স্খলনাশঙ্কার ও দুঃখ দৈন্যের ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে তেমনই রাখালের দৃষ্টি ছিল একটা আশার ক্ষীণ জ্যোতির পানে। যৌবনের কূলে দাঁড়িয়ে যে জ্যোতিকে সে বরণ করে নিয়েছিল, তরুণ একনিষ্ঠ ভক্তের মত তারই উদ্দেশ্যে তার যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। আজ বিবাহিত জীবনের গৌরব ও আনন্দের মধ্যে যে তার আশার সফলতা অর্জ্জন করেছে, যৌবনের কল্পনা আজ তার কাছে বাস্তবের মূর্ত্তি ধরে এসেছে। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও তার চক্ষু জ্বল্‌ছে, বেদনা-বিমূঢ় হৃদয়ের দু একটী দীর্ঘশ্বাস বাহিরের আনন্দের চাপে গুমরে মর্‌ছে। যারা তার বাল্য জীবনের দুঃখের অংশ পুরা মাত্রায় গ্রহণ করেছিল, যাদের পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থা তার জীবন পথ সুগম করে দিয়েছিল আজ তারা তার সুখের অংশভাগী হতে বেঁচে নেই।

তাদের দাম্পত্য জীবনের চারিটী বৎসর বেশ সুখে কেটে গিয়েছে। সরলার স্নেহ যত্ন ও প্রেমে রাখালের জীবন মধুময় হয়ে উঠেছে। গত জীবনের দুঃখ স্মৃতিকে বিদায় দিয়ে বর্ত্তমানের সুখের হাত ধরে যখন সে জীবন পথের যাত্রা সুরু করেছে, তখন তার পথে এসে দাড়াল—জমিদারের কুদৃষ্টি! গ্রামের জমিদারের ডান হাত রাঙাদিদি যখন বহু প্রলোভন স্বত্তেও সরলার সুনজর পেল না, তখন জমিদারের দৃষ্টি পড়্‌ল তার বামহাত বাকী খাজনার দিকে। আদালতের অক্ষয় ক্ষমতায় প্রকাশ্যে রাখালের বাস্তবাটি নিলাম হয়ে গেল! তার পর একদিন ভোরের আলোয়, রাখাল তার পিতৃ পিতামহের ভিটার উপর দুফোঁটা তপ্ত অশ্রুর শেষ চিহ্ন রেখে সরলার হাত ধরে বাহির হয়ে পড়্‌ল। ভোরের ফুরফুরে হাওয়া শূন্য গৃহের মধ্যে এসে একটা অস্ফুট হাসির খণ খন শব্দে জমিদারের ক্ষমতাকে উপহাস করে গেল।

২

পদ্মার তীরে যেখানে শালগাছ গুলো সারি বেধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তারই পাশে একটা ছোট জেলে পাড়ায় রাখাল আবার সংসার পেতে বসেছে। নদীর বুকের উপর এই ছোট গ্রামটাকে দেখ্‌লে হৃদয় করুণায় ভরে যায়। পদ্মার উন্মত্ত তরঙ্গ নৃত্যে কবে এই গ্রামটার জীবন দীপ নিবে যাবে, তা কে বল্‌তে পারে? তবু এখানকার লোকেরা ভরা বিশ্বাসে বাসা বেঁধে আছে, কারণ পদ্মা তাদের মুখের আহার দেয়। নিষ্ঠুর প্রকৃতির নির্ম্মম অট্টহাস্যে যে দিন মরণের দোলা দুলে উঠে, উজ্জল তরঙ্গোলাস যখন কূলে কূলে ধ্বংসের বার্ত্তা বয়ে আনে, তখন ক্ষুদ্র গ্রামটার মুখচ্ছবির উপর এক বিষাদ যবনিকা নেমে আসে।

মানুষের হিংসা দৃষ্টি ও অত্যাচারের গণ্ডীর বাইরে এসে রাখাল যখন এখানে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল, তখন সরল গ্রামবাসীরা তাহাদের সরল হৃদয়ের স্নেহ ও প্রীতির অর্ঘ্যে তাহাকে অভ্যর্থনা করেছিল। তাহাদের সহানুভূতি ও আন্তরিকতা এই দুইয়ের সম্মিলনে তার জীবনের দিন গুলি সুখময় হয়ে উঠে ছিল। তার সহজ সরল জীবন পথ যখন শান্তির কুসুমে ভরে গিয়েছিল তখন সুখের পেয়ালা পূর্ণ করে ফুটে উঠ্‌ল এক শিশু কন্যার অফুরন্ত হাসি। স্বর্গের অমিয় মাখান এই হাসির আলোয়

তাদের দাম্পত্য প্রেম আরও গভীর ও নিবিড় হয়ে উঠেছে। গত জীবনের দুঃখ দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিবার জন্য যেন স্বর্গের আনন্দ এই শিশুর কান্নায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ আনন্দে সরলার ভাগ বড় বেশী ছিল না। এক বৎসর যেতে না যেতে যখন গ্রামে মহামারি এসে সরলাকে ধরে বস্‌ল তখন রাখাল বুঝ্‌ল এ ঝড়ে নদীকুলের এই বালুর খেলাঘর অচিরে ভেঙ্গে পড়্‌বে। নির্ম্মম মৃত্যু যেখানে তার বলিষ্ঠ পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসে, সেখানে মানুষের শত চেষ্টা, প্রাণ ভরা ভালবাসা, কিছুই কর্‌তে পারে না, তার করুণ প্রার্থনা মৃত্যুর পাষাণ হৃদয়ে আহত হয়ে কেঁদে কেঁদে ফিরে আসে। শুধু বুক কাটা কান্না, অপূর্ণ আশার তীব্র যাতনা, বিয়োগ বেদনা বিষাদ মলিন বিদায়ক্ষণকে হারোণোর হাহাকার শব্দময় করে তুলে। সরলার জীবনশক্তি ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগ্‌ল, তারপর সন্ধ্যার জ্যোৎস্নার মৃদু হাসিতে তার ম্লান মধুর শেষ হাসিটী মিশিয়ে নদীতীরে এই বনকুসুমটী অকালে ঝরে গেল।

৩

রাখালের জীবনের সুখ উৎস শুকিয়ে গিয়েছে, শুধু কন্যার হাসি মুখখানি তাকে আবার দৈনন্দিন টেনে এনেছে। গ্রামের লোকের সঙ্গে তাকে বড় একটা মিশ্‌তে দেখা যায় না। বেলা শেষে ঘরে ফিরে যখন সে কন্যাকে বুকে চেপে ধরে, তখন অজ্ঞাতে ফুটফোটা চোখের জলের উষ্ণস্পর্শে অতীত স্মৃতি আবার নূতন করে জেগে উঠে। এইরূপে দুঃখ শোক ও বেদনার মধ্য দিয়ে একে একে আটটি বছর চলে গিয়েছে তাকে আবার সংসারী করবার জন্য গ্রামবাসীরা কতই প্রয়াস পেয়েছে, কিন্তু রাখাল সরলার স্মৃতির অবমাননা কর্‌তে চায় নি।

যেদিন জ্যোৎস্নার আলো রাখালের ছোট কুঁড়েখানির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ত; সেই বিদায় দিনের কথা তার মনে পড়্‌ত, ঘরের বদ্ধবাতাসে তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত, তাই মেয়েটিকে বুকে ক'রে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে বস্‌ত। চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোকের পরশ পেয়ে বাতাস যখন ফুলের গন্ধ গায় মেখে নদীর কানে কানে গুঞ্জন ক'রে উঠে, তখন আনন্দে ফুলে উঠে নদীর ঐ স্নেহ-ভরা বুক, আর তরঙ্গরোলে ফুটে উঠে তার আনন্দোচ্ছ্বাস। নদীর বুকে সৌন্দর্য্য লীলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়েটি রাখালের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে আর পিতার করুণ দৃষ্টি প'ড়ে থাকে ঐ মাহারা মেয়েটির ঘুমন্ত মুখের উপর। দূরে নদীর

তীরে যেদিন চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে, রাখালের নির্নিমেষ নয়ন তার পানে নিবদ্ধ হয়ে থাকে, বুক কাঁপিয়ে বেরিয়ে আসে একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস আর স্মরণে আনে তার স্বর্ণপ্রতিমার অকাল বিসর্জ্জনের এক ব্যথাভরা স্মৃতি।

রাখাল নদীর জল-কল্লোল বড় ভালবাসে। এর মাঝে সে তার বুকভরা ব্যথার সহানুভূতি খুঁজে পায়। তার মনে হয় যেন তারই মত ব্যথা নিয়ে ঢেউগুলি ফুলে ফুলে মাথা খুঁড়ে মরছে। তাই কতদিন ছোট জেলে নৌকার পাল তুলে দিয়ে সে আপন মনে গান গাইতে গাইতে নদীর বুকে কত দূরে ভেসে গিয়েছে।

কিন্তু সেদিন ছিল কাল বৈশাখী। রাখাল মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ওপারে মেলা দেখ্‌তে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে ফিরছিল, এমন সময়ে পশ্চিমে কালো মেঘের পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়ালে আর বাতাস উন্মত্তবেগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল নদীর বুকের উপর! তারপর প্রচণ্ড তরঙ্গ বিক্ষোভে কেঁপে উঠ্‌ল নদীর কালো জল! ভয়ে মেয়েটি রাখালের কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রহিল। দূর হতে অস্পষ্ট রেখা দেখ্‌তে পেয়ে রাখাল বুকে আশা বাঁধবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কেঁপে উঠ্‌ছিল তার বুকটা। তার মনে হচ্ছিল আর বুঝি তার কূলে ফেরা হবে না। অদৃষ্টের ভ্রূকুটী যখন তাহাকে অকূলে ভাসিয়েছে তখন কূল পাওয়া তাহার দুরাশামাত্র। ঊর্দ্ধে আকাশে বজ্র নির্ঘোষে মসীবর্ণ মেঘের বিরাট অভিযান, নিম্নে চঞ্চলা প্রকৃতির উচ্ছল কলরোল, মধ্যে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মানবের বুকভরা হাহাকার, আংশিক প্রলয়ের ভীষণ দৃশ্যকে করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী করে তুলছে। কূলপ্রত্যাহত তরঙ্গগুলি উন্মত্তের মত নৌকার উপর এসে পড়ছে। বিদ্যুতের ক্ষণিক দীপ্তিতে অন্ধকার আরও জমাট বেঁধে উঠছে। মাথার উপরে বজ্রের ভৈরবনাদে মৃত্যুর আহ্বান সূচিত হচ্ছে। রাখাল আর পারলনা, মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ভীতি বিহ্বল একবার ডেকে উঠ্‌ল 'ভগবান!' তারপর এক উত্তাল তরঙ্গ ভীমরবে নৌকায় উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল মানব কণ্ঠের ক্ষীণ হাহাকার!

* * *

মেঘ কেটে গেছে; চাঁদের হাসি আবার জগতের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। প্রমত্ত প্রভঞ্জন এখন মলয়ের মূর্ত্তি নিয়ে এসেছে। প্রকৃতি নিষ্ঠুরতার ঘন-কালো মুখস খুলে ফেলে আবার স্বভাব সৌন্দর্য্যে হেসে উঠছে। শুধু দূরে ঐ নদী সৈকতে তার নিষ্ঠুরতার চিহ্ন এখনও লোপ পায় নি। তরুণের নিস্পন্দ বুকের উপর ঝরা চাঁপার সৌন্দর্য্য নিয়ে পড়ে আছে তার মানব কুসুম। তার চারিদিকে আজ জল-কল্লোল কেঁদে কেঁদে ফিরছে, জীবনের শেষ অধ্যায়ে যে কল্লোলকে সে আপনার বলে ভেবেছিল তারই বুকের উপর তার শেষ শয্যা রচিত হইয়াছে। ধনীর দুঃখ বেদনা শোক ও হর্ষকে মূর্ত্ত করিয়া তুলবার জন্য ইতিবৃত্তে ও সাহিত্যের রাজপথে শব্দের বিরাট অভিযান চলছে কিন্তু দারিদ্র্য ও মৃত্যুর মধ্যে যে জীবনের দোলা তার শান্ত সৌন্দর্য্যের বিকাশ করছে তার করুণকাহিনী শুনতে সৃষ্টির যুগ থেকে বেঁচে আছে এই কল্লোল—

সমাচার।

গত বৎসরে কলিকাতা পুলিশের কার্য্য সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে যে, কলিকাতা এবং সহর গুলিতে গত বৎসর ৩১টী দৈনিক পত্র, ৩টী অর্দ্ধ সাপ্তাহিক, ৭০টী সাপ্তাহিক, ১৫টী পাক্ষিক ১৭ টী মাসিক, ২৭টী ত্রৈমাসিক, ৩টী দ্বৈমাসিক, ১টী অর্দ্ধ বাৎসরিক এবং ৩টী বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসরে সর্ব্ব সমেত ৬০০টী ছাপাখানা ছিল।

—আনন্দ বাজার।

গত বুধবার রাত্রি ১১-৫০ মিনিটের সময় ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে মহারাজার বয়স ৬৬ বৎসর ১০ মাস হইয়াছিল।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের রুদ্র তানের নূতন বই "বিষের-বাঁশী" প্রকাশিত হইয়াছে—মূল্য ১।৵০।—'বিষেরবাঁশীতে কবির নূতন গান ও কবিতাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে যে অল্প ক'জন ইংরেজী উপন্যাস লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন যোশেফ কন্‌রাড তাঁদের একজন। সম্প্রতি ইনি সাতষট্টি বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ইনি জাতিতে ছিলেন পোলিস। এক জন বিদেশীর পক্ষে বিদেশী ভাষায় এতটা সাফল্য লাভ বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ইনি সুদীর্ঘ কাল নাবিকের কাজ একান্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন ক'রে ১৮৯৪ সালে চাকরী ইস্তফা দিয়ে ইংলণ্ডের কেন্ট-অঞ্চলের বিশপ্‌স্ বোর্ণ-এ বসবাস আরম্ভ করেন। সাধারণ মানুষের মত তিনি দুনিয়াটাকে দেখেন নি, তাই ইংলণ্ডে যেয়েই তিনি এক ফরাসী জানা মাল্লার সাহায্যে ইংরেজী শিখ্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন, এখন জীবনের অবসর সময়টা সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা উপন্যাস ও নাটকের আকারে প্রকাশ করতে লাগ্‌লেন। প্রথম বই "আলমেয়ার্‌স ফলী।" তারপর পর পর বার চোদ্দ খানা বই, প্রকাশিত হল। তার মধ্যে youth (যৌবন) ও Typhoon ই (ঝড়) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কন্‌রাডের মত জোরালো প্রাকৃতিক বর্ণনা আর কোন ইংরেজ লেখক করতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। গেল বছর তাঁর শেষ বই—The Rover প্রকাশিত হয়েছে। জীবনটা কেবল হেসে খেলেই কাটিয়ে দেন নি, জীবন সমুদ্র মন্থনের ফলে বিষ টুকু নিজে পান করে অমৃত টুকু তিনি জগতের তৃপ্তির জন্য বিলিয়ে গিয়েছেন। তাই তিনি সভ্য জাতির নমস্য।

নিবেদন।

এবারে "পূবের হাওয়া" কবিতাটীর শেষাংশ পাই নাই বলিয়া এই সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আশা করি, কবির এই অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতা পাঠক পাঠিকারা মার্জ্জনা করিবেন।

কল্লোল

বুড়ো-ঝি

—শ্রীনীলিমা বসু।

গঙ্গা-জলের ঘড়াটা কাঁখ হইতে সশব্দে দালানের উপর বসাইয়া দিয়া ভব বলিয়া উঠিল, "আমার পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দাও বাপু, আমি চলে যাই, তোমাদের সংসারের খাটুনী আমি আর পেরে উঠিনে—"বলিয়াই সেইখানে ভিজা কাপড়ে বসিয়া পড়িল। তখন বেলা একটা বাজে।

তাহার এই কথার মুখে, কোন জবাব দিলে; আজ এই ভরা-দুপুরের সময় একটা যে প্রলয়-কাণ্ড উপস্থিত হইবে, তাহা সকলে বেশ ভাল করিয়াই জানিত, তাই চুপচাপ করিয়া ঘড়াটা তুলিয়া লইয়া মণির মা সেখান হইতে সরিয়া গেলেন।

ভব আপন মনে খানিকক্ষণ বসিয়া, যখন ক্লান্তি অনুভব করিল, তখন উঠিয়া কাপড়খানা ছাড়িয়া, রান্নাঘর হইতে ভাতের থালাটা বাহির করিয়া, দালানের কোন্ ঘেঁসিয়া প্রতি দিনের নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়া খাইতে বসিল। মেজাজটা অতিরিক্ত গরম থাকার দরুণ রান্নাও তাহার মুখে ভাল লাগিতেছিল না। কোন্ তরকারীতে নুন বেশী, কোন্টায় ঝাল, তাহারই খুঁৎ ধরিয়া অনর্গল বাক্যের জের টানিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সাহস করিয়া কেহই ইহার প্রতিবাদও করিল না।

বুড়ো ঝির কথাটা একটু ভাল করিয়া বলা দরকার। সে আজ এক বৎসর মণিদের বাড়ী কাজ করিতেছে। বয়স তার সত্তর পার হইয়া গিয়াছে, চুলগুলি প্রায় সবই সাদা; সামনের ছুইটি দাঁত অত্যাজদের স্মৃতি বজায় রাখিবার জন্ত পড়-পড় হইয়াও এখনও টিকিয়া আছে।

মণিদের বাড়ী কাজ করিবার আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সে প্রায় প্রতিদিনই একবার করিয়া বাড়ীর গৃহিণীকে তাহার মাহিনা চুকাইয়া বিদায় দিতে বলে। তাহার এ মূল্যহীন কথার জবাবটি পর্য্যন্ত কেহই দেয় না, কেন না সবাই জানে বুড়ি এ বাড়ী ছাড়িয়া সহজে অন্যত্র যাইবে না।

কাজের চাপ বেশী পড়িলে, তাহার মাথাটা কেমন যেন গুলাইয়া যায়। যাহাকে যাহা বলিবার নয়, উত্তেজনার ঝোঁকে তাহাকে তাহাই বলিয়া বসে। কিন্তু মজা এই, কাজের অবসরে বৈকালবেলা যখন পান-দোক্তা গালে দিয়া সে পা ছড়াইয়া রকের উপর বসে, তখন জিজ্ঞাসা করিলে, কতকালের কত গল্প তাহার নিকট হইতে শোনা যায়। সেদিন মণি আবদার করিয়া বসিল, "ও বুড়োঝি, আমি আবার কোন্ দিন শ্বশুর বাড়ী চলে যাব, তোমার সব গল্প আমায় বল।"

বুড়ো-ঝির যখন মন খুশী থাকে, তখন সে এই প্রকার আবদার খুব পছন্দ করে; আর বিশেষ করিয়া মণির আবদার সে কিছুতেই এড়াইতে পারে না। মণিকে সে মনে মনে যথার্থই স্নেহ করিত। তাই একটা বুক-জোড়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "কি আর বল্‌বো দিদিমণি, আমার কথা শুনে তোমার কি-ই বা হবে, এ অভাগীর কি বল্‌বার মত কথা আছে ভাই?" তাহার গলার স্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বুড়ির ভিজা গলার স্বর মণি টের পাইলেও, আগ্রহভরে সে আবার বলিল, "না, তোমার ছেলেবেলাকার কথা বল।"

একটু খানি চুপ করিয়া সে কথা পাড়িল, "তবে শোন, বল্‌ছি, আমার এ পোড়া অদেষ্টের কথা; মুখ ফুটে কাউকে জানাতে মন চায় না দিদি, তুমি ধরে বস্‌লে বলে বলি। আমাদেরও একদিন ছেলো, যখন এই তোমাদেরই মত, এমনিধারা হেসে খেলে বেড়িয়েচি, ভয়-ভাবনা কিচ্ছু ছেলো না। বাপ-মার একমাত্তর মেয়ে ছিলুম আমি। বড় আদরের ছিলুম তাদের, তাই বুঝি কপাল এমনি ক'রে পুড়েচে।" বলিয়া ভিজা চোখ ছুইটা কাপড়ের আঁচলে মুছিয়া লইয়া পরক্ষণেই আবার বলিতে সুরু করিল।

—"আমার বাবা ছেলো রাজানগরের বাবুদের মুহুরী। তেখনকার দিনে তিন

গণ্ডা টেকা মাইনে পেয়ে, দেশে কোটা-বাড়ী দিলে, পয়সাওলা ঘরের মেয়ে ছিনু আমি।" তারপর মুখে একটা শব্দ করিয়া সে বলিল, "কি আর বলবো ভাই, তেখন কোমরে কাপড় জড়িয়ে রুক্মিণীসইদের আমবাগানে, কত আম কুড়িয়ে খেয়েচি, আবার ঘরে নিয়ে এসেচি—সে ছেলো একদিন। হায় হায়, বে ও তো হয়েছেলো একটা নাম-করা নোকের ঘরে; তেখনকার দিনে কল্না কৈঁসারীদের ঘর বল্লে কে না চিন্তো! বে হয়েছেলো কবে তা ছাই মনে নেই! মার কাছে শুনেচি, চার বছর পেরিয়ে যে মাসে পাঁচে পড়্নু, সে মাসেই বে হয়েছিলো; আজকাল যেমন দেখ্চি অনাছিষ্টি কাণ্ড, ধেড়ে বুড়ো না ক'রে কেউ মেয়ের বে দেয় না! আমাদের কালে, পাঁচ পেরিয়ে ছ'য়ে পড়্তেই বাপ-মা বে দিয়ে খালাস হ'তো।"

মণি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—অ্যাঁ, চার বছরের সময় তোমার বিয়ে হয়েছিল? শ্বশুরবাড়ী যেতে কাঁদ্তে না? এই দেখ না, আমি এত বড় হয়েছি, তবু মাকে ছেড়ে যেতে হলেই কান্না আসে।"

দন্তহীন মুখে বুড়ি, হা, হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। কাঁদিতেও যেমন তাহার দেরী লাগিত না, তেমনি হাসিটাও খুব শীঘ্র আসিত। হাসিয়া লইয়া বলিল, "কাঁদলে কে ছাড়্বে? বে ছোট্টটি বেলা হলেও, ঘর কত্তে এইছিনু এগারো, বারো বছরের সমায়। তোমার কথায় এক দিনের কথা মনে পড়্লো দিদিমণি, সেবার পেথম শ্বশুর ঘরে যাই, কত কাঁদনু, শেষটায় মার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকনু। তবু জোর করে নে গেল! কত্তা নিজেই এইছিলেন, সেবার সে এক নাগাড়ে ছিনু পাঁচ বচ্ছর—"

মণি জিজ্ঞাসা করিল,—"এতদিন ছিলে একসঙ্গে, তারা ছেড়ে দেয়নি বুঝি?"

"আরে রামঃ! এমন শাউড়ীর ঘর সাতজন্মে কেউ করবে না দিদিমণি, সে দজ্জাল মাগীর জ্বালায় পাড়ার নোক টেঁকতে পারে নি, ঘরের বৌ আর বেশী কি? খেতে-পত্তে কি কষ্টটাই না দেছে আঁটকুড়ির ঝিটি, সে দেখ্লে শত্তুরের চোকেও জল আসে।—তা যাক্গে কষ্টে-ছিষ্টে এক রকম করে ছিনু। কত্তা নেকাপড়া শিকে আপিষে চাগ্রী কত্তে নাগ্ল, তেখন আমার বয়েস হিসেব কত্তে গেলে, সবে এক-কুড়ি। তেতদিনে ছেলেপিলে হলোনা দেকে সে মাগী যেন আমার ওপর আরও খাপ্পা হলো। ছেলেকে ফুসলে-ফাস্লে কি মন্তর করলে, আমারও কপাল ভাঙলো; মায়ে-পোয়ে মিলে দু'দিনের নাম ক'রে আমায় পিস্-

শ্বাউড়ীর বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে কত্তা আবার বে কর্‌লে! আমায় একটু জানালেও না। আমি যেন সকলের চোকে বিষ হনু, কি বল্‌বো দিদি, সুখ বুকে সবই সয়েছিনু, কিন্তু তাও ওদের সইলো না, একদিন লাথি, ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিলে। মনে এত দুঃখু হলো, কালীঘাটে খুড়তুতো বোনের কাছে চলে গেনু।"

এই বলিয়া সে বার কতক চোখ দুইটা মুছিয়া লইল, তার পর কাপড়ের খুঁট্ হইতে আর একটু কাঁচা দোক্তার পাতা ছিঁড়িয়া গালে ফেলিয়া দিল।

বুড়ির দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে মণির চোখও জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা, বাপ,—তারা কোথায় ছিল? বোনের কাছে গেলে কেন?"

কপালে করাঘাত করিয়া সে বলিল,—এ বোগ্‌নো-পোড়া বরাতে কি আর সে সুখ-টুকুন্ ছেলো দিদিমণি? তারাও যে তেখন স্বগ্‌গে, নইলে যাহোক ক'রে আমার ভাত খায় কে? এই বয়েসে ভাত-কাপড়ের জন্থে পরের দোরে-দোরে বেড়াব কেন? বোল না দিদি, সে দুঃখুর কথা বোল না, এই শুক্‌নো বরাতে সব শুকিয়ে গেল। তা নইলে কোলে একটা কিছু হলে, আজ আমার রাজার সংসার—"

এমনি সময় ওদিককার ঘর হইতে মণির মা ডাকিলেন,—"মণি, আজকে কি তোদের কথা শেষ হবে না? কি কচ্ছিস্, এদিকে আয় না!"

"যাই মা, একটু পরে যাচ্ছি।"

বুড়ো ঝি বলিল,—"যাও দিদিমণি, এ কথার কি আর শেষ আছে ভাই? একবার পেড়ে বস্‌লে রক্ষে নেই, তুমি যাও, মা আবার রাগ কর্‌বেন।"

মণির তখন আর সেখান হইতে উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, এই বৃদ্ধার দীর্ঘ জীবনের উপর দিয়া, কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা, নির্ম্মম ভাবে পায়ের তলায় মাটি কাঁপাইয়া, আশেপাশের সমস্তই প্রবল দাপটে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কেহ ত তাহার খোঁজ লয় নাই, কেহ হয় ত আর লইবেও না, কেননা গৃহহারা, স্বজনহারা, পরাধীন দাসী-চাকরের আবার কাহিনী কি? সত্যই ত, আরও কত ঝি তাহাদের বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু কই, সে-ত অমন করিয়া কোনদিন কাহাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই। চেষ্টা করিলে হয়ত এমনি ধারা আরও অনেক হতভাগিনীর জীবন-কাহিনী সে শুনিতে পাইত। এখন মণি বেশ স্পষ্ট করিয়া

বুঝিতে পারিল, বুড়ো-ঝি, সময় নাই অসময় নাই, আপন মনে কেন এত বকে, কারণে-অকারণে কেনই বা এত রাগিয়া উঠে!

সে একটু জোরের সঙ্গে বলিল,—"না বুড়ো-ঝি বল, আমি আজ শুনবো।"

ভব আবার বলিতে লাগিল,—"বোনের সঙ্গে, কাশী-বিন্দেবন কোরে সেবার ঘুরে এয়েছি, এমন সময় একদিন আচমকা খবর পেনু, কত্তা আর নেই! সেই থেকে দিদি এই সাজ।—রোজ কাঁদি আর বলি, এ জন্মে ত পাপের ফল খুব ভোগ করনু, হে ভগবান আর জন্মে যেন তোমায় পাই।" এই বলিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মণির মনটা তখন কি জানি কেন রাগে ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বুড়ি কিন্তু একটু পরেই কান্নাটা চাপা দিয়া বলিতে লাগিল, "এই যে দিদি নিত্যি গঙ্গায় যাই, আর ফিরতে বেলা হয়, তোমরা বল, এত দেরী করে এসো কেন? কেন যে করি, সে আমিই জানি। মা-গঙ্গার পানে চেয়ে থাকি, আর আমার দু'চোক জলে ভরে ওঠে। ভাবি, মাগো, তোর প্যেটে সবই দিইচি—মা, বাপ, বোন, কত্তা সকলকে তুই নিইচিস্, আমার পাঁজরা ক'খানা কবে নিবি মা? তেখন আর থাক্‌তে পারিনে; হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলি, চোকের জলে বুক ভেসে যায়। লোকে মনে করে আমি বুঝি একটা পাগল! তা ভাবুকগে, কি করবো ভাই, এত কি সওয়া যায়? এদ্দিনে কোথায় নাতি, নাত্‌নী, পুত্‌বৌ নে ঘর করবো, তা নয় আজ পরের দোরে গতর খাটিয়ে, পেটে দুটো খাচ্ছি, কাঁকালে পরচি। আমার দুঃখু একমাত্তর নারায়ণ ভিন্ন কেউ জানে না দিদিমণি।—"

মণির মনের সে তিক্ততা মুছিয়া গিয়া, আবার এক অপরিসীম বেদনায় কাতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, আজিকার এই রাত্রির ভিতরেই বুড়ির জীবনের আরও কতকগুলি অশ্রু-বিজড়িত কাহিনী শোনে। কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না, রাত্রি হওয়াতে, তাহার মা খাইবার ঠাঁই করিয়া দিতে বলিলেন, ঝি তাড়াতাড়ি আসন আনিতে গেল। মণিও সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল।

বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মণির চোখে ঘুম আসিতেছিল না, ঘুরিয়া ফিরিয়া বুড়ির কথাগুলি মনে হইয়া বড়ই অস্বোয়াস্তি বোধ হইতেছিল। একবার সে ভাবিল, তাহার মাকে সব বলে, আবার কি জানি কেন বলিতে ইচ্ছা হইল না, অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

* * * *

বুড়ো-ঝির আরও অনেক কথা শুনিবার ইচ্ছা থাকিলেও মণির শোনা হইল না, দুইটা দিন যাইবার গোছ-গাছ করিতেই কাটিয়া গেল। মণির স্বামী পুলিন মণিকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল। যাইবার দিন সকাল বেলা, মণি একখানা নূতন কাপড় আর একটি টাকা লুকাইয়া বুড়ো-ঝির হাতে দিয়া বলিল,—"এ কাপড় তুমি প'রো,—এই টাকা দিয়ে পান-দোক্তা খেও।"

বহুদিনের অনাহারী-রোগী, সম্মুখে ভাতের থালা দেখিলে, আনন্দাতিশয্যে তাহার রোগক্লিষ্ট মুখ খানিতে, যেমন আনন্দ উছলিয়া পড়িতে থাকে মণির দেওয়া টাকা ও কাপড় পাইয়া, এই আশী বছরের বুড়ির দুঃখ-আঘাত-জর্জ্জরিত মুখখানিও ঠিক তেমনি খুশীতে ভরিয়া গিয়াছিল। প্রথমটা সে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল, পরে একটু সামলাইয়া বলিল, "দিদিমণি, তোমার মত দিদিমণি তপিস্যে করলেও পাব না দিদিমণি ; ভগমান তোমায় রাজরাণী করবেন দিদিমণি ! জামাই বাবু রাজা হবেন, ছেলে-পুলে নে সুখে ঘর সংসার করবে। দুঃখীকে দান করলে, তাকে ভগমান কক্ষনো দুঃখু কষ্ট দেন না দিদিমণি।"

আশাতিরিক্ত করুণার দান পাইয়া বুড়ি, মণিকে কতবার যে 'দিদিমণি' সম্বোধন করিল তাহার ঠিক নাই। মণিও আজ বুড়ো-ঝিকে আনন্দিত দেখিয়া মনে মনে বেশ তৃপ্তি পাইল। বুড়ি তাহার মুখখানিকে আরও একটু নিকটে আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "মা টের পেলে রাগ করবে না ত দিদিমণি ?"

"মাকে দেখাবার দরকার কি ? তুমি অমনি পোরো, মা জানতে পারবে না।"

আনন্দে, ভয়ে ধীরে ধীরে মণির দেওয়া জিনিষ কাপড়ের তলায় লুকাইয়া লইয়া বুড়ি তাহার ঘরের দিকে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

অনাদির অশ্রু দিয়ে লভি যারে এ জীবনে হায়
অনন্তের অশ্রুপাতে তাহারে লভিনু পুনরায়

"অনাদ্যন্ত"

বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, বন্দী মোর ভগবান কাঁদে

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

ঘরের দরজায় ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীউলীর কর্কশ গলা শোনা গেল "ভর-সন্ধেয় দরজা বন্ধ কেন লা বেগুন? খোল্ না, কতক্ষণ দাঁড়াব!"

প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে একটি বিগত-যৌবনা রোগা লম্বা স্ত্রীলোক, সিল্কের একটা শাড়ী সেলাই করছিল। স্ত্রীলোকটির ঠিক বয়স আন্দাজ করা কঠিন হলেও শিল্কের শাড়ীটি যে সমস্ত উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য্য খুইয়ে বীভৎস প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছেছে এটা সহজেই বোঝা যায়।

দরজায় প্রথম আঘাত শুনে বেগুন কিসের আশায় একটু চঞ্চল হয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ীটি বিছানার তলায় লুকোবার চেষ্টা কর্‌তে গেছ্‌ল কিন্তু তারপর বাড়ীউলীর গলার স্বর শুনে সেটি আর না লুকিয়ে বিরক্ত স্বরে বল্‌লে "খোলাই আছে, জোরে ধাক্কা দাও।" তারপর আবার সেলাইএ মন দিলে।

তার হারাণ-যৌবনের সমস্ত সম্পদের মধ্যে ঐ কণ্ঠস্বরটুকু বুঝি এখনো অবশিষ্ট ছিল। কণ্ঠস্বরটি ছেঁড়া জুতোর নতুন ফিতার মত একেবারে বেখাপ্পা!

বাড়ীউলী তার বিপুল বাতগ্রস্ত দেহ নিয়ে অতিকষ্টে এক পার 'পর ভর দিয়ে বেঁকে আর একপা তুলে উঁচু চৌকাঠটা ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে বল্‌লে—"সে ছোঁড়াত আজও এল না রে বেগুন—সে এবার ভেগেছে।"

বেগুন কোন কথা না বলে নীরবে শাড়ীটা সেলাই কর্‌তে লাগল।

বাড়ীউলী তক্তপোষ কাঁপিয়ে বসে বল্‌লে "বল্‌ছিলুম কি, এই বেলা তোর তাগা জোড়াটা বিক্রী ক'রে ফেল্, শশীর বাবু ত শশীকে এক জোড়া কিনে দেবে বল্‌ছে, আমি বন্দোবস্ত ক'রে তোর তাগা জোড়াই গছিয়ে দেব'খন।

শাড়ীটা সেলাই শেষ ক'রে সেটা সন্তর্পণে পাট্ কর্‌তে কর্‌তে বেগুন বল্‌লে "আমি তাগা বিক্রী কর্‌ব না, তোমায় কতবার বলেছি তবু তুমি বিরক্ত কর্‌তে আস কেন বল ত মাসী—? এখন যাও বাবু, আমার কাজ আছে।"

অতিরিক্ত ক্রোধেও মাসীর স্থূলদেহ স্থূলতর হবার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই তার কর্কশ কণ্ঠস্বর সপ্তমে টেনে বল্‌লে—

"কেন যাব না, কেন? দে আমার দুমাসের ভাড়া দে, গাণ্ডে পিণ্ডে যে দুমাস গিলেছিস্ সেই খোরাকী দে, আমি তোর কাছে ভিখিরী হয়ে এসেছি? আমার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বেরো আমার বাড়ী থেকে, কালই আমি খেঁদিকে এনে বসাব—ঘাটের মড়া। দু-দুমাসে একটা মিন্‌সে ওর চৌকাঠ মাড়াল না ওর আবার রোখ্! কিছু বলি না বলে! ভালোমানুষীর কালই নেই, ভালো কথা বল্‌তে এলুম, না আমি বিরক্ত কর্‌তে এলুম। ভাগা বেচ্‌বি না-ত কদিন তোকে অমনি অমনি পুষ্‌ব রে মড়া?"

দম ফুরিয়ে গেছ্‌ল বলেই বোধ হয় বাধ্য হয়ে এবার চুপ করে মাসী হাঁফাতে লাগ্‌ল।

মাসীর কণ্ঠস্বরে বাড়ীময় সাড়া পড়ে গিয়েছিল, দরজার কাছে যে কয়েকজন এসে জমেছিল তার মধ্যে শশীই সব চেয়ে মাসীর আদরের—মাসী তাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিল। তার দেহে যৌবনের কমনীয়তা হয়ত ছিল না কিন্তু বাঁধুনী ছিল, উগ্রতাও ছিল, তার রোজকার বেশী ছিল বলে সে বাড়ীর সমস্ত বাসিন্দার হিংসার ঈর্ষার ও মাসীর স্নেহের পাত্রী। একটা সোনার চিরুণী হাতে ঘরের ভেতর ঢুকে সে ন্যাকামি-ভরা আদুরে নাকীসুরে বল্‌লে "ও—মাসী তুই এখানে কোঁদল কচ্ছিস্ আর আমি তোকে খুঁজে খুঁজে সারা! তুই চিরুণীটা ভাল করে গুঁজে দিবিনে ত, বেশ আমার খোঁপা খুলে যাক্।"

তারপর আবার ঠোঁট উলটে মুখ ঘুরিয়ে দরজার কাছে ফিরে গেল।

মাসী তখন ভাল করে দম ফিরে পায় নি, হাঁপাতে হাঁপাতে ক্রোধ কর্কশ গলাটাকে যথাসাধ্য মোলায়েম করে বল্‌লে "আয়না লো দিই, রাগ করিস্ কেন!"

মাসীর পাওনা সত্যি সত্যি বাকী থাকলেও অন্যদিন হ'লে বেগুন মাসীর, মুখনাড়ার প্রতিশোধ দিতে কিছুতেই পেছ্‌পা হত না। কিন্তু আজ সে চুপ করেই রইল। বুকের পুরোণ ব্যথাটা আজ আবার বেড়ে উঠেছিল। প্রত্যুত্তর দেবার লোভ সামলান শক্ত হলেও চেঁচামেচির পরিণাম শরীরের পক্ষে কখনই ভাল হবে না, হয়ত তার ফলে এই দুঃসময়ে কদিন অকর্ম্মণ্য হয়ে শয্যাগত থাকতে হবে জেনে সে অতিকষ্টে সংযত হয়ে রইল।

শশীর পায়ে জুতো লক্ষ্য করে মাসী বল্‌লে "ও আবার কি ঢঙ্ লা, মেম সাহেব হলি নাকি!

শশী আগেকার মতনই কচি খুকির গলা নকল করবার চেষ্টায় নাকীস্বরে উত্তর দিলে "বা! আজ যে একজিবিশনে যাচ্ছি, জানিস্ না বুঝি ?"

"সে আবার কি ?"

"ওমা, একজিবিশন্ গো একজিবিশন্ সায়েবদের মেলা, জানিস্ না ?"

"তা আমায় নে' যাবি না ?"

শশী মুখ বেঁকিয়ে বল্লে "হ্যাঁ তুই যে ধুম্সি, তোকে আবার নে যাবে, নড়্তে পারিস্ না, থপ্ থপ্ ক'রে চলিস, তোকে নে' গে' মুস্কিলে পড়ি আর কি ?"

একথা শশী ছাড়া আর কারুর মুখ থেকে বেরুলে মাসী সহ্য কর্‌ত না কিন্তু শশীর এখন রাজপাট্ সুতরাং অতিকষ্টে কথাটা হজম ক'রে মাসী বল্লে "বেশ আমি না হয় ধুম্সি, তুই না হয় রূপুসী, তা বলে তোর মাসী ত, তুই পারিস্ বলেই সাধ্ছি নইলে আর কাউকে কি বলতে গেছি।"

মনস্তত্বে মাসীর অশিক্ষিত পটুত্ব ছিল। রূপসী ও ক্ষমতার উল্লেখে খুশী হয়ে শশী বল্লে "আচ্ছা চ দেখি, বাবু গাড়ী আন্‌তে গেছে।"

ঝগড়া হঠাৎ থেমে যাওয়ায় দরজায় ভিড় হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। বেগুন নীরবে টীনের ভাঙ্গা পেঁট্‌রা থেকে কাপড় চোপড় বার করায় মন দিয়ে ছিল।

'সায়েবদের মেলায়' যাবার আশায় আপাততঃ রাগটা কিছু ভুলে, মাসী শশীকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল "খোরাকী আর ভাড়া না পেলে বাছা বলে যাচ্ছি, কাল থেকে আমার বাড়ীতে আর তোমার জায়গা হ'বে না।"

"আচ্ছা আজই ভাড়া দেব" বলে বেগুন দরজাটা সশব্দে ভেজিয়ে দিলে। তারপর তাড়াতাড়ি সাজ পোষাক কর্‌তে মন দিলে। আজকের এই একজিবিশন্‌ই তার একমাত্র আশা। সত্যই দুমাস তার ঘরে কেউ আসে নি, দুমাস ধরে মাসীর কাছে ধারে খাচ্ছে। প্রদীপের তেলটুকুও আজ ক্ষ্যান্তর অনুপস্থিতিতে তার ঘর থেকে না বলে নিয়ে এসেছে। মাসী যে পয়সা না পেলে এতদিনের বাসিন্দা বলে একটুও খাতির রাখ্‌বে না একথা সে ভাল রকমই জান্‌ত। আজ কোন রকমে শীকার হাত্‌ড়ান চাইই। তাই সাদ্ধাতার আমলের সিল্কের শাড়ীটা এতক্ষণ ধরে সে সেলাই করেছে। আজ একজিবিশনে গেলে, রাত্রের মত খাওয়া বন্ধ জান্‌লেও এখন জলখাবারের জন্যে অপব্যয় কর্‌বার তার একটা পয়সাও নেই। তার শেষ আধুলিটি টিকিট্ কেন্‌বার জন্যে রাখ্‌তেই হবে। প্রদীপের স্তিমিত আলোর সামনে সে চুলটা বাঁধতে গেল। ডানদিকে কপালের ওপরেই চুল অত্যন্ত পাতলা হয়ে টাক পড়বার মত হয়েছে, সেখানটা যথাসাধ্য অন্যদিকের চুল টেনে

ঢেকে সে খোঁপা বাঁধ্‌লে। একটি মাত্র ভাল যে সেমিজ ছিল তা ধোপা বহুদিন থেকে পয়সা না পেয়ে আর ফেরৎ দিয়ে যায় না—সুতরাং পুরোণ আধ-ময়লা সেমিজটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। পাউডারের কৌটো বহুদিন খালি! কেরাসিনের ডিবের আলোয় খড়ির গুঁড়ো ধরা পড়ে না কিন্তু একজিবিশনের উজ্জ্বল আলোতে খড়ির গুঁড়ো মেখে যেতে তার সাহস হ'ল না। দুই চোখের কোণের কালীভরা কোটর, লুকোবার কোন উপায় নেই। তাদের ব্যবসায়ে ভাল সাজপোষাকের মূল্য যে কত, তা সে বেশ জানে, বিশেষতঃ এই যৌবনের পারে এসে মানুষের চোখে ধাঁধা লাগাতে হলে সাজপোষাকের অন্তরালে আসন্ন-বার্দ্ধক্যের কুশ্রীতা গোপন না করলে সে চল্‌তেই পারে না। কিন্তু বেশ-ভূষা দূরের কথা কিছুদিন ধরে দুবেলার উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ অন্নসংস্থান করাও তার পক্ষে বিশেষ কঠিন হয়ে উঠেছে! যে তাগা জোড়া বিক্রী কর্‌বার পরামর্শ দিতে এসে মাসী এইমাত্র ঝগড়া ক'রে গেছে, সেই তাগা জোড়াটা বার করে নিয়ে পর্‌লে। কেন সে তাগা বিক্রী কর্‌তে চায় না, তা যদি মাসী জান্‌ত! তার শেষ সোনার অলঙ্কার যে বহুদিন আগে অভাবের তাড়নায় বিক্রী হয়ে গেছে, একথা জানিয়ে, তার তাগাজোড়া এবং সমস্ত গহনাই যে গিল্টি এই সংবাদ দিয়ে সে আর বাড়ীর সবার কাছে ছোট হ'তে চায় না।

শেষকালে কিন্তু শশীর কথা মনে ক'রে সে তাগা-জোড়া খুলে রাখলে। বহুদিন আগে তার এক সৌখীন সাহেবি-ঘেঁষা প্রণয়ী জুটেছিল। সে তাকে জুতো পরিয়ে বিবি সাজিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। তারি দেওয়া এক জোড়া হিল্‌-তোলা জুতো বহুদিন পেঁট্রার এক কোণে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে ছিল। আজ সেটিকে বার ক'রে ভাল করে পরিষ্কার ক'রে সে অনেকদিন বাদে পায় দিলে। জুতোর সঙ্গে তাগা মানাবে না ভেবে, সে তাগা জোড়া খুলে রেখেছিল।

সাজ-গোজ সমস্ত ক'রে যখন সে পথে বেরুল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। অনেকখানি পথ হেঁটে যেতে হবে। অনেকদিন বাদে জুতো পায়ে দিয়ে চল্‌তে একটু অসুবিধা হচ্ছিল কিন্তু একেবারে অনভ্যস্ত নয় বলে তার চলন নিতান্ত অস্বাভাবিক হয় নি।

চৌরঙ্গীর চৌমাথা পার হবার সময়, দুজন লোক তার সম্বন্ধে একটা অভদ্র ইঙ্গিত ক'রে হেসে উঠ্‌ল। তার আকর্ষণীশক্তি একেবারে লোপ পায় নি মনে ক'রে বেগুন একটু খুসী হয়ে উঠ্‌ল।

টিকিট বিক্রেতা মনস্তত্ত্ববিদ্‌ নয়; তাদের সে অবসরও নেই, নইলে সেদিন

দক্ষিণ তোরণের টিকিট-ঘরের কাউণ্টারে আধুলী দিয়ে টিকিট নেবার সময় একটি শিরওঠা কঠিন সৌষ্ঠবহীন হাতের কাঁপুনিতে তারা অনেক কিছু দেখ্‌তে পেত। এটি বেগুনের শেষ আধুলী।

আলোকের উন্মত্ত উৎসব! অসংখ্য উৎসবমত্ত মানুষের কোলাহলে, দূরের ব্যাণ্ডের অপরিস্ফুট সুরধারার মাধুর্য্য ও সমস্ত আনন্দ-সমারোহের ওপর অতল গভীর স্নিগ্ধ নক্ষত্রে খচিত রহস্যাবরণ, বেগুনের কুটিল জীবন, পথক্লান্ত, নিত্য অবহেলার মরুচেপড়া মনের কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল।

মেহেদি গাছের বেড়া-দেওয়া বাঁদিকের অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পথটা দিয়ে সে এগিয়ে চল্‌ল। দুর্ব্বল শরীরে এতখানি হেঁটে এসে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ কর্‌ছিল। বুকের ভেতর মাঝে মাঝে পুরাণ বেদনাটা তাকে পরিহাস করবার জন্যই যেন মাঝে মাঝে চিড়িক্ দিয়ে উঠ্‌ছিল। কিছুদূর গিয়েই অল্প অন্ধকারে একটা খালি বেঞ্চি দেখে কিছু জিরিয়ে নেবার জন্যে সে বসে পড়্‌ল। এ পথটা দিয়ে লোকজনের যাতায়াত অপেক্ষাকৃত কম। সাম্‌নেই একটা বৈদ্যুতিক বাতীর পোষ্ট কিন্তু তাতে আলো ছিল না। বেগুন কতকটা নিজের অজ্ঞাতে ও কতকটা সজ্ঞানে আসন্ন-সংস্থানের জন্যে যেন শক্তি সংগ্রহ করছিল। কিছুক্ষণ অবসন্ন ভাবে বসে থাক্‌বার পর হঠাৎ পাশে চোখ পড়াতে সে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে উঠ্‌ল। তার অলক্ষ্যে কে একজন বেঞ্চির অন্য পাশে এসে বসেছে! অন্ধকারে তার মুখ ও বেশ-ভূষা ভাল ক'রে দেখা না গেলেও, সে যে পুরুষ এবং বলিষ্ঠ পুরুষ তা বুঝ্‌তে বিশেষ কষ্ট হল না। বেগুন সজাগ ও উদ্‌গ্রীব হয়ে ভাল ক'রে বস্‌ল। ডান পায়ের জুতো মাটিতে ঠুকে বার কয়েক শব্দ কর্‌লে এবং মাথার কাপড় ফেলে হঠাৎ খোঁপার কি ত্রুটি শোধ্‌রাতে বিশেষ ক'রে মন দিলে।

সামনের বাতিটা কোন কারণে নিশ্চয় খারাপ হয়েছিল। একজন মিস্ত্রী সেটা জ্বালাবার চেষ্টা কর্‌ছিল! হঠাৎ বাতিটা পলকের জন্যে জ্বলেই নিবে গেল! ঐ পলকটিতে লোকটাকে দেখে নেবার সুযোগ কিন্তু বেগুনের হয়নি। যাই হোক্ লোকটা তাকে দেখ্‌তে পেয়েছিল নিশ্চয়ই। অন্ততঃ সেও একবার তার দিকে একটু পাশ ফিরে একটা পায়ের ওপরে পা তুলে দিয়ে বস্‌ল। মাথার খোঁপার কাল্পনিক ত্রুটি শুধ্‌রে বেগুন বেশ একটু জোরেই হাতটা নামালে। হাতের গিল্টির চুড়িগুলি বেজে উঠ্‌ল—রিন্-ঠিন্-রিনি-ঠিন

অন্ধকারে কালবর্ণ লোকটা তার দিকেই চেয়ে আছে কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকেও তার দিক থেকে অগ্রসর হবার কোন লক্ষণ পাওয়া গেল না। বেগুন একটু অধীর হয়ে উঠ্‌ল। তবে কি লোকটা এখনো বোঝেনি, না কোন গোবেচারী গোছের চাষা ভূষো হবে?

আলোটা জ্বলে না কেন? কিন্তু এই বেশ ভূষা নিয়ে আলোর চেয়ে অন্ধকারই যে তার পক্ষে সুবিধার একথা সে জান্‌ত। কিরকম লোক না জেনে আরো অগ্রসর হওয়া হবে কি না ভাবছিল এমন সময় লোকটা একবার কাশ্‌লে! বেগুন ও একবার কাশ্‌লে। লোকটা আবার কাশ্‌লে!

বেগুনের বুকটা আশায় জ্বলে উঠ্‌ল! এ যে জোর ক'রে নকল কাশ্‌বার চেষ্টা, তা বোঝা আর কঠিন নয়। আঁচল থেকে ধীরে চাবিটা খুলে বেগুন পায়ের কাছে ফেলে দিলে। তারপর খানিক খোঁজ্‌বার ভান্ ক'রে লোকটার দিকে ফিরে বল্‌লে "আপনার কাছে কি দেশলাই আছে? আমার চাবিটা একটু খুঁজে দেখ্‌ব—"

লোকটা চম্‌কে উঠ্‌ল। সত্যি সে কণ্ঠস্বর চম্‌কাবার মত। এই কণ্ঠ-স্বরটিতে এখনও কৈশোরের অপরূপ কোমলতা ও যৌবনের অসীম মাধুর্য্য ও স্নিগ্ধ মাদকতা অটুট্ হয়েছিল! আর সে স্বরে ছিল—নিখিলের সুষমাময় নারীত্বের প্রচ্ছন্ন বিস্ময়ের আভাষ!

এই পতিতার জীর্ণ জীবনের জঞ্জালে এই সদ্য-ফুট শেফালির মত সৌরভ-শুচি কণ্ঠস্বর কেমন ক'রে থাক্‌তে পারে এইটেই আশ্চর্য্য! লোকটা চম্‌কে উঠে ছিল কারণ সে এতটা আশা করে নি।

লোকটি নীরবে পকেট থেকে একটা দেশলাই বার ক'রে বেগুনের প্রসারিত হাতে গুঁজে দিলে।

বেগুন নীচু হয়ে দেশলাই জ্বেলে চাবী খোঁজ্‌বার ছল কর্‌বার মধ্যেই টের পেলে লোকটা আর একটু সরে এসে বস্‌ল।

সামনে ইলেক্‌ট্রি্‌ক বাতিটা আর একবার জ্বলে উঠ্‌ল কিন্তু বেগুন মুখ তুলে লোকটাকে দেখ্‌বার আগেই আবার নিভে গেল। বেগুন মনে মনে বাতির ও বাতিওয়ালার সপ্তম পুরুষ উদ্ধার ক'রে আবার আর একটা দেশলাই জ্বাল্‌লে। বাতিটা যেন ইচ্ছে করেই তার সঙ্গে তামাসা কর্‌ছিল। এবার আর চাবী খুঁজে পেতে দেরী হল না। দেশলাইটা ফিরিয়ে দেবার ছলে বেগুন লোকটার হাতে একটা আঙ্গুল দিয়ে ধীরে আঘাত কর্‌লে তারপর আর একটু ঘেঁসে বস্‌ল।

বল্‌লে "ভাগ্যিস্ আপনি ছিলেন, নইলে এই অন্ধকারে চাবী খোঁজা কি সোজা!—"

লোকটা কোন উত্তর দিলে না শুধু অন্ধকারে একটা হাত বেগুনের কোমরে এসে ঠেক্‌ল! বেগুন সে হাতটা বাঁ হাতের মুঠোয় খপ্ ক'রে ধরে ফেলে একটু চাপ্ দিলে। অন্ধকারের মধ্যে স্পর্শ ক'রে বেগুন অনুভব কর্‌ছিল, হাতটা অত্যন্ত লোমশ্ ও তার চামড়া অত্যন্ত কর্কশ—লোকটা দেখ্‌তে খুব সুশ্রী বোধ হয় হবে না—তা না হোক্!

বার কয়েক মিট্ মিট্ ক'রে সামনের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠ্‌ল।

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় আতঙ্কে লোমশ হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেগুন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটার ওপরের ঠোঁট একেবারে নেই—মাড়ি থেকে লম্বা অপরিষ্কার দাঁতের পাতি, সেই ভয়ঙ্কর ক্ষত থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত মুখটাকে বীভৎস ক'রে তুলেছে, আর তার বাঁ দিকের সমস্ত গাল কবে যেন আগুনে ঝল্‌সে পুড়ে বিকৃত বিবর্ণ মাংস পিণ্ড হয়ে গেছে!

লোকটা বেগুনের এই আতঙ্কে একটুও হতভম্ব হয় নি এমন নয় কিন্তু সে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। বেগুন তার দিকে আর না চেয়ে এগিয়ে চল্‌ল। অনেক সময় ও অনেক কলা কৌশল তার বৃথা নষ্ট হয়েছে সত্য কিন্তু তা বলে ঐ দুঃস্বপ্নের সঙ্গে সে স্ফূর্তি করতে পারে না। এর চেয়ে ভাল শীকার সে নিশ্চয় জোগাড় করতে পার্‌বে।

অনেক দিন বাদে জুতো পায়ে দিয়ে অতখানি হেঁটে পায়ে ফোস্কা পড়ে ছিল এবং একটানা চলার সময় তার বেদনা বিশেষ কিছু অনুভব না কর্‌লেও অনেকক্ষণ জিরোবার পর এখন হাঁটা একটু কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন জুতো খুলে ফেলাও অসম্ভব, খুঁড়িয়ে হাঁটলেও হাস্যাস্পদ হ'তে হয় সুতরাং যন্ত্রণা গোপন ক'রে সে যথাসাধ্য স্বাভাবিক ভাবে হাঁট্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। তাকে হাঁট্‌তেই হবে যে। কিছু দূর গিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকালে। লোকটা তখনও তার দিকে চেয়ে সেই বেঞ্চিতেই বসে ছিল।

নির্ম্মম জুতোর নিঃশব্দ পীড়ন সহ্য করা বিশেষ কঠিন হয়ে উঠ্‌লেও সে অনেকক্ষণ নানাদিকে ঘুরে বেড়াল। মেলার মজা ও আমোদ লক্ষ্য করবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। চারিদিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে শীকার অনুসন্ধান করাতেই সে একেবারে তন্ময় হয়ে ছিল। যত সময় যাচ্ছিল তার আশঙ্কা ও অস্থিরতা তত বেড়ে উঠ্‌ছিল। এ পর্য্যন্ত কোন সুবিধা সে করতে পারে নি।

কয়েকজন নিঃসঙ্গ পুরুষের আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়ে ও কয়েকজনকে দৃষ্টির ইঙ্গিতে আকর্ষণ করবার চেষ্টা ক'রে কোন ফল হয় নি।

শাখায় শাখায় লাল বাতি-দেওয়া ঝাঁকড়া একটা গাছের তলায় বেশী ভীড় জমে ছিল। সেটা জুয়ার আস্তানা। লোহার পায়ের ওপর ঘুরে ঘুরে একটা ছ-কোণা কাষ্ঠখণ্ড খেলোয়াড়দের ভাগ্য নিরূপণ করছিল। বেগুন যখন গিয়ে সেখানে দাঁড়াল তখন ভাগ বাঁটরা হচ্ছে—এক তরফা খেলা শেষ হয়ে গেছে।

একটি বামনাকার স্থূলকায় লোক স্মিতবদনে এক তাড়া নোট, পকেটে পুরছিলেন। খুশীতে তার দুভাঁজ চিবুক তিন ভাঁজ হবার চেষ্টায় ছিল। বেগুন ঠেলেঠুলে তার পাশে জায়গা ক'রে নিলে। তার ঠিক বিপরিত দিকে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে একটি ফিরিঙ্গি যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কি বলছিল। তাদের কথাবার্ত্তা না বুঝলেও হাব-ভাবে বেগুন বুঝতে পারলে ছেলেটি সম্প্রতি অনেক লোকসান দিয়ে আর খেলতে না চাইলেও মেয়েটি তাকে ছাড়তে দিতে চায় না।

ইতিমধ্যে মোটা ভদ্রলোক পাঁচ নম্বরে একটা দশ টাকার নোট ধরেছেন। আবার কাষ্ঠখণ্ড ঘুরল। তারপর চারদিক থেকে কোলাহল উঠল, চার নম্বর মার দিয়া!

মোটা ভদ্রলোক রাগে টেবিল চাপড়ে আর একটা দশ টাকার নোট বার করলেন। ওদিকে ফিরিঙ্গি ছেলেটির সাথে মেয়েটির বচসা সুরু হয়েছিল। ছেলেটি এবারেও হেরেছে ও মেয়েটি আর একটি ফিরিঙ্গি বুড়োর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খানিক বচসা ক'রে ছেলেটি মুখ রাঙা ক'রে চলে গেল। বেগুন মোটা লোকটির আরো কাছ ঘেঁসে একবার জুতো দিয়ে তাঁর পাটা মাড়িয়ে দিলে। তৎক্ষণাৎ আবার ক্ষমা চেয়ে সে বলতে যাচ্ছিল "মাফ করবেন দেখতে পাইনি।" কিন্তু লোকটির কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না, তিনি তার জুতোর চাপ টেরই বোধ হয় পান নি!

আবার খেলা সুরু হ'ল। এবার নম্বর উঠল 'দুই'। মোটা লোকটির টাকা ছিল তিনে।

পেছন থেকে একটা ধাক্কা এল! বেগুন সামলাতে না পেরে ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরলে।

"এইও পাজী বদ্‌মাস!" ভদ্রলোক এক ঝট্‌কায় তার হাত দুটো ছাড়িয়ে তাকে অন্য পাশে ছিটকে দিলেন। বেগুন এবার সত্য সত্যই অতি কষ্টে পেছনের লম্বা চওড়া শিখের গায়ে ভর দিয়ে টাল্ সাম্‌লালে।

"আরে হিঁয়ে ত মরু যাওগে" বলে শিখ্ তাকে ভিড় থেকে ঠেলে বার ক'রে দিলে। সে অন্যদিকে ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে আর তার সাহস হচ্ছিল না। ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে সে এর পর কি করা যায় ভাবছিল।

যে সব পথে সারি সারি আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত দোকানের সামনে দিয়ে অসংখ্য লোকজন যাতায়াত করছিল সেখানে তার যাবার উপায় নেই। তার সাজ সজ্জার অসংখ্য ত্রুটি তার অতৃপ্তিত যৌবনের কুশ্রীতা সেখানে আলোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাবে। নিশাচর শ্বাপদের মত তার অন্ধকারের সঙ্গেই আত্মীয়তা। একটি বয়স্ক সুবেশ বলিষ্ঠকায় ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাবার সময় তার দিকে একবার চেয়ে গেলেন। খানিক দূর গিয়ে আর একবার ফিরে চাইলেন তারপর ডানদিকের ঝিলের ওপরকার ছোট সাঁকো পার হয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বেগুন সন্দিগ্ধ মনে তাঁর পিছু নিলে। সাঁকো পার হয়ে একটা ছবির ঘরে গিয়ে বেগুন আবার তাঁকে দেখ্‌তে পেলে। ভদ্রলোক ব্যস্ত ভাবে যেন কি খুঁজ্‌ছিলেন। সে বিপরীত দিক্ দিয়ে ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছবির প্রতি বিশেষ মনযোগ দিলে। ভদ্রলোক বোধ হয় তাকে লক্ষ্য করেন নি। হঠাৎ বেগুন তাঁর দিকে ফিরে বল্‌লে "আচ্ছা তের বছরের মেয়ে এমন ছবি আঁকতে পারে?"

ভদ্রলোক বোধ হয় শোনেন নি, কোন উত্তর দিলেন না। বাম পাশ থেকে কে মিহি গলায় বল্‌লে "হাঁ, তের বছরের মেয়ে আবার অমনি আঁক্‌তে পারে! ও অমনি বাড়িয়ে লিখেছে।"

পেছনে শশী, তার জিরাফ-গর্দ্দান, কাঠঠোক্‌রা-মুখো বাবু ও মাসীর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। বেগুন আশ্চর্য্য হয়ে ফিরে তাকালে। মাসী একবার তার বেশের দিকে চেয়ে নাক সিঁটকে মুখ ফেরালে। শশী একটু হাস্‌লে। কিন্তু তখন শশীর সালঙ্কারা সৌভাগ্য-গর্ব্বিত যৌবনের সঙ্গে নিজের তুলনা ক'রে ঈর্ষান্বিত হবার সময় তার ছিল না। ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন; বেগুন তাঁর পিছু নিলে। মাসী পেছন থেকে বল্‌ছে শুন্‌তে পেলে "ওই রূপের আর দেমাক দেখে বাঁচি না।—"

ভদ্রলোক বেশ জোরে হাঁট্‌ছিলেন। হয়ত এ অনুসরণে কোন লাভ হবে না ভেবেও এবং পায়ের যন্ত্রণা সত্ত্বেও বেগুন যথা সাধ্য জোরে হাঁটতে সুরু করলে। প্রকাণ্ড একটা নাগর দোলার সামনে গিয়ে তিনি বস্‌লেন। বেগুন এবার মরিয়া হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাতটা খপ্ ক'রে ধরে ফেলে বল্‌লে—"আসুন না ঐ চেয়ারটা খালি আছে।"

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে চাইলেন। ভদ্রলোক শুনতে পান নি ভেবে বেগুন কম্পিত বুকে, হাতে একটু টান দিয়ে বিবর্ণ-মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা ক'রে আবার বল্‌লে "আসুন না ওই দোলাটায় একবার চড়ে আসি।" কিন্তু তৎক্ষণাৎ সভয়ে তাঁর হাত ছেড়ে দিলে। ভদ্রলোকের মুখে চোখে অসীম বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ ফুটে উঠে ছিল। এমন দুঃসাহস অবশ্যই তিনি আশা করেন নি। ক্রোধ-কটুকণ্ঠে তিনি বল্‌লেন "তোমার এই বেয়াদবীর জন্তে তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি জান?—নচ্ছার পাজী মেয়েমানুষ কোথাকার!—"

বহুদিনের পুরাতন বেদনাটা আবার বুকের পাঁজরায় পেরেক ঠুক্‌ছিল। ভদ্রলোক বল্‌ছিলেন "তোমার এতবড় আস্পর্দ্ধা—"

হঠাৎ পাশ থেকে একটি ছেলে ডাক্‌লে "বাবা! ওমা এই যে বাবা।" আধা ঘোম্‌টা দেওয়া একটি স্ত্রীলোক কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বেগুন ভদ্র-লোকের ক্ষণিকের অন্তমনস্কতার সুযোগে সেখান থেকে সরে গেল। খানিক দূর গিয়ে একটা চেয়ারে সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়্‌ল। মাথাটা ঘুরছিল, চোখেও যেন একটু ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছিল—এখন যদি একটু মদ পেত!

কিন্তু ক্রমশঃ সময় যাচ্ছে। আজ যাহোক্ কিছু রোজগার করা চাই-ই। এখন মনে হচ্ছিল, সেই প্রথম শীকার অবহেলা করা হয়ত উচিত হয় নি কিন্তু সে যে ভাবতেও গা শিউরে ওঠে! কিছুক্ষণ পরে এক জড়ভরতকে কাঁধে ভর করিয়ে এনে একটি মেয়ে তার সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিলে। মেয়েটি যে তারই সম-শ্রেণীর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু এই অষ্টাবক্র মূর্ত্তিমান জরাকে কোথা থেকে সে পাকড়াও করলে!

বুড়োকে চেয়ারে বসিয়ে মেয়েটা বল্‌লে "খবরদার এখান থেকে নড়িস্ নি বুড়ো তাহলে তোর হাড়মাস আর এক জায়গায় রাখ্‌ব না।" বুড়ো সুরা-জড়িত কণ্ঠে অস্পষ্টভাবে কি বল্‌লে বোঝা গেল না। মেয়েটা বল্‌লে "দে টাকা এক বোতল আনি" তারপর বুড়োর পকেটে হাত দিলে! কিন্তু এ বিষয়ে বুড়ো এখনও খুব সজাগ, সে আর্ত্তকণ্ঠে বিকৃত স্বরে চিৎকার ক'রে বল্‌লে "ঐ নিলে, সব চুরী ক'রে নিলে!" মেয়েটা বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বল্‌লে "দে তবে হতচ্ছাড়া তুই নিজেই দে।" বুড়ো পকেট থেকে একটা নোট কম্পিত হাতে বার ক'রে দিলে; মেয়েটা চলে গেল।

বেগুন নীরবে সমস্ত লক্ষ্য করছিল। বুড়োর যেমন রূপ তেমনি বেশ!

তার দেহের গঠন দেখ্‌লে মনে হয়, মাত্র সম্প্রতি সে চতুষ্পদে চলা ত্যাগ করেছে। তার কুৎসিত মুখের লোল-মাংসে ও প্রতি রেখায় সারাজীবনের পৈশাচিক ইতিবৃত্ত লেখা। শীর্ণ দেহে একটা ময়লা চাপ্‌কান এবং সে চাপ্‌কানের ওপর আবার এক দুর্গন্ধ নোংরা চাদর, গলায় কম্ফোর্টার জড়ান, পাঁকাটির মত সরু ধনুকের মত বাঁকা পায়ে লাল মোজা ও ক্যাম্বিশের ছেঁড়া জুতো। ঐ ধ্বংসাবশেষের মাঝে মৃত্যুর ভ্রূকুটির তলেও কদর্য্য কামনার বীভৎস উৎসবের লীলা আজও থামে নি! বেগুনের নিসাড় মনেও ঘৃণা ও বেদনা জাগ্‌ছিল।

কিন্তু বৃদ্ধের পকেট টাকায় ভরা! ঐ মেয়েটার বদলে যদি সে নিজে আজ একে শীকার কর্‌তে পার্‌ত; কিছু দিনের দুর্ভাবনা অন্ততঃ ঘুচ্‌ত। এক-বার ইচ্ছে হ'ল যে মেয়েটার অনুপস্থিতিতে বুড়োকে ভুলিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যায়। কিন্তু সাহস হ'ল না। মেয়েটা যদি আর না আসে, তা হ'লে হয়ত ভালো হয় কিন্তু সে সম্ভাবনা খুব কম। মেয়েটার কিন্তু অনেক দেরি হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মেয়েটিকে আর ফির্‌তে না দেখে বেগুন অবশেষে আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না। বৃদ্ধ বোধ হয় ঝিমোচ্ছিল। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে বস্‌ল। পকেট থেকে মনিব্যাগটা উঁকি মার্‌ছিল। একবার ইচ্ছে হ'ল, এই অবসরে মণিব্যাগটা নিয়ে সরে পড়ে; কোন হাঙ্গামা নেই, কেউ দেখ্‌তেও পাবে না। কিন্তু সে সাহস হ'ল না, বুড়ো সে সুযোগ দিলেও না। হঠাৎ চোখ চেয়ে বল্‌লে "কে রূপো এলি? দে বোতল দে।"

বেগুন বল্‌লে "আমি রূপো নই—"

"আচ্ছা তুই সোনা, দে এখন বোতল দে।"

সে হাত বাড়ালে।

"বা, আমি বোতল কি জানি!"

বুড়ো এবার চটে উঠে বল্‌লে "আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? দে বল্‌ছি বোতল।"

বেগুন বুড়োকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লে "মর বুড়ো, আমি কি তোর রূপো, তোর রূপো চম্পট দিয়েছে।"

বুড়ো এবার সচেতন হয়ে উঠ্‌ল। বেগুনের দিকে চেয়ে বল্‌লে "কোথায় গেল রূপো! তুই কে!" তারপর দুর্ব্বল পায়ে ওঠ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে। বেগুন তাকে নিরস্ত কর্‌তে গেল। বুড়ো চীৎকার ক'রে বল্‌লে "না-না আমার রূপোকে খুঁজ্‌ব, ছাড়্‌ তুই মাগী। কিন্তু বুড়োর ওঠ্‌বার ক্ষমতা ছিল না। বেঞ্চিতে

আবার টলে পড়্‌ল। বেগুন, বৃদ্ধের গলা বাহু দিয়ে বেষ্টন ক'রে বল্‌লে "রূপো থাক্‌গে আমি তোকে বোতল দেব, চ আমার সঙ্গে।"

"না-না আমার রূপোকে চাই।" বৃদ্ধ বেগুনের বাহুর বেষ্টন থেকে মুক্ত হবার দুর্ব্বল চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। বৃদ্ধের বুকে মাথাটা রেখে বেগুন ফুঁপিয়ে কান্নার অভিনয় ক'রে বল্‌লে "ভালবাসলেই এমনি ক'রে কাঁদাতে হয়, কে তোর রূপো? তোকে ফেলে পালিয়ে গেল আর আমি তোকে সাধছি তবু আমায় পায়ে ঠেল্‌ছিস্।" অভিনয়ে চির অভ্যস্ত এই পতিতার পঙ্কিল হৃদয়ও সে জঘন্য অভিনয়ে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠ্‌ছিল—কিন্তু উপায় নেই—

বুড়োকে রাজী করিয়ে অনেক কষ্টে তাকে গেটের কাছাকাছি যখন আন্‌তে পারলে তখন বেগুনের একটু আশা হ'ল। এই দুর্ব্বল অসুস্থ শরীরে এই অথর্ব্ব বুড়োর ভার বয়ে আনা সহজ নয়। বেগুনের সমস্ত দেহ ভেঙে পড়্‌তে চাইছিল কিন্তু গেটের কাছে পৌঁছালেই কিছু দিনের মত দুঃখের অবসান হবে ভেবে, আশায় সে প্রাণপণে এগিয়ে চলেছিল। পেছন থেকে কে হাঁক্‌লে "এই ও খাড়া হো যাও—"

বেগুন তখনও এগিয়ে চল্‌ছিল। লাল পাগ্‌ড়ী-পরা পাহারাওয়ালা পেছন থেকে ছুটে এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে বল্‌লে "এত্তা চিল্লাতা, শুন্‌তা নেহি?"

সভয়ে বেগুন দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। বৃদ্ধের শিথিল প্রায় দেহ তার কাঁধে ঝুল্‌ছিল।

"ইতো মাতোয়ালা হ্যায়, ছোড়্‌দো ইসকো—।"

বৃদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে বল্‌লে "হ্যাঁ বাবা মাতাল হ্যায়।" বেগুন হতাশ হয়ে শেষ চেষ্টা করলে, বল্‌লে "আমার স্বামী যে পাহারাওয়ালা সাহেব!" দু'চারজন লোক মজা দেখ্‌তে জড় হয়ে ছিল, তারা হেসে উঠ্‌ল।

"চুপ্‌ বদমাস মাগী, দিল্লাগি কর্‌তা—" পাহারাওয়ালা বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে গেল। অনেক দিন বাদে বেগুনের চোখ সজল হয়ে উঠ্‌ছিল বোধ হয়।

লোকের ভিড় অনেক কমে গেছ্‌ল। রাত্রি অনেক হয়ে এসেছে। যে পথে প্রথম একজিবিশনের ভেতর গিয়েছিল সেই পথেই আবার চল্‌তে আরম্ভ করলে। এখন তার মনে হচ্ছিল প্রথম সুযোগ ত্যাগ করা তার ভয়ানক বোকামী হয়েছে!—ভাগ্যহীনার আবার সুরূপ কুরূপ!

বেঞ্চিটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। তার ওপর কে যেন শুয়ে আছে মনে

হ'ল। ভাগ্যের এত পরিহাসের পর আর দুরাশা করতে তার প্রবৃত্তি ছিল না। বেগুন কিন্তু নিজের সৌভাগ্য সে প্রথম বিশ্বাস করতেই পারছিল না। যাকে দেখে সে কিছু পূর্ব্বে আতঙ্কে শিউরে উঠে ছিল তার সেই বীভৎস মূর্ত্তিই খানিক পরে তার এত আনন্দের কারণ হবে একথাও সে কল্পনা করতে পারে নি! সেই 'দুঃস্বপ্নই' বেঞ্চির ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। মনের অদ্ভুত বিতৃষ্ণাভরা আনন্দ দমন ক'রে সে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললে "রাত ত অনেক হয়ে গেছে।" এই জাগানোর অধিকার নিয়ে কোন সন্দেহ কোন সঙ্কোচ কোন দ্বিধা তার মনে আর ছিল না।

লোকটা হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে তার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল! লোকটার গায়ে খাকি ছেঁড়া কোট, পরণে আধময়লা কাপড় দেখে নিম্নশ্রেণীর মিস্ত্রী বলে মনে হয়। লোকটার হাতধরে তুলে বললে "চল, যাবে না?"

প্রথম ঘুমের ও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে লোকটা দুহাতে চোখ রগড়ে উঠে দাঁড়াল। মেলায় লোক আর ছিল না বললেই চলে। তারা দুজনে পাশাপাশি এগিয়ে চলল। ক্ষুধায় শ্রান্তিতে বেগুনের পা আর চলে না—আর চলছিল না। খাবারের দোকানের সামনে এসে বেগুন তাকে থামিয়ে বললে "দাঁড়াও, কিছু খাবার আনি, কিছু রেস্ত বের কর দেখি।"

লোকটা ধীরে ধীরে একে একে তিনটে পকেটের ভেতরকার কাপড় উল্টে দেখালে।

কিছুক্ষণ নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে বেগুন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগল "মিনি-পয়সায় ইয়ার্কি দিতে এসেছ হারাম জাদা চোর।—"

লোকটা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার অন্তরের কোন ভাবই মুখের বিকৃত ভগ্ন আয়নায় প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা ছিল না। বেগুন হতাশ হয়ে আর একবার তার পকেট ও পয়সা লুকোবার সমস্ত সম্ভব স্থান নিজে হাতড়ে দেখলে। একটি দেশলাই ও গুটিকতক বিঁড়ি ছাড়া তার কোন সম্বল ছিল না!

দাঁতে দাঁতে চেপে অসীম অসহায় হতাশায় ভাগ্যের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার চরম প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় সেই কদর্য্যকহীন মূর্ত্তিমান দুঃস্বপ্নের হাত ধরেই বেগুন বললে, "চল—"

এবার তাদের পথে কেউ বাধা দিলে না।

শীতের নিশ্বাস

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

একটি আসন্ন-যৌবনা শ্যামা কৃশতনু কিশোরীর মত সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নেমে এল মাটীর বুকে!

পালঙ্কের ওপর একটি রোগা ম্লান মেয়ে একমুঠো বাসি ফুলের মত লুটিয়ে পড়ে ছিল, তার শিয়রে বসে সেবা কর্‌ছিল—একটি কৃশ ম্লান ছেলে।

আকাশে দু-একটি ক'রে তারা ফুটে উঠ্‌ছে।

ছেলেটি বল্‌লে, 'আলোটা জালিয়ে দিই?'

মেয়েটি করুণ সুরে বল্‌লে, 'না চাইনে আলো। তুমি উঠো না।—উনি কোথায়?'

'বেড়াতে পাঠিয়েছি জোর ক'রে। খালি ভাবে, আর মুখ ভার ক'রে পড়ে থাকে।'

'হাঁ বেশ করেছ। বালিশটা থেকে মাথাটা তোমার কোলের ওপর টেনে নাও না একটু।—একটু নাও।'

ছেলেটি ধীরে-ধীরে মেয়েটির রুক্ষ শুক্‌নো চুলগুলি, সিঁথির দুই পাশে একটু গুছিয়ে দিলে। আস্তে-আস্তে বালিশটা থেকে মাথাটি কোলের ওপর তুলে নিয়ে কপালে আল্‌গোছে আঙুলগুলি বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

অন্ধকারে চোখ দুটি একটু তুলে মেয়েটি বল্‌লে,'আমি জান্‌তাম তুমি আস্‌বেই। তুমি না এসে পার না।—তোমাকে না দেখে আমি মর্‌তে পার্‌ছিলাম না। আমার হাতটা একটু ধর।'

মেয়েটির শুক্‌নো একখানি হাত ছেলেটি আস্তে স্পর্শ কর্‌লে।

মেয়েটি বল্‌লে, 'তোমাকে আজ কি যে বল্‌ব ভেবে পাচ্ছি না! কত কথা যে বল্‌তে ইচ্ছা হয়, পারি না। সেদিনও পারি নি আজও পারব না।'

ছেলেটি বল্‌লে, 'চুপ ক'রে লক্ষ্মীটির মতো ঘুমোও। বেশী বক্‌লে যে বুক-ব্যথা ক'রে উঠ্‌বে আবার।'

'হাঁ ভারী ঘুমিয়ে পড়্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে কিন্তু, তোমার কোলের ওপর মাথা

রেখে শুয়ে! ভারী মিষ্টি লাগ্ছে তোমার আঙুলগুলি!—আজ আমাকে একটু কথা বল্‌তে দাও। তুমি আরেক বার না বললে হয়ত তোমার কথার অবাধ্য হতে ইচ্ছা কর্‌বে না। কিন্তু আমি ত চলেই যাচ্ছি। গোপনে একটি কথা না হয় আজ বলেই যাই। শুনবে না?'—

'শুন্‌ব, কিন্তু—'

'কটা বেজেছে বল্‌তে পার?'

'সাতটা বাজে।'

'আজ্‌কের দিনটি ভারী সুন্দর লাগ্ছে! তুমি এ ক'বছর কোথায় ছিলে, কি কর্‌ছিলে? ভারী জানতে ইচ্ছা করে।'

'ঘরছাড়া হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।'

মেয়েটি ফিকা একটু হাস্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, পার্‌লে না! বল্‌লে, 'লোকে তোমার কথা শুনে হাস্‌বে, টিট্‌কিরি দেবে।—বল্‌বে সামান্য একটা মেয়ের জন্য এমন ভাবে কেউ অনাবশ্যক দিন খোয়ায়!—ভুয়ো দুর্ব্বলতাকে সবল করে? আমি যদি ছেলে হতাম, আর কোনো একটা মেয়ে অহঙ্কারে আমাকে আঘাত কর্‌ত, আমি কি কর্‌তাম জান?'—

মেয়েটির সরু একটি আঙুলে কয়েকটি চুল ছেলেটি জড়াতে লাগ্‌ল, আস্তে আস্তে।

মেয়েটি বল্‌লে, 'আমি প্রতিশোধ নিতাম। আমার জীবনকে এত কম মূল্য দিতাম না কখনো। একটা সামান্য অহঙ্কারী মেয়ের স্পর্দ্ধার কাছে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে কোন দিন পূজো কর্‌তাম না তাকে।'

'মায়া!'

'আমাকে ডাক্‌ছ? কথাগুলি বল্‌তে পার্‌লাম না স্পষ্ট ক'রে। আমাকে ক্ষমা কর।'

'তুমি ত জান, তুমি আমার সমস্ত কিছুর বাইরে। তোমাকে কিছু দিয়েই ত আর নাগাল পেতে চাইনে। তবে কেন ক্ষমার কথা বল্‌ছ? তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বার প্রয়োজন কিছু ছিল কিনা জানি না। ভারী দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম।'

'না, প্রয়োজন ছিল বৈ কি। নইলে আজকের চোখের কোণে যে শেষ জল-টুকু জমে উঠ্‌ছে তা আর কে মুছিয়ে দিত? আজ্‌কে আর নিষ্ঠুর হয়ো না। দাও মুছিয়ে চোখের জল।'

মেয়েটির চোখের পাতা দুটি ছেলেটি একবার মুছে দিলে।

মেয়েটি বল্‌লে, 'তোমার হাতের মুঠির মধ্যে আমার দুর্ব্বল কৃশ হাতটি অনুভব কর্‌তে পার্‌ছি। এই ত আমি, নারী। সেদিনও হয়ত এম্‌নি হাতখানি ধরে-ছিলে, আমি ছিনিয়ে নিয়েছিলাম!—মনে আছে?'

'সে সব কথা ভুলে যাও।'

'না, আমি কিছু ভুলি নি। দেখ, ঐ বাক্সটার মধ্যে আমার একটা ডায়রী খাতা আছে। ওটা আমি তোমাকে দিলাম, তোমার কাছে রেখে দিও।

'কিছু দরকার ছিল কি তার?—

'না-ও থাক্‌তে পারে। যদি দরকারী না বোঝ, তবে পুড়িয়ে ফেলো। তোমাকে না পেলে ওঁকে হয়ত তোমার নাম করেই বলে যেতাম, তোমাকে দিয়ে দিতে। তা তিনি খুঁজে পেতেন যেমন ক'রে হোক তোমাকে বা'র কর্‌তেনই। কিন্তু তার আর দরকার হ'ল না।' পরে একটু থেমে বল্‌লে, 'আচ্ছা একটা কাজ কর্‌লে কেমন হয়? খাতাটা আমার সাম্‌নে পুড়িয়ে ফেলো। আমি এম্‌নি শুয়ে শুয়ে দেখি।'

ছেলেটি ব্যাগ্র কণ্ঠে বল্‌লে, 'তুমি এবার সত্যিই চুপ কর মায়া।'

'তোমাকে আজ পেলাম! এ জানি কি রকম পাওয়া ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! এই উনিশ বছরের জীবন! তোমাকে দিলাম আঘাত, তাঁকে দিলাম আনন্দ। আনন্দ না দিলে সেই আঘাতের জ্বালা সইতে পারে না কেউ, তুমি জান। না, মনে হচ্চে তোমাদের দুজনকেই আমি ঠকিয়েছি। তোমাদের কাছে আমি ঋণী। মধুময় মৃত্যু দিয়ে এ ঋণ শোধ কর্‌তে চাই।'

ছেলেটি বল্‌লে, 'দর্‌জাটা খুলে দিই গে। শেখর এসেছে।—যাই?

মেয়েটি বল্‌লে, 'যাও।'

বালিশের ওপর আস্তে-আস্তে মাথাটি রেখে ছেলেটি চলে গেল।

* * * *

প্রায় বারোটা রাত হবে। শেখর তার স্ত্রীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, 'ওষুধটা খেয়ে ফেল মায়া!'

মায়া চোখ তুলে একটি বার চাইলে। বল্‌লে, 'না ওষুধ আর খাব না। ভারী তেতো। তার চেয়ে আমাকে একটা—' ভারী খুশী হব।'

শেখর বল্‌লে, 'লক্ষ্মী আমার, মাণিক আমার, খাও।'

'না আমি খাব না। ডাক্তারগুলো মাথামুণ্ড কিছু বোঝে না। এমন সময় আবার ওষুধ খায়?—কি, রাগ কর্‌লে? দাও তবে।'—

জানলা দিয়ে কয়েকটা তারা দেখা যাচ্ছিল।

মায়া বললে, 'আজ সাতুই শ্রাবণ, না? একুশে অঘ্রাণ আমাদের বিয়ে হয়েছিল ঠিক এমনি মাঝ রাতে! কোনো আদল নেই, সে ছিল শীত আর এ বর্ষা, তবুও আজকের দিনটি ভারী চেনা-চেনা লাগছে! মনে হচ্চে কি যেন আজ পেলাম আবার। আজ চলে যাচ্ছি কিনা একেবারে, হয়ত তাই।'

শেখর বললে, 'একটু ঘুমোও।'

'এ পৃথিবী আর দেখতে পাব না। কোথায় যেন চলেছি সেই আনন্দে বুক ভরে আছে! আচ্ছা, আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে?'

'তুমি এমন কথা বোলো না মায়া!'

'হাঁ কাঁদবে আমি জানি। দেখ, যেদিন আমাদের বিয়ে হয়, সেদিন কত আলো জলেছিল, কত সানাই বেজেছিল। মনে আছে? আমি সেদিন একটু কেঁদেছিলাম। কেঁদেছিলাম এই জন্য যে আজ আমরা পরম আনন্দে মিলতে যাচ্ছি, আর এই রাত্রেই কোথায় হয়ত কোন্ এক বিরহী, চোখের জলে অন্ধকার ধুয়ে দিতে চাচ্ছে! আজ সবাইকে ফেলে যাচ্ছি ভেবেও কিন্তু কাঁদতে ইচ্ছে করে না! মনে হচ্চে, কে যেন কোথায় আবার—'

'হাওয়া করি, তুমি ঘুমোও লক্ষীটি।'

মায়া বললে, 'সুন্দর ক'রে কপালে তোমার আঙুলগুলি বুলিয়ে দাও। আচ্ছা, তোমার বন্ধুটি কোথায়? তাকে কোথায় পেলে?'

'পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কি বিশ্রী যে চেহারা হয়ে গেছে! ভারী দুঃখী। বিছানা ক'রে দিয়েছি নীচে ঘুমুতে। অনেকক্ষণ তোমার কাছে বসেছিল, না? গিয়ে দেখলুম চেয়ারে চুপ করে ব'সে আছে। বললুম—ঘুমুবে না? বললে—ঘুম আসছে না!—ভারী দাগা পেয়েছে জীবনে।'

'দাগা? কিসের?' মায়ার বুকের পাঁজরাগুলি একবার কেঁপে উঠল।

শেখর বললে, 'একটি মেয়েকে ভারী ভালোবেসেছিল, মেয়েটি ওকে—'

'ছি ছি ছি! তার জন্যে এমন করে সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে হয় এত বড় কর্ম্মের সংসারে? আমি যদি ছেলে হতাম তবে যে এমন করে প্রেমের অবমাননা করে তার টুঁটি টিপে।—'

মায়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে। পরে ম্লান কণ্ঠে ফের বললে, 'কিন্তু জান কি, মেয়েরা বন্ধনের আঘাত পেয়ে পেয়ে এত কঠিন হয়ে পড়ে, যে তারাও আঘাত দিতে চায়। তুমি আমার কথা শুনছ না, না?'

'শুন্‌ছি। কিন্তু তুমি ঘুমোও।'

'ঘুমোব। কিন্তু বল, আমি মরে গেলে তুমি ফের বিয়ে করবে।'

'মায়া!'

শেখর মায়ার মুখ চেপে ধরলে।

মেয়েটি বল্‌লে, 'বেশ! আমি তোমাকে কতটুকু দিয়ে যেতে পারলাম যে তুমি তা নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে? একটা কাল্পনিক আদর্শ খাড়া করে' নিজেকে ফাঁকী দিও না। আবার বিয়ে করো। আমি যেমন তোমাকে ভালো বেসেছিলাম, মেয়েটিও তোমায় তেম্‌নি ভালোবাস্‌বে কিম্বা তার চেয়েও বেশী।'

'তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচ্‌ব না।'

'বাঁচ্‌বে। সবাই বাঁচে। তোমার বন্ধুও বেঁচে আছে।'

'কিন্তু তার প্রিয়া ত নিঃশেষে মুছে যায় নি পৃথিবী থেকে। সে এই পৃথিবীতে আছে এই আকাশের তলে, তাই এ পৃথিবী তার কাছে এত মিষ্টি!'

মায়া তার শীর্ণ বাহু দুটি দিয়ে স্বামীকে বেষ্টন করে বল্‌লে, 'তার প্রিয়া হয়ত এম্‌নি রাতে তার স্বামীকে বুকের মাঝে বন্দী ক'রে ঘুমুচ্ছে, না? এম্‌নি করে থাকি শুয়ে, কেমন? তুমিও আমাকে জড়িয়ে ধর। আলোটা হাওয়াতেই নিবে যাবে, থাক্ খোলা জান্‌লাটা।—ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে! বৃষ্টি আস্‌বে হয়ত!—

আত্মীয়রূপী পর হচ্ছে কুঁজো মানুষের কুঁজ, পিছনে লেগেই থাকে, কেটেও ফেলা যায় না, বহন করাও দুঃখ।

"মুক্তধারা"

স্মৃতির খাতা

—শ্রীসুনীতি দেবী।

পুরাণো দু'খানি খাতা হাতে পড়ল। দু'খানি যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি ময়লা আর ছেঁড়া! দু'খানা, দু'রকম ছবি আর লেখাতে ভরা। তাদের কোন পাতা শুধু সাদা, কোনটাতে কালি ঢালা, কোনটা হাসির রং-এ উজ্জ্বল; কোনটা বা অশ্রু-মলিন।

দু'টো খাতা থেকে দু'টো আলাদা আলাদা পাতা নিয়ে মিলিয়ে পড়লাম, বেশ লাগ্‌ল। ছিঁড়ে এনে নিজের খাতায় জুড়ে রেখে ছিলাম। আজ তারই দুটি পাতা উপহার দিচ্ছি। আমার খাতায় থেকে রং হয়ত একটু বদল হয়ে গেছে, তা হোক্, জিনিসটা প্রায় ঠিক্‌ই আছে।

*　　*　　*　　*

(এক পাতা)

ওকি ঠাকুরদা? বুড়ো বয়সে এই রোগ!—পরের বাড়ীর মেয়ের দিকে চুরি ক'রে দেখা?—এই বলেই শচীন ঘরে ঢুকে সুইচ্ টিপে ঘর আলো ক'রে দিল!

আমি জানালা থেকে সরে এসে ফরাসে বসে পড়্‌তেই সে বোধ হয় আমার চোখের জলটুকু দেখ্‌তে পেল। সে কেমন থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, —কাঁদ্‌ছিলে নাকি দাদু?

ধরা গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে উত্তর দিলাম,—না দাদাভাই, ও কিছু নয়।

শচীনের বোধ হয় তাতে মন উঠ্‌ল না। সে আবার কি প্রশ্ন কর্‌বার উপক্রম কর্‌তেই আমি হুকুম কর্‌লাম—বাতিটা নিভিয়ে দাও ত দাদা। আর কাউকে একবার তামাক দিতে বলে দাও গে।

শচীন উঠে গেল বটে, কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই আবার ধীরে ধীরে আমার ঘরে ঢুকে পায়ের কাছে বসে, পায়ে হাত বুলোতে লাগ্‌ল। মনটা নরম হয়েই ছিল, সে

পায়ে হাত দিতেই তাকে কাছে টেনে বললাম কি রে ক্ষেপা, আবার এলি যে? শচীন একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে ফেললে,—কি হয়েছে তোমার, বলবে না দাদা?

আমি মিনিট দুই চুপ্ ক'রে থেকে বললাম—বলব তোকেই বলব। এত-গুলো বছর চলে গেল, মরবার সময় নয়ত বলে যাই।—তুই শেষে আমার চোখের জলও দেখ্‌লি! তোদের বয়সে বুক থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়েছে, তবু পৌরুষগর্ব্বে অটল থেকেছি, চোখ থেকে এক ফোঁটা জল পড়ে নি। আর আজ এত দুর্ব্বল যে ঐ এক ফোঁটা মেয়েটাকে দেখে কেঁদে ফেললাম!

শচীন চমকে জিজ্ঞাসা করল—মাধবীকে দেখে?

আমি বললাম- ও বাড়ীর মেয়েটি, যাকে দেখ্‌ছিলাম, তার নাম মাধবী না কি? তুই কি ক'রে জানলি রে?

শচীনের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠ্‌লাম। বললাম,—বাতিটে জাল্ দেখি। তবু সে উঠ্‌ল না! নিজেই উঠে আলো জালিয়ে তার লজ্জা-রক্ত মুখখানা দেখ্‌লাম। কিছু বুঝ্‌তে বাকি রইল না। এতকাল জজিয়তি করেছি কি বৃথা? লোকের মুখের ভাব খুবই চিনি যে। আলো নিভিয়ে শচীনের পাশে বসে বললাম—প্রেমে পড়েছ ভাই? তাতে লজ্জা কি? সবাই ত পড়ে। এই আমিও ত পড়েছি।

শচীন উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করল—ওর সঙ্গে?

আমি বললাম,—কার? তোমার মাধবীর সঙ্গে? না ভাই, না। এত দুঃখেও তুমি হাসালে! সাধে কি ক্ষেপা বলি? সে অনেক দিন আগেকার কথা দাদা। সেও ঠিক মাধবীর মতই দেখ্‌তে ছিল। আজ তাকেও দেখেছি। তাকে দেখেই অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এতদিন পরেও চিনতে দেরী হয়নি। এত বয়সেও শরীর তার বেশী ভাঙ্গে নি। ভাঙ্গবার ত কিছু ছিলও না কি না। রোগা ছোট্ট শরীরটি তার তেমনি রোগা ও ছোট্টই আছে। বার্দ্ধক্যের রেখা কেবল মুখে কয়েকটা আঁচড় কেটে, চুলে সাদা রং বুলিয়ে গেছে, আর কিছু বদ্‌লাতে পারে নি।

সেও আমায় চিনেছে মনে হল। আমায় দেখে কেমন যেন চমকে সে চলে গেল। আমি সন্ধ্যার আসন্ন-অন্ধকারে চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরেই ঐ মাধবী মেয়েটি আলো জালিয়ে ও ঘরে এসে বসল। ওকে দেখেই মনে হল, অতীত যেন বর্ত্তমান হয়ে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে।—ঠিক সেই! চিবুকের ওপর কালো মস্ত তিলটি পর্য্যন্ত! আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়েই রইলাম।

তুই না ডাক্‌লে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তাম জানি না।—ওরা কতদিন এ বাড়ীতে এসেছে রে?

শচীন বল্‌লে—মাস খানেক হবে। ঐ বুড়ীটি ত মাধবীর ঠাকুরমা।

আমি বল্‌লাম—তুমি যে সব খোঁজ নিয়ে সেরেছ দেখ্‌ছি! তা বেশ, বেশ! ঠাকুরদা-ঠাকুরমাদের প্রেমের পালা শেষ হয়ে গেছে। এবার তারা নাতী-নাত্‌নী-দের প্রেমাভিনয় দেখুক।—শুনি না তোদের প্রেমের ইতিহাস।

শচীন বল্‌লে—সে পরে শুনো। তুমি যে বল্‌তে বল্‌তে চুপ্‌ ক'রে গেলে?

কাজেই আমায় সব বল্‌তে হ'ল। শচীনের মত সমজদার শ্রোতা পাওয়া দুর্ল্লভ। তার নব-প্রেম-স্নিগ্ধ হৃদয় এখনও তিক্ততা কাকে বলে তা জানে না। তাই সে উপহাস না ক'রে সহানুভূতিতে গলে শুনতে লাগ্‌ল।

—আমি তখন মেসে থেকে কলেজে পড়ি। মাঝে মাঝে কাকার বাড়ীতে যেতাম। বাবা যেমন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, কাকা তেমনি সাহেবি-ভাবাপন্ন ছিলেন। তখনকার দিনের সাহেবিয়ানা কি রকম উৎকট ছিল, তা তোরা বুঝ্‌বি না। তাই বাবা মোটে পছন্দ কর্‌তেন না যে আমি কাকার বাড়ী যাই। কিন্তু কাকার প্রতি (আর বোধ হয় তাঁর উদার মতামতের প্রতিও) আমার কেমন যেন টান ছিল,—না গিয়ে পার্‌তাম না।

একদিন কাকার বাড়ীতে দেখি ঢের লোকজন। ড্রয়িংরুম মেয়ে পুরুষে ভরা। আমাকে দেখে কাকা খুসি হয়ে উঠ্‌লেন। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে একটি বছর পনের বয়সের মেয়ের সঙ্গেও আলাপ হ'ল। কাকা বল্‌লেন,—এটী ডাক্তার মৈত্রের মেয়ে। খুব বুদ্ধিমতী, এই বয়সেই চমৎকার লেখা পড়া শিখেছে।

তখনকার কালে শিক্ষিতা বাঙ্গালীর মেয়ে খুব দুর্ল্লভ ছিল। আর তার আগে আমি এরকম নব্যসমাজের কোন মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হই নি বলে, তার নমস্কারের উত্তরে কোন রকমে নমস্কার ক'রে সরে বস্‌লাম।

নূতন জিনিস ভেবেই হোক্‌, কি যাই হোক্‌, বারবার তার দিকে তাকাচ্ছিলাম। তার মুখখানি খুঁটিয়ে দেখ্‌তে গেলে এমন কিছু না, কিন্তু সব মিলিয়ে অপূর্ব্ব এক শ্রীমণ্ডিত। সকলের কথাবার্ত্তা শুনতে শুনতে মত্ত চোখ দুটো থেকে থেকে জলে উঠ্‌ছিল, আবার যখন চোখ নীচু ক'রে বসে থাক্‌ছিল, তখন মনে হচ্ছিল, টানা ভ্রূ দুটির নীচে যেন দুটী মুদিত কমল!

এই পর্য্যন্ত বলে.বোধ হয় প্রিয়ার ধ্যানে মগ্ন হয়ে চুপ্ করে গিয়েছিলাম, কেননা শচীন বল্লে—ঠাকুরদা ; চুপ্ ক'রে আছ যে, আর বল্‌বে না ?

আমি স্বপ্নরাজ্য থেকে যেন জাগ্‌লাম। বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম,—বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষা তার মুখখানিকে আশ্চর্য্য দীপ্তি দিয়ে ছিল। মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে যা কুসংস্কার ছিল, তাকে দেখে নিমেষে দূর হয়ে গেল।

সমস্ত রকম আলোচনা সে মন দিয়ে শুন্‌ছিল, আর বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছিল। তাই দেখে মনে হ'ল, পনের বছরে এর এত জ্ঞান! তা না হলে দেখ্‌তে তাকে ছোট মেয়েটির মত সরল সুন্দর। এমন ছোটখাট হাল্‌কা শরীরটি, যে মনে হয় বুঝি বা একটু চেষ্টা কর্‌লেই উড়ে যেতে পারে।

আমার বারে বারে তাকান সে বুঝ্‌তে পেরে, থেকে থেকে লাল হয়ে উঠ্‌ছিল। আবার মাঝে মাঝে চুরি ক'রে দেখ্‌ছিল, তাও বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম। তার ছেলে-মানুষি দেখে আমার হাসিও আস্‌ছিল।

ডাক্তার মৈত্রের সঙ্গে খুব আলাপ হ'ল। বেশ রসিক ও সহৃদয় পুরুষ। তাঁর বাড়ী মাঝে মাঝে যেতে বল্‌লেন। মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে আমি তাঁর কথায় রাজি হলাম।

কিন্তু যাওয়া আর ঘট্‌ল না!—সে দিন বাড়ী ফিরেই বাবার চিঠি পেলাম, তখনই বাড়ী যেতে হবে। গরমের ছুটি হতে কয়েকদিন বাকি ছিল, কিন্তু বাবার অবাধ্য হবার জো ছিল না। পর দিনই দেশে রওনা হলাম।

বাড়ীতে পৌঁছে দেখি ভাই বোনেরা নেচে বেড়াচ্ছে, আর বল্‌ছে—দাদার বিয়ে, কি মজা!—

আমি অবাক্! এক সপ্তাহের মধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

কেন জানি না, এই এক সপ্তাহ ধরে কেবল মেয়েটির মুখ মনে ভেসে উঠেছে। সেই হাসি ভরা মুখ, সেই আনন্দ-দীপ্ত চোখ দুটি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে আকুল ক'রে তুলেছে। ভাব্‌লাম—একি প্রেম না মোহ? ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন ব্যথা অনুভব করেছি! সবাই বল্‌ল—কি সুন্দর বৌ—তবু বিয়ে করে কোন আনন্দ পাইনি।

আসল দুঃখ আরম্ভ হ'ল কল্‌কাতায় ফিরে। তাদের বাড়ী গেলাম না বটে, তবে কাকার ওখানে মাঝে মাঝে দেখা হ'ত। তার সেই শিশুর মত ভাব আর ছিল না। তার যৌবন-বিকসিত দেহে ও চোখে-মুখে সর্ব্বত্র সলজ্জ ভাব ফুটে উঠেছিল। মুখের কথা আমাদের মধ্যে বেশী হ'ত না, কিন্তু চোখের

চাউনি ও হাসি দিয়ে অনেক কিছু বলা হয়ে যেত। আমি কেন যে মূঢ়ের মত ভেসে চলে ছিলাম! বুঝি নাই। হয়ত আমি সংযত থাক্‌লে তাকে অনেক কষ্ট থেকে বাঁচাতে পারতাম।

দিনের পর দিন, মাস, বছর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন তাকে দেখ্‌লাম বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি! আমার দিকে চাইতে যেন তার চোখ জলে ভরে এল। আমি কাছে গিয়ে কথা বল্‌বার উপক্রম কর্‌তেই সে শুধু বল্‌ল, কাল সকালে একবার আমাদের বাড়ী আস্‌বেন? আমি 'হাঁ' বল্‌তেই সে সরে গেল। আর কিছু বল্‌ল না।

পরদিন সকালে যেতেই ডাক্তার মৈত্র খুসি হয়ে বল্‌লেন,—বা, বা, বেশ হয়েছে। আমাদের বালীর বাগানে আজ আমরা চড়িভাতি কর্‌তে যাচ্ছি; তুমি ঠিক্ সময়ে এসেছ।—চল, তোমাকেও যেতে হবে।

তাঁদের সঙ্গে ত গেলাম। বাগানে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে তাকে একা পেলাম। এই আমাদের প্রথম নির্জ্জনে দেখা। আমি বল্‌লাম—এখানে একটু বসা যাক্।

দু'জনে পাশাপাশি বস্‌লাম।

সে দিন তাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! টুক্‌টুকে রেশমের উপর জরির কাজ-করা জ্যাকেট, আর একটা গেরুয়া শাড়ী তার পরণে ছিল। আর হাতে ছিল দু'গাছি রুলি। আমি তার পাশে বসে খুঁটিয়ে দেখ্‌ছিলাম। তার চিবুকের তিলটি ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছিল। তার এক ঢাল ঢেউ খেলান চুলের গোছা বাতাসে কেঁপে কেঁপে আমায় ছুঁয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন বনদেবী!

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—কিছু বল্‌বেন বলে ডেকেছেন কি? সে দু-তিনবার ঢোক গিলে আস্তে আস্তে বল্‌ল—আপনার নাকি বিয়ে হয়ে গেছে?

আমি শক্ত হয়ে সোজা হয়ে বস্‌লাম, বল্‌লাম—হাঁ।

সে বল্‌ল,—কবে?

আমি বল্‌লাম—আপনার সঙ্গে আলাপ হবার এক সপ্তাহ পরে।

সে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ল—এতদিন বলেন নি কেন?

আমি বল্‌লাম—ভেবেছিলাম আপনি জানেন।

এবার তার গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে এল। বল্‌ল—জেনে কি আমি—

আর শুন্‌তে পেলাম না! তার বড় বড় ঝালরের মত চোখের পাতা বেয়ে

মুক্তো ঝরতে লাগল। তার ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আমি প্রাণপণে শক্ত হয়ে বসে রইলাম।

শচীন, একটু নিঃশ্বাস ফেলে নিই ভাই, এই বলে আমি চুপ করলাম। শচীন নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আমি আবার বলতে লাগলাম।

একটু পরে সে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—আপনার স্ত্রী খুব সুন্দরী ?

শচীন, কি সুন্দর, কি করুণ সে জল-ভরা চোখ দুটি, আমি তোকে বোঝাতে পারব না। আমি যেন সব ভুলে গেলাম। বললাম, তোমার চেয়ে নয়। বলেই তাকে কাছে টেনে তার ঠোঁটে কপালে চুলে চুমোর বৃষ্টি ঝরিয়ে দিলাম। সে মন্ত্র মুগ্ধের মত আমার বক্ষ সংলগ্ন হয়ে রইল।

দূরে মানুষের কণ্ঠস্বরে আমার চেতনা ফিরে এল, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। বললাম,—রাগ করেছ কি ? ভারি অন্যায় হয়ে গেল, না ?

সে আমার কাঁধে মাথাটি রেখে স্বপ্নাবিষ্টের মত বলল—জানি না।

আর কিছু না বলে আমরা অন্যদের কাছে ফিরে গেলাম। সারাটা দিন যেন কিসের ঘোরে কেটে গেল।

এবার থেকে তাদের বাড়ী মাঝে মাঝে যেতাম। কিন্তু অমন পাগলামি আর করি নি। বাইরে দুজনে সংযত ছিলাম বটে, কিন্তু আমাদের ভালবাসা দ্রুতবেগে বেড়ে চলল। আমারটা ত নিজেই বুঝতাম, আর তার ভাব, তার প্রত্যেকটি কথায় কাজে ফুটে উঠত। দুঃখের মধ্যেও সুখ ছিল—আমাদের এই নিষ্ফল ভালবাসা।

এমনি ক'রে বছর না ঘুরতে একদিন সে আমায় বলল—তার বিয়ের কথা হচ্ছে।

আমি নিজে বিবাহিত হলেও তার বিয়ের কথা মোটেই ভাল লাগল না। আমি চেয়ে ছিলাম আমায় ভালবেসে সে চিরকুমারীই থাকুক। এর মধ্যে স্বার্থ-পরতা ছিল বটে, কিন্তু আর একটা জিনিসও ছিল। মানুষ যাকে সব চেয়ে ভাল-বাসে, তাকে আদর্শ ক'রে পূজা করতে চায়। তাকে নীচু দেখলে কিংবা সংসারের আরও দশজনের মত ব্যবহার করতে দেখলে তার কষ্ট হয়। তাই তার বিয়ের কথা শুনে আঘাত পেলাম।

সেদিন কিছু না বলে ফিরে এলাম। অন্য দিন যেতেই সে বলল,—উপায় নাই। তুমি এখানে আস, তাতেই অনেক কথা উঠেছে। তা ছাড়া যে সমাজেই হোক্, মেয়েদের বিয়ে করতেই হবে। এ ভাব যে লোকের মনে বদ্ধমূল, তাকি

জান না ? দিদি কাল বল্‌ল—কলঙ্ক থেকে উদ্ধার পেতে চাও যদি, ত বিয়ে ক'রে ফেল। এমন পাত্র আর পাবে না।

আমি শিউরে উঠে বল্‌লাম—তোমার নামেও লোকে কলঙ্ক দিতে পারে? তোমায় দেখ্‌লে যে মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার কথা আমার মনে পড়ে।

সে চুপ্‌ ক'রে রইল।

আমি খানিক ভেবে বল্‌লাম—আচ্ছা, বিয়ে কর। হয়ত এই আমাদের শেষ দেখা। এবার থেকে তোমার জগতের বাইরে হয়ত তোমার অপরিচিত হয়েই আমায় থাকতে হবে।

তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগ্‌ল। আমি আকুল হয়ে বল্‌লাম—আমি তোমার চিরদিনের বন্ধু থাক্‌ব। আমায় যখন চাইবে আমি তখন আস্‌ব।

সে নত হয়ে আমার পায়ের ধুলো নিতেই আমি তার মুখখানা দুহাতে তুলে ধরলাম। সে আমার হাত সরিয়ে দিয়ে দ্রুত চলে গেল। কি জানি পাছে আবার ভুল করি বলেই বোধ হয় সাবধান হ'ল।

পুরাতন স্মৃতি মনে আস্‌তে দু'ফোঁটা চোখের জল পড়্‌ল। শচীনও চোখ মুছ্‌ল মনে হ'ল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বল্‌তে লাগ্‌লাম—তার পর আর বল্‌বার বিশেষ কিছু নাই। আমার লেখা পড়া শেষ হ'ল। উন্নতির সোপানে দ্রুতবেগে উঠে গেলাম। জীবনের সবই পূর্ণ হয়েছে। এই অপূর্ণতাটুকু না থাক্‌লে ঠিক্ হ'ত না; তাই বিধাতার বিধানে তাকে হারিয়েছি।

মাঝে কোন্ এক বিয়ে বাড়ীতে তাকে দেখেছিলাম। ললাটে উজ্জ্বল সিন্দুর বিন্দুতে মুখশ্রী আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সে আমার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। তাতে বড় কষ্ট হয়েছিল। খানিক পরেই আবার চোখ দুটি কোমলতায় ভরে আমার দিকে চাইল। আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। কিন্তু কথা বল্‌বার সুযোগ দিল না।

এত দিন পরে আজ আবার দেখ্‌লাম। সেই করুণ চোখ দুটি ব্যগ্রভাবে চেয়ে চলে গেল। এই হয়ত শেষ। আর দেখ্‌ব কি না জানি না।

শচীন বড় বেশি গম্ভীর হয়ে গেল দেখে, তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বল্‌লাম—দেখ ক্ষেপা, এই ভাল। যদি পেতাম, তবে সব কবিত্ব বোধ হয় ফুরিয়ে যেত। পাই নি যে, এই অতৃপ্তিতেই ওকে আজও আমার মানস-প্রিয়া ক'রে রেখেছে।

ওর কথা ভাব্‌লেই মনটা নূতন রাজ্য ঘুরে আসে। তখন যেন যৌবন ফিরে পাই। অতৃপ্ত বাসনার ধুপে দেবীর পূজা চলেছে। নয়ত কবে প্রেমের আগুন নিভে যেত। শেষে তার সঙ্গেই কত মন-কষাকষি, কত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সংসারিকতায় ডুবে সব কবিত্ব কল্পনা জলাঞ্জলি দিতে হ'ত।

তাই বলে তুমি যেন মাধবীকে ছেড়ে দিও না! আমি কতকগুলো বাজে বকে গেলাম বলে সেটা উপদেশ ভেব না। তোমরা নব্য যুগে জন্মেছ, জাতের ধার ধার না, ভাবনা কি দাদা, মনের আনন্দে মাধবীকে ঘরে বরণ ক'রে তোল, আমি প্রাণপণে সাহায্য করব। কেমন?

শচীন কিছু না বলে আমায় হঠাৎ প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি অন্ধকারে তাদের বাড়ীর জানলার দিকে চেয়ে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লাম,— প্রিয়া আমার প্রিয়া! বন্ধু আমার বন্ধু!—

* * * *

(অন্য পাতা)

তাকে আজ দেখ্‌লাম।

কত দিন হয়ে গেছে,—বয়সের সঙ্গে কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি তেমনি উজ্জল আছে!

প্রথম দিনের কথা—সে কি ভুল্‌বার? তখন পর্য্যন্ত আমার মন শিশুর মত ছিল। তার উজ্জল চোখ দুটি আমায় অভিভূত ক'রে ফেল্‌ল, তার কণ্ঠস্বর আমার শিরায় শিরায় নব স্পন্দন জাগিয়ে তুল্‌ল! তার সঙ্গে আলাপ হয়ে পর্য্যন্ত তার চিন্তাই হ'ল আমার সাথী। তাকে বেশি দেখ্‌তে পেতাম না, কিন্তু দিনরাত আমি তার ধ্যানে মগ্ন থেকে সুখ পেতাম।

ক্রমে ক্রমে চোখের নেশা যেন পেয়ে বস্‌ল। তার দেখা পাবার জন্য কত রকম যে চেষ্টা কর্‌তাম, তার ঠিক নেই। কতদিন গাড়ী ক'রে যেতে পথে তাকে এক পলক দেখেছি, কতবার কত বন্ধুর বাড়ীর নিমন্ত্রণে তাকে দেখ্‌তে পেয়েছি, তাতেই তৃপ্তিতে আমার বুক ভরে উঠেছে। সে না দেখ্‌লেও আমার দুঃখ হ'ত না। আমি কেমন ক'রে তাকে দেখ্‌তে পাব, এই আমার ভাবনা ছিল। এই দেখার মোহ আমায় পাগল ক'রে তুলে ছিল।

আমার এই ভালবাসা আমার দেহ মনকে বিকশিত ক'রে তুলেছিল সন্দেহ নাই। কেননা, বন্ধুরা থেকে থেকে বল্‌ত,—তুই এত সুন্দর হয়ে উঠ্‌ছিস কি ক'রে বল্‌ ত?

আমার এ প্রেমে তখন পর্য্যন্ত বেদনা ছিল না। এমন সুখ-স্বপ্নময় জীবন আর কখন ফিরে এল না, এই দুঃখ।

স্বপ্ন থেকে জাগ্‌লাম ভারি রূঢ় আঘাতে। এক দিন তার কথা হবার সময় দাদা বল্‌ল—ওর এতটুকু বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে, ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে, না?

কথাটা শুনেও যেন বুঝ্‌তে পারি নি। যখন ভাল ক'রে বুঝ্‌লাম, তখন হঠাৎ চোখের সাম্‌নে দিনের আলো অন্ধকার হয়ে গেল। প্রেমের বেদনা সেদিন আমায় প্রচণ্ড আঘাতে জাগিয়ে তুল্‌ল। জেগে লজ্জায় যেন মরে গেলাম। ছি, ছি, কি স্বপ্ন নিয়েই দিন কাটিয়েছি! তাকে ভুল্‌বার বিপুল চেষ্টায় শরীর ক্ষয় হয়ে যেতে লাগ্‌ল। বেশি পড়ার চাপে শরীর খারাপ হচ্ছে বলে, বাড়ীর লোকে পড়া বন্ধ করলেন। শরীর তবু আরও খারাপ হ'তে লাগ্‌ল।

তার পর এক দিন চড়িভাতি করতে গিয়ে দু'জনে নির্জ্জনে দেখা হ'ল। সে কথা ভাব্‌লে এখনও বক্ষ-স্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে।—কাউকে বলি নি সে কথা। অথচ ভুল্‌তেও পারি নি! সেই এক মুহূর্ত্তে তখন যেন পৃথিবী ওলট্‌-পালট্‌ হয়ে গিয়েছিল। সেই এক নিমিষের স্মৃতি এখনও পর্য্যন্ত অধীর ক'রে তোলে।—না, আজ আর সে সব ভাব্‌ব না। কিছুতেই ভাবব না।—আমার মাথার মধ্যে কেমন করছে। সে কি সত্যই আমায় বুকে জড়িয়ে—? না, বোধ হয় স্বপ্ন!

* * * *

কেমন করে বিয়ে হয়ে গেল,—সেও এক স্বপ্ন! কর্ত্তব্যে এতটুকু অবহেলা করি নি, কিন্তু মনটাকে কিছুতে বাগ মানাতে পার্‌তাম না। কত তিক্ততার মধ্য দিয়ে দিন কেটেছে।

তার পর কোলে যখন ছেলে মেয়েগুলিকে পেলাম, তখন ধীরে ধীরে নিজেকে ভুলে মাতৃত্বের নূতন অনুভূতি নিয়ে তাদের মধ্যে ডুবে গেলাম। জীবন-ধারা কত বিচিত্র পথ দিয়ে বয়ে চল্‌ল, সব ত আজ মনেও নাই।

ক্রমে ক্রমে যখন নাতি-নাতনীগুলি ঘরে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল, তখন মনে হল,—ভগবান আমার জন্য এত সুখও রেখেছিলেন।

এত সব পাওয়ার সুখের মধ্যে যেটুকু না-পাওয়ার দুঃখ, সেও আমার আনন্দ হয়ে উঠ্‌ল। সেই বেদনাটুকু আমার নিতান্ত নিজস্ব ক'রে ভোগ করেছি। কেউ তার ভাগ পায় নি।

প্রথম-যৌবনের প্রেমের মালা সংসারের তাপে শুকিয়ে উঠ্‌লেও তার স্মৃতি ত যায় নি। যখন তার খবর পেতাম, শুন্‌তাম সে কৃতী হয়েছে, যশস্বী হয়েছে, তখন

হর্ষ-বিষাদে প্রাণটা দুলে উঠ্‌ত। তাকে দেখ্‌তে কিন্তু চাইতাম না। কি জানি দেখ্‌লে যদি আর বাঁচ্‌তে না পারি।

তবু দেখা হয়েছিল একবার। মনে ভাবলাম, তাকে দেখাব যে ভুলে গেছি, তাই কথাও বলি নি। মুখ ফিরিয়ে অপরিচিতের মত চলে গেলাম। কিন্তু সে কেন কথা কইল না? এ অভিমান বুকে কাঁটার মত বিঁধে রইল। সত্যি কি সে আজও মনে মনে আমার বন্ধু আছে? এই কথাটা সে দিন ঘুরে ফিরে মনে আস্‌তে লাগ্‌ল।

আজ আবার তাকে দেখে একি হ'ল! জান্‌তামই ত, তাদের পাশের বাড়ীতে আছি; ইচ্ছা করেই তাকে দেখ্‌বার চেষ্টা করি নি। তাকে এদিকে তাকিয়ে থাকৃতে দেখে আমি কেন থমকে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম? কেন চোখা চোখি হ'ল? এত বয়সে, সময়ের এত দূরত্বেও সেই স্মৃতি কি আজও তেমনি নূতন?

* * * *

ওগো পারের কাণ্ডারী! খেয়া-ঘাটের কূলে এনে আমায় আর পিছন পানে ফিরও না!—

আমি এই যে ভালবেসে গেলাম প্রাণে প্রাণে
আকাশ আলো ধরিত্রীরে
বেদনা তার জাগ্‌বে নাকি কোন খানে,
চাইবে না কেউ পিছন ফিরে?

"সন্ধ্যার"

মেঘের হাসি

—শ্রীভূপতি চৌধুরী।

কি একটা কথার উত্তরে চটে গিয়ে সুনীলকে বলে ছিলাম—তোর এত হাসি আসে কোথা থেকে বল্ ত ?

উত্তরে সুনীল খানিকটা হেসে ছিল। কিন্তু সে ত হাসি নয়, সে যেন একটা ব্যথার দীপ্ত প্রকাশ ! তার মুখের এই হাসিটুকুই ছিল তার বিশেষত্ব। কারণে অকারণে সে হেসে উঠ্ত, কথা-বার্ত্তায় হাসির ফিণিক ফুটিয়ে তুল্ত, ব্যথা দিয়ে, ব্যথা পেয়ে সে হাসির উৎস খুলে দিত। তার হাসির কোন বাধা ছিল না, উচ্ছল উদ্দাম ছিল তার এই হাসি !

এই সুনীল ছিল আমার বাল্যজীবনের স্কুলের সহপাঠি বন্ধু। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার সময় তার সঙ্গে আমার যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তার পর আর দেখা হয় নি।

একদিন হাঁসপাতালে কি একটা কাজে গিয়ে পড়েছিলাম। চার পাশে ক্লিষ্ট আত্মার কাতর ক্রন্দন-সিক্ত ভারি বাতাস ও রোগী-জগতের বীভৎসতা আমায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলে ছিল। ফিরছি, হঠাৎ আমার বাল্য-সখা এই সুনীলকে দেখে থম্‌কে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে অল্প হেসে সে আমায় বস্‌তে বল্‌লে তার পাশে।

আমি বস্‌লাম। আবার তার মুখে মৃদুহাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল। আমি দেখে বিস্মিত হলাম—কি শান্ত কি করুণ কি তৃপ্তিভরা এ হাসি ! ব্যঙ্গের তীব্র বিদ্যুজ্জ্বালা এতে নেই।

আমার হাতখানা তার হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বল্‌লে—আমায় এখানে মর্‌তে দিস্ না ভাই।—

সে কি গভীর কাতর করুণ অনুনয় !

তাকে আমার বাড়ি নিয়ে এলাম। তার ম্লান চোখ যেন একটা কিসের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। মুখে সে কি শান্ত হাসি !

দিন যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন-প্রদীপের তৈল-ভাণ্ডও নিঃশেষিত হয়ে

আসে। নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-দীপের তৃপ্তির বিকাশ তার বুক ছাপিয়ে ওঠে। আমি তার শয্যাপার্শ্বে চুপ ক'রে বসে থাকি।

পূবদিকের খোলা জানালার মধ্য দিয়ে চিম্‌নির ধোঁয়ার মতো কালো মেঘ-ভরা আকাশে, সহসা একটা বিদ্যুতের ঝিলিক্ দিয়ে সশব্দে একটা বাজ গর্জ্জে উঠ্‌ল! সঙ্গে সঙ্গে অধর প্রান্তে হাসির একটা রেখা খেলিয়ে সে বল্‌লে—আমাদের জীবনটা ঠিক এমনি দুঃখ-মেঘভারেভরা আকাশের মতো, হাসি হচ্ছে এই বিদ্যুতের ঝলক্ —তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস তার বক্ষপঞ্জর ভেদ ক'রে বার হয়ে এল। তার অধরোষ্ঠ একটা কিসের আবেগে কেঁপে উঠ্‌ল।

তার শীর্ণ হাতখানা আমার দুই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্‌লাম— সুনীল, তোর কি কষ্ট হচ্ছে বল্ ভাই?

কোনো উত্তর না দিয়ে শান্তভাবে সে শুয়ে রইল। যেন চিন্তা যোগ নিমগ্ন।

ঘরটা ভয়ানক নিস্তব্ধ। এ নিস্তব্ধতার ভীষণতা ভঙ্গ ক'রে নড়ে বস্‌বার ইচ্ছা করছিল না। ঠিক যেমন ভাবে তার হাতটিকে আমার হাতের মধ্যে নিয়ে বসে ছিলাম ঠিক তেমনি ভাবেই বসে রইলাম।

'খুস' করে একটা দেবদারু গাছের পাতা খসে পড়ার শব্দ সে নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে আমার কাণে এল। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ বাতাস ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে বিজয় যাত্রায় বার হয়ে পড়্‌ল। মেঘপুরের দুয়ার ভেঙে মুক্ত-বিদ্রোহীর মতো জলধারা ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল।

উৎক্ষিপ্ত কয়েক কণা জলধারার পরশ তার গায়ে লাগ্‌তেই সুনীলের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। চোখ খুলে একবার বাহিরের এই মত্ত ধারার দিকে চেয়ে সে উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল। গভীর আবেগ-বিহ্বল স্বরে সে বল্‌লে—কি তৃপ্তি, কি আনন্দ!

একটু থেমে একটা গভীর শ্বাস বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তেমনি আবেগ বিহ্বল উত্তেজিত স্বরে সে আবার বলে চল্‌ল—এমনি, এমনি ক'রে যদি আমার কথা বল্‌তে পারি, এই মুক্ত বারি-ধারার মতো, বাতাসের তীব্র আর্ত্তনাদের মতো, ঝড়ের নৃত্য-তাণ্ডবের মতো—'

আমি তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম।

তার মুখে তখন কি এক জ্যোতি! চক্ষের দৃষ্টি তার তখন কোন অসীমের পথে হারিয়ে গেছে। হঠাৎ যেমন ভাবে লোক অন্ধকারাবৃত স্থানে সার্চ্চলাইটের আলো ফেলে, ঠিক তেমনিভাবে আমার মুখের উপর তার চোখের দৃষ্টি ফেলে,

বল্‌লে—পৃথিবীর কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি, আমি তাকে তাই ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, ঠিক তেম্‌নি ভাবে।

অল্প থেমে আবার আমার দিকে ঠিক পূর্ব্বের মতো তাকিয়ে বল্‌লে—আমার জীবন কথা, আমি কে, কিছু জান?—

আমি ঘাড় নাড়্‌লাম। ধীরে ধীরে সে তার মাথার বালিশের তলা হতে কয়েকটা টুক্‌রো কাগজ বার ক'রে, আমার হাতে দিয়ে বল্‌লে—পড়্‌ ভাই, আমায় পড়ে শোনা —

তার স্বরে সে কি ব্যাগ্রতা!

* * * *

নাম না-জানা পালক, আমার ললাটে কোন পরিচয় লিপি এঁটে দেন নি। ছেলেবেলা হতে তাই সবার ঘৃণা কুড়িয়ে এসেছি। এক স্কুলের বোর্ডিংএ থাকৃতাম। মাসে মাসে আমার নিয়মিত খরচ আস্‌ত, কিন্তু কোথা থেকে আস্‌ত তা জান্‌তাম না। স্কুলের ছুটী হলে সকলে বাড়ী যেত, কিন্তু আমি বোর্ডিং বন্ধ হলে চল্‌তি-সরাইখানা, ট্রেণের আশ্রয় নিয়ে ভারতের এধার হতে অন্যধার পর্য্যন্ত ঘুরে আস্‌তাম। এই যে বেড়াতে বার হতাম, এটার মধ্যে মস্ত একটা ফাঁকি ছিল। তখন আমি খুব বড় হয় নি, ফলে মন ও বিশেষ দৃঢ় ছিল না। বোর্ডিংএ ছুটী হয়েছে। সবাই বাড়ী চলেছে, এক আমি ছাড়া। একজন ছেলে এসে আমায় প্রশ্ন কর্‌লে, তুমি কবে বাড়ী যাবে ভাই?

'বাড়ী' এই কথাটা শুনে আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। সে চাঞ্চল্য চাপ্‌তে গিয়ে অন্যাবশ্যক রূঢ়ভাবে তাকে বল্‌লাম— আমি বাড়ী যাই না যাই তোর তাতে কি? তার পর থেকেই ছুটী হ'লেই সকলের আগে আমি বেরিয়ে পড়্‌তাম।

তারপর যেদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষার আবেদন লিখ্‌তে গেলাম, সেখানে দেখ্‌লাম, তারা আমার পিতার পরিচয় চায়!

আর আবেদন করা হল না। সেখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এলাম। স্কুলের কেরাণী আমার রকম দেখে মুখ টিপে হাস্‌লে মাত্র। বোর্ডিংএর নূতন অধ্যক্ষ আমায় ডেকে পাঠিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সাধাসিধা ভাবে হয়ত একটু চড়া স্বরেই বল্‌লাম—যা জানি না, তা লিখ্‌ব কেমন করে?

তিনি আমার দিকে একটা রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, পরে মৃদু হাস্‌লেন মাত্র।

মৃদু-হাসির তীব্র ব্যঙ্গের জ্বালায় আমি জ্বলে উঠেছিলাম। ভাবলাম এর কি প্রয়োজন ছিল? আমার মনে পড়ে গেল কর্ণের কথা। সঙ্গে সঙ্গে আমার কুন্তী

মায়ের কথাও স্মৃতি পটে উদয় হল। হিন্দু যে সব কথা কোন দিন ভাবে না বা ভাবতে দ্বিধা বোধ করে; তেমন সব কথা, বিনা দ্বিধায় ভাবলাম, দেখ্‌লাম কর্ণের মতো শিশুকালে আমিও পরিত্যক্ত কিন্তু কোনো অধিরথ আমায় জল থেকে তুলে, তার পরিচয় আমার ললাটে দিয়ে, আমায় মানুষ হবার সাহায্য করে নি। সত্য জন্ম-রহস্য জান্‌লে পরে, হয়তো কর্ণের পক্ষে এমন একটা স্থায়ী নাম রেখে যাওয়া সম্ভব হত না। জন্ম-রহস্য সত্য যেদিন সে জান্‌লে, তার পরই তার মৃত্যু হল। কিন্তু আমি, আমার জন্ম-রহস্য জানার পরও কলঙ্কের বোঝা বয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি পরিচয়ের প্রবেশ-পত্রহীন আমার পক্ষে পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার বন্ধ।

স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম চাকরীর সন্ধানে। কিন্তু ব্যর্থতার বিপুল বোঝায় শ্রান্ত হয়ে পড়্‌লাম। ছেলেবেলার বড় হবার বাসনা আমায় মত্ত ক'রে তুল্‌লে। ভাবলাম বড় মানুষ না হতে পারি, বড় অমানুষ হব। স্থির কর্‌লাম—অমানুষ হবার সাধনায় রত হব। সাথী কর্‌ব মানুষ নয়, যন্ত্র—রিভল্‌ভার। কিন্তু সংস্কার-বদ্ধ মানুষের মন তখনও দ্বিধা বোধ করে। আরও একবার চেষ্টা কর্‌তে বলে!

সফল না হবার ইচ্ছা নিয়ে আবার বার হলাম। কিন্তু এবার সফল হলাম। একটি ছোট সংসারে; একটি ছোট ছেলের জন্য মাষ্টারের প্রয়োজন ছিল। আমার বিদ্যার বহর শুনে, ছোট ছেলের মাষ্টারের পক্ষে মাট্রিক পর্য্যন্ত বিদ্যা যথেষ্ট মনে ক'রে তাঁরা আর কোন প্রশ্ন না ক'রে আমায় বাহাল কর্‌লেন। একবার ভাবলাম আমার জন্মকাহিনীটা তাঁদের শুনিয়ে দি কিন্তু তখন তাঁরা ও সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করায় আমি তা অব্যক্তই রেখে ছিলাম।

দুপুর বেলা কোন কাজ ছিল না—ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে হল—তা হলে না। পৃথিবীকে সবটা জানিয়ে দিয়ে দেখ্‌ব, সে আমায় সহ্য করে কি না?

সন্ধ্যায় গৃহকর্ত্তা ফিরে আসার পর সব কথা তাঁকে বল্‌লাম। শুনে গম্ভীর ভাবে তিনি বল্‌লেন—তোমার সৎসাহস ও সত্যবাদিতার আমি প্রশংসা করি, কিন্তু তোমায় ঘরে আমি স্থান দিতে পারি না।

ধীরে ধীরে মুখ নীচু ক'রে বার হয়ে এলাম। এতদিন সকলে আমায় ব্যঙ্গ হাসিতে জালিয়েছে, তাই আমিও তাদের উপেক্ষা ক'রে চলে এসেছি কিন্তু এ গাম্ভীর্য্যের তীব্র কশাঘাত সহ্য করার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না তাই আমি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। ভাবলাম—তবে কি পরিচয়-পত্রহীন আমার স্থান পৃথিবীতে নেই?

কত কথা ভাবতে ভাবতে পথচলা সুরু করলাম। অনাহারে অনিদ্রায় রাস্তার মাঝে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান হ'লে দেখি আমি এক হাঁসপাতালে! একজন নার্স আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে, মূর্ত্তিমতী করুণার মতো! আমাকে চোখ চাইতে দেখে তিনি স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন—কি চাই তোমার?

এই স্নেহ-মমতা-ভরা কণ্ঠ আমায় উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলল। একটা ভাবাবেগে আমি চক্ষু মুদলাম।

তাঁর শীতল স্নেহ-কোমল হাতটি আমার কপালের উপর রেখে তেমনি কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?

এ স্পর্শ, এ সম্ভাষণ, এ অসহবেদনাময় সুখ আমি যাচাই ক'রে নিতে চাইলাম, আমার পরিচয় দিয়ে। ধীরে ধীরে আমার জন্ম-রহস্য রুদ্ধশ্বাসে কোনদিকে না চেয়ে তাঁকে বলে গেলাম। কতদিন কত স্বচ্ছন্দে আমি আমার পরিচয় দান করেছি, এর মধ্যে হীনতা থাকলেও আমি কোনো দীনতা বোধ করি নি। কিন্তু আজ এটা আমার কাছে একটা কঠিন তিক্ত কর্ত্তব্যের মতো বোধ হচ্ছিল। কোনো রকমে সবটুকু বলে আমি তাঁর মুখের দিকে চাইলাম।

তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে গিয়েছিল। মুখে সহানুভূতিভরা বেদনার রেখা পরিস্ফুট! তিনি নির্ব্বাক।

একটা তৃপ্তি, একটা আনন্দ, একটা বিপুল সুখের পীড়নে আমার যেন শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে এল। এ যন্ত্রণাময় সুখে একটা অব্যক্ত বাণী আপনা হ'তে আমার কণ্ঠহতে বার হয়ে এল—মাগো!—

তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে আমার শিরে তাঁর চুম্বনের আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিলেন।

হঠাৎ কি ভেবে তিনি নিজেকে সংযত ক'রে উঠে ধীরে ধীরে ভগ্নকণ্ঠে বললেন—আমিও তাকে কখন দেখি নি। কিন্তু আজও আমি তাকে জীবন পথের পাথেয় পাঠাচ্ছি—

তাঁর কণ্ঠ হতে আর কোন কথা বার হল না। একটা দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুক ভেঙ্গে বার হয়ে এল। অঝোর-ধারে চোখ হ'তে অশ্রু ঝরতে লাগল।

তাঁকে বিচলিত করলে হয়ত আমারই মতো তাঁর ছেলের স্মৃতি, কিম্বা হয়ত আমিই বা?—এই আমার মা আমার হারানো মা—এ স্বপ্নসুখও অসহ্য! অথচ এ

আমি নষ্ট হতে দিতেও চাই না। তাই আমি সেথান হ'তে পালাতে চাইলাম। তুমি এলে বন্ধু, তোমার সহানুভূতিভরা উদার হৃদয় নিয়ে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে!

—এই স্নেহে এই প্রেমে, এই সহানুভূতিতে, আমার প্রাণ আবার নতুন ক'রে জন্মলাভ করতে চাইল। মনে হল এতদিন ধরে আমি পৃথিবীকে ভুল বুঝে এসেছি। তার ঘৃণার কাঁটা-বিছান পথে আমি এতদিন চলে এসেছি। স্নেহ-প্রেমের ছায়া-শীতল দুর্ব্বাদলে ছাওয়া পথের কোন সন্ধান পাই নি। মনে হল—এতদিন ধরে আমি আমার জীবনকে নষ্ট ক'রে এসেছি। পৃথিবীর সুরাভাণ্ডের গরলই পিয়ে এসেছি, অমৃতের রসাস্বাদন করি নি। এত দিন ধরে যে ভুল ক'রে এসেছি তাকে ত আর শোধ্‌রাবার সময় নেই কিন্তু তাতে কি, যাবার আগে যে আমার ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ, এই ধরণীর পুষ্পগন্ধ-ভারের সৌরভের সন্ধান যে জেনেছি, তাতেই আমি ধন্য · · · ·"

সুনীল স্থির হয়ে তার জীবন কথা শুনছিল। তার চোখে দুটো নির্ব্বাণো-ন্মুখ-দীপের দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

বাইরে তখনও বিদ্যুজ্জালাময়ী মেঘেভরা আকাশ হতে অশ্রান্তধারায় জল ঝরছে!

ভাবছ জগতটাকে কেড়ে নিলেই জগত তোমার হ'ল?—ছেড়ে রাখ্‌লেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপ্‌তে গেলেই দেখ্‌বে সে ফস্‌কে গেছে!

"মুক্তধারা"

দেবতার গ্রাস

—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

গাছের পাতা ঝরে, ফুলও ঝরে। মাটির সঙ্গে রং মিলিয়ে আপন সমাধি রচনা করে—কারো চোখে এ ছবি বিশেষ বিস্ময়কর ঠেকে না। কারণ ঋতুতে ঋতুতে এই ঝরা-ফুল-পাতার খেলা অবিশ্রান্তভাবেই হয়ে আস্‌ছে। মনে কোন রেখা-পাত করে না, কারণ এরই পিছনে আছে—নব-ফুল-বল্লরীর আবির্ভাব। কিন্তু যখন দেখা যায়, গগনচুম্বি ছায়া-ঘন তরু, তার বিস্তীর্ণ শাখা-প্রশাখা পত্র মঞ্জরি নিয়ে মাটির বুক ভরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সহসা তার সমস্ত সজীবতা হারিয়ে ফেলেছে; ডাল পড়েছে নুয়ে, পাতা গেছে দুম্‌ড়ে, রস গেছে শুকিয়ে—মানুষের বুক হায় হায় ক'রে ওঠে।

মহেশ রায়কে দেখে, সবার বুকে সেদিন ঠিক এমনি একটি হাহাকার জেগে ছিল!

অর্দ্ধাশনে অনশনে কত লোকের দিন যায়; কত মানুষ, জীর্ণ মলিন বস্ত্রে কোনমতে লজ্জানিবারণ ক'রে দিন কাটায়, এ পৃথিবীতে কত সহস্র মানুষ গৃহহীন, পথের ধারে, পথের জঞ্জালের মত দিন কাটাচ্ছে—কিন্তু সে যে মহেশ রায়!

মানুষ বলে, আহা কি ক'রে এমন সর্ব্বনাশ হল! ওগো ও যে বড় সুখী, বড় অভিমানী; রোদের তাত্‌টি গায়ে সয় নি কোন দিন! ও যে একদিনও বাঁচ্‌বে না!

কিন্তু মহেশ রায় বাঁচ্‌লেন। একদিন নয়, এক বছর এগার মাস! তিনি যে দিন মারা গেলেন, শোনা যায়, ঘোষ পাড়ার ভিক্ষারীও নাকি চোখের জল ফেলেছিল।

তিনি ছিলেন বনেদী বড় লোক। আর সেই অনুযায়ী ছিল তাঁর হাব-ভাব চাল-চলন নজর দিল মেজাজ আর রুচি।—কিন্তু বৈঠকখানার ফরাসে, তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে করসিতে গুড়্‌ক টেনে, গাল-গল্প ক'রে দিন কাটান, বা সন্ধ্যায় বড়লোকের চির-প্রথা অনুযায়ী বাগান-বাড়ীতে মজলিস্ জমান; এ সব ছিল

তাঁর চিন্তার চৌহদ্দির বাইরে। লক্ষ টাকার জামিন্ দিয়ে তিনি হয়ে ছিলেন একটি সওদাগরী অফিসের বেনিয়ান।—বেতন পেতেন আড়াই শ টাকা।

লোকে বল্‌ত, কুবের যাঁর ঘরে ভঁাড়ারী, তাঁর কেন এ পণ্ডশ্রম!—কেউ আশ্চর্য্য হত, কেউ বা আড়ালে ডুচারটে মনের মত টিপ্পনিও কাট্‌ত। মহেশ রায় হাস্‌তেন।

দিন যায়। যৌবনের সীমা ছাড়িয়ে মহেশ রায় বার্দ্ধক্যে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর ঢেউ-খেলান চুল, সুবিন্যস্ত গোফ্, দাড়ী সবই পূর্ব্বের মতই পরিপাটি, শুধু তাদের রং বদল হয়েছে।—কিন্তু যৌবনে কাজের প্রতি তাঁর যে উদ্দামতা যে আগ্রহ ছিল, তা তেমনিই রইল।

অফিসের ম্যানেজার তাঁর বন্ধু। দুজনে এক সঙ্গেই প্রায় কাজে ঢোকেন; একদিন তিনি হেসে বল্‌লেন—রায় সাহেব, আর কেন? এবার মক্কা বা কাসি যেথায় হোক একটা ঠাঁই জুটিয়ে নাও, আমিও পাড়ি জমাব ভাবছি।

রায় মশাই হাস্‌লেন। কিন্তু মনে জাগ্‌ল তাঁর দশ বছরের ছেলের মুখখানি, চোখের কোণ রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল; উত্তর দিলেন—মক্কা কাসি আমার ঘরে। কোথাও যাচ্ছি না সাহেব, ঘরেই পচে মরব। পুণ্যিটা তুমিই কর গে।

সাহেব বল্‌লেন—হাঁ, ভাব্‌ছি এই হিসেব-নিকেসের পরই—জানুয়ারী নাগাদ—'

হিসাব নিকাসের সময় এল। অডিটার রা দেখ্‌ল সমস্ত বছরের জমা-খরচের হিসাব ঠিক আছে কোন ত্রুটি নেই কিন্তু তহবিলের খানিকটা ফেঁাপ্‌সা হ'য়ে গেছে!

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল—মহেশ রায় এর জন্যে দায়ী।

ছোট কেরানীরা চোখ টেপাটিপি করল, যারা মহেশ রায়কে হিংসা করত তারা উঠ্‌ল ক্ষেপে, যেন টাকাটা তাদেরই গেছে! দু একজন বল্‌ল, দেবতা এসে বল্‌লেও বিশ্বাস করি না।

ম্যানেজারের কাছে রায় মশায়ের ডাক পড়্‌ল, তিনি এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু আজ সাহেব, বন্ধুর স্নেহ দেখিয়ে বসতে চেয়ার দিখিয়ে দিলেন না।

চোখ দিয়ে আগুন বার ক'রে রায় মশাই ধরা গলায় বল্‌তে চেষ্টা করলেন—আমি—এত বড় অন্যায় ··· আমাকে বিশ্বাস কর—

কাগজের ওপর কি লিখ্‌তে লিখ্‌তে সাহেব বল্‌লেন—জানি। ওসব কথা বল্‌বার দরকার নেই। কে এ কাজ করেছে তাও জান্‌তে পেরেছি। কিন্তু দেরী

হয়ে গেছে, সে ভয়ানক হুঁসিয়ার, তাকে ধরা যাবে না, গেলেও তোমার নিস্তার নেই।

প্রায় কেঁদে ফেলে রায় মশাই বল্লেন—কে সে ?—

সাহেব বল্লেন—তুমি যার ক্ষুধার অন্ন জুটিয়ে ছিলে একদিন।

এক নিমেষে মনে পড়ে গেল সব কথা। তিন বছর পূর্ব্বে এক নিকট সম্পর্কের ভাইকে তিনি নিজের জামিনে ক্যাসিয়ারের কাজে বসিয়ে ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। বল্লেন, সে কি সম্ভব ? ও যে আমার ভাই! ওকে যে আমি—

তাঁর গলা আবার ধরে এল!

সাহেব বল্লেন—সইগুলো সব জাল, কিন্তু তুমি তার জামিন। তোমার নিজের কত টাকা আছে ?—

রায় মশাই কিছু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বল্লেন—অনেক অপগণ্ড মানুষ করতে হয়েছে, বিশেষ কিছুই নেই। বাড়ী আর আমার স্ত্রীর গয়না গাঁটিতে বোধ হয় হাজার সত্তরও হবে না, সব পুরোণ—সেকেলে—

সাহেব বল্লেন ওতেই হবে। খোয়া যাচ্ছে এক লাখ ছত্রিশ হাজার। তোমার জামিনের টাকা আছে একলাখ; খুচরাটা আমি ডিরেক্টারদের বলে মাপ করাতে পারি।—তুমি অনেক দিনের বিশ্বাসী লোক, তোমার দ্বারা কোম্পানির লাভও হয়েছে যথেষ্ট।

রায় মশাই ম্লান হেসে বল্লেন—তাই হোক্। কিন্তু শম্ভু এ কাজ করবে ?—সে যে আমার বাড়ীতেই থাকে! তার স্ত্রী ছেলে মেয়ে যে—

সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে রায় মশাইয়ের হাত ধরে বল্লেন—বুড়ো বয়েসে দাগাটা বড় বেশী লাগে রায় সাহেব—

রায় মশায়ের মুখের হাসি মিলাল না, কিন্তু চোখে জল এল। তিনি দেখ্লেন বন্ধুর চোখ ও বেদনায় রাঙ্গা!

তারপর তিন দিনের দিন আফিসের সমস্ত টাকা বুঝিয়ে দিয়ে, রায় মশাই বন্ধুর কাছে বিদায় চাইলেন।

সাহেব জিগ্গেস করলেন—কি ব্যবস্থা করলে ?—

রায় মশাই বল্লেন—বাড়ী, গাড়ী, গয়না-গাঁটি সব আমার ভাই কিনেছে, আর আমাকে ঐ বাড়ীতে কিছুদিন বিনা ভাড়ায় থাকতে দিতেও রাজী হয়েছে।

এবার সাহেব হাস্‌লেন।

* * * *

সহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল—রায় মশাই জালিয়াৎ! তবু কেউ সেকথা বিশ্বাস কর্‌ল না। কিন্তু মানুষের এ বিশ্বাস, বিধাতার হিসাবের খাতায়, রায় মশায়ের পরকালের শান্তির জন্তে জমা হল, ইহকালে সেগুলো বিশেষ কাজে এল না।

অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা গেল, রায় মশায়ের কোঁচান ধুতি পাঞ্জাবীর পাটে পাটে ময়লা জমেছে, ছিঁড়েও গেছে! কপালের বলি-রেখা গুনে শেষ করা যায় না, শরীর নুয়ে পড়েছে, গাল দুটি মুখের ভিতরে যেন চলে যেতে চায়!

রায় মশায়ের স্ত্রী তারাসুন্দরী, চিরদিন তাঁর প্রাপ্য সুখ-শান্তির ভাগ স্বামীর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন, নিঃশব্দে দুঃখের ভাগও নিলেন কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর বুক ফেটে গেল। তিনি শয্যা নিলেন।

ডাক্তার এল, ওষুধও খেলেন, কিন্তু জীবন-প্রদীপ তাঁর ধীরে ধীরে নিব্‌তেই থাক্‌ল।

রোগ শয্যায় শুয়ে তিনি একদিন দেখ্‌লেন, তিন-তলার ঘর থেকে তাঁর ধনী বৌ, তাঁরই গয়নাগুলি গায়ে দিয়ে, তাঁর খবর নিতে এসেছেন!

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে খীন কণ্ঠে তারাসুন্দরী বল্‌লেন—ভাল আছ ভাই?—

উত্তর শুন্‌লেন—কৈ আর ভাল? যে পোড়া শরীল হয়েছ, বোতল বোতল ওষুধ খাচ্ছি তবু দেখ না, এই সিঁড়িটুকু ভেঙ্গে আস্‌তেই বুকের ভেতরটা ধড়্‌ফড়্‌ কর্‌ছে!—

ছোট ছেলে অসীমকে কাছে ডেকে, তার ছোট হাত দুটি বুকে চেপে, তারা-সুন্দরী চোখ বন্ধ ক'রে পড়ে রইলেন। তপ্ত অশ্রু তাঁর দু'গণ্ড ভাসিয়ে বয়ে যাচ্ছিল!

* * * *

সেদিন সকালে রায় মশাই তাঁর হিসাবের খাতাটি খুলে দেখ্‌লেন, তিন শ ছাপান্ন টাকা, দশ আনা, ন পাই এখনও তাঁর হাতে আছে!

অসীম তখন তাঁর পাশেই বসে ছিল, তিনি তার দিকে তাকিয়ে একটু হাস্‌লেন। সে হাসি দেখে ভয় পেয়ে ছোট অসীম কেঁদে উঠ্‌ল!

পাড়ার লোক বলাবলি করে—রায় মশায়ের নিশ্চয় ভীমরথি হয়েছে! গিন্নীর

শ্রাদ্ধে কি টাকাটাই না চাল্‌লে! আহা ওটা থাক্‌লে ছেলেটার তবু একটা হিল্লে হ'ত।—কিন্তু বল্‌তে হয়, নজর বটে! কি খাওয়াটাই না খাওয়ালে মানুষকে!

কিন্তু তাঁর এই 'নজরটা' নিজের সম্বন্ধে একেবারেই দেখা গেল না! তিনশ ছাপ্পান্ন টাকা, দশ আনা, ন পাই, রায় মশায়ের নজরে যত দিন থাকা উচিৎ ছিল তা হয় নি। তবু সেটা একদিন ফুরাল, আর সেই সঙ্গে তিনিও ভেঙ্গে পড়্‌লেন। আর উঠ্‌লেন না। কিন্তু তাঁকে দাহ কর্‌বার লোকের অভাব না হলেও তাঁর শ্রাদ্ধে হয়েছিল।

পাড়ার মেয়েরা বলাবলি কর্‌ল—কি ভাই গো! চামারের বেহদ্দ!—তোকে যে সর্ব্ব দিল, তার আত্মার সদ্‌গতির জন্যে কি দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকেও খাওয়াতে পার্‌লি না? ওদের টাকার ঘুণ্ ধরে না গা?—

এই কথা গুলি যখন রায় মশায়ের ভ্রাতৃবধু অম্বুজার কাণে এল, তিনি নথ নেড়ে মুখ বাঁকিয়ে বল্‌লেন, লোকের মুখে আগুন। পোড়া চোখে আক্কেল থাকীরা কি দেখ্‌তে পায় না, যে অত বড় একটা ধুমস্ ছেলেকে মানুষ কর্‌তে হচ্ছে আমাকেই? তার নবাবীর খোরাক জোটাচ্ছে কে? ঐ কালামুখী না?—

পাড়ার লোকের মুখবন্ধ হ'ল।

অসীম আর ধনী লোকের ছেলে নয়। ধনীর আত্মীয়। ধনী আত্মীয়ের আশ্রয়ে, দরিদ্রের সন্তান যে ভাবে মানুষ হয়, অসীমের তার কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটল না। বালক অসীম, কাক কাকীমার মুখের দিকে তাকায়, ভাই বোনগুলিকে দেখে; তাদের পোষাকের সঙ্গে নিজের কাপড় জামা, বালকসুলভ ঈর্ষ্যার চোখে মিলিয়ে নেয়। খাবার সময় মুখে খাবার ওঠে না! পড়্‌বার সময় আন্‌মনা হয়ে যায়, স্কুলে মার খায়, লুকিয়ে নির্জ্জনে চোখের জল ফেলে।—কিন্তু জগতের স্নেহের ভাণ্ডার কোন দিন শূন্য হবার নয়, অসীম, বাড়ীর চাকর-মহলে আশ্রয় পেল, রাঁধুনীর সঙ্গে তার বিশেষ ভাব। বাইরে, পাড়ার নীচ জাতের ছেলেদের সঙ্গেও অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হল। দিনের বেলাটা তাদের সঙ্গেই কাটায়। ধনী আত্মীয়দের নিশ্বাস ফেল্‌বার অবসর নেই। অসীম তাদের মনে ছিল কি জানি না। কিন্তু সে তাদের চোখে যে ছিল না, তা বলা যায়।

মাঝে মাঝে গভীর রাতে অসীম রাঁধুনীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাত—তুই কেন আমার জন্যে ওসব ভাল ভাল খাবার রাখিস্? আমি খাব না।

রাঁধুনী কেঁদে উত্তর দেয়—তোর মা বাবাকে আমি বিশ বছর রেঁধে

খাইয়েছি একটি দিনের তরেও তারা আমায় বকে নি, আর তুই, আজ ঐ শম্ভু চামারের ভাইপো, আমায় মন্দ বলিস্! খাবার রাখ্‌ব না ত কি? এ সব ত তোরই। যে ছাই ওরা তোর জন্যে বরাদ্দ রেখেছে, তা দেখ্‌লে তোর মা—

রাঁধুনীর মুখের কথা মুখেই থেকে যায়।

এমনি ক'রে প্রায় আট বছর কেটে গেল।

অসীম লেখাপড়া কিছু শিখ্‌ল না। সৌখিন বা ভদ্রভাবটার চিহ্ন তার শরীর মন হতে মুছে গেছে। ধনী ভাইরা তাকে ভাই বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করে। সেও কোন দিন স্বেচ্ছায় তাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়ায় না। বাড়ীর কা'রো কাছেই সে বড় একটা আসে না। অনেকে হয়ত তার চেহারাও ভুলে গেছে। শুধু কাকীমা তাকে ভোলেন নি।

একদিন সন্ধ্যার পর অসীম তার ঘরে ঢুক্‌তেই শুন্‌তে পেল, কাকীমা বল্‌ছেন, খেয়ে-দেয়ে ধর্ম্মের ষাঁড় হচ্ছেন! এত খোরাক জোগায় কে? আমাদের যে হাড় কালি হয়ে গেল! লেখাপড়া শিখিস্ নি, কলে খাট্‌তে পারিস্ না?—

অসীম, আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌ল। ঠিক কথা মনে ক'রে দিয়েছেন কাকীমা!

ছোট বেলা থেকে সে পাড়ার যত কারিগরের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিল। বিশেষ ক'রে রঘু কামারের সঙ্গে। কত দিন সে তার হাপর টেনেছে। আগুনে পোড়া লোহার উপর রঘু ছেনি ধর্‌লে, কত দিন সে বড় বড় হাতুড়ি পিটেছে। এই কাজে তার খুব আনন্দ হত।

সেই রাত্রেই অসীম চুপি চুপি রঘুর কাছে এসে বল্‌ল—আমায় একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পার কাকা?

রঘু সব বুঝ্‌ল। বল্‌ল—কাজ আমি দেব?

অসীম বল্‌ল—হাঁ, পার্‌বে না?

রঘু বল্‌ল—তা আর পার্‌ব না?—কিন্তু এখানে কাজ কর্‌লে তোমার বাপের নাম ডুব্‌বে। আমার ছেলে কালিমাটিতে কাজ করে, তার কাছে তোমায় পাঠাতে পারি।

অসীম, আনন্দে অধীর হয়ে গেল। বল্‌ল—তাহ'লে কালই যাব কাকা, আমি আর একদিনও এখানে থাক্‌তে পার্‌ব না।

ঘরে ফিরে মঙ্গলা রাঁধুনীকে অসীম বল্‌ল—তোর ছুটি, আর আমার জন্যে ভাত কোলে ক'রে বসে থাক্‌তে হবে না। আমি একটা কাজ নিয়ে চলে যাচ্ছি।

সে রাত্রে রায় মশাই আর তাঁর স্ত্রীকে মনে ক'রে মঙ্গলা অনেক চোখের জল ফেলেছিল।

ভোর হ'তেই অসীম পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা ক'রে বেড়াতে লাগ্‌ল। হরি গয়লা, শ্যাম ময়রা, নফর গোপা, চণ্ডী কলু, এমন কত বন্ধু তার। সবার ঘরেই কিছু কিছু সে খেতে চাইল। সবাইকেই এক কথা বল্‌ল—আমায় ভুলে যাস্ কিন্তু আমার মা বাবাকে ভুলিস্ নি।—'

সবাই তাকে বল্‌ল একই কথা—তোকে দেখ্‌বে দয়াময় হরি। আমরা ছোট জাত, আশীর্ব্বাদ ত কর্‌তে পারি না। কিন্তু আমাদের কল্‌জেটা ছিঁড়ে যাচ্ছে রে অসীম—'

সন্ধ্যার পর অসীম বাড়ীতে এল। কিন্তু তার নিজের ঘরে গেল না, বরাবর ওপরে উঠে এসে, যেখানে কাকীমা তাঁর ছেলে মেয়ে নাতী নাতনীদের খাওয়াচ্ছিলেন, সেইখানে এসে দাঁড়াল।

কাকীমা বল্‌লেন—নেশা টেশা করেছিস্ নাকি? চোখ দুটো দেখ, যেন জবাফুল!

অসীম বলল—আমি আজ চলে যাচ্ছি। বাইরে একটা কাজ পেয়েছি।

বড় ছেলেটির পাতে লুচি দিতে দিতে ঠোঁট দুটি একটু বাঁকিয়ে কাকীমা বল্‌লেন—পাবেন ত ন'শ পঞ্চাশ, বইবেন ত মোট্, তাই আবার ঢাক পিটে বেড়াচ্ছেন! ঘেন্নায় মরি—

ভাই বোনেরা মুখ টিপে হাস্‌ল।

যে ঘরে তার মা বাবা মারা গিয়েছিলেন সেই ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অসীম সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

২

সে যেন পাতালপুরী! চারপাশে আগুন, বিরাট দৈত্যের মত সব যন্ত্র! কলের মুখ দিয়ে আগুনের ফুল্‌কি বেরিয়ে আস্‌ছে! কাণে কা'রো কথা এসে পৌঁছয় না; সব আকারে ইঙ্গিতে বুঝ্‌তে হয়। কি ভীষণ সে শব্দ! এখানকার মানুষরাও যেন এক একটি যন্ত্র-বিশেষ! তাদের শরীর যেন রক্ত মাংসের নয়, সে লোহা হয়ে গেছে।

অসীম, অসীম বিস্ময়ে একটা গলা লোহার নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। আগুনের স্রোত যেন নেমে চলেছে!

রঘু কামারের ছেলে গোপাল এসে বল্‌ল—সাহেবকে বলেছি, তোমার কাজ হয়েছে, রিভেটম্যান।—মাইনে বাইশ টাকা, উপরিও আছে। থাক্‌বে কোথায় ?

অসীম চিন্তিতভাবে তার নুতন বন্ধুর মুখের দিকে চাইল। বন্ধু বল্‌ল—রায় মশায়ের ছেলেকে আমার সঙ্গে থাক্‌তে বল্‌তে ত পারি না, তাই—

বন্ধুর হাত চেপে ধরে অসীম বল্‌ল—পার্‌ব, সব পার্‌ব। আমার কোন কষ্ট হবে না। আট বছর তার পরীক্ষা দিয়েছি। আমি ছোট হয়েই থাকৃতে চাই তোমাদের মত। আমাকে একেবারে তোমাদের মত ছোট ক'রে দাও।

গোপাল বল্‌ল—তা মিলেমিশে থাক্‌লে দু'ভায়ের দিন এক রকম ক'রে কেটে যাবেই—নাও ধর দেখি এই হাতুড়িটা এই জোড়্‌টার পিছনে, আমি রিপিট করি। বেশ শ'ক্ত ক'রে ধর, নইলে হাতে ব্যথা হ'বে। একটু বাঁদিকে, ডাইনে একবার আরো জোরে—সাবাস ! তুমি পার্‌বে।

দুই বন্ধু কপালের ঘাম মুছে সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

বছর না ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে অসীমের নাম হল—অসি মিস্ত্রী। তার গলার স্বর হল ভারী, কর্কশ, ভাবা হল—ছোটলোকের মত ! সে খইনি খায়, যখন তখন থুথু ফেলে, গলাগাল দেয়, সভ্য জগতের সমস্ত চিহ্ন লোহার কলে ঢালাই হয়ে সম্পুর্ণ নূতন রূপ নিয়ে উঠ্‌ল।—অসীমও হয়ে গেল লোহার মানুষ।

এখানে আসার অল্প দিনের মধ্যেই অসীম দেখ্‌ল তারই মত সহস্র সহস্র ভাগ্যহত মানুষ এই কারখানার মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আকারে ইঙ্গিতে ধরা না গেলেও তাদের নামের শেষে—বোস, ঘোষ, মিত্র, গাঙ্গুলী, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শব্দ, সভ্য জগত্তের উচ্চ বংশধরগণের পরিচয় দেয়। অনেকেই সময় সময় আপনাদের পূর্ব্ব গৌরবের কথা গর্ব্বের সঙ্গে বলে, অসীম শুনে যায়, নিজের কোন কথা বলে না কোন দিন। শুধু মানুষকে জানিয়ে দেয়—সে অসি মিস্ত্রী।

একটানা স্রোতের মত বৈচিত্র্যহীন দিনগুলির ভিতর দিয়ে তার জীবন নদী ব'য়ে চল্‌ছে। অসীম এখন শুধু রিভেট্‌ম্যান নয়, সে কারখানার সব কাজ বোঝে, কর্‌তে পারে। সে লোহা ঢালাই করে, ইঞ্জিন [illegible]য়, কলকব্জা তৈরি করে, কাঠের ওপর বাটালি দিয়ে এমন সুক্ষ্ম কাজ করে, যে ছুতোররাও অবাক হয়ে যায়। কারখানার ফোর্‌ম্যান থেকে ম্যানেজার পর্য্যন্ত সবাই এখন অসি মিস্ত্রীর পরামর্শ নেয়।

কারখানার বাইরে মিস্ত্রী পল্লীতে সে তার বন্ধু গোপালের সঙ্গে বাসা বেঁধে আছে। ছোট একটি ঘর। দুই বন্ধুর দুটি খাটিয়া, হাঁড়ির ভিতর তাদের কাপড় থাকে, দু তিনটে কাঁসার থালা গেলাস, দেবী জগদ্ধাত্রীর ছবি একখানা, এই দুই বন্ধুর সম্পত্তি। বাইরে একটু দাওয়ার মত, সেইখানেই পালা ক'রে অবসরের সময় রাঁধে, খায়, তারপর পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। দিন যায়। অসীম সভ্য জগতের কথা ভুলে গেছে।

একদিন সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে অসীম শুন্‌ল—কি একটা ভয়ানক অপরাধের জন্যে যে ননী দাসকে সবাই একঘরে করেছিল, সে, শেষ রাত্রে মারা গেছে কিন্তু তাকে দাহ করা হয় নি। কেউ ছুঁতে চায় না।

রেগে আগুন হয়ে অসীম বল্‌ল—হয়েছে সবাই মিস্তিরি, খাট্‌ছে কলে, তবু আজও সুমুন্দিদের বামুনাই রুয়াব গেল না! সুমুন্দিদের মাতায় গোটাদুই ক'রে রিপিট্ ঠুকে দিলে জ্ঞান হয়—

দুই বন্ধু ননী দাসের বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। শবদেহের শিয়রে মোক্ষদা আর শিউলি বসে ছিল, তারা ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল।

অসীম এগিয়ে এসে বল্‌ল—কাঁদিস্ পরে, এখন একটা কাটারি আন্‌ত দেখি শিউলি, আর খানিকটা দড়ি আর মাদুর থাকে ত আনিস্।

শিউলি সমস্ত জিনিস এনে দিলে, কাটারিটা তুলে নিয়ে উঠান থেকে একটা সরু শালের বাতি মাপ মত কেটে এনে বল্‌ল—আয় গোপ্‌লা এই মাদুরে ওকে শুইয়ে দড়ি দে' এটার সঙ্গে বাঁধি। বইতে কষ্ট হবে না।

ননীকে যারা একঘরে ক'রে ছিল, ভোরের বেলা যখন তারা শুন্‌ল—অসি আর গোপ্‌লা মিস্ত্রী কায়েতের মড়া ছুঁয়ে জাত ধর্ম্ম সব নষ্ট ক'রে দিয়েছে, সবাই একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠ্‌ল। পেরাচিত্তির নেই, বামুন খাওয়ান নেই, বারো-য়ারীতে চাঁদা দুটাকা তাও নয়, অম্‌নি অম্‌নি স্বগ্‌গলাভ? আর সৎকার কর্‌ল কি না ছোট জাত, অসি আর গোপলা! একেই বলে কলিকাল—এই সঙ্গে শিউলির সম্বন্ধে দু-চার কথাও বল্‌তে ভুল্‌ল না তারা।

অসীম দাঁতে দাঁতে চেপে বল্‌ল—শালারা আজও সব ভদ্দর রয়ে গেছে! মুখগুলোর মধ্যে হাতাটাক গলা শিসে ঢেলে, ফুটোটা ভরাট্ ক'রে দিতে পার্‌তুম—

* * * *

শিউলির ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে মোক্ষদা একদিন অসীমকে বল্‌লে—বাবা

ও মেয়েটার কি গতি হবে? দেবতা মানুষ সবাই আমাদের ত্যাগ করেচে শুধু তোরাই ছাড়িস্ নি; তাই তোদের কাচেই কাঁদি।

অসীম বুঝ্‌ল—নিরাশ্রয় হলেও অপরিচিত মানুষের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা কলঙ্কের কথা।

সে একবার শিউলির আনত মুখের দিকে তাকিয়ে বাসায় ফিরে গিয়ে গোপালকে বল্‌ল—শিউলিকে আমি বে কর্‌ব। তুই একবার কানাই ভট্‌চাযকে জানিয়ে রাখিস। কাল পরশুর মধ্যেই, বুঝ্‌লি?—

বিয়ে হ'য়ে গেল। বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অসীম শ্বশুর বাড়ীতেই রইল; নইলে মোক্ষদাকে দেখ্‌বে কে?—

একদিন রাত্রে শিউলি সাহস ক'রে অসীমের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বল্‌ল—তোকে যেন রাজপুত্তুরের মত দেকৃতে!

অসীম হেসে বল্‌ল—হাঁ। আর তুই তার বৌ।

চোখ রাঙা ক'রে ভারী গলায় শিউলি বল্‌ল—আমার বাবারও অনেক টেকা ছেল একদিন—

গেলো কে? কাকা?—

না। একদিন মাঝ রেতে আমাদের ঘরে আগুন লাগ্‌ল, আমি তেখন খুব ছোট। বাবা আমাকে কোলে নে' মার হাত ধরে বাইরে পাইলে এল; আর সেই গোল্‌মালে জমিদারের পাইক্‌রা মাকে জোর ক'রে ধরে নে' গেল—

ধরে নে' গেল—কোতা?—

জমিদারের কাচারি বাড়ীতে।

কেন?—

কি জানি।

আর আসে নি?—

না।

গভীর এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অসীম বল্‌ল—হুঁ।

অসীমের আর একটু কাছে সরে এসে, ভিজে-গলায় শিউলি বল্‌ল—আচ্ছা তোর মাকে মনে আচে?—

অসীম বল্‌ল—না। তেখন আমি ঐ চক্কোত্তীর ছোড়া ক্যাব্‌লাটার মত হব।

কিন্তু আমি তোর মাকে দেকেচি—

কোতা?—

তোর চোক দুটোতে। তোর বাবাকে মনে পড়ে ?—

অসীম বল্‌ল—খুব।

রাজার মত তেনাকে দেকৃতে ছেল, না ?—

রাজাদের অত ভাল দেকৃতে হয় না। আমাদের এই ঘরটায় যদি তেনাকে ঢুক্‌তে হত, তাহলে মাতা থেকে কাঁদ্ অব্‌দি এক ফুট তিন ষ-টাক ছেঁটে না দিলে গলত না! তার ছাতিটে ছেল ঐ দোরটার মত চেটাল।

শিউলি আর কোন কথা না বলে অসীমের বুকের কাছটিতে মাথা রেখে শুয়ে রইল।

অসীম বল্‌ল—মোক্ষদা তোর কে হয় শিউলি ?—

শিউলি বল্‌ল—কেউ না। ওকে ওর বাড়ীর নোক তাড়িয়ে দে' ছেল। কোতা ওর ঘর ছেল জানি না। বাবা ওকে নিজের বোনের মত রেখে ছেল।

সেই জন্যে বুঝি সবাই তোর বাবাকে একঘরে করে ?

হাঁ।

খুব দুঃখু পেয়েচিস্ না শিউলি ?

হাঁ।

আর এখন ?—

এখন তুই আচিস্ আর আমাদের ভাবনা কি ?

অসীম দেখ্‌ল শিউলির চোখ দুটি আবার রাঙ্গা হয়ে উঠেছে!

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে শিউলি বল্‌ল—তোর দেশে আমায় নে' যাবি না ?

না।

কেন ? সেখানে কেউ আর নেই ?

আচে।

কে ?

বাস্তু ঘুঘু। সে-ই তার ছেনা-পোনা নে' আমার ভিটেয় চরে বেড়ায়।

অসীমের গলায় হাত দুটি জড়িয়ে তার মুখটা শিউলি নিজের চোখের জলে-ভেজা মুখের ওপর চেপে ধর্‌ল।

অসীম বল্‌ল—আচ্ছা শিউলি, মোক্ষদা আগে কপালে সিঁদুরের টিপ্ পর্‌ত, এখন ত পরে না ? হাতে একটা নোয়া আর শাঁকাও দেকেছিলুম মনে হয়, এখনত নেই, তোর বাবা মরে যাবার পর থেকে পেড়ে কাপড়ও আর পরে না!

বিস্ময়পূর্ণ দুটি চোখ অসীমের মুখের ওপর তুলে শিউলি চেয়ে রইল। গভীর এক রহস্যের সন্ধান যেন তার কাছে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে!

অসীম বল্‌ল—তোকে ঠিক মোক্ষদার মত দেক্‌তে!

চমকে উঠে শিউলি বল্‌ল—কেন তোর এ কতা মনে হল?

অসীম বল্‌ল—ক'দিন ধরেই দেক্‌চি, ক'দিন ধরেই ভাবছি, কতাটা আজ বল্লুম, তোর একদিনও মনে হয় নি?

শিউলি বল্‌ল—অনেক দিন ভেবেচি, অনেক লোকের অনেক কতা শুনেচি, কিন্তু ঠিক বুজ্‌তে পারি নি। বাবার কাছ থেকে ও সব সময় দূরে থাকৃত; কোন দিন তেনার সামনে মুকের কাপড় খোলে নি।

অসীম বল্‌ল—ও তোর মা শিউলি!

শিউলির চোখের জল অনেকক্ষণ থেকে ঝরে পড়ছিল, এবার সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে চোখের ওপর গভীর স্নেহের চুম্বন রেখে অসীম বলল—আবার কাঁদিস্‌ কেন? মাকে ত ফিরে পেয়েচিস্‌—

শিউলি বিছানার ওপর উঠে বসে বল্‌ল—একবার যাই—

কোতা?

ওকে একবার মা বলে ডাকৃব।

অসীম বল্‌ল—যা।

৩

আঘাতটা খুব বেশী নয়। কোথাও বিশেষ কাটে নি, ফাটে নি। কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে ছিল মাত্র। তবু তাতেই অত বড় যোয়ান, লোহার মানুষ অসীম, জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল!

কারখানার সবাই হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল। ম্যানেজার তাকে নিজের কাম্‌রায় এনে ডাক্তারকে খবর দিলেন; কিন্তু ডাক্তারের আগে এল মোক্ষদা আর শিউলি।

ব্যাপারটার মধ্যে কারো হাত ছিল না। একজন কারিগরের হাতুড়ি, হাত ফস্‌কে তার মাথায় এসে পড়ে।

ডাক্তার এল, অনেক চেষ্টাও হল কিন্তু অসীমের জ্ঞান ফিরে এল না!

চিন্তিত ভাবে ডাক্তার বল্লেন—বাঁচ্বে কিন্তু স্মরণ শক্তি হয়ত না-ও ফিরে আস্তে পারে।

ম্যানেজার বল্লেন—ওকে তা হ'লে সহরের হাঁসপাতালে পাঠাই—

কিন্তু শিউলি, সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে বল্ল—প্রাণ থাকৃতে আমি ওকে ছেড়ে দিতে পার্‌ব না।

ভারতীয় নারীদের ওপর ম্যানেজারের মনে মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছিল তিনি আর বোঝাবার বৃথা চেষ্টা কর্‌লেন না। শুধু ডাক্তারকে বলে দিলেন নিয়মিত ওযুধ-পত্র দেওয়া বা দেখা-শোনার যেন কোন ত্রুটী না হয়।

সবাই ধরাধরি ক'রে অসীমকে তার ঘরে নিয়ে গেল।

শিউলি আর মোক্ষদা ছ'জনেই সমান উৎকণ্ঠায় চোখভরা জল নিয়ে অসীমের বুকে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে তাকে নাড়া দিয়ে ডাকে, চোখের পাতা টেনে ধরে তাকে চাওয়াতে চেষ্টা করে, দরজার বাইরে গোপাল অস্থির হয়ে পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে ছুটে এসে মাঝে মাঝে দেখে যায়—যখন তখন পাগলের মত ডাক্তারের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ে। কিন্তু অসীম চোখ মেলে চাইল না! সে যেন অনেক দিন পরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে!—একটা দিন একটা রাত কেটে গেল!

দ্বিতীয় দিন ভোরের দিকে মোক্ষদা বল্ল—শিউলি, কানাইসোলের বাবা বিশ্বনাথ বড় জাগ্রত দেবতা।—দশ বিশটে গাঁয়ের মানুষ, বাবার কাছে মানৎ ক'রে ফল পেয়েচে যা, দীতে কুটো নে' বাবার দোরে হত্যে দে' পড়। বুক চিরে রক্ত দে' বাবার পা ধুইয়ে দে।—গোপাল রয়েচে, আমি ওকে বেশ আগ্‌লে নে' থাকৃতে পার্‌ব—তুই নদীতে একটা ডুব দে' বেরিয়ে পড়্ মা—

* * * *

পথ খুব বেশী নয়, পূবে বার ক্রোশ মাত্র। শিউলি ঘর থেকে বেরিয়ে পথে নেমে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম ক'রে পথ চল্‌তে লাগ্‌ল। পথের দিকে তার দৃষ্টি নেই, তার মুখে এসে পড়েছিল শুকতারার ম্লান আলো।

ধীরে ধীরে চার পাশের অন্ধকার কাটিয়ে পূব-আকাশের গায়ে উষার আলো দেখা গেল! আর সেই সঙ্গে দলে দলে মানুষ ঘর ছেড়ে রাঙ্গা মাটির পথে বেরিয়ে এল!

কেউ চলেছে হাটে, মাথায় তার পসরা, কেউ চলেছে মাঠে, কাঁধে তার

কাঙ্গাল, কেউ বা তীর্থযাত্রী—নৈবেদ্য, চন্দন-পুষ্প-পত্রের ডালি তার হাতে! কোলাহলে পৃথিবী ভ'রে উঠ্ল।

যে তরুণ রবি মাঠের পারে শাল বনের ফাঁক দিয়ে পথযাত্রীদের মুখের ওপর সোনার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ক্রমে তা মাথার ওপর উঠে এসেছে। পথের ধুলা তেতে উঠেছে, পথিক গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। শিউলি এগিয়েই চল্ল, তার দৃষ্টি সাম্‌নের দিকে, মন ছুটেছে তার শরীরকে ফেলে অনেক আগে আগে।

পশ্চিম আকাশ রাঙ্গা ক'রে শাল বনের আড়ালে সূর্য্যের আলো যখন ঢাকা প'ড়্ল ঠিক সেই সময় শিউলির চোখে পড়্ল দূর পাহাড়ের ওপর শুভ্র এক মন্দিরের শিখর! শিউলি হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

তখন সন্ধ্যা-আরতি হচ্ছে। মন্দিরের দ্বারের কাছে অসংখ্য মানুষ। ভিড় ঠেলে যায় কার সাধ্য। তবু তারই মাঝে কোন মতে শিউলি একটু জায়গা করে নিল। সঙ্গে সঙ্গেই চার দিক থেকে শব্দ উঠ্ল—মর্ মাগী, চোখের মাথা খেয়েচিস্, দেখ্‌তে পাস্ না, ছুঁয়ে দিলি!—কে জানে কি জাত! মাগীর আস্পদ্দাটা একবার দেখ! আমাদের ঠেলে উনি যাবেন আগে!—আ মর—

শিউলি ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, সিঁড়ির এক ধারে চুপ ক'রে বসে রইল।

আরতি শেষ হয়ে গেছে। দলে দলে মানুষ মন্দির থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে চলেছে। প্রাঙ্গন জনশূন্য। পূজারী তাঁর অনুচরের সঙ্গে মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আস্‌তেই দেখ্‌লেন—সিঁড়ির ওপর কে একজন পড়ে আছে! কাছে এসে জিগ্‌গেস করলেন—কে গা—

মুখ তুলে শিউলি বল্ল—বাবার কাচে হত্যে দিতে এসেছি আমার সোয়ামীর বড় অসুখ, তেনাকে—'

শিউলির কথা বন্ধ হয়ে গেল।

অনুচরের দিকে অর্থভরা ইঙ্গিত ক'রে নরম গলায় পূজারী বল্‌লেন—আরে পাগ্‌লী দেবতার খুসীর ওপর হাত বাড়াতে চাস, কিন্তু সে কি এত সহজে হবার?—জীবনের বিনিময়ে জীবন বলি দিতে হয়—

শিউলি বল্ল—নেও ঠাকুর, আমার জীবন বাবার চরণে নিবেদন করলুম—সে বেঁচে উঠুক।

পূজারী আর একবার অনুচরের দিকে চাইলেন।

অনুচর বল্‌ল—তা দেখ বাছা, ঐ নাট্‌মন্দিরের একটা ঘরে হত্যে দিয়ে থাক গে। ঘরে ঘরে কত মেয়ে এখনও পড়ে আছে। বাবার যদি দয়া হয়, দেখা দেবেন।

তখন গভীর রাত্রি। সমস্ত দিনের পথচলার পর শ্রান্তিতে শিউলির শরীর মন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। ঘুমের মত একটা আচ্ছন্নভাব তাকে যেন ঘিরে ধর্‌ছিল এমন সময় তার মনে হল, তার খুব কাছে যেন কে দাঁড়িয়ে!

মানুষ? না, যেন ছবিতে দেখা মহাদেবের মত! মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল, কটিতে বাঘছাল কিন্তু মুখটা যেন পরিচিত! চোখে সে কি দিব্যজ্যোতি?—না পাশবিক কামনার আগুন জ্বালা?

শিউলির শরীর অবশ হয়ে এল! সহসা তার মনে হল, যেন মানুষের হাতের মত কি তাকে ঘিরে ধরেছে!

শিউলি একবার চোখ মেলে চাইল।—চিন্‌তে পার্‌ল—সে পূজারী।

* * * *

রাত্রি যেন আর কাটে না! মোক্ষদা অসীমের মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। গোপাল বাইরের দাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে।—সহসা ধড়্‌মড়্‌ ক'রে অসীম বিছানার ওপর উঠে বসে ব্যাকুল কণ্ঠে ডেকে উঠ্‌ল—শিউলি—শিউলি—

গোপাল বাইরে থেকে ছুটে ঘরে এসে অসীকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌ল। মোক্ষদা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বল্‌ল—সে বাবা বিশ্বনাথের পায়ে হত্যে দিতে গেচে আজ ভোরে। বাবা পুজো নিয়েচেন। শোও, তোমার খুব অসুখ হয়ে ছেল।

শ্রান্তভাবে শুয়ে পড়্‌তে পড়্‌তে অসীম বল্‌ল—শিউলি নেই!

* * * *

আরো একটা দিন কেটে গেল। কিন্তু অসীম ভাল আছে। ডাক্তার খুসী মনে ওষুধ বদ্‌লে দিলেন, বিশেষ যত্ন নেবার জন্য পরামর্শ দিলেন। ম্যানেজার সাহেব নিজে এসে একবার দেখে গেলেন। অসীম যখন তখন মোক্ষদাকে বলে—মা, সে ছেলেমানুষ, তাকে একা কেন পাঠালে, সে কখন আস্‌বে?

মোক্ষদা বলে—আর ভয় কি বাবা, মা আমার সতী লক্ষ্মী। সে এল বলে; অনেকখানি পথ—

রাত্রি আবার গভীর হয়ে উঠেছে। অসীম ঘুমিয়ে পড়েছে। তন্দ্রার ভারে মোক্ষদার চোখ দুটিও ঢুলে আস্‌ছে। এমন সময় দরজায় সাম্‌নে শিউলি এসে দাঁড়াল!

মুখ তার বিবর্ণ, মৃতের মত! চোখ তার ভাবহীন, শরীর যেন পাথর হয়ে গেছে!

আনন্দে মোক্ষদা চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—আয় মা আয়! ও ভাল আছে। আমি জান্‌তুম এ হবেই।—বাবা মুখ তুলে চাইবেনই—

অসীম ডেকে উঠ্‌ল—শিউলি—'

মোক্ষদা চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হাতের ছোট একটি পাত্র থেকে দেবতার চরণামৃত আর পূজার ফুল বার ক'রে অসীমের মাথায় চোখে বুকে শিউলি মাখিয়ে দিল।

তার প্রত্যেকটি কাজ এমন প্রাণহীন, যে দেখ্‌লে বিস্ময় লাগে!

তার হাত চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে অসীম ডাক্‌ল—শিউলি—

আবেগহীন কণ্ঠে শিউলি উত্তর দিল—আমি শিউলি নই, শিউলিকে দেবতা নে'চেন।

দেবতা?—

হাঁ। পরশু রাতে সে তাঁর দেখা পেয়েচে।—কাল রাতেও—

দেবতার দেখা পেয়েচিস্? তাই আমি বেঁচে উঠ্‌লুম বুঝি? অমন ক'রে দূরে সরে রইলি কেন? কাচে আয়! কেমন তাঁকে দেখ্‌তে?

দেওয়ালের গায়ে মহাদেবের একটা ছবি দেখিয়ে শিউলি বল্‌ল—ঠিক ঐ রকম। মুকুটা শুধু পূজুরীর মত। আমার শরীরের বদলে—'

দু'হাতে মুখ ঢেকে অসীম অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—বাগো—

* * * *

সেদিন ভোরে উষার আলো জগতের কাছে যে রহস্য উদ্‌ঘাটন কর্‌ল, তার খবর নিয়ে এল, নিধু জেলে।

অসীমের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে নিধু ডাক্‌ল—মিস্তিরি ও মিস্তিরি, একবার বাইরে আয়—'

অসীম সে ডাক শুনে বিছানায় উঠে বস্‌ল, কিন্তু পাশে শিউলিকে দেখ্‌তে পেল না! সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নিধু বল্‌ল—একবার আমার সাথে আয়—

মোক্ষদার ঘরের দিকে যেতে যেতে অসীম বল্‌ল—একটু দাঁড়া আমি—

নিধু তার হাত ধরে বল্‌ল—আগে তুই চ—দাঁড়াবার সময় নেই।

অসীম ভীত ভাবে বলে উঠ্‌ল—কেন ?

নিধু বল্‌ল—চ' না।

ঘাটের পথ ছেড়ে বাঁদিকে আঘাটায় কাদা ভেঙে নিধু, অসীমকে নিয়ে যেতে যেতে বল্‌ল—সাবধানে চলিস্, দেকিস্ পড়িস্ নি, এই ধর্ আমার হাত। ঐ সামনে দেক্‌তে পাচ্চিস ?—

অসীমের বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল। সে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এগিয়ে এসে দেখ্‌ল, অনাবৃত মলিন এক নারীদেহ, কাপড়ের আঁচলে দুটি হাত বাঁধা!—নীচু হয়ে তার মুখের দিকে তাকাতেই অসীম চিন্‌ল—শিউলি! . . .

ধীরে ধীরে সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। সামনের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল—সর্ব্ব-কলুষনাশিনী নদী, লজ্জায় ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে, দূরে, বহু দূরে সরে গেছে! আর মাটির কলঙ্ক গায়ে মেখে, মাটির ওপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে মাটির মেয়ে!

আকাশের দিকে জ্বলন্ত দুটি চোখ তুলে অসীম দাঁতে দাঁত চেপে গর্জ্জে উঠল—শয়তান—'

* * * *

কারখানার ম্যানেজার তাঁর কাম্‌রায় বসে কাজ করছিলেন, এমন সময় অসীম এসে তাঁকে সেলাম ক'রে দাঁড়াল।

সাহেব খুসী হয়ে বল্‌লেন—ভাল আছ মিস্ত্রী ?—

অসীম মাথা নেড়ে বল্‌ল—হাঁ হুজুর।

আর দিন কতক ছুটি নাও, শরীর সারলে—'

অধীর ভাবে অসীম বলে উঠ্‌ল—আমি বেশ সেরে উঠেচি সাহেব, আর ছুটি চাই না।

অসীম আবার কাজে লাগ্‌ল। তার নিত্য-কর্ত্তব্যের ওপর আর একটি কাজ সে বাড়িয়ে নিল।—ভোর বেলা কারিগরদের কাজে ডাক্‌বার জন্যে এঞ্জিন-ঘর থেকে বাঁশী বাজে, অসীম তার ভার নিল।

প্রত্যেক দিন শেষ রাত্রে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজটি সে করে। সে যখন শিকলটি টেনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তার চোখ মুখে যে জ্যোতি দেখা যেত, তা দিব্য নয়। অপার্থিব নয়। মাটির, ভয়-দুঃখ ভাবনা-উৎকণ্ঠায় উদ্ভাসিত।—এই বাঁশি বাজানোয় এক দিনের জন্যেও তার ক্লান্তি এল না। সময়েরও

নড় চড় হয় না, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটা বাজে, আর সে চেন্‌টি টেনে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ ধরণীর বুক ব্যাকুল এক চীৎকারে ভ'রে যায়! সে যেন স্নেহময়ী জননীর বুক ফাটা কান্না! প্রিয় সন্তানকে তার দেবতার গ্রাস থেকে আড়াল করে রাখ্‌বার জন্যে অবিশ্রান্ত ভাবে যেন ডাক্‌ছে—চলে আয়—চলে আয় —চলে আয়—'

সুখ-সুপ্ত মানুষ সে শব্দ শুনে কেঁপে জেগে উঠে দলে দলে ত্রস্ত পদে ঘর ছেড়ে চলে আসে। প্রিয়ার ব্যাকুল কণ্ঠালিঙ্গন প্রিয়পরিজনের স্নেহ-শুশ্রূষায় পরিপূর্ণ শান্তি কিছুতেই তাদের ধরে রাখ্‌তে পারে না! তাদের কাণে বাজে অসীমের বাঁশি —তার গানের সুরে কেবল বাজে—সব ফাঁকি—সব ফাঁকি! সুখ শান্তি তৃপ্তির রূপ নিয়ে লোলুপ দেবতা তার অনন্ত বুভুক্ষার হুতাশনে দিন রাত্রি তোদের বলি দিচ্ছে!—ঐ দেবতার গ্রাস থেকে আমি তোদের বাঁচাব—আমি তোদের জ্যেষ্ঠ— আমি তোদের ভালবাসি—আমার কাছে আয়—'

বিশ্বজয়ের গর্ব্ব আমার জয় করেছে ঐ পরাজয়,
ছিন্ন-আশা নেতিয়ে পড়ে, ওমা এসে দাও বরাভয়

"উপেক্ষিতা"

ব্যর্থ অশ্রু

—শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী।

"না, বড় অস্থির ক'রে তুলেছ তুমি!"

"কেন? কিসে এত অস্থির করেছি তোমাকে?"

বাড়ীতে এলেই ত তোমার মুখে যত রাজ্যের সংসারের কথা, যেখানে যে জঞ্জাল জুটেছে শুনতে হবে?" বলিয়া সুরেশ্বর বিরক্ত ভাবে করুণার মুখের দিকে চাহিল।

করুণা তাহার কণ্ঠস্বরকে অপেক্ষাকৃত নরম করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল "বলতে পার, তুমি শুনবে না ত শুনবে কে? সংসারের দায়ীত্ব কি একলা আমার, তোমার কি কোন কর্ত্তব্য নেই, কিছু না?"

"দায়িত্ব আমি অত বুঝি নে, তোমাদের খাওয়া-পরার জন্য যেটুকু দরকার, তা আমি করব না বলি নি, তার ওপর দিয়ে যে আবার এর অসুখ ওর বিসুখ এই সব নিত্য আজগুবি খবর, সে আমি শুনতে রাজী নই।" বিরক্তির সহিত কথা কয়টি শেষ করিয়া সুরেশ্বর নীরব হইল।

"বেশ"। সংক্ষেপে উত্তরটি দিয়া করুণা গৃহের বাহির হইয়া আসিল। পরে সে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে বলে "ওগো, ভাত দেওয়া ছাড়াও সংসারে আরো কর্ত্তব্য আছে" কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না।

বলিবে কাহাকে? প্রাণ যেখানে স্পন্দনহীন অবস্থায় বর্ত্তমান, ভাষার যেখানে মূল্য থাকে না, সেখানে, কোন কথা, কোন বেদনা জানাইতে যাওয়া যে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। না আর সে কোন কথাই তাহাকে জানাইবে না। এ যে অনর্থক,—বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রত্যেক দিনের এই তাচ্ছিল্য-ভরা রূঢ় কথা আর সে শুনিতে পারে না। নিঃশব্দভাবে সে নিজের কাজে হাত দিল।

সুরেশ্বর ইহার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটি ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিল,—করুণার কথার প্রত্যেক বর্ণগুলি তখন তাহার মনের ভিতর একটা গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার ভিতরটায় যেন একটা বড়

রকমের গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছিল। সে বাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলেই করুণা যেন শাসনের জন্য প্রস্তুত হইয়াই তাহার নিকটে উপস্থিত হয়, নিত্য একটা না একটা নূতন দাবী লইয়া ঠিক যেন বিপ্লব বাধাইবার মতলব স্থির করিয়া রাখে! সহসা সে একটু রূঢ়স্বরে অবার ডাকিল "করুণা!"

হাতের কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া করুণা আসিয়া উপস্থিত হইল। ভারী গলায় বলিল "কি বলছ?

"মতলবটা কি করেছ বল দেখি।"

"কিসের মতলব?" করুণা স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

সুরেশ্বর বিরক্তির সঙ্গে বলিল—"বলতে পার, আর কতদিন এমন ক'রে জ্বালাবে?"

করুণা উদাসভাবে উত্তর দিল "যতদিন দুজনকে একসঙ্গে সংসারে থাকতে হবে।"

২

প্রায় চোদ্দ বছর আগে, কবে যে একদিন কোন্ শুভ বৈশাখের মন্ত্র, পুরোহিত ও আত্মীয়গণের সহায়তায় সুরেশ্বর ও করুণার জীবনে এই দাম্পত্য গ্রন্থি পড়িয়াছিল—তাহা এখন স্বপ্নের স্মৃতি অপেক্ষাও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

এমন কি, সে রাত্রিটা জ্যোৎস্নার আলোয়ভরা অথবা অন্ধকারের কুহেলী মাখা অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, তাহাও অনেকক্ষণ ভাবিয়া তবে স্মরণ পথে আনিতে হয়।

কিন্তু এই গ্রন্থিটার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার যে দায়িত্ব, তাহার অনেকটা আসিয়া পড়িয়াছিল করুণার উপর! সুরেশ্বর সময় মত সংসারের দিকে দৃষ্টি দিলেও বেশীর ভাগ সময়টাকেই সে ফাঁকি দিয়া নিজে সংসারের গণ্ডগোল হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিত, এবং তাহার অন্যথা হইবার উপক্রম দেখিলেই সে যথেষ্ট পরিমাণে বিচলিত হইয়া পড়িত।

করুণারও যে তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল তাহা নয়,কিন্তু যে কাজটা সুরেশ্বর করিলে অধিকতর স্বচ্ছন্দে শেষ হইবার আশা সে করিত তাহা যে না জানাইলেই চলিত না। যতই হউক সে নারী,—এই নারীত্বই যে তাহাকে বাহিরের সামান্য ক্ষমতা হইতে খাটো করিয়া রাখিয়াছে।

নারীর কর্ত্তব্য সে নিঃশঙ্কে সম্পন্ন করিতে পারে, কিন্তু পুরুষের কর্ত্তব্য সে

করিবে কি করিয়া ? অথচ তাহাকে জানাইলে সুব্যবস্থা দূরে থাকুক, অশান্তিটাই বাড়িয়া উঠিত।

স্বামীর এই তাচ্ছিল্যে, করুণার অভিমানরুদ্ধ অন্তর, সন্তান-সন্ততির উপরেও যেন নিষ্ঠুর হইয়া পড়িত।

সেদিনও সে সুরেশ্বরের মুখে বিরক্তিভরা কথাগুলি শুনিয়া, রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া রান্নার ব্যবস্থা করিতেছিল, সেই সময়ে তাহার দশ বৎসর বয়স্কা কন্যা জয়ন্তী আসিয়া ডাকিল "মা!"

বিরক্তভাবে করুণা উত্তর করিল "তোমার আবার হুকুমটা কি শুনি।"

মলিন মুখে জয়ন্তী বলিল "আমার বড় জ্বর এসেছে মা।"

"জ্বর এসেছে শোও গে, আমি ডাক্তারও নই, বদ্যিও নই, দেবতাও নই যে তোমার জ্বর ছাড়িয়ে দেব,"

মায়ের এই অদ্ভুত উত্তরে ব্যথিতা বালিকা ম্লান মুখেই ফিরিয়া চলিল।

নিকটেই সুরেশ্বরের পিসিমা বসিয়া একখানা ডালায় কতকগুলি ডাল ফেলিয়া মাটী কাঁকর বাছিতে ছিলেন, তিনি করুনার এই বিরক্তিসূচক কণ্ঠস্বরে বালিকাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমার বাছা কথার শ্রী নেই—মেয়েটা তোমার কি করেছে বল ত ? জ্বর হয়েছে বলতে এল, তুমি তাকে দশ কথা শুনিয়ে দিলে! কেমন ধারা মা তাও জানিনে!"

বিধবা বড় যা প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিলেন—"ছোট বো'র পায়ে পায়ে রাগ!"

করুণা নীরবেই কাজ সারিতে লাগিল, কেবল তাহার বুকের ভিতর অভিমান-ভরা বেদনার আন্দোলন বাড়িয়া চলিল।

৩

"মা, বাবাকে চিঠি দেব ?"

"কেন ?"

"তোমার যে আজ ক'দিন জ্বর ছাড়্‌ল না!"

"তার জন্যে কি ? তুমি এখন মানুষ হয়েছ বিনু!"

"তবু তিনি কি ভাব্‌বেন মা!"

"ভাব্‌তেন যদি, তা হ'লে আমিও তোমাকে লিখ্‌তে বল্‌তাম"

বিনোদ একটু নীরব থাকিয়া বলিল "জয়ন্তীকে আমার চেষ্টা করব মা!"

"মোটেই না, সে স্বামীর সংসারে সুখে আছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট।" উত্তর দিয়া করুণা নীরব হইল।

অপরাহ্ণের শ্রান্ত বায়ু তখন ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছেল, বিদায়োন্মুখ তপনের শেষ কিরণ-কণাটুকু শ্যামল শ্রীমণ্ডিত তরুশির রঞ্জিত করিয়া হাসিতেছিল। অদূরস্থ বিপুল কলেবর অশ্বত্থ বৃক্ষের ঘন পল্লবে আত্ম গোপন করিয়া বসন্তের চির পরিচিত অতিথি যেন একটা অব্যক্ত বেদনার সঙ্গেই বলিয়া উঠিতেছিল—"চোখ গেল—চোখ গেল।"

বাতায়নপথে অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া বিনোদ ডাকিল—"মা।"

উদাসকণ্ঠে জননী উত্তর দিল "কি বিনু।"

"কাজ ভাল হবে কি?"—

"বেশ হবে। জান ত, খবর দিলেই বিরক্ত করা হয়।"

বিনোদ তাহার পিতাকে বিশেষ ভাবেই চিনিত, সেই জন্য জননীর এই অভিমানের মূল খুঁজিয়া লইতে তাহার বিশেষ বিলম্ব হইল না। সে স্তব্ধ গম্ভীর মুখে পীড়িতা জননীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ইহার পর দিন দুই অতীত হইলে সে দিন শেষ রাত্রিতে সহসা করুণা ডাকিল "বিনু।"

বিনোদ আরো কাছে আসিয়া মায়ের মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল "কেন মা?"

"আমি যাচ্ছি বিনু, তার জন্য তুই কাঁদিস নে,—করুণা সহসা থামিয়া গেল।

এ যে শেষ-বিদায়ের কণ্ঠস্বর তাহা বুঝিতে বিনোদের একটুও বিলম্ব হইল না। কিন্তু জননীর আদেশ মাথায় করিয়া সে স্থির গম্ভীর মুখেই বসিয়া রহিল। আজ তাহার সমস্ত আত্মা, নিজের সুখ দুঃখের অস্তিত্ব ভুলিয়া গেল। সে আকুল ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল, তাহার জননীর পরপারের শান্তি! তাহার অশ্রু-বিহীন অবিচল দৃষ্টি প্রভাতী-তারার মতই ফুটিয়া রহিল, মায়ের মুখের উপর।



—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস।

সহরেরই উপান্তে ঘন বৃক্ষশ্রেণী-বেষ্টিত চির অন্ধকারে ঘেরা বৃহৎ অট্টালিকা। দূরের পথিক সেই ঘনশ্যাম অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে যে শাদা শাদা দেয়ালের ছাপ্‌গুলি দেখিতে পায়, তাহা লইয়া মনে মনে ও জনে জনে অনেক কথাই আলোচনা করিয়াছে।

সেই অট্টালিকা, সেই কৌতূহলপুরীর পাশ দিয়াই সদর রাস্তা। কাল-বৃদ্ধ, ফাটল-ধরা মহীরুহের ঘন-পল্লবিত অন্ধকারের নিবিড়তার ভিতর ঐ অট্টালিকা যে কোন্‌ রাজার ধন আগুলিয়া রহিয়াছে তাহা অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।

সদর রাস্তা হইতে যে দীর্ঘ পথ, বাড়ীর সোপানতলে পৌছিয়াছে, তাহারই উপরে সুবিস্তৃত বৈটকখানা। গদি-আঁটা চেয়ার, কুর্শি; মখ্‌মলের তাকিয়া, রূপার বাতিদান, ফুলের গেলাস্‌, পুরু গালিচা, আয়না, ফানুসভরা এই ঘরটিকে মায়াপুরীর মত মনে হইত।

এই ঘরেরই পাশে ছোট আরেকটি ঘরে তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িয়া যুবক কি ভাবিতেছিল। সে ঘরে আস্‌বাব বিশেষ কিছুই নাই। শুধু একখানি বড় আয়না দেয়াল জুড়িয়া মেঝে পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে।

যুবক কি ভাবিতেছিল। ঘরের দরজায় একটি সাঙ্কেতিক শব্দ হইল।

যুবক উঠিয়া বসিয়া বলিল, কে? সুজন? এস।

সুজন দরজা খুলিতেই, বাহির হইতে শানাইয়ের করুণ আলাপ যুবকের কাণে পৌছিল।

যুবক সুজনকে জিজ্ঞাসা করিল, বিবাহের কত দূর?

সুজন একখানি ছোট চৌকি টানিয়া বসিয়া পড়িল।

তাঁহার ভাব-গতিক দেখিয়া যুবক আবার জিজ্ঞাসা করিল, বিবাহ মিটিয়া গেল?

সুজন একটি শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হাঁ মিটিয়া গিয়াছে।

বর যাত্রীরা খুশী?

হাঁ, তাহারা খুব খুশী। তাহারা বিদায় হইয়া গিয়াছে।

যুবক আবার শুইয়া পড়িল। একটু কি চিন্তা করিল। আবার উঠিয়া বসিয়া বলিল, মালতীকে কেমন মনে হইল?

খুব খুশী।

বর?

সেও খুব খুশী। তারপর যে সব দামী আস্‌বাব তৈজসপত্র দেওয়া হইয়াছে—

যুবক একবার কপালের উপর হাত বুলাইয়া লইয়া বলিল, কাল বর-কনে বিদায়ের পূর্ব্বে, মালতীকে নগদ কয়েক শত টাকা দিয়া দিও। বলিয়া দিও, বিশেষ কারণ না হইলে যেন খরচ না করে। আর সেখানে থাকা এর পর যদি একেবারে অসম্ভব মনে হয়, তাহা হইলে যেন ঐ টাকা খরচ করিয়া নিজের কিছু একটা ব্যবস্থা করিয়া লয়।

তাহার পর একটু থামিয়া সুজনের দিকে চাহিয়া বলিল, মালতীর বোধ হয় মনে আছে, কাল চলিয়া যাইবার পর এ বাড়ীতে আর আসা চলিবে না।

সুজন ধীর স্বরে বলিল, তাহা তাহাকে শেষেও একবার বলিয়াছি। কিন্তু—

তাহাকে থামিতে দেখিয়া যুবক বলিল, কিন্তু কি, বল? আবার কি চায় সে? আরও যদি কিছু চায়, তুমিই তাহার ব্যবস্থা করিও, আমার আদেশের অপেক্ষা করিও না। কোনও ইচ্ছা যেন তাহার অপূর্ণ না থাকে।

সুজন বলিল, তাহাই বলিতে ছিলাম, আপনি যদি আদেশ না করেন—

যুবক বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, সুজন, এখনও আমার আদেশ! তোমার হাতেই ত সব ছাড়িয়া দিয়াছি। পাপের ভাগ আমি কুড়াইতেছি, পুণ্যের দেনা তোমাকেই চুকাইতে দিয়াছি। তবে কেন বারে বারে আর আমাকে আদেশ করিতে আদেশ কর?

সুজন কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, কিন্তু এ যে আপনার আদেশ ভিন্ন হয় না। মালতী আপনার সঙ্গে একবার দেখা করিতে চান্।

যুবক অবাক হইয়া বলিল, আমার সঙ্গে?

তারপর বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, বুঝিতে পারি না, কি করিয়া তাহারা আমার কথা জানিতে পারে!

সুজন বলিল, আজ রাত্রেই দেখা করিতে চান্।

এমন সময় দ্বারে আবার ঘা পড়িল।

যুবক বলিল, এস।

বাহির হইতে কে বলিল, সঙ্গে লোক আছে।

যুবক বড় আয়নাটার দিকে চাহিয়া বলিল, সুজন, বাইরে একজন মেয়ে আসিয়াছে। তুমি যাও না, কি ব্যাপার শুনিয়া আসিবে।

সুজন উঠিয়া বাহিরে গেল। যুবক তাহার সম্মুখে ছোট টুলটির উপর স্ফটিকের কৌটায় যে একটি শুষ্ক গোলাপ ফুল পড়িয়াছিল, তাহারই দিকে চাহিয়া একবার মৃদু হাসিল। সেই একটুখানি হাসিতেই যেন ঘরটি বিদ্যুতের ঝলকের মত একবার জ্বলিয়া উঠিল!

ছোট কুঠরীর পাশের দ্বারে আবার টুক্ টুক্ করিয়া শব্দ হইল।

যুবক উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। একজন বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল।

যুবক সংবাদের প্রতীক্ষায় বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধ মিনতি করিয়া বলিল, চিত্রা একবার দেখা করিতে চান্।

যুবক প্রশ্ন করিল, চিত্রা? এত রাত্রে?

বৃদ্ধ যেন বড় আশা পাইল। সে ঐ টুকু সুযোগের মধ্যেই যেন সব কথা বলিয়া লইতে পারে, এই ভাবে বলিতে লাগিল, আমাকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বলিয়াছে। একবার যদি তোমার সঙ্গে তাহার দেখা করাইয়া দিতে পারি!

যুবক আয়নার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বাহিরের ঘরে কে কি করিতেছে তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল।

বৃদ্ধের কথা শেষ হইতেই মুখ ফিরাইয়া বলিল, আচ্ছা তাহাকে বলিও কাল দেখা হইতে পারে। দিনে, রাত্রে নয়। একটু থামিয়া গিয়া আবার বলিল, বলিয়া দিও, রাত্রে নয়, দিনে দেখা হইতে পারে।

যুবকের কথা শেষ হইতে না হইতেই নারী কণ্ঠে সেই দ্বার পথ হইতে কে বলিল, কিন্তু আমি যে আসিয়াছি।—আমি যে রাত্রেই কিছু বলিতে চাই।

চিত্রা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ স্তম্ভিত হইয়া বলিল, কি করিলি মা!

এই ব্যাপারের বিষয় বৈঠকখানা-ঘরের কেহ টেরও পাইল না।

চিত্রা বৈঠকখানার দরজা ঠেলিতে গেল। বৃদ্ধ তাহাকে জোর করিয়া ঠেকাইয়া রাখিল।

একটু পরেই শুনা গেল, সে ঘর হইতে একজন মেয়ে বলিতেছে, শুনিয়াছি, আপনি অনেক মেয়েকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের গতি করিয়া দিয়াছেন। আমি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি! আমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে না পাইলে আমি বাঁচিব না। বলিতে বলিতে যেন মেয়েটি কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার উত্তরে সুজন বলিল, এখানে একবার আসিলে আর ফিরিয়া যাওয়া চলিবে না। যাহাকে চাও তাহাকে আনিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু তাহাকেই চাও কি না তাহা কি মনে মনে স্থির জানিয়াছ?

নারীর আর্দ্র কণ্ঠ ভেদ করিয়া উত্তর আসিল, চাই চাই। তাহাকে পাইবার জন্যই সব কিছু ফেলিয়া আসিয়াছি।

মনে হইল সুজন যেন এবার একটু হাসিল। সে বলিল, সব কিছু যে ফেলিয়া আসিয়াছ তাহা তোমার মনে আছে দেখিতেছি। আচ্ছা, পরে আমাকে তাহার নাম ধাম বলিও, আমি তাহার সংবাদ লইয়া তোমারই ইচ্ছামত তাহার সঙ্গে বিবাহ দিব। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিও। বিবাহের পর আর এ বাড়ীতে আসিতে পারিবে না।

তাহার পর একটু খস্ খস্ পায়ের শব্দ হইল! কিছু পরেই সুজন যুবকের ঘরে প্রবেশ করিবার ইঙ্গিত করিল। কেহ উত্তর দিল না।

সুজন একটু অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া যাইবে, এমন সময় যুবক হাসিতে হাসিতে বৈঠকখানার দিকের দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেই ব্যাপার বুঝি?

সুজনও হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। যুবক ইসারা করিয়া সুজনকে বিদায় করিল।

সুজন অদৃশ্য হইলে যুবক বৈঠকখানা হইতে বৃদ্ধকে ডাকিয়া বলিল, চিত্রাকে পাঠাইয়া দাও।

অনুমতি পাইয়া চিত্রা তাহার সরল সুন্দর দেহখানি ভরিয়া একটা মমতার স্নিগ্ধতা মাখিয়া যুবকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

যুবক তখন একখানি বহু মূল্য আসনে বসিয়াছিল।

যুবকের ললাটে চিন্তার রেখা, দীর্ঘকালের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন নাই, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে যেন কোন্ রাজপুরীর বন্ধ দ্বারের মত প্রতীক্ষার স্তব্ধতা আঁকা রহিয়াছে!

যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল, কি চাও চিত্রা? কিছু ঠিক করিয়াছ কি?

চিত্রা একবার, দুইবার বলিতে চেষ্টা করিল, তাহার পর তাহার দুই চক্ষু জলভারে ছল্ ছল্ করিয়া উঠিতেই সে যেন ভাষা খুঁজিয়া পাইল। এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, চাই—সঙ্গ।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, কার? তখনও তাহার ঠোঁটের কোণে একটি তীব্র পরিহাস লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

চিত্রা গালিচার উপর বসিয়া বলিল, তোমার!

যুবক হঠাৎ জোরে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই চারিদিকে চাহিয়া হাসি থামাইয়া ফেলিল, বলিল, আমার সঙ্গ? কেন বল ত? আমাকে হত্যা করিতে চাও?

চিত্রা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, না, তোমাকে বাঁচাইতে চাই।—জানি, তোমাকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিবার সহস্র রকমের আয়োজন আছে, তোমার জীবনরক্ষা করিবার শতাধিক লোক নিযুক্ত আছে, কিন্তু তাহার ভিতরেও যে তোমার নীরব প্রাণের প্রতিক্ষণের মৃত্যুর দহন, তাহা হইতে বাঁচাইবার ভার আমি লইতে চাই।

যুবক বিকট হাসিয়া বলিল, জান আমি ডাকাতের সর্দ্দার! লুণ্ঠন আমার ব্যবসা, হত্যা আমার বিলাস, উপকার আমার মুখোস। আমার কাছে এ তোমার কি কথা?

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চিত্রা আর কথা বলিল না।

তাহারপর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া যুবক জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু চিত্রা, তুমি ত এতকাল এখানে আছ, এমন কথা ত কখনও বল নাই। আমি কে তাহা ত কয়েকজন অনুচর ভিন্ন এ পুরীর কেহ জানে না। জানে সুজন কর্ত্তা, উপকারী, দয়ালু, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। নির্য্যাতিতের রক্ষা তাহার কাজ, নিরুপায়ের উপায় করাতে তাহার আনন্দ। আমি ত তাহারই অনুগত, তাহারই আশ্রয়ে বাস করি।

কথাগুলি বলিতে বলিতে যুবকের মুখে চোখে যৌবনের নিরুদ্ধ সঙ্গীত, রৌদ্র-মেঘের গরিমার মত ভাতিয়া উঠিল।

চিত্রাও হাসিয়া উত্তর করিল, তুমি ডাকাত, তুমি দস্যু, তুমি দলপতি,

তুমি নিষ্ঠুর সব জানি। তোমার তপস্যাদীর্ণ মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া এতকাল তোমাকে জানিতেই চেষ্টা করিয়াছি। জানি, তরবারির মত তুমি নির্ম্মম। কিন্তু এও জানি, যে তরবারি একজনের হাতে পড়িয়া নিরপরাধীকে হত্যা করিতে কাঁপিয়া উঠে না, সেই তরবারি আরেক জনের হাতে পড়িলে আততায়ীর হাত হইতে অসহায়কে রক্ষা করে।

যুবক পাশের ছোট টেবিল হইতে সুরার পাত্র লইয়া গেলাসে ঢালিল।

চিত্রা যুবকের হাত ধরিয়া নিরস্ত করিল। কিছু না বলিয়া যুবকের মুখের উপর ঠোঁটটি রাখিয়া চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

কয় মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিয়া গেল। তাহার পরই যুবক দুই হাতে জোরে চিত্রাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

চিত্রা যেন জানিত, সে এরকম ব্যবহারই পাইবে। একটুকুও ক্ষুব্ধ না হইয়া মধুর কণ্ঠে বলিল, সত্য করিয়া বল, মদের চাইতেও এ কি খারাপ ?

যুবক হঠাৎ উঠিয়া ডাকিল, কে আছ ? মুহূর্ত্তে দুইজন লোক সে ঘরে প্রবেশ করিয়া আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

যুবক আবার কি ভাবিয়া বলিল, যাও।

যেমন নীরবে আসিয়াছিল তাহারা তেমনি নীরবে চলিয়া গেল।

চিত্রা উঠিয়া গিয়া যুবকের পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার মাথাটি নিজের বুকের উপর টানিয়া লইল। আদর করিয়া বলিল, এ তোমার কিসের প্রতিশোধ ? কাহার বিরুদ্ধে তোমার এ যুদ্ধ ঘোষণা ? আমাদের ?—পাগল তুমি ! নারী নিজেই জানে না সে কি চায়। যে নারী তাহা জানে, সে যা চায়, তা' সে চায় না , যা চায় না, তাহাই চায়।

যুবক রক্ষকণ্ঠে হাঁকিয়া বলিল, যাও, যাও চিত্রা। এসব অভিনয়ের অবসর আমার নাই।

চিত্রা ততখানি মিষ্ট করিয়াই বলিল, যাব, জানি, তুমি সারাদিনে রাত্রে এত অভিনয় কর, যে স্বাভাবিক জিনিসটাকেও অভিনয় ভাবিয়া তোমার মন তিক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু বল, আমাকে তোমার অভিনয়ের অন্তরালের সাথী করিয়া রাখিবে ?—আমিও অভিনয় করি। তোমার এ দৌলৎখানায় এই সব-পাওয়ার কল্প-পুরীতে মেয়েদের সঙ্গে আমিও কত মনের বাসনা কামনার কথা বলি। যে মেয়ে যা' চাহিয়াছে, তুমি তাহারই অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছ। আজও মালতীকে তাহার ইচ্ছা মত বিবাহ দেওয়াইয়াছ। জানি,

এ সকলের অন্তরালে তোমারই হাত। তোমারই একটা দারুণ কৌতুহলের আগ্রহ। কিন্তু, এত মেয়ের মনের কথা ত জানিতে পারিয়াছ, কিন্তু বলিতে পার, আজও কি নারীর বাসনার শেষ পাইয়াছ?

যুবক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। চিত্রা জোর করিয়া বলিল, বল, কি বুঝিয়াছ?

যুবক এবার হাসি থামাইয়া বলিল, তুমি কি চাও বল ত?

চিত্রা আকুল কণ্ঠে বলিল, তোমার একটু ভালবাসা একটু—একটু।

যুবক খুব ধীরে ধীরে বলিল, ভালবাসা?

চিত্রা তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিব, হাঁ, ভালবাসা—ভালবাসা একটু খানি। শুধু যতটুকু বাসিলে, আরও না বাসিয়া পারা যায় না, ততটুকু।

যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি যে ভালবাসিতে জানি না।

চিত্রা বলিল, জান না! কোন মেয়েকে ভালবাস নাই?

যুবক বলিল, যদি বলি 'না'।

চিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, ভালবাস নাই? তবে কি করিয়াছ?

যুবক উত্তর করিল, দয়া।

চিত্রা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, মানুষ মানুষকে দয়া?—আশ্চর্য্য!

যুবক তেমনি স্থির ভাবে বলিল, না, যাহারা আমাদের মানুষ ভাবে না, তাহাদেরই আমরা দয়া করি। তাই তাহাদের দেওয়া আঘাতকে তুচ্ছ করিতে পারি, তাহাদের অভিসন্ধিপূর্ণ ব্যবহারগুলিকে মহত্ত্বের জোড়াবুক পাতিয়া সহ্য করিতে পারি। তাহাদের সব রকমের অক্ষমতাকে বুঝিতে পারিয়া মার্জ্জনা করিতে পারি। তাহারা যে কত অসহায় তাহা বুঝিলেই নির্দ্দয় হওয়া অসম্ভব!

ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত চিত্রা দুলিয়া উঠিল। যুবকের সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি বলিতে চাও, সব নারীই এই রকম?

যুবক হাত নাড়িয়া বলিল, না, যাহারা নয়, তাহাদের কথা ত বলি নাই।

চিত্রা ব্যথিত স্বরে আপন মনে বলিতে লাগিল, তবে তবে, আমি একদিন তোমাকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছি কেন? কেন অন্তরের মত তোমার কাছে এত কালেও কিছু চাহিতে পারি নাই?

যুবক বলিল, জয়ের আশায়। যাহার কথা শুনিয়াছ, অথচ যাহাকে এত কালেও ধরিতে পার নাই, তাহাকেই জয় করিবার আশায় এতকাল আমার সন্ধানে ফিরিয়াছ। কিন্তু চিত্রা বড় দেরী করিয়াছ। ঐ দেখ স্ফটিকের আধারে

কি ? ঐ খানে আমার বিশ্বাস, আশা, ফুলের পাঁপড়িগুলির মতই শুকাইয়া পড়িয়া আছে—তাই ঐ কৌটাটা সঙ্গে সঙ্গে রাখি—উহার দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে মনকে চমক লাগাই। পার ঐ ফুলটাকে তাজা করিতে ?

চিত্রা বলিল, পারি। আর একবার তুমি বিশ্বাস কর।

যুবক হাসিয়া বলিল, বিশ্বাস ? বিশ্বাস করিতে করিতে যে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবে! চিত্রা, যতক্ষণ তুমি নারী, আমি পুরুষ, ততক্ষণ কেবলই হারজিতের মকর্দ্দমা।

নারী নারীই থাকে, পুরুষ পুরুষই থাকে। কেহ নিজেকে ভুলিতে পারে না। কিন্তু যেখানে দুইটি মানুষ দুইটি মানুষকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিতে চেষ্টা করিয়াছে সেখানে মানুষ অমর হইয়াছে। বেদনার অধৈর্য্য মানুষকে হিসাবের খাতা লইয়া বসিতে দেয় নাই।

চিত্রা এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার নিজের শক্তি ফিরিয়া পাইল। সে প্রস্তুত হইয়া যুবককে প্রশ্ন করিল, বল, তাহা হইলে নারী কি চায়।

যুবক বলিয়া উঠিল, নারী ঐশ্বর্য্য চায়।

চিত্রা হাসিয়া বলিল, মিথ্যা।

যুবক বলিল, মিথ্যা ? নারী রূপ চায়।

চিত্রা তেমনি হাসিয়া বলিল, ভুল বুঝিয়াছ, মিথ্যা।

যুবক আপনাকে আর বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, তবে ? নারী চায় সুখের সংসার, মাতৃত্ব।

চিত্রা ক্রূর হাসিয়া বলিল, আরও মিথ্যা।

যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। তীব্র স্বরে বলিল, নারী—নারী—নারী চায় পুরুষ।

চিত্রা উত্তর করিল, কিছু সত্য, তবুও বুঝ নাই।

যুবক চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে তখন পাগলের মত বলিতে লাগিল, নারী চায় প্রেম, অধিকার, ভালবাসা, সেবা মমতা, বিশ্বাস, সাহস, ক্ষমা, স্বর্গ, নরক—

চিত্রা যুবককে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া শোয়াইয়া দিল, ধীরে ধীরে তাহার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল, নারী চায়, অপমান, আঘাত। পলে পলে সে নিজেকে অপমান করিয়াও বৎসরের পর বৎসর বাঁচিয়া থাকে। সে ভালবাসিতে পারে, কিন্তু ভালবাসাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহে না। আমিও নারী, তোমার হাতের অপমান আমাকে ধন্য করিল। নিজেকে ভুলিয়া তোমাকে চাহিতে পারিলাম। আজ আমার সব অপমান তোমার ক্ষমতার বাহিরে।

যুবক ভগ্নস্বরে বলিল, কিন্তু আমার এত দিনের এই বিপুল আয়োজন, এত অর্থ-ব্যয়, এত প্রতীক্ষা, এত অভিনয়—

চিত্রা তাহার কপালে হাত রাখিয়া বলিল, সব সার্থক। নারীকে তুমি দুই হাতে বিলাইয়াছ, তাহারা আকাঙ্খা পুরাইয়া লইয়া গিয়াছে। আজ নারীকে হারাইয়া সঙ্গিনী পাইলে—যে তাহার নিজেকে তোমার মধ্যে মিলাইয়া দিয়া তোমাকে জিতিয়া লইল।

সুজন আসিয়া দ্বারে আঘাত করিল। চিত্রা বলিল, আমি যাই?

যুবক বাধা দিয়া বলিল, না। তারপর সুজনকে আসিতে অনুমতি করিল।

সুজনের সঙ্গে আসিল, মাল্য-চন্দন-সজ্জা বিভূষিতা মালতী!

যুবককে দেখিয়াই অতর্কিতে মালতী বলিয়া ফেলিল, তুমি?—

যুবক করুণ হাস্যে বলিল, হাঁ মালতী, আমিই। যাহাকে তিরস্কার করিয়া ছিলে তাহারই হাতে পুরস্কার লইতে হইল, তাই না?

মালতীর গলা ধরিয়া গেল। তবুও অনেক চেষ্টা করিয়া বলিল, আমি তখন বুঝিতে পারি নাই, আমাকে শাস্তি দাও।

যুবক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, বুঝিতে পার নাই, এখনও যে বুঝিতে পারিলে তাহা নহে। যাহারা বুঝিবার ভাণ করে, তাহারা কখনই বুঝিতে পারে না। যাহারা বুঝিতে অপেক্ষা করে, তাহারা একদিন হয়ত বুঝিতে পারে।

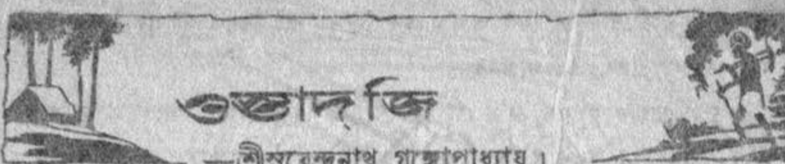
তাহার পর যুবক আবার আসনে বসিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে বলিল, যে শাস্তি আমি আজীবন ভোগ করিয়াছি, তাহার বাড়া যদি কিছু শাস্তি থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে দিতাম। আমার হাতে আর শাস্তি নাই। আমি নিজে সব ভোগ করিয়া ফেলিয়াছি!

ঠিক সেই সময় বৃদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, পুরীর দ্বার খোলা পাইয়া—

বৃদ্ধকে বাধা দিয়া যুবক জিজ্ঞাসা করিল, সকলে চলিয়া গিয়াছে, এই ত?

বৃদ্ধ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, কেহ নাই!

যুবক আদেশ করিল, ফটক বন্ধ কর। কাল হইতে নূতন ব্যবস্থা হইবে।



ওস্তাদ্‌জি

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১

দেবীসিং বিবাহ করে নি।

বোধকরি তার ফুরসৎ ঘটে ওঠে নি। সুরে-সুরে, সুর-পঞ্চমে, পঞ্চমের সঙ্গে ঋখবের মিলের কোন্‌টা যে সব চেয়ে সরেস—তাই যে আজীবন ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লে না—তার কি অন্য মিলের কথা চিন্তা করা সাজে, না সম্ভব?

বিবাহ? দেবীসিং আঁত্‌কে উঠ্‌তো,—বাপ্‌রে! সে-যে একটা মহামারি ব্যাপার!

যারা এক ট্যাঁকে কামিনী আর অন্য ট্যাঁকে কাঞ্চনকে গুঁজে নিয়ে সংসার-সমুদ্রে রীতিমত পাড়ি জমিয়ে তুলে ছিল, তারা দেবীসিংকে বল্‌তো—পাগল!

যারা কাঞ্চনের গদীতে ব'সে কামিনীর আরাধনায় ছিল, তারা চুপি-চুপি এসে বল্‌তো, ওস্তাদ্‌জি, রাস্তা ত বাৎলাও!

দেবীসিং সেতারের তিন্‌টে তার দেখিয়ে বল্‌তো, ঐ, ওরা জানে। তর্জ্জনীটা উঁচু ক'রে ধরে বল্‌তো, আর এ জানে। নিজের বুকের ওপর বাঁ-হাত খানা চেপে ধ'রে বল্‌তো, আর, এ কে? আমিই জানিনে! কি বাৎলাবো বাচ্ছা?

লোকে তার কথা শুনে হাস্‌তো।

২

মুস্তরি বাঈ এর চার তালার সিঁড়ির পাশের ছোট ঘরের দেয়ালে, বনাৎ মোড়া সেতারটি ঝুলিয়ে রেখে দেবীসিং সেদিন সন্ধ্যার সময় ছেঁড়া দড়ির খাটের ওপর শুয়ে প'ড়ে, আকাশের মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গে নিজের গলা-মেলাবার চেষ্টা কর্‌ছিল; গম্ভীর—গম্ভীর!

ভাদ্র শেষ হয়ে এসেছে; আকাশে লঘু মেঘের খেলার মধ্যে গুরু-গর্জ্জন! কুম্ভ শূণ্য ক'রে মহাকাল মৃদঙ্গ নিনাদ কর্‌ছেন!

দেবীসিং উঠে ব'সে একাগ্র-আবেগে, বুক খালি ক'রে, সুর খাদে নামিয়ে নিতে চাইছিল!

এখনো হয়নি! আরো রিক্ত, আরো শূন্য ক'রে দিতে হবে!

বুকের ওপর ফোঁটা-দুই চোখের জল গড়িয়ে পড়ল!

৩

ওস্তাদ্‌জি!

মুক্তরির গলা যেন সপ্ত-স্বরা বীণা!

বিশ্বলোকের অশ্রুর আর্দ্রতা মেশানো স্নিগ্ধ-গম্ভীর গলায় দেবীসিং ফিরে বললে, কি চাস্?—মুক্তরি, বেটি!

কি জবাব দেব ওদের?

কাজ নেই মুক্তরি—যেতে ব'লে দাও—

মুক্তরির হাতে একটা ভাঙা যুঁই এর গোড়ে জড়ান ছিল। সজল বাতাসের সঙ্গে তার গন্ধটা দেবীসিং এর ওপর যেন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল।

উঠে প'ড়ে, মুক্তরির হাত থেকে প্রায় ছিঁড়ে খুলে নিয়ে, মালাটা সে নিজের মাথায় জড়িয়ে দিয়ে বললে—এবারের বাদলাটা—একেবারে ফাঁকি দিয়ে ছিল আর কি!—বেইমান্!

মুক্তরির পাৎলা ঠোঁটের ওপর ক্ষীণ হাসি প্রকাশ পাবার আগেই লীন হয়ে গেল।

নীচে যাবার উপক্রম করতে দেবীসিং এগিয়ে এসে, হাত দু-খানা ধরে ফেলে বললে, রাগ করিস্ নি মুক্তরি।

রাগ না, অনেকগুলো টাকা—তাই ভাব্‌ছি!

কপাল কুঁচ্‌কে দেবীসিং বললে,—যেতে দে, যেতে দে মুক্তরি; তুই নষ্ট হয়ে যাবি শেষকালে—

নিমেষে মুক্তরির মুখটা ভার হয়ে গেল। টাকা নইলেই বা চলে কেমন ক'রে?

দুই কাণে হাত দিয়ে দেবীসিং বিষম বেজার হয়ে বললে, উঃ—আর পারি নে শুনতে; আজীবন শুনছি—টাকা, টাকা—টাকা!—জাহান্নমে যাক্ তুচ্ছ টাকা!

৪

ভাঙা মেঘের ফেণার মধ্যে চাঁদ তখন একটানা সাঁতারে পশ্চিমের কূলে ভেসে চলেছে।

দেবীসিংএর মাথায় তখনো যুঁইএর গোড়েটা তেম্‌নি জড়ানো। সে রঙ্গেদা

ওপর ক্ষুধার্ত সিংহের মত রেলিংএর একদিক থেকে আর একদিক পর্য্যন্ত হান্‌-টান্‌ ক'রে ফিরছে!

নীচে একখানা মোটর এসে লাগ্‌তেই দেবীসিং তাড়াতাড়ি নিজের খাটের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়্‌লো; শিশু যেমন ক'রে মার ভয়ে পালায়!

সিঁড়ির ওপর একটি-একটি ক'রে পায়ের শব্দ; তার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ধক্‌ ধক্‌ ক'রে উঠ্‌ছে;—অসম্ভব উদ্বেগে কেটেই বা যায়!

মুস্তরি এসে শয্যার কাছে দাঁড়িয়ে স্থির কণ্ঠে বল্‌লে, ওস্তাদজি—তুমি এখনো জেগে?

লজ্জার অবধি রইল না! দেবীসিং ধড়-মড় ক'রে উঠে ব'সে বল্‌লে, তাইতো মুস্তরি—কি জানি কেন, আমি চোখ বুজ্‌তে পারি নি,—কেন বল ত?

জানি!

কি আশ্চর্য্য মানুষ তুমি! তাও জান?—

মুস্তরি হাস্‌লে।

কুলুঙ্গি থেকে বাদামের তেলের শিশিটা পেড়ে নিয়ে একমনে ওস্তাদজির টাকের ওপর মালিশ ক'রে দিয়ে—পাখার বাতাস দিতে দিতে বল্‌লে—এবার ঘুমোও।

মুস্তরি, তুমি ঘুমোবে না?

সে হবে এখন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে কেটে গেল।

মুস্তরি,—দেবীসিং ধীরে ডাক্‌লে।

কেন, ওস্তাদ্‌জি?

কি ক'রে এলি?

কি আবার—জবাব দিয়ে এলুম।

সাফ্‌ জবাব?

হাঁ, তাই।

ওস্তাদজির নাক ডেকে উঠ্‌ল! পা টিপে-টিপে মুস্তরি ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

রাত প্রায় তখন শেষ হ'য়ে গেছে।

৫

এই বুড্‌ঢা, কেয়া মাংতা?

দেবীসিং নবাব সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

দ্বারে জোড়া প্রহরী।

তাদের সম্ভাষণে তার দিব্য-জ্ঞান হলো ; এ জুড়ি, নাগরিক সুর বলে না—বেজায় বে-খাপ্পা !

বহু ধস্তা-ধস্তির পর তারা স্বীকার হলো—যদি সত্যি ক'রে সে সেতার বাজাতে জানে, তা হ'লে হুজুরের সঙ্গে মোলাকাৎ হ'তেও পারে।

তার পর, অগ্নি-পরীক্ষা !

ধুলো ঝেড়ে, তার জুড়ে সিপাইজির জীর্ণ সেতারখানি ওস্তাদজির হাতে, শ্রীরামচন্দ্রের পাদ-স্পর্শে অহল্যার মত নব-জীবন লাভ ক'রে, মূর্চ্ছনা-ঝঙ্কারে মুগ্ধ ক'রে দিলে।

চকিতে বিছানার ওপর উঠে ব'সে নবাব-সাহেব হাঁক দিলে—জল্‌দি বোলাও

ওস্তাদজি অভিবাদন ক'রে দাঁড়াতেই প্রশ্ন হ'ল, কে আপনি ?

দেবীসিং হুজুরের তাঁবেদার।

দেবীসিং ! দেবীসিং ! এ নাম কোথায় শুনেছি যে ! আচ্ছা সে পরে হবে . . . ঐ সেতার খানা তুলে নিয়ে . . . একটা রামকেলী ওস্তাদজি, ফরমাইয়ে . . . আপনার মেহেরবানি বান্দার গোস্তাকি মাফ্ করবেন।

৬

মুক্তরি ! ও মুক্তরি—মুক্তরি ; আঃ কোথায় যে যায় থেকে-থেকে !

দেবীসিং ব্যগ্রভাবে সেতার নামিয়ে নিয়ে সুর মেলাতে বসে গেল।

মুখে হারা-নিধি ফিরে পাওয়ার সদ্য-প্রসন্নতা !

ওস্তাদজি, আমায় ডাকছিলে ?

সুরের তন্ময়তায় তখন ওস্তাদজির চোখদুটি বিকচ-কমলের মত বিস্তারিত।

হঠাৎ সেতারখানা রেখে দিয়ে, আনন্দ-চাঞ্চল্যে দেবীসিং বললে, শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নে মুক্তরি, ও দিকে সব ঠিক ঠাক্।

কি ঠিক ক'রে এসেছ ওস্তাদজি—কোথায় ঠিক ?

নবাব সাহেবের ওখানে—আজ রাতেই।

নিমেষে মুক্তরির মুখ নীল হয়ে গেল।—সর্ব্বনাশ !

দেবীসিং তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল ! তার হাতখানা টেনে খাটের ওপর বসিয়ে বললে,—তবে কাজ নেই মুক্তরি।

তার গলাটা যেন কে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে ছিল। ডাগর দুটো চোখ বুজে ফেলে অতি কষ্টে সে বল্লে, না-কেন, ওস্তাদজি ?

নিশ্চয় তোর অসুখ করেছে—আয় ত দেখি—

নিজের নিটোল গালের ওপর মুস্তরির কপালটা চেপে ধ'রে বল্লে, একি ! এযে একদম পাথর ; কি হয়েছে তোর ?

কিছু না।

এতটাকা ! কিসের ওস্তাদজি ?

এক মুঠো বার ক'রে মেজের ওপর ফেলে দিয়ে দেবীসিং বল্লে—আমি কি চাইতে গিয়েছি ? দিলে, কি করি ?

৭

একি হচ্ছে মুস্তরি, আজ !

কেন ?

একটা গানও যে জমে না !

তাতে কার কি-যায়-আসে ? গান শুনতে কে আসবে এখানে ?

তবে ?

মুস্তরি মাথা হেঁট ক'রে রইল।

হঠাৎ দেবীসিং উত্তেজিত হয়ে উঠ্লো। মুস্তরি, সত্যি কথা বল্,—তোকে অপমান করেছে ?

এক ফোঁটা স্বচ্ছ অশ্রুর মধ্যে নর্ত্তকীর আজীবন গীত-গরিমা নিমেষে তলিয়ে গেল !

কোল থেকে সারঙ্গি নামিয়ে দিয়ে, কঠোর কণ্ঠে দেবীসিং বল্লে, টাকা এখখুনি ফেরৎ দিয়ে আসছি—আমি।

ফিরে তারা নেবে না, ওস্তাদজি।

তুই কেমন ক'রে জানলি ?

খুব জানি।

তবে কি উপায় হবে ?

এখন ত যেতেই হবে।

তুই যাবি ?

যাবো, ওস্তাদজির হুকুম যে, যেতেই হবে।

জাহান্নমে যাক্‌ সে শুয়োর! তুই যেতে পাবি নে. . . . খোদার কসম! দেবীসিং খবর দার।

৮

ক্ষিপ্র পদে মুস্তরি ওপরে উঠে এসে খাটো গলায় ডাক্‌লে—ওস্তাদজি চল! ওস্তাদজি গভীর নিদ্রা-মগ্ন। মুস্তরি গা ঠেলে ডাক্‌লে—তাতেও ঘুম ভাঙ্গে না।

ওমা, একি! হাত পা যে সব ঠাণ্ডা, হিম!

ওস্তাদজি! ওস্তাদজি!

আর ওস্তাদজি।

* * * *

ডাক্তারদের বহু চেষ্টায় শেষ রাত্রে ওস্তাদজি চোখ চেয়ে বল্‌লে,—দেবীসিং খবরদার!—

আফিণের নেশায় ঘোর কাট্‌তে দিন দুই কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল।

৯

পেয়ালা নিঃশেষ ক'রে নবাব সাহেব বল্‌লে,—আচ্ছা, পাঁচ হাজার? তাই দেওয়া যাবে; কিন্তু আমার মুস্তরিকে চাই।

একজন মোসাহেব আর একজনের গা টিপে বল্‌লে, তার ওস্তাদজিকে বাঁচানর জন্যেইত মুস্তরি ডাক্তারকে বকশিস্‌ দিয়েছে—পাঁচ হাজার। পাঁচ হাজারে মুস্তরিকে পাওয়া যাবে না—তার বাঁদিকে যদি পাওয়া যায়।

কথাগুলো নবাব সাহেবের কাণে যাবার জন্যই বলা হয়েছিল; যেতেও কসুর হয় নি।

একটু হেসে, নবাব সাহেব বল্‌লে, তা আমি জানি, যে মুস্তরিকে টাকা দিয়ে খরিদ করা যায় না; তাই যদি হ'তো ত সেদিন হাজার আস্‌রফির তোড়ায় অমন ক'রে লাথি মেরে চলে যেত না।

মোসাহেবের দল চক্ষু বিস্ফারিত করে বল্‌লে, বাপ রে—হা-জা-র আস্‌রফি!

একজন বল্‌লে,—সে কি একটা যে সে মানুষ! সেদিন আনন্দগড়ের রাজা, এক রাতে চল্লিশ হাজার——

ধমক দিয়ে আর একজন বল্‌লে,—চোপ্‌ রাও বেতমিজ্‌. জানিস্‌? আমাদের নবাব, দশ-বিশ লাখ্‌ দরিয়ায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন?

নবাব সাহেব নেশার আনন্দে, খোস-মেজাজে—অবিরত ধূমোচ্ছাসে ঘরটার হাওয়া নিবিড় ক'রে তুল্‌লে।

১০

ওস্তাদজির ছিন্ন খাটে মুস্তরি বসে ছিল। তার মুখ শীর্ণ মলিন। কেক্না গালের ওপর চোখের জলের ময়লা দাগ!

তিন দিন তিন রাত ওস্তাদজিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

দাসী এসে বল্লে, একজন বিদেশী লোক দেখা করতে চায়।

কি বলে সে?

মুলাকাৎ,—ভারি জরুরি কথা আছে।

ডেকে আন—এখানেই।

বিদেশী, মাটির ওপর ঝুঁকে সেলাম ক'রে দাঁড়াল।

কি চাও?

তার কথা শুনে, মুস্তরির উত্তেজনার শেষ রইল না।—

দেবীসিং। ওস্তাদজি!

কোথায়?—কোথায় তিনি?

নবাব সাহেবের বাড়ীতে।

আটক্ রাখা হয়েছে?

বায়নার টাকার জন্য।

অন্যমনস্ক হয়ে মুস্তরি—যেন আবার ভাবনায় ডুবে গেল। হঠাৎ সচেতন হয়ে বল্লে, আচ্ছা যেতে পার তুমি।—এই নাও।

লোকটার আক্কেল দাঁত পর্য্যন্ত বুঝি বা বার হয়ে পড়ে!

১১

মুস্তরির রূপ ছিল, যৌবন ছিল, খ্যাতি ছিল—কি ছিল না?

আজ সে তার যথা-সর্ব্বস্ব যা কিছু সব, ডালায় সাজিয়ে নিয়ে—মদোদ্ধত মাৎসর্য্যের পায়ের তলায় লুটিয়ে দেবে।

ওস্তাদজি বন্দী!

মনে করতেই যে অশ্রু সাগর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে!

ডুবন্ত সূর্য্যের আলোয় শরতের নীল আকাশে হাল্কা মেঘ ঝল মল্ করছিল। তার আলো, কালোয় পড়ে কালোকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

রাজ পথের ওপর লোকের চোখ-ধাঁধিয়ে কে যায় ওই অনিন্দ্য সুন্দরী! বক্ষোমাঝে পুরুষের যৌবন-চঞ্চল—নাচে রক্ত-ধারা!

১২

আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার বিপদও অনেক !

নবাব সাহেবের সিরাজির গোলাপি নেশা, এক ঝলকে রক্ত-জবার মত টক্‌টকে লাল্‌ হ'য়ে উঠ্‌লো।

প্রকাণ্ড সিংহ-মুখো সোফাটার ওপর মুস্তরি গিয়ে ব'সে অলৌকিক গাম্ভীর্য্য ভরে বল্‌লে ; নবাব সাহেব, ওস্তাদ্‌জির ঋণ শোধ করতে এসেছি ; যত টাকা লাগে, যা-কিছু তুমি চাও, সব দিতে মুস্তরি প্রস্তুত, বল, কি তোমার হুকুম।

ওস্তাদ্‌জি ! অবাক্‌ কাণ্ড ! কে ওস্তাদজি !

দেবীসিং, আমার ওস্তাদজি, নবাব সাহেব। যাঁকে তুমি তুচ্ছ ক'টা বায়নার টাকার জন্য আট্‌কে রেখেছ।

তোবা, তোবা, ইয়ে বিল্‌কুল্‌ ঝুট্‌ !

ঝুট্‌ ! নবাব সাহেব, জহান্নম্‌ কি নেই ?

বিবিজান্‌ !—

এক লাফে মুস্তরি কামোন্মদের কলুষ-হস্তের বেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে বাইরে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু লালসা তখনো প্রতি-নিবৃত্ত হয়নি।

মুস্তরি চীৎকার ক'রে বল্‌লে, নবাব সাহেব, খবরদার,

জলদ গম্ভীর কণ্ঠে পিছন থেকে দেবীসিং ডাক্‌লে, কি হয়েছে মুস্তরি ?

মুস্তরি ফিরে ওস্তাদজিকে দেখে, দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আর থাক্‌তে পারলে না। দু'হাত মেলে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ততার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ল !

কত আর সইবে সেতারের তার ?

তাই ছিঁড়ে গেল তার !

মুস্তরিকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে দেবীসিং সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেল।

সতীর দেহলতা অমনি করেই কি মহাকালের বুকে দোলে নি একদিন ?

এমনিতরই অধীর চঞ্চল উদ্বেগ-ব্যাকুলতায় তাঁর পায়ে পায়ে তাণ্ডবের রুদ্র তাল বেজে ওঠে নি কি ?

শশী পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

চিন্তার অন্ত নাই। ছেলেটা যে কি-কুক্ষণে ওদের ছাদে চড়িয়া ঘুড়ি উড়াইতে গেল; পড়িয়া গিয়া মাথা ফাটাইল—কত কষ্টে বর্দ্ধমানের হাঁসপাতালে দিয়া আসিলাম, আজ আবার খবর আসিয়াছে, অবস্থা তার ভাল নয়! ছুটি নাই, টাকাও নাই যে তাহাকে একটিবার দেখিয়া আসি। বাড়ীতে স্ত্রীর অসুখ—আজ মরে কি কাল মরে! বাবা রে বাবা! এমন করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না।

মাইনর স্কুলের থার্ড পণ্ডিত—পঁচিশ টাকা সহি করিয়া মাসের শেষে কুড়িটি টাকা পায়; কি এমন সঙ্গতি আছে তার, যে, হেড মাষ্টারের কথাটা অমান্য করিয়া ছুটি না লইয়াই ছেলেটাকে একটিবার দেখিয়া আসিবে! তিন-চারটা টাকা না হয় সে কারও কাছে ধার-ধোর্ করিয়া লইতে পারে।—কিন্তু আবার ঋণ?

সুমুখের একটা বেঞ্চ হইতে একটা ছেলে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, সার্!

আঃ! তোরা দেখ্ ছি আমায় মার্‌বার ষড়যন্ত্র করেছিস্ সবাই মিলে! কি হলো কি,—চেঁচিয়ে উঠ্‌লি যে?

ছেলেটা বলিল, সার্, এই হেবো সার্ আমার আঁক্‌টা দেখে দেখে শেলেটে টুকে নিচ্ছে সার্—

শশীশেখর বলিল, এই হেবো সরে, বোস্।

হেবো সরিয়া বসিল।

শশীশেখর ভাবিল, একবার যাইবে নাকি! হেড্‌মাষ্টারকে আর-একবার বলিয়া শেষ চেষ্টা দেখিলে হয়।—তারও ত ছেলে-মেয়ে আছে!

সার্—

আবার সার্!

চেয়ারের উপর চোখ বুজিয়া শশী পণ্ডিত ভাবিতেছিল। চোখ খুলিয়া দেখিল, একটা ছেলে শ্লেটে অঙ্ক কসিয়া তাহাকে দেখাইতে আনিয়াছে। মনোযোগ সহকারে অঙ্কটা দেখিয়া দিয়া বলিল, যা, হয়েছে। চুপ ক'রে বোস্।

শশীশেখর উঠিতে যাইতেছিল, এমন সময় ছুটির ঘণ্টা বাজিল। হেড্-মাষ্টারের কাছে আরও কয়েকজন শিক্ষক বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। শশী-শেখরকে দেখিবামাত্র একজন বলিয়া উঠিলেন, আসুন পণ্ডিত মশাই, আসুন! আপনি দিন্-দিন্ কুঁজো হয়ে যাচ্ছেন যে?—

এম্‌নি বোঝা তোমার কাঁধে এসে পড়্‌লে মাটির সঙ্গে তুমি মিশিয়ে যেতে, আমি তবু কুঁজো হয়েও দাঁড়িয়ে আছি—' শশীশেখরের ইচ্ছা করিল, এই কথাটি সে তাহাকে শুনাইয়া দেয়, কিন্তু বলিতে সে কিছুই পারিল না। ব্যগ্র কাতর দুটি চক্ষু দিয়া অদূরে কর্ম্মরত হেড্ মাষ্টারের আনত মুখখানাই সে শুধু বারে বারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল,—নিদাঘের তপ্ত শুষ্ক ধরিত্রী, যেমন করিয়া উর্দ্ধে সঞ্চরমান মেঘ-পুঞ্জের কাছে একটি বর্ষণের আবেদন লইয়া বারে বারে তাকায়?

কিন্তু হেড্ মাষ্টার একবার মুখ তুলিয়াও চাহিলেন না।

শশীশেখরের চোখে চশমা ছিল, কিন্তু সচরাচর লোকে যে চশমা ব্যবহার করে, ইহা ঠিক তা নয়। দুইটা চশমার কাঁচের আষ্টে-পৃষ্ঠে দড়ির বন্ধন দিয়া কোন-রকমে সে দুটা চোখের সুমুখে ধরিয়া রাখা হইয়াছে। এই চশমাটিকে দেখাইয়া দিয়া রহস্তের ছলে একজন শিক্ষক বলিলেন, আপনার এই চশমার দড়িটা এইবার হয় পাল্‌টান্, নয় পরিষ্কার ক'রে ফেলুন।—ও যে ভয়ানক ময়লা হয়েছে পণ্ডিত-মশাই!

অসহ্য! স্বার্থপর এই লোকগুলার রঙ্গ-রহস্তের আর অবসর মিলিল না। তাহারই সর্ব্বনাশ! দারিদ্র্যের উপর এই টিট্‌কারি, শশীশেখরের অসহ্য হইয়া উঠিল। ধীরে-ধীরে সেখান হইতে বাহির হইয়া সে পথে নামিল।

গেছে পাগলটা? বলিয়া হেড্ মাষ্টার-মহাশয় মুখ তুলিয়া একবার পথের পানে তাকাইয়া দেখিলেন, সত্যই সে গিয়াছে কি না, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, ওটা ফর্‌টি-নাইন্। ওর সঙ্গে কথা বলে? এখনই হয়েছিল আর কি?

অন্যান্য শিক্ষকেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

শশীশেখর যে 'ফর্‌টি-নাইন্', এই কথাটা প্রমাণ করিবার জন্ম তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, শুনেছেন মজা?—উনি পথে একদিন একটা দু-আনি কুড়িয়ে পেয়ে ছিলেন, তার পর থেকে সোজা তাকিয়ে আর পথ চলেন না;—ভাবেন, আবার হয়ত কোন্‌দিন টাকাটা-সিকিটা কুড়িয়ে পাবেন।

পাগল! বদ্ধ পাগল! বলিয়া আবার সকলে হাসিতে লাগিল।

শশীশেখর তখন তাড়াতাড়ি পথ চলিতেছিল। বাড়ীতে মরণাপন্ন রুগ্না স্ত্রী, মুখে এক ফোঁটা জল দিবারও লোক নাই।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিতেই পোষ্ট আপিসের ডাক-পিয়নের সঙ্গে দেখা। এমন অসময়ে লোকটাকে দেখিয়াই শশীশেখর একটুখানি চমকিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি ?—

একখানা টেলিগিরাফ্—

টেলিগ্রাম ! আমার ?

পিয়নের খাতায় শশীশেখর সহি করিয়া দিল। হাতটা তখন তাহার কাঁপিতেছিল।

খুলিয়া দেখিল, যাহার জিম্মায় ছেলেটাকে সে বর্দ্ধমানের হাঁসপাতালে রাখিয়া আসিয়াছে তাহার সেই ভায়রা-ভাই লিখিয়াছে,—Jiban passed away last night—' 'passed away' কথাটার বাংলা মানে সে জানিত না, কিন্তু নিমিষেই কে যেন তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিল।

জীবন নাই ! থাকিবে না তা জানি।

বৃদ্ধের চোখের জলে সব ঝাপ্সা হইয়া গেল। অদূরে একটা নিমগাছের তলায় বসিয়া শশীশেখর টেলিগ্রামখানা অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিল। চোখের জল অনেকবার মুছিল, কিন্তু বুকের ভিতরটা তোল্‌পাড়্ করিতেছিল,—সেখানে হাত দিতে পারিল না। তাহারপর টেলিগ্রামখানা সেইখানে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

জীর্ণ একটা খড়ো-চালার একপাশে একটা খাটের উপর তাহার স্ত্রী শুইয়া ছিল। পাড়ার নাপিত-বৌ দয়া করিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। শশী-শেখর চালার উপর উঠিয়া আসিতেই, গলাটা খাটো করিয়া সে বলিল, এইমাত্র একটু ঘুমলো।

ঘুমোক্, আর যেন না ওঠে। কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়াই শশীশেখরকে চুপ করিয়া বসিতে দেখিয়া নাপিত-বৌ আবার বলিল, বৌ বমি করেছিল একবার, কিন্তু চাপ্ চাপ্ রক্ত উঠ্‌লো বমির সঙ্গে। ডাক্তারকে একবার—

হুঁ বলিয়া শশীশেখর এবারও চুপ করিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না।

নাপিত-বৌ চলিয়া গেলে, শশীশেখর তার নিদ্রিত স্ত্রীর মুখের পানে এক-বার তাকাইল। আর কত দেরী ? কিন্তু মুখ দেখিয়া কিছুই বোঝা গেল না।

এ মরণপথ-যাত্রীণীকে তার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিয়াই বা কি হইবে? শশীশেখরের বুকের ভিতরটা হু-হু করিতে লাগিল। শরীরের সমস্ত রক্তস্রোত যেন কোথায় আসিয়া হঠাৎ থামিয়া যাইতেছে। একেবারেই থামে না?—

পরদিন প্রাতে সে পয়সা-দুইএর সাগু কিনিয়া আনিল। জল দিয়া তাহাই একবার ফুটাইয়া লইয়া অর্দ্ধেকটা নিজে খাইল, অর্দ্ধেকটা তাহার স্ত্রীর মুখের কাছে ধরিল কিন্তু সে খাইতে পারিল না। অবশেষে সেটুকুও সে নিজেই খাইয়া ফেলিল।

ছি, ছি, ! প্রাণ ধারণের এই গ্লানি ত আর সহ্য হয় না! গতরাত্রে অন্ধকারে এই চালার একপাশে সে চুপ করিয়া পড়িয়া পড়িয়া ছেলেটার জন্য কাঁদিয়াছে আর স্ত্রী তাহার জ্বরের তাড়নায় প্রলাপ বকিয়াছে। কয়েকবার বমিও সে করিয়াছিল, কিন্তু রক্ত, রক্ত; লাল রক্ত ছাড়া আর কিছু না!

সে আর মানুষ চিনিতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহাকেও সে একবার জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তুমি কে?

আমি কেউ নই—

শশীশেখর আবার ইস্কুলে গেল। আবার সেই ছেলে-পড়ানো! ছুটি সে আর কোনো দিন চাহিবে না, প্রয়োজনের দিন তাহার গত হইয়াছে। কিন্তু তাহার বিপর্য্যয়ের কাহিনী কেহ জানিল না, কাহাকেও জানাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না

আরও পাঁচটা দিন কোনো রকমে কাটিল। তাহার পর সেদিন সে এক অন্ধকার শীত-রাত্রির দ্বিপ্রহরে স্ত্রীর চীৎকারে শশীশেখরের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। উঠিয়া তাহার শিয়রের কাছে গিয়া দেখিল, শয্যার উপর নিশ্চলভাবে পড়িয়া পড়িয়া স্ত্রী তাহার গোঙাইতেছে।—বিছানার উপরেই বমি করিয়াছে, রক্তে সমস্ত বিছানাটা লাল হইয়া গিয়াছে! শশীশেখর প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া রহিল। প্রায় সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণাভোগ করিয়া রাত্রির শেষ প্রহরে সে চুপ করিল। ঘড়্ ঘড়্ করিয়া তখন তাহার গলার ভিতর শব্দ হইতেছে, হাত-পা একেবারে অবশ হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে! তাহার পর আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ে যেমন করিয়া মরে, শাঁখা সিঁদুর লইয়া সতী লক্ষ্মী এই বাংলার মেয়েটিও তেমনি করিয়া স্বামীর শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া শেষ হইয়া গেল। কিন্তু বৎসরে বৎসরে, দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে এতদিন ধরিয়া যে মরণ সে মরিয়া গেল, এমন করিয়া আর যেন কেউ না মরে!

শশীশেখর ভাবিয়া ছিল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবে, কিন্তু সে নিশ্বাস

গলিয়া জল হইয়া তাহার দুচোখ ছাপাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু তাহার চিন্তার শেষ হইল কি না কে জানে?

তাহার পর সেগ্রামে শশী পণ্ডিতকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। স্কুলের হেড-মাষ্টার তাহার বাড়ীতে সন্ধান লইয়া দেখিলেন, ঘরের জিনিষপত্র যৎসামান্য যাহা ছিল, সবই তেম্‌নি পড়িয়া রহিয়াছে, লোকজন কেহ কোথায় নাই।

গ্রামটার নাম ভদ্রা। সেখান হইতে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরে। একদিন প্রাতে দেখা গেল, এই গ্রামের একটা রাস্তার ধারে একটা ঠাকুর বাড়ীর খড়ো-চাল-দেওয়া চণ্ডীমণ্ডপে শশী পণ্ডিত একটা পাঠশালা খুলিয়াছে। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি ছেলে একটা প্রকাণ্ড বকুলগাছের তলায় দাঁড়াইয়া সুর করিয়া ধারাপাতের নামতা মুখস্থ করিতেছে, আর শশীশেখর একটা বাঁশের কঞ্চি হাতে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের একটা থামে হেলান্ দিয়া একদৃষ্টে সুমুখে, পথের দিকে তাকাইয়া আছে। তাহাকে দেখিলে আর চিনিবার উপায় নাই। চশমাটা এখনও তেম্‌নি রহিয়াছে কিন্তু চোখ দুইটা আরও ভিতরের দিকে বসিয়া গেছে, চোয়ালের হাড় দুইটা ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, গায়ে জামা নাই, বুকের পাঁজরগুলা একটি একটি করিয়া অনায়াসে গনিতে পারা যায়,—পরণের ধুতিখানা যেমন ছেঁড়া, তেমনি ময়লা। মনে হয়, দাহ করিবার জন্য যেন তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, কিন্তু জলন্ত চিতা হইতে সে যেন আধ-পোড়া হইয়া বাঁচিয়া সম্প্রতি উঠিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু সেখানেও একটা গোলমাল বাধিল। শশীশেখরের এই ছেলে-পড়ানোর সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হইয়াছে এই, যে, ছেলেগুলাকে সে সব সময় সহ্য করিতে পারে না। একটুখানি দোষ ত্রুটি পাইলেই তাহাদের অসম্ভবরকম প্রহার করিয়া বসে। এই নির্ম্মম প্রহারের চোটে 'বাবারে' 'মারে' বলিয়া শ্বাস যদি কাহারও তলাইয়া যায়, তাহা হইলেও সে নিবৃত্ত হইতে পারে না। বলে, মর্ না দুষ্টু ছেলে, বাপ্ মাকে ফাঁকি দিয়ে একদিন ত মরেই যাবি, বাঁচ্‌বার জন্যে ত' আসিস্ নি।—এই বলিয়া সে নিজেই ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে, কাঁপিতে কাঁপিতে হাতে ছড়িটা থামিয়া যায়,—ছড়িটা তখন সে দূরে ছুঁড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজিয়া বসে।

ছেলেরা সে কথা বুঝে না। বাড়ীতে গিয়া নালিশ করে, মেরে মেরে

পণ্ডিত তাদের পিঠের চামড়া তুলে দেয় ; সুতরাং তাহারা আর পাঠশালায় যাইবে না। এবং এই সত্য প্রমাণ করিতে তাহাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না,—গাত্র-চর্ম্মের উপর বাঁশের কঞ্চির দাগগুলা তাহার সাক্ষ্য দেয়।

ক্রমশঃ অভিভাবকেরা শশীপণ্ডিতের পাঠশালা হইতে ছেলেদের ছাড়াইয়া লইতে লাগিল। অবশেষে একটি একটি করিয়া খসিতে খসিতে পাঠশালা প্রায় শূন্য হইয়া পড়িল।

তিনটি ছাত্র লইয়া পড়ানো চলে, কিন্তু অন্নের সংস্থান হয় না। কোনদিন একবেলা, কোনদিন বা উপবাস করিয়াই তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

কিন্তু আর চলে না। শরীরটাও দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, কাশির ব্যারামটাও বুঝি বা আবার প্রবল হইয়া উঠিল!

গতরাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল। একে শীতকাল, তাহার উপর বৃষ্টি। চণ্ডীমণ্ডপের চারিদিক ফাঁকা, জলের ঝাপ্‌টায় সমস্তটাই ভাসিয়া যায়,—ঠাকুর ঘরের খড়ো চালাটাও এমনভাবে ফুটা হইয়া গেছে যে, সেখানেও থাকিবার উপায় নাই। তাহারই এক কোণ ঘেঁসিয়া গত রাত্রিটা সে যেরূপভাবে বসিয়া কাটাইয়াছে, উপর্য্যুপরি সেরূপ কষ্ট জীবন্ত মানুষে সহ্য করিতে পারে না। কাশির বেগটাও বোধ করি সেইজন্যই আজ একটুখানি বেশী হইয়াছে।

এই ঠাকুরবাড়ীর মালিক—শ্রীপতি হাজরা, গ্রামের মধ্যে বেশ অবস্থাপন্ন লোক। সেদিন তাঁহার ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া বাড়ীটার চালে কিছু খড় চাপাইয়া দিবার জন্য শশীশেখর তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া আসিয়াছিল। সেদিনও আর একবার যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় দেখিল, একটা গাড়ীতে করিয়া একগাদা খড় এবং জন চার পাঁচ জন মজুর তিনি পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে কতটা তাহাকে বাঁচাইবার জন্য এবং কতটা বাড়ী পড়িয়া যাইবার ভয়ে, তাহা বুঝিতে পারিয়াও শশীশেখর যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সেদিন একটু সকাল-সকাল ছেলে-তিনটিকে ছুটি দিয়া সে চুপ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের একপাশে তাহার পুরাতন মহাভারতখানি খুলিয়া পড়িতে বসিল।

মাধব বাউরী চালে খড় চাপাইতে ছিল। বেলা প্রায় বারোটা বাজে! পণ্ডিত এখনও চুপ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া মাধব বলিল, ঠাকুর, বেলা যে যায়, চান আহার করুন।

শশীশেখর মুখ তুলিয়া মাধবের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, হুঁ।

মাধব কহিল, ঠাকুরের রান্না কোথায় হয়? এই উনোনে?

শশীশেখর আবার বলিল, হুঁ

এখনও যোগাড়-যন্তর্ যে কিছুই করেন নাই ?

সব দিন হয় না।

মাধব অবাক্ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, সে কি ঠাকুর! উপোস দাও ?

হুঁ।

মাধব বলিল, এমন করে ক'দিন বাঁচ্‌বেন ? শরীরে ত কিছুই নাই।

শশীশেখর একবার তাহার জরাজীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার দেহটার দিকে তাকাইয়া মনে-মনে খুসী হইয়া একবার ঘাড় নাড়িয়া খক্ খক্ করিয়া কাশিতে আরম্ভ করিল। অনেক কষ্টে কাশি বন্ধ হইলে পর কিয়ৎক্ষণ দম্ লইয়া বলিল, হুঁ, আর ক'টা দিন—

মাধব জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মেয়েছেলে আছে ঠাকুর ?

শশীশেখর এবার আর উত্তর দিল না। হাঁ, না, কিছু না বলিয়াই মহাভারতের একটা পৃষ্ঠা উল্টাইয়া সহসা তাহাতেই মনঃসংযোগ করিল।

মাধব ভাবিল, লোকটা পাগল, কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনাহার ক্লিষ্ট সেই মলিন মুখখানা দেখিয়া তাহার বড় দয়া হইল। বলিল, আমাদের পাড়ায় এক পাল ছেলে আছে পণ্ডিত, পড়াবে ? আমরা চাঁদা ক'রে রোজ একসের চাল তোমাকে দিব।

গলাটা একবার পরীষ্কার করিয়া লইয়া শশীশেখর বলিল, ছেলেদের পাঠিয়ে দিও। পড়াব।

পরদিন হইতে বাউরী ও বাগ্‌দি-পাড়ার যত ছেলে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের উপর সারি দিয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া বর্ণের সহিত তাহাদের প্রথম-পরিচয় সুরু করিয়া দিল। উৎসাহ তাহাদের শুধু এই কাজেই নয়, অন্যদিকেও তাহারা তেম্‌নি মজবুৎ। নুন তেল হইতে আরম্ভ করিয়া চাল, ডাল, তরকারী—মাধব সমস্তই তাহাদের সঙ্গে দিয়াছিল। পাঠশালার ছুটির পর ছাত্রেরা পুরাতন উনানটা ভাঙ্গিয়া আর একটা নূতন উনান, দেখিতে না দেখিতে তৈরী করিয়া ফেলিল। শুক্‌নো কাঠ আনিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। বলিল, আর কি কি কর্‌তে হবে বল মাশাশয়। মাধু-খুড়া আমাদের বলেছে।

শশীশেখর ঈষৎ হাসিয়া তাহার মাটির কল্‌সিটি কাঁধে লইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

আহারাদি শেষ করিয়া সে চণ্ডীমণ্ডপে বসিতে যাইবে এমন সময় গ্রামের একজন বর্ষিয়সী বিধবা মেয়ে, তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত রোগা, চুলগুলা ঘাড়ের নীচে ছুঁটা ডান পায়ে প্রকাণ্ড গোদ নামিয়াছে। বোধকরি চোখে ভাল দেখিতে পায় না, তাই একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, বলি অ পণ্ডিত!

শশীশেখর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কি?

মেয়েটি হাত নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলি, বামুনের ঘরের ছেলে ত? নাড়্ পিসি মাসি কেউ নাই তোমার ঘরে? না ঘর-দোর্-ছাড়া ডালের বাঁদর? এই বলিয়া বোধ হয় উত্তরের অপেক্ষায় সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, এইবার গলাটা যেন আরও একপর্দ্দা চড়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, তবে যে, ছোঁড়াটা আমাদের ঐ মাথ্না-ডোমের ছোঁয়া চাটাইটা নিয়েই ঘরে ঢুক্‌লো? আবার বল্‌তে গেলাম ত উল্‌টে আমাকেই মার? এ কি নেকাপড়া শেকাচ্ছ নাকি?

উদ্ভ্রান্তচিত্ত শশীশেখর সব কথা আজ কাল ভাল বুঝিতেও পারে না। বলিল, কি বল্‌ছেন? আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

তা পার্‌বে কেনে? পণ্ডিত হয়েচ যে? এই ভদ্‌রা গাঁয়ে পেসন্নর-পিসির কথা কেউ বুঝে না,—হক্ কথা বলি কি না! তোমার পণ্ডিত গিরি আমি বার কর্‌চি,—চল্‌লাম আমাদের ছিপতির কাচে! মাথ্না ডোম আর পদা মুচির বেটা উঠ্‌বে ঠাকুর ঘরে? আর আমারা এই অষ্টপহর পেন্নাম কর্‌তে আস্‌চি! বলিয়াই পেসন্নর পিসি আর সেখানে অপেক্ষা করিল না, হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু শেষের কথাটা শুনিয়া শশীশেখর একটুখানি অবাক হইয়া গেল। কারণ, এই মেয়েটিকে এই চণ্ডীমণ্ডপের ত্রিসীমানা কোনদিন মাড়াইতে সে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ হইল না।

যাহা হউক সন্ধ্যায় ডাক পড়িল—পণ্ডিতের। শ্রীপতি ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, সুতরাং যাইতেও হইল।

শ্রীপতি হাজরা একা ছিল না,—গ্রামের আরও কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি সেখানে বসিয়া ছিলেন।

বেশী কথা বলে না দেখিয়া শ্রীপতি প্রথম দিন হইতে ভাবিত,—লোকটা বোধ হয় কালা, কানে ভাল শুনিতে পায় না। তাই শশীশেখরকে দেখিবামাত্র সে বেশ জোরে জোরেই বলিয়া উঠিল, কি ভেবেছেন মহাশয়! দয়া করে দেয় নুন, আর ভাত মারে চার গুণ! তাই, না!

কিন্তু উত্তরের পরিবর্ত্তে শশীশেখর তাহার হাতদুইটি একবার কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল।

শ্রীপতি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, ওসব হবে না মশাই, আমার ওখানে হাড়ি-ডোম চণ্ডালের আড্ডা করতে ত আপনাকে বলি নি!

গ্রামের রাসু চাটুজ্যে পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন, পিচ্ করিয়া খানিকটা থুথু ফেলিয়া বলিলেন, আরে রামঃ! ঠাকুর বাড়ী যে!

শ্রীপতি বলিল, ভেবেছিলাম আহা বুড়ো বামুন ছেলেগুলো পড়িয়ে যদি খেতে পায় ত থাকুগে,—কিন্তু এমন মারহাট্টা স্বভাব, মেরে মেরে ত সব তাড়ালে তারপর এইবার আবার চোয়াড় ছোটজাত ধরেছেন,—

শশীশেখর যে কালা, রাসু চাটুজ্যেও তাহা আন্দাজে অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন, তথাপি গলাটা একটুখানি খাটো করিয়া বলিলেন, সৎব্রাহ্মণ বলে, ত ওকে মনেই হয় না সীপতি—কি জানি বোধ হয় কলুর বামুন কি গয়লার বামুন-টামুন হবে।

কথাটা, শশীশেখর শুনিতেও পাইল, বুঝিতেও পারিল, কিন্তু বলিতে কিছুই পারিল না, বরং শ্রীপতিকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল, এতে আপনার আপত্তি কি আছে! আহা শিখ্‌তে চায় ওরা—

শ্রীপতি বলিল আপত্তি অনেক। আপনি বুঝ্‌বেন না। বুঝ্‌লে আর ছেলে ঠেঙিয়ে খেতে হতো না। যাক্ ঠাকুর-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ আমার—আমি বল্‌ছি ও সব হবে না। আপনি মানে মানে বাড়ী চলে যান্।

রাসু চাটুজ্যে বলিলেন, আমাদের সীপতির ওজর-আপত্তি কিছুতেই নেই বাবা! সে কথাটি বল্‌বার জো নেই।—তবে কিনা এ আগুন নিয়ে খেলা ত আর বড় সহজ কথা নয় মশাই! আজ আপনি না হয় এই অনাচারটি কর্‌লেন পয়সার লোভে, তারপর কাল যখন গলন্তকুষ্ঠি, অন্ধক হয়ে যাবেন, তখন কে রাখ্‌বে, বলুন? এই বলিয়া সে তাহার দুইহাতের আঙুলগুলা গলিতকুষ্ঠ রোগীর মত জড় করিয়া হাতের তালু দুইটা বারকতক নাড়িয়া তাহাকে দেখাইয়া দিলেন।

উদাসীনের মত শশীশেখর শ্রীপতিকে একবার তার শেষ মিনতি জানাইল, তাহ'লে হবে না শ্রীপতি বাবু?

না, হবে না। বলিয়া শ্রীপতি ঘাড় নাড়িল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার হইয়া সমবেত সকলেই একবার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া দিল।

শশীশেখর চণ্ডীমণ্ডপে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিপিন বাগ্‌দি ও হরি মালের ছেলে দুটা উনানে আঁচ দিয়া তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

আমার সঙ্গে কি ইয়ারকি হচ্ছে নাকি তোদের? উনোন্ ধরাতে কে বল্‌লে? দে জল ঢেলে নিভিয়ে দে। বলিয়া শশীশেখর তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা ছেলে বলিল, আপনি তখন বলে গেলেন—

শশীশেখর বলিল, না বলি নি, যা তোরা। কাল থেকে আর আস্‌তে হবে না বাপু তোদের, সবাকে বলে দিস্। আমি এখানে থাক্‌ব না, কাউকে পড়াতেও পার্‌ব না।

ছেলে দুইটা চলিয়া গেল কিন্তু অনতিবিলম্বে মাধব বাউরী খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল। শশীশেখর তখন অন্ধকার চণ্ডীমণ্ডপের একপাশে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে ছিল। মাধব বলিল, পড়াতে পার্‌বে না কেনে ঠাকুর?

এ ত আচ্ছা বিপদে পড়্‌লাম রে বাবা! কি বল্‌ছিস্ কি? বলিয়া চোখ খুলিয়া শশীশেখর নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

মাধব বলিল, বুঝ্‌তে পেরেছি ঠাকুর। তুমি চল আমাদের সরকারী মনসা-ঘরে। বামুন-ঠাকুররা এখানে পড়াতে দেবে না তা জানি।

শশীশেখর বিরক্ত হইয়া বলিল, ছেলেপেলে পড়াতে আমার আর ভাল লাগে না বাপু—কেন চেঁচাছিস্?—যা।

মাধব না-ছোড়বন্দা। বলিল, তবে আমাদের গাঁয়ে উপোস দিয়ে মরতে পাবে না ঠাকুর; অন্য গাঁয়ে যাও।—কিন্তু পণ্ডিতের নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাইয়া সে আবার বলিল, ভাল কথা বল্‌ছি ঠাকুর, তুমি চল। আমাদের মনসা-ঘর থেকে তোমাকে কেউ নড়াতে পার্‌বে না। সেটা আমাদের সবাইকার ঠাকুর ঘর—কারও একলা বাবার নয়।

অবশেষে বাধ্য হইয়া শশীশেখর রাজি হইল। পরদিন প্রত্যূষে বাউরী ও বাগ্‌দি পাড়ার মাঝে সেই ছোট মনসা-ঘরটিতে সে তাহার নূতন ডেরা বাঁধিল। দেখিল, চারিদিকে বাঁশের বেড়া-দেওয়া ছোট মাটির ঘরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উঠানে কয়েকটা কুল-গাছে অসংখ্য টোপা কুল ধরিয়াছে। একধারে একটা রক্ত-করবী আর একটা জবাফুলের গাছে বিস্তর ফুল ফুটিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে শশীপণ্ডিতের সে-এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। যে

ছেলেদের একদিন সে ধরিয়া ধরিয়া ঠেঙাইত, তাহারাই আজ তাহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিল।

মাধব বাউরীর সাত-আট বছরের একটা ছেলে ছিল। নাম পাঁচু। সে-ই হইল তাহার সব চেয়ে বেশী অনুগত। পাঁচু যখন তখন পণ্ডিতের কাছে বসিয়া থাকিত, পণ্ডিতের কাজ করিয়া দিত, হাসিত, খেলিত, ছুটিয়া বেড়াইত। পণ্ডিতও নিজে রাঁধিয়া অর্দ্ধেক ভাত পাঁচুকে দিত। কোনদিন নিজে না খাইয়া পাঁচুকে খাওয়াইত। পাঁচু বাতাসা খাইতে ভালবাসে, শশীশেখর তাহার রাঁধিবার চাল দোকানে দিয়া তাহার জন্ম বাতাসা কিনিয়া আনিত। শশীশেখর রাত্রি জাগিয়া কাহিনী বলিত, পাঁচু মন দিয়া শুনিত।

সেদিন পাঁচু বায়না ধরিয়া বসিল যে, সে কুল খাইবে।

শশীশেখর বলিল, কুল যে খেতে নাই রে পাঁচু, অসুখ করবে!

পাঁচু কাঁদিয়া বলিল, না, খুব খেতে আছে—

শশীশেখর ঢিল ছুঁড়িয়া কুল পাড়িতে লাগিল। পাঁচুর সঙ্গে ছুটিয়া ছুটিয়া কুল কুড়াইয়া অনেকগুলা টোপা কুল সেদিন সে নিজেও খাইয়া ফেলিল।

মাধব বলিত, ঠাকুরকে পেঁচোয় পেয়েছে।

শশীশেখর পাগলের মত সকলের মুখের পানে তাকাইয়া হাসিত।

গাছের কুলগুলা তখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে,—ঢিল ছুঁড়িলে একটা কুলও পড়ে না। অথচ পাঁচু গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কুলের জন্ম কাঁদিতেছে—যে কোন রকমে কুল তাহাকে পাড়িতেই হইবে। অবশেষে বুড়া শশীশেখর অতিকষ্টে নিজেই সেই কুল গাছটায় উঠিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে, হাত-পা তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মাথাটা অসম্ভব রকম ঘুরিতে লাগিল, সে আর কোন প্রকারেই নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।—সেই উঁচু গাছটার উপর হইতে ধুপ্ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল।

পাঁচু কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া গিয়া তাহার বাবাকে খবর দিল। মাধব আসিল, এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে বাউরী ও বাগ্দি পাড়ার ছেলে-মেয়ে সকলেই মনসা ঘরের উঠানে আসিয়া জড় হইল। দেখিল, শশীশেখরের বাঁ-হাতের খানিকটা কাটিয়া গেছে এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাটির উপর লুটাইতেছে! সকলেই হায়, হায়, করিতে লাগিল। চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়া বাতাস করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান হইল। সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া

মনসা-ঘরের উপরে তাহাকে শোওয়াইয়া দিতেই শশীশেখর ধীরে ধীরে বলিল, তোরা ভয় পাস্‌নে বাবা, এ কিছু নয়, সেরে যাবে।

দিন দুই তিনের মধ্যে সারিয়াও গেল।

সেদিন শশীশেখর রান্নার উদ্যোগ করিতেছে,—পাঁচু একটু দূরে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছে। এমন সময় হাসিতে হাসিতে মাধব তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাঁচু তাহার বাবাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, বাবা, আমি আজ আলু ভাজা খাব।

মাধব তাহাকে এক ধমক্ দিয়া শশীশেখরের পানে তাকাইয়া বলিল, 'পেঁচোকে দিনরাত যে নিজের কাছে-কাছে রাখ্‌ছ ঠাকুর, ও যে গেল! বড় হলে খেটে খেতে পারবে ত?

শশীশেখর ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, এ আপদ ত তুই নিজেই ঘরে ঢুকিয়েছিস্ মাধব, না-ই যদি পারে ত দোষ আর কা'কে দিবি? এই বলিয়া হাসিতে গিয়া প্রবলবেগে খক্ খক্ করিয়া সে কাশিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে খানিকটা কাঁচা রক্ত তাহার দুই কস্ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

মাধব বলিল, এ ত ভারি কাশি হয়েছে ঠাকুরের! একি ঠাকুর! রক্ত যে!

রক্তটা মুছিয়া ফেলিয়া শশীশেখর বলিল, এমনি হচ্ছে আজ মাস খানেক।

মাধব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তাহ'লে একদিন গঞ্জে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে এসো ঠাকুর। লছু কৈবর্ত্তর গাড়ী জোড়াটা আমি ঠিক ক'রে, চল নিজেই নিয়ে যাই।

শশীশেখর বলিল, না-না, মাধব, তোকে কিছু করতে হবে না। সারে ত এম্‌নিই সারবে।

মাধব শুনিল না। বলিল, তিন-চারটে টাকার মাম্‌লা ঠাকুর,—চল, কাল সকালেই যাই।

মাধব সেইদিন সন্ধ্যায় শ্রীপতি হাজরার বৌএর কাছে কাঁসার একটা থালা ও পিতলের একটা বড় ঘটি বন্ধক রাখিয়া চারিটা টাকা আনিল। লছু কৈবর্ত্তর গরুর গাড়ীটা পাওয়া গেল না। কালু কামারের গরু এবং শশী পালের গাড়ী আনিয়া রাত্রেই সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিল। পর দিন অতি প্রত্যূষে গাড়ী 'জোড়-তাড়' করিয়া পণ্ডিতকে তাহাতে উঠাইয়া লইল। পাঁচু কিছুতেই সঙ্গ ছাড়িল না, সেও কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। মাধব তাড়াতাড়ি তাহার কলি-

কায় খানিকটা আগুন চাপাইয়া লইয়া গঞ্জের দিকে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কিন্তু রোগের চিকিৎসা করাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া শশীশেখরের চোখ দুইটা কেন না জানি জলে ভরিয়া আসিল। একদিন চিকিৎসা-অভাবে যাহারা চলিয়া গেছে, তাহাদের মুখ দুইটা আজ তাহার মনে হইতেই তাহার মস্তিষ্কের সমস্ত শিরা উপশিরা ধরিয়া কে যেন টানাটানি করিতে লাগিল। বলিল, না রে মাধব, আমি যেতে পারব না, চল্ ফিরে চল।

মাধব সে-পাগলের কথা শুনিল না। জোরে-জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

শহরে যখন পৌঁছিল, বেলা তখন প্রায় দশটা। ডাক্তারের দরজায় গাড়ী খুলিয়া মাধব সেইখানেই বসিয়া রহিল। পাঁচুকে সঙ্গে লইয়া লাঠি ধরিয়া শশীশেখর ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিল।

রোগী দেখিয়া ডাক্তার বলিল, এ সারবে না। আপনার যক্ষা হয়েছে। আর, সে অনেক টাকা খরচ করতে আপনি পারবেন না—

শশীশেখরকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ডাক্তার বলিল, আজ একটা ওষুধ দিচ্ছি, নিয়ে যান। এটি কে? আপনার ছেলে? বলিয়া পাঁচুর দিকে ডাক্তার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

শশীশেখর বলিল, আজ্ঞা না।

ডাক্তার বলিয়া দিল, ছেলে পেলে কাউকে কাছে আসতে দিবেন না আপনার, বুঝলেন, ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ—

শশীশেখরের মাথাটা এইবার ঘুরিতে লাগিল। ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনটা হাতে লইল বটে কিন্তু ওষুধ সে কিনিল না। কাগজটা ডাক্তারের দরজায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিল। বলিল, মিছেমিছি এলাম মাধব, ডাক্তার বল্লে, কিছু হয়নি, এ দু' দিনেই সেরে—'

কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না, খক্ খক্ করিয়া কাশিতে কাশিতে বাঁ হাত দিয়া পাঁচুকে ক্রমাগত তাহার বাবার দিকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে লাগিল।

পাঁচু খানিকটা সরিয়া গিয়া বলিল, আবার কত সরব?

কাশি থামিলে শশীশেখর বলিল, পাঁচুকে তোর কোলে বসিয়ে নিয়ে চল্ মাধব, আমি একটু হাত-পা ছড়িয়ে শুই।

পাঁচু কিছুতেই যাইতে চায় না। অনেক কষ্টে তাহাকে মাধব তাহার কোলে চড়াইয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল।

ভগ্নায় ফিরিয়া শশীশেখর সেদিন আর রান্না করিল না। বৈকালে ছেলেগুলা পড়িতে আসিল, সেদিন তাহাদের ছুটি দিয়া শশীশেখর মনসাঘরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাঁচু আহারাদি করিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাহার কাছে আসিতেছিল, শশীশেখর তাহাকে এক ধমক্ দিয়া বলিল, খবরদার আমার কাছে আসিস্ নে পেঁচো, মেরে খুন ক'রে দেব।

পঁচে হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল!

শশীশেখর বলিল, আমার কথা শুন্‌লি নে যে পাঁচু? আমার কাছে আর আসিস্ নে, বুঝ্‌লি? আমি বামুন, তুই বাউরী, তোকে ছুঁলে আমার চান করতে হয়।

পাঁচু ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, হ্যাঁঃ, চান্ করতে হয়! দেখ্‌বে ছোঁব,—এই ছুলাম, এই, এই, এ—ইয়া,—হলো? বলিয়া পাঁচু তাহার গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শশীশেখর প্রাণপণে তাহাকে দুই হাত দিয়া ঠেকিয়া সরাইয়া দিয়া বাঁশের কঞ্চিটা দিয়া তাহার পিঠের উপর সপাং করিয়া এক চাবুক বসাইয়া দিল।

পাঁচু অভিমানে মুখ ভার করিয়া রহিল। চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর ধীরে-ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

শশীশেখর একদৃষ্টে এই ছেলেটার চলিয়া যাওয়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাকাইয়া রহিল; চোখ দুইটা তাহার জ্বালা করিতে লাগিল। হাতের ছড়িটা দুই হাত দিয়া ভাঙিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া উঠানের উপর সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

পরদিন প্রাতে শশীশেখরকে সেখানে দেখিতে পাওয়া গেল না। মনসাঘরের উঠানের উপর দেখা গেল তাহার কাপড়, জামা, বিছানা, এমন কি মহাভারতটি পর্য্যন্ত আধ-পোড়া অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে! সকলেই অনুমান করিল, জিনিস-পত্রগুলি নিজের হাতে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিয়া সে কোথাও চলিয়া গিয়াছে।

মাধব খুঁজিতে বাহির হইল। বেলা প্রায় এগারটার সময় গ্রামের এক প্রান্তে শ্রীপতি হাজরার আম-বাগানের ভিতর অনুসন্ধান করিতে গিয়া মাধবের চোখের সুমুখে যে-দৃশ্যটা পড়িল, তাহাতে সে একেবারে যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে শিহরিয়া কাঠ হইয়া গেল। দেখিল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সেই কঙ্কালসার মৃতদেহ

সুমুখে একটা আমগাছের শাখার উপর ঝুলিয়া আছে। নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানা খুলিয়া উলঙ্গ হইয়া গলায় ফাঁসি লইয়াছে!—হাত পাগুলা ঝুলিতেছে, গলাটা আঁটিয়া সরু হইয়া গিয়াছে, মাথাটা কাৎ হইয়া পড়িয়াছে, চোখদুটা অসম্ভবরকম বড় হইয়া বাহিরে ঠিক্‌রাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, দাঁতগুলা বাহির হইয়া আছে, আর সেই রক্তরঞ্জিত দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে অনেকখানা রক্ত গড়াইয়া গড়াইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছে! . . .

আজিকার এই নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নবেলার মাধব বহুক্ষণ ধরিয়া আড়ষ্টের মত এই বিভীষিকাময় মৃতদেহটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

তাহার পর কেমন করিয়া নাজানি সংবাদটা সারা গাঁয়ে রটিয়া গেল। এই অদ্ভুত জীবটিকে দেখিবার জন্য দেখিতে-দেখিতে সমস্ত ভদ্রা ভাঙিয়া লোক জড় হইল।

এ আপদ আমার বাগানে কেন বাবা! বলিয়া শ্রীপতি হাজরা তৎক্ষণাৎ থানায় খবর পাঠাইয়া দিল। ইন্‌স্পেক্টর আসিল। দারোগা আসিল। কনেষ্টবল, জমাদার, সব আসিয়া হাজির হইল।—শশীপণ্ডিতের ইতিবৃত্ত লিখিয়া লইয়া একটা গরুর গাড়ীতে করিয়া সদরে লাশ চালান করিয়া দিল।

তাহার পর, 'মর্গে' তাহার মৃতদেহটাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া তন্নতন্ন করিয়া তাহারই উপর কত রকমের পরীক্ষা চলিতে লাগিল! ডাক্তারে ছাড়্-পত্র লিখিয়া দিল। অবশেষে দিন দুই পরে, তাহার সেই বিকৃত পচা দেহটাকে মুচি-মুর্দ্দাফরাসে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া কোথায় কোন গোভাগাড়ে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

সেইদিন হিম-শীতল বিমর্ষ রজনীর নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে শৃগাল শকুনিগুলা শশী-পণ্ডিতকে লইয়া খাওয়া-খাওয়ি করিতে করিতে তাহাদের শ্মশান-উৎসব মাতাইয়া তুলিল। . . .

প্রিণ্টার—শ্রীশ্যামকুমার চট্টোপাধ্যায়,
বাণী প্রেস,
৩৩এ মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা।

কল্লোল

ভাইফোঁটা

—শ্রীসান্ত্বনা বসাক।

"ও দিদিমণি তোমার যে বিয়ে!"

'বাস্' হইতে নামিয়া বাড়ীতে পা দিবামাত্র সরিতের কানে এই কথা কয়টি প্রবেশ করিল। দাসী, তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত মুখে, এক গাল হাসিয়া বলিল "বকসিস্ দিতে হবে দিদিমণি।"

সরিত একবার পায়ের জুতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া "পাবে ভয় নেই" বলিয়া উপরে চলিয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়া বইগুলি রাখিয়া কাপড় ছাড়িতে না ছাড়িতেই তাহার জেঠীমা আসিয়া বলিলেন "ও সরি, কাল আর কলেজে যাস্ নে, তারা দেখ্‌তে আস্‌বে।"

সরিত যেন কিছুই জানে না এরূপ ভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কারা?"

জেঠীমা জানিতেন 'কারা' বলিলে তাঁহার আর রক্ষা নাই, তাই আপন মনেই যেন বলিতে লাগিলেন, "চারটের সময় আস্‌বে বলেছে। ও সরি, তোর কপাল ভাল তাই এমন——"বলিয়া অর্দ্ধ পথে থামিয়া ঢোক্ গিলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "ঐ মেডিকেল না কি বলে ঐ কলেজে ডাক্তারী পড়ে। দেখ্‌তে যেন কাত্তিকটি! রং যেন সাহেবের মত, খাঁড়ার মত নাক, চোখ যেন—"

সরিত, ছাড়া-কাপড়খানা কুঁচাইয়া কাঠের আল্‌নায় রাখিতে রাখিতে বেশ সহজ সুরে বলিল "কাল আমাকে যেতেই হবে।"

জেঠীমা গালে হাত দিয়া বলিলেন "ওমা কোথা যাব আমি—"

বাধা দিয়া "কোথাও যেতে হবে না, ঠিক এই বাড়ীতেই থাক্‌বে" বলিয়া সরিত তোয়ালে হাতে ঘরের বাহির হইয়া গেল? জেঠীমা কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, "বাবা এ মেয়েকে বোঝানো সহজ নয়, মেয়ে নয় ত পুরুষের বাবা! এমন মেয়ে সাত জন্মে দেখি নি" ইত্যাদি বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

মুখ হাত ধুইয়া ঘরে আসিয়া সরিত রাস্তার ধারের জান্‌লার পর্দ্দাটা সরাইয়া দিয়া পালঙ্কের উপর আড়্ হইয়া শুইয়া পড়িল। বসন্তের মৃদুবাতাস আসিয়া মেটের মশারীর ঝালরগুলি দুলাইতে লাগিল। সরিত তাহার পানে চাহিয়া রহিল। জেঠীমার কথাগুলি লইয়া মনের মধ্যে তোল্‌পাড় করিতে করিতে সহসা তাহার একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। তখন সে প্রথম শ্রেণীতে পড়িত। একদিন তাহার প্রিয়বন্ধু পরাগ আসিয়া তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল, চিঠিখানি পরাগের দাদার। পরদিন সরিত একখানি মোটা খাম পরাগের হাতে দিল। চিঠিখানি পাইয়া পরাগের দাদা আর যাহাই হউক তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট যে হয় নাই তাহা নিশ্চয়। খামের ভিতর হইতে জুতার সুকতলা ও কাঁটার কাঠির ধরণের কয়েকটা জিনিষ নাকি বাহির হইয়াছিল!

বালক ভৃত্য আসিয়া বাহির হইতে ডাকিল "চা এনেছি দিদিমণি।"

সরিত উঠিয়া খোলা চুল জড়াইতে জড়াইতে বলিল "নিয়ে আয়।" পর্দ্দা ঠেলিয়া ভৃত্য আসিয়া চা খাবার ইত্যাদি দিয়া গেল। সরিত টেবিলের সাম্‌নে বসিয়া এক চুমুকে চাটুকু শেষ করিয়া বলিল "আর এক কাপ্ নিয়ে আয় তো।"

চা আনিলে সরিত বলিল "রুটি টুটি সব নিয়ে যা, ও সব কিছু খাব না। ছোড়্‌দা এসেছে কিনা জানিস্?"

ভৃত্য 'না' বলিয়া কাপ্ ইত্যাদি লইয়া চলিয়া গেল। সরিত, দরজাটা বন্ধ করিয়া কৌচের উপর বসিয়া একখানা বইয়ের পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। মিনিট দুই পরেই সরিতের বৌদি নন্দরাণী ডাকিল "ও ঠাকুরঝি দরজাটা একবার খোলই না ভাই। সুখবরটা পেয়ে কি অম্‌নি দোর বন্ধ ক'রে বস্‌তে হয়?

সরিত কোন উত্তর দিল না। নন্দরাণী আবার দ্বার ঠেলিল।

সরিত উঠিয়া ঝনাৎ করিয়া দরজা খুলিয়া বলিল "কি জ্বালা! দণ্ড চুপ ক'রে বসতে দেবে না নাকি?

বৌদি একগাল হাসিয়া বলিল "আমার ভাই এত আহ্লাদ হ'চ্ছে যে কি বল্‌ব।"

সরিত বলিল "দুঃখের বিষয় যে, এ আনন্দটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে না, কারণ আমি সম্প্রতি বিয়ের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠি নি।"

বৌদি সবিস্ময়ে বলিল "ওমা সেকি! কালই যে তারা দেখ্‌তে আস্‌বে।"

সরিত বলিল "দেখ্‌তে আস্‌বে আবার কি? আমি একটা মানুষ, দুটো হাত, দুটো পা, আর দুটো চোখ এর মধ্যে আবার দেখ্‌বার কি আছে? ও সং সেজে বসা আমার পোষাবে না, তা সোজা বলে দিচ্ছি।"

বৌদি বলিল "তা সবাই তো তোমার মত সুন্দর হয় না, যে শুনেই অমনি পছন্দ ক'রে ফেল্‌বে? কেমন দেখ্‌তে কি বৃত্তান্ত এ সবও তো জানা চাই।"

সরিত ঝঙ্কার দিয়া বলিল "হঁা, তারপর পছন্দ না হলে, ফেলে চলে যাক্‌, আর সে মেয়েটা মরুক লজ্জায়। এর চেয়ে মেয়েগুলো জন্মালেই বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে না কেন? সব আপদ্‌ চুকে যায়।"

বৌদি মুখভার করিয়া চলিয়া গেল। সরিত ছোড়্‌দার ঘরে চলিল। ছোড়্‌দা বরুণ তখন একরাশ কাগজ-পত্রের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কি লিখিতেছিল। সরিত আসিয়া তাহার চেয়ারের পিঠে হাত রাখিতে সে মুখ না তুলিয়াই বলিল "কি রে! খবর কি?

সরিত একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল "জেঠামশাই আমার বিয়ের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

লেখা না থামাইয়াই কৌতুকপূর্ণস্বরে বরুণ বলিল "তাই নাকি?"

সরিত বলিল, "আমি একটা কাণ্ড করব ঠিক করেছি।"

বরুণ কাগজ কলম রাখিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "কি? কি বল্‌ তো?"

একবৎসর বয়সে সরিত মাকে হারাইয়াছে। সেই অবধি জেঠীমাই তাহাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়া আসিতেছেন। পিতা শশাঙ্কমোহন মেসোপটেমিয়ায় কি একটা কাজ করেন, মাহিনাটা বেশ মোটা দরেরই পান। তিন চার বৎসর

অন্তর একবার করিয়া কলিকাতায় আসেন, এ ভিন্ন বাড়ীর সহিত আর কোনও সম্পর্ক নাই। জেঠামশাই মৃগাঙ্কমোহন, ব্যবসাদার। ব্যবসা করিয়া বিস্তর টাকা করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অরুণ হাইকোর্টের উকীল। কনিষ্ঠ বরুণ 'মাইনিং' নিয়া আছে, বিবাহের নামে চটা। বিলাত, আমেরিকা ঘুরিয়া মাইনিং কার্য্যে পাকা হইয়া আসিয়াছে। পিতার ইচ্ছা ছিল তাহাকে ব্যারিষ্টারী পাশ করাইয়া অর্থোপার্জ্জনের আর একটা পন্থা বাহির করেন কিন্তু বরুণ তাহাতে নারাজ। সাহেবী মেজাজের ছেলের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া মৃগাঙ্কবাবু হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইচ্ছা ছিল তাহার বিবাহে একটা বড় রকমের দাঁও মারিবেন কিন্তু বিধি তাহাতেও বাদ সাধিয়াছেন। অরুণই তাঁহার একমাত্র ভরসা। তাহার বিবাহে নগদ অলঙ্কারে হাজার দশেক টাকা লুটিয়াছেন, বধুটিও দেখিতে সুন্দরী।

২

বিকাল চারটা বাজে জেঠামশাই ঘন-ঘন রাস্তার দিকে চাহিতে ছিলেন। বাহিরের ঘরে আজ চারজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। দুইজন প্রৌঢ় দুইজন যুবক। যে গৌরবর্ণ ক্ষীণকায় যুবকটি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত একটি বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছিলেন, তিনিই সতীন্দ্র লাহিড়ী। মেডিকেল কলেজে পড়িতেছেন এই বৎসরই শেষ পরীক্ষা দিবেন। অপর যুবকটি সতীন্দ্রের মাসতুতো ভাই অনিমেষ, বর্ণ শ্যাম, স্বভাব কিছু চঞ্চল।

কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় ভদ্রলোকটি সতীন্দ্রের মাতুল ও অপরটি অনিমেষের পিতা।

অরুণ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বার-বার আনা-গোনা করিতেছিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল "আপনাকে মাঠাকরুণ ডাকছেন।"

অরুণ ভিতরে যাইতেই তাহার মা বলিলেন "মোটর খানা না হয় পাঠিয়ে দে। খাবার দাবার গুছিয়ে বসে আছি, ওর তো এখনও দেখা নেই।"

অরুণ চিন্তান্বিত ভাবে বলিল "তাই করতে হবে দেখছি।"

এমন সময় নীচে একটা কোলাহল উঠিল "দিদিমণি এয়েচেন গো দিদিমণি এয়েচেন!" অরুণ চটিজুতা ফট্-ফট্ করিয়া নামিয়া গেল।

সরিত ধীরে সুস্থে কাপড় ছাড়িয়া হাত-মুখ ধুইয়া এককাপ্ চা পান

করিতে বলিল। অরুণ তাড়া দিতে, বেশ নির্ব্বিকার ভাবে সে বলিল "ব্যস্ত হবার দরকার নেই।"

চায়ের কাপ্‌টি শেষ করিয়া সরিত, বাহিরের ঘর অভিমুখে যাত্রা করিল। জেঠীমা বলিলেন "ও সরি, লক্ষ্মী মেয়ে চটিজুতোটা খুলে রেখে যা মা, হিন্দুঘরের মেয়ে।"

তাহার পূর্ব্বেই সরিত অদৃশ্য হইল। সমাগত ভদ্রলোকদের নমস্কার করিয়া সরিত একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া সতীন্দ্রের মাতুলের বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া "আপনাদের কাছে আমার কিছু বল্‌বার আছে, আশা করি তা শুনবেন"। বলিয়া উত্তরের আশায় থামিল।

অনিমেষের পিতা বলিলেন "শুনব বৈ কি মা"।

সরিত সোজা হইয়া বসিয়া বলিল "আপনারা বোধ হয় জানেন, আমি কলেজে পড়ি। এ কথাটা অবশ্য নিজের গুণপনা জাহির কর্‌বার জন্য বল্‌ছি না, কিন্তু আমি জানি, আজকাল অনেকে কলেজে-পড়া বৌ পছন্দ করেন না, কারণ তাদের মধ্যে নাকি নম্রতা ও লজ্জাশীলতার অভাব দেখা যায়।" একটু থামিয়া আবার বলিল "এ কথা যে একেবারেই মিথ্যা তা আমি জোর ক'রে বলতে পারি না কারণ আমি নিজেই এর জল্‌-জ্যান্ত প্রমাণ। এ সব কথা যাক্! বাঙালীর মেয়েদের যে যখন তখন কতকগুলি অজানা অচেনা লোকের সামনে সং সাজিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়, এতে যে তাদের লজ্জাশীলতায় এবং আত্মসম্মানে কত খানি আঘাত লাগে তা বোধ হয় কেউ ভেবে দেখ্‌বার প্রয়োজন বোধ করে না। বাঙালী মেয়ের জীবনের উদ্দেশ্য—বিয়ে। অনাহারে মর, অসুখে মর, সারা দেশটা ধ্বংস হয়ে যাক তবু মেয়েব বিয়ে দিতেই হবে! একি বীভৎস প্রথা? মেয়ে বলে তাদের প্রাণ নেই? আর বিয়ে, সে কি কনের সঙ্গে হয়, না 'পণের' সঙ্গে হয়? আজকাল যাঁরা শিক্ষিত বলে গর্ব্ব করেন তাঁদের মধ্যে ক'জন পণ না নিয়ে বিয়ে করেছেন? রূপ আর রূপো ছাড়া কিসের আদর তাঁরা করেছেন? শিক্ষা, শিক্ষা, কি শিক্ষা এঁরা পেয়েছেন, সেই পচা পুরাণ কুপ্রথাগুলিকে এঁরা ছাড়তে পেরেছেন? যুগ যুগান্তর ধরে নারীর উপর যে অত্যাচার চলে আসছে তার কণামাত্র লাঘব করতে পেরেছেন?—" হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে দীপ্তচক্ষে সতীন্দ্রের পানে চাহিল। সতীন্দ্র বিস্মিত প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া ছিল। তাহার চক্ষু আনত হইল। সরিতের দীপ্তনয়নে মমতা ও কঠোরতার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব আলো ফুটিয়া উঠিয়া সতীন্দ্রের হৃদয়ে একটা গভীর রেখা টানিয়া দিল।

সরিত সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, "নির্লজ্জের মত অনেক কিছু বলে ফেলেছি, আশাকরি মাপ করবেন। এখন কিছু জলযোগ করলে সুখী হব।" বলিয়া চলিয়া গেল ও অল্পক্ষণ পরেই সহস্তে খাবারের রেকাবী হাতে ফিরিয়া আসিল। সতীন্দ্রের মামা উঠিয়া বলিলেন! "আর কেন যথেষ্ট হয়েছে, যাই এবার।"

সরিত বলিল "সে হতেই পারে না, বসুন।"

অনিমেষের পিতার দিকে চাহিয়া মাতুল বলিলেন "নাও ওঠ, আর খেতে হবে না।" অনিমেষের পিতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আঃ চটো কেন বসই না।"

এই মেয়েটির ক্ষুরধার কথাগুলি শুনিয়াই ইহাকে বধু করিয়া ঘরে তুলিবার সঙ্কল্প তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন তবু ইহার মুখের একটা দীপ্ত-শ্রী তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল তাই তিনি বারবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলেন।

আর মামা, কলির মেয়েদের অসমসাহসিকতা ও নির্লজ্জতার বিষয় চিন্তা করিয়া বাঙলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অত্যন্ত খড়িত হইয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু আহারের আয়োজন দেখিয়া তিনি বলিলেন "করেছেন কি! এ যে যজ্ঞীর ব্যাপার, এত খাই কি ক'রে? ওহে তোমরা বসে পড় আর দেরী কেন?" বলিয়া মহা-উৎসাহে খাবারের থালাখানিকে আক্রমণ করিলেন। অনিমেষ সতীন্দ্রকে গা টিপিয়া নিম্ন স্বরে বলিল "খাবার দেখে রাগ জুড়িয়ে গেল।

"ওঃ করেন কি! আর খাব কি করে, অসম্ভব একেবারে যে। বাঃ এযে দেখি ছানার পায়স, দিব্যি খেতে হয়েছে তো! নাঃ এবার আমি মারা গেলাম, এতখানি রাবড়ী আর পেটে ধরবে? এটা আবার কি, এপ্রেস গজা নাকি? হাঃ হাঃ কোনদিন আবার শুনব এম্পারার খাজা হয়েছে। সতী ও কি করছ! এরি মধ্যে হাত গুটিয়ে বসে আছ? নাঃ আজকালকার ছেলেদের সঙ্গে আর পারা যায় না। কি খাওয়া সব! ঐ বয়সে আমরা লোহা হজম করতাম!" বলিয়া মামা সগর্ব্বে চাহিলেন।

অনিমেষ অস্ফুটস্বরে বলিল, "শুধু ঐ বয়সে কেন এই বয়সেও কিছু কসুর্তি নেই।"

মামা রাগিয়া বলিলেন "কি বলছিস্ সব বিড়্ বিড়্ করে।"

অনিমেষ সাধু সাজিয়া বলিল "ঐ ছবিখানার কথা।"

মামার মনে একটা ধারণা আছে যে অনিমেষ সর্ব্বদাই তাঁহার স্থূলদেহ ও কৃষ্ণবর্ণ লইয়া আলোচনা করে, তাই বলিলেন "হুঁঃ বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে। সতী, ছেলের মত ছেলে বটে, মুখে কথাটি নেই, ওর মত হতে চেষ্টা কর দেখি।"

অনিমেষ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল "যে আজ্ঞে।" মামা স্থূলদেহখানি উঠাইয়া বলিলেন "উঠে. পড় সব, সতী ওঠ।" অনিমেষ, মামার দামী শাল খানির একপ্রান্তে মুখ মুছাইয়া বলিল "হাঁ সতী ওঠ, আর দেরী নয়।

মামা বলিলেন "শালখানা কে যেন টান্‌লো মনে হলো!

অনিমেষ নিবিষ্টচিত্তে একখানি ছবি দেখিতে লাগিল।

৩

পিসিমা রন্ধন-গৃহের দ্বারে আসিয়া বলিলেন "নাও ওঠ, ওদিকে বাইরের লোকজন সব এসে পড়ল। রান্না-বান্না করা কি তোমাদের পোষায়, যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড তোমাদের!"

সরিত একটা চপ্ মুখে পুরিয়া বলিল "চপ্ গুলো শেষ ক'রে নিই তো তারপর উঠ্‌ব খ'ন। দেখি পুডিংটা ঠিক জমল কি না।" বলিয়া ঢাকা খুলিয়া পুডিং দেখিতে গেল। পিসিমা বলিলেন "ওটা কি হল? রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে খাওয়া আবার সেই এঁটো হাতেই সব ঘাঁটা! এসব কি অনাছিষ্টি কাণ্ড বাছা!" সরিত পরম নিশ্চিতভাবে বলিল "ওটা টেষ্ট্ হল। কেমন হয়েছে দেখ্‌তে হবে তো?"

এমন সময় অরুণের কন্যা মিনা সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া নাক সিঁটকাইয়া বলিল "ওমা! পিসি তোমরা এখনও সাজ্‌গোজ্ কর নি?"

সরিত তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "ইস্ সাজ দেখে কে। জন্মদিন তোর, আমরা সাজ্‌তে যাব কেন?"

মিনা খুব কায়দা করিয়া সিল্কের রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে সেণ্টের গন্ধ ছড়াইয়া চলিয়া গেল! নন্দরাণী "ওমা কে আসছে ভাই" বলিয়া মাথায় কাপড়টা তুলিয়া দিল। পিসিমা রন্ধন গৃহের সম্মুখে বসিয়াছিলেন চাহিয়া দেখিলেন একটি দিব্য হাসামুখী তরুণী সেইদিকে আসিতেছে, পরণে একখানি ফিকে নীল রংয়ের শাড়ী, ব্লাউস্ ও সেই রংএর। কাণে দুইটি মুক্তার দুল, মুখখানি বড়ই সুন্দর, সরল!

সরিত মুখ বাড়াইয়া বলিল "এদিক পানে নয় গো ঠাকুরুণ, ঐ দিকে।"

তরুণী হাসিমুখে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "ইস্ একেবারে মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা যে!"

সরিত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল "আরে বা, গোড়ায় গলদ ক'রে ফেললি! অন্নেরই যে অভাব বরং—"

তরুণী বলিয়া উঠিল "বরং মাংসপূর্ণা কি ডিম্বপূর্ণা বল্লে চলে, কি বলিস্ ?"

সরিত হাসিয়া বলিল "যা বলেছিস্, তা এখানে না বসে ড্রয়িংরুমে যা না।" তরুণী একটা পিঁড়ি টানিয়া চৌকাঠের গোড়ায় বসিয়া বলিল "দরকার নেই, এখানেই বসি।"

সরিত বলিল "বৌদি এস, এঁর সঙ্গে ইন্‌ট্রোডিউস্ করিয়ে দি, ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী বিদ্যুৎলতা।" বাধা দিয়া বিদ্যুৎ বলিল "শ্রী আর কোথায় যে শ্রীমতী হব ?"

সরিত বলিল "যা যা আর ন্যাকাম করতে হবে না, ঢের হয়েছে। বৌদি ওঠ এবার, কাপড়টা ছাড়ি গিয়ে। আর ভূত সেজে থাকা যায় না, ঢের লোক এসে পড়েছে।

তাহারা বাহিরে আসিতেই বরুণ বলিল "এই যে সরি, তোকেই খুঁজছি, সতীন্দ্র এসেছে।"

সরিত কাপড় পিন্ করিতে করিতে বলিল "তা কি করতে হবে ?"

বরুণ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল "দেখা-করাটাও তো দরকার, তাই বল্‌ছিলাম।"

সতীন্দ্র নত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেই জেঠীমা তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন "থাক্ বাবা থাক্, আমাদের বাড়ী যে আবার এসেছ এও কত ভাগ্যি।"

ড্রইংরুমে লোকসমাগম দেখিতে দেখিতে, মৃদু হাসিয়া সতীন্দ্র বলিল "আস্‌ব না আর কেন।"

দূর হইতে তাহার সুগৌর সুন্দর মুখখানি দেখিয়া বিদ্যুৎ সরিতের কাণে কাণে বলিল "তোর ভাবিটি তো দিব্যি দেখ্‌তে!"

সরিত বিরক্ত স্বরে বলিল "নে আর বাজে বকিস্ না, ভাল লাগে তো নিজেই বিয়ে কর্ না। আমি স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিয়েছি।"

বিদ্যুৎ আশ্চর্য্যভাবে বলিল "এত সুন্দর তাও পছন্দ হল না।"

সরিত হস্তস্থিত গোলাপ ফুলটির ঘ্রাণ লইতে লইতে বলিল "পলাশফুল কিনা তাই বা কে জানে, সুন্দর হলেই তো আর ভাল হয় না।"

পিসিমা মুগ্ধনেত্রে সতীন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আহা ছেলে নয় তো যেন কার্ত্তিক! এমন ছেলেকে মায়ে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠায় নি কেন ?"

কথাটা সতীন্দ্রের কাণে গেল। তাহার ঠোঁটের কোণে একটা তীব্রবেদনার

রেখা ফুটিয়া উঠিল "আমার মা তো নেই" শুনিয়া জেঠীমার হৃদয় তাহার প্রতি সমবেদনায় ও ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। তাঁহার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকু দিয়া এই মা-হারার দুঃখ যদি ঘুচাইতে পারিতেন!

৪

পরাগ বলিল 'ওগো শুনছ, বিদ্যুতের যে বড় অসুখ।

বরুণ খবরের কাগজটা মুখের উপর হইতে নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "সে কি, কবে থেকে?"

পরাগ বলিল "পরশু থেকেই হয়েছে। অনিমেষবাবু বলে গেলেন, আজ খুব বাড়াবাড়ি, একবার নিয়ে চল না। অনিমেষবাবুর বাবাও এখানে নেই, কি কষ্ট।"

বরুণ কাগজটা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া বলিল "চল আজই যাই। কাকে দেখাচ্ছে? সরি জানে একথা?

পরাগ বলিল "না সে জানে না। আর জান্‌লেও যাবে কি ওদের বাড়ী?"

বরুণ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "যাবে না কেন? সতীন্দ্র তো ওর কাছে কোন দোষ করে নি, তবু ওর উপর এত বিরক্তি কেন?"

পরাগ নখ খুটিতে খুটিতে বলিল "থাক্, বলে কাজ নেই; রেগে যাবে শেষে।

বাহিরে সরিতের পদশব্দ শুনা গেল। বরুণ ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল সে বাহিরের বেশে কোথায় যাইতেছে, জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাচ্ছিস? বিদ্যুতের অসুখ জানিস্?"

সরিত গম্ভীরভাবে "হাঁ জানি" বলিয়া নীচে নামিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে বরুণ দেখিল, জানালার সম্মুখে টেবিলের উপর হাত রাখিয়া তাহাতে কপোলবিন্যস্ত করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া সতীন্দ্র বসিয়া আছে। সম্মুখে বাতিদানে একটা মোমবাতি জ্বলিতেছে, তাহার ম্লান আলোকে সতীন্দ্রের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় পরাগ শিহরিয়া উঠিল।

অনিমেষের মা বিদ্যুতের শিয়রে বসিয়া অডিকলোন দিতে ছিলেন। পরাগ তাঁহার হস্ত হইতে সিক্ত বস্ত্রখণ্ডটি লইয়া বিদ্যুতের উত্তপ্ত ললাটে দিল। বরুণ মাটির উপর হইতে আইসব্যাগটা তুলিয়া নিয়া বলিল "বরফ, বরফ নেই আর?"

মাসীমা বলিলেন "এইমাত্র আন্‌তে গেল।"

বরুণ সতীন্দ্রকে বলিল "যতক্ষণ ডাক্তার না আসেন তুমি নিজে দেখ।"

সতীন্দ্র হাসিল। এমন সময় তাহার মুখে হাসি দেখিয়া বরুণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সতীন্দ্র তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "খুব আশ্চর্য্য, না ?"

সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনা গেল। বরফ লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে অনিমেষ ও তৎপশ্চাতে ডাক্তার আসিয়া প্রবেশ করিলেন। অনিমেষ বরফ রাখিয়া বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ্ টিপিয়া দিল। বরুণ বরফ আছ্ড়াইয়া ক্ষিপ্রহস্তে কতকটা আইস ব্যাগে পুরিয়া পরাগের হস্তে দিল। ডাক্তার বলিলেন "ওতে হবে না সেঁক্ দিন।"

ডাক্তার বাহিরে গেলেন, বরুণও সঙ্গে গেল। ডাক্তার বলিলেন "আর কেন, সবই তো শেষ হয়ে গেছে।" বরুণ এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া বলিল এত শীঘ্র ?

ভোরের আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেই আধআলো আধছায়াময় আকাশের পানে চা'হিয়া ডাক্তার উদাসকণ্ঠে বলিলেন 'হাট ফেলিওর'।

৫

বিয়ে করাই মানুষের ভুল। এই তো এক মাসও হল না এরি মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। এই জন্যে বিদ্যুতকে পর্ পর্ ক'রে করে বিয়ে কর্‌তে বারণ ক'রে ছিলাম।

পরাগ অশ্রুসিক্ত চক্ষে সরিতের পানে চাহিয়া বলিল "একটু কষ্টও কি হয় না, এতদিন একসঙ্গে পড়েছ ? কি কষ্ট সতীন্দ্রবাবুর।" সরিত বিদ্রুপমাখা স্বরে বলিল "কষ্ট! কষ্ট আবার কি ? দুদিন পরে একটা বিয়ে ক'র্‌বেখন। তার আবার কিসের কষ্ট ? নিশ্চয় সে বিদ্যুতের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার কর্‌ত নইলে এত শীঘ্র—" চোখের জল মুছিয়া পরাগ বলিল "একজনের নামে মিথ্যা অপবাদ দিও না সরিত। এক সময়ে তুমিই আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিলে কিন্তু তোমার ব্যবহারে আজ তোমার উপর—"

সরিত বলিল "ঘৃণা হচ্ছে ? তা হোক। আমি লজ্জা ঘৃণা ভয় বিসর্জ্জন দিয়েছি। আমি সত্যি কথা বল্‌ব তাতে কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

পরাগ বলিল "কেউ সাহসও করবে না কিন্তু জান সরিত নম্রতাটাই মেয়েদের প্রধান গুণ।

সরিত মুখ বিকৃত করিয়া বলিল "তা জানি। নম্র অর্থাৎ কিনা পুরুষের

পায়ের তলায় পড়ে থেকে তাদের বর্ব্বরতার প্রশ্রয় দেওয়াটাই হল মেয়েদের প্রধান গুণ।"

নন্দরাণী নিম্নস্বরে বলিল "আগে তো এমন ছিলে না।"

সরিত ঝঙ্কার দিয়া বলিল "জগত পরিবর্ত্তনশীল। আগে যা ছিল এখন তা তো থাকতে পারে না।"

পরাগ বলিল "তোমার মাথায় একি ঢুকেছে? সব দোষই কি পুরুষদের? সরিত বলিল "তোমরা বিয়ে করেছ, তোমাদের এ নিন্দে সইবে কেন। থাক সুখে থাক, আমি কোনও কথা বলতে চাই না"

সরিত সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পরাগ ও নন্দরাণী নির্ব্বাক হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।

সরিত ঘরে গিয়া দেখিল, তাহার কতকগুলি চিঠিপত্র রহিয়াছে। সে যে বালিকা বিদ্যালয়ে আবেদনপত্র পাঠাইয়া ছিল তাহা মঞ্জুর হইয়াছে। মাহিনা ৭০ টাকা। সে সসম্মানে প্রথম বিভাগে বি এ পাশ করিয়াছে।

অরুণ আসিয়া বলিল "তোর চাকরী করবার কি দরকার? বাবা রয়েছেন, কাকা রয়েছেন. আমরা রয়েছি, টাকার কি কিছু অভাব আছে? যা দরকার হয় বললেই পারিস্।"

সরিত গম্ভীর মুখে বলিয় "আমার ইচ্ছা, তা ছাড়া চিরকাল অন্যের ঘাড়ে চেপে থাওয়াও যায় না।"

অরুণ বলিল "আমরা কি তোর পর?" সরিত বলিল "আমি একাজ করবই বাধা দেওয়া বৃথা।" অরুণ বলিল "তবে যা ইচ্ছে হয় কর কিন্তু লোকের মুখ তো আমরা বন্ধ করতে পারব না।"

সরিত বলিল "বেশ, অপমান বোধ কর তো বোর্ডিংএ চলে যাব।"

অরুণ নির্ব্বাক।

৬

"সরিত শুনলাম নাকি তুই ব্রাহ্ম হবি?"

সরিত হাতের সেলাইটা নামাইয়া বলিল "হাঁ"; বরুণ একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল "ভাল ক'রে ভেবে দেখেছিস্, এটা ভাল হচ্ছে কি না

সরিত সোজা হইয়া বসিয়া চড়াগলায় বলিল "ভাল কি মন্দ সেটা আমি বুঝ্‌ব তোমাদের তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

বরুণ বলিল "কা'জ করে ভাবার চেয়ে ভেবে কাজ করা ভাল এটা মানিস্‌ তো?"

সরিত স্থির দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "তুমি কি বল্‌তে চাও বল তো?" বরুণ বলিল "দেখ্‌, কদিন থেকে দেখ্‌ছি তুই খুব বাড়াবাড়ি কর্‌ছিস। যখন যা মাথায় আস্‌ছে তখনি না ভেবে-চিন্তে তাই কর্‌ছিস। এর পরিণাম যে কি তা ভেবে দেখেছিস্‌?"

সরিত বলিল "প্রয়োজন বোধ করি নি।"

বরুণ বলিল "করিস্‌ নি কিন্তু এমন একদিন আস্‌বে যখন তোকে এর জন্ম অনুতাপ কর্‌তে হবে।"

সরিত বলিল "সেদিনের অপেক্ষায় বসে বসে রোদ্‌ পোহাতে থাক" বলিয়া সেলাইটা তুলিয়া পুনরায় তাহাতে মনোনিবেশ করিল।

বরুণ গম্ভীরভাবে বলিল "কেন হিন্দুধর্ম্মটা ছাড়্‌তে চাচ্ছিস্‌ ভাল করে বুঝিয়ে বল্‌ তো।"

সরিত আরক্তলোচনে বলিল "আমি এর জন্তে কোনও কৈফিয়ৎ দিতে পার্‌ব না, জান্‌লে গোড়া থেকে একটা নোটবুক সঙ্গে রাখ্‌তাম। আমি যা ভাল বুঝ্‌ছি তাই কর্‌ছি।"

বরুণ বলিল "হিন্দুসমাজের তো এই অবস্থা; দিনদিন ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। তা এ সময় নিজের ধর্ম্মটা ত্যাগ না ক'রে তার দোষ ত্রুটিগুলো দূর কর্‌বার চেষ্টা করাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?"

সরিত বলিল "এসব কথার জবাবদিহি আমি কর্‌তে পারব না।"

বরুণ বলিল "তোকে যা ইচ্ছা তাই করতে মত দিয়েছি তা বলে এতটা কি করা উচিত?"

সরিত বলিল "মত দেবার না-দেবার তুমি কে? তুমি ভণ্ড, মেয়েদের হিতৈষী সেজে বেড়াও কিন্তু যেই দেখ, তারা সব বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর তোমাদের কোন তোয়াক্কা রাখ্‌ছে না, অমনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠ। তোমায় এতদিন চিন্‌তে পারি নি, আজ চিন্‌লাম। বাইরেরই যত সব ভড়ং, আসলে কিছুই না!"

বরুণ কিছু বলিল না একটু হাসিয়া উঠিয়া গেল। পরের সপ্তাহে রবিবারে সরিত ঘোর আরক্ত মুখে মন্দির হইতে ফিরিল। পরাগ জিজ্ঞাসা করিল

"ব্যাপার কি?" সরিত বলিল "সব ভণ্ডামি, সব ভণ্ডামি, আসল মনের খোঁজ কেউ নেয় না কেবল বাইরের ভড়ংই সব। আসল ধর্ম কি বাইরের অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে? দীক্ষা আমি নেব না, বাইরে লোক দেখান অনুষ্ঠানকে আমি ঘৃণা করি—প্রাণের সঙ্গে মনের সঙ্গে, ঘৃণা করি।

"আমিও তাই করি" বলিয়া বরুণ আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। সরিত বলিল, "তোমায় সেদিন অনেক গালাগাল দিয়েছি ছোড়্‌দা কিছু মনে কর না"

বরুণ বলিল 'দূর বোকা, আমি যে তোর ছোড়্‌দা।"

৭

রন্ধনকার্য্যের কি একটা বিষয়ে গভীর গবেষণা করিবার জন্য সরিত জেঠীমার ঘরে চলিয়াছিল সহসা 'বরুণ' বলিয়া ডাকিয়া কে একজন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। উঠানের সেই অংশটা সন্ধ্যার অন্ধকারে ছায়াবৃত হইয়াছিল আগন্তুককে চিনিতে না পারিয়া সরিত জিজ্ঞাসা করিল "কে?"

আমি "সতীন্দ্র" বলিয়া আগন্তুক সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। ঘর হইতে তীব্র বৈদ্যুতিক আলো বাতায়ন-পথে সম্মুখস্থ দালানে আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই আলোকে শুভ্র পরিচ্ছদ পরিহিত সতীন্দ্রের অতি শুভ্র মুখের পানে চাহিয়া সরিত নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছইমাসের মধ্যে মানুষের এতটা পরিবর্ত্তন হইতে পারে ইহা তাহার স্মরণ ছিল না। সুক্ষাগ্র নাসিকা ও উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় ভিন্ন আর কিছুই সে শীর্ণ মুখে দৃষ্ট হয় না! বর্ণের অতি শুভ্রতা তাহাকে ক্ষোদিত মূর্ত্তির আকার দিয়াছিল।

জেঠীমা আসিয়া পড়িলেন, সরিতও নিষ্কৃতি পাইয়া "আস্‌ছি" বলিয়া চলিয়া গেল।

বরুণের ঘর হইতে সতীন্দ্রের কণ্ঠস্বর বড়ই হতাশাপূর্ণ হইয়া ধ্বনিত হইল "খুব দূরই যাচ্ছি, ফেরাবার কেউ থাকলে বোধ হয় যেতাম না।"

সরিতের মনে পড়িল সতীন্দ্রের মাসীমাও আর ইহলোকে নাই। রাত্রে শুইয়া সরিত সন্ধ্যার কথাই চিন্তা করিতেছিল, বরুণের কণ্ঠস্বর শুনা গেল "সরির জন্যই সে দেশ ছাড়্‌ছে।" পরাগ ও নন্দরাণী সমস্বরে বলিল "আহা।"

পূর্ব্বাকাশে সবেমাত্র রক্তিম রাগ ধরিয়াছে, প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ুতে নিদ্রাহীন উত্তপ্ত মস্তিক শীতল করিবার জন্য সরিত বাগানে আসিয়া ধীরে ধীরে বেড়াইতে আরম্ভ করিল। অজস্র শিউলী ফুল ফুটিয়া সুমিষ্ট গন্ধে বাগানটা ভরপুর করিয়া

রাখিয়াছিল, তাহারই কতকগুলি তুলিয়া লইবার জন্ম নিকটস্থ হইতেই কিছুদূরে খস্ খস্ শব্দ হইল। সরিত চাহিয়া দেখিল মিনা হেঁট হইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কি তুলিতেছে। কাছে আসিয়া বলিল "কিরে, এত ভোরে কি তুল্‌ছিস ?"

মিনা একগোছা দূর্ব্বা ঘাস ছিঁড়িয়া একখানি ছোট রেকাবীতে রাখিতে রাখিতে বলিল 'আর বল কেন, ভোরে না উঠ্‌লে কি স্বস্তি আছে ? সব উদ্যোগ্‌ আয়োজন কর্‌তে কর্‌তেই বেলা বেড়ে উঠ্‌বে। দূর্ব্বো কটি তুলে রাখ্‌ছি সকাল সকাল, তারপর ধান চাই, খাবার দাবার গোছান চাই, অফুরন্ত কাজ।"

সরিত হাসিয়া বলিল "কিসের এত আয়োজন রে ?"

মিনা বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া বলিল "ভাইফোঁটার গো ভাইফোঁটার, এক পাল ছেলে মেয়ে আছে তাদের বারমাসে তের পার্ব্বণের হাঙ্গামা পোয়াতে পোয়াতে অস্থির।"

সরিত তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। মিনা বলিল "দুটো দূর্ব্বো তোল না গো পিসি, এক পাল ভাই আমার, তাদের কতঘাসই যে লাগ্‌বে তা জানি না।"

সরিত ইতিমধ্যে মনে মনে কি একটা ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, বলিল "এক কাজ কর দেখি, আর একটু বেশী ক'রে দূর্ব্বো তোল্, আমিও ভাইফোঁটা দেব।

মিনা লাফাইয়া উঠিল "সত্যি পিসি, সত্যি দেবে তুমি ?"

সরিত বলিল "হাঁরে সত্যি না ত কি মিথ্যে।"

মিনা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মহা উৎসাহে দুই হাতে চড়্ চড়্ করিয়া দূর্ব্বা ছিঁড়িতে লাগিল। মালী আসিয়া বকাবকি লাগাইয়া দিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল "দিদিমণি চা খাইবা না ? মা ডাকুছি।"

মিনা বলিল "ডাকুছি তো ডাকুছি।"

* * * *

সতীন্দ্র সরিতকে আপনার করিয়া লইতে চাহিয়াছিল কিন্তু সে যে ভাবে চাহিয়াছিল ঠিক সেই ভাবে পাইল না। খোলাচুলে একখানি লালপাড় সাদা শাড়ী পরিয়া ধান দূর্ব্বা চন্দন রেকাবীতে সাজাইয়া সরিত যখন আসিয়া দাঁড়াইল তখন গোধূলির স্নিগ্ধ আলোকে তাহাকে কল্যাণময়ী ভগিনী মূর্ত্তিতে বড় মনোরম, বড় পবিত্র দেখাইল।

সতীন্দ্রের ললাটে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা দিয়া পায়ের গোড়ায় একটা প্রণাম করিয়া সরিত সহাস্যে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "আশীর্ব্বাদ কই ?"

সতীন্দ্রের সৌম্য আনন জ্যেষ্ঠের অব্যক্ত স্নেহাশীষধারায় কল্যানপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া বিশ্বের ভগিনীকে অভিনন্দিত করিল। ঘরের ভিতর হইতে শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে মিনা আসিয়া বলিল "হল না গো তোমাদের ? মেয়েগুলো যে অস্থির হয়ে উঠ্‌লো খিদেয়। ভাইকে ফোঁটা দিয়ে তবে খেতে পাবে নইলে যে অমঙ্গল হবে।"

কাছের পাওনাকে নিয়ে, বাসনার যে দুঃখ তাই—পশুর।

দূরের পাওনাকে নিয়ে, আশঙ্কার যে দুঃখ, তাই—মানুষের।

"রক্তকরবী"



আঁখি



—শ্রীবিজয় সেন গুপ্ত।

১

তিন বছরের শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে এসে প্রতিভা বল্‌লে—যতীনদা, বিয়ে করবে ?

যতীন একটু অবাক্ হয়ে বল্‌লে—তার মানে ?

সে খোকাকে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলে।

খোকাকে তার হাতে দিয়ে প্রতিভা বল্‌লে—মানে আবার কি ! বিয়ে করবে, তার আবার মানে জিজ্ঞাসা করতে হয় ? এত বোঝ, আর এটা বুঝ্‌লে না ?

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য অবলম্বন ক'রে যতীন বল্‌লে—হয়তো না। আর একটু স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বল।

আমরা বাপু তা হলে লেখাপড়া না শিখে ভালোই আছি—বলে প্রতিভা যতীনদা'কে জানিয়ে দিলে, তার সন্ধানে একটি সুন্দরী মেয়ে আছে, খাসা দেখ্‌তে—একবারে নিখুঁত—যতীনদা'র তাকে বিয়ে করতেই হবে।

তাকে রাগাবার জন্যে যতীন তেমনি গম্ভীর ভাবেই বল্‌লে—তা যা বলেছ ; বিয়েটা না করলে আর চল্‌ছে না।

পরিহাস বুঝ্‌তে পেরে প্রতিভা চটে গিয়ে বল্‌লে—তোমার কেবল ঐ-ই তো জানা আছে। ঠাট্টা করতেই শিখেছ কেবল। এ বিয়েতে যদি অমত কর, তা হলে আমি তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না, বলে রাখ্‌ছি।

খোকার ছোট হাতদুটি নিয়ে খেলা করতে করতে যতীন বল্‌লে—কিন্তু এ রকম হঠাৎ আক্রমণের হেতুটা কি শুনতে পাই নে ?

এইবার শান্ত হয়ে প্রতিভা জবাব দিলে—সত্যি যতীনদা' আর তোমার বিয়ে না করলে মানায় না। খুড়ীমা কত দুঃখ করেন !

শেষের কথাগুলো ভাল ক'রে শেষ না হতেই হো-হো ক'রে হেসে যতীন বল্‌লে

—দেখ, আমি সব সইতে পারি, কিন্তু তোমার ঐ রকম গম্ভীর হওয়া সইতে পারি নে।

তা পারবে কেন? আচ্ছা, আগে বৌদি আসুক, তারপর দেখা যাবে—' বলে প্রতিভা খোকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—আয় খোকা, আমরা যাই, ও বড় দুষ্টু!

খোকা কিন্তু এল না। হেসে যতীন বললে—দেখ্‌লে, ও ঠিক আমার কথা বুঝেছে, তাই যেতে চাইছে না। আর দোহাই তোমার, এমনি তোমার শাসনেই তো বাঁচি নে, এর ওপর আবার বৌদি-আনার মতলব এখন ছেড়ে দাও। যখন তোমার বৌদি আনব, তখন কি আর তোমাকে না জানিয়েই আনব?

আচ্ছা সে দেখা যাবে—'বলে খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে একটু বাঁকা দৃষ্টি ক্ষেপণ ক'রে প্রতিভা চলে গেল।

এদের দু-জনের সম্বন্ধটা একটু অদ্ভুত। যতীন প্রতিভার চেয়ে আট বছরের বড়, তাই প্রতিভা তাকে 'যতীনদা' বলে। তবু এদের মধ্যে এমন একটি সখ্য বর্তমান ছিল, সেখানে বয়সের পক্ষে অন্তরায় হওয়া সম্ভব ছিল না। ছোট বেলার হাসি-কান্নার মধ্যে যে-বন্ধুত্ব, বয়সের কোনো হিসাব না নিয়েই দিনে-দিনে বেড়ে ওঠে, এ সেই বন্ধুত্ব। এতে মনের এমন একটা দিক মাধুর্য্যে ভরিয়ে রাখে, যার জোড়া আর পরবর্তী জীবনে মেলে না।

প্রতিভা চলে যাওয়ার পর যতীন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। তার একে একে মনে পড়্‌ল কত কথা, সে সব কথার কাজের তালিকায় কোনো হিসাব নেই, অথচ যাদের বাদ দিলে জীবনের খাতার অনেক অংশই শূন্য হয়ে যায়। এ সেই সব নিরর্থক অর্থে-ভরা কথা।

প্রতিভার বিয়ের কথা যতীনের মনে পড়্‌ল! সেদিন তার কাছে জীবনটা যেন একেবারে বিস্বাদ হয়ে উঠেছিল, যার সম্ভবনা সে আগে কখনো মনেও করতে পারে নি। সে বারে বারে ভাবতে চেষ্টা করত প্রতিভাকে তার বোনের মতো দেখা উচিৎ, কিন্তু প্রতিবারেই চিন্তা আপন গতিতে এমন পথে চল্‌ত যে, সে আপনাতে আপনি লজ্জিত হয়ে পড়্‌ত। একদিকে শূন্যতার অনুভূতি আর একদিকে এই লজ্জা তাকে যেন পাগল ক'রে তুল্‌ত।

তারপর দিনে-দিনে গভীর বেদনা ক্রমে নিবিড় শান্তিতে পরিণত হয়ে গেল; জেগে রইল কেবল একটি অপরূপ সখ্য যা তাকে সকল লজ্জা থেকে অব্যাহতি দিলে। আর তার প্রতিভার সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা কইতে বাধা রইল না।

নিজের মধ্যে এই অবস্থাটি আজ উপলব্ধি ক'রে যতীন একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে। সে বুঝ্‌লে এই জন্যেই প্রতিভা যখন তাকে বিয়ের কথা বল্‌লে, তখন তার পক্ষে কথাটাকে অত সহজ ক'রে গ্রহণ করা সম্ভব হ'ল।

সে আবার "বিবাহের ইতিহাস" পড়্‌তে বস্‌ল। আধুনিক বিবাহ-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ তাকে লিখ্‌তে হবে, তাই সে ওয়েষ্টার মার্কের বইখানা পড়্‌ছিল।

ঘণ্টাখানেক বাদে পড়া শেষ ক'রে যতীন ভেতরে গিয়ে ডাকুলে—মা।

ভাঁড়ার ঘর থেকে মা উত্তর দিলেন—কেন? কি বল্‌ছিস?

তুমি বুঝি প্রতিভাকে আমার পেছনে লাগিয়ে ছিলে?

মা একটু অবাক্ হয়ে বল্‌লেন—কেন, সে কি বল্‌লে?

বল্‌বে আর কি, বিয়ে করার জন্যে আবদার!

না বাপু, আমি বলি নি, আমি কেবল বলেছিলুম, তুই পড়ার ঘরে আছিস্। অনেকদিন পরে এসেছিল; বল্‌লে—খুড়ীমা, যতীনদা' কোথায়? তাই বল্‌লুম! আর কিছু তো বলি নি।

মা কখনো বেশী কথা বল্‌তেন না; তিনি আবার তাঁর কাজ সুরু ক'রে দিলেন। মৃদু হেসে যতীন বল্‌লে,—ওটা তবে ওরই দুষ্টুমি!

২

মাসখানেক বাদে একদিন যতীন প্রতিভাদের বাড়ী গিয়ে ঘরে ঢুকেই প্রতিভার স্বামী সুনীলবাবুকে দেখে বল্‌লে—চমকে উঠ্‌বেন না, সুনীলবাবু!

সুনীলবাবু "মার্কাস অরেলিয়াসের আত্মচিন্তা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কে, যতীন? এসো খবর কি?

কাছেই প্রতিভা বসে খোকাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। যতীন পকেট থেকে একখানা রঙিন খাম বার করতেই সে তাড়াতাড়ি খোকাকে দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট ঝিয়ের কোলে দিয়ে এসে খপ্ ক'রে যতীনের হাত থেকে খামখানা নিয়ে খুলে ফেল্‌লে। তারপর একবার তার ওপর চোখ বুলিয়েই বলে উঠ্‌ল,—ওমা, যতীনদা' তোমার বিয়ে!

সুনীলবাবুও বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন,—তাই নাকি?

এই দেখই না—বলে প্রতিভা স্বামীর হাতে চিঠিখানা দিলে।

যতীন প্রশান্ত হাস্যে প্রতিভার দিকে চেয়ে রইল।

প্রতিভার চোখে যে-আনন্দের আলো দেখা দিয়েছিল, সেটা পর-মুহূর্তেই

মিলিয়ে গেল। সে অভিমান-ভরা স্বরে বল্‌লে—তবে এই না সেদিন আমায় বললে, বিয়ে করবে না এখন ?

হাসি মুখে যতীন বল্‌লে, আগে আমার কথা শোনো, তারপর রাগ কোরো। সে-দিন খবর পেলুম, এক ভদ্রলোক কন্যাদায়ে ভারী বিব্রত, শীগ্‌গীর মেয়ের বিয়ে না দিলে জাত যাওয়ার সম্ভাবনা; অথচ এত গরীব যে, খেতেই কুলোয় না। তাই ভাবলুম, অনেকদিন তো এ-সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলা গেল, একটা না হয় কাজেই ক'রে ফেলা যাক্, কি বলেন সুনীলবাবু ?—বলে সে উত্তরের প্রতীক্ষায় সস্মিতমুখে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

সোৎসাহে মাথা নেড়ে সুনীল বাবু বল্‌লেন—এ তো খুব ভাল কথা!

প্রতিভা কিন্তু মোটেই সে পথে গেল না, সে বলে উঠ্‌ল,—তার চেয়ে বল্ না কেন, বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল! অথচ আমি যখন বল্‌লুম, তখন—

অভিমানে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল।

যতীনের এই বিয়ে করার আরো একটা কারণ ছিল, যা এদের কারো কাছে তার প্রকাশ করা চলে না। প্রতিভা সেদিন আসার পর যখন সে বিকালবেলা নিরিবিলিতে তার সকল কথা আলোচনা কর্‌তে বস্‌ল, তখন সে আহত হল এই দেখে যে, কিছুক্ষণ আগে সে তার মনের সব মলিনতা কেটে গেছে মনে ক'রে যে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করছিল, তাতে তার সম্পূর্ণ অধিকার হয় নি। এখনো যেন আবিলতা রয়ে গেছে একটু! এখনো তার বিয়ের কথা মনে কর্‌তে গেলেই প্রতিভার কথা মনে পড়ে, বিয়ে আর প্রতিভা এই দুটি কথা যেন আজো তার মনে এক সূত্রে গাঁথা হয়ে আছে।

এটা তাকে অত্যন্ত আঘাত দিয়ে গেল। তাই যখন সে এই দরিদ্র ভদ্রলোকটির সন্ধান পেল, তখন সে তাঁর প্রতি দয়াও বটে, আবার নিজের কাছে মুক্তি পাবার জন্যেও বিয়ে করবে স্থির ক'রে ফেল্‌লে।

তাকে নীরব দেখে প্রতিভা ফের বল্‌লে—আমি জানতুমই এই রকম করবে তুমি, কেবল আমি বল্‌তে গেলেই দোষ!

সুনীলবাবু বল্‌লেন—এ তোমার অন্যায় কথা প্রতিভা। তখন ও ঠিকই ক'রে রেখেছিল ঐ রকম; কিন্তু এটা যে কত বড় কাজ ও করছে, সেটা তুমি দেখ্‌ছ না কেন ?

বেশ, তুমিও যতীনদার দলে। তা হবেই তো! আমারি যত দোষ ?

সুনীলবাবু বুঝিয়ে বল্‌লেন—তুমি বুঝ্‌ছ না—

অন্তরে তার হঠাৎ কি যেন বিষের জ্বালা সুরু হয়েছিল, যার তাড়নায় প্রতিভা উঠে পড়ে বল্‌লে—বেশ, তোমরা যা হয় কোরো, আমি ও বিয়েতে যেতে চাইনে, সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মানুষের মনের কোনো হাদিস্ পাওয়া যায় না। প্রতিভাই একদিন, যতীন-দা'কে বিয়ে করতে কত অনুরোধ করেছিল, আর আজ সেই খবরেই তার মনের ভেতর বিষম টানা-হেঁচ্‌ড়া পড়ে গেল কেন, তা কে বল্‌বে?

একটা দুর্জ্জয় রাগ তার মনে আসন পেতে বস্‌ল, এবং সেটার কোনো সুনির্দ্দেশ্য হেতু খুঁজে না পাওয়ায় তার সমস্ত আক্রোশ পড়্‌ল তার নিজেরই ওপর। যতীদা' তার মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করে নি বলে তার ওপর অভিমান হয়েছিল সত্যি, কিন্তু তার পরিমাণ কতটুকু! এ রাগের মূলে যে সে কথা নেই, তা সে নিজেই বুঝ্‌লে।

অথচ—

যতীনদা' বিয়ে করবে, সে তো ভালই! এই কথাটি সে বারে বারে মেনে নিতে চাইলে, কিন্তু মন কিছুতেই সায় দিলে না; বরং এতে তার অন্তরের জ্বালা আরো বেড়ে উঠ্‌ল।

সুনীলবাবু ঘরে ঢুকে বল্‌লেন—যতীন চলে গেল, আমিও বেরুচ্ছি। ছড়িটা কোথায় আমার?

প্রতিভা বল্‌লে,—জানি নে।

সুনীলবাবু চলে গেলেন।

পাশের ঘরে খোকা কাঁদ্‌ছিল। একবার সেদিকে চেয়ে দারুণ বিরক্তিতে প্রতিভা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল।

আপত্তি

—শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

রুগ্না স্ত্রীর শিয়রে বসে বসে নিমেষ ভাবছিল—এখন কি করা যায়! সঞ্চিত অর্থ তার যা ছিল, তা ত সবই ফুরিয়েছে—ডাক্তারের ভিজিটের প্রায় পঞ্চাশ টাকা বাকী, ঔষধের দোকানেও খুব কম ক'রে কোন্ না পঞ্চাশ ষাট টাকা হবে। এ সমস্ত সে শোধই বা করবে কেমন ক'রে; আর ভবিষ্যতে রোগ না সারা পর্য্যন্ত তার স্ত্রী ও ছেলের চিকিৎসাই বা সে চালাবে কেমন করে?—

আজ দু বছর থেকে তার স্ত্রীকে যক্ষায় ধরেছে। এবং একমাত্র পাঁচ বছরের ছেলেটারও দেহে আজ প্রায় এক বছরেরও উপর কালাজরের নির্ম্মম বীজ যেন শিকড় গেড়ে বসেছে। তার উপর আবার একটা হাত ও একটা পা তার পক্ষাঘাতে পঙ্গু!

মাত্র তিরিশ টাকা মাহিনার কেরাণী হয়েও সে আজ পর্য্যন্ত জীবনে যা কিছু সঞ্চয় করেছিল তার সবই আজ এদের এই রোগের চিকিৎসায় খরচ হয়ে গেছে। আফিসে এক মাস ছুটি নিয়ে ছিল, তাও আজ কদিন হল ফুরিয়েছে। এ ক'দিন ত সে সাহেবের বিনা অনুমতিতেই কামাই করেছে। তাই সে মনে মনে ভাবছিল, এখন কি করা যায়!—আচ্ছা, এমনি যত অর্থহীনের ঘরেই কি যত রোগের আবির্ভাব হয়?—ভগবান কি একবারও ভেবে দেখেন না, যে দুবেলা পেটপুরে খাবার পয়সা যারা পায় না, এত দীর্ঘকালের চিকিৎসার পয়সা তারা পাবে কোথায়? তাও আবার সাধারণ জর-জালা নয়, যত সব বিদ্‌ঘুটে রোগ।

রাত্রের অন্ধকার তখন পৃথিবীর বুকে বেশ জমাট বেঁধে বসেছে। সেই আঁধার-রাতের নিবিড় স্তব্ধতার বুক চিরে চিরে একটা কালপেঁচা তার বিশ্রী কর্কশ কণ্ঠে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো। অদূরের নদীতীরের বৃহৎ বটগাছের মাথা থেকে কচি ছেলের করুণ কান্নার মত বুঝি একটা শকুনি শিশুর চীৎকার ভেসে আস্‌ছিল। নিমেষের বুকটা সে শব্দে একবার শঙ্কার দোলায় কেঁপে কেঁপে উঠে থেমে গেল।

ঘরের এক কোণে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছিল। তারই অস্পষ্ট আলোকে

সে দেখ্‌লো, অদূরের শয্যায় শায়িত তার পুত্র কয়েকবার যেন কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় হাতখানা নেড়ে একটা কাতর আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌লো।

নিমেষ উঠে এসে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌লে— কি বাবা?

উঃ বড় গা জ্বল্‌ছে একটু জল—

পাশের পিতলের গেলাসটা থেকে তার মুখে এক ঢোক জল ঢেলে দিয়ে নিমেষ বল্‌লে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো?

না,—মা! বলে সে আবার পাশ ফিরে শুলো এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন অচৈতন্যের মত ঝিমিয়ে পড়্‌ল।

ওদিক থেকে স্ত্রীর কাশির শব্দে ছুটে গিয়ে নিমেষ জল-ভরা সরাখানা তার মুখের কাছে তুলে ধর্‌লো। খানিকটা তাজা রক্ত তুলে তাতে ফেলে দিয়ে সে আবার অবসন্ন হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়্‌ল।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিমেষ রক্তের সরাখানা মাটিতে নামালে তারপর সেই সরার রক্তের পানে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে সে হাত-পাখাখানা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে স্ত্রীর মাথায় বাতাস কর্‌তে লাগ্‌লো।

তার চোখ দুটো যেন সহসা একবার জ্বালা ক'রে উঠ্‌লো। কিন্তু অশ্রু ত তা থেকে এক বিন্দুও পড়্‌ল না! অতিরিক্ত পীড়নের তপ্ত জ্বালায় তার ভিতরের সমস্ত অশ্রুই বুঝি শুকিয়ে উঠেছিল।

অধিক দুঃখের মুহূর্ত্তে কাঁদ্‌বার অক্ষমতাটা যে মানুষের বুকে কতটা তীব্র বেদনার সৃষ্টি ক'রে তা কেবল ভুক্তভোগীই জানে!—

নিমেষ চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লো, অবসাদে মুদ্রিত তার স্ত্রীর চোখদুটির উপর যেন তন্দ্রা তার মোহন পরশটুকু ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিয়ে গেল।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পাখাটা নামিয়ে রাখ্‌তেই তার কানে এসে আবার তার পুত্রের আর্ত্তনাদ বাজ্‌লো,—ওমা, মাগো!

তাড়াতাড়ি পুত্রের পাশে উঠে এসে সে দেখ্‌লো, বালকের পাণ্ডুর দুটি গাল বেয়ে ধারার পর ধারা অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ছে!

সস্নেহে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সে বল্‌লে, কি হচ্ছে বাবা?

অত্যন্ত ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে কর্‌তে বালক বল্‌লো,—বড় কষ্ট! উঃ!—

জ্বরের তাপ অনুভব ক'রে নিমেষ বুঝ্‌লো, জ্বরটা তার যেন একটু বেশীই বেড়েছে এবং অস্থিরতাও পূর্ব্বের চেয়ে একটু অধিক। এত কান্নাও সে আজ এক বৎসরের মধ্যে কখনও দেখে নি!

থার্মোমিটারের সাহায্যে টেম্পারেচার নিয়ে সে দেখ্‌লো—১০৪॥০। মাথার রুক্ষ চুলের মধ্যে দিয়ে হাতের কয়েকটা শীর্ণ আঙ্গুল চালাতে চালাতে নিমেষ ভাবলো, হঠাৎ এত জ্বর বাড়্‌লো কেন? ডাক্তারকে খবর দেব কি? তাই বা কেমন করে যাই? একে এত রাত্রি!—দু-দুটো রোগীকে এমন একা ফেলে রেখে কেমন করেই বা যাই? আর ডাক্তারের বাড়ী গিয়েই বা কি এমন ফল হবে? ডাক্তার হয়ত এখন ঘুমোচ্ছে—ডেকে ডেকে কোনো উত্তরই পাব না। এমনি অনেক কথা সে অনেক্ষণ ধরে ভাবতে লাগ্‌লো এবং অবশেষে সে ডাক্তারের বাড়ী যাওয়াই স্থির করলো।

ডাক্তারের দরজার কাছে এসে সে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—ডাক্তারবাবু!

ঠিক তার পায়ের কাছেই একটা কুকুর শুয়ে ছিল। হঠাৎ এতরাত্রে এই অপরিচিত কণ্ঠস্বরে কুকুরটা লাফিয়ে তার খালি পায় একটা কামড়্ বসিয়ে দিল। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। সজোরে একটা পদাঘাতে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিমেষ আবার চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—ও ডাক্তারবাবু!—

কুকুরের কর্কশ চীৎকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এমনি আর্ত্তকণ্ঠে অনেকক্ষণ চীৎকার করার পর, উপরের জানালা হতে ক্রুদ্ধ বিরক্ত কণ্ঠের জবাব এল—কে এত রাত্রে?

অত্যন্ত মিনতিভরা কণ্ঠে নিমেষ উত্তর দিল, আমি ডাক্তারবাবু!

আরও তীব্র বিরক্তির সুরে ডাক্তার উত্তর দিলেন—আঃ, এত রাত্তিরে আবার কি?

খোকা যে কেমন করছে ডাক্তারবাবু!

তা এত রাত্তিরে কি করব? জ্বালাতন! যাও, যাও, এখন কিছু হবে না; কাল সকালে যা হয় হবে। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে জানালাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

নীচে থেকে নিমেষ আর একবার চীৎকার ক'রে ডাক্‌লো, ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু একবারটি শুনুন!

কিন্তু ডাক্তারের কুকুরের সুতীব্র চীৎকারে সে আর্ত্ত করুণস্বর চাপা পড়ে গেল।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে নিমেষ বাড়ী ফিরে দেখ্‌লো, খোকা যেন আগের চেয়ে একটু সুস্থ শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তার মাথার পাশের বিছানাটা ও বালিশটা একেবারে বমিতে ভরে গেছে। বিশ্রী তার গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরে উঠেছে!

স্ত্রীর বিছানায় গিয়েও সে যা দেখ্‌লো তাতেও তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

মাথার বালিশের পাশে খানিকটা টাট্‌কা রক্ত পড়ে রয়েছে। আর তার অত্যন্ত অবসন্ন শীর্ণ দেহটা বিছানার সঙ্গে যেন একেবারে মিশিয়ে গিয়েছে। তাতে প্রাণের স্পন্দনের খুব অল্পই সাড়া পাওয়া যায়।

এমনি ক'রে একা দুজনের সেবা করে অন্য দিনের মতই সে তার সেদিনের বিনিদ্র রজনীটাও নির্ব্বিকার ভাবে কাটিয়ে দিল।

রাত্রি শেষ হতে না হতেই সে আবার ডাক্তারের বাড়ী ছুটলো। অনেকক্ষণ বসে বসে সে ডাক্তারের দেখা পেল বটে কিন্তু তিনি এলেন না। তিনি বলে দিলেন ভিজিটের বাকী টাকা শেষ ক'রে না দিলে তিনি আর রোগী দেখ্‌তে আস্‌বেন না।

কাঁধ-কাঁদ গলায় নিমেষ ডাক্তারের পা জড়িয়ে বল্‌লে, আপনার সব টাকা আমি শোধ ক'রে দেবো ডাক্তারবাবু।—দোহাই আপনার একবারটি আজ চলুন!

কিন্তু ডাক্তার সে কথায় কর্ণপাতও কর্‌লেন না। মটর হাঁকিয়ে তিনি এক বড় লোকের বাড়ী "কলে" বেরিয়ে গেলেন।

রাস্তায় আসতে আস্‌তে নিমেষ ভাবলো—সত্যিই ত; আমার পয়সা নেই—কেনই বা ডাক্তার আমার বাড়ী আস্‌বে? তারও ত এটা ব্যবসা? প্রতিজ্ঞা কর্‌লে—আর সে ডাক্তার ডাক্‌বে না। এমন ক'রে নিত্য প্রতিমুহূর্ত্তে অপমানিত, লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে চিকিৎসা না হওয়াই ভাল! আজ এতদিন ধরে কত পয়সা খরচ ক'রে সে ত তাদের চিকিৎসা করালো; কিন্তু কি ফল হ'ল তার? একটুও ভালর পথে তারা অগ্রসর হয়নি। বরং তারা দিনের পর দিন ক্রমান্বয়ে মন্দের পথেই এগিয়ে চলেছে। স্ত্রী তার আর কি বাঁচে? হাজার চেষ্টা কর্‌লেও আর কি সে বাঁচ্‌তে পারে? বাঁচ্‌বার সমস্ত শক্তিটুকু যার দেহ থেকে নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেছে—ওষুধ দিয়ে কি আর তাকে বাঁচানো যায়? কিন্তু—

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিমেষ ভাবলো, তবে কি তার স্ত্রী সত্য সত্যই মর্‌বে? এত দিনের তার প্রাণান্ত পরিশ্রম, জলের মত ক'রে এত অর্থ ব্যয়, রাতের পর রাত এমন বিনিদ্র চক্ষে তাদের শিয়রে বসে কাটান—সবই কি তার ব্যর্থ হবে? নিমিষের চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পথটা যেন একটা নিবিড় অন্ধকার ভরে উঠ্‌লো। হঠাৎ এক ভদ্রলোকের ঘাড়ে পড়্‌তেই সে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো,—দেখ্‌তে পান না নাকি মশাই?

কোনও উত্তরই না দিয়ে সে তার চলার পথেই এগিয়ে চল্‌ল।

স্ত্রীকে যে নিমেষ কত নিবিড়ভাবেই ভাল বাসতো তা শুধু তারা দুজনেই

বুঝ্‌তো। আজ তার একে একে মনে পড়্‌তে লাগ্‌লো—তাদের অতীত জীবনের কত ছোট-খাট প্রেমের কাহিনী। সামান্য কথা বার্ত্তা নিয়ে তাদের কত দিন কত দ্বন্দ্বই না হত; কিন্তু সে দ্বন্দ্ব মিটতেও আবার কয়েক মুহূর্ত্তের অধিক বিলম্ব হত না। পরস্পরকে যারা এত বেশী ক'রে ভালবাসে, তাদের মধ্যেই ত এমন সকাল সন্ধ্যায় শত সহস্রবার অভিমানের দ্বন্দ্ব বাধে।

সেই সমস্ত পুরাণ স্মৃতিগুলোকে মনের মধ্যে নাড়া-চাড়া ক'রে নিমেষ যেন আজ এত গভীর দুঃখের মধ্যেও একটু আনন্দের আভাব পেল।

একমাত্র ছেলেটি তাদের উভয়ের বড় আদরের ছিল। প্রথম যখন খোকা হল, তখন কত আনন্দেই না তা'দের উভয়ের তরুণ বুক দুটি কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। খোকার ভাতের সময় তিরিশ টাকা মাইনের কেরাণী হলেও নিমেষ তার সাধ্যের অতিরিক্তই খরচ করেছিল। এবং সে খরচটুকুও সে করেছিল—কেবল সেই আনন্দেরই আতিশয্যে।

এদের আজ তাকে হারাতে হবে! কিন্তু তবে সে বাঁচ্‌বে কেমন করে! পারবে না?—খুব পারবে।—পাঁচজনে যেমন করে বেঁচে থাকে, ঐ পথের ভিক্ষুকটাও যে আশায়, যেমন ক'রে বেঁচে আছে। ঐ অক্ষম পঙ্গুটাও যেমন ক'রে বেঁচে আছে—বিশ্ব-পরিত্যক্ত ঐ খঞ্জ আতুরটা যেমন ক'রে বেঁচে আছে—সেও ঠিক তেমনি করেই বেঁচে থাকবে। কিন্তু বেঁচেই বা তার লাভ কি?—কালই হয়ত ডাক্তার তার ভিজিটের টাকার জন্য লোক পাঠাবে, ওষুধের দোকান থেকে টাকার তাগাদায় লোক আস্‌বে, আজ তিন মাসের বাড়ী ভাড়া পনের টাকা বাকী, তার জন্যেও হয়ত কালই এসে তারা তাগাদা করবে—এবং ভাড়া না দিতে পারলে হয়ত বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। অবস্থার দোহাই দিলে তারা ত বুঝ্‌বে না! তারা যে এই সংসারেরই মানুষ!

বাড়ী ফিরে নিমেষ দেখ্‌লো, পীড়িত মাতা-পুত্র তখনও তেমনি নির্জ্জীবের মত বিছানায় পড়ে ঘুমাচ্ছে। ওষুধের শিশির পানে চোখ পড়্‌তেই সে দেখ্‌লো, শিশিগুলো প্রায় সবই খালি। মালিশের ওষুধটা এখনও প্রায় আধশিশি আছে। পথ্য ঘরে কিছুই নেই; দুধের পয়সা দিতে না পারায় কাল থেকে গোয়ালাও দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে। রোগীরা কাল শুধু দুধহীন বার্লি খেয়েই কাটিয়েছে কিন্তু আজ তার ঘরে বার্লিও নেই! নিমেষ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো—না থাক্; তবু সে আর ধার ক'রে কিছুই আন্‌বে না! রোগীরা মরুক; সে আজ চোখের সামনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখে সব সহ্য করবে—তবু সে আর ধারের

বোঝা বাড়াবে না। চাকুরী? সে ত তার যাবেই। আফিস সে কিছুতেই এখন যেতে পারবে না। এবং এতদিন ছুটির পর আবার ছুটি চাইতে গেলে যে কি হবে, সেটা সে ভাল করেই জানতো।

বাইরের বারান্দায় এসে সে চুপ ক'রে বসলো।

সামনের বিয়ে বাড়ী থেকে তখন রসুনচৌকীর সুর শোনা যাচ্ছিল। বিয়ে বাড়ীর আনন্দ-কোলাহল নিমেষের দুঃখ-দগ্ধ বুকে যেন তীক্ষ্ণ কাঁটার মত এসে বাজ্‌লো। তার মনে পড়্‌লো এম্‌নি এক আনন্দের মুহূর্ত তারও জীবনে একদিন গিয়েছে। তারও সেই পল্লীর ক্ষুদ্র কুটীরে একদিন এক নবীনার আগমনবার্ত্তা জানাতে এমনি এক রসুনচৌকীর আগমনী সুর বেজেছিল। কিন্তু সেই আগন্তুক আজ তার জীবনের পালা সঙ্গে ক'রে কোন অনন্ত-পথের যাত্রী হতে চলেছে। তার এই আটাশ বছরের ক্ষুদ্র জীবনে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটল। নিজের অতীত জীবনের সেই আধ-ভোলা অস্পষ্ট স্মৃতিগুলো মনে ক'রে নিমেষ যেন বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে পড়্‌ল। বাড়ীর ছাদে বসে একটা দাঁড়কাক তখন বিশ্রী বিকট রবে চীৎকার করছিল—কা—কা—কা!

হঠাৎ ভিতর থেকে একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বর এসে তার কাণে বাজ্‌লো—কোথায় গেলে?—

উঠে ভিতরে গিয়ে স্ত্রীর শিয়রের কাছে বসে সে বল্‌লে—কি, কিছু বলছ?

হুঁ—তুমি কি খাবে আজ?

খাবো এখন যা হয়।

না যাও, চারটি রেঁধে নাও এই বেলা।

আচ্ছা—

আচ্ছা নয়, যাও! আর শোনো, আমার ওষুধ আর তুমি এনো না, তোমার পায়ে পড়ি, লক্ষীটি!

নিমেষ যেন হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচ্‌লো! এই ত সে চাইছিল এতক্ষণ ধ'রে! কিন্তু তবু সে স্পষ্ট উত্তরটা উচ্চারণ করতে পার্‌লো না।

ধীরে ধীরে তার পাখানা ছুঁয়ে স্ত্রী বল্‌লো—বল আন্‌বে না!

একটা নিশ্বাস ফেলে নিমেষ উত্তর দিল, আচ্ছা!

স্ত্রী আবার জিজ্ঞাসা করলো, খোকা এখন কেমন আছে?

একক্ষণ তার অজ্ঞাতেই নিমেষের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—ভাল—

আজ দুদিন থেকে যে কয়েক ঢোক জল ছাড়া নিজেদের পেটে আর কিছুই পড়ে নি—তার এক বিন্দুও সে স্ত্রীকে জান্‌তে দিল না।

সেদিনটাও কোনও রকমে কেটে গেল। নিজের আফিস গেল না এবং আফিসের জন্যে সে একবার একটুও ভাবলেও না। সন্ধ্যার দিকে উভয় রোগীর অবস্থা আবার অত্যন্ত খারাপ হতে লাগ্‌লো। আজ সমস্ত দিনই কারো পেটে ওষুধ পড়ে নি। সমস্ত দিনের মধ্যে অনেকবার তার মনের মধ্যে থেকে কে যেন তাকে ওষুধ আন্‌তে পাঠাতে চেয়েছে, কিন্তু সে নিজে জোর ক'রে তাকে চেপে রেখেছে, তার সে আদেশ সে কিছুতেই মানে নি। সে আজ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ভাগ্যের বিরুদ্ধে যেন কঠোর বিদ্রোহ কর্‌বার জন্তই বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তার হৃদয়ের প্রেম, স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি এ সমস্তই আজ তার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে।

রাত্রি অধিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর অবস্থাও যতই মন্দ হ'য়ে উঠ্‌ছিল, তার মনের মধ্যে যেন ততই কি এক অদ্ভুত মত্ততা জেগে উঠ্‌ছিল। নিজেরই সঙ্গে যুদ্ধে তার মন আজ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়্‌ছে কিন্তু তবু সে আজ তাদের চিকিৎসার জন্য কিছুই কর্‌বে না। তার স্ত্রী তার পুত্র যদি আজ এই রাত্রের মধ্যেই তারই চোখের সাম্‌নে তাদের জীবনের শেষ নিশ্বাস গ্রহণ কর্‌তে চায়, তবু ও না।

হঠাৎ তার মাথার মধ্যে একটা চিন্তার রেখা রক্ত-তড়িতের মত ঢেউ খেলে গেল—আত্মহত্যা। একবার তার সমস্ত দেহটা যেন আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লো। কিন্তু পরক্ষণেই সে স্থিরপ্রতিজ্ঞা কর্‌লো হাঁ, সে আত্ম-হত্যাই কর্‌বে। হ'ক্ তাতে পাপ, হ'ক্ তা ঘৃণিত! তবু ত সে আজ অসহ্য জ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে! উপায়? স্ত্রীর মালিসের ওষুধ! তারই শিশির গায়ে লেখা আছে—তীব্র বিষ।

কিন্তু স্ত্রী পুত্র, সে মলে তারা কি কর্‌বে? . . . থাক্ তারা! সে ত দেখ্‌তে আস্‌বে না। কিন্তু ঐটুকু ছেলে; কেউ একবার ফিরেও চাইবে না তার পানে; আত্মীয় পরিজন বলতে এ বিশ্বে আজ তার কেউ নেই, একটি প্রাণীও না।

তাকেও মেরে রেখে যাবে। তার সমস্ত দেহটা একবার অতি তীব্র বেগে কেঁপে উঠ্‌ল। গলাটা যেন তার মরু-তৃষ্ণায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠ্‌ল। ভিতরের সমস্ত কিছু বাধা বিঘ্ন, বিপত্তি, বিরুদ্ধভাবকে সজোরে দমন

ক'রে সে প্রতিজ্ঞা করলে—তাই সে করবে আজ! স্ত্রী পুত্র ত মরবেই। তবে আর শুধু কেন তারা কষ্ট পায়! প্রাণীহত্যার পাপের ভাগী হবে সে! স্ত্রী-ঘাতী, পুত্র ঘাতী! হ'ক না, তাতে তার ক্ষতি কি? নিজের জীবনকে সে আজ পাপের অতল গভীরতায় ডুবিয়ে দেবে। সে আজ একবার পরখ্ করতে চায় জীবনে মানুষ পাপের পথে কতদূর এগিয়ে যেতে পারে।

ত্রস্ত কম্পিত চরণে সে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। স্ত্রীর ক্ষীণ কণ্ঠ দিয়ে একটা অস্ফুট কাতর শব্দ বেরিয়ে এলো—ও মা! সে শব্দে নিমিষের সমস্ত বুকটা সভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌লো।

আস্তে আস্তে মালিশের শিশিটা হাতে নিয়ে সে পুত্রের শিয়রে এসে দাঁড়াল। হাঁ, আগে পুত্র, তারপর স্ত্রী, তারপর সে নিজে!

কম্পিত হাতে শিশির ছিপিটা খুলে, কাঁচের গ্লাসে মালিশ খানিকটা ঢাললে, তারপর ডাকলে খোকা!

কিন্তু শুষ্ক কণ্ঠের অস্পষ্ট চাপা স্বরে সে যেন নিজেই চমকে উঠ্‌লো।

খোকা জেগেই ছিল, উত্তর দিল—উঁ—?

অত্যন্ত অস্বাভাবিক চাপা গলায় সে কোনো রকমে উচ্চারণ করলে—ওষুধটা!

উঁ? আঃ—দাও!

ধীরে ধীরে খোকা হাঁ করলো।

এক হাতে শিশিটা আর এক হাতে ওষুধের গ্লাস্‌টা ধরে, নিমেষ আরও একটু এগিয়ে এলো। তার সমস্ত দেহ তখন অসম্ভব রকম কাঁপ্‌ছিল।

অত্যন্ত জোরে খোকাকে চেপে ধরে সে তার মুখে সমস্ত ওষুধটা ঢেলে দিল। খোকা সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল—ওঃ জলে গেল যে!

কক্ষের অপর পাশ থেকে নিমেষের স্ত্রী বলে উঠ্‌লো,—কি হলো গো, অমন করে কেন?

কোন রকমে নিমেষ উত্তর দিল—ওষুধ।

হঠাৎ অত্যন্ত জোরে হাতটা কেঁপে ওঠায়, নিমেষের হাত থেকে শিশিটা ধপ্ ক'রে বিছানায় পড়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ওষুধটায় চাদর ও বিছানার খানিকটা ভিজে উঠ্‌লো!

পাগলের মত নিমেষ চিৎকার করে উঠ্‌লো—বাঃ!

নিমেষের স্ত্রীর শীর্ণ বুকটা সে আর্ত্ত চীৎকারের ব্যাকুল উদ্বেগে ফেটে পড়্‌বার উপক্রম করল। সে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—কি, কি হল?

দুই হাতের মুষ্টিকে দৃঢ় বদ্ধ ক'রে নিমেষ তখন বিছানায় লুণ্ঠিত সেই খালি শিশিটার পানে এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল। ক্ষুধিত শার্দ্দুলের মত তার দুই চক্ষু দিয়ে যেন তখন দীপ্ত অগ্নিকণা ঠিক্‌রে পড়্‌ছিল।

ওরে পথিক

—শ্রীসুবোধ রায়।

পথিক ওরে! কোথায় যাবি
এমন মলিন বেশে?
সঙ্গী-বিহীন অন্ধ-পথে
ক্লান্ত দিবস শেষে?
ব্যথার সাজি বক্ষে তুলে
দুঃখ-পীড়ন রইলি ভুলে,
মিটিয়ে দিলি দ্বন্দ্ব প্রাণের—
হায় রে শুধু হেসে!

কোলাহলের আবাস ছেড়ে
যাবিই যদি আজ,
ওরে পথিক! সাজ্‌লি যা' এ
এই কি ভালো সাজ?
সকল সুখে আগুন জেলে
মায়ার আলো দিলিই ঠেলে
মরণ-জয়ী মনের নেশাই
রাখ্‌লি অবশেষে!

মরু-তৃষা

—শ্রীভূপতি চৌধুরী।

জুনমাসের শেষা-শেষি, বিকাল সাড়ে পাঁচটা। তখনও প্রাসাদ-আঙ্গিনায় সূর্য্যের প্রখর আলোর উজ্জ্বল দীপ্তি খেলা করছে। এমন সময় একটি সুদৃশ্য কালো জুড়ির 'ভিক্টোরিয়া গাড়ী' প্রাসাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

কঁতেস্ দ্য-ম্যাস্কারে ধীরে ধীরে সোপান বেয়ে নেমে আস্‌তেই, তাঁর স্বামীকেও প্রাসাদ-তোরণে দেখা গেল। একবার দাঁড়িয়ে শুধু কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ম তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকাতেই, মুখ তাঁর বিবর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর স্ত্রীর, তপ্ত-কাঞ্চনের মতো বর্ণ, বড় বড় টানা-চোখের অতল-দৃষ্টি, কালো কেশের রাশি, তাঁকে অসামান্য লাবণ্য-মণ্ডিত ক'রে তুলে ছিল। কোন দিকে চোখ না ফিরিয়ে, এমন কি তাঁর স্বামীকেও লক্ষ্য করেছেন এমন ভঙ্গী না ক'রে কঁতেস্ সোজা গিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্‌লেন। একটা তীব্র আক্রোশ বুকে চেপে তাঁর স্বামী গাড়ীর দরজার কাছে এসে প্রশ্ন করলেন —বেড়াতে যাচ্ছ?

একটা তাচ্ছিল্যের সুরে উত্তর এল—দেখ্‌তেই পাচ্ছ।

'বোআ-দা-বুলঞ্'তে নাকি?

খুব সম্ভব।

তোমার সঙ্গে যেতে পারি কি?

তোমার ইচ্ছা, এ গাড়ী ত তোমারই

স্ত্রীর কথায় বিন্দুমাত্রও বিস্মিত না হয়ে, কঁৎ-দ্য-ম্যাস্কারে গাড়ীতে উঠে তাঁর স্ত্রীর পাশে বসে হুকুম করলেন—বোআ-দা-বুলঞ্—'

যথারীতি সহিস গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বস্‌তেই, কালো জুড়ি পথ বেয়ে ছুটে চলল।

স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসে; কারো মুখে কোনো কথা নেই। কঁৎ ভাবছিলেন কেমন ক'রে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করা যায়, কিন্তু স্ত্রীকে রুক্ষ ভাবে

বসে থাকতে দেখে কথা আরম্ভ করবার সাহসও তাঁর হচ্ছিল না। অবশেষে অত্যন্ত সাবধান ভাবে গাড়ীর ঝাঁকুনির তালে, তাঁর হাতটা কঁতেসের হাতের উপর গিয়ে পড়তেই, তিনি তাঁর হাত খানা অত্যন্ত ত্রস্ত ভাবে সরিয়ে নিলেন। তাঁর হাত সরাবার ভঙ্গীতে তাঁর বিরক্তি যেন পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাচ্ছিল। স্বেচ্ছাচারী, প্রভুত্বমদ-গর্ব্বিত কঁৎ, তাঁর স্ত্রীর ব্যবহারে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে চিন্তা ক'রে, ডাকলেন—গ্যাব্রিয়েল!

কি, বল।

তোমায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে!

কোনো উত্তর না দিয়ে, ক্রুদ্ধা সম্রাজ্ঞীর মতো কঁতেস্, গদীতে ঠেসান্ দিয়ে স্থির ভাবে বসে রইলেন। গাড়ী তখন শাঁজ্-এলিসে ধরে 'আর্ক'দ্য-ত্রিঅফ্‌' এর দিকে ছুটেছে। দীর্ঘ পথের প্রান্তে গগন-চুম্বী স্তম্ভ-শীর্ষে রক্ত সূর্য্য আহত পাখীর মতো ঢলে পড়েছে। অগণ্য গাড়ী ঘোড়া পথ বেয়ে ছুটে চলেছে।

কঁৎ আবার ডাকলেন—গ্যাব্রিয়েল!

নিজেকে আর কোনো প্রকারে সংযত রাখতে না পেরে কঁতেস উত্যক্ত স্বরে উত্তর দিলেন—সত্যি বলছি আমায় কি একটুও শান্তিতে, নিরিবিলিতে থাকতে দেবে না? গাড়ীতে একলা বেড়াতে যাবার স্বাধীনতাও কি আমার নেই?

কোন কথা কাণে না তুলে ঠিক আগেকারই মতো স্নেহ-স্বরে কঁৎ বললেন—আজকার মতো সুন্দর কিন্তু তোমায় কখনও দেখায় নি।

ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে তাঁর মুখ হতে বার হল—বৃথা তুমি একথা বলছ। আর তোমার কথার ছাঁদে আমি ভুলি না।

একটা বিস্ময়ের ধাক্কায় মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি হবার পর তাঁর মনের ক্রূর-ভাব জাগ্রত হয়ে উঠল। কঁৎ বলে উঠলেন—তার মানে?
কথার সুরে প্রেম-মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে প্রভুত্বের রুক্ষতারই আভাস পরিস্ফুট।

সহিস শুনতে না পায় এমনি ভাবে গাড়ীর চাকার শব্দের সঙ্গে গলার সুর নামিয়ে কঁতেস্ কঠোর ব্যঙ্গস্বরে উত্তর দিলেন—তার মানে? আজ তোমার স্বরূপ আমি যেন চিনতে পেরেছি। আমি তোমায় যা জেনেছি তাই কি তুমি জানতে চাও!

কঁৎ গম্ভীর ভাবে বললেন—'হুঁ!'

যেদিন থেকে তোমার স্বার্থপরতার বিপুল বোঝায় আমায় পিষে ফেলেছ, সেদিন থেকে সব শুনতে চাও?—

বিস্ময়ে ক্রোধে কঁৎ লাল হয়ে উঠেছিলেন। দাঁতে দাঁত চেপে একটা অস্পষ্ট হুঙ্কারে তিনি বলে উঠ্‌লেন—সব—সব বল।

দীর্ঘ, বিশাল ভদ্র আকৃতি তাঁর দেখ্‌লে সাধারণতঃ পতিত্ব ও পিতৃত্বের আদর্শ বলেই বোধ হয়; কিন্তু আজ এই প্রথম এমন আদর্শ পুরুষের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর চোখের উপর নিজের স্থির দৃষ্টি রেখে তাঁর স্ত্রী বল্‌লেন—একান্তই তুমি কতকগুলো অপ্রীতিকর কথা শুনবে দেখ্‌ছি। বেশ আমারও তাতে আপত্তি নেই, আমি বলে যাব। তাতে আমার কপালে যা আছে হবে, কিছুই আর আমি ভয় করি না, আর তোমাকেও আমি গ্রাহ্য করি না।

একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ দেখে ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কঁৎ বল্‌লেন—তুমি কি পাগল হয়েছ?

না, আর আমি সহ্য করব না। এগার বৎসর ধরে তোমার কদর্য্য অত্যাচারে আমায় মাতৃত্ব-বন্ধনে বন্দী ক'রে রেখেছ। এইবার আমায় সে বন্ধন হতে মুক্ত ক'রে, সমাজে নারীর উপযুক্ত স্থান আমি বেছে নেব।

সহসা ম্লান বিবর্ণ মুখে জড়িত-কণ্ঠে কঁৎ বলে উঠ্‌লেন—আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

বুঝ্‌তে তুমি পার সবই। না বোঝ্‌বার এতে কিছু নেই। সবে তিন মাস হল আমার কোলের ছেলেটি হয়েছে কিন্তু তবু আজও আমার সৌন্দর্য্য অটুট্ রয়েছে, এত চেষ্টা করেও তুমি তাকে নষ্ট করতে পার নি। আজ বুঝি সে সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়ে তোমার সেই অভিলাষ জাগ্রত হয়ে উঠল? তাই ভাবছিলে, আরও একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লে হয় না?

কি বাজে বক্‌ছ তুমি!

বাজে আমি বলি নি কিছুই। এখন আমার বয়স ত্রিশ, এগার বৎসর আমাদের বিয়ে হয়েছে এরই মধ্যে আমার সাতটি ছেলে হয়েছে। এমনি ভাবে কি আরও দশ বৎসর আমায় তুমি ভোগ ক'রে আমার যা কিছু সব নিঙড়ে নিয়ে আমায় ছেড়ে দিতে চাও?

হাতের মধ্যে কঁতেসের হাত তুলে নিপীড়ন করতে করতে কঁৎ বল্‌লেন—আর তোমায় আমি বাজে বক্‌তে দেব না। কি সব বল্‌ছ তুমি!

যা বল্‌ছি তার শেষ পর্য্যন্ত তোমায় বলে যাব। কোনো বাধা আমি মান্‌ব না। যদি বাধা দাও ত এমন চীৎকার করব যে তোমার ঐ সহিসটাও নেমে আস্‌বে। জান, শুধু এই কথা বল্‌বার জন্তেই আমি তোমায় আমার সঙ্গে আস্‌তে দিয়েছি।

সব তোমায় শুনিয়ে তবে ছাড়্‌ব। সব সময় তোমার প্রতি একটা বিতৃষ্ণায় আমার মন ভরে থাকে। আর তোমায় সেটা বুঝ্‌বার সুযোগও দিয়েছি আমি। কোনো দিন তোমায় আমি মিথ্যা ক'রে কিছু বলি নি। কিন্তু তবুও আমার অসম্মতি সত্ত্বেও তুমি আমায় বিয়ে করেছিলে। ধনী তুমি—দুর্দ্দশাগ্রস্ত আমার পিতা মাতাকে তুমি বাধ্য করেছিলে তোমার হাতে আমায় সম্প্রদান করতে। আমার অশ্রু-জলের বাধা তুমি মানো নি।

টাকা দিয়ে তুমি আমায় কিনে ছিলে। কিন্তু সে কথা ভুলেও, সাথীর প্রতি একটা কর্ত্তব্যের খাতিরে তোমায় আমি ভালবাস্‌বার চেষ্টা করেছিলাম। যতদূর সম্ভব আমি তোমার অনুরক্ত স্ত্রী হবার চেষ্টা পেয়েছি। কিন্তু তুমি আমার প্রত্যেক ভঙ্গী সন্দেহের চোখে দেখ্‌তে। লোকে আমায় সুন্দরী বল্‌ত, সমাজে আমার রূপের প্রশংসা হত, খবরের কাগজে আমার সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি বার হত, এ তুমি সহ্য কর্‌তে পার্‌তে না। লোক-সমাজে এসে আমি আমার রূপের প্রশংসা কুড়োই এ তোমার সহ্য হত না। তাই তুমি চেষ্টা কর্‌তে আমায় অবিরত মাতৃত্বের ভারে পীড়িত ক'রে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখ্‌তে।

তোমার ইচ্ছা ছিল, এই উপায়ে আমার দেহের রূপ-যৌবন নষ্ট ক'রে, লোক-সমাজে আমার অপদার্থ ক'রে ছেড়ে দেবে। তোমার এ জঘন্য ইচ্ছা প্রথমে আমি বুঝ্‌তে পারি নি। শেষে তোমারই বোন, তোমার এই জঘন্য আচরণে বিরক্ত হয়ে তোমার সকল কথা আমার কাছে ব্যক্ত করে। তুমি এর জন্য তার কাছে আবার বড়াই করতে!—

মনে কর দেখি, এই এগার বৎসর শুধু তোমার সন্তানের জননী হবার জন্য আমায় সমাজ ও লোকসঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য করেছ। প্রতিবার প্রসব হবার পর যখন আমার কমনীয়তা লুপ্ত হয়ে যেত, তখন আবার তাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টায় আমায় তুমি তোমার দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে। আবার যখন আমার হৃতকান্তি উদ্ধার ক'রে ফিরে আস্‌তাম, লোকের মুখে আমার রূপের সুখ্যাতির গুঞ্জন আরম্ভ হতেই তা বন্ধ ক'রে দেবার জন্য আবার তোমার অত্যাচার চল্‌ত। ভোগ কর্‌তে আমায় তুমি চাও, আমার আপত্তি নেই কিন্তু তুমি যে আমায় কুৎসিত করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ছ এ তথ্য আমার অসহ্য—

তোমার সন্তানদের তুমি ভালবাস্‌তে, তোমার সঙ্গে তাদের রক্তের সম্বন্ধ আছে বলে নয়, অন্য কারণে। তারা হচ্ছে তোমার জয়-চিহ্ন। আমার রূপের উপর,

আমার যৌবনের উপর, আমার কমনীয়তার উপর তোমার জয়, স্তম্ভ হচ্ছে এই তোমার সন্তানেরা। এদের দিকে চেয়ে নিজের জয়ের আনন্দে তোমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত। আমার পরাজয়ের চিহ্ন স্বরূপ, গর্ব্ব ক'রে তুমি এদের থিয়েটার প্রভৃতিতে নিয়ে যেতে। লোকে ভাবত কি স্নেহশীল পিতা তুমি এদের—

কঁৎ এত জোরে তাঁর স্ত্রীর হাত চেপে ধরে ছিলেন, যে যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে তাঁকে চুপ্‌ করতে হল। মৃদু অথচ রুক্ষস্বরে তিনি বল্‌লেন, শোনো, আমার ছেলেদের আমি খুবই ভালোবাসি। কিন্তু মা হয়েও তোমার এ সব কথা বল্‌তে লজ্জা হয় না? তুমি আমার, আমি তোমার স্বামী, তোমায় নিয়ে আমার যা খুশী করবার অধিকার আছে। এ জন্য আইন পর্য্যন্ত আমার দিকে।

কঁৎ পশুশক্তিতে তাঁর হাতখানা চেপে ধরার ফলে, যন্ত্রণায় কঁতেসের শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল, ব্যথায় তাঁর চোখ জলে ভরে উঠেছিল। একবার তাঁর দিকে লক্ষ্য করে কঁৎ বল্‌লেন—দেখ্‌লে আমি প্রভু কি না, আমি বলবান কি না? তার পর তাঁর মুষ্টি শিথিল করতেই কঁতেস্‌ বল্‌লেন—আমায় কি তোমার খুব নিষ্ঠাবতী বলে বোধ হয়?

বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কঁৎ বল্‌লেন—নিশ্চয়।

তোমার কি মনে হয় খ্রীষ্টের সমাধি-বেদীর সম্মুখে শপথ ক'রে কোনো মিথ্যা কথা বল্‌তে পারি?

না।

তবে চল আমার সঙ্গে, একটা চার্চ্চে।

কেন?

গেলেই বুঝ্‌তে পারবে। যাবে কি?

তুমি একান্তই চাও ত চল।

উচ্চকণ্ঠে কঁতেস্‌ ডাক্‌লেন—ফিলিপ্‌—

গাড়োয়ান ঝুঁকে ঘোড়ার উপর চোখ রেখে, কাণ পাত্‌তেই শুনতে পেলে, কঁতেস্‌ বলছেন—স্‌াঁ-ফিলিপ্‌-দ্যু-রুল'এ নিয়ে চল।

গাড়ী সেই পথে ছুটল।

স্বামী স্ত্রী সারাপথ নির্ব্বাক্‌ বসে রইলেন। চার্চ্চের দ্বারে গাড়ী দাঁড়াতেই কঁতেস্‌ সর্ব্বপ্রথমে নেমে সোজা গিয়ে গায়ক-মণ্ডলীর বসিবার স্থানে সম্মুখস্থ একটি চেয়ারের উপর দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন। বহুক্ষণ ধরে তিনি প্রার্থনা

করতে লাগ্‌লেন। কি একটা বেদনায় তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠ্‌ল! দুই হাতে মুখ ঢেকে সে অশ্রু লুকোবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কঁৎ পিছনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দেখ্‌ছিলেন। এ অবস্থাটি কঁৎএর অস্বস্তিকর বোধ হওয়ায় তিনি কঁতেসের কাঁধের উপর হাত রাখ্‌তেই, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ যেন জলে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, কঁতেস্ তাঁর স্বামীর চোখের দিকে চেয়ে বলে উঠ্‌লেন—আমি কি বল্‌তে চাই জান? আমি তোমার আর ভয় করি না; তোমার যা খুসি করতে পার, আমি গ্রাহ্য করি না। এই আমি ভগবানের নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি এই সাতটি ছেলের, মাত্র একটির তোমার রক্তে জন্ম নয়। আমায় 'সন্তান-প্রসবের যন্ত্র' করার চেষ্টার, তোমার পৌরুষ-গর্ব্বে এম্‌নি ভাবে আমি আঘাত করেছি। এই আমার প্রতিশোধ। তুমি হয়ত জান্‌তে চাইবে কে সে, আর কোনটি বা সেই সন্তান। তা আমি বল্‌ব না। আর তুমিও তা সহস্র চেষ্টা করেও জান্‌তে পার্‌বে না। ভেবেছিল ! পরে বল্‌ব এসব কথা কিন্তু একথা তুমিই আমায় বল্‌তে বাধ্য করালে। আর কিছু আমার বল্‌বার নেই।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত পদক্ষেপে তিনি মুক্ত দুয়ারের দিকে অগ্রসর হলেন। প্রতি পদক্ষেপেই তাঁর মনে হচ্ছিল, এখনি বুঝি তাঁর উপেক্ষিত স্বামী ছুটে এসে তাঁকে আঘাত করে! আশঙ্কা ব্যর্থ হল। দ্বারদেশে আস্‌তেই একটা দারুণ উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হল। কোনো ক্রমে সে অবস্থা জয় ক'রে গাড়ীতে উঠে অস্ফুটস্বরে কোনো রকমে হুকুম কর্‌লেন—গাড়ী চল।

দ্রুতবেগে কালো-জুড়ী ছুটে চল্‌ল।

দুই

ফাঁসীর আসামী যেমন ক'রে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা ক'রে বসে থাকে, কঁতেস্ ঠিক তেমনি ভাবে 'ডিনারের' প্রতীক্ষায় বসেছিলেন। ভাবছিলেন, তাঁর স্বামী এইবার কি কর্‌বেন? তিনি বাড়ী ফিরেছেন কি? স্বেচ্ছাচারী, উদ্দাম, দুর্দ্দমনীয় তাঁর স্বভাব, কি ভেবেছেন বা তিনি, আর স্থিরই বা কি করেছেন? সারা বাড়ীতে একটা শব্দও নেই। প্রায় প্রতি পলে পলে তিনি ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন। সন্ধ্যা হতেই দাসী তাঁর প্রসাধন শেষ ক'রে দিয়ে গেল। ঠিক আট্‌টা বাজ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই খান্‌সামা দরজায় ঘা মেরে জানিয়ে দিলে—ডিনার প্রস্তুত।

আমার যৌবনের উপর, আমার কমনীয়তার উপর তোমার জয়, শুধু হচ্ছে এই তোমার সন্তানেরা। এদের দিকে চেয়ে নিজের জয়ের আনন্দে তোমার চোখ উজ্জল হয়ে উঠ্‌ত। আমার পরাজয়ের চিহ্ন স্বরূপ, গর্ব্ব ক'রে তুমি এদের থিয়েটার প্রভৃতিতে নিয়ে যেতে। লোকে ভাবত কি স্নেহশীল পিতা তুমি এদের—

কঁৎ এত জোরে তাঁর স্ত্রীর হাত চেপে ধরে ছিলেন, যে যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে তাঁকে চুপ্ করতে হল। মৃদু অথচ রুক্ষস্বরে তিনি বল্‌লেন, শোনো, আমার ছেলেদের আমি খুবই ভালোবাসি। কিন্তু মা হয়েও তোমার এ সব কথা বল্‌তে লজ্জা হয় না? তুমি আমার, আমি তোমার স্বামী, তোমায় নিয়ে আমার যা খুশী কর্‌বার অধিকার আছে। এ জন্য আইন পর্য্যন্ত আমার দিকে।

কঁৎ পশুশক্তিতে তাঁর হাতখানা চেপে ধরার ফলে, যন্ত্রণায় কঁতেসের শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল, ব্যথায় তাঁর চোখ জলে ভরে উঠেছিল। একবার তাঁর দিকে লক্ষ্য করে কঁৎ বল্‌লেন—দেখ্‌লে আমি প্রভু কি না, আমি বলবান কি না? তার পর তাঁর মুষ্টি শিথিল কর্‌তেই কঁতেস্ বল্‌লেন—আমায় কি তোমার খুব নিষ্ঠাবতী বলে বোধ হয়?

বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কঁৎ বল্‌লেন—নিশ্চয়।

তোমার কি মনে হয় খ্রীষ্টের সমাধি-বেদীর সম্মুখে শপথ ক'রে কোনো মিথ্যা কথা বল্‌তে পারি?

না।

তবে চল আমার সঙ্গে, একটা চার্চ্চে।

কেন?

গেলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। যাবে কি?

তুমি একান্তই চাও ত চল।

উচ্চকণ্ঠে কঁতেস্ ডাক্‌লেন—ফিলিপ্—

গাড়োয়ান ঝুঁকে ঘোড়ার উপর চোখ রেখে, কাণ পাত্‌তেই শুন্‌তে পেলে, কঁতেস্ বল্‌ছেন—স্ঁয়া-ফিলিপ্-দ্যু-রুল'এ নিয়ে চল।

গাড়ী সেই পথে ছুটল।

স্বামী স্ত্রী সারাপথ নির্ব্বাক্ বসে রইলেন। চার্চ্চের দ্বারে গাড়ী দাঁড়াতেই কঁতেস্ সর্ব্বপ্রথমে নেমে সোজা গিয়ে গায়ক-মণ্ডলীর বসিবার স্থানের সম্মুখস্থ একটি চেয়ারের উপর দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়্‌লেন। বহুক্ষণ ধরে তিনি প্রার্থনা

করতে লাগ্‌লেন। কি একটা বেদনায় তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠ্‌ল! দুই হাতে মুখ ঢেকে সে অশ্রু লুকোবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কঁৎ পিছনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দেখ্‌ছিলেন। এ অবস্থাটি কঁৎএর অস্বস্তিকর বোধ হওয়ায় তিনি কঁতেসের কাঁধের উপর হাত রাখ্‌তেই, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ যেন জলে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, কঁতেস্ তাঁর স্বামীর চোখের দিকে চেয়ে বলে উঠ্‌লেন—আমি কি বল্‌তে চাই জান? আমি তোমায় আর ভয় করি না; তোমার যা খুসি করতে পার, আমি গ্রাহ্য করি না। এই আমি ভগবানের নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি এই সাতটি ছেলের, মাত্র একটির তোমার রক্তে জন্ম নয়। আমায় 'সন্তান-প্রসবের যন্ত্র' করার চেষ্টায়, তোমার পৌরুষ-গর্ব্বে এম্‌নি ভাবে আমি আঘাত করেছি। এই আমার প্রতিশোধ। তুমি হয়ত জানতে চাইবে কে সে, আর কোনটি বা সেই সন্তান। তা আমি বল্‌ব না। আর তুমিও তা সহস্র চেষ্টা করেও জান্‌তে পার্‌বে না। ভেবেছিল। পরে বল্‌ব এসব কথা কিন্তু একথা তুমিই আমায় বল্‌তে বাধ্য করালে। আর কিছু আমার বল্‌বার নেই।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত পদক্ষেপে তিনি মুক্ত দুয়ারের দিকে অগ্রসর হলেন। প্রতি পদক্ষেপেই তাঁর মনে হচ্ছিল, এখনি বুঝি তাঁর উপেক্ষিত স্বামী ছুটে এসে তাঁকে আঘাত করে! আশঙ্কা ব্যর্থ হল। দ্বারদেশে আস্‌তেই একটা দারুণ উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হল। কোনো ক্রমে সে অবস্থা জয় ক'রে গাড়ীতে উঠে অস্ফুটস্বরে কোনো রকমে হুকুম করলেন—বাড়ী চল।

দ্রুতবেগে কালো-জুড়ী ছুটে চল্‌ল।

দুই

ফাঁসীর আসামী যেমন ক'রে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা ক'রে বসে থাকে, কঁতেস্ ঠিক তেমনি ভাবে 'ডিনারের' প্রতীক্ষায় বসেছিলেন। ভাবছিলেন, তাঁর স্বামী এইবার কি করবেন? তিনি বাড়ী ফিরেছেন কি? স্বেচ্ছাচারী, উদ্দাম, দুর্দ্দমনীয় তাঁর স্বভাব, কি ভেবেছেন বা তিনি, আর স্থিরই বা কি করেছেন? সারা বাড়ীতে একটা শব্দও নেই। প্রায় প্রতি পলে পলে তিনি ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন। সন্ধ্যা হতেই দাসী তাঁর প্রসাধন শেষ ক'রে দিয়ে গেল। ঠিক আটটা বাজ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই খান্‌সামা দরজায় ঘা মেরে জানিয়ে দিলে—ডিনার প্রস্তুত।

কঁৎ এসেছেন কি ?

আজ্ঞে হাঁ। তিনি ডাইনিং হলেই বসে আছেন।

এমনি একটা বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় আশঙ্কা ক'রে, বহু দিন পূর্ব্ব হতেই তিনি আত্মরক্ষার জন্য একটা রিভল্‌বার কিনে ছিলেন। সেটার কথা একবার মনে পড়্‌ল, আবার পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়্‌ল তাঁর ছেলেরাও সেখানে থাক্‌বে। অবশেষে মাত্র 'স্মেলিং সল্টে'র শিশিটা হাতে নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

কঁৎ আড়ম্বর-সহকারে চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌লেন, তারপর পরস্পর মাথা নেড়ে অভিবাদন করে স্ব-স্ব স্থানে বসে পড়্‌লেন। পুত্র তিনটি তাদের মাষ্টারের সঙ্গে মায়ের দক্ষিণে, ও কন্যা তিনটি তাদের শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে মায়ের বামে বসেছিল। শুধু তিন মাসের ছোট ছেলেটি উপরে তার ধাত্রীর কাছে শুয়েছিল।

কঁতেস্ নতমুখে বসে বসে একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ করছিলেন আর কঁৎ প্রতিক্ষণে একবার তাঁর ছেলেদের দিকে, আবার তাঁর মেয়েদের দিকে একটা অজানিত আশঙ্কার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন।

ঠেলে সরিয়ে রাখ্‌তে গিয়ে হঠাৎ মদের গ্লাসটা পড়ে গেল। সারা টেবিল-ক্লথ্‌টা মদের ছিটায় রঙীন হয়ে উঠ্‌ল। এই সামান্য দুর্ঘটনার শব্দে চমকিত হয়ে কঁতেস্ তাঁর স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। উভয়েরই দৃষ্টি-বিনিময় হওয়া সত্ত্বেও কারো মুখ হতে কোনো শব্দ বার হল না।

সহসা কঁৎ টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বল্‌লেন—আচ্ছা এই ছেলেদের মধ্যে শপথ ক'রে বল দেখি, তুমি যা বলেছ তা সত্যি ?

একটা তীব্র ঘৃণার তিক্ত আবেগে কঁতেস্ উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেন। এক হাত ছেলেদের ও অন্য হাত মেয়েদের দিকে প্রসারিত ক'রে দ্বিধাহীন দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—এই ছেলেদের মাথার দিব্য দিয়ে আমি বল্‌ছি, আমি তোমায় সত্য কথাই বলেছি।

উত্তেজনার ঝোঁকে নেপ্‌কিন্‌টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ারটা দূরে টেনে ফেলে আর দিরুক্তি না ক'রে ঘর হতে তিনি বার হয়ে গেলেন। কঁতেসের বুক ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়্‌ল। তার পর এই সর্ব্ব-প্রথম-জয়ে আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে ছেলেদের সম্বোধন ক'রে তিনি বল্‌লেন—কিছু ভেবো না তোমরা এ ব্যাপার নিয়ে। একটা বিশেষ ঘটনায় আজ তাঁর মনের ঠিক্ নেই। সে কিছু না, দু দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডিনার শেষ হয়ে গেল। শুতে যাবার পূর্ব্বে মাতৃহৃদয়ের স্নেহচুম্বনে সন্তানদের অভিষিক্ত ক'রে কঁতেস্ তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

কঁৎ এর প্রতীক্ষা ক'রে তিনি জেগে রইলেন। ছেলেরা তাঁর কাছে ছিল না, তাই মনস্থির করে, তিনি আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ রিভলবারটা পকেটে রেখে দিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু ঘরের দুয়ারে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল না। শুধু মাঝে মাঝে বন্ধ জানালা কাঁপিয়ে চলন্ত গাড়ীর অস্পষ্ট শব্দ কাণে আস্‌ছিল।

উদ্বেগপূর্ণ অথচ দৃঢ় নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। স্বামীকে যন্ত্রণা-দেওয়ার পথের সন্ধান পেয়ে, আনন্দে আজ চোখ দুটি তাঁর উজ্জ্বল।

সময় যায়, প্রভাতের আলো এসে দেখা দিয়ে গেল কিন্তু কঁৎ এর দেখা পাওয়া গেল না! নানা সন্দেহে কঁতেসের মন দুলে উঠ্‌ল।

দাসী এসে তাঁর চা দিয়ে গেল আর সেই সঙ্গে নিয়ে এল তাঁর স্বামীর নিকট থেকে এক চিঠি। তিনি লিখেছেন—একটা দীর্ঘ-ভ্রমণের ব্যবস্থা তিনি করেছেন। কঁতেসের যা কিছু দরকার তা তাঁর উকিল তাঁকে যোগাবেন।

তিন

গ্রাঁ থিয়েতার্। 'রবার্ট দি ডেভিল' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের পর অবসর সময়ে দুই বন্ধুতে কথা হচ্ছিল। একজন বল্‌লেন—'কঁতেস্-দা-মাস্‌কারে এখনও কি সুন্দর রয়েছেন দেখেছ ?

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বন্ধুটি তাঁর অপেরা গ্লাস চোখে দিয়ে বক্সের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। কঁতেস্‌কে তখনও বেশ অল্প-বয়স্কা বলে বোধ হচ্ছিল। রূপের প্রভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তিনি মহিয়সী সম্রাজ্ঞীর মতো বসেছিলেন। দেহ-বর্ণের শ্বেতাভ আভায় নানা বিচিত্র আলোকে তাঁকে পাষাণ-মূর্ত্তির মতো দেখাচ্ছিল। কালো চুলের উপর মুকুটের হীরকটি যেন জ্বল্‌ছিল—আঁধার আকাশে তারার মতো। কিছুক্ষণ সে মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে তিনি বল্‌লেন—হাঁ সুন্দরী বটে!

আচ্ছা কত বয়স হবে ওঁর বল ত ?

দাঁড়াও বল্‌ছি! মনে মনে একটা হিসাব ক'রে তিনি বল্‌লেন—ছত্রিশ হবে।

অসম্ভব।

আমি বাজী রাখ্‌তে পারি।

কিন্তু ওঁকে পঁচিশের বেশী বলে মনে হয় না।

ওঁর সাতটি ছেলে।

বিশ্বাস হয় না যে ওঁর সাতটি ছেলে হয়েছে!

এগার বৎসরের মধ্যে ওঁর সাতটি ছেলে হয়, তখন ওঁর বয়স ত্রিশ। তার পর ওঁর স্বামীর সঙ্গে একটা বিচ্ছেদ ঘটে যায়।

আহা!

এতে আহা বল্‌বার কি আছে?

কেন? আচ্ছা ভাব দেখি, এগার বৎসরে সাতটি ছেলে! তার মানে ত এগার বৎসরই ওঁকে মাতৃত্ব-বেদনার নরক-বাস করতে হয়েছে। ওঁর রূপ, যৌবন; মাধুর্য্য, ক্ষমতা সব নষ্ট ক'রে ফেল্‌বার চেষ্টা করা হয়েছে।—একটা জঘন্য সামাজিক নিয়মে এমন চমৎকার রূপ-প্রতিমাকে শুধু একটা সন্তান-প্রসবের যন্ত্র ক'রে ফেলা হয়েছে।

কিন্তু তুমি করবে কি? এই ত স্বভাবের নিয়ম।

মানি এ স্বভাবের নিয়ম কিন্তু এ আমাদের শত্রু, একে জয় করতে হবে। সে অবিরত আমাদের পশুত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে। তুমি নিশ্চয় জেনো, ভগবান সুন্দর শুভ্র পরিচ্ছন্ন বলে কিছুই সৃষ্টি করেন নি। সেই বিরাট সৃষ্টি-যন্ত্র নির্ব্বোধের মতো সৃষ্টিই ক'রে চলেছে, কিন্তু কি যে সে করছে তা সে জানে না। কিন্তু সেই সৃষ্টির মধ্যেই মানুষ, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ছন্দ সুর, এ সবের সৃষ্টি করেছে, তাদের বুদ্ধি বলে। সামাজিক আইনে বাঁধা দুটি মানুষ পশুর মতো খালি সৃষ্টি ক'রে চলেছে। আমাদের এই যে পাশব প্রবৃত্তি, একে জয় করতে হবে। আমরা সভ্য হয়েছি, বুদ্ধির ক্রম-বিকাশের ফলে আমরা কেন এ পশুত্বকে জয় ক'রে সম্পূর্ণ আমার ক্ষমতার বশীভূত করতে পারব না? বর্ব্বর অবস্থায় আমাদের কি ছিল? কিছুই না, সবই ত আমরা করেছি, বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতির রহস্য জেনেছি, জ্ঞানের বলে কাব্য সৃষ্টি করেছি, অসুন্দরের বিনাশ ক'রে ছন্দ-সুর-গান ইত্যাদির আবিষ্কার করেছি।—

এই সময় যবনিকা উত্তোলিত হওয়ার ফলে, বন্ধু তাঁর কথা বন্ধ করলেন। সকল গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল।

চার

কঁৎ ও তাঁর স্ত্রী গাড়ীর মধ্যে পাশাপাশি বসে থিয়েটার হতে বাড়ী ফিরছিলেন। দুজনেই নির্ব্বাক। হঠাৎ কঁৎ বলে উঠ্‌লেন গ্যাব্রিয়েল!

বল—

যথেষ্ট 'ক হয় নি ?

কি ?

এই ছ'বৎসর ধরে কি ভীষণ শাস্তি তুমি দিয়েছ আমায়।

আমি ? আমি তোমায় কি করতে পারি ?

সত্যি ক'রে আমায় বল, কোন ছেলেটি আমার নয় ?

কথ্‌খনো বল্‌ব না—'

সত্যি বল্‌ছি, তাদের দেখ্‌বার আমার সাহস হচ্ছে না। তাদের কথাও ভাব্‌তে পারছি না। সন্দেহে আমি পুড়ে যাচ্ছি। বল কোন্‌টি সে। আমি তোমায় ক্ষমা করব, তাকে আর পাঁচ জনেরই মতো দেখ্‌ব।

তা বল্‌বার অধিকার আমার নেই।

এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না। শরীর আমার চিন্তায় ক্ষয়ে যাচ্ছে, আমি পাগলের মতো হয়ে উঠেছি।

কঁতেস্ বল্‌লেন—তাহলে সত্যি তুমি খানিকটা দুঃখ ভোগ করেছ দেখ্‌ছি।

ভয়ানক দুঃখ পেয়েছি আমি। তা নয় ত যদি আমি একথা ভোল্‌বার চেষ্টা ক'রে তোমার সঙ্গে একসঙ্গে ঐ বাড়ীতে থাকতুম, তাহলে প্রতিক্ষণে ঐ কথা আমার অতিষ্ঠ ক'রে তুল্‌ত। এদের মধ্যে একজন যে আমার নয়, অথচ সে কে, তা জানি না। ফলে কারুকেই আমি ভালোবাসতে পারতুম না।

কঁতেস্ তাঁর পূর্ব্ব কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে গেলেন।

বহু কষ্টে বিষাদ মাখা সুরে কঁৎ বল্‌লেন—সত্যি আমি বলছি—প্রতিদিন আমি অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করেছি। তুমি জান আমার ছেলেদের আমি ঠিক সেকালের বাপেদের মতো ভালবাসতুম কিন্তু তোমার কথায় আমি তাদের কথা, তাদের ভালবাসবার কথাও ভাবতে পারতুম না। আজ আমি স্বীকার করি অপরে যে তোমার প্রশংসা করবে এ আমি সহ্য করতে পারতুম না। যেদিন তুমি আমায় ও কথা শোনালে তারপর আর তোমার কথা ভেবে আমি কষ্ট পাই নি। আমি যে তোমায় হত্যা করি নি, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে—তাহলে কোন্ ছেলেটি আমার নয়, তা আর জানবার উপায় থাকবে না। আমি জান্‌বার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করেছি আর সেই সঙ্গে এতদিন সে কি অসহ্য যন্ত্রনা বোধ করেছি! এখন আর আমি তাদের ভালবাসতেও সাহস করি না। তাদের দিকে তাকাতে, তাদের কাছে ডাকতে, তাদের কোলে তুলে আদর করতে ভয়

পাই ; সব সময় খালি মনে হয়—এই বুঝি সেই। এই ছ'বৎসর ধরে আমি তোমায় সঙ্গে আমার ব্যবহার শোধ্‌রাবার চেষ্টা করেছি। আমায় সত্যি ক'রে বল সে কে? আমি শপথ করছি আমি কোনো রকম দুর্ব্যবহার আর করব না।

গাড়ীর অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও কঁৎএর মনে হতে লাগ্‌ল যে কঁতেস্ যেন বিচলিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর মনে হল, এইবার তিনি নিশ্চয়ই সদয়ভাবে কথা কইবেন, তাই তিনি বলে উঠ্‌লেন—আমি বল্‌ছি, তোমার হাতে ধরে বল্‌ছি—

কঁতেস্ ধীর স্বরে বল্‌লেন তুমি যা ভাবতেও পার্‌বেনা তার চেয়েও আমি দোষী। সে জীবন আমার অসহ্য বোধ হয়েছিল তাই আমি তোমায় দূরে সরাতে চেয়েছিলাম। আমি ভগবানের সামনে, ছেলেদের মাথায় হাত দিয়ে তোমায় মিথ্যা বলেছি।

ঠিক ছ'বৎসর পূর্ব্বে এই গাড়ীর মধ্যেই কঁৎ যেমন ভাবে তাঁর স্ত্রীর হাত চেপে ধরে ছিলেন আজও ঠিক তেমনি ব্যগ্রভাবে তেমনি শক্তিতে সেই অন্ধকারে তাঁর স্ত্রীর হাত চেপে ধরে জড়িতকণ্ঠে বল্‌লেন—সত্যি, এসব সত্যি?

সত্যি

একটা বিপুল দুঃখে তাঁর অন্তরাত্মা যেন ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি অস্পষ্ট স্বরে বল্‌লেন—আবার আমার মনে নতুন ক'রে সন্দেহ জাগ্‌ছে। কখন তুমি সত্য কথা বলেছ, এখন না তখন? আমি কেমন ক'রে এ কথা বিশ্বাস করব। সে কথা বলার পর আর আমি কেমন ক'রে নারীকে বিশ্বাস করি? আমি যে কিছুই ভাবতে পার্‌ছি না। এর চেয়ে তুমি যদি বল্‌তে সে ছেলেটি হচ্ছে—সেজ, কি ন, কি নতুন; তাহলে হয়ত স্থির হতে পার্‌তুম। শান্তি পেতুম।

গাড়ী প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে সোপানের সামনে এসে দাঁড়ল। প্রথামত কঁৎ আগে নেমে হাত বাড়িয়ে কঁতেস্‌কে নামিয়ে নিলেন। কয়েকটা ধাপ উঠে কঁৎ বল্‌লেন আমি তোমার সঙ্গে আর কিছুক্ষণ কথা বল্‌তে চাই।

বেশ, বল।

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ কর্‌তেই বেয়ারাটা একবার আশ্চর্য্যভাবে উভয়ের দিকে তাকিয়ে আলো জেলে দিয়ে চলে গেল। কঁৎ বল্‌লেন—কি ক'রে বুঝ্‌ব তুমি আমায় এখনই সত্য কথা বল্‌লে? এর পূর্ব্বে সহস্রবার তোমায় আমি অনুনয় করেছি, আমায় সত্য কথা বল, কিন্তু তুমি পাষাণ প্রতিমার মতো অচল অটল মূক ভাবে রয়ে গেলে! তারপর আজ তুমি বল্‌লে যে তুমি আমায় তখন মিথ্যা

বলেছ। ছ'বৎসর ধরে ঐ কথাটাই সত্যি বলে বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে। এখন আর অন্য কথা বিশ্বাস করতে পারছি না; তুমি আমায় মিথ্যা বলেছ। আচ্ছা এ কি তুমি আমায় ভোলাবার বা শাস্তি দেওয়ার জন্যে বল্‌লে?

বেশ স্থির ধীর দৃঢ়কণ্ঠে অবিসংবাদিত স্বরে কঁতেস্ বল্‌লেন—তোমায় তখন যদি ও-কথা না বল্‌তাম, তাহলে এই ছ'বৎসরে আমার আরও চারটি ছেলে হত।

কিন্তু এমন কথা কি মায়ের বলা সাজে?

এমন কথা বলা সাজে কি না জানি না কিন্তু সাত ছেলের মা আমি, এরাই আমার যথেষ্ট। এদের আমি প্রাণ-অপেক্ষাও ভালোবাসি। সভ্য জগতের প্রাণী আমরা; আমরা পৃথিবীর অধিবাসী সৃষ্টি করবার কল নই।

স্ত্রীর হাত ধরে কঁৎ বল্‌লেন—আচ্ছা আর একটা কথা গ্যাব্রিয়েল্। আমায় সত্যি কোন কথাটা, বলে দাও।

এখনই ত তোমায় বল্‌লাম। তোমার অপমান আমি করি নি।

কঁৎ তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তখনও কি সুন্দর তাঁকে দেখাচ্ছিল। চোখের তারায়, সে কি নীলিমার প্রশান্ত দৃষ্টি। কালো চুলের উপর মুকুটের হীরেটা কি ভাস্বর! হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি যেন প্রাণে প্রাণে অনুভব করলেন—এ ত জাতির জন্মদাত্রী-যন্ত্র নয়! ভগবানের এক অপূর্ব্বসৃষ্টি, মানুষের সকল কামনা-বাসনা-বিজড়িত আদর্শ মূর্ত্তি। এ যেন কোন স্বপনের তারা, কাব্যের মানসী, ভাস্বররূপে মানব জীবন আলোকিত ক'রে দেয়!

কল্পনার চোখে এ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ ক'রে কঁৎ মোহ মুগ্ধের মতো তাঁর দিকে চেয়ে ছিলেন—তাঁর মুখ হতে আপনা হতে বার হল—আমি তোমায় বিশ্বাস করি। আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছি তুমি আমায় মিথ্যা বল নি।

কঁতেস্ তাঁর স্বামীর দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন—তা হলে আজ হতে আবার বন্ধু আমরা?

হাতটা ধরে তার উপর একটা চুম্বন রেখা এঁকে দিয়ে তিনি বল্‌লেন—বন্ধু আমরা গ্যাব্রিয়েল, ধন্যবাদ তোমায়—

তারপর তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে তিনি ঘর হতে বার হয়ে গেলেন। এখনও তাঁর স্ত্রী সুন্দরী রয়েছেন দেখে বিস্ময়ে তাঁর বুক ভরে উঠ্‌ল। একটা আনন্দে তাঁর বুক দুলে উঠল। *

---

* Guy de Maupassant.



(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩৭

রাত্রির যে গভীরতা, ঘড়ির কাঁটায় তাহা ধরা পড়ে না। সে ধরা পড়ে ঐ মানুষটির চোখের পাতায়, বুকের তলায়, যে রাবণের চিতার মত চিন্তায় অনির্ব্বাণ শিখা জ্বালিয়া বসিয়া আছে। অপমানের বেদনা, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাকে যাহার মন হইতে চির-নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। মানুষের মনের মলিনতা, যাহার হৃদয়ের সমস্ত ক্ষুধাকে এক নিমেষের জন্যও চরম-নিবৃত্তির আস্বাদ লাভ করিতে দেয় নাই! যাহার বিশ্বাসকে, শ্রদ্ধাকে নিষ্ঠাকে অবজ্ঞাভরে মানুষ পদদলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আকাশের অনন্ত নক্ষত্র-পুঞ্জের মত শত অপূর্ণ আশা-আকাঙ্খা যাহার বুকে তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়া মরে। বিশ্রাম যাহার সে উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না; নিদ্রা যাহার ঝলসিয়া পুড়িয়া মরিয়া যায়।—সেই মানুষটির উত্তপ্ত ললাটে লেখা থাকে—রাত্রি কত ক্রুর, রাত্রি কত কঠিন। রাত্রি গভীর নয়, সীমাহীন। রাত্রি মোহন নয়, ভয়ঙ্কর, অসহ্য।

যাহারা সুবিধাবাদী. শরীরকে যাহারা পণ্য-দ্রব্যের মত শান্তি-সুখের হাটে হাটে লইয়া বিকাইয়া বেড়ায় বা ক্রয় করিতে চায়; জীবনকে যাহারা বাঁধিয়া রাখে, প্রেমকে যাহারা তুচ্ছ ভাবিতে পারে—রাত্রি তাহাদের কাম্য বস্তু। রাত্রি তাহাদের লোভকে চরিতার্থ করে; ভোগের এবং লাভের পেয়ালা কাণায় কাণায় ভরিয়া দেয়।

কিন্তু প্রাণকে যাহারা পরমশ্রদ্ধা দান করিয়াছে, প্রেমকে যাহারা সর্ব্বস্ব বলিয়া অনুভব করিয়াছে, শরীর তাহাদের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু। কিছুতেই তাহারা ইহাকে কলুষিত হইতে বা দেখিতে পারে না। প্রেমহীন, প্রাণহীন শরীরের

প্রতি তাহাদের কোন মোহও থাকে না। কিন্তু এই শরীরের মধ্যেই যে প্রেমের বাসা ; শুক্তির বুকে মুক্তার মত প্রেম যে এই রক্ত-মাংস-পিণ্ডের মধ্যেই লুকাইয়া থাকে ; প্রেমিক মানুষ ইহা জানে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া ইহাকে বাহির করিতে পারে না।—কারণ সে যে ব্যবসাদারী !

সুবিধাবাদী মানুষ, এই ব্যবসায়-বুদ্ধিহীন মানুষগুলিকে ভাবে নির্কোধ। তাহাদের প্রেমকে উপহাস করে, তাহাদের দুঃখকে অশ্রদ্ধা করে।

তবু পৃথিবীতে এই নির্ব্বোধ মানুষের সংখ্যা অল্প নয়। মানুষের উপহাস অশ্রদ্ধা সহ্য করিয়া তাহারা বাঁচিয়া আছে। তাহারা দুঃখী নয়, তাহারা অনন্ত সুখের অধিকারী। তাহাদের মনে আছে অখণ্ড শান্তি। বিরাট মুক্তিকে তাহারা বুকের মধ্যেই পাইয়াছে। তাহাদের জীবন, প্রদীপের মত ধীরে ধীরে নিঃশেষিত নির্ব্বাপিত হইলেও তাহারা দিয়া যায়—আলো। বিধাতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত সমস্ত অন্ধকার মিলিত হইয়াও ইহাকে ম্লান, নিষ্প্রভ করিতে পারে না। বাদলরাতের উতল ধারার সুরে সুর মিলাইয়া গভীর আনন্দে তাহারা গাহিয়া উঠে।—

· · · কোন্ দূরের মানুষ এল যেন আজ কাছে,
তিমির আড়ালে, নীরবে দাঁড়ায়ে আছে !
বুকে দোলে তার বিরহ-ব্যথার মালা,
গোপন-মিলন অমৃত-গন্ধ ঢালা !
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি ! · · ·

বঞ্চিত-হিয়ার সঞ্চিত এ অশ্রু-মতি হার, জগতের বিরহীর বুকে আসিয়া দোল্ খায়।—সব-পাওয়ার অপেক্ষা সব-হারানর আনন্দ হয় বড়।

কিন্তু বিনা অন্বেষণে যে এই পরম সম্পদ পাইয়াছে ; বক্ষের মণি, আপনার হাতে ছিঁড়িয়া যাহার পায়ে ডালি দিয়া শুক্তি বলিয়াছে—লহ, লহ ; যাহা আছে সব লহ জীবনবল্লভ। আমার প্রেমের আহুতি হোক্, আমার এই রক্ত-মাংসের শরীর, তোমার ক্ষুধার হুতাশনে পূর্ণ-তেজে ও জ্বলে উঠুক · · · আমার বলে যা কিছু আছে, তা তোমার ক'রে নাও—'

ইহার উত্তরে যে অপ্রয়োজনের উদাসীনতা দেখাইয়া বলিয়াছে—'মিথ্যা।—বিশ্বাস করি না।' তাহার পর আপনার চরণপ্রান্তে সেই প্রেমকেই মৃত, হিমশীতল দেখিয়া যে আবার বলিয়া উঠিয়াছে—'সত্য। বিশ্বাস করি। ফিরে এস।' তাহার দুঃখকে বর্ণনা করিবার ভাষা নাই।

রাত্রি গভীর। পৃথিবী সুপ্ত। শ্রীশ জাগিয়া আছে। সবুজ শেড্-এ ঢাকা

আলোটি তাহার টেবিলের উপর জলিতেছে। জীবন্ত-জগতের পরপার হইতে সে আজ তাহার হারাণ-প্রিয়ার ব্যাকুল আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে! তাহার চোখে আর ঘুম নাই। অবহেলার দিনে দেখা তাহার প্রিয়ার মুখ আজ নব-রূপমাধুরী লইয়া তাহার চোখে স্বপ্ন-পরশ বুলাইয়া দিতেছে। তাহার কথা, নূতন অর্থ লইয়া শ্রীশের হৃদয়কে এক নূতন অনুভূতি, নূতন জাগরণের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!

বারে বারে তাহার মনে পড়ে—আপনার হৃদয়-হীনতার কথা। আর তাহার উত্তরে যাহা শুনিয়াছে বা দেখিয়াছে, তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠে।

একদিন সে তটিনীকে বলিয়াছিল—দেখ, তুমি যদি তোমার ঐ Second-rate sentimentality আর hysteric—ভাবটা মন থেকে তাড়াতে পার, তা হ'লে হয়ত সাহিত্যের কিছু উন্নতি করতে পারবে।

এই উক্তির পর, ম্লান মুখের একটি হাসির রেখা এবং অশ্রু-ছল্‌-ছল্‌ চোখ দুটির যে ছবি একদিন সে দেখিয়াছিল, আজ তাহা দেখিলে—

শ্রীশ, তাহার ড্রয়ার টানিয়া, রাশিকৃত তাম্র-শাসন, শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্ত্তির প্রতিলিপি, ঐতিহাসিক প্রবন্ধের তাড়া প্রভৃতি মাটির উপর নামাইয়া, সবার তলা হইতে বাহির করিল—সিল্‌-করা, ধুলা-মলিন একটি ফাইল; বহু যত্নে সে তাহাকে কোলের উপর তুলিয়া লইল। তাহার চোখে মুখে তখন ফুটিয়াছিল সেই দণ্ডদাতা মহারাজার ব্যথা-করুণ ভাবটি, আপন প্রিয়াকে যিনি লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া, অন্ধতম গহ্বরে ফেলিয়া রাখিয়া ছিলেন। আজ তাহাকে আপনার হাতে বাহির করিয়া, নিজের দেওয়া ব্যথার দানগুলিকে আরক্ত চোখে দেখিতেছেন।

শৃঙ্খল টুটিয়া গিয়াছে! পাষাণ তাহার ভার লইয়া বুক হইতে নামিয়া গিয়াছে! মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি! আলো-বাতাসের জোয়ার, যেন বুকের উপর আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে চায়! প্রিয়ার আদর, আহ্বান, ব্যাকুল-প্রতীক্ষার অভিমান-অশ্রু-জড়িত সুর শ্রীশের চারি পাশে এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিয়াছে! লোভী, ভিক্ষুকের মত সে আকণ্ঠ পুরিয়া সে সুরধারা পান করিতেছে।

· · · সকাল বেলা যে মাধবী ফুলগুলি দিয়ে গিয়ে ছিলে, দুপুরে তা শুখিয়ে উঠেছিল! গন্ধও ছিল না!—এখন, এই রাত্রে, সেই শুখ্‌না ফুলে এমন সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি, কি বল্‌ব! এ যেন স্মৃতির সৌরভ! তোমার স্মৃতি ঐ ফুলগুলির সঙ্গে এমন ক'রে জড়ান আছে আমার মনে যে একটি ফুলকে দেখ্‌লে তোমার প্রত্যেকটি কথা আমার মনে পড়ে যায়!—ফুলগুলি দিতে এসে হাতখানি হাতের ওপর রাখা · · ·

আচ্ছা, দুঃখের চেয়ে সুখও যেন সময় সময় অসহ্য মনে হয়, না? সেথ্‌লা-দিনের সেই স্পর্শ স্মৃতিটুকু আমার বুকে যে অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, সে সুখের ভার যেন আর বইতে পারি না মনে হয়! অত সুখ সয় না বলেই ত তোমার চোখের দিকে তাকাতে পারি না বেশীক্ষণ!—কি আছে তোমার চোখে বল না? কবে আবার দেখ্‌ব তোমায়?—'

উদাসীনতা নির্লিপ্ততা উপেক্ষার অন্তরালে এতখানি দেনা-পাওনা হইয়া গিয়াছে! ফুলগুলি দিবার সময় হাতখানি সে তাহার হাতের উপর রাখিয়াছে! চির-উপবাসী প্রাণ, তাহার ঐ অনবধানের দানটুকুর মধ্যেই প্রচুর সংস্থান করিয়া লইয়াছে! জগতের সমস্ত কঠিনতম উপেক্ষাও বুঝি তাহাকে আর রিক্ত করিতে পারিবে না!

'· · · · আজ হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল শ্রী, কয়েক দিনের মধ্যেই মাকে নিয়ে চেঞ্জে এ যাব। কিন্তু তোমায় না দেখে থাক্‌ব কি করে?—জানি না! তুমি বল, এটা আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু এর ওপর ওঠ্‌বার শক্তি আমার নেই। তুমি নিজেই জান না, তুমি কত সুন্দর,! আমার চোখকে কি তৃষ্ণাতুর ক'রে দিয়েছ! তোমার হাসি, তোমার চাউনি, সব মিলে আমায় পাগল ক'রে দেবে!—আচ্ছা শ্রী, তোমার গানের সুরে যে ব্যাকুলতা আছে, তোমার প্রাণে তা নেই কেন?—জান, তোমার গানের সুরের সঙ্গে আমার প্রাণের কান্নার বিয়ে হয়ে গেছে! হয়ত হেঁয়ালী ভাবছ না?—আমার মুখের কথা তুমি বুঝ্‌তে পার না, তাই এই চিঠিগুলোকে বলি, তোমরা ত জেনেছ আমার অন্তরের গোপন কথাটি, তার কানে কানে বলে দিও—আমি অবিশ্বাস সইতে পার্‌ছি না আর—'থাক্‌গে কি হবে কতকগুলো কথা ব'লে? সীমাবদ্ধ ভাষায় আমার অসীম বেদনাকে প্রকাশ কর্‌বার চেষ্টা যে পাগ্‌লামী, তবু চেষ্টার অন্ত নেই · · ·'

* * * *

'· · · · দেখ শ্রী, আমার মনে হয়, আমি হঠাৎ কবি হয়ে উঠেছি! শুনবে একটা কবিতা?—

সারাদিন ঘর-কন্নার কাজে বধূর দিন কেটে যায়, তার মন পড়ে থাকে প্রিয়ের কাছে।—কখন তার চির-আকাঙ্খিত মিলন-রাত্রি আস্‌বে! মালাটি হাতে নিয়ে সে থাক্‌বে বরের প্রতীক্ষায়। বর আস্‌বে। মালাটি পরে নেবে তার গলায়। মুখে ফুট্‌বে তার মোহন হাসি, বধূর কণ্ঠে এসে দুল্‌বে, বরের গলার মালা! চোখের পাতায় দেবে চুম্বন, জীবন ভ'রে উঠ্‌বে। হাসি-কান্নার সুরে বাঁধা

বধূর দেহটি থাক্‌বে বীণার মত বরের কোলে, তার মোহন অঙ্গুলি স্পর্শে দেহ বীণার সবক'টি তারে বাজ্‌বে একটি সুর—মরণ—মরণ—মরণ—'

কি বল্‌ছ ?—ছ্যা-ছ্যা ! জোলো কবিত্ব ? দেখ শ্রী, তোমার ঐ অবিশ্বাসী মনটা যেন আমার সতীন ! কোন মতে ওর গলাটিপে মেরে ফেল্‌তে পার্‌তাম—'

* * * *

'কোথায় যেন পড়েছি—Infinite passion and the pain of the finite heart that yearn—এই ধরণের একটা কথা।—আজ বার বার তাই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, সব চাওয়াই কি অসীম, আর পাওয়া গুলো সব স-সীম ? বেশ ব্যবস্থা কিন্তু !

আস্‌বে একবারটি ?—'

* * * *

'তোমার কাছ থেকে একটা জিনিষ চেয়ে নিতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে, দেবে ?—কিন্তু চেয়ে নেওয়ার চেয়ে অমনি পেলে আরো ভাল লাগে, তাই এত দিন চাই নি ; আশা ধরেই বসে বসে পাওয়ার স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তুমি যা কৃপণ, তাতে আশা বিশেষ নেই। আচ্ছা ধর যদি ভিক্ষে না চেয়ে ডাকাতি করি, তুমি কি করতে পার ? তুমি যখন তোমার টেবিলে বসে ঘাড় গুঁজে 'প্রেতনীতত্বের' পুঁথি লেখ, তখন যদি পিছন থেকে দুহাত দিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে আমার মুখখানা চেপে ধরি তোমার মুখের ওপর, কি হয় ? পারি না ভাবছ ?—খুব পারি। কিন্তু আমি তা করব না। আমি আশা ধরেই বসে থাক্‌ব।—এমন লক্ষীমেয়েকে তুমি ভালবাস না ! আমারই যে লোভ লাগ্‌ছে !—'

* * * *

. . . . সকাল বেলা তোমাকে চিঠিটা যখন লিখি, তখন বৈরাগ্য-সাধনের কতকগুলি কবিতা পড়্‌ছিলাম, তাই মনটাও সেই রকম স্যাঁৎ সেঁতে হয়ে উঠে-ছিল।—'যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই, তাহা চাহি না।' এই সব। আর এখন যা পড়্‌ছি, তার মধ্যে বহু যুগের সুপ্ত-হিংসা, বুভুক্ষা লোভ বাসুকির মত সহস্র ফণা নাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে ! এর মধ্যে আছে বল্‌শেভিকবাদ। যা' লুটেপুটে নিতে পার, তাই তোমার . . . এখন এস না, বিপদে পড়্‌বে—'

* * * *

কাল মায়ার সঙ্গে আমার ছাড়া-ছাড়ি হয়ে গেল। তুমি চলে যাবার একটু পরেই ও এসেছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ সইতে পারি নি। মরুভূমির দেশে জন্মেও যে

সরলতা ওর বুকে ছিল, তুমি তোমার শিক্ষায় দীক্ষায় তা সরিয়ে নিয়েছ। ওর একমাত্র উপমা আমার মনে হয়—(কবির ভাষায়) মরুভূমির মঞ্জরীহীন লতা। চল্‌তি কথায়—ঝামা। ভালবাসার নামে তোমারই মত নাক্ সিঁটকায়! যেন কেউ ওকে কড্‌লিভার অয়েল খেতে বল্‌ছে! ডেঁপোর মত লম্বা লম্বা কথা বলে, সব বই-পড়া-বুলি, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। ঝামা মানুষের উপকারী, হাজারবার সে কথা স্বীকার করি। বাসন-কোসন মাজ, কৃতার্থ হব, কিন্তু আমার পিঠের ওপর যে বস্‌বে, সে অসহ্য। ওকে বলেছি—তো'তে যে দিন ফুল ফুটবে, সেদিন তোর কাছে আমি নিজেই আস্‌ব।—ঠিক এই কথাটা তোমাকেও বল্‌তে পার্‌তাম—'

* * * *

'··· তোমার মা বাবাকে দেখি, আর মনে হয়, ঐ শান্তি-সুখের কোলে পৌছবার পথে, তুমি আমার পাষাণ-প্রাচীর। তুমি যদি শুধু কঠিন হ'তে তোমায় আমি খেলা ছলে ভেঙ্গে ফেল্‌তাম। আমারই পায়ের ওপর তুমি পড়্‌তে লুটিয়ে।—কিন্তু তুমি যে অবিশ্বাসী—'

* * * *

'··· প্রতিজ্ঞা ক'রে তোমাকে চিঠি লেখা বন্ধ কর্‌ব ভাবছিলাম। বার ঘণ্টার মধ্যে তিনখানা চিঠি লিখেছি বলে হাস্‌লে, আমারই সাম্‌নে বসে! তবু প্রতিজ্ঞা যে করি নি, ভালই হয়েছে; করলে ভাঙতে হ'ত। বিকেলে একটু বেড়াতে বেরিয়ে ছিলাম, ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলাম। তুমি বার ঘণ্টায় তিনখান লেখ নি, তুমি লিখেছ, বার দিনে তিনখানা। সবটুকু পড়েছি। বেশ লাগ্‌ল। বুকের ভিতরটা হিম হ'য়ে আস্‌ছিল। তুমিই জগতে একমাত্র সুখী মানুষ। মনে হচ্ছে, কোন জিনিস না পেলে তোমার মত বে-পরোয়া ভাবে বল্‌তে পার্‌তাম, 'বয়ে গেল' আমার কোন দুঃখই থাক্‌ত না। মুখ রয়ত বলে অনেক সময় কিন্তু প্রাণটা তখন যেন আরো কেঁদে ওঠে!

তুমি বোধ হয় কখনও disappointed হও নি?—হ'লেও হয়ত 'বয়ে গেল' বলে পার পেয়েছ? থাক্, আজ একজনের disappointmentএর কথা তোমায় শোনাই। জিগ্‌গেস ক'রনা কিন্তু সে কে। বল্‌ব না। তুমি তার প্রতি একেবারেই interested নও, এমন একজন মানুষ, তার একজন বন্ধুকে বিশেষভাবে ডেকেছিল। এমন্ বিপদে পড়েছিল সে, যে তার অবস্থাটাকে কথা দিয়ে ঠিক বোঝান যায় না। তার এই বন্ধুটি তখন যদি তাকে Fail করে, তবে সে ডুব্‌বেই, এমন উৎকণ্ঠায় তার সময় কাট্‌ছিল। সকাল গেল, দুপুর এল। দুপুর গেল,

সন্ধ্যা এল, রাত্রি গভীর হ'য়ে উঠ্‌ল। ঘড়ির প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত ছুরির মত তার বুকে বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল—তবু আশা—যদি আসে—'

এখন বল্‌তে পার, সে এসেছিল কি না? আচ্ছা এমন বিপদের সময় সব জেনে শুনে দূরে সরে থাকৃলে কি প্রমাণ হয়?—কি বল্‌ছ? 'নিজের পায়ে নিজে না দাঁড়াতে পার্‌লে কেউ কাকেও তুলে ধর্‌তে পারে না।' তার চেয়ে বল্‌লেই ত হয়—'তুমি চ'রে থাও, আমি পার্‌ব না তোমার ঝঞ্ঝাট পোহাতে।'

সময় সময় ভাবি, তুমি কেন সেই অমানুষগুলোর আবির্ভাবের যুগে জন্মালে না! নারী-শরীর থেকে ভোগের সুরা পরিপূর্ণ মাত্রায় পান ক'রে নিয়ে যারা জগতে প্রচার ক'রে বেড়াত—কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ—তুমি তাদের সকলের গুরু হ'তে পার্‌তে। কাঞ্চনে তোমার স্পৃহা নেই, কামিনী তুমি স্পর্শ কর নি। পুণ্যের ফুলে ডবল প্রমশন পেতে পেতে এত ওপরে উঠে যেতে, যে মাটিকে আর চোখেই দেখ্‌তে পেতে না।

রাগ হ'ল? ঝগড়া করতে যে ভারি ইচ্ছে কর্‌ছে, কি করি? আমার একটি বন্ধুর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে, দুটোতে যখন বিনিয়ে বিনিয়ে ঝগড়া করে, ভয়ে মরি! ভাবি বুঝি সব গেল! তার পর একটু নিরালা পেলেই দেখি দুটোতে—কিন্তু থাক্ সে কথা।'

* * * *

'.. কত প্রশ্নই যে কর্‌লাম কত চিঠিই যে লিখ্‌লাম, তার ঠিক নেই! —কিন্তু না, আমি নালিশ কর্‌ছি না; মনে একটু অভিমানের মেঘ জমা হ'য়ে উঠেছে মাত্র, একটু কাঁদ্‌লেই আবার বুক হাল্কা হয়ে যাবে।

চিঠি না লিখে তোমায় যদি জব্দ করা যেত তা আমি কর্‌তাম; কিন্তু জানি যে, ওতে তোমার কিছুই আসে যায় না। না লিখ্‌লে আমারই বাঁচা দায়, তোমার খবর পাই না।

সেদিন আস্‌বার সময় ট্রেনে সমস্ত রাত কেঁদেছি, চোখ দুটো ফুলে উঠে ছিল। মা জিগ্‌গেস কর্‌লেন, কি হয়েছে? আমি বল্‌লাম বালি পড়েছে।—সত্যি শ্রী, তুমি আমার চোখের বালি। তুমি আমার প্রাণ বার ক'রে দিলে!

চাই না তোমার চিঠি। এই ত চার দিন আজ তোমায় দেখি নি, মরে কি গেছি; বেশ আছি। আমি আর ফির্‌ব না এখান থেকে। বেশ জায়গাটা! শুধু মাঠ, আর মাঠ! বেশী গাছ-পালা দূরের কথা বেশী ঘাস পাতাও নেই।

ইচ্ছে করে, পায়ে হেঁটে চলে যাই, মাঠের পারে ঐ নীল পাহাড়ের সীমা-রেখাটির উদ্দেশে।—যাবে আমায় নিয়ে? এস না—'

পুনঃ—দেখ, কল্পনায় মনের মত ছবি আঁকার শক্তি যদি মানুষের না থাকত, তা হলে, আমাদের মত মানুষের বাঁচাটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াত! পাই আর না পাই, 'পাব' এই কথাটা কি ক'রে যে বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে তা আমি জানি। তুমি জানবে না কারণ তুমি ত মানুষ নও—'

কথা শোনার নেশায় শ্রীশের মন তখন মশ্‌গুল্‌ হইয়া উঠিয়াছে। লোভীর মত সে আপনার গুপ্ত ভাণ্ডারে সঞ্চিত রত্ন, একটি একটি করিয়া দেখিয়া লইতেছে। এমন করিয়া তাহাদের উপর হাত বুলাইতেছে, যেন তাহারা তাহার প্রিয়ার বেদনায় উত্তপ্ত গাল দুটি! পাতার পর পাতা উন্টাইয়া যায় আর কত পুরাতন অর্থ-ভরা কথার সুর তাহার বুকের মধ্যে বাজিয়া উঠে।—কিন্তু এবার যাহা শুনিল তাহার সুর সতন্ত্র। ইহা আশা আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত আগমনী সঙ্গীত নয়; ইহার প্রতি ছত্রে বিসর্জ্জনের কান্না জাগিতেছে!

'. . . . আমি আমার অপমান সহিতে পারি, প্রেমের সহে না যে অপমান। সত্যি সত্যি সইতে পারি না, পারলাম না। আজ সারা দিন নিজের মনে ঐ কথাটা বলেছি আর কেঁদেছি। বাড়ীর লোকের কাছে ধরা পড়েও এ কান্না আমার থামাতে পারি নি, তাই আমার প্রতি সংশয়ে এঁদের মন ভ'রে উঠেছে।

কি করব? আমি অযোগ্য হতে পারি, তাই বলে আমার প্রেমেও মিথ্যে হবে! তুমি লিখেছ—'ভালবাসিটা মিথ্যে কথা।' হয়ত তাই হবে কে জানে? এই মিথ্যার উপাসক তোমার কাছ থেকে আজ চির বিদায় নিল। এ মিথ্যা দিয়ে তোমার মনে আর গ্লানি আনব না কোন দিন। এ মিথ্যা রইল আমার নিজের জন্যে। আমার এ মিথ্যা রূপও তুমি আর কোন দিন দেখ্‌বে না।

তুমি ছিলে আমার ছোট বেলার খেলার সাথী, কৈশোরে তুমি হলে আমার বন্ধু। যৌবনে আমি তোমায় ভালবাসলাম। সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধরলাম তোমার মুখের কাছে, তুমি নিলে না!

ভারি দুঃখ হচ্ছে শ্রীশ। আমি জানি একদিন এই কথা মনে ক'রে তোমার বুক ফেটে যাবে। তোমাকে আঘাত কখনও দিই নি। কিন্তু এবার দেব। তোমার পাথরের চোখ গলে জল ঝরবে। ব্যথার রক্তে রাঙা তোমার বুক আমি দেখ্‌ব। আমি খুসী হব। সাধারণ মানুষের মত, অপদার্থের মত হিংসার অনুশোচনার আগুনে তোমাকে তিল তিল ক'রে জলে পুড়ে মরতে দেখ্‌ব। আমার সমস্ত

বিসর্জ্জন দিলাম, সেই সুখ সেই আনন্দকে বুক ভ'রে দেখে নেবার জন্যে। শান্তিকে চিরদিনের জন্যে তোমার মন থেকে নেব সরিয়ে।—তোমাকে জাগাব তোমাকে কাঁদাব আমারই জন্যে। আমি যে ছিলাম তোমার জীবনে, আমি যে চলে গেলাম তোমার জীবন থেকে, তা তুমি জান্‌বে। আমাকে যে অপমান করেছ তাকেই ফিরে পাবে তোমার বুকে। প্রতি চিন্তায় তার তীব্র দংশনের জ্বালা অনুভব করবে। অপমানকে তুমি চিন্‌বে! আর তারই সঙ্গে চিন্‌বে তটিনীকে।—সেই হবে আমার তোমায় পাওয়া . . . ”

কি আশ্চর্য্য নারী প্রকৃতি! অমৃত যেন বিষ হইয়া উঠিয়াছে! যে মুখের কথাকে শ্রীশ একদিন বিশ্বাস করে নাই, তাহাকেই পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করিয়াছে। ঐ ভীষণ ভয়ঙ্কর কথাগুলি যে মৃত্যুতাণ্ডবের আগমনী শুনাইয়া ছিল, তাহাকে কে পাইয়াছে। দিনের পর দিন সর্ব্বনাশী লীলাময়ী নারীর নিষ্ঠুর চরণাঘাতে তাহার বক্ষের পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! কি কঠিন সে প্রেমের আঘাত!

মনে পড়ে সেই দিনের কথাটি। চিঠির লেখাকে সত্য বলিয়া ভিতরে বাহিরে শ্রীশ যেদিন অনুভব করিল, সেই শেষ চিঠিখানি হাতে লইয়া কম্পিত বক্ষে সে সেদিন তটিনীর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।—কিন্তু কোথায় তটিনী? তাহার স্থান অধিকার করিয়া তাহার চোখে মুখে গলার সুরে সর্ব্বশরীরে যে আসিয়া বসিয়াছে সে কে? কে তাহাকে ব্যঙ্গের সুরে অভ্যর্থনা করিল।—এই যে শ্রীশ বাবু! হঠাৎ পথ ভুলে নাকি?—

তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিলেও সে বলিয়াছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলাম তোমার কাছে তটিনী।

লীলাভরে শরীর দোলাইয়া তটিনী উত্তর দিয়াছে।—বলুন—

ঠিক এই সময় পার্শ্বে উপবিষ্ট একজনের কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিয়াছে—Propaganda works নাকি শ্রীশ বাবু?—আজকাল দেখা যায়, একজন মেয়েকে সামনে রাখ্‌লে আপনাদের কাজের যেন ঢের সুবিধা হয়—' সঙ্গে সঙ্গেই আরো কয়েকটি কণ্ঠের চাপা হাসির শব্দ সে শুনিয়াছে। মুখ ফিরাইয়া তাহাদের প্রত্যেককেই শ্রীশ দেখিয়াছে।—চিনিয়াছে—তটিনীর মৃত্যু-তাণ্ডবের তাহারা সহচর! গ্রীবা বাঁকাইয়া তাহার দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া তটিনী আবার বলিয়াছে—বলুন—'

বিমূঢ়ের মত শ্রীশ স্বীকার করিয়াছে—একটা কোন বিশেষ দরকারী কথা

তাহাকে সে বলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার কিছুই এখন মনে হইতেছে না!

হাসির সুরে, কৌতুকের আড়ালে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ-বহ্নির জ্বালা, শ্রীশের শরীর-মন ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। গভীর আনন্দে তটিনী তাহা দেখিয়াছে। সে পৈশাচিক আনন্দের তীব্রতা শ্রীশও অনুভব করিয়াছে, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারে নাই! নির্ব্বোধের মত একান্ত অসহায় ভাবে বসিয়া থাকা ছাড়া, সে আর কি করিতে পারে? তাহার দিকে না চাহিয়া বা না চাহিবার ভাণ করিয়া তটিনী আর সকলের সহিত তাহার অফুরন্ত কল-হাস্যে ঘরখানি ভরিয়া দিয়াছে! শ্রীশ দেখিয়াছে; সমস্ত শুনিয়াছে। নিজেকে তাহার মনে হইতেছিল, সে যেন আদি যুগের সেই প্রথম মানুষ, যে পাথর লইয়া খেলা করিতে করিতে সহসা অগ্নিকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে! তাহার চারি পার্শ্বে আগুন, সহস্র লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার নড়িবার শক্তি নাই! সেই ভয়ঙ্কর রূপের মায়া জালে সে বাঁধা।—নিরুপায়!

গোধূলির আলো নিভিতেই, ঘরের কয়েকটি উজ্জ্বল আলো জ্বালা হইয়াছে, সেই সঙ্গেই তটিনী তাহাকে বলিয়াছে—ভারি বিশ্রী একটা Gloomy ভাব আপনি ঘরে এনে ফেলেছেন শ্রীশ বাবু! কোথাও প্রেমে টেমে পড়েছেন নাকি?—বলুন না, একটু ঘটকালি করি—'

যন্ত্র চালিতের মত শ্রীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বহু কণ্ঠের প্রশ্ন হইয়াছে—চল্‌লেন?—বসুন না আর একটু—'

জীবনে প্রথম সেই দিন পরিপূর্ণভাবে তাহার দুই চক্ষু মেলিয়া শ্রীশ বাহিরের জমাট অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারকে প্রথম জীবন দিয়া অনুভব করিল।

তাহার পর তটিনীকে ফিরাইবার তাহার সে কি বিপুল আগ্রহ! কিন্তু কোথায় তটিনী?—তাহার সন্ধান মিলিল না! কিন্তু দিনে দিনে তাহারই জন্য আহরণ করা, একান্ত যত্নের সহিত সৃষ্টি করা অপমানের কালি আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল তাহার ললাটে, যাহার দাগ কিছু দিয়াই সে তুলিতে পারিল না।

পারিল না কিন্তু দূরে সরিয়াও গেল না। সে রহিল ঐ মরণ-পথ-যাত্রীনীর অতি নিকটে। যেখান হইতে তটিনীর দেওয়া আঘাতগুলি সবার অলক্ষ্যে অতি সহজে সে পাইতে পারে, এমন স্থান, সময়, সুযোগ সে খুঁজিয়া বাহির করিত! একান্ত নিষ্ঠার সহিত ঐ বেদনাকে সে আপনার বক্ষে ধারণ করিত।

তটিনীর বক্রগতি-রেখার অনুসরন করিয়া অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন সে চলিত। বাহিরের কেহ তাহার খবর রাখিত না। কিন্তু কোথাও কেহ প্রেমের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছে দেখিলে সে আর স্থির থাকিতে পারিত না। একেবারে বুক দিয়া গিয়া পড়িত। অবিশ্বাস করিয়া যে দুঃখ সে পাইয়াছে তাহা কাহাকেও পাইতে দেখিতে যেন সে পারিবে না। নারীর প্রতি বিদ্বেষে ভরা সুপ্রকাশের মনের সহিত সে দিনের পর দিন সংগ্রাম করিয়াছে! যুক্তি তর্কে হারিয়াও সংগ্রাম তাহার থামাইতে পারে নাই! তাহার পর শান্তার পার্শে নূতন সুপ্রকাশকে সে যেদিন প্রকাশিত হইতে দেখিল, সেদিন তাহার কি আনন্দ! শান্তা ছিল তাহার জীবন-মরুর বুকে শান্তির উৎস কিন্তু আপনার সুখ-স্বার্থের তৃষ্ণা মিটাইবার উপায়স্বরূপ যাহাকে সে ব্যবহার করিতে পারে নাই। বারে বারে তাহার স্নেহ-করুণ হাত, আপনার উত্তপ্ত ললাট হইতে একান্ত শ্রদ্ধার সহিত সরাইয়া রাখিয়াছে। শান্তাকে সুপ্রকাশের হাতে তুলিয়া দিয়া নূতন করিয়া আশ্রয়-হীনের দুঃখকে সে বরণ করিয়া লইয়াছে। আজ তাহারা সুখী। শ্রীশের বুকও তৃপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছে।

কোলের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিঠিগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটি কাগজের উপর তাহার চোখ পড়িল। কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তৃষিত অন্তরে নারীত্বকে প্রথম উপলব্ধি করিয়া তটিনী তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে—'কেউ জানে না! আমি তোমাকে লুকিয়ে চিঠি লিখ্‌ছি। সবাই শুন্‌লে রাগ কর্‌বে। তুমিও বক্‌বে জানি, তবু না লিখে পার্‌ছি না! কত রাত হয়েছে কে জানে! কিছুতে ঘুমোতে পার্‌ছি না! তুমি এখন একবার আমার কাছে আস্‌তে পার না? এস না লক্ষীটি। তা হ'লে কি মজাই না হয়!—প্রথমে আমার কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠ্‌বে, তারপর বাবা বল্‌বেন—কে-অ? —আর আমি বল্‌ব—চোর। আমার মন চুরি কর্‌তে এসেছে!

সাহস হয়? হয় না? ভীরু!—এই শোন, তুমি আমার গল্প লেখার খাতা নিয়ে পালিয়েছ কেন? চোর! পত্র পাঠ ফিরিয়ে দিয়ে যাও। নইলে আমার দুঃখ হ'বে, আমি কাঁদ্‌ব। ঝর ঝর করে আমার চোখ দিয়ে জল পড়্‌বে তুমি না এলে।'

সুখের ভারে শ্রীশের মন ভরিয়া উঠিল। টেবিলের উপর ছড়ান লেখার রাশির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চোখের পাতা অবসাদে মুদিয়া আসিতেছে, এমন সময় তাহার কপালের উপর কাহার হাতের স্পর্শ পাইয়া সে চমকিয়া উঠিল! মাথা তুলিয়া দেখিল—মা!

দুষ্ট ছেলে, অপাঠ্য নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করিবার সময়, সম্মুখে গুরুজন দেখিলে যেমন করিয়া তাহার উপর পাঠ্য পুস্তক চাপা দেয় তেমনি করিয়া ঐ ছড়ান চিঠিগুলির উপর তাড়াতাড়ি কতকগুলি বই খাতা চাপা দিতে গিয়া চোরাই মালগুলিকে করুণার আলো চোখের কাছে আনিয়া দিল! শেষে, নিজের এই অকৃতকার্য্যের হাস্যকর ছবির কথা মনে করিয়া নিজেই হাসিয়া ফেলিল।

সদ্য অপরাধী অবোধ শিশুকে হাতে হাতে ধরিয়া মা যেমন করিয়া শাস্তি দিতে লইয়া যায় তেমনি করিয়া শ্রীশের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বিছানায় শোয়াইয়া করুণা বকিয়া উঠিলেন—হতভাগা ছেলে, আমাদের একেবারে শেষ ক'রে তবে ছাড়্‌বে। উনি কিছু বলেন না, আমিও কোন কথা কই নি। কিন্তু তোর কি চোখ নেই? একেবারে কসাই হয়েছিস্‌!

করুণা বকিলেন, কিন্তু তাঁহার হাতখানি রহিল শ্রীশের কপালে! শ্রীশের মন হইতে সমস্ত অবসাদ যেন মুছিয়া লইল! হাসিয়া বলিল—তুমি বকতে জান না মা। মাসীমার কাছে শিখে এস।

করুণা বলিলেন—আচ্ছা, আর পাকামো করতে হবে না, ঘুমো। আমি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আসি।

শ্রীশ। আবার আসি কেন? শোও গে। আমি ত শুয়েছি!

করুণা। আমি তোর কাছেই শোব।

আলো নিভিয়া গেল এবং পরক্ষণেই শ্রীশ, মাকে পাইল তাহার কাছে। গভীর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—একটু সকাল-সকাল তুলে দিও মা; এক জায়গায় যেতে হবে।

করুণা বলিলেন—সকালের আর বাকী কি? এত যদি তাড়া থাকে তা হ'লে এখুনি যা না?

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—তাড়া আছে তবে এত সকালে নয়।

৩৮

গত সন্ধ্যায় তটিনীকে শ্রীশ কথা দিয়াছিল, সে সকালেই আসিবে। কিন্তু যখন আসিল তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে। ফটকে ঢুকিতেই দেখিল, দেওয়ালের গায়ে লাগান সাদা এবং লাল এন্টিগোনামের ফুলশুদ্ধ ডাল ধরিয়া তটিনী টানাটানি করিতেছে! তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত সহজ সুরে তটিনী বলিল—শ্রীশ, দাও না একটা ভাল দেখে ডাল ছিঁড়ে—'

তটিনীর গলার স্বরে গত সন্ধ্যার কোন আবেগ বা উৎকণ্ঠার আভাষ পাওয়া গেল না। শ্রীশ ফুল পাড়িয়া দিল, তটিনী হাত পাতিয়া লইয়া বলিল—চল ওপরে।

ঘরে আসিয়া ফুলগুলি একটি ফুলদানিতে রাখিয়া তটিনী বলিল—আমি এখনও চা খাই নি। তোমার সঙ্গে খাব বলে অপেক্ষা করছিলাম।

শ্রীশ। আমি সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাতে বসে বসে তোমার চিঠিগুলো পড়্‌ছিলাম এমন সময় মা এসে জোর করে আমায় বিছানায় শুইয়ে নিজে পাশে শুলেন।

তটিনী। আমারও প্রায় সেই দশা। তবে আমার পড়্‌বার কিছুই ছিল না। মাও ছিলেন না আমার পাশে। শুধুই একটা চেয়ারে বসে রাত কাটিয়ে ভোরে ঘুমিয়ে পড়েছি! —জীবনবাবু যখন ওপরে যাচ্ছিলেন তখন জাগ্‌লাম।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে শ্রীশ বলিল—জীবন?—

তটিনী। হাঁ, তিনি সুধার কাছে আছেন। নাব্‌বেন হয়ত একটু পরেই।

শ্রীশ। সুধার কাছে?—

তটিনী। অত অস্থির হয়ো না। সব বল্‌ব আজ তোমাকে।

এই সময় তটিনীর মাদ্রাজী আয়া, চায়ের ট্রে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তটিনী জিজ্ঞাসা করিল।—উপরে দিদিমণির কাছে চা পাঠান হইয়াছে কি না?

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী ভাষা মাদ্রাজী সুরে বাঁধিয়া আয়া বলিল—They Fin-nis long ago, onny shab, he Sleep-pin' with towel full of ice-e on his head-e—He drinked lot last night-e—'

অতি দুঃসংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু হাসি থামে কি করিয়া? কোন মতে সংযত হইয়া তটিনী আয়াকে বলিল—এখন যাও, দরকার হ'লে ডাক্‌ব।

তটিনী চায়ের কাপে চিনি দিয়া তাহাতে ঢালিতেছে। শ্রীশ তাহার হাতের দিকে চাহিয়া আছে। তটিনী বলিল—এ বাড়ীটার কিছু নতুন নতুন লাগ্‌ছে না তোমার?

শ্রীশ। সমস্ত! এত খদ্দরের আমদানী হ'ল এখানে কি ক'রে? ও পর্দ্দা-গুলো আগে বিলিতি কাপড়ের ছিল।

তটিনী। ও সব তোমার কারখানায় তৈরী।

শ্রীশ। আমার কারখানায়?

তটিনী। হাঁ, শুধু আমি রং করিয়ে নিয়েছি। আমার এ কাপড় জামা

এও সব তোমার তৈরী। তুমি জেলে যাবার পর থেকেই এ গুলো ব্যবহার কর্ছি। তবে বাইরে আমার এতদিন সিল্ক্ ছিল। কয়েকদিন হ'ল তাও বন্ধ করেছি।

কথা বলিতে বলিতে চায়ের কাপ্ শ্রীশের দিকে বাড়াইয়া দিয়া তটিনী বলিল—আমি তোমাকে ডেকেছি আমার নিজের কোন বিপদের ভয়ে নয়, তোমার বন্ধু জীবনের জন্যে। ও এমন একটা কাজ কর্তে যাচ্ছে, যার জন্যে হয়ত ওকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ কর্তে হবে।

শ্রীশ ব্যাকুলভাবে বলিল—আমি আর থাক্তে পার্ছি না তটিনী, একটু তাড়া-তাড়ি বলে ফেল কথাটা—

তটিনী হাসিয়া বলিল—তোমার অনেকখানি বদল হয়েছে শ্রীশ, তুমি এখন সাধারণ মানুষের মত কথায় কথায় উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে ফেল!—বল্ছি, কিন্তু এই সঙ্গে আমার কথাও যে কিছু তোমায় শুন্তে হবে। নইলে কিছুতেই পরিষ্কার হবে না ব্যাপারটা।

কথাগুলি বলিয়া অন্যমনস্কভাবে সে খানিকটা গরম চা খাইয়া ফেলিয়া তাড়া-তাড়ি গিলিয়া ফেলিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—এখুনি পোড়ারমুখী হয়ে ছিলাম আর কি!

শ্রীশ হাসিল কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ ধরিয়া চায়ের কাপে চামচটি নাড়িতে নাড়িতে মাথা তুলিয়া তটিনী বলিল—আমার শেষ চিঠির কথা তোমার মনে আছে শ্রীশ?—

শ্রীশ বলিল—আছে।

তটিনী। সব কথা?—

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—পরীক্ষা ক'রে দেখ্তে পার।

তটিনীও হাসিয়া উত্তর দিল—বেশ, বল, বিশেষ ক'রে আমি তোমাকে এমন কোন কথা বলেছি, যার ভিতর দিয়ে আমার একটি মাত্র, আর সব চেয়ে বড় উদ্দেশ্য সাধন কর্বার আভাস প্রকাশ পেয়েছে?

শ্রীশ। 'শান্তিকে নেবো চির দিনের মত তোমার বুক থেকে সরিয়ে'।—তুমি নিয়েছ, একথা আজ অকপটে তোমার কাছে স্বীকার কর্লাম। তুমি জয়ী।

আরক্তমুখে তটিনী বলিল—এবার আমার গল্প আরম্ভ করি।—ঐ ছিল আমার প্রধান উদ্দেশ্য। সব দিক দিয়ে সমস্ত রকমের আঘাত দিয়েও তোমাকে হার মানাতে পারিনি, কারণ দুঃখ অপমানকে তুমি শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় তুলে নিতে! ঐ আঘাত দেওয়ার মধ্যে আমিই শুধু দিনে দিনে ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম।

তুমি হ'য়ে উঠ্‌ছিলে বড়।—অমলকে দীপ্তির কাছ থেকে আমিই সরিয়ে নিয়েছিলাম শ্রীশ—

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে শ্রীশ বলিল—তুমি ?—

তটিনী। হাঁ সমস্তের মূলেই আমি, কিন্তু তোমরা জান মিসেস্ ডি—'

শ্রীশ আবার বলিল—তুমি !—

তটিনী অবিচলিত কণ্ঠে বলিল—হাঁ শ্রীশ, আমি। মিসেস্ ডি—আমার একটা মুখোস মাত্র। ঐ নির্ব্বোধ অপদার্থ মানুষটাকে আমি তোমার শান্তি-হরণের একটা যন্ত্রের মত এত দিন ব্যবহার ক'রে এসেছি।

শ্রীশ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। তটিনী বলিতে লাগিল—সুধা আমার সেজ মাসীর মেয়ে সে ত জানই; ও যখন বিলেত গেল, সেই সময় অমলকে লিখি—'ও যদি সুধাকে বিয়ে করে, তাহ'লে আমার কার্সিয়ংএর বাড়ী, আর নগদ কিছুটাকাও যৌতুক স্বরূপ সে পাবে'—আর বিশেষ কিছুই আমায় ভাবতে হয় নি। সুধা, অমলকে ভালবাসত কি না জানি না। কিন্তু ওর সুন্দর মুখের ওপর একটা টান ছিল, কিন্তু অমল গরীবের ছেলে বলে, আমার মেসো রাজী ছিলেন না। আমার এই যৌতুকে, ওদের অনেকখানি মেঘ কেটে গিয়ে সেটা এসে পড়্‌ল তোমাদের ভাগে।

—অমলকে সরালাম কিন্তু বিকাশ এল দীপ্তির পাশে। তোমরাও আবার সুখী হয়ে উঠ্‌লে। কিন্তু দীপ্তি হল এবার আমার সহায়, সে বিকাশকে বুঝ্‌তে পার্‌ল না। আমি খুশী হয়ে উঠ্‌লাম। কিন্তু বেশী দিন সে খুশী আমার রইল না। অসিত এসে দীপ্তির সে ভুল শুধ্‌রে নিল।—কিন্তু আমি সহ্য করি কি ক'রে ? অমলকে আবার পাঠালাম দীপ্তির কাছে, সেই সঙ্গে মিসেস ডি—'কেও দিলাম টিপে। কিন্তু কিছু হ'ল না। মুখ কালো ক'রে অমল ফিরে এল।—

এবার কি জানি কেন এই দারুণ পরাজয়ে আমি নিজে খুশী না হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না; সে খুশী আমি অমলের কাছেও প্রকাশ কর্‌লাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখ্‌লাম, আমার নিজের জালে আমি নিজে বাঁধা!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তটিনী বলিল—আমি যেন এখুনি মরে যাব, তাই তোমার কাছে আমার সব কথা ব'লে নিচ্ছি! না শ্রীশ ?—

শ্রীশ শুধু বলিল—বল।

এক নিশ্বাসে শেষ চা-টুকু খাইয়া মুখ মুছিয়া তটিনী বলিল—সুধা আমার কাছে কেঁদে পড়্‌ল—ও কেন এখনও দীপ্তির কাছে যায়, লোকে যে অনেক কথা বলছে—

আমি বল্‌লাম—আমি চাই না সুধা,ঐ জানোয়ারটার হাতে তোকে তুলে দিই।

সুধা আমার ওপর ক্ষেপে উঠ্‌ল! আমি বুঝ্‌লাম ও অনেক দূরে গেছে।—কিন্তু কত দূরে যে, তা তখন জান্‌তাম না। তাই নির্বোধের মত সবার সামনেই এক দিন অমলের কথা বলে ফেল্‌লাম। তার পরই জীবনে যত দুঃখ আঘাত মানুষকে দিয়েছি তা ফিরে এল আমার বুকে—অমল সুধার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল।—বিয়ের দিন এক রকম ঠিক হয়েই ছিল।

সুধা আবার আমার কাছে এসে কেঁদে পড়্‌ল—এ কি হ'ল!—

আমি বল্‌লাম—ভাল হ'ল।

ও বল্‌ল—না-না! সে হ'তে পারে না—'

তার কান্না কিছু দিয়েই থামাতে পারি নি! তার সে ভীত চাউনি আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে—'হ'তে পারে না—হতে পারে না', এ কান্না আমার কানে আজও লেগে আছে! সে যেন দীপ্তিরই কান্না! একবার সয়েছি, তাতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে, দুবার কি পারি? নিজেই গেলাম অমলের কাছে।—বল্‌লাম, দেখ, তোমরা অনেক দিন engaged ছিলে, এর পর বিয়ে ভাঙ্গা ঠিক নয়। তুমি পুরুষ, তোমার কোন দোষই কেউ দেখ্‌বে না, দুষ্‌বে ওকে।

অমল কোন উত্তর দিল না।

তার হাত ধরে বল্‌লাম—আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক তোমায় লিখে দিচ্ছি।

সে উত্তর দিল—হিন্দু সমাজের এক ব্রাহ্মভাবাপন্ন জমীদারের এক মাত্র মেয়ের সঙ্গে তার কাকা বিয়ের ঠিক করেছেন। দিনও ঠিক হ'য়ে গেছে।

আমার মুখের কাছে এগিয়ে এল, সুধার বলা কথাটি। মনে হ'ল বলি,—কিন্তু কিছুতেই তা পার্‌লাম না।

সে কি অশান্তির ভিতর দিয়ে আমাদের দিন কাটতে লাগ্‌ল! সুধাকে আমি নিজের কাছে নিয়ে এলাম। এই সময় সুধার খুব একদিন অসুখ হ'ল! আমি যে ডাক্তারকে ডাক্‌লাম, ছোট বেলায় সে আমাদের বাড়ী আস্‌ত। তোমার সঙ্গে তার আলাপ আছে, জীবন বাবুর বিশেষ বন্ধু। ডাঃ দত্তের এসিস্‌টান্ট—তপন সাহা।

তিন দিন সব দিক দিয়ে ভেবে আমি ঠিক কর্‌লাম—সুধার ও ছেলেকে পৃথিবীতে আস্‌বার আগেই সরাতে হবে।

তপন বল্‌ল, আমার দ্বারা হ'বে না। তা হ'লে ও ভারটা ডাঃ দত্তকেই দেবেন।

পাশের ঘর থেকে সুধা আমার কথা শুনতে পেয়ে আর তপনের ঐ সহানুভূতির সুরে সাহস পেয়ে, আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—আমি ভুল করি নি, দোষ

ও করি নি, তবে নির্দ্দোষী আমার ছেলেই তার শাস্তি পাবে কেন?—ও আসুক, আমার সব অপমান সহ্য হবে।

তখন আমার দিকে ফিরে বল্‌ল—'মিসেস দত্ত, সুধাকে কয়েকদিন আপনার হাতেই আমি রাখ্‌ছি, যে পর্য্যন্ত না আমি ওর ভার নিতে পারি।—আপনি ওর জন্যে দায়ী।'—আমি সুধাকে আমার বুকে টেনে নিলাম।

সেই দিন সন্ধ্যা বেলা তোমার বন্ধু জীবন এল আমার কাছে।—বল্‌ল তখন আমায় পাঠিয়েছে, সুধাকে আমি নিয়ে যাব আমায় যার কাছে।

আমার তখন সব বিষয় বিবেচনা কর্‌বার শক্তি হারিয়েছে; বল্‌লাম আপনার স্পর্দ্ধা কম নয়!

সে হেসে বল্‌ল—খুব বেশী মিসেস্ দত্ত। আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি তাকে নিজেই খুঁজে নিচ্ছি।—

খুঁজে নিল।

তার পর সুধার ঘরে এসে দেখি, জীবন তার পাশে বসে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে!

তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর এই দু'বার আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল, কিন্তু দু'বারই সুধার জন্যে।

তার পর হ'ল এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। দুজনের সে কি ভীষণ সংগ্রাম। সুধা হার মান্‌বে না, জীবন হার মানাবে। দুজনেরই জীবন-পণ!

সুধা বল্‌ল—হতে পারে না।—আমি পারব না।

জীবন বল্‌ল—তবে যাকে আন্‌তে চাও তাকে আন্‌বার তোমার অধিকারও নেই।

—কেন?

—সভ্যজগতে শুধু মার পরিচয়ে তার সন্তান বাঁচ্‌তে পারে না। মার পরিচয়ের কোন মূল্যও নেই।—দু একটা দেশে ছাড়া. কিন্তু তুমি তাদের কেউ নও সুধা।

—আমার দেশে আমাকে দিয়ে তার সূত্রপাত হোক্‌।

—সূত্রপাত তোমাকে দিয়ে হ'তে পারে না, সে হ'বে তোমার সন্তানেরই ওপর দিয়ে। তোমার ভুলের জন্যে তোমাকে দুষে' মানুষ মন হাল্কা কর্‌বে, তোমাকে বল্‌বে জঞ্জাল, কিন্তু তোমার সন্তানকে কর্‌বে পরিত্যাগ।—নিরপরাধী অকলঙ্ক জীবটির জীবন্ত-সমাধির ব্যবস্থা ক'রে দেবে তুমিই। তুমি একা তাকে বাঁচাতে পার না সুধা, কিন্তু আমি পারি, খুব সহজে পারি।

সুধা আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠ্‌ল। আমি জীবনকে বল্‌লাম—তুমি মানুষ?—

সুধার চোখের জল মুছিয়ে জীবন হেসে বল্‌ল—ঐত ভুল বুঝ্‌লেন মিসেস্ দত্ত! দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, এর মধ্যে আমার একটা প্রকাণ্ড স্বার্থ রয়েছে।

আমি বল্‌লাম—স্বার্থ, কিসের?

সে বল্‌ল—সুধাকে পেলে, আমি আমার মাকে ফিরে পাব।—আমিও একজন জন্ম-অপরাধী। আমি ভীষণ এক অত্যাচারীর সন্তান। আমার মার মনে আমার জন্ম-দাতার প্রতি যে দারুণ ঘৃণা ছিল, তার সবটুকু ঢেলেছিলেন তিনি আমার ওপর। আমার মা আমায় কোন দিন কোলে নেন্ নি। আমায় ছুঁতে হ'লে অশুচি মনে করতেন। মানুষ হয়েছি ঝি-চাকরের কোলে। আমার মার সব চেয়ে রাগ আর দুঃখ, আমি আমার বাবার মত দেখ্‌তে। তাই তিনি আমার মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। কিন্তু যে অসীম স্নেহ, বাইরের মানুষ তাঁর কাছ থেকে পায়, তাইতেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম এত দিন, এবার লোভ হ'য়েছে সে সবটুকু আমি একা ভোগ করব। যে অসহায় অবস্থার ভিতর দিয়ে তিনি আমায় পেয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশী অসহায় তোমাকে আমি নিয়েছি জান্‌লে তিনি আমায় ক্ষমা করবেন। আমি অত্যাচারীর সন্তান, কিন্তু অত্যাচারী নই, এ কথা প্রমাণ করবার তুমি আমার একমাত্র সুযোগ সুধা।

সুধা ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বল্‌ল—নাও, বাঁচাও।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

চোখ বন্ধ করিয়া ক্লান্তভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া তটিনী ধীরে ধীরে বলিল—আমার কথা শেষ হয়েছে শ্রীশ, আর ত কিছুই বল্‌বার নেই।

শ্রীশ বলিল—আছে। তোমার নিজের কথা, সেটা না শুনে ত আমি যেতে পারি না।

তটিনী ক্লান্তভাবে বলিতে লাগিল—আমার কথা, তার মধ্যে শোন্‌বার মত কিছুই নেই শ্রীশ।—জীবনকে কুৎসিত করতে চেয়েছি, পারি নি। সে আপনার সত্য, সুন্দর রূপের মহিমায় অম্লানই রয়েছে। যত কালি ছড়িয়েছি, তা সমস্ত এসে জমা হয়েছে আমারই বুকে। আমিই কুৎসিত হয়ে গেলাম। এই কথা এখন বিশেষ ক'রে মনে পড়্‌ছে, আর মনে পড়্‌ছে, আমার জীবনও ছিল অমনি সুন্দর। সামান্য একটা প্রত্যাখ্যানের অভিমানকে অসহ্য মনে ক'রে, তোমাকে দিতে গেলাম আঘাত, শুধু তোমাকে, কিন্তু দেখ্‌লাম, জীবনের প্রত্যেকটি-গ্রন্থীতে তার সাড়া জেগেছে! জীবনকে আঘাত দেওয়া যায় কিন্তু তার গতিকে থামান যায় না। প্রাণের বন্যা সে সমানে বইয়ে চলে। সবখানে তার সরসতা। প্রকৃতির সমস্ত

অত্যাচার মাথায় নিয়ে সে তার স্নেহের কোল বিছিয়ে বসে থাকে। নিজের অজ্ঞানতা, হিংসার ছুরিতে দিনের পর দিন শাণ্ দিয়েছি, আর ভেবেছি এর একটি আঘাতে প্রাণের রক্তরাগ হয়ে উঠ্‌বে জমাট নীল।—কিন্তু কোথায় ছিল জীবন, কোথা থেকে এল অসিত, প্রাণের দীপ্তিতে সবার বুক তৃপ্তি সুধায় ভ'রে দিল।—আমার মত কুৎসিত তুমি আর কা'কেও দেখেছ শ্রীশ?—

শ্রীশ। না।—ভালবাসা-বাসি খেলায় তুমি আমার সব চেয়ে বিস্ময়কর-আবিষ্কার তটিনী!—এবার বল তোমার নিজের কথা।

তটিনী চোখের জল মুছিয়া বলিল—আমার নিজের কোন কথাই নেই; যা করেছি বা করুতে চেয়েছি তা তোমাকে আমার মনের মধ্যে রেখে—তোমারই জন্যে। বিয়ে করেছি তাকেই, যে আমার চেয়েও কুৎসিত, কারণ তুমি ছিলে আমার চোখে সব চেয়ে সুন্দর। তুমি দেখ্‌বে আমাকে ওর পাশে, এই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল, কিন্তু কোন দিন স্ত্রী হ'তে পারলাম না। এতে আমার স্বামীর অবশ্য কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নি। স্ত্রীর দৈন্য ওর নেই।—ছিল নাও কোন দিন। কত অসহায় নারী, কত বিধবা তাদের আত্মীয়ের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নাবালক সন্তানের পৈত্রিক সম্পত্তিটুকু বজায় রাখ্‌বার জন্যে ওর আশ্রয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্পত্তি ও রক্ষা করেছে, কিন্তু কতটুকু ওদের জন্যে তা জানি না, কিন্তু 'ইজ্জৎ'কে যে তারা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি তা জানি।

কথা বলিতে ব'লতে থামিয়া গিয়া শ্রীশের মুখে একটা কোন দৃঢ় সঙ্কল্পের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিয়া, তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া তটিনী ডাকিল—শ্রীশ--শ্রীশ, না, ও নয়; ও হ'তে পারে না। আমি জানি এই মাত্র তুমি কি ভাবছিলে। কোন দরকার নেই তার। আমি খেলেছি মরণ খেলা আমার জীবন নিয়ে, তুমি বেঁচে উঠেছ কিন্তু আমি মরে গেছি। আমায় বাঁচাতে পার্‌বে না।

শ্রীশ যেন চেতনা ফিরিয়া পাইয়া তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে তটিনীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। সেই মুহূর্ত্তেই তটিনীর বুকের ভিতর তাহার প্রাণ যেন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—আমি মরি নি—মরি নি—আমি বেঁচে আছি, ঐ হাসিটুকু দেখ্‌বার জন্যে, তোমার চোখের ঐ অশ্রুকণা আমার সব কালি ধুয়ে দিয়েছে—

সেই সময় আরক্ত চোখে জীবন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশকে দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল—ওমা তুমি এখানে! আরে! তুমি এখানে আস জান্‌লে আমার পথটাও যে অনেকটা সোজা হত!

শ্রীশ হাসিয়া বলিল—না জেনে ভালই হয়েছে জীবন, তোমার নিজের পথ বজায় রইল।

শ্রীশের একখানি হাত শক্ত করিয়া চাপিয়া, নীরবে তাহার মনের তৃপ্তি, প্রাণের আনন্দ জানাইয়া, তটিনীর দিকে চাহিয়া বলিল—ও এইমাত্র ঘুমাল, জ্বরও নেই।—তবু ওকে এখন ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। আমাকে যদি চারটি খেতে দেন তা হ'লে থেকে যাই সমস্ত দিন।

তটিনী হাসিয়া বলিল—না, পাবেন্ না খেতে ; প্রেমিক মানুষের আবার ক্ষিদে কি? ছি ছি লজ্জার কথা।—যান্ ওপরে। জেগে উঠে ও আবার হয়ত চোখে অন্ধকার দেখ্‌বে!

জীবন হাসিয়া বলিল—ও চোখে অন্ধকার দেখে কি না জানি না, তবে বড় পচা চোখ, খালি জল পড়ে, মুছিয়ে দিতে হয়!—কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ছ'দিন আগে মায়া দেবীকে আমার একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল, তা এপর্য্যন্ত হ'য়ে ওঠে নি। এখান থেকে নড়্‌তে ইচ্ছে ক'রে না যেটুকু সময় পাই তার চেয়ে বেশী এখানে থাকি। শ্রীশ, তুমি যদি একটা চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছে দাও, বিশেষ উপকৃত হব।

শ্রীশ বলিল—বক্‌শিস্—

জীবন। হুঁয়া মিলে গা।

সে একখানি কাগজে লিখিল 'আমার বৌ খুঁজে পেয়েছি মায়াদেবী। আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।'

চিঠিখানি খামে বন্ধ করিয়া শ্রীশের হাতে দিয়া, তটিনীর দিকে চাহিয়া জীবন বলিল এবার ওপরে যাই।

তটিনী। এত তাড়া?

জীবন চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল সুবিধে হলে এর আগেই পালাতাম।

জীবন চলিয়া যাইবার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া তটিনী বলিল আমি এখন থেকে কার্সিয়ং এর বাড়ীতে থাকব, বেশীর ভাগ সময়। তোমার ওপর দু একটা কাজের ভার আমি দিয়ে যাব।—নিজেকে সমস্ত অসুবিধের হাত থেকে বাঁচিয়ে সহজভাবে বেঁচে থাক্‌বার মত টাকা আমি নিয়েছি, বেশীর ভাগটা দিয়ে যাব তোমার হাতে। তুমি মানুষ করবে, সহায় সম্বলহীন সন্তানদের। মনে রেখো তারা আমারই সন্তান। অবাধ্য দেখ্‌লে, নীচ প্রকৃতি দেখ্‌লে, তাদের শাস্তি দিও। মানুষকে মানুষ হবার পথ দেখিও। আমি তাদের দেখব না

কোন দিন, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি কথা আমায় জানিও; আর জানিও তাদের মা এক জন আছে, যে তাদের ভালবাস্‌তে শিখ্‌ছে।—বল পারবে?—

শ্রীশ বলিল—পারব।—আর কিছু আমায় করতে হ'বে?

তটিনী একটু ভাবিয়া বলিল—আর একটা কাজ আছে। যেখানে যা ভাল বই পাবে কিনে পড়বে, মনের মত কথায় দাগ দিয়ে দিয়ে, তারপর আমায় পাঠাবে।

শ্রীশ বলিল—আচ্ছা।

তটিনী বলিল—আমার গয়নাগুলো সব পাবে দীপ্তি, এ বাড়ীখানা দিলাম সুধাকে।

শ্রীশ। তোমার স্বামী—'

তটিনী। তার জন্মে আমার ভাব্‌বার দরকার নেই, মা তাকে যথেষ্ট দিয়ে গেছেন, ওর নিজেরও যথেষ্ট আছে।—এই মাসের মধ্যেই সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেল্‌তে চাই, তোমাকে রোজ একটু কষ্ট ক'রে আস্‌তে হবে।

শ্রীশ বলিল—আসব।

* * * *

সেই দিন সন্ধ্যা বেলা মায়াকে তাহার ঘরের দরজায় দাঁড়াইতে দেখিয়া তটিনী হাসিয়া বলিল—কি-লো মায়া! আয় আয়, আমি পিঠ পেতে দিয়েছি, যত পারিস্ ঘস্। আর আপত্তি করব না।

মায়া তাহার কাছে আসিল, কোন কথা না বলিয়া তটিনীর গলা জড়াইয়া অশ্রু-ছলছল্ চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সহসা দুইজন দুই জনের কাঁধে মাথা রাখিয়া খুব খানিকটা কাঁদিয়া লইল। প্রথমে সংযত হইল তটিনী। মায়ার চোখ মুছাইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল—ফুল ফুটেছে দেখ্‌ছি! —খবর পেলে আমি নিজেই যেতাম।

মায়া বলিল—গেলি না, তাই নিজেই দেখাতে এলাম আর কি করি?—কেমন দেখাচ্ছে এবার আমাকে?—

তটিনী বলিল—রাণীর মত।

মায়া। রাণী?—

তটিনী। হাঁ—বুক যার ভরে ওঠে, সেই রাণী। ভিখারিণীও রাণী হতে পারে।—মৌমাছিটি কে?

মায়া হাসিয়া বলিল—কি ক'রে বলি? একটা ত নয়।

তটিনী। তোকে দেখে আবার সকলকে ফিরে পাব মনে হ'চ্ছে মায়া।

মায়া। পাবি মানে? তুই একবার ডাক, সবাই এসে জুটবে।

তটিনী ম্লান হাসিয়া বলিল—না, জোটা জুটির পালা আমার শেষ হয়েছে, তবে যাবার আগে সবাইকে একবার চোখ ভ'রে দেখে যাব। তুই কি কর্‌বি?

মায়া। আমি? যে দুটো জিনষের ওপর আমার সব চেয়ে রাগ ছিল, তার প্রথমটা। বিয়ে কর্‌ব।

তটিনী। পার্‌বি না।

মায়া। পার্‌ব না?—বলিস্ কি! তোরা সবাই পার্‌লি আর আমার বেলায় দুঃসাধ্য ঠেক্‌বে?—উনি, ঠাকুর পো, ছেলে, মেয়ে, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, ঘটকার বড়মানুষী, দেমাক, পরচর্চ্চা, এত সব জিনিষ পাব হাতের কাছে, তবু বলিস্ পার্‌ব না!

তটিনী। না।

মায়া হতাশাভরা কণ্ঠের অনুকরণ করিয়া বলিল—তা হ'লে দ্বিতীয়টা করি? স্কুল মাষ্টারী, কি বলিস্?

তটিনী। মন্দের ভাল। কিন্তু ওটাও ছেঁটে ফেল্‌তে পারিস্ না মন থেকে?

মায়া। না। ছেলে মেয়ে না হ'লে বাঁচ্‌ব কি ক'রে? 'Eternal feminine তটি, মা আমাদের হ'তেই হবে। নিজের না হোক পরের-ছেলের। এখন একবার সুধার কাছে নিয়ে চ।

তটিনী। তুই যা ওপরে, জীবন সেখানে আছে, আমি আর নড়্‌তে পার্‌ছি না।

মায়া বলিল—নড়িস্ নি, আমি এখ্‌নি আস্‌ছি।

তটিনী বলিল—আয়।

উপরের খোলা ছাদে সুধা আর জীবন বসিয়া গল্প করিতেছিল, মায়াকে দেখিয়া দুই জনেই উঠিয়া দাঁড়াইল। সুধার কাছে আসিয়া আপনার কণ্ঠের একটি হার তাহার কণ্ঠে পরাইয়া মুখ চুম্বন করিয়া জীবনের দিকে ফিরিয়া মায়া বলিল আজ ভয়ানক সুখী হয়েছি। এত আনন্দ জীবনে পাইনি। এবার আমায় আপনার 'বাঙাল দেশ' দেখান, যাকে 'জিনিস' বলে আমায় একদিন লোভ দেখিয়েছিলেন?

জীবন। একটু ভুল হ'ল মায়াদেবী, শুধু আপনাকে নয় আপনাদের সকলকে। আমার মাকে তার আয়োজন কর্‌তে লিখেছিলাম, আজ চিঠি পেয়েছি, তিনি নিজেই আস্‌ছেন আপনাদের নিতে।

* * * *

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সুধা এবং জীবনের বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু উৎসবের কোন আয়োজন বা আড়ম্বর রহিল না। অল্প কয়েকটি বিশিষ্ট মানুষ তাহা দেখিয়াছিল মাত্র। যাহারা দেখিতে পায় নাই, নিমন্ত্রিত হয় নাই, তাহারা এই বিষয় লইয়া নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিয়া কাটাইল কিন্তু কারণ কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া হতাশ হইয়া শান্তভাব ধারণ করিল। মিসেস ডি—' নিজেই তটিনীর নাগাল পান না, খবর মানুষ পায় কি প্রকারে ?

তটিনী,তাহার যাহা কিছু করণীয় তাহা অত্যন্ত সতর্কতা এবং ক্ষিপ্রতার সহিত সারিয়া একদিন সকালে শ্রীশের সহিত যে পরামর্শ করিল, সেই দিন গোধুলি লগ্নে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা গেল। দার্জ্জিলিং-যাত্রী গাড়ীর একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় তটিনী বসিয়া, এবং শ্রীশ তাহার জানালায় হাত রাখিয়া প্লাট্ ফরমে দাঁড়াইয়া তটিনীর মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

সময় হইল, ঘণ্টা বাজিল, গার্ডএর বাঁশীর শব্দ হইল। তাহার হাতের সবুজ পতাকাটির দিকে শ্রীশের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া তটিনী বলিল—'ও শ্রী! দেখ—দেখ!

শ্রীশ বলিল—দেখ্‌লাম। সবুজ, প্রাণের রংএ ছোপান। সমস্ত শরীর দুলিয়ে ও বল্‌ছে—চলে যাও, পথের বিঘ্ন দূর হয়েছে—'

এঞ্জিনের চীৎকার শোনা গেল; গাড়ী নড়িয়া উঠিল। দুই জনেরই মুখে এক সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল, বিদায় হাসির রেখা। তাহাদের সংবদ্ধ হাতে টান্ পড়িল। তাহার পর জোর করিয়া যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তি দুই জনকে দুই দিকে সরাইয়া লইল! . . .

চোখের বাষ্পবারি, তাহাদের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়াছে। দুই জনের হাতে দুইটি রুমাল, মরণাহত পাখীর মত বাতাসে ডানা ঝাপটিয়া মরিতেছে।—সর্পিল গতিতে যাত্রী গাড়ীখানি দূর হইতে দূরান্তরের দিকে সরিয়া সরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

শেষ কথা

যে নিয়মের তরঙ্গ-আঘাতে, সংসার সমুদ্রের বুকে বুদ্‌বুদ জাগিয়া উঠে, সেই তরঙ্গের আঘাতেই তাহা মিলাইয়া যায়। প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্তে এ বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হইতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু মিলায় না শুধু তাহার হাসি-কান্না

অভাব-অভিযোগের সুর। তাহার বিরাম নাই। সে সুর যেন আপনার নিয়মে আপনি বাঁধা! অসীম তাহার উচ্ছ্বাস, ভীষণ, তীব্র তাহার বেদনা।

ইহারই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে মানুষের জীবন ধারা। অপ্রতিহত তাহার গতি। অনন্ত তাহার পথ। কোথায় ইহার শেষ, কেহ জানে না। এই প্রাণধারার দুইটি তীর, একটি মিলন, আর একটি বিচ্ছেদ। এক তীরে আছে তাহার দিনের আলো, পাখীর গান, ফোটা-ফুলের হাসি। আর এক তীরে তাহার চির-রাত্রির বাসা! তাহার বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, গান নাই; সে শীতল, সে নিবিড়!

এই মিলনের কূলে আসিয়া মানুষ যে সুখ পায়, গণনার সংখ্যায় তাহার হিসাব মিলে না। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই। কিন্তু বিচ্ছেদের অন্ধকারে তাহাকেই আবার নূতন করিয়া মানুষ ফিরাইয়া পায়, সুখ তখন হয় আনন্দ।—বিচ্ছেদ মানুষের সহ্য হয়, সে বাঁচিতে পারে। এ আনন্দকে হারাইতে হয় না কোন দিন।

একটি সম্পূর্ণ বৎসর প্রায় ঘুরিয়া গিয়াছে। যে কয়েকটি মানুষ, প্রাণের প্রচণ্ড বিক্ষোভ লইয়া দুলিয়া উঠিয়াছিল, তাহারা আবার শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। জীবনের বিগত দিনগুলির দিকে তাহারা তাকায়, বুকে জাগে তাহাদের দীর্ঘশ্বাস। চোখে আসে জল। তাহার পর, আগত দিনগুলির জন্য নূতন করিয়া প্রস্তুত হয়, তাহাকে বরণ করিয়া জীবনের পাত্রটি ভরিয়া লইতে থাকে।

দীপ্তির সহিত শেষ-বিদায়ের বহু মাস পরে, একদিন ভোরের বেলা, পাখীরা যখন মুক্ত আলো-বাতাসের স্পর্শ পাইয়া আনন্দে গান গাহিয়া উঠিয়াছে; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বুকের মধ্যে তীব্র এক বেদনা অনুভব করিয়া বিকাশ জাগিয়া উঠিল। সেই শেষ-বিদায়ের ক্ষণে দীপ্তির লেখা চিঠির কথা তাহার মনে পড়িল। ইহার পূর্ব্বেও বহুবার পড়িয়াছে, কিন্তু এমন বেদনা, এমন অশান্তি সে কোন দিন অনুভব করে নাই। কি লেখা আছে উহার মধ্যে, তাহা সে জানে না।—কিন্তু না জানিয়াও যেন আর তাহার বাঁচিবার উপায় নাই; এমন ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠার সহিত চিঠিখানি সে বাক্স হইতে বাহির করিয়া, আবরণ খুলিয়া, প্রভাত-আলোয় মেলিয়া দেখিল, তাহাতে লেখা আছে—'যে বন্ধন তুমি পরালে আমার গলায়; তার সমস্ত গুরুত্বকে তুমি জান না, আমি জানি, তবু নিতে চল্লাম।—কিন্তু কোন্ অধিকারে তুমি আমায় বাঁধ্‌লে এমন ক'রে?—মুক্তি চাই বিকাশ, আমায় ছেড়ে দাও—'

সকাল বেলাকার আলো-বিকাশের চোখে ম্লান হইয়া আসিল। উদ্‌ভ্রান্তের মত

সে পথে বাহির হইয়া সামনের দিকে চলিতে লাগিল, যেন এই মাত্র একটা কোন দুঃসংবাদ সে পাইয়াছে, তাই ছুটিয়া চলিয়াছে প্রাণ দিয়া তাহার প্রতিকার করিতে।

অসিতের বাড়ীতে আসিয়া সোজাসুজি উপরে উঠিয়া ভীত, উৎকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে সে চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। অসিত তখন সেখানে বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতে ছিল, চিনিতে না পারিয়া বিস্ময়পূর্ণ চোখে কিছুক্ষণ বিকাশকে দেখিয়া বলিল—বসুন, কাকে চান?—'

শুষ্ক কণ্ঠে বিকাশ বলিল—দীপ্তি, মিসেস্ বিশ্বাস—

অসিত বলিল—তিনি ত এখানে নেই, মার কাছে আছেন। তাঁর খুব অসুখ হয়েছিল।

বিকাশের মুখে অসিতের কথারই প্রতিধ্বনি হইল—অসুখ—?

সে যেন গভীর এক আর্ত্তনাদ! তাহার পর আর কোন কথা না বলিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি সিঁড়ি দিয়া নামিতে গেল।

অসিত বলিল—ব্যস্ত হবেন না। তিনি ভাল আছেন। আমি এখুনি তাঁর কাছে যাব।—চলুন আমিই নিয়ে যাই আপনাকে।

বিকাশ বলিল—চলুন।

তাহার কথা কহিবার শক্তি যেন আর ছিল না। কিছু পরে বলিল—আমি বিকাশ, আমাকে হয়ত আপনি চিনবেন না—

অসিত ব্যগ্রভাবে উঠিয়া বিকাশের হাত ধরিয়া বলিল—কি আশ্চর্য্য! খুব চিনি আপনাকে। আপনার প্রত্যেকটি কথা আমি জানি। কত দিন আমার নিজের ইচ্ছে হয়েছে আপনাকে টেনে নিয়ে আসি আমাদের কাছে, কিন্তু সাহস হয় নি। আপনার মন অত্যন্ত কঠিন। হয়ত আমাদের ক্ষমা করতেন না।

অসিতের কথা শুনিয়া বিকাশ অবাক হইয়া গেল। এই মানুষটি কি ফাঁসীর মত দীপ্তির কণ্ঠে চাপিয়া বসিতে পারে?

অসিত বলিতে লাগিল—আপনার কথা বলতে বলতে বাবা,মা,বড়মাসী, মাসদি, সবার চোখ জলে ভ'রে ওঠে। এতখানি ভালবাসা আপনি ঠেলে রেখেছেন?

বিকাশ হাসিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর অসিত বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিলে তাহার সহিত নীরবে গাড়ীতে আসিয়া বসিল।

* * *

ঘরের দরজার সাম্‌নে সবুজ রংএর পর্দ্দা ফেলা আছে, তাহা ঈষৎ সরাইয়া ঘরের ভিতরটি একবার দেখিয়া লইয়া সম্পূর্ণ রূপে পুনরায় পর্দ্দাটি সরাইয়া, অসিত বিকাশকে ইঙ্গিত করিল—যান্, দীপ্তি শুয়ে আছে, মায়াদিও আছেন।

কিন্তু বিকাশের পা উঠিল না। তাহার সর্ব্বশরীর যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে!

কি মনে করিয়া বিকাশকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া অসিত ডাকিয়া বলিল—দীপ্তি, তোমার জন্যে আজ একটা চমৎকার Surprise এনেছি।—মায়াদি Guess করুন ত?—

দীপ্তি মুখ ফিরাইতেই অসিত সরিয়া দাঁড়াইল। বিকাশ যন্ত্র-চালিতের মত দীপ্তির বিছানার কাছে আসিয়া তাহার কপালে হাত রাখিয়া তাহার মুখের দিকে অশ্রুপূর্ণ চোখে চাহিয়া রহিল।

মায়া বলিল—ভাল আছ বিকাশ?—কিন্তু জিগ্‌গেস্‌ইবা আর করছি কেন, মুখ দেখ্‌লেই বোঝা যায় মানুষটা কেমন আছে।

মায়ার কথার কোন উত্তর না দিয়া বিকাশ বলিল—এত অসুখ, আমি ত জান্‌তাম না!

মায়া বলিল—কি ক'রে জান্‌বে না এলে?—

ঠিক এই সময়ে পাশের ছোট একটি খাটে, সবুজ আবরণের মধ্য হইতে অস্ফুট অথচ তীব্র কাহার ক্রন্দনের শব্দ তাহার কাণে আসিতেই তাহার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল—ওকি—ও কে?—

মায়া বলিল—যান্, দেখুন—

বিকাশ সরিয়া আসিয়া ছোট বিছানাটির পাশে দাঁড়াইয়া আবরণ সরাইয়া দেখিল; চিনিতেও বিলম্ব হইল না।—এ তাহারই দেওয়া বন্ধন, রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! আর সেই সঙ্গে তাহার মনে পড়িল—সে দিতে আসিয়াছে মুক্তি!

ম্লান একটি হাসির রেখা বিকাশের মুখে দেখা দিল। নীচু হইয়া শিশুর মস্তকে সে চুম্বন রাখিয়া দিল। সে-চুম্বন যেন তাহার পরাজয়ের প্রণতি। বিজয়ীর ললাটে তাহা রাজটীকার মত অক্ষয় হইয়া রহিল। কিন্তু এ পরাজয়ে তাহার কোন ক্ষোভ, কোন গ্লানি, কোন বেদনা রহিল না। অনির্ব্বচনীয় শান্তিতে তাহার বুক ভরিয়া গেল।

দীপ্তি বলিল—বসুন।

পরাজিতের স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই থাকে না। বিকাশও তাহার জন্য কোন লোভ দেখাইল না। চোখভরা জল লইয়া বলিল—আমি আর কোথাও যাব না।

সে আর গেলও না কোন দিন। মিত্র পরিবারের বুকে এই অনাত্মীয়টি সংসারের সমস্ত বন্ধনের বেদনা, প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়া লয়। দীপ্তিকে ভালবাসে, অসিতকে শ্রদ্ধা করে, মায়াকে বলে মা, স্বর্ণ এবং করুণাকে বলে মাসী! এ অদ্ভুত সম্বন্ধের কথা শুনিয়া মানুষ হাসে। দিন চলিয়া যায়। বিকাশ সবার দৃষ্টির সম্মুখে আপনাকে বিকশিত করিয়া রাখিল।

তাহাকে পাইয়া বীরেন্দ্রনাথ আবার হাঁসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার সংসারের সমস্ত শূন্যতা যেন পরিপূর্ণ শান্তিতে ছাইয়া গিয়াছে। মিত্র পরিবারের সকলের অপেক্ষা অধিক শান্তি পাইয়াছে দীপ্তি। একদিন সে লিখিয়া ছিল—'বিকাশকে সে আর চিনিতে পারিবে না।' কিন্তু এখন বিকাশের প্রতি কোন সঙ্কোচ তাহার মনে নাই! কারণ তাহার কামনা এখন পূজায় পরিণত হইয়াছে। বারে বারে তাহার মন বিকাশকে প্রণাম করে। অসিত বলে—আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি দীপ্তি, যে বিকাশ তোমার বন্ধু। দীপ্তি বলে—আমার কৃতজ্ঞতা কাকে জানাব জানি না, তুমি আমার স্বামী। প্রত্যেকের জীবন যেন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মায়া এবং শ্রীশকে দেখিয়া করুণা স্বর্ণ প্রভৃতি সকলে ব্যথা পান, কিন্তু যে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাহারা তাহাদের জীবনকে বরণ করিয়া লইয়াছে তাহা ভাবিয়া ভাঙ্গা মন জোড়া দিবার চেষ্টা করেন না। কারণ জানেন, তাহা সহিবে না।

কিন্তু একজনের জীবন আজও আরম্ভই হইল না। যে পিছনের দিকে তাকায় না, সম্মুখের বিস্তৃত পথের দিকে যে দিনের পর দিন চাহিয়া বসিয়া থাকে—সেই চির মৌন উমা।

শান্তা এবং কল্যাণীর মত সেও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা। মাতা তাহার চির-রুগ্না; পিতারও সহসা মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠ দুইটি সহোদর, আপনাদের কৃতীত্বে, দুইটি ধনী-কন্যার পাণিগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের অপরিসর ঘরগুলির মধ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। এই দুইটী ধনী কন্যার বেশীর ভাগ অংশ থাকিত বাহিরে, ভিতরে থাকিত অল্পই, তবু যে টুকু থাকিত, তাহার সবটুকু ভার আসিয়া পড়িয়াছিল উমার উপরেই।

ভার গ্রহণ করিবার শক্তি ছিল তাহার অসীম। মুখে তাহার অসন্তোষ বা ক্লান্তির আভাস দেখা ঘটিত না কোন দিন, তাই যাহারা চাপ্ দিত, তাহারা বুঝিতেই পারিত না তাহাদের ভার কতখানি।

পিতার সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হইয়াছে। ধনী বধূদ্বয়, তাহাদের যৌতুকের অর্থে তাহাদের সংসার চলিতেছে, সময় সুবিধা এবং সুযোগ পাইলেই উমাকে তাহারা একথা বুঝাইয়া দিত।—কথায় নয় ইঙ্গিতে।

কিন্তু এই ইঙ্গিত স্পষ্টতর হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই, সে মায়ার মত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার লইয়াছে। কোন অশান্তিকে সে মনে মাথা গলাইবার পথ দেয় না। অন্ধ, বধির মানুষ, রূপ, আলো, শব্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে যেমন উদাসীন সেও তেমনি অনেক বিষয়েই নির্ব্বিকার ছিল। যেন কিছুই সে বুঝিতে পারে না! তাহাকে দেখিয়া মানুষ অনেক কথাই ভাবে বা প্রকাশ্য ভাবেই বলিয়া ফেলে সে শুনে, কিন্তু কোন মত প্রকাশ করে না।

উমা ছিল শ্যামলা। স্বভাব ছিল তাহার শান্ত, সংযত। চোখের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত স্নিগ্ধ, তাহাতে কোন জ্বালা প্রকাশ পাইত না, তাই যেন সে মানুষের ঔৎসুক্যকে তাহার প্রতি টানিয়া আনিতে পারিল না। সে রহিয়া গেল সবার আড়ালে, অম্লান পুষ্পটির মত।

দিনের বেলাটা তাহার বাহিরের কাজের ভিতর দিয়া কাটিয়া যায়। অবসরের সময়টা কাটে, রুগ্ন মাতা পিতার পরিচর্য্যায়; কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীর অত্যাচার আবদার মিটাইয়া, এবং ধনী ভ্রাতৃবধূদ্বয়ের কুঞ্চিত নাসিকাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায়।

গভীর রাত্রে, পরিশ্রান্ত শরীর মন লইয়া বিছানায় শুইয়া তাহার সব চেয়ে প্রিয় চিন্তাটিকে বুকে লইয়া দোলা দেয়, তাহার জীবন-পুষ্পের সব কয়টি দল যে ফুটাইবে, সে আসিতেছে, প্রতিদিন অক্লান্ত পদে সে আসিতেছে তাহার দিকে। কল্পনায় তাহার কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পায়, ঘুমের ঘোরে সে পায় তাহার স্পর্শ। বুক ভরিয়া উঠে।

শান্তা, কমলা, কল্যাণী, দীপ্তির শান্তিপূর্ণ সংসারের দিকে তাকাইয়া আনন্দে তাহার মন ভরিয়া যায়। প্রাণ ভরিয়া বন্ধুদের মাথায় আশীর্ব্বাদ-বর্ষণ ক'রে। পরিপূর্ণ অনাবিল শান্তির ভিতর দিয়া তাহারও দিন কাটিয়া যায়।

বিমল এখনও তাহার 'ভিটার মাটি' আঁকড়িয়া বসিয়া আছে। আর তাহাকে কোন দিন বিচলিত হইতে দেখা গেল না। জীবনকে অধিকাংশ সময় দেশে থাকিতে হয়, রচনা ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সে তাহাকে বড় একটা সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু মায়াকে সে তাহার কাজের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পাইয়াছে। বিমল তৃপ্ত। তাহাকে দেখাইয়া কমলা একদিন মায়াকে বলিল—মনে পড়ে মায়া,

তুই ঐ মানুষটাকে কি বলেছিলি? মায়া বলিল—আমি কি বেদব্যাস? যে যা বল্‌ব তাই সত্যি হ'বে?

মানুষের দুঃখের প্রতি বিমলের অসীম শ্রদ্ধা। মানুষের দুঃখকে আপনার করিয়া ভাবে, দরদ দিয়া লেখে, মানুষ পড়িয়া শান্তি পায়।

কল্যাণী এখন ঈষৎ একটু মোটা হইয়াছে। মানুষকে লইয়া আমোদ করিবার প্রবৃত্তি আজও তেমনি আছে। সে এখন একটি বিপুল আকারের শিশু-পুত্রের জননী। একদিন দীপ্তির বাড়ীতে তাহার জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া হাসির বন্যা ছুটাইয়া দিল।

শান্তা তাহাকে একটু বেশীদিন পরে দেখিয়াছে, সে অবাক হইয়া বলিল—তোর হ'ল কি? আর যে আমাদের খবরই রাখিস্ না!—কবিতা লেখা টেখা কি জলাঞ্জলি দিলি নাকি?

কল্যাণী বলিল—আর বলিস্ নি ভাই, হাড়্‌মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেল! দিনে ছেলে, রাতে ছেলের বাপ!—

হাসির তরঙ্গে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল।

কল্যাণী তাহার খোকাকে দীপ্তির কন্যার পার্শে শোয়াইয়া বলিল—দেখ, ঠিক যেন ঢাকের পাশে টেম্‌-টেমি!—কি রকম খোবা খোবা মাংস দেখেছিস?

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, কি নাম দিলি!

কল্যাণী বলিল—'ভাইরল্‌'।—ঠিক হয় নি?

শ্রীশ, তাহার কাজে দুই জন অসীম শক্তিশালী মানুষকে পাইয়াছে। একজন অসিত, আর একজন সুধীর। দুই জনেই যন্ত্রী। শ্রীশের কল্পনাকে তাহারা মূর্ত্ত করিয়া বাহিরে প্রকাশ করে। ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া আছে তটিনীর শেষ অভিলাষ। যাহারা শ্রীশের কারখানায় কাজ করে, তাহারা অবাক্ হইয়া ভাবে, তাহাদের কাজের মধ্যে কোথায় যেন মায়ের স্নেহ লুকাইয়া আছে!

সুধীর বলে—একটি লাখ্, বেশী নয় একটি লাখ্, এমনি ছেলে যদি আমাদের দেশে জন্মায় শ্রীশ, তাহলে দেখ্‌বে, আমাদের মায়ের সমস্ত বন্ধনের গ্রন্থিগুলি খসে পড়েছে। তিনি আবার বেঁচে উঠ্‌বেন। বক্তৃতা আর গুণ্ডামি, এতে হবে না। হাজার ষ্ট্রাইকেও না।

সুপ্রকাশ, শ্রীশকে ভালবাসিত কিন্তু তাহাকে বুঝিতে পারে নাই কোন দিন। শান্তাকে পাইয়া সে তাহাকে বুঝিয়াছে তাই কৃতজ্ঞ ভৃত্যের মত অত্যন্ত সম্ভ্রম এবং

সতর্কতার সহিত তাহাকে চোখে চোখে রাখে। শান্তাকে বার বার বলে—ওকে দেখো, আমার চেয়ে তোমার চোখে ওর অশান্তি বেশী ধরা পড়বে।

মানুষের পায়ে-চলা পথের দিকে মায়া তাকাইয়া থাকে, পথ-যাত্রীদের দেখে আর ভাবে, ঐ অনন্ত পথ, ঐ অনন্ত যাত্রীদের মধ্যেই লুকাইয়া আছে তাহার পথিক-বন্ধু। প্রতিদিন সে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে! ঐ পথ ধরিয়া যদি সেও বাহির হইয়া পড়ে তাহার সন্ধানে, তবে দেখা কি হইবে না কোন দিন?—

কে জানে!—

শ্রী গোকুলচন্দ্র নাগ

বীর পুরুষের লাঞ্ছনা

—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

স্ত্রীজাতিকে আমরা অবলা বলি, কারণ আমাদের দৃঢ় ধারণা যে বল জিনিষটে পুরুষদের এক চেটে। কিন্তু এই অবলাদের হাতে পুরুষজাতিকে কত অবস্থায় কত রকমে লাঞ্ছিত হতে হয় তা আমরা সকলেই জানি—নিজের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে নয় কিন্তু নাটক নভেল পড়ার ফলে। আমরা যাকে উঁচুদরের কাব্য বলি তার ভিতরকার কথা হচ্ছে নারী। নারী বাদ দিয়ে ট্রাজেডিও হয় না কমেডিও হয় না।

স্ত্রী কর্ত্তৃক পুরুষ নিগ্রহের অনেক মর্ম্মভেদী কথা সংস্কৃত কবিদের মুখেও শুনেছি, Strindbergএর বইয়েও পড়েছি কিন্তু আমি স্বচক্ষে যে বুকভাঙ্গা ব্যাপার দেখেছি, তার তুল্য স্ত্রী কর্ত্তৃক পুরুষ নিগ্রহের বিবরণ বিশ্ব-সাহিত্যে নেই।—

এ ব্যাপার ঘটেছিল বিলেতে, আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে। আমি সে দেশে থাকা কালীন এদেশ থেকে একটি যুবক ব্যারিষ্টারি পড়্‌বার জন্য, ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। অত বলিষ্ঠ, অত সুপুরুষ যুবক আমাদের মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না। আমরা আর পাঁচজন ছিলুম এগ্‌জামিন পাশ করা বঙ্গ যুবক, অতএব বলা বাহুল্য কেউ আমাদের দেখে রাজপুত্র বলে ভুল করত না। অপর পক্ষে এই নব আগন্তুকটিকে সকলেই রাজপুত্র বলে ভুল করত। তাঁর শরীর ছিল যেমন সুঠাম তেমনি বলিষ্ঠ, আর তাঁর মুখটি ছিল কুঁদে কাটা। টেনিস খেল্‌তে, ঘোড়ায় চড়্‌তে, দাঁড় টান্‌তে, তাঁর জুড়ি বিলাত-প্রবাসী ভারতবাসীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত না। তিনি বাঙালী হলেও, কোনও পাঞ্জাবী কি কাশ্মিরী যুবক, রূপে বলে, তাঁর সমকক্ষ ছিল না। যাঁরা তাঁর চাইতে বলিষ্ঠ ছিলেন তাঁরা কদাকার, আর যাঁরা তাঁর চাইতে সুন্দর ছিলেন তাঁরা নেহাৎ মেয়েলি। একমাত্র তাঁর শরীরেই বল ও রূপের রাসায়নিক যোগ হয়েছিল।

আমি চিরকালই রূপ ও শক্তির বিশেষ ভক্ত। কাজেই আমি দু দিনেই তাঁর

একটি ভক্ত বন্ধু হয়ে উঠলুম। সত্য কথা বলতে গেলে আমার চেয়ে তাঁর বড় বন্ধু বিলেতে আর কেউ ছিল না। তাঁর আর একটি মহা গুণ ছিল। তিনি যে কত সুপুরুষ আর কত বীরপুরুষ সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন। তিনি জীবনে কখনো এক ফোঁটা মদ খান নি, একটান সিগারেট টানেন নি। কারণ তিনি ডাক্তারদের মুখে শুনেছিলেন যে মদ ও তামাক শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

এ জাতীয় পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীজাতির হৃদয় জয় করবার ইচ্ছা অতি স্বাভাবিক। তিনিও তাই মনে ভাবতেন যে তিনিও বিলাতে এসেছেন শুধু সে ভূ-ভাগের স্ত্রী-রাজ্য জয় করতে। তাঁর কথা শুনে মনে হত যে তিনি এ বিষয়ে একজন দ্বিতীয় জুলিয়াস্ সিজার। অর্থাৎ স্ত্রী হৃদয় জয় করতে তাঁকে কোনরূপ চেষ্টা করতে হত না, কোনরূপ আয়াস পেতে হত না—আগাগোড়া ছিল Veni, Vedi, Veciর ব্যাপার। অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের প্রতি তিনি একবার দৃষ্টিপাৎ করতেন, তার গলাতেই তিনি শিকল পরাতেন।

বন্ধুবরের ইংলণ্ডের নারীরাজ্য জয়ের কাহিনী কতদূর সত্য তা বলা অসম্ভব। সম্ভবত সে বিবরণের অনেক অংশ কাল্পনিক। বীর পুরুষদের আত্মকথা প্রায়ই অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে। আলেকজাণ্ডার দুঃখ ক'রে বলেছিলেন যে পৃথিবীতে জয় করবার মত দেশ আর অবশিষ্ট নেই। কথাটা যে অত্যুক্তি সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নেই। তাই বলে তিনি যে একজন বীরপুরুষ ছিলেন এবং নানা দেশ জয় করেছিলেন এ কথা ত কেউ অস্বীকার করে না। সুতরাং বন্ধুবর যে গণ্ডা গণ্ডা Duchess, Countess দের প্রণয় ডোরে শৃঙ্খলিত করেছিলেন, সে কথা না মানলেও, আমি মানতে বাধ্য যে বিলেতের দাসী চাকরাণীরা তাঁকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠত। এ ঘটনা আমার চোখে দেখা। 'দাসী চাকরাণী' শুনে নাক্ সিটকাবেন না। মনে রাখবেন তারাও স্ত্রীলোক আর তাদের অন্তরেও স্ত্রীলোকের হৃদয় আছে। আর তাদের হৃদয়ও এক নজরে কেড়ে নেওয়া কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। বন্ধুবর পদ মর্য্যাদা দেখে প্রণয় করতেন না। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তাঁর সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ছিল। এ কথাটা বলে রাখা দরকার নচেৎ বন্ধুবরের লাঞ্ছনার ইতিহাসটি শুনে, আপনারা মনে করতে পারেন যে তাঁর রুচি ছিল ইতর।

এ দেশের মত বিলেতেও মেলা হয়। বিলাতের কোনও এক পাড়াগেঁয়ে সহরে তাঁর সঙ্গে আমি একবার একটি মেলা দেখতে যাই। গিয়ে দেখি সেখানে একটিও ভদ্র সন্তান নেই, আছে শুধু ছোটলোকের ছেলে মেয়েরা। ব্যাপার দেখে আমি সেখান থেকে অনতিবিলম্বে সরে পড়তে চেয়েছিলুম, কিন্তু বন্ধুবর

তাতে কিছুতেই রাজি হলেন না। অত নারী সমাগম দেখে তাঁর বিজয় পিপাসা এতটা প্রবল হয়েছিল যে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা আমার শক্তিতে কুলোলো না। মেলা এ দেশে যেমন হয়ে থাকে দেখলুম বিলেতেও প্রায় সেই রকমই হয়। মেলার ছোটখাট তাঁবু খাটিয়ে লোকে সব মণিহারীর দোকান পেতে বসে আছে; চারদিকে মেলার লোকের ভিড়্ ও ঠেলাঠেলি। ইতর শ্রেণীর যুবকরা পরস্পর চীৎকার করছে কখনো বা রঙ্গ ক'রে শেয়াল কুকুর ডাক্‌ছে ও সেই শ্রেণীর যুবতীরা গিল্‌গিল্ ক'রে হাসছে আর এ-ওর গায়ে হেসে ঢলে পড়্‌ছে। আমাদের মেলার সঙ্গে বিলেতি মেলার প্রভেদ এই যে, বিলেতে হাসাহাসি দৌড়াদৌড়ীর মাত্রাটা একটু বেশী, কেন না সে দেশের লোকরা আমাদের চাইতে একটু বেশী জীবন্ত। সে যাই হোক অত ইতর লোকের সংঘর্ষটা আমার পক্ষে তেমন আরামজনক হয় নি। তাই আমি একটা নাগর-দোলার কাছে এসে দাঁড়ালুম। অবশ্য সে দোলায় চড়্‌বার আমার প্রবৃত্তি হয় নি; ইতর জাতের সঙ্গী সঙ্গিনীদের সঙ্গে একযোগে উৎসব করার অভ্যাস আমার ছিল না বলে। খানিকক্ষণ পরে দেখি বন্ধুবর লাফিয়ে গিয়ে নাগর-দোলার এক চেয়ারে চড়ে বস্‌লেন। তার পর লক্ষ্য করি তার পাশের চেয়ারে একটি যুবতী বসে আছেন, আর তার মাথায় একটা রুমাল বাঁধা আর হাতে একগাছি চাবুক। এ যে কোন শ্রেণীর স্ত্রীলোক তা আমি ঠাওর করতে পার্‌লুম না। মেয়েটি দেখ্‌তে ভদ্রমহিলার মত কিন্তু বিলেতের কোনও ভদ্র মহিলার পক্ষে মাথায় রেশমের ক্যাটা বেঁধে হাতে ঘোড়ার চাবুক নিয়ে এ রকম জায়গায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। মনে করলুম হয়ত কোনও ভদ্র মহিলা এই অদ্ভুত বেশ ধারণ ক'রে গোপনে মেলা দেখ্‌তে এসেছেন এই জন্য যে, কেউ তাকে চিন্‌তে না পারে।

বন্ধুবরের দু মিনিটের মধ্যে উক্ত মহিলাটির সঙ্গে গলাগলি-ভাব হয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা ধরে তিনি ও তাঁর সঙ্গিনী নাগর দোলায় দুল্‌লেন। আর এই আধঘণ্টা ধরে দুজনে শুধু ফিস্‌ফিস্ করে কথা বল্‌ছিলেন আর মৃদুমন্দ হাস্য কর্‌ছিলেন। নাগর দোলা থেকে নেমে তারা দুজনে সটান্ একটি খাবার দোকানে গিয়ে ঢুক্‌লেন এবং তার পর সেখান থেকে ভুরিভোজন ক'রে বেরিয়ে এলেন। অবশ্য খরচ সব বন্ধুবরের। ইতিমধ্যে দেখি তাঁদের বন্ধুত্ব খুব জমে গিয়েছে। কারণ এবার তাঁরা দুজনে স্বামী স্ত্রীর মত হাতধরাধরি ক'রে বেড়াচ্ছেন। আমি অবশ্য দূর থেকেই তাঁদের love-making দেখেছিলুম। হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য আমার চোখে পড়্‌ল। দেখি বন্ধুবর শূন্যমার্গে দুবার ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে

চিৎ হয়ে পড়্লেন! অমনি তাঁর চারপাশে দেদার লোক জমে গেল—আমি ভিড়ঠেলে গিয়ে দেখি যে বন্ধুবর তখনও ভূমিশয্যায় পড়ে রয়েছেন। আর উক্ত মহিলাটি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বন্ধুবরকে তুলতে যাচ্ছি দেখে উক্ত ইংরাজ যুবতী আমাকে বল্লেন যে তুমি পারবে না, তোমার বন্ধু বেজায় ভারি, আমি একে তুল্ছি। এই বলে তিনি বন্ধুবরকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে টেনে তুলে দাঁড় করালেন তার পর তাঁকে আলিঙ্গন কর্লেন। সেই আলিঙ্গনের অব্যবহিত পরে দেখি বন্ধুবর আবার শূন্য মার্গে উড্ডীন হয়েছেন। তার এক মুহূর্ত্ত পরে বন্ধুবর আবার ডিগ্‌বাজী খেয়ে মাটির উপর পড়্লেন; এবার মুখ থুব্‌ড়ে। আর রমণীটি এক লম্ফে গিয়ে তাঁর পিঠে আসোয়ার হয়ে তাঁকে চাবুক দিয়ে বেদম পিটতে লাগ্‌লেন। আমি ছুটে গিয়ে রমণীটিকে নিরস্ত কর্‌বার চেষ্টা করলুম সে উত্তরে বললে যে তোমার বন্ধুটি আমাকে ঘোড়ায় চড়্‌তে শেখাতে চেয়েছে তাই আমি প্রথমে তার পিটে চড়েই ঘোড়ায় চড়্‌তে শিখ্‌ছি। আর ঘোড়া চল্‌ছে না বলেই তার উপর চাবুক চালাচ্ছি। অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে বন্ধুবরের পিঠ থেকে সোয়ার নামালুম। আর পাঁচ জনে ধরাধরি করে তাঁকে খাড়া কর্‌লুম। দেখ্‌লুম বন্ধুবরের হাত পা কিছুই ভাঙ্গে নি শুধু পড়ার Shockএ তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে রমণীটি আমাকে অতি ভদ্রভাবে বল্লে যে যদি তোমার বন্ধুটি আমাকে না বল্‌তেন যে তাঁর মত কুস্তিগীর ও তাঁর মত ঘোড়-সোয়ার পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই তাহলে তাঁকে আর এই প্রকাণ্ড লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত না। তিনি যে কত বড় কুস্তিগীর তার পরিচয় ত তোমরা পেয়েছ। আমার সঙ্গে প্যাঁচ কসতে গিয়েই তিনি দুবার দুবার শূন্যে ডিগবাজি খেয়েছেন। আর ঘোড়ায় চড়া কাকে বলে তা তোমাদের দেখাচ্ছি। এই বলে তিনি গিয়ে ঘোড়ার দোলার একটা কাঠের ঘোড়ার পিঠে গিয়ে চড়ে বস্‌লেন। তার পর সে দোলা যখন বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরতে লাগ্‌ল তখন দেখি তিনি তার উপর সোজা দাঁড়িয়ে আছেন। তার পর তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার উপর নৃত্য করতে লাগ্‌লেন, তার পর আকাশে লাফিয়ে উঠে জোড়া ডিগবাজী খেয়ে সেই ভ্রাম্যমান কাঠের অশ্বপৃষ্ঠে এসে দাঁড়ালেন। দর্শকবৃন্দ আনন্দে চীৎকার কর্‌তে ও সজোরে করতালি দিতে লাগ্‌ল।

বন্ধুবর অবাক হয়ে হাঁ করে এই ব্যাপার দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ব্যাপার তিনি কিছুই বুঝ্‌তে পারলেন না। এমন সময়ে পাশের একটি লোক বন্ধুবরকে বল্লেন ঐ মেয়েটিকে চেনেন্ না! ও যে বিলেতের একটি প্রসিদ্ধ Circus Girl.

স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক পুরুষ নিগ্রহের এর চাইতে বড় ট্রাজেডি কেউ কখনো দেখে-ছেন না শুনেছেন?

পান্থ-বীণা

—শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়।

৯

অমরেশের দরজা হইতে ফিরিয়া পাশেই একটা গলির ভিতর বংশী ঢুকিয়া পড়িল। কদর্য্য একটা সঙ্কীর্ণ গলি—দুদিকে খোলার বস্তি। কিয়দ্দূরে একটা ঘরের দরজায় বিস্তর লোক জড় হইয়াছে। পাশের একটা খোলার ঘরের ভিতর কি যেন একটা হাঙ্গামা বাধিয়াছিল,—সমবেত কয়েক জন নারীর তীক্ষ্ণকণ্ঠের কলহ কোলাহলে দূর হইতে অন্ততঃ তাহাই মনে হয়। দেখিতে দেখিতে লাল-পাগ্‌ড়িওয়ালা জন দুই তিন পুলিশ-কনেষ্টবল, আলুলায়িত কেশা উলঙ্গপ্রায় একটা মেয়েকে টানা-হেঁচ্‌ড়া করিয়া ভিড় ঠেলিয়া ঘরের ভিতর হইতে একেবারে রাস্তার উপর আনিয়া ফেলিল। মেয়েটার এক অপরিচিত প্রেমাস্পদ নাকি তাহার মুখের উপর এ্যাসিডের শিশি ছুঁড়িয়া দিয়া তাহার অলঙ্কার পত্র সমস্তই কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছে। চোখ দুইটা তাহার কানা হইয়া গেছে, সমস্ত মুখের উপর এ্যাসিডের দাগ—গহনা কাড়িতে গিয়া মেয়েটার নাক-কাণ ছিঁড়িয়া দিয়া রক্তে তাহার কাপড় চোপড় ভাসাইয়া দিয়াছে। অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া মেয়েটা ছট্‌-ফট্‌ করিতেছিল। আরও জন কতক মেয়ে কোমর বাঁধিয়া ঝগ্‌ড়া করিতে করিতে পুলিশের ঠেলা খাইয়া পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপার যে ঠিক্‌ কি হইয়াছে ভাল বুঝিতে পারা গেল না। অর্থের জন্য এমন অনর্থপাত পথে-ঘাটে নিত্য কতই না ঘটিতেছে। পথে দাঁড়াইয়া এই কৌতুক দেখিবার অবসর বংশীর ছিল না—তেমন ইচ্ছাও হইল না; কাজেই তাড়াতাড়ি পথটা সে পার হইয়া একটা বড় রাস্তায় গিয়া পড়িল। ট্রামগাড়ীগুলা লোকে লোকে ঠাসা। বাদুড়ের মত ঝুলিতে ঝুলিতে কেরাণীরা বোধকরি আপিসে চলিয়াছে। বংশীর নজর ছিল ফুট-পাথের পাশে মোটা মোটা থামগুলার দিকে। ইহাদেরই গায়ে-মারা হাতে লেখা একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া ছেলে-পড়ানোর কাজটি সে পাইয়াছিল। খবরের কাগজ-গুলাকে বিশ্বাস হয় না। যে-সব বিজ্ঞাপন তাহাতে থাকে, অধিকাংশই পোষ্ট-

বক্সের নম্বর দেওয়া—দরখাস্ত করিতে পয়সার প্রয়োজন, যদিও উত্তর পাইবে না ইহা সুনিশ্চিত। কিয়দ্দূর গিয়া হঠাৎ একটা থামের বিজ্ঞাপনের দিকে তাহার নজর পড়িল। নব-প্রকাশিত পুস্তক, কেশ তৈল এবং হোমিওপ্যাথিক কলেজের বিজ্ঞাপনের পাশে একটা ছোট কাগজে লেখা ছিল—Wanted a tutor in History—'কিন্তু এ পর্য্যন্ত পড়িয়াই তাহার আর পড়িবার প্রয়োজন হইল না; কারণ ইতিপূর্ব্বে তাহারই মত কোন্ এক দুর্ভাগার নজরে ইহা পড়িয়াছিল কে জানে—পাছে আর কেহ সেটি কাড়িয়া লয় এই ভয়ে দয়া করিয়া সে তাহার ঠিকানা এমন-কি রাস্তার নামটির উপরে পর্য্যন্ত পেন্সিল দিয়া এমনভাবে হিজিবিজি কাটিয়া দিয়া গিয়াছে যে, তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া বিজ্ঞাপন-দাতার নিকটে পৌঁছিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই।

সুমুখে একজন রিক্‌শা-ওয়ালার সঙ্গে এক মাড়োয়ারীর বচসা চলিতেছিল। অত্যন্ত রোগা এবং বৃদ্ধ এই লোকটা নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই প্রকাণ্ড ষণ্ড-মার্ক এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে এতদূর টানিয়া আনিয়াছে, কিন্তু দু-আনার বেশী পয়সা তিনি তাহাকে কিছুতেই দিবেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া কাহাকেও মধ্যস্থ মানিবার জন্ত রিক্‌শাওয়ালা তাহার হস্ত প্রসারিত করিয়া বংশীকে তাহার দু-আনিটি দেখাইয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিয়া উঠিল, দেখিয়ে বাবুজি, শ্যামবাজারসে ইয়ে মাটিয়া কালিজ্ তক্ —

কিন্তু সে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের বিচারের প্রয়োজন ছিল না; এই অবসরে দ্রুতপদে তাঁহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বুড়া তাহার পিছু-পিছু ছুটিল—গোড় লাগি মহারাজ, আউর্ এক আনা,—দু গো পায়সা হুজুর—

বংশী নিজের রাস্তা ধরিল। প্রায় মাইল দেড়েক পথ অনর্থক হাঁটিয়া আসিয়া দেখিল, একটা ছাপাখানার দরজায় একটা কাগজের উপর লেখা রহিয়াছে,—এক-জন প্রুফ-রীডার্ চাই। বংশী ধীরে ধীরে সেইখানেই ঢুকিয়া পড়িল। কম্পোজিটাররা কাজ করিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিতেই একজন বলিয়া দিলেন, ওই যে সাতাশ-নম্বরে আমাদের বইএর দোকান, সেইখানে বড়বাবু আছেন, জিজ্ঞেসা করুন।

তিন চার খানা বাড়ীর পরেই বইএর দোকান। চারিদিকে আল্‌মারি ভরা বই, সুমুখে চেয়ারে বসিয়া বড়বাবু বোধকরি খাতা লিখিতেছিলেন, পাশে একটা বেঞ্চের উপর আর-একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। বংশী ধীরে-ধীরে সেই বেঞ্চের এক ধারে গিয়া চুপ করিয়া বসিল। বড়বাবু মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়াও দেখিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে খাতার উপরে মুখ রাখিয়াই বড়বাবু কহিলেন, আপনার নভেলখানা আমি পড়েছি, তেমন সুবিধে হয় নি, আচ্ছা, কপিরাইট্ কত হলে দিতে চান ?

বংশীর পাশে যিনি বসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, কপিরাইট্ ? এক শ' টাকার কমে আমি দিতে পারব না।

ঈষৎ হাসিয়া বড়বাবু এইবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই বংশীকে দেখিতে পাইলেন; কপি-রাইটের কথা সম্প্রতি বন্ধ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাই আপনার ?

বংশী বলিল, প্রেসে আপনার একজন রীডার্ চাই লিখেছেন—

হ্যাঁ, চাই। কোন্ প্রেস থেকে আস্‌ছেন ?

কোনো প্রেস থেকে আসি নি।

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি বাড়ী থেকে আস্‌ছেন ?—প্রুফ্ কারেক্ট্ করতে জানেন ?

কথাটা বংশী নিজেও এতক্ষণ ভাবিয়া দেখে নাই। ভাবিয়াছিল, রীডারি মানে শুধু পড়িয়াই দিতে হয়। বলিল আজ্ঞে না, ও-সব জানি না।

বড়বাবু বলিলেন, তবে আর রীডারের চাক্‌রী কেমন করে হয় বলুন ?

আমি জান্‌তুম না। বলিয়া বংশী তাঁহাকে একটি নমস্কার করিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছোট একখানা গীতার দাম কত ?

এইবার বড়বাবু হাসিয়া কহিলেন, তাই বলুন যে, বই নেব। দিন্ আট আনা দিন্। এই বলিয়া টেবিলের উপর তিনি তাঁহার ডান-হাতটি বাড়াইয়া দিয়া ডাকিলেন, ওহে রাজিব-লোচন, একখানা পকেট-গীতা দাও ত এঁকে!

থাক্ দিতে হবে না। বলিয়া বংশী পিছন ফিরিতেই বড়বাবু বলিয়া উঠিলেন, চার আনারও একটা কম-দামী আছে, সেইটেই নিয়ে যান না হয়।

কি যে বলিবে, কি যে করিবে, বংশী কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না। যন্ত্রের মত তাহার মুখ দিয়া যেন বাহির হইয়া গেল, কাল নিয়ে যাব, আজ পয়সা নেই।

বংশী তখন দরজা পার হইয়া আসিয়াছে। বড়বাবু বলিতেছিলেন আমরা দান খয়রাৎ করিনে। পয়সা চাই—

পথের উপর দিয়া বংশী অনেক দূর চলিয়া আসিল কিন্তু বড়বাবুর সেই শেষের

কথাটা তখনও তাহার কানের কাছে ক্রমাগতই বাজিয়া চলিতেছিল, পয়সা চাই, পয়সা চাই—

প্রাণ-ধারণের ইহাই যেন মূল মন্ত্র। বাংলার মাটির বুকে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মাটিই তাহাকে পরিপোষণ করিবে, বাঁচিয়া থাকা তার জন্ম-অধিকার! কিন্তু সে অভিমান সে গর্ব্ব যদি কোনো দিন ছিল ত ছিল, আজ আর নাই। আজ অর্থ চাই, নইলে অনর্থ ঘটিবেই! বংশীর মনে হইতেছিল, এই যে রাস্তার লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া, এই মুটে ঐ মজুর, এই ফিরিওয়ালা, এই তুমি এই আমি—সকলের মুখে সেই এক প্রয়োজনের ছাপ-মারা! চাই চাই অর্থ চাই! ঐ যে রাস্তার ধারে খোলার বস্তির সেই মেয়েটা এ্যাসিডে পুড়িয়া অন্ধ হইয়া গেল, সেও শুধু অর্থের দায়ে সেই প্রবঞ্চক শত্রুকে কাছে ডাকিয়াছিল বলিয়াই! আবার দস্যুবৃত্তি করিয়া এই মেয়েটাকে চিরজীবনের মত পথে বসাইয়া যে চলিয়া গেল, সেও শুধু ঐ এক প্রয়োজনে। পাওনাদারের কাছে টাকার তাগাদা করিতে যে-মাড়োয়ারীটা মানুষের পিঠে চড়িয়া ছুটিয়া আসিল, সেও যে-কারণে ঐ নিরুপায়বৃদ্ধকে ছ আনার বেশি পয়সা দিতে চায় না—ক্ষুৎ-পীড়িত অর্থের কাঙাল ওই বুড়াও ঠিক সেই কারণেই ধুঁকিতে ধুঁকিতে অর্থ গৃধ্নু সেই হত্যাব্যবসায়ীর পিছু পিছু ছুটিল, মহারাজা, হুজুর, আর অন্তত ছটি পয়সাও দাও বলিয়া!...

কিন্তু বংশী আজ তার পিতার একটা সামান্য অনুরোধও রাখিতে পারিল না, এই গ্লানি যেন তাহাকে সর্ব্বক্ষণ পুড়াইয়া মারিতে লাগিল। হয়ত অমরেশের বাড়ী গেলে অনায়াসে সে তাহা পাইতে পারিত কিন্তু সারা দুপুরটা সে পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইল তবু সে রাস্তা দিয়া চলিতেও কি জানি কেন তাহার মন সরিল না।

বৈকালে আজ একটু সকাল-সকাল ছেলেটিকে বংশী পড়াইতে গেল। সে এক ওস্তাদ ছেলে! পড়ার চেয়ে অন্য দিকেই তার ঝোঁক বেশী। অনেক চেষ্টা করিয়াও বংশী তাহাকে বশ মানাইতে পারিতেছিল না। মাষ্টার-মশাইকে দেখিয়াই ছেলেটি বলিল, আজ স্যার্ আপনি রাত্রে আস্‌বেন, ক্লাবে আমাদের একটা মিটিং আছে, আমি চল্লুম এখন।

পাশের ঘর হইতে ছেলের বাবা তাহা শুনিতে পাইয়া রাগে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। ক্লাবে মিটিং আছে শুয়ার! ক্লাব! বলিয়াই অতবড় ছেলের গালে ঠাস্ করিয়া একটা চড় মাড়িয়া দিয়া বলিলেন, বস্ পড়তে বস্ হতভাগা! —আর, আপনিও কি রকম মাষ্টার মশাই, এতদিন ত' পড়াচ্ছেন, কই, ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট্ ত' কিছুই দেখ্‌ছি নে—

বংশী সহ্য করিতে পারিল না ; বলিল, না দেখেন, অন্য মাষ্টার নিয়ে আসুন—দেখি আর কিছুদিন। পরে তাই হবে। বলিতে বলিতে ছাত্রের পিতা চলিয়া গেলেন।

ছেলেটিকে পড়াইয়া বংশী বাড়ী ফিরিল কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। বাবা যদি গীতাখানি চাহিয়াই বসেন ! কি উত্তর দিবে সে ? এই দুর্ভাবনায় আরও কিয়ৎক্ষণ সে পথে পথে ঘুরিল, তাহার পর সন্ধ্যার কিছু পরেই অন্ধকারে বাড়ী ঢুকিয়া সে নিজের ঘরটিতে গিয়া চুপ করিয়া বসিল। রত্নেশ্বর তখন চোখ বুজিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গায়ত্রী তাহার খাবার লইয়া যখন ঘরে প্রবেশ করিল, দেখিল, লণ্ঠনটা বংশী নিজেই জ্বালাইয়াছে, ভাঙা চেয়ার খানা কেরোসিন-কাঠের টেবিলটার কাছে টানিয়া আনিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্ট মনে কি যেন লিখিতেছে।

গায়ত্রী কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এসেই যে লিখ্‌তে বসেছিস্—কি লিখ্‌ছিস্ ?

কলেজের একটা মোটা খাতায় বংশী লিখিতেছিল ; খাতাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, ও কিছু নয় দিদি।

খেয়ে নে, তোকে আজ একটা মজার কথা বলব বংশী। এই বলিয়া গায়ত্রী বাহিরে চলিয়া গেল।

বংশী বলিল, এখনি বল্ না দিদি।

আস্‌ছি। বলিয়া গায়ত্রী বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট কয়েক পরেই হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের কাছে চুপ্ করিয়া দাঁড়াইল।

বংশী বলিল, বল্ না দিদি, কি মজার কথা—

বলি খেয়ে নে। বলিয়া গায়ত্রী আন্‌মনে বংশীর সেই লেখা-খাতা খানাই খুলিয়া ফেলিল।

হাঁ হাঁ করিয়া বংশী তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়া উঠিল, দেখিস্‌নে, দেখিস্‌নে দিদি, ও কিছু না।

গায়ত্রী কিন্তু সে নিষেধ শুনিল না। লেখাটা পড়িয়া ফেলিয়া বলিল, এ কি গল্প না উপন্যাস ? বেশ হচ্ছে।

বংশী দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিল, হ্যাঁ বই লিখ্‌ছি। বিক্রি করব।

টাকা পাবি ?

হাঁ। বলিয়া বংশী খাইতে লাগিল।

বংশীর উচ্ছিষ্ট বাসন রাখিয়া গায়ত্রী যখন ফিরিয়া আসিল, বংশী তখন তাহার খাতায় পাতাগুলা ছিঁড়িয়া দিয়াশলাই দিয়া মেঝের উপর পুড়াইতে বসিয়াছে।

গায়ত্রী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ও কি করছিস রে?

পুড়িয়ে ফেল্‌ছি সে-লেখাটা!

কেন? বেশ ত হয়েছিল।

বংশী ঈষৎ হাসিল। বলিল, ক্ষেপেচিস্ দিদি? এ যে প্রতারণা করা হয়।

কেন?

থাক্‌গে। তুই বল্ না দিদি, কি বল্‌ছিলি? এই বলিয়া বংশী তাহার মুখের পানে একবার মুখ তুলিয়া চাহিল।

পাশের ভাঙা টেবিলের গায়ে হেলান্ দিয়া গায়ত্রী বলিল, অমরেশ এসেছিল আজ দুপুরে। বাবাকে সে কি বল্‌লে জানিস্? বলিয়াই সে হাসিতে লাগিল।

এমন সময় রত্নেশ্বর ডাকিলেন, বংশী! বাঁশী!

বংশী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিতেই তিনি বলিলেন, গীতাখানা দে ত বাবা একবার—

বংশী চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

যাহা আছে তাহা আছে ঢাকি
যাহা পাই ভার হয়ে থাকে
সত্যেরে চিনিব কোন ফাঁকে?

"খায় ঘোল"



বেদের মেয়ে

—জসীম উদ্দিন।

গাঙের ঘাটে বেদেদের নাও। নায়ে বসে সুন্দরী এক বেদের মেয়ে তার এক গা-ভরা যৌবন। জলের দিকে চেয়ে চেয়ে তার 'লম্বা মাথার-ক্যাশ' একবার সে খুলেছে একবার বাঁধ্‌ছে। সমস্ত অঙ্গটি ভ'রে তার রূপ যেন ঝরে পড়্‌ছে চঞ্চল জলের উপর রঙীন ওড়্‌নার মত!

বাদসার ছেলে, নদীর ধারে বেড়াতে এসে বেদেনীর রূপে মুগ্ধ হ'ল। হাতে তার বাঁশের বাঁশী কেঁদে উঠ্‌ল পুরোণো একটা মেঠো সুরে,—

জাইত্‌ গ্যাল বাইদ্যার সাথে!

তখন সাঁজের আলো-ছায়ার জালবুনানি মিলিয়ে গেছে। তিমির-ঘন গাঙের অগাধ জলে দিনান্তের এই কবরস্থানে কাজল-বরণ বনে-ঘেরা চাষার মেয়েদের ঘর হ'তে কনক প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। বাদসার ছেলে ঘরে ফির্‌ল তীরে-বাঁধা দড়িটির মত মন তার বাঁধা রইল সেই বেদের নায়ের ঘাটে।

কাঁকরভরা পথের উপর দুখান রাঙা চরণ ফেলে কাঁকণ হাতে বেদের মেয়ে চলেছে। কাঁকণভাঙা কোমলসুরে অন্ধকার ভরে গেল। সে চলেছে, পসরার ভারে মাথা তার নুয়ে পড়েছে। মুক্তার মত ঘামে-নাওয়া করুণ মুখখানি তার প্রতি নিমিষের রূপহারা দেহে রঙীন মোহ এঁকে দিচ্ছিল। বাদসাজাদা পথের ধারে দাঁড়িয়ে তার চলার দিকে চেয়ে রইল। বেদের মেয়ে তার পানে ফিরেও চাইল না। বাদসার ছেলে তার দ'লে চলে-যাওয়া পথের ধূলি মুঠায় মুঠায় সারা গায়ে মাখ্‌তে লাগ্‌ল।

রাত তখন দুপুর। হাজার-কুঁচি কাঁচের মত ঢেউগুলো সব চাঁদের আলোয় চিক্ মিক্ করছে। একটা রাতচরা পাখী তখন চলেছিল নিশীথ-অভিসারে।

তার ডানার শব্দে সাদা আকাশের চাঁদের আলো দুলছিল। বাদসাজাদার বাঁশী সেই গভীর রাতের সুরে বেদনার ঢেউতুলে গাইতে লাগ্‌ল

জাইত্‌ গ্যাল বাইষ্ঠার সাথে।
জাইত্‌ গ্যাল কুল গ্যাল হৈল কুলের খোটা
রজনী প্রভাতের কালে পক্ষী ছাড়ল বাসারে
নীল রায় রায়
জাইত গ্যাল বাইষ্ঠার সাথে।

তখন নায়ে বসে বেদের মেয়ে চাঁদের আলোয় চুল শুকোচ্ছিল। আঁধারভরা নিশীথরাতে সুরের মায়া সুন্দরী বেদের মেয়ের চোখের কোণে অকারণে জল ভরে দিল। প্রেমের ব্যথার কথা সে জান্‌ত। শুধু জান্‌ত না তুচ্ছ একটা বেদের মেয়ের জন্যে কেমন ক'রে একটা বাদ্‌সার ছেলে পাগল হ'তে পারে। এ যেন নিতান্তই অসম্ভব। প্রেমের এই কাঁটার পথ হ'তে সে তাই বাদসাজাদাকে ফিরে যেতে বল্‌ল।

তোমরা ত বাদসার ছেলে থালিতি খাও ভাত
আমার সাথে গেলি পরে কটবা কলার পাত।
তোমরা ত বাদ্‌সার ছেলে বাটিতি খাও পাণি
আমার সাথে গেলি পরে আচায় খাবা পাণি।

এমনি সুরে সুরে কত সে তাকে বুঝাল। তারা বেদে জাত, নায়ে নায়ে বাস, কলার পাতায় তারা ভাত খায়, বাদসাজাদার প্রেমের পোষাক সে কোথায় পাবে? কিন্তু বেদের মেয়ের এই সহজ জীবন বাদসাজাদাকে আরও মুগ্ধ ক'রে ফেলল।

পাক মারুম্‌ পাকালী মারুম্‌ বাইছ্যা মারুম টিয়া
বালো কইর‍্যা রাইন্ধ্যা থুইও কালি জিরা দিয়া।

বাদ্‌সার ছেলে কোন প্রবোধই মানে না। বেদের মেয়ে যতই বলে—

আমরা ত বাদিয়ার মেয়ে মাঠে খেলাই টোল
ঝড়ী বৃষ্টি অন্ধকারে বইসে বাজাই ঢোল।

কিন্তু প্রেমের পরশমণিতে বেদের মেয়ের সবই যে আজ সোনা হয়ে গেছে।

অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেছে তখন তুচ্ছ জাতের উঁচু নিচু। রাজার ছেলের বাঁশী তার শেষ গান গেয়ে গেল—

শোন শোন বাইস্তায় জাত শোন আমার কথা
ভাবেতে মজিলে মন হাড়ি ডোম কোথারে
নিল রায় রায়
জাইত গ্যাল বাইস্তার সাথে।

পরদিন প্রভাতের উদার আলোয় সেই বেদের মেয়ে নৌকা খুলে ভিন গাঁয়ের পানে ছুটিয়ে দিল। বাদসার ছেলে পাগল হয়ে সেই গাঙের ধারে দাঁড়িয়ে কেবল গাইতে লাগল

জাইত্ গ্যাল বাইদ্যার সাথে

তারপর যে কি হ'ল তা হয়ত কোন গ্রামের বৃদ্ধ জানতে পারেন। আমরা অনেকের কাছেই এই বেদের মেয়ের কাহিনী শুনতে চেয়েছি। কেউ বলতে পারে নি। শুধু গানটি কৃষকদের ঘরে ঘরে শোনা যায়। শাওণ মাসে বর্ষার জলে পাট কাটতে কাটতে তারা এই গান গেয়ে থাকে। আর নিঝুম রাতে কৃষক পল্লী হ'তে মাঝে মাঝে বাঁশীর সুরে এই গান ভেসে আসে এবং গ্রামে যারা বাঁশী বাজাতে শেখে, তারা প্রথমেই এই গানটা বাজাতে শেখে। শাওনভেজা মাঠে মাঠে কাটার সুরে সুরে চাষার ছেলেরা আজও সেই বেদের মেয়ের কাহিনী রাখালিয়া সুরে গাহিয়া থাকে—

খাটো খোটো বাইস্তানাতার লম্বা মাথার ক্যাশ
তাই না দেইখে বাদসার ছেলে ছাইড়্যা গ্যাল দ্যাশ্।

বুঝ্লাম না কেন জীবনের এ অগ্নিজ্বালা ; দুঃখসুখের মায়াচক্র, সৃষ্টির ভাঙা-গড়া খেলা—

'অশোক'

সর্ব্বনাশের ঘণ্টা

—নজরুল্ ইস্‌লাম্।

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্ব্বনাশের নেশা।
রুধির-নদীর পার হ'তে ঐ ডাকে বিপ্লব হ্রেষা!
হে দ্রোণাচার্য্য! আজি এই নব জয়-যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হ'তে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
শিষ্য তোমার; দাও গুরু দাও তব রূপ-মসী ছানি'
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিৎ কদর্য্যতার গ্লানি!
তোমার নীচতা, ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদ্গার গুরু শিষ্যের শিরে; তব বুক হোক খালি!
বন্ধু গো! গুরু! দূষিত দৃষ্টি দূর কর, চাহ ফিরে,
শয়তানে আজ পেয়েছে তোমায়, সে যে পাঁক ঢালে শিরে!
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা,
যে ভোগানন্দ দাসেদেরে গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজ তাহাদেরি বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি;
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা ক'রে ভালোবাসিয়াছ বাঁদরামী!
হে অস্ত্র-গুরু! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়-কেতু, হ'লে কুকুর কুরু নেতা!
ভোগ-নরকের নারকীর দ্বারে হইয়াছ তুমি দ্বারী
ব্রহ্ম অস্ত্র ব্রহ্ম দৈত্যে দিয়া হে ব্রহ্মচারী!
তোমার কৃষ্ণ রূপ-সরসীতে ফুটেছে কমল কত,
সে কমল ঘিরি নেচেছে মরাল কত সহস্র শত,
কোথা সে দীঘির উজ্জ্বল জল কোথা সে কমল রাঙা,
হেরি শুধু কালো, শুকায়েছে জল, সরসীর বাঁধ ভাঙা!
সেই কালো মাখি চোখে মুখে তুমি সাজিয়াছ ছি ছি সং,
বাঁদর নাচের ভালুক হয়েছ, হেসে মরি দেখে ঢং!

অন্ধকারের বিবর ছাড়িয়া বাহিরিয়া এস গুরু,
হের দিবালোকে—বাঁদরের বেদে কেটেছে শুষ্ক ভুরু !
মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমারে ফেলেছে নরকে টানি,
ঘৃণার তিলক পরাল তোমারে স্তাবকের শয়তানী !
যাহারা তোমারে বাসিয়াছে ভালো করিয়াছে পূজা নিতি,
তাহাদের হানে অতি লজ্জার ব্যথা আজ তব স্মৃতি।
নপুংসক ঐ শিখণ্ডী আজ রথের সারথী তব,—
হানো বীর তব বিদ্রূপ বান, সব বুক পেতে লব
ভীষ্মের সম ; যদি তাহে শর-শয়নের বর লভি',
তুমি যত বল আনিই সে রণে জিতিব অস্ত্র কবি !
তুমি জান, তুমি সম্মুখ রণে পারিবে না পরাজিতে,
আমি তব কাল যশোরাহু সদা শঙ্কা তোমার চিতে,
রক্ত অসির কৃষ্ণ মসীর যে কোনো যুদ্ধে, গুরু,
তুমি নিজে জান তুমি অশক্ত, তাই করিয়াছ শুরু
চোরা-বাণ ছোঁড়া বেল্লিকপনা বিনামা আড়ালে থাকি',
ভাড়ার-আনা নপুংসকেরে রথ-সম্মুখে রাখি।
হের গুরু আজ চারিদিক হ'তে ধিক্কার অবিরত
ছি ছি বিষ ঢালি জ্বালায় তোমার পুরানো প্রদাহ ক্ষত !
আমারে যে সবে বাসিয়াছে ভালো, মোর অপরাধ নহে !
কালীয় দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালী দহে—
তাহার দাহ তোমারে দহেনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জলুনীর চোটে। তুমি পাও কোন্ সুখ
দগ্ধ মুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি !
শিব সুন্দর সত্য তোমার লভিল একি এ গতি ?
যদিই অসতী হয় বাণী মোর, কালের পরশুরাম
কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদনাম
কিনিতেছ গুরু ! কেন এত তব হিয়া দগ্‌দগী জ্বালা ?
হোলীর রাজা কে সাজাল তোমারে পরায়ে বিনামা মালা ?
তোমার গোপন দুর্ব্বলতারে, ছি ছি, ক'রে মসীময়
প্রকাশিলে, গুরু, এইখানে তব অতি বড় পরাজয় !

তুমি ভিড়িওনা গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল শকুনের দলে,
শতদল দলে তুমি যে মরাল শ্বেত সায়রের জলে।
ওঠ গুরু, বীর, ঈর্ষা-পঙ্ক-শয়ন ছাড়িয়া পুনঃ,
নিন্দার নহ নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুন!
উঠ গুরু উঠ, লহ গো প্রণাম বেঁধে দাও হাতে রাখী,
ঐ হের শিরে চক্কর মারে বিপ্লব-বাজপাখী!
অন্ধ হয়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ
ঘনায় আকাশে অসন্তোষের বিদ্রোহ-বারিবাহ।
দোতালায় বসি উতলা হয়োনা শুনি বিদ্রোহ-বাণী,
এ নহে কবির, এ কাঁদন ওঠে নিখিল মর্ম্ম ছানি!
বিদ্রূপ করি উড়াইবে এই বিদ্রোহ-তেঁতো ঝালা?
সুরের তোমরা, কি করিবে তবু হবে কান ঝালা পালা
অসুরের ভীম অসি-ঝনঝনে, বড় অশোয়াস্তি কর!
বন্ধু গো এত ভয় কেন? আছে তোমার আকাশ-ঘর!
অর্গল এঁটে সেথা হ'তে তুমি দাও অনর্গল গালি,
গোপীনাথ ম'ল? সত্য কি? মাঝে মাঝে দেখো তুলি জালি!
বরেন ঘোষের দ্বীপান্তর আর মির্জ্জাপুরের বোমা,
লাল বাংলার হুমকানী,—ছি ছি এত অসত্য ওমা
কেমন ক'রে যে রটায় এ সব ঝুটা বিদ্রোহী দল!
সখী গো আমায় ধর ধর! মাগো কত জানে এরা ছল!
সইলো আমার কাতুকুতু-ভাব হয়েছে যে, ঢ'লে পড়ি!
কাঁচলে জড়ায়ে পা চলে না আর, হাত হ'তে পড়ে ছড়ি!
শ্রমিকের গাঁতি বিপ্লব বোমা, আঁ ম'লো তোমরা মর!
যত সব বাজে বাজখাঁই সুর, মোচ্ছনী বৃত্তি ধর!
যারা করে বাজে সুখভোগ ত্যাগ, আর রাজরোষে মরে,
ঐ বোকাদের ইতর ভাবায় গালি দাও খুব ক'রে।
এই ইত্‌রামী বাঁদরামি-আর্ট আর্টেপিঠে বেঁধে
হনো কুকুর পেট পালি আর হাউ হাউ মরি কেঁদে!
এই শয়তানী ক'রে দিনরাত বল আর্টের জয়!
আর্ট মানে শুধু বাঁদরামী আর মুখ ভ্যাঙচানো কয়!

আপনার নাক কেটে দাদা এই পরের যাত্রা ভাঙা
ইহাই হইল আদর্শ আর্ট, নাকি সুর, কান রাঙা !
আর্ট ও প্রেমের এই সব মেড়ো মাড়োয়ারী দলই জানে,
কোনো বিদ্রোহ অসন্তোষের রেখা নাই কোনো খানে !
সব ভুয়ো দাদা ও সবে দেশের কিছুই হইবে না'ক
এমনি করিয়া জুতো খাও আর মলমল-মল মাখ !
জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকা তৈরী হতেছে এদের তরে,
দেখিবে এদের আর্টের আঁটুনী একদিনে গেছে ছ'ড়ে !
বন্ধু গো ! গুরু ! আঁখি খোলো, খোলো শ্রবণ হইতে তুলা,
ঐ হের পথে গুর্খা সেপাই উড়াইয়া যায় ধুলা !
ঐ শোনো আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার !
তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আর্টশালা হবে নেড়া !
প্রেমও আছে গুরু, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,
ভালো নাহি লাগে, ভালো ছেলে হয়ে, ছেড়ে যাও, মানা নাই !
আমি বলি—গুরু ব'লো তাঁহাদেরে কোনো বাতায়ন-ফাঁকে
সজিনার ঠ্যাঙা সজনীর মত হাতছানি দিয়ে ডাকে !
যত বিদ্রূপই কর গুরু তুমি জান এ সত্য-বাণী,
কারুর পা চেঁটে মরিব না, কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটাবেনা পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মত,
ধরা মা'র বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত !
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস
ততদিন গুরু সকলের সাথে ক'রে নাও পরিহাস !

প্রাপ্ত পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

গল্পের আরম্ভ—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী। দাম একটাকা।

ছয়টী ছোট গল্প—গল্পের আরম্ভ, কালো বউ, গল্পের আর্ট, রক্তের লেখা, প্রিন্স্ অব্ দি প্রিমরোজ গে।

গল্প কয়টী পড়িতে পড়িতে মনে হয় এইবার বুঝি আসল গল্প আরম্ভ হইবে। লেখা স্থানে স্থানে জটিল, উপমাগুলি যাহারা বুঝিতে পারিবে না তাহাদের জন্য লেখা নয় বলিয়া মনে হয়।

প্রচ্ছদপটের ছবিটি আঁকা সুন্দর হইয়াছে, ছবিটি দেখিলেই বইখানি একবার হাতে করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। বাঁধান, কাগজ, ছাপা খুব ভাল; প্রকাশকের বিশেষ চেষ্টায় পরিচায়ক।

দমকা হাওয়া—শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। দাম একটাকা।

একটী বড় গল্প। লেখার ধরণ ভাল, ভাষাতেও জড়তা নাই। পূজার বাজারে অনেকে অনেক বই হয়ত কিনিবেন, সে হিসাবে এই গল্পের বইখানি ভালই। বাঁধাই সুন্দর।

অপরিচিতা—এম, মনির হোসেন। দাম সাতসিকা।

বড় গল্প। ঠিক উপন্যাস বলা চলে না। মুসলমান গ্রন্থকারের লেখা বলিয়াই সকলের পড়া উচিত। গল্পের ভিতর যেন বহু বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। কোনটা না লিখিলে বইখানি ভাল হইত, তাহা হয়তো নিজের লেখার প্রতি মায়াতে গ্রন্থকারের চোখে পড়ে নাই। বাঁধান লাল টক্‌টকে কাপড়ে, তার উপরে সোনার জলে নাম লেখা। তবে বইখানির নাম অপরিচিতা হইলেও দুইটী কোটেশন চিহ্নের ভিতর "অপরিচিতাকে" এমন করিয়া পরিচিত করিবার কারণ বুঝা গেল না। উপহার পৃষ্ঠা সাজান আছে, যিনিই কিনিবেন তাঁহাকেই হয়ত কাহাকেও না কাহাকে বইখানি উপহার দিতে হইবে এরূপ মনে হয়।

বিষের বাঁশী—কাজী নজরুল ইস্‌লাম। দাম এক টাকা ছয় আনা। কাজীর একবার বিচার হইয়া গিয়াছে। কাজীর এবার কাজীর-বিচার করিতে হইলে, তাঁহার ফাঁসি হওয়া উচিত। ১নং অপরাধ—এ সব 'ভয়ঙ্কর' ভাল কবিতা ও গান লিখিয়া উক্ত কবি একটী দাস-ব্রত-সাধক, পরলোকবাদী নিদ্রিত জাতিকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে।

২নং অপরাধ—তাঁহার গান ও কবিতাগুলি বাহিরে নিন্দা করিলেও মনে মনে ভাল না বাসে এমন লোক বাংলা দেশে বড় নাই। এ সব গানকে ভালবাসিলে, হয়ত দেশের লোক একদিন নিজের দেশ বা জাতিকেই ভালবাসিয়া বসিবে!

৩নং অপরাধ— উক্ত কবি অধিক দিন জীবিত থাকিলে তাঁহাকে শাস্তি দিবার মত লোক হয়ত আর থাকিবে না। আর একটি অপরাধ কাজির বই ছাপিলেই ভয়ানক বিক্রয় হয়, তাহাতে অধিক সংখ্যক লোকই তাঁহার গান ও কবিতা পড়ে। ইহাও গুরুতর অপরাধ।

বোল্‌শেভিকবাদ—শ্রীশৈলেশনাথ বিশী। দাম বার আনা!

এই পুস্তকখানি বহু বাদানুবাদের কেন্দ্রস্থল একটী রাষ্ট্রবাদের বাংলা অনুবাদ।

যে সকল দেশে গণতন্ত্র বলিয়া জিনিষটী আজকাল প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা বাস্তবিক জনসাধারণের স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়! ইহা ব্যক্তিত্বের স্বাধীন প্রসারের সকল সুযোগ দেয় না।

সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের বাহ্যিক অন্তরালে গণতন্ত্র আপন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। শাসন যন্ত্র ধনী সম্প্রদায়ের হাতে। জনসাধারণ বলিয়া যে বহু সংখ্যক মানুষকে বুঝায়, তাহাদের চিরকালই সেই সোনার রথের দড়ি ধরিয়া টানিয়া মরিতে হয়। দেশ-জগন্নাথ হস্তহীনই থাকেন, ধন রত্ন হাতে করিয়া তুলিতেও পারেন না, হাতে করিয়া তাহা বিতরণও করিতে পারেন না। তাঁহাকে যাহারা ঘিরিয়া বসিয়া থাকে তাহারাই সে সব কুড়াইয়া লন্ এবং গণতন্ত্রের ঘণ্টা বাজাইয়া পূজার ঘটা দেখান্!

পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মানব বারট্রাণ্ড রাসেল রুষিয়ায় যাইয়া রুশের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ প্রকাশ করেন। এই নিরপেক্ষ নির্ভীক মানুষটীর শ্রম ও চিন্তার ফলকে আজও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারই প্রণীত বোল-শেভিকবাদের বঙ্গানুবাদ এই পুস্তকখানি।

কোনও দেশকেই নিজেকে গড়িয়া তুলিতে হইলে, অপরজাতি ও দেশের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। কি উপায়ে অন্য দেশ তাহাদের সমস্যাগুলির সমাধান

করিতে পারিয়াছে তাহা জানা দরকার বলিয়া এই বইখানি সকলেরই পড়া উচিত। বাংলায় অনুবাদ হওয়াতে বাঙ্গালী মাত্রেরই বোলশেভিকবাদ পড়িতে সুবিধা হইয়াছে।

শনিবারের চিঠি—সাপ্তাহিক পত্রিকা দাম /০। সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযোগানন্দ দাস। পত্রিকা খানি আকারে ছোট, একখানা খামে পুরিয়া বিক্রয় হয়। আলোচ্য বিষয়গুলি হাস্যরস ও কৌতুকের ভাষায় থাকে। দুই একটী কবিতাও থাকে। এযাবৎ যতগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ভিতর 'সকাল বেলার গোয়ালিনী সম্পর্কে, শিশুমঙ্গল, স্কুলের বাসের মেয়ের বিষয়ে ছাদ বিহার, প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা বেশ উপভোগ্য হইয়াছে!

লেখক লেখিকার কয়েক জনেরই মুসলমান নাম, মুসলমান লেখক লেখিকাদের যে এই পত্রিকার সম্পাদন বিভাগ এতখানি সুযোগ দিতেছেন তাহার জন্য ইঁহারা সকলের শ্রদ্ধারপাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ইঁহাদের সংবাদ সাহিত্যটি কয়েকবার খুব সুন্দর হইয়াছে। কতকগুলি লেখা পড়িয়া ঠিক কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে তাহা বুঝা না গেলেও কাহাকেও যে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। লেখকদিগের কয়েকটি নামও সাধারণ বাংলা নামের মত নয় বলিয়া মনে হয় হয়ত সেগুলি ঠিক নাম নয়।

আরও কিছু কাল না গেলে, পত্রিকাখানির বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়।

প্রিণ্টার্—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, "বাণী প্রেস"
৩৩এ মদনমিত্রের লেন, কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল] [দ্বিতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

কল্লোল



চাষা



—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত।

মাটির ছেলে, মাটির মতন প্রীতি-শীতল বুকখানি,
মাটির বাতির ম্লান-শিখাটির মতন মৃদুল মুখখানি!
মাটি-মায়ের হৃদয় উজাড় কর্‌ছ তুমি প্রেম দিয়ে,
মাঠের কবি, বন্দনা মা'য় কর্‌ছ খুশীর গান গেয়ে!
ধূ-ধূ ধূসর যে-ক্ষেত ছিল শুক্‌নো ধূলোর আস্তানা,
যাদুকরের ছোঁয়াচ্ লেগে রঙ্-চঙী তার ভাব্‌খানা!
রঙ্-সোহাগী নীল-বিলাসী ক্ষেতের তুমি হও রাজা,
ভুঁয়েতে ভুঁই-চম্পা ফোটাও, ফুল-মুলুকের নওরোজা!
শষের ক্ষেতে সোনার আঁজন যখন বুলায় ভাস্করে,
বানাও মাটির আলি, সবাই ভাবে— এ কোন্ ভাস্কর এ!
লাঙ্গলেতে ছন্দ বাজাও, মাটির মেদুর বুক মাতে,
শ্যামার শীষের জল্‌সা চলে ঝীঝিঁ-শালিক-পিক সাথে!
নীল-বেগুনী-জর্দ্দা-লালের-পাখ্‌না মেলে মেঘ্-পরী,
আলোর বীণায় বিভাস্ বাজায় বেড়ায় বিভোল্ সম্ভরি!

কাঠ্-বেরালী ঠোকর মারে, শিশির পড়ে ঠিক্‌রিয়া,
সির্‌সিরানির ঝুমুর বাজায় বাতাস আলোর মদ পিয়া !
কড়িঙ্ আসে পাখ্‌না মেলে মৌমাছিদের মজ্‌লিসে,
প্রজাপতির পাখার রঙে গাঁদার রঙ্‌টি রয় মিশে !
ঘুম-স্বপনায় ঘুমিয়ে চলে সুষমী নদী ঢেউ তুলি,
রূপার আঁচল শিথিল-শীতল, আল্‌পনা দেয় লাল গুলি' !
আলোর নূপুর বাজ্‌ল যখন, ফিঙে যখন গান গাহে,
মাটির মালী মাঠের মুকুট মাটির মালিক বাদ্‌শা হে,
ছন্দ বাজাও পেশীর তালে, বাজাও লাঙল-তান্‌পুরা,
ছন্দ শুনে চক্ষু খোলে মাটির জীবন-তস্করা !
প্রাণ-পতাকা বহন করি, মাতাল তৃণের মঞ্জরী,
মন্ত্র শুনি তোমার কবি, উঠ্‌ছে পুলক গুঞ্জরি !
মরুর বুকে ঐন্দ্রজালিক, বহাও বাদল-ঝর্ণাকে,
যৌবনেতে পেলব কর তাপসী অপর্ণাকে !
সুর-খেয়ালী, কি সুর বাজাও ! তোমায় করে বন্দনা
বন-শালিক আর দোয়েল চড়ুই তিতির পাখী চন্দনা।
গৈরিকেতে ধ্যান-উদাসী নয়ন মুদি চুপ করে'
বসুধা আজ সুধায় উছল উঠ্‌ল বিহ্বল রূপ ধরে' !
সে কোন্ রাজার দুলাল তুমি ! জীয়ন্-কাঠির চুম্ লাগি'
চোখ্-জানালার খিল্‌টি খুলি গেল তাহার ঘুম ভাগি' !
এলিয়ে দিল অলক-গুচ্ছি, রাঙালো চোখ সুর্ম্মাতে,
হাতছানি দেয় আকাশকে নীল, চোখে অলখ্ সুর মাতে !
শ্যাম-কিশোরী কুর্ত্তি-আতর ছড়ায় মুহু দিল্-ভোলা,
দিল্ দরিয়া খিল্ খোলা আজ চোখে স্বপন-নীল-গোলা !
দৃষ্টিটি তার চোখ্ জুড়ানো, গন্ধ ভারী মিষ্টি সে,
মাঠের কবি, এই কবিতা—তোমার মোহন সৃষ্টি সে !

* * * *

কলের ধোঁয়ায় আকাশ কালো করছে ওরা মিস্ত্রিরি,
তুমি বহাও মাটির বুকে রঙের সুরের পিচ কিরি !

ভূত-বাছড়ের ছানা ওড়ায় উড়ো জাহাজ অম্বরে,
তুমি তখন চর্‌কা ঘুরাও ঘুরন্‌-চাকীর মন্তরে !
ঘুঘু ডাকে ঘুমপাড়ানি, নিঝুম ছপুর থম্‌-থমে,
টহল মারে, ব্যস্ত ওরা, ঝ'াক-জমকী জম্‌-জমে।
ওরা যখন মানুষ মারে 'হাউইট্‌জার' ও বন্দুকে,
অশথ্‌ তলায় অধর পরশ দাও বাঁশরী-বন্ধুকে !
পাল্কী চলে ঠুংরী তালে, খেম্‌টা তালে বয় হাওয়া,
মেঘের ফাঁকে সজল-শীতল একটি তারার রয় চাওয়া !
ওরা যখন মড়ক লাগায়, কান্নাতে দেশ দেয় ভরি,
মঞ্জু তুমি বিনিদ্‌ কবি, কাটাও জোছন-শর্ব্বরী !
স্বর্ণমী নদীর ও-তীরটিকে পীড়ছে হাজার বস্তিতে,
তুমি হেথায় পাতার কুঁড়ে বানাও নীরব স্বস্তিতে।
হাউই ছাড়ে, পাহাড় উড়ায়, 'ডিনামাইটের' কার্‌খানা,
রাজ-কারিগর, লাঙল-কাছে সকল যন্ত্র হারমানা !
লাল ইমারৎ গড়্‌ছে বটে,—সকলই কুকীর্ত্তি যে,
দীর্ঘশ্বাস ও কান্না আছে অসংখ্য তার ভিত্তিতে।
লক্ষ শোণিত বিন্দুতে তায় একটি পাথর হয় রাঙা,
তবু শুনি সে কুঠিতে খুঁত্‌ থেকে যায়, রয় ভাঙা !
পাতার কুঁড়ে, মাটির বেড়া, একটি ছোট দীপ তাতে,
দীপটি তুমি দাও নিবিয়ে ফুলেল্‌ হাওয়ায় জ্যোৎস্নাতে !
যে নীলাকাশ মঞ্জু-করা চমৎকারের ফাগ দিয়ে,
কলঙ্কিত কর্‌ল ওরা ধূম-দানবের দাঁত দিয়ে।
সওদা কর মাটির তুমি, হাট কর না ঢাক পিটে,
বন কাপসে কাপড় বানাও, রাঙাও নাক' মায়্‌পিটে।
স্বাস্থ্য এবং শক্তি বলি দাও না হেয় লুব্ধতায়,
মাটির বুকে বুক পেতে শোও, নওক' কিছু ক্ষুব্ধ তায় !
মিনার-মহল চাও না কিছু, মোহর পাবার নেই আশা,
পিয়াল-ফুলী স্নিগ্ধ মাটির আঙ্গিনাতেই সুখ-বাসা !
যন্ত্রাসুরের যন্ত্রণাতে গোঙায় ওরা দিনরাতি,
তুমি তোমার জীবন কাটাও মাটির গলায় হার গাঁথি
মাটির ছুলাল, মাঠের কবি, ক্ষেতের তুমি হও রাজা,
সবখানে পাপ বীভৎসতা, হেথায় ফুলের নওরোজা

তিলোত্তমা

—শ্রীশান্তা দেবী।

সারাদিনের ধারাবর্ষণের পর সবে আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। বর্ষায় সন্ধ্যাবেলা ঝাউগাছের তলায় ভিজে ঘাসের উপর পা ঝুলিয়ে ছাতাপড়া কাঠের বেঞ্চিতে বসে বোর্ডিংএর মেয়েদের সভা হচ্ছিল। কেউ বসেছিল মর্চেধরা লোহার হাতলের উপর, কেউ বসেছিল কোনো বন্ধুর কোলের উপর পা দিয়ে পিঠের কাঠের বেড়াটার উপর, কেউ-বা একসঙ্গে সকলের মুখ দেখ্‌বার ও গল্প কর্‌বার আশায় বসেছিল ভিজে মাঠেই উবু হয়ে।

মেনকা বল্‌লে, "আচ্ছা ভাই, ভগবানের এ কিন্তু বড় অবিচার! তাঁর যাকে খুশী খেয়াল মত সুন্দর কর্‌বেন, যাকে খুশী বিশ্রী কর্‌বেন, অথচ মানুষে মনে করে যেন সুন্দরীর সৌন্দর্য্যটা তার নিজেরই কীর্ত্তি! তার জোরে তারা দিব্যি বিশ্ব-শুদ্ধকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে বেড়ায়! এই দেখ্‌ না, আমরা যদি চারবেলা মাথাও কুটি ত কেউ কখনও এক পয়সার বাদাম-ছোলাও কিনে খাওয়ায় না; আর মল্লিকাটাকে ভগবান দুটো বড় বড় চোখ আর একটু ফর্সা রং দিয়েছেন বলে উদয়াস্ত তার ভক্ত পূজারীদের নৈবেদ্যর আর শেষ নেই!"

তারা বল্‌লে, "সত্যি, নীচু-ক্লাশের মেয়েগুলো ত মল্লির প্রেমে বাগানটাকে একেবারে নেড়া ক'রে ফেলেছে। আরে বাপু, তোদের ন্যাকামি কর্‌তে হয় নিজের নিজের গাঁঠের পয়সা খরচ ক'রে কর্‌লেই পারিস্; আমরা কেলে-কুচ্ছিত আছি, কেউ কিছু ত দেয়-ই না; বাপ মায়ের পয়সায় বোর্ডিংএ থেকে বাগানের ফুল-গুলোও যে পাব, তাও লক্ষ্মীছাড়ীদের জ্বালায় হবার যো নেই!"

লাবণ্য বল্‌লে, "এ বাপু তোর অন্যায় কথা। যাকে দেখ্‌তে পারি না তার চলন্ বাঁকা! মেয়েগুলো ত নিত্যি আধপেটা খেয়ে টিফিনের পয়সা জমিয়ে মল্লির জন্যে চোকোলেট্ বিস্কুট আর ডালমুট কিনে কিনে ফতুর হয়ে গেল। শুধু বল্‌বি গাঁঠের পয়সা খরচ করে না। টিফিনের সময় একবার সেই বাক্সওয়ালার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াস্ ত, দেখ্‌বি, অর্দ্ধেক জিনিস মল্লির কল্যাণেই তার বিকিয়ে যায়।"

মেনকা সজোরে জোড়া বিনুনি দুলিয়ে বল্‌লে, "সেই কথাই ত আমি এতক্ষণ বল্‌তে চাইছিলাম। আজ মল্লির জন্মদিন। সকাল থেকে দেখ্‌ছি বেঞ্চির আড়ালে,থামের আড়ালে,বোর্ডের পেছনে আঁচল চাপা দিয়ে প্রেজেণ্ট নিয়ে বাচ্চা-গুলো ঘুরছে মল্লিকাদির সন্ধানে। বাবা, এক ফোঁটা-ফোঁটা সব মেয়ে, এদের ঢং দেখ্‌লে গায়ে জর আসে। সে কি মুখ লাল করা আর ঘাড় বেঁকানোর ঘটা! বড় হলে এরা যে সব কি হবেন ভেবেই পাই না!"

তাপসী ভিজে ঘাসে পা দিয়ে বসেছিল। সে হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "বাবা গো, বসে বসে চটি দুটো চুপ্-চুপে হয়ে ভিজে গেল, তবু মল্লিরাণীর আর দেখা নেই! কি যে এত সাজ্‌ছে তা সেই জানে! মেয়ের রূপ যত না থাকুক, অহঙ্কার তার চারগুণ আছে!"

এক বিঘৎ চওড়া নীল ফিতের বিনুনির আগায় রাক্ষুসে প্রজাপতির মত একটা ফাঁস বেঁধে, রেশমী শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে দুই হাতে চুল টিপ্‌তে টিপ্‌তে একগাল হাসি নিয়ে তখন একটি চোদ্দ-পনের বছরের সুন্দর মেয়ে বোর্ডিং-বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে মাঠের দিকে আস্‌ছিল। মেয়েরা একসঙ্গে কলরব করে উঠ্‌ল, "ঐ যে ঐ নীল-পরী আস্‌ছে! যে রকম পাখ্‌না মেলেছে, উড়ে যেতে আর দেরী হবে না।"

মেয়েটি হেসে এসে সান্ধ্য-সভার মাঝখানে দাঁড়াতেই লাবণ্য একটা নীল কাচের মালা তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বল্‌লে :—

"কণ্ঠেতে নীল পদ্মমালা, টিপটি নীলা কাঁচপোকার
ধূপের ধোঁয়া পাখ্‌না তোমার, মূল কি তুমি সব ধোঁকার!
ভুলের প্রদীপ নয়নে তোর, পিন্ধনে মেঘ-ডম্বরী,
নীল পরী গো নীল পরী!"

তারা ও মেনকা একসঙ্গে দুইহাতে সজোরে লাবণ্যর দুই গাল টিপে ধরে বল্‌লে, "ও বাবা! মেয়ের পেটে পেটে বিদ্যে ত কম নয়? আবার কবিতা লেখা হয়েছে! এ মেয়ে বাঁচ্‌লে হয়!"

লাবণ্য মাথা ঝাড়া দিয়ে কোন প্রকারে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিতে নিতে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "গেল, গেল—সব কটা দাঁত ভেঙে গেল! কবিতা আমি লিখি নি বাপু, সত্যেনবাবু অনেক কাল আগে লিখে রেখে গিয়েছেন। পরের কবিতা আওড়েই তোদের হাতে প্রাণ যাচ্ছিল, নিজে লিখ্‌লে না জানি কি হত!"

তাপসী হঠাৎ এগিয়ে এসে গলায় কাপড় দিয়ে করজোড়ে অনুনয়ের ভঙ্গী

ক'রে বল্লে, "দোহাই মিস্‌সাহেবরা, একটু চুপ করুন না; মল্লির ভক্তদের অর্ঘ্যগুলো একটু দেখি—"

মেনকা ঝঙ্কার দিয়ে বল্লে, "অম্‌নি জিভ্‌ দিয়ে লাল গড়াতে সুরু করেছে? পুরুষ মানুষে যে তোদের গাল দেয় তা' সাধে দেয় না! কাপড় আর গয়না, গয়না আর কাপড়! আর কথা নেই? যাবে কোথায় ফেমিনিন্ মন—"

তাপসী গম্ভীর গলায় "আপাতত আপনার ম্যাস্কুলিন্ গলাখানা কানে বড় লাগ্‌ছে" বলে মল্লিকার হাত ধরে টেনে এনে বেঞ্চির ঠিক মাঝখানে বসিয়ে তার পোযাক পরিচ্ছদ পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তে শুরু করল। ঝুঁটা মুক্তার মালা, কাচের চুড়ি, রঙীন টিন ও ঝিনুকের ব্রোচ, হাড়ের আড়-চিরুনী ও কাঁটা, রেশমী ফিতা, ফুল-তোলা রুমাল, বিলাতি ও স্বদেশী এসেন্স ইত্যাদির ভারে মল্লিকার সর্ব্বাঙ্গ বোঝাই হয়ে উঠেছিল। তার উপর খাতা পেন্‌সিল, কলম, ছুরী, প্রভৃতি বিদ্যালয়সুলভ উপহারের তালিকা যে আজ সে কত দিল তার ঠিক নেই। ভালবাসায় যারা সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে টেক্কা দিতে চায় তারা কেউ কেউ বা জাপানী রঙের বাক্স, কি বেতের সেলাই-চুব্‌ড়ি পর্য্যন্ত কিনে ফেলেছে। মা বাবার কাছে বহু লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে হয়ত তাদের এ অর্থ সংগ্রহ কর্‌তে হয়েছে। কিন্তু মল্লিকাদির চোখে সকলের বড় হওয়ার এবং সঙ্গিনীদের ঈর্ষা অর্জ্জন করার তুলনায় এ লাঞ্ছনা যে কত ছোট জিনিষ তা বলে বোঝানো যায় না।

উপহারের তালিকা শেষ ক'রে মেয়েরা উঠে বাগানে পাইচারি শুরু কর্‌লে। মল্লিকা হঠাৎ বল্লে, "এখনও একটা জিনিষ বাকি আছে।"

সাগ্রহে সঙ্গিনীরা জিনিষ দেখ্‌বার জন্যে ঝুঁকে এল। মেনকা বল্লে, "আবার জিনিষ কোথায় পেলি রে? কেউ জুটেছে নাকি এরি মধ্যে?" মল্লিকা গাল ফুলিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বল্লে, "তোদের সব তাতে বাঁদরামি! কেন্ সলিলাদি'কে কি ভুলে গেছিস?"

তারা ঠোঁট উল্টে বল্লে, "একেই বলে কপাল! বিয়ে ক'রে বন্ধু শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বসে আছে, তাও প্রেজেন্ট পাঠাতে ভুল হয় না। সুন্দর মুখ থাক্‌লে কত অসাধ্য সাধনই না করান যায়!—তা কি পাঠিয়েছে শুনি?"

গর্ব্বিত সুরে মল্লিকা বল্লে, "শুনে আর কি হবে? একেবারে দেখ্‌তেই পাবে। কাল তিলোত্তমা বাড়ী গিয়েছিল, আজ আস্‌বে; সলিলাদি তার হাতেই পাঠিয়ে দেবে লিখেছে।"

গোলগাল একটি মেয়ে মাটিতে আঁচল লুটোতে লুটোতে জরির ফিতে বাঁধা

একটা বাক্স হাতে এসে মল্লিকার হাত ধরে বললে, "ও ভাই, তিলোত্তমা এই বাক্সটা তোকে দিতে আমায় পাঠিয়ে দিলে—"

মল্লিকা নাক বেঁকিয়ে বললে, "কেন, সুন্দরীর কি পায়ে বাত হয়েছে? সে নিজে আসতে পারল না?"

মধু একফোঁটা হলেও মাছি যেমন ঝাঁক বেঁধে তার চারিপাশে উড়ে এসে বসে, ছোট বাক্সটিকে লক্ষ্য ক'রে আট-দশটি মেয়ে তেমনি উদ্‌গ্রীব হয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। টানাটানি হুড়োহুড়িতে বাক্স এ-হাত থেকে ও-হাত অনেকবার ঘুরল কিন্তু খোলা আর হয়ে উঠল না। শেষে মল্লিকার নাকের ডগা লাল ও চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে দেখে সখীরা তার ধন তার হাতেই ফিরিয়ে দিল। নিজস্ব সম্পত্তি হাতে পেয়ে মল্লিকা সলজ্জ হাস্যে উদ্যত অশ্রু চাপা দিয়ে জরির ফাঁস খুলতে বসল। কত যত্নে পাঠানো জিনিষটি! তার নীল কাগজের তলায় হলদে কাগজের মোড়ক, তার তলায় পিস্‌বোর্ডের বাক্স, তার ভিতর নীল মখমলের বাক্স, কাগজের ভাঁজে-ভাঁজে, জরি ও রেশমের ফাঁসে ফাঁসে সখীর আদর-সোহাগ যেন ফুটে উঠেছে। গহনার ছোট বাক্সটুকু খুলি-খুলি করেও মল্লিকা খুলছিল না। একবার খোলা হলেই ত দেখা শেষ হয়ে যাবে, আজকার সারাদিনের আশাপথ চাওয়া আনন্দ এক নিমিষেই ফুরিয়ে যাবে। অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে অতি আদরে মল্লিকা ডালাটি খুলে ধরল। "কি, কি, দেখি, দেখি," করে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু দশজোড়া চোখ একসঙ্গে ডুবুরি নামিয়েও সেই ক্ষুদ্র বাক্সের গহ্বরে কোনো গহনার সন্ধান করতে পারল না! শূন্য বাক্সটি তার নীলডালা মেলে মল্লিকার কোলের উপর অবহেলাভরে পড়ে রইল। মেয়েরা বিস্মিত হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। এতজনের সামনে এমন ভাবে হতাশ হয়ে অপমানে, দুঃখে ও লজ্জায় মল্লিকার মুখ চোখ আগুনের মত লাল হয়ে উঠেছিল। মেনকার এমন অসময়ে রসভঙ্গটা মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। সে অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে বললে, "সলিলাদি, ভাই, শেষকালে জন্মদিনের দিন তোকে এপ্রিল্ ফুল্ করতে বসল!"

মল্লিকা বড় চোখ আরো বড় ক'রে গর্জ্জন করে উঠল, "কখ্খনো না, হতেই পারে না। এ সমস্ত কার বাঁদরামি তা কি আর আমি বুঝতে পারি নি? তিলোত্তমা লক্ষীছাড়ীকে ডাক্ দেখি পারুল একবার এদিকে।" দুঃখ ও অভিমানে টপ্‌টপ্ করে কয়েক ফোঁটা চোখের জল তার গাল বেয়ে বাক্সর ডালার উপর ঝরে পড়ল।

পারুল, "সুমতি, ও-সুমতি" বলে ডাক্তে ডাকতে মোটা শরীর নিয়ে আবার বোডিং-বাড়ীর দিকে ছুটল।

তিলোত্তমার মা বাপ তিলোত্তমার নাম সুমতিই রেখেছিলেন। জন্মকাল থেকে তার দেহে রূপের প্রাচুর্য্য কোথাও না খুঁজে পেয়ে তাঁরা রূপ-বাচক নামগুলোকে সাবধানে বর্জ্জন করেই এসেছিলেন, পাছে তেমন কোনো নাম রাখ্‌লে মেয়েকে বড় হয়ে লোকের কাছে লজ্জা কি দুঃখ পেতে হয়! কিন্তু মানুষের জীবনে দুঃখ কি লজ্জা নিবারণের ক্ষুদ্রতম পথও যে কত দুর্গম তা তাঁরা হয়ত তখন ভাবেন নি। তাই মনে করেছিলেন গুণবাচক নামের সাহায্যে মেয়ের কুরূপের দিক থেকে মানুষের দৃষ্টিটাকে একটু তফাৎ ক'রে দিতে পারবেন। কিন্তু মানুষের স্বভাবই মন্দ। নিজের কি নিজ-জনের রূপ-গুণের অভাব মানুষকে লজ্জা ও বেদনা দেয় বলে সে সেটা গোপনে রাখ্‌তেই চায়, পরের সেই অভাবটাই তাকে অফুরন্ত নিষ্ঠুর কৌতুকের খোরাক জোগায় বলে সে যেমন ক'রে পারে তাকে টেনে লোক-চক্ষুর সাম্‌নে দাঁড় করায়।

সুমতির গায়ের রং শুধু কাল ছিল না, শৈশবের কাউর-ঘায়ের স্মৃতি তার উপর চিরস্থায়ী একপ্রস্থ ছিট্‌ এঁকে দিয়েছিল। তার উপর দৈর্ঘ্যে সে এমন অনাবশ্যক রকম বেড়ে গিয়েছিল যে, মা-বাবার মুখে "বাপু বাছা" শোনার ভাগ্যও তার সচরাচর ঘট্‌ত না। ছোট মানুষ কুশ্রী হলে তার রূপের দৈন্যে মানুষের মনে কখনও বা করুণা জাগে, কিন্তু সুমতির দীর্ঘদেহে কুরূপ যেন দম্ভের জয়ধ্বজা তুলে ঘুরে বেড়াত। করুণায় নত-চক্ষু আকাশপথে বহু ঊর্দ্ধে না তুল্‌লে এই শীর্ণ দীর্ঘ মেয়েটির মুখের পানে তাকিয়ে 'আহা' বলা কিছু শক্ত ছিল। মেয়েটির মাথার চুল ছিল ঘোড়ার বালাঞ্চির মত শক্ত ও সোজা; তার একটা মুদ্রাদোষ ছিল, যখন তখন মাথার মাঝখানের চুলগুলো টেনে টেনে ছেঁড়া; ফলে ছোট একটি টাক মাথায় বারমেসে বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিল; টাকের আশে পাশের ছোট চুলগুলো সর্ব্বদাই কাঁটার মত খাড়া হয়ে থাকৃত। চিরুণী কি ব্রাশের সাধ্য ছিল না তাদের একটুও নত করে। কাজেই চুলের সিঁথি তার অর্দ্ধপথেই যাত্রা শেষ করতে চিরবাধ্য ছিল। শরীরের তুলনায় সুমতির মাথাটা একটু বেশী ছোট ছিল এবং হাঁট্‌বার সময় প্রতি পাদক্ষেপের সঙ্গে সরু গলার প্রান্ত থেকে সেটি তালে তালে সাম্‌নে ঝুঁকে পড়্‌ত। কথা বল্‌বার সময় হাত পাগুলিকে সে স্থির রাখ্‌তে পার্‌ত না, তার গ্রন্থিবহুল আঙুলগুলোকে মুখের সাম্‌নে দুলিয়ে

দুলিয়ে সে তার প্রতি বাক্যের মাত্রা রেখে চল্‌ত; মনে ভাবের উচ্ছ্বাস যত উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ত, ঠোঁট কেঁপে কেঁপে স্বর তার তত অস্পষ্ট হয়ে আস্‌ত, কিন্তু আঙুলের গতি দ্রুত হয়ে উঠ্‌ত। সে কুঁজো হয়ে হাঁট্‌ত, কিন্তু লম্বা লম্বা পা ফেলে কুব্জতার দীনতাটা যথাসাধ্য ঢাক্‌তে চেষ্টা কর্‌ত। সৃষ্টিকর্ত্তা এই মেয়েটিকে সৃষ্টি কর্‌বার সময় তাঁর সরস ও রঙীন মাল-মসলাগুলি কৃপণের মত দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, তাই বোধহয় তার পার্থিব পিতামাতার মনেও এই কার্পণ্যের ছোঁয়াচ্‌টা একটু লেগে গিয়েছিল। মেয়ের চেহারা যতই কেন লম্বা হোক না, বয়স যখন তের,তখন দশ হাত বিয়াল্লিশ ইঞ্চির চেয়ে বড় শাড়ী তার জন্যে কিন্‌তে তাঁদের মন সর্‌ত না। সুতরাং শাড়ীর পাড়ের তলায় এক বিঘৎ খালি শীর্ণ কালো, পা সে সর্ব্বদা বাহির ক'রে রাখ্‌ত। জুতোর বোতাম ছিঁড়ে, ফাটা ও কালিবিহীন চাম্‌ড়ার ফিতেটা সারাক্ষণ লোভীর জিভের মত লক্‌লক্‌ কর্‌ত, কিন্তু মুচির পয়সার অভাবে কোনো দিন তাকে স্বস্থানে ফেরানো হয়ে উঠ্‌ত না। অলঙ্কারে কন্যার রূপের অভাব মেটানো যাবে না এই বিশ্বাসটা সুমতির পিতামাতার এমন দৃঢ় ছিল, যে তাকে কোনো দিন দু'গাছা কাচের চুড়িও তাঁরা অযথা কিনে দেন নি। বাক্সওয়ালার কাছে কেনা একটা রঙীন টিনের প্রজাপতি-ব্রোচ ছিল তার একমাত্র ভূষণ। যখন-তখন সেটাকে গায়ের জামায় বিঁধিয়ে বেড়াতে সে ভাল বাস্‌ত।

বিধাতার ও পিতামাতার কার্পণ্যে পীড়িত সুমতি যখন প্রথম স্কুলে এল, তখন তার এই সাদাসিধা অনাড়ম্বর নামটা শুনে মেয়েরা বিশেষ খুশী হতে পারে নি। এমন একটা হাস্যকর রকমের বিশ্রী চেহারার গায়ে ঐ নিতান্ত চলনসই নামটার সাহায্যে তাদের হাসির হুল-ফোটানো ঠিক সহজভাবে আস্‌ছিল না। তাই মেয়েদের মধ্যে সুরসিক বলে পরিচিত কে একজন তার নূতন ক'রে নামকরণ করেছিল 'তিলোত্তমা'। এই নামে সে সকলের কাছে এমনভাবে পরিচিত হয়ে উঠ্‌ল যে তার আসল নামটা বেশীর ভাগ লোকেই ভুলে গিয়েছিল। যাদের নিতান্ত তাকে স্নেহভরে ডাক্‌বার দরকার হত তারাই দু'তিনবার ভুল ক'রে পরে সুমতি নামটার সন্ধান পেত।

পারুলের ডাকাডাকির উৎপাতে মল্লিকার গহনার কৈফিয়ৎ দিতে তিলোত্তমা হাত নাড়্‌তে নাড়্‌তে এসে উপস্থিত হল। মল্লিকা তাকে দেখেই ফোঁস্‌ ক'রে উঠে বল্‌লে, "এই মেয়ে, আমার জিনিষ কি কর্‌লি?

তিলোত্তমা কাপড়ের খুঁট্‌ মুখে তুলে চিবোতে চিবোতে বিরক্ত-স্বরে বল্‌লে, "কেন? দিলুম ত তোমাকে।"

মেয়েরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠে বল্‌লে, "কি দিয়েছিস্, একটা খালি বাক্স ত ?"

তিলোত্তমা দুই হাতের দশটা আঙ্গুল নাড়া দিয়ে বল্‌লে, "খালি বাক্স কি ভরা বাক্স আমি জানি না। ঐ ত চিঠিটা মাটিতে পড়ে রয়েছে তুলে দেখ না।"

মেনকা চিঠিটা তুলে পড়্‌ল, "মল্লিরাণী, তোর জন্যে ছোট্ট এক জোড়া নীলার ব্রোচ পাঠালাম। আজ একবারটি পরিস্।"

তিলোত্তমা গম্ভীরভাবে তার ছোট মাথাটা নেড়ে বল্‌লে, "তাহলে নীলার ব্রোচই আছে।"

মল্লিকা চটে উঠে বল্‌লে, "হ্যাঁ, আছে না তোমার মাথা! আমি যাচ্ছি মিস্ কাঞ্জিলালের কাছে। আমার জিনিষ আদায় না ক'রে কিছুতেই ছাড়্‌ছি না।"

মিস্ কাঞ্জিলালের দরবারে নালিশ করা হল। রাগের মাথায় নালিশ ক'রে মল্লিকারই হল বিপদ! শিক্ষয়িত্রীকে না জানিয়ে বাহির থেকে মেয়েদের হাতে চিঠি ও উপহার নেওয়ার অপরাধে সে নিজেই আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। এ অপরাধটা এই তার প্রথম নয়, ইতিপূর্ব্বেও এ কারণে সে শাস্তি ভোগ করেছে; সুতরাং ব্যাপারটার উল্লেখ মাত্রেই মিস্ কাঞ্জিলালের দৃষ্টি কঠোর ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠ্‌ল। তিনি মল্লিকার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন ক'রে বল্‌লেন, "কে তোমাকে গহনা উপহার পাঠিয়েছিল?" মল্লিকা চোখের পাতা নামিয়ে নীচু গলায় বল্‌লে, "সলিলাদি।" শিক্ষয়িত্রীর জেরা তাতে শেষ হল না। তিনি বল্‌লেন, "প্রতিবারই কি তাঁর কাছে উপহার পাও?" মল্লিকা বল্‌লে "না, যখন তিনি ইস্কুলে ছিলেন তখন পেতাম, তারপর আর পাই নি।" কেন যে মরতে সে বোকার মত না ভেবে না চিন্তে নালিশ কর্‌তে এসেছিল এই লজ্জায় তার মন তখন ভরে উঠেছে।

তিলোত্তমার তলব পড়্‌ল। মাটিতে চিলে জুতোজোড়ার খোড়ালি ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে সে এসে উপস্থিত হল। কপালে আজ কিছু আছে জেনেই তার চলন আরো উদ্ধত হয়ে উঠেছিল। শিক্ষয়িত্রী বল্‌লেন, "সুমতি, তুমি মল্লিকাকে বাইরের থেকে চিঠি আর উপহার এনে দিয়েছ?" তিলোত্তমা সরু গলাটা অনেকখানি ফুলিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ, এনে দিয়েছি।" শিক্ষয়িত্রী তীব্র স্বরে বল্‌লেন, "তুমি জান ইস্কুলে এ রকম কাজ বারণ, তবে কেন কর্‌লে?" তিলোত্তমা ঝাঁকি দিয়ে উঠে একবার একটা আঙ্গুল মল্লিকার মুখের দিকে উঁচিয়ে আর একবার পথের দিকে আর একটা আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লে, "মল্লি আমায় আন্‌তে বল্‌লে কেন! আর সেই ওর সলিলাদির দেওর আমায় দিলে কেন?"

জবাবের জোরটা ভাল ক'রে বোঝাবার জন্য সে অনেক কষ্টে মাথাটা আরো উঁচু ক'রে দাঁড়াল। পরক্ষণেই মল্লিকার মাথাটা হেঁট হ'য়ে গেল, সমস্ত মুখখানা এক নিমিষে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। মিস্ কাঞ্জিলাল চকিতে একবার তার ভীত আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "সলিলার দেওর তোমায় দিল? মল্লিকা, তুমি কি আগের কথা সব ভুলে গেছ? এ উপহার কার আমি জান্‌তে চাই।"

মল্লিকা কোন উত্তর দিল না; মুখটা আঁচলেচাপা দিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। তিলোত্তমাকে জব্দ করতে গিয়ে সে এ কি গ্রহের ফেরে নিজে জড়িয়ে পড়্‌ল! এর পর গুরুসভায় কোন্ লজ্জায় আর সে মুখ দেখাবে?

শিক্ষয়িত্রী আবার তিলোত্তমার দিকে চাইলেন। দ্বিতীয় অপরাধটার বিচার এখনও বাকী। লুকিয়ে যে উপহার এত দূর এসেছিল তার একটা কিনারা ত কর্‌তে হবে। মাঝ পথে সেটা হস্তগত কর্‌ল কে? তিলোত্তমাকে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন; "যে উপহার তুমি মল্লিকার জন্য এনেছিলে, সেটা কোথায় গেল?"

যতক্ষণ মল্লিকাকে নিয়ে জেরা চল্‌ছিল ততক্ষণ একমনে তিলোত্তমা সব শুন্‌ছিল আর ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে মল্লিকার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। তার পক্ষ্মবিহীন ক্ষুদ্র চোখ দুটি থেকে যেন ঝলকে ঝলকে আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছিল। সে আগুনে মল্লিকাকে দগ্ধ করেও যেন তার ক্রোধ শান্তি হচ্ছিল না। তা তাকে ভেদ ক'রে বাইরে ছুটে চলেছিল শিকারের আশায়। শিক্ষয়িত্রীর ডাকে তার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না; ঠোঁট দু'খানা নড়ে নড়ে থেমে যাচ্ছিল; তার শীর্ণ হাত দুখানা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে কাঁপতে স্থির হয়ে আস্‌ছিল! শিক্ষয়িত্রী আবার বল্‌লেন, "কি করেছ সে গহনা?" ঢোঁক গিলতে গিলতে তিলোত্তমা বল্‌লে, "ভেঙে কুচি কুচি ক'রে নর্দ্দমায় ফেলে দিয়েছি।"

এমন উত্তর কেহ আশা করে নি। মল্লিকা ব্যথিত বিস্মিত দৃষ্টি একবার তিলোত্তমার মুখের দিকে তুলে আবার মাটির দিকে নামিয়ে নিল, শিক্ষয়িত্রী স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বল্‌লেন, "সুমতি, তুমি কার সঙ্গে কথা বল্‌ছ জান? কি বল্‌ছ বুঝে বোলো। তুমি যা বল্‌ছ, তা কি সত্য? যদি সত্য হয় তবে কেন এ কাজ করেছ আমি জান্‌তে চাই।"

তিলোত্তমা বল্‌লে, "হাঁ সত্য, আপনি কি করতে চান করুন। আমি করেছিই ত; একশ বার করেছি! বেশ করেছি ভেঙেছি! আমার খুসী আমি ভাঙব। তার জন্যে আমি কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে চাই না।"

এ কথার উত্তরে আর কি বলা যায় ? শিক্ষয়িত্রীর মুখ অপমানে কালো হয়ে উঠ্‌ল। তিনি কোনো রকমে ক্রোধ সম্বরণ করে বল্‌লেন, "সুমতি, তোমার আজকার ব্যবহারের শাস্তি স্বরূপ তোমায় এ স্কুল থেকে আজই বার করে দেওয়া হবে। এর বেশী আর আমার কিছু বল্‌বার নেই।"

সুমতি হাত পা দুলিয়ে মাথা নেড়ে তখনই ঘর থেকে বাহির হয়ে গেল। এই ঘরের হাওয়া যেন তার গায়ে বিছার কামড়ের মত জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

ঘরে গিয়ে সুমতি একবার বিছানায় লুটিয়ে পড়্‌ল, তার পর উঠে তার বইএর পাতার ভিতর লুকানো কাঁচি দিয়ে কেটে রাখা একখানা ছবি টেনে বের ক'রে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে পথের ধুলায় ফেলে দিল। কাগজের বুকে আঁকা যে কিশোর বালকের হাসি মুখখানা এত দিন তার ছেঁড়া পাটিগণিতের অন্তর উজ্জ্বল ক'রে রাখ্‌ত তাকে সে যেন আজ সহস্তে দীর্ণ বিদীর্ণ ক'রে ফেল্‌তে চাইছিল। আজন্ম সে বহু অপমান বহু অবহেলা অবজ্ঞা সহ্য করেছে কিন্তু আজকার এ আঘাতের যেন সে তুলনা খুঁজে পাচ্ছিল না। সে কুৎসিত, সে কদাকার, তাকে দেখে মানুষের মনে কোনো কোমল মৃদুল ভাবের উদয় না হতে পারে, ঐ কিশোর কুমারের মনে মোহজাল বিস্তার সে না কর্‌তে পারে; কিন্তু তাই বলে তার মুগ্ধ মনের সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে এ ছলনা কর্‌বার কার কি অধিকার আছে ? মল্লিকাকে উপহার দেবে সর্বেশ, আর তাই হাতে ক'রে চোরের মত লুকিয়ে নিয়ে আস্‌বে সুমতি ? এর চেয়ে যে তার মরণ ভাল ছিল।

সুমতির যাবার সময় হয়ে এল। শিক্ষয়িত্রী শেষবার নরম হয়ে বল্‌লেন, "সুমতি, তুমি যদি তোমার দোষের জন্ম ক্ষমা চাও, তবে আমি এখনও তোমাকে রাখ্‌তে পারি।"

সুমতি হাত নাড়া দিয়ে বল্‌লে, "না, না, আমি থাক্‌তে চাইনে। আমায় দূর করেই দিন। মল্লি-রাক্ষুসীটাকে আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না। আমায় না যেতে দিলে আমি নিজেই বেরিয়ে চলে যাব।"

তিলোত্তমা চলে গেল। মেয়েরা বল্‌লে, "মাগো, ধন্যি মেয়ে বটে! যেমন তাড়কা-রাক্ষুসীর মত চেহারা, তেমনি কি বুকের পাটা!" মেনকা বল্‌লে, "বুকের পাটা না কচু! ও সব বাঁদরামি। ওর শুক্‌নো হাড়ের গাঁঠে গাঁঠে সয়তানী। গয়নাটা সটকিয়েছে; এখন ধরা পড়ে তেজ দেখিয়ে নেওয়াও হল, পালানোও হল। সত্যি বাপু, যাই বল আর তাই বল, মানুষের চেহারায় স্বভাব আঁকা থাকে।

ওকে প্রথম দিন দেখেই বুঝেছিলাম সয়তানী-বুদ্ধিতে শুকিয়ে পাকিয়ে ওর চেহারাটা অমন কাঠ হয়ে উঠেছে।"

তারা বল্‌লে, "আরে হিংসে রে হিংসে! প্যাকাটির দিকে কেউ ত ফিরে তাকায় না, তাই গায়ের জ্বালায় কি ক'রে পরের সর্ব্বনাশ করবে তাই ভেবে আপনি পুড়ে মরে।"

* * * *

মল্লিকার সাতদিন কথা-বন্ধ শাস্তি। ঘরের কোণে হাঁড়িমুখ ক'রে সে বসে পড়্‌ছিল; একটি মেয়ে তাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। সলিলা লিখেছে, "ভাই মল্লি তোকে যে গহনাটা পাঠিয়েছিলাম সেটা না পেয়ে না জানি আমায় কি ভাবছিস্। ব্রোচ-জোড়া বাইরে রেখেই ভুলে খালি বাক্সটা প্যাক করে পাঠিয়ে দিয়েছি। জন্মদিনে তোর পরা হল না, কিছু মনে করিস্ না। এবার দেখা হলেই পরিয়ে দেব। তিলোত্তমাকে চোর ধরিস্ না যেন।—সে বেচারা কিছুই জানে না।"

ক্ষুধায় অন্ন জোটে না যাদের দারুণ তৃষায় মেলে না জল,
ষোড়শোপচারে কেমনে তাহারা তোরে আজ মাগো পূজিবে বল!
—"ব্যর্থ বোধন।"

শাস্তি

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১

বৃদ্ধ কৃষ্ণলাল যখন তাঁহার একমাত্র মা-হারা শিশু-সন্তান গোপাললালকে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামলালের হাতে সমর্পণ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, তখন মনে হইল যেন, তিনি তাঁহার অতি আদরের ধনকে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়াই একটি মহা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিলেন!

গোপাল যখন বছরখানেকের ছেলে তখন তাহার মা মারা যায়। সেই সময় হইতে কৃষ্ণলাল পুত্রকে, একত্রে মাতা এবং পিতার স্নেহ যত্ন ও ভালবাসা দিয়াই মানুষ করেন। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর সময়ে সেই ব্যথা-ক্লিষ্ট করুণ চোখের ছল্ ছল্ দৃষ্টি মনে করিয়া তিনি আর দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রামলাল, কৃষ্ণলালের একমাত্র ভাই। সেও ছেলে বেলায় পিতৃমাতৃহীন হইয়া দাদার কাছেই বাপের আদর যত্ন ও ভ্রাতৃজায়ার কাছে মায়ের স্নেহ এবং ভালবাসা পাইয়া মানুষ হয়! তাই কৃষ্ণলাল বোধকরি মাতৃহারা পুত্রকে নিজের মৃত্যুর সময় রামলালের হাতে দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন!

রামলালের বয়স তখন কুড়ি বৎসর হইবে, বিবাহ হয় নাই। কৃষ্ণলালের এই আশা আর জীবিতাবস্থায় পূর্ণ হইল না! কৃষ্ণলালের চেষ্টা সত্ত্বেও রামলাল রাজী হয় নাই কারণ, তাহার ইচ্ছা ছিল, নিজে যতক্ষণ না নিজের এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের ভার বহিতে সক্ষম হইবে, ততক্ষণ বিবাহ করিবে না। দাদার মৃত্যুর পর সে বুঝিল, এখন বিবাহ করা প্রয়োজন। নহিলে গোপালকে কে দেখিবে? তখন দাদা বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌সন্ লইয়া দিনরাত গোপালকে লইয়াই থাকিতেন, সেই জন্ম অন্ত কাহারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু এখন কি হইবে! সে ত সমস্ত দিনই বাড়ীর বাহিরেই থাকে কিন্তু গোপালকে ত আর সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়ানো চলে না—সে সম্ভবও নহে!

দাদার মৃত্যুর সময়কার সেই যন্ত্রনাপূর্ণ ক্যাকাশে চোখের করুণ চাহনি মনে পড়িল! মনে পড়িল, দাদা যখন তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন—"রাম, আমার গোপাল রইল—তোমাকে আর কি বল্‌ব—ওযে তোমারও ছেলে!"

সে তখন নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। দাদা কি মনে করিয়া তাহার হাতটি নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া অনুনয়স্বরে বলিলেন—"পার্‌বে ত রাম?"

"কেন পার্‌ব না দাদা! আমার গোপাল—" আর বলিতে না পারিয়া সে গোপালকে বুকে করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দাদা নিশ্চিন্ত হইয়া একটি বুক-জোড়া আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু বুজিলেন—চিরজন্মের মত।

এই রকম কত কি চিন্তা দিনরাত তাহার মনে আনাগোনা করিত। সেই গোপাল যাহাতে সুখে থাকে তাহার ব্যবস্থা তাহাকে যেমন করিয়াই হোক করিতেই হইবে!

২

রামলালের স্ত্রীকে গোপাল মা বলিয়াই ডাকিতে লাগিল।

এই নূতন সংসারে আসিয়া অমলা প্রথমটা যেন কেমন হইয়া গেল! কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত এই সব ভাবিয়া স্থির করিতে কিছু সময় লাগিল।

রামলাল যখন তাহার স্ত্রীকে জানাইল যে গোপালের দেখাশুনার জন্যই তাহাকে ঘরে আনা হইয়াছে—অতএব সে যেন তাহার কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা না করে, তখন অমলা বিশেষ সুখী হইতে পারে নাই! এবং এই জন্যই গোপালের উপর প্রথম হইতেই তাহার একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়া উঠিল। কিন্তু রামলালের সম্মুখে গোপালের সহিত কোনরূপ খারাপ ব্যবহার করিতে সে ভয় পাইত!

অমলা মনে মনে ইহাই স্থির করিল যে, যতদিন এ সংসারে তাহার নিজের কোন জোর থাকিবে না ততদিন সে, যে যেমন চায় তাহার সহিত সেই রকম ব্যবহারই করিবে; কিন্তু ভগবান যেদিন তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন—সেইদিন সে একবার দেখিয়া লইবে এ সংসারে কাহার দাবী, কাহার অধিকার বেশী।—তাহার না গোপালের?

সে নীরবে নিজের কাজ করিতে লাগিল। রামলাল স্ত্রীর এই প্রকার সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হইল, ভাবিল—মনের মত স্ত্রীই হইয়াছে।

গোপালের বয়স কম হইলেও সে যেন কেমন করিয়া নিজের অন্তরের ভিতর

অনুভব করিল, তাহার মা তাহাকে তেমন ভাবে ভালবাসে না। সে যেন স্বভাবতঃই তাহার কাছ হইতে দূরে থাকিতে চাহিত। অমলাও ইহা বুঝিল কিন্তু কি করিবে? সে যে সত্যই তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে না! মনে মনে দুইজনের এই প্রকার ভাব থাকিলেও বাহিরে তাহা বুঝা যাইত না।

গোপাল বেশীভাগ রামলালের কাছেই থাকিত। অমলা হয়ত সুবিধা পাইয়া কোন কোন দিন গোপালের কাছে বস্ত্র-প্রান্তে শুষ্কচক্ষু মুছিয়া বলিত "আমি ত আর গোপালের মা নই তাই গোপাল আমার কাছে থাকতে চায় না—আমায় ভাল বাসেনা—" বলিতে বলিতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিত। গোপাল যেন কেমন হইয়া যাইত। মা কেন এমন কথা বলে? আমি ত মাকে ভালবাসি। বাসি না? এই প্রশ্ন মনের ভিতর জাগিত! সে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিত—"কেন মা তুমি অমন ক'রে বল? আমি তোমায় ত কত ভালবাসি।"

অমলা বলিত—"আমি ত আর সত্যি মা নই!"

গোপাল অভিমান করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিত—"সত্যি মিথ্যে আমি জানি নে মা—"বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। সে তাড়াতাড়ি মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইত! অমলা সযত্নে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিত—"আচ্ছা আর বল্‌ব না—।" এই গোপালকে বুকের মধ্যে পাইয়া তাহার মনে একটি কিরকম অদ্ভুত আনন্দ হইত। সে মনে মনে ঠিক ভাবিয়া পাইত না এ আনন্দ এ তৃপ্তি গোপালকে বুকে পাইয়া হয় কেন? গোপাল ত তাহার ছেলে নয়?

৩

সে দিন রাত্রে কি একটি কথা লইয়া রামলালের ও অমলার কিছু মনান্তর হইয়া গেল। প্রথমটা রামলাল, স্ত্রীর, গোপালের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছিল! কিন্তু আজকাল দেখিল অন্যরকম! গোপাল কেমন মনমরা হইয়া শুষ্কমুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার বয়সও হইয়াছে সে যেন কিসের একটি অভাব দিবারাত্রিই অনুভব করিত এবং পূর্ব্বকার অপেক্ষা তাহার শরীরও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

অমলা ধীরে ধীরে সংসারের উপর একটু আধটু আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। রামলাল বলিয়াছিল—"আচ্ছা, গোপাল কেন অমনতর হয়ে গেল বল দেখি? তুমি বুঝি—"

"ছচক্ষে দেখতে পারিনে, না? বল, এই কথাটি শুনতেই বাকি ছিল। আমি তাকে যত্ন করিনে—এইত! বেশ ত আমায় না হয় বিদেয় ক'রে অন্য কাউকে নিয়ে এস, যে গোপালকে যত্ন করতে পারবে। বুড় ছেলেকে কি কোলে ঘুম-পাড়াতে হবে, না হাতে ক'রে খাইয়ে দিতে হবে?—" বলিয়া ক্রোধের ভরে গজ্ গজ্ করিতে করিতে অমলা পাশ ফিরিয়া শুইল।

রামলাল তাহার পর কত কথা বলিল এবং অবশেষে নিজের যে দোষ হইয়াছে তাহাও স্বীকার করিল কিন্তু অমলা কোন জবাব দিল না।

অমলা মনে করিল—এ কি জ্বালা! পরের দায় ঘাড়ে করিয়া আমার লাভ কি? তাহা ছাড়া গোপালের প্রতিই রামলালের সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা যদি চলিয়া যায় তবে নিজের পুত্রের বেলায় থাকিবে কি?

গোপালের সামনে এবং আড়ালে অমলা দুই প্রকার হইয়া যাইত। যখন গোপাল না থাকিত তখন তাহার উপর খুব রাগ হইত, কি যে করিবে ভাবিয়া পাইত না—কিন্তু গোপাল যখন আসিয়া মা বলিয়া ডাকিয়া গল্প করিত তখন সমস্ত রাগ-বিদ্বেষ কোথায় চলিয়া যাইত। গোপালকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইবার একটি প্রবল ইচ্ছা হইত কিন্তু জোর করিয়া সে ইচ্ছা দমন করিত।

সমস্ত দিন অমলা কাহারও সহিত কথা-বার্ত্তা কহিল না। গম্ভীর হইয়া রহিল। রামলাল আর তাহাকে কোন প্রশ্ন করিল না।

সন্ধ্যাবেলা গোপাল যখন ঝিএর মুখে শুনিল, যে মা সমস্ত দিন কিছু খায় নাই এবং দরজায় খিল দিয়া ঘরে শুইয়া আছে তখন মনে করিল হয়ত তাহারই উপর রাগ করিয়াছে।

"মা!"

"কেন?"

"দোরটা একবার খোল না।"

"কেন?"

"তোমার কি হয়েছে মা? খাও নি কেন?"

অমলা আসিয়া দোর খুলিয়া দিল। উস্কো-খুস্কো চুল, চক্ষু রক্তবর্ণ! গোপাল ভয় পাইল। সে তাড়া তাড়ি গিয়া মার কপালে হাত দিয়া বলিল "জ্বর হয়েছে বুঝি?" অমলা মনে মনে স্থির করিয়াছিল আজ কিছুতেই নরম হইয়া মিষ্ট কথা কহিবে না—আজ তাহার রাগ দেখাইবে, তাই কর্কশ স্বরে বলিল—"না কিছু না।"

"তবে কেন খাও নি ?"

অমলার চোখে হঠাৎ জল আসিল। সে তাড়া তাড়ি মুখ ফিরাইয়া গোপন করিয়া কোন মতে বলিল—"এমনি—ইচ্ছে হয় নি !

গোপাল বুঝিল যে কিছু ত্রুটী হইয়া গিয়াছে। অনেক ভাবিয়া বলিল—"কাকা বকেছেন বুঝি ?"

অমলা এবার ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত মন গলিয়া গেল। গোপালের কাছে সমস্ত ঘটনাটি বলিতে লজ্জা হইল। গোপালকে লইয়াই তাহাদের মনান্তর হইয়া গিয়াছে !

গোপাল ধীরে ধীরে বলিল—"সেইজন্ত তুমি নিজের ওপর রাগ ক'রে শরীরের ওপর অত্যাচার কর মা এত ! কাকা যদি বকেন, কি করবে ?" গোপাল ইহাও বুঝিয়া ছিল যে তাহার কথা লইয়াই বকুনি খাইয়াছে তাই বলিল, "কাকার ত ভারি অন্যায় কেন অমন ক'রে বকেন ? তুমি আমায় কত ভালবাস ত তিনি জানেন না তাই বকেন।"

অমলার আর সহ্য হইল না। এই বালকের মুখের এই সরল কথা শুনিয়া সে স্থির থাকিতে পারিল না। গোপালকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বার বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। অমলার মনের সমস্ত গ্লানি চোখের জলে ধুইয়া গেল ; সে আবার প্রফুল্ল মনে নিজের কার্য্যে মনোযোগ দিল।

৪

দিনগুলা হয়ত ভালয়-মন্দয় এই রকম ভাবেই কাটিয়া যাইত। হয়ত তাহাদের স্নেহ যত্ন ভালবাসা এই রকম করিয়া গোপালের প্রতিই চলিয়া আসিত। হয়ত গোপালকে সে একদিন নিজের ছেলে বলিয়াই মনে করিতে পারিত ; যদি না মধ্য হইতে আর একজন আসিয়া সব ওলট্-পালট্ করিয়া দিত। সে রামলালের পুত্র নন্দলাল।

এই নন্দলালের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অমলার ত যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইলই, রামলালেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইল। সেটি আর কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক অমলা বুঝিল এবং নিভৃতে আরামের একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

গোপাল যেন তাহার মা এবং কাকার নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া গেল। সে বুঝিল না কেন এমন হইল ! নন্দকে সে বোধ করি নিজের প্রাণের অপেক্ষাও

ভাল বাসিয়াছিল কি জানি কেন! কিন্তু গোপাল ঠিক বুঝিল না, এই নন্দর প্রতি তাহার ভালবাসা মাকে তেমন আনন্দ দেয় না কেন!

রামলাল বেচারা মহা মুস্কিলে পড়িল। সে না পারে গোপালকে আদর করিয়া ভালবাসিতে, না পারে অনাদর করিয়া দূরে ঠেলিতে। কারণ তাহার সমস্ত গতি-বিধিই আর একজনের দ্বারা পরিচালিত হইত। বেচারা বড় দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক। স্ত্রীকে বেশ ভয় করিত। দিবারাত্রি নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকিত; অবসরে বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেস দিয়া নিবিষ্টমনে ধূমপান করিত, সংসারের কি হইতেছে না হইতেছে তাহা দেখিবার প্রয়োজন হইত না।

একদিন সকালবেলা রামলাল অবসর মত নিজের কাজ করিতেছে এমন সময় ভিতর হইতে কিসের তীব্রস্বর শুনিতে পাইল। ঠিক বুঝিল না যে কেহ কোন রাগ-রাগিণী আলাপ করিতেছে কি না! অবশেষে আলাপ নহে বিলাপ বুঝিয়া ভিতরে গিয়া এক ভীষণ ব্যাপার দেখিল।

ঝি রণচণ্ডীর ন্যায় রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ চক্ষু করিয়া গলার স্বর যতদূর সম্ভব চড়াইয়া চীৎকার করিতেছে এবং তর্জ্জনী ঘুরাইয়া কাহাকে তর্জ্জন করিতেছে। অদূরে অমলা নন্দকে ভীষণ প্রহার করিতেছে এবং তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোপাল থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

"ব্যাপার কি?" বলিয়া রামলাল স্ত্রীর দিকে তাকাইল।

কেহ কোন জবাব দিবার পূর্ব্বেই ঝি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ও কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া সমস্ত ব্যাপার জানাইল।

ব্যাপারটা আর কিছুই নহে—গোপাল পড়িতেছিল নন্দ গিয়া গোপালের একটি বই লইয়া অতি মনোযোগ সহকারে পড়িতে গিয়া বইটি ছিঁড়িয়া ফেলায় গোপাল তাহার কান মলিয়া দিয়া একটি চড় লাগায়। অমলা দেখিতে পাইয়া গোপালকে যা নহে তাহাই বলে, নন্দর গায়ে হাত তুলিবার তাহার কোন অধিকার নাই তাহা জানায় এবং ভবিষ্যতে এরূপ হইলে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবে জানাইতেও ছাড়ে নাই।

ঝি গোপালকে বড়ই ভালবাসিত। যতদিন অমলা না আসিয়াছিল ততদিন সে-ই তাহাকে মানুষ করে। এই সকল কথা তাহার অসহ্য বোধ হয়, সেও অমলাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে, এই লইয়াই ঝগড়া হয়।

রামলাল ভীষণ চটিয়া যায়। জীবনে বোধহয় এই তাহার প্রথম রাগ।

রাগে সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চোখ দুটো লাল হইয়া গেল কিন্তু মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, ঠোঁট দুটী কাঁপিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া রামলাল ক্রোধ-কম্পিতস্বরে অমলাকে বলিল—"এর মানে কি?"

এই স্বর শুনিয়া অমলা চমকিত হইল। স্বামীর এরূপ কণ্ঠস্বর ইতি পূর্ব্বে সে শুনে নাই। কোন জবাব দিতে পারিল না।

রামলাল আবার বলিল—"বেশ যাতে ভাল হয় আমিই তাই করব। গোপালের যাতে এখানে না থাকা হয় তারই ব্যবস্থা করছি আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের যাবার উপায়ও করছি—তুমি তোমার ছেলে নিয়ে সুখে থাক।" বলিয় দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

৫

রামলাল নিজের প্রায় বেশীরভাগ কথাই রাখিতে পারিত না। কিন্তু এবার তাহা হইল না। সেই দিন হইতেই যেন সে একেবারে বদলাইয়া গেল। অবশ্য নিজের যাইবার কোন উপায়ই করিল না বটে কিন্তু গোপালের অন্যত্র যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

গোপালের মামা প্রায়ই গোপালকে কলিকাতায় নিজের কাছে রাখিবার ইচ্ছা রামলালকে জানাইতেন; রামলাল রাজী হইত না। এবার রামলাল তাহাকে জানাইল যে গোপালের এখানে তেমন পড়া-শুনার সুবিধা হইতেছে না, বোধ-হয় কলিকাতায় সুবিধা হইবে।

গোপালের এক মামা। মামার সংসারে মামা আর মামী ছাড়া আর কেহই নাই। গোপাল সেখানে গিয়া সুখেই রহিল। যাইবার সময় নন্দ অনেক কান্নাকাটি করিয়াছিল। গোপালের মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল। কিছুদিন থাকিয়া তাহার মন ঠিক হইয়া গেল। সে বেশ মনোযোগ দিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল।

• • • •

অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে—কতদিন হইবে ঠিক বলিতে পারা যায় না বোধকরি বছর চব্বিশ পঁচিশ হইবে। গোপাল কলিকাতায় মস্ত দোকান, খুলিয়াছে—খুব বড়লোক।

নন্দ অনেক বড় হইয়াছে, পড়াশুনা করিতেছে—দাদার কথা বিশেষ মনেও নাই।

রামলাল বৃদ্ধ হইয়াছে; গোপালের চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই তাহার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কেমনতর হইয়া গিয়াছিল, কাহারো সহিত বিশেষ কথা-বার্ত্তা কহিত না। এখন বৃদ্ধ বয়সে রোগ ধরিয়াছে বোধ হয় আর বেশীদিন কাটিবে না।

অমলা ভালয়-মন্দয় একরকম মন্দ নাই।

* * *

আজ আটদিন রামলাল মারা গিয়াছে। গোপাল জানে না; চিঠিপত্র যে চলিত না তাহা নয়—তা সে মাস খানেক অন্তরে অন্তরে।

সকালবেলা গোপাল নিজের দোকান-ঘরে বসিয়া আছে—একজন লোক ঢুকিল। মাথায় তৈল নাই পায়ে জুতা নাই, থান কাপড় এবং সাদা চাদর গায়ে।

গোপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাই আপনার?"

আগন্তুক বলিল—"গোপালবাবু কোথায়?"

"আমিই গোপালবাবু—কি চাই—"

"দাদাগো—বাবা মারা গেছেন—আমি নন্দ—" বলিয়া নন্দ আছাড় খাইয়া গোপালের পায়ের তলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। গোপাল বলিল—একখানা চিঠি লিখ্‌লেই ত হত ভাই, এই অশৌচের ভেতর তুমি কেন এলে?"

"কি করব দাদা—মা যে কিছুতেই মান্‌লেন না বল্‌লেন 'যা নন্দ তার পায়ে ধরে নিয়ে আয়গে, বড় দুঃখে সে এ জায়গা ছেড়ে গিয়েছিল।' আমি কত বোঝালাম বল্‌লাম—এ খবর পেয়ে কি কেউ দুঃখ অভিমান ক'রে বসে থাকৃতে পারে? তিনি বল্‌লেন, না বাবা তুই জানিস্‌নে—আমার নিজের যাওয়া উচিত ছিল—আমি যে তাকে এখান থেকে তাড়িয়ে ছিলাম রে।—"

শ্রাদ্ধাদির পর গোপাল, অমলাকে বলিল—"চল মা সবাই মিলে কল্‌কাতায় থাকিগে—নন্দ ঐখানেই পড়া-শোনা করবে। এখানে আমার আর থাক্‌তে ইচ্ছে করে না।"

অমলা বলিল—"তাই চল্‌ বাবা—তোকে ছেড়ে আমি আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচব না।"

অবশেষে তাহাই স্থির হইল। বাড়ী ঘর-দোরের ভার পাড়াপ্রতিবেশীর উপর দিয়া তাহারা সকলে কলিকাতায় গেল। মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখা-শুনা করিয়া যাইবে—ইহাই কথা রহিল।

রামলাল নিজের সমস্ত সম্পত্তিই গোপালের নামে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

মাস তিন চার পরে অমলা একদিন গোপালকে বলিলেন—"আর ত একলা থাকৃতে পারি না বাবা, তোর বিয়ে দিয়ে একটি টুকটুকে বউ ঘরে আন্‌তে পার্‌লে বাঁচি। নিজেও একটু জুড়ই—দেখ্‌না বাবা—তোকেই বা কি বলি—"

"হাঁ দেখ্‌ছি" বলিয়া গোপাল হাসিয়া চলিয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা অমলা মালা জপিতেছিল এমন সময় গোপাল একটি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়া বলিল—"মা কেমন? দেখ পছন্দ হয়?"

"কে রে? বেশ মেয়ে ত!"

"ও—বিপিনের ছোট বোন্‌।"

তারপর কিছু মিষ্টমুখ করিয়া উষা দাদার সঙ্গে বাড়ী চলিয়া গেল। অমলা বলিল—"গোপাল অমন মেয়েটি হাত-ছাড়া করিসনে বাবা—" "না মা অত ভেবো না—এই আস্‌চে মাসেই ওকে ঘরে নিয়ে আস্‌ব। নন্দর পরিক্ষাটা হয়ে যাক।"

অমলা কিছু বিশেষ বুঝিল না—"হাঁ৷ তাই বেশ হবে—"বলিয়া মা দুর্গার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল—"আমার মনের ইচ্ছে বিফল কর না মা!"

একদিন গোপাল দুই জোড়া চেলী লইয়া অমলার কাছে গেল। অমলা তখন গোপালের বিবাহেরই সব উদ্যোগে প্রবৃত্ত ছিল। গোপাল বলিল—"দেখ মা বর-কনের চেলী, কেমন হল?"

"বেশ বেশ, মেয়েটিকে বেশ মানাবে টুকটুকে রং কি না!"

গোপাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এটা কিন্তু নন্দকে বেশ মানাবে—না?"

"নন্দকে কেন তোমাকেও বেশ মানাবে—কার্ত্তিকের মতন! কত দাম?"

"এখনও ঠিক করি নি। বেশী নয়—তা হাঁ৷ আমায় আর কেন মা? ও নন্দরই হোক, ওর মধ্যে আমায় আর টেনো না।" বলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। অমলা ঠিক বুঝিল না যে কি সে বলিল! হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর অনেক ঘটা করিয়া একদিন নন্দর বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু অমলা এত আনন্দেও না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না। গোপাল, নন্দকে আর উষাকে

আশীর্ব্বাদ করিয়া নন্দকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। নন্দ দাদার বক্ষের ভিতর স্থান পাইয়া যেন পিতার শোক ভুলিয়া গেল। অমলা কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। মনে মনে গোপালের উদারতা দেখিয়া তাহার উদ্দেশ্যে বার বার অজস্র আশীর্ব্বাদ করিল।

পুত্র ও পুত্র-বধুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে তুলিল অমলা গোপালকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বুড়ো মাকে খুব শাস্তিটাই দিলি বাবা—!"

মালা

—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

জীবন-ভরা ব্যথার ফুলে এমালা গাছি গাঁথা;
কাহার গলে পরাব আমি তোমায় দান, দাতা?
সরস অতি,—সতেজ অতি,—দলের থরে থরে,
শ্বাসের মত সুরভি বহে, করুণা-মধু ঝরে।
পাঁপ্‌ড়ি নাহি কুঁকড়ে পড়ে গ্রীষ্মে খর রোদে,
বর্ষা ঝড়ে তুষার শরে জীবন নাহি মোদে।
যুগের পর আসিল যুগ শুষিতে জালা রাশি,
হল না তায়,—হবে না তার ব্যথার মালা বাসি!

অভিমান

— শ্রীনীলিমা বসু।

জ্যোৎস্না-ভরা গভীর রাত্রি। এত বড় কলিকাতা-নগরীটা নিস্তব্ধ নীরব, এই নিশুতিরাতে সুধার চোখে ঘুমের লেশমাত্র নাই। সেই সন্ধ্যা হইতে এ পর্য্যন্ত বিছানার উপর সে ছট্‌ফট্ করিতেছে; আজ একি হইল? একটু ঘুম আসিলে যে সে বাঁচে!

এতক্ষণ বিছানায় পড়িয়া কত কথাই না তাহার মনে হইয়াছে, কত পুরাতনকে টানিয়া নূতন করিয়া ভাবিয়াছে. কত নূতনকে মনের অতল-তলে ডুবাইয়া দিয়াছে কিন্তু শান্তি কই? এমনভাবে যে তাহার আর ভাল লাগে না!

পাশেই স্বামী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। একবার তাহার ইচ্ছা হইল, এই পরিশ্রান্ত নিদ্রিতের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া এ কয়দিনে যাহা কিছু অন্যায় সে করিয়াছে তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া লয়, কিন্তু আবার পরক্ষণেই অভিমানে, লজ্জায়, রাগে সে পাশ ফিরিয়া শুইল। না, সে কিছুতেই ক্ষমা চাহিবে না, এমন কি অন্যায় সে করিয়াছে, যাহার জন্য পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে? অপরাধ যদি কিছু হইয়া থাকে তাহা কেবল একমাত্র তাহারই একার নয়; উভয়েরই।

বায়স্কোপের ছবির মত আজ তাহার জীবনের অনেক কিছু ঘটনা মনের উপর দিয়া চলিয়া চলিয়া আবার কোন্ তিমিরে মিলাইয়া গেল! তাহার শৈশবকাল, তখনকার সব সঙ্গীদের কথা। তারপর স্কুলের জীবন, তখন যৌবন কেবল ধীরে ধীরে তাহার আগমনী জানাইতেছে, সেই সময়কার বন্ধুত্ব, প্রীতি, মনের নানারূপ রঙ্গীন আকাশ-কুসুম কল্পনা, সবই তাহার মনে পড়িল। পরে বিবাহ-দিনের কথা তাহার চোখের সমুখে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। কত আনন্দ, কত উদ্বেগ! যাহাকে কখনও দেখে নাই, জানে নাই, তেমনি এক তরুণ যুবক কোথা হইতে তাহার সুমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল! বুকখানা তাহার সঙ্কোচনায় দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল!

আর আজ? দুইটি বছর অনায়াসে পার হইয়া গেল, কাহারও বাধা বন্ধ

মানিল না। পূর্ব্বের দিনের সঙ্গে, এখনকার দিনগুলি মিলাইতে গিয়া, তাহার বুক চিরিয়া প্রকাণ্ড এক দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। চোখ দুইটা সহসা জলে ভরিয়া উঠিল।

এ-বাড়ী আসিয়া ইহা আজ নূতন নয়। এমনি গভীর রাত্রে, অথবা নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে বিরল কোণে মুখ গুঁজিয়া, কাতর কান্না সে আরও কত কাঁদিয়াছে, কেহ তাহার খবর পায় নাই। ছয়মাস পূর্ব্বের সেই রাত্রির কথা মনে পড়িল। কথায় কথায় স্বামী বলিলেন—'আমি তো তোমায় কিছু বল্‌ছি না সুধা। তুমি তোমার মতে চল,—আমাকে আমার মতে চল্‌তে দাও। অন্যের স্বাধীনতায় হাত দেওয়ার অধিকার তোমার নেই।' সেদিন কথা কয়টি সুধাকে অত্যন্ত আঘাত করিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিয়াছিল—"দুই মতের উপর ভর দিয়ে, একপথে চলা কি এতই সহজ?" সুধার সেদিন মনে হইয়াছিল, স্বামী তাহাকে হাতে ধরিয়া কঙ্কর-কণ্টকময় সংসার পথ অতিক্রম করিয়া চলুন, ইহাই সে চায়। এই হাতে হাত না পাওয়াতেই তাহার মনে ব্যথা বাজে!

খোলা জানালা দিয়া যে চাঁদের আলোটুকু ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল, কখন যে সেই আলো গ্রাস করিয়া অন্ধকার ধীরে ধীরে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে, সুধা তাহা টেরও পায় নাই। এতক্ষণে নজর পড়িলে দেখিতে পাইত, সারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বিজলী চমকাইতেছে!

সুধার ইচ্ছা হইল স্বামীকে না জাগাইয়াই তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। গত চারটা রাত্রি সে ঐ ওপাশে মুখ ফিরাইয়া একভাবে শুইয়া কাটাইয়া দিয়াছে। আজ তাই তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। এতটা হয়তো না করিলেও চলিত। আর ব্যাপারটা যে গোড়াতেই খুব গুরুতর ছিল তাহাও তো নয়।

চারদিন আগে সুধা, তাহার স্বামীর অমতে মেজদিদির সঙ্গে, একজিবিসন্ দেখিতে গিয়াছিল, পরে বাড়ী ফিরিয়া স্বামীর সহিত কথা কহিতে গিয়া দেখে, বহু প্রশ্নেও সে একেবারে নিরুত্তর! তখন বারকয়েক সাধা-সাধি করিয়াও কোন ফল না হওয়াতে, সুধা রাগ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসে, সেই অবধি দুই-জনের কথা বন্ধ আছে। সুধা মনে করিয়াছিল, স্বামীই আগে কথা কহিবেন, কিন্তু একদিন একদিন করিয়া চারদিন কাটিয়া গেল, কথাবার্ত্তা কিছুই হইল না।

সুধার ভারী রাগ হইতেছিল, সহরের সমস্ত মেয়ে-পুরুষ; এই মেলা দেখিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছে, বিদেশ হইতে কতলোক দেখিতে আসিতেছে; কেবল মাত্র

তাহার যাওয়াতে, স্বামীর স্বদেশিকতায় কোথায় যে বাধা পড়িল, তাহা যেন সে কোন মতেই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না! কেন যে তিনি কোন আমোদে যোগ দিতে একান্ত বিমুখ, সুধা অনেক ভাবিয়াও তাহা বুঝিতে পারিল না। সে চায়, জীবন ভরিয়া আনন্দকে বরণ করিয়া লইতে, আর তাহার চির-জীবনের সঙ্গী—? কেন এমন হইল? ঝর ঝর করিয়া আবার তাহার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।—তারপর কখন নিবিড় নিদ্রা আসিয়া তাহার জাগরণ-ক্লান্ত চোখ দুইটি ছুইয়া ফেলিল, সে জানিতেও পাইল না।

* * * *

বিমলের মনটা কয়দিন যাবৎ মোটে ভাল লাগিতেছে না, কোথায় যেন কাঁটার মত বিঁধিয়া তাহাকে যন্ত্রণা দিতেছে। সে চায় তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে, সহজ, সরল ও শান্তিময় করিয়া গড়িয়া তুলিতে, কিন্তু প্রবল বাধা-অশান্তিতে তাহা প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাঙ্গিয়া যায়। দেশকে সে ভালবাসে, দেশের সন্তান হইয়া, বিদেশী-ঢংকে সে একটুও পছন্দ করে না। ভগবানের দেওয়া জীবনটাকে সে শ্রদ্ধা করে, কেবল মাত্র হাসি-খেলা করিয়া উড়াইয়া দিতে চায় না। সে চায়, সুধা স্বেচ্ছায় তাহার এইসব কাজে পাশে আসিয়া দাঁড়ায়; সুধাকে পাওয়া দূরে থাকুক, তাহার নিকট হইতে এতটুকু সহানুভূতি পাইলেও সে তাহার বুকখানা আনন্দে ভরিয়া উঠে। মিথ্যাকে সে কোন মতেই সহ্য করিতে পারে না! এইজন্য কতদিন সুধার সহিত সাময়িক ঝগড়া পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, তর্কের দ্বারা মিথ্যার মূল উৎপাটিত করিয়া, সত্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে চাহিয়াছে; কথার ঘায়ে, সুধাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়া, আবার পরক্ষণে আপনি ক্ষমা চাহিয়াছে। কখনও তো সে তাহার সুধাকে অনাদর করে নাই, অশ্রদ্ধা করে নাই। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে নাই, তবুও এমন ঘোর অশান্তি হয় কেন?—জীবনে ভোগকে বিসর্জ্জন দিয়া, ত্যাগের মন্ত্র যে যত গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, সে-ই তত সত্য-আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে; ইহাই তাহার মূল ধারণা। মানুষের ইচ্ছার তো নিবৃত্তি নাই! যত পায় ততই ভাবে,—আরও—আরও—আরও!

সেদিন সুধাকে-সে বিদেশী বণিক-তন্ত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'এক্‌জিবিসনে' যাইতে অমত করিয়া ছিল বটে, কিন্তু বাধা দেয় নাই। ঐ প্রসঙ্গে সে যে-কয়টা কথা বলিয়াছিল, তাহাতে তাহার দিক্ দিয়া যুক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু সেই সবকে অস্বীকার করিয়া সুধা যখন একাকীই গেল, তখন বিমল সহস্র চেষ্টা করিয়াও বেদনাকে দূরে সরাইয়া দিতে পারিল না। তাই সুধা যখন ফিরিয়া

আসিয়া কথা কহিতে চাহিল, তখন মুখে হাসি আনিয়া কথা কহিতে তাহার সামর্থ্যে কুলায় নাই।

সারাদিন পরিশ্রম ও মনের অশান্তিতে তাহার শরীর বড় ক্লান্ত লাগিতেছিল, সুতরাং বিছানায় শুইয়াই সে ঘুমাইয়া পড়িল। সুধার কথা কিছুই জানিতে পারিল না।

* * * *

আকাশের গাঢ় মেঘে তখন আসন্ন বৃষ্টির সূচনা দেখা দিয়াছে। বাতাসের দাপটে, ঘরের জানালা সশব্দে বন্ধ হইয়া আবার খুলিয়া যাইতেছে। বিমলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া জানালাটাকে ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া, আবার আসিয়া ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল। বার কয়েক গর্জ্জন করিয়া, বাহিরে প্রবল ধারায় মেঘ বর্ষিতে লাগিল,—ঝম্—ঝম্—ঝম্।

সুধার ঘুমটি বেশ গভীর হইয়াছিল, বৃষ্টির দাপাদাপি তাহার কানে এতটুকুও প্রবেশ করিল না। বাদলের সুর বড় করুণ ভাবে বিমলের বুকে ব্যথা হানিতেছিল; একা থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। অতি সন্তর্পনে কাছে সরিয়া আসিয়া, তাহার দুই বাহু দিয়া সস্নেহে সুধাকে বুকে টানিয়া লইল। স্বামীর আদরে সুধার ঘুম টুটিয়া গেল, সে ইহারই আশায় আজ কতক্ষণ জাগিয়া কাঁদিয়াছে। এইবারে স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, আকুল আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল।

আকাশের অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে, ঘরের কোণে দুইটি প্রচণ্ড অভিমানীর, এ কয়দিনের অন্তরের জমাট ভাব যেন মুহূর্ত্তেই কাটিয়া গেল।

তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়,
মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়।

"রক্ত করবী"

আশার বাণী

—মিঃ এইচ্, জি, ওয়েলস্।

চিন্তাশীল সাধক মিঃ এইচ্, জি, ওয়েলস্ তাঁহার নব নব সৃষ্টির ভিতরে মানুষের চিন্তাধারাকে অভাবিত কল্পনার দেশে লইয়া গিয়া মানুষকে মুগ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার বিপুল রচনা-সংগ্রহের গুপ্ত-ভাণ্ডার ধন, বুভুক্ষু মানুষের হাতের কাছেই ধরিয়া দিয়াছেন।

গত একবৎসর ধরিয়া ইনি বিলাতের Westminster Gazetteএ প্রতি সপ্তাহে প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। প্রবন্ধ শেষ করিবার সঙ্গে তিনি যে ভাবে উপসংহার করেন, তাহার ভাব, যে 'আমি গত বারমাসে বাহান্নটি প্রবন্ধ লিখেছি আর এইটিই আমার শেষ প্রবন্ধ। আমার সেক্রেটারী এ সব প্রবন্ধগুলিই খবরের কাগজ থেকে কেটে একখানি বইয়েতে সুন্দর ক'রে নিয়মিত ভাবে এঁটে রেখেছেন। এর মধ্যে অনেকগুলিকে আমি পছন্দ করি, আর কতকগুলির ভিতর বল্‌বার মত কিছু থাক্‌লেও ভাল ক'রে লেখা হয় নি বলে, তত ভাল লাগে নি—আর কতকগুলি একবারে খারাপ হয়েছে।

খবরের কাগজের জন্য যাঁরা লেখেন, তাঁদের প্রতি এ সুযোগে আমার শ্রদ্ধা এসেছে। তাঁদের আত্মনির্ভরতা, তাঁদের লেখা সম্বন্ধে নিজেদের বিশ্বাস, এ সব কতগুলি গুণ তাঁদের যথেষ্ট আছে। খবরের কাগজে লেখা মানে প্রতি দিনই—গ্রীষ্মে বর্ষায় সমানভাবে লিখে যেতে হবে। প্রত্যেক সপ্তাহে লেখক বসে বসে লেখ্‌বার বিষয়কে চিবিয়ে চিবিয়ে ঠিক্ ক'রে রাখ্‌বেন্ আর ঠিক দিনে ঠিক সময়ে তাঁকে লেখা দিতে হবে। এতে যে এত পরিশ্রম কর্‌তে হয় তা' আমার আদৌ জানা ছিল না। সেই জন্য বল্‌ছি, সাময়িক কাগজে লেখক হিসাবে এই বোধ হয় আমার 'মৃত্যু শয্যা।'

আমার সামনে আমার লেখা প্রায় ৩০ খানা বই পড়ে আছে, আর তা' দেখে মনে হয়, আমি সত্যিই খুব খেটেছি এতকাল। এই যে এত লেখা—এর দাম কি?—তাই ভাবি।

সমস্ত মানুষ যা' বিশ্বাস করে—আমি যেন সব লেখার ভিতরেই তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছি ! বল্‌তে চেয়েছি, যে—এই পৃথিবীটিকে সবাই যে চোখে দেখে, আমি যেন সে চোখে দেখি না। আর যত পৃথিবী আছে, তার মধ্যে এই পৃথিবীটাই যে সব চাইতে ভাল বা জান্‌বার মত, তা' আমি বিশ্বাস করি না—এ কথা আমি খুব জোর করেই বলেছি।

এ কথা বোঝ্‌বার চেষ্টা আমি অনেকদিন থেকে ক'রে এসেছি আর আমার Outline of Historyতে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি, যে—এই যে মানুষের পৃথিবী, আজ যা' আছে তা' একেবারে সাময়িক। তাকে ক্রমশঃ অনেক পরিমাণে বদ্‌লে দেওয়া যেতে পারে।

আমার নিজের সমস্ত বই পড়ে মনে হয়, একটা জীব যেন কারাগারে আট্‌কা পড়ে তা'থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজ্‌ছে !

আমার মনে পড়ে, আমার শৈশবে একটি বোল্‌তাকে আমি পিচ্‌বোর্ড আর কাগজের তৈরী কারাগারে কেমন ক'রে বন্ধ ক'রে রেখেছিলাম—আর তা থেকে বেরিয়ে আস্‌বার জন্য ঐ ছোট পোকাটির কাগজের দেওয়ালে আঁচড়ানর শব্দ আর তার বিক্ষোভের আর্ত্ত গুঞ্জন !

আমি তাকে শেষকালে কি করেছিলাম তা আমার মনে নেই। খুব সম্ভব তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম। কিম্বা সে হয়ত কাগজের বাক্সটির এক কোণ দিয়ে যে ছোট একটু আলোর রেখা তার বন্দীগৃহে প্রবেশ করছিল—সেই ছিদ্রটিকেই প্রাণপণে আঁচ্‌ড়ে বড় ক'রে সেই পথ দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর সেই কাগজের বন্দীশালা খুলে পিচ্‌বোর্ডের দেয়ালে তার মুক্তির চেষ্টায় যে আঁচড়ের দাগগুলি দেখেছি, তা দেখে বুঝ্‌তে পেরেছি, সেই বন্দীগৃহে তার কি মর্ম্মন্তুদ্ যন্ত্রনা হয়েছিল ! আমার সমস্ত পুস্তকেই পাঠকরা বোধ হয় এই রকমই কতগুলি আঁচড়ের চিহ্ন দেখ্‌বেন ! অমনি ধারাই বেদনার ক্ষত চিহ্ন !

আমার সমগ্র লেখার মধ্যে বিপুল বিশ্বাসের একটি সুর আছে। আর আমি বিশ্বাস করি, আমাদের ক্ষুদ্রতা থেকে বিরাট একটা ব্যাপ্তির জগৎ আছে। আমাদের নীচতা, আমাদের অবসাদ, আমাদের ক্ষুদ্র আবেষ্টনের ভিতর থেকে পালিয়ে মুক্তি পাবার ঐ বিশালতা !

আমার মতে, আমার মনে হয়, আমরা যে পোষাক পরি, তার মধ্যে অনেক-গুলিই বিশ্রী ও কদাকার ; আমরা যা' খাই তার অনেকগুলিই খারাপ ; আমাদের থাক্‌বার বাড়ীগুলি জঘন্য, আমাদের স্কুলগুলি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও শক্তিহীন ; আমাদের

আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা জীবনহীন, আমাদের টাকা-পয়সার 'লেন্ দেন্' একেবারে বাজে; আমাদের ব্যবসা-বানিজ্যের ধরণ বর্ব্বরোচিত ও অপব্যয়-দুষ্ট; আমাদের তৈরী জিনিষগুলি আংশিক ও ব্যয়সাধ্য হয়ে তৈরী হয়। আমাদের রাষ্ট্র নীতি নির্ব্বোধের মত।

আমি নিজেও যে এ সবের খুব বাইরে তা' হয়ত নয়। কিন্তু আমার সমস্ত অন্তর ও দেহের শক্তির কতকাংশ, এই রুদ্ধগৃহের নিয়ম, আকাঙ্ক্ষা, বিরক্তি, প্রভৃতি থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টাতেই ব্যয় করেছি।

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই, প্রকৃতির এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্যবৃষ্টি এবং মানুষের মনকে অসম্ভাবিত উপায়ে আনন্দ দেবার শত আয়োজন সত্ত্বেও এই পৃথিবীতে বাস করা অসহ্ বলে মনে করে।

সুরা।—লোকে কথায় বলে—"ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে বেরিয়ে যাবার সোজা রাস্তা"।—এর মানে কি? এই সুরা মানুষকে সাময়িক উত্তেজনা দেয়, তার অবসন্ন দেহ-মনকে মুক্তির আশ্বাস দেয়, মানুষের আশা-আনন্দহীন জীবনের অবরোধ থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাবার সুড়ঙ্গপথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু?—যখন নেশা ছুটে যায়, উৎসবের কোলাহল থেমে যায়—সেই হিম-শীতল স্তব্ধ রুদ্ধ বন্দীশালায় সে যখন চোখ মেলে জেগে ওঠে!—

আমাদের এই খাঁচায় থাকার অবস্থার কথা মনে রাখ্‌তে হবে কিন্তু তাকেই বড় ক'রে তোলার চেষ্টা কর্‌তে হবে! মনের দৃষ্টিতে, কল্পনার অবসরে, বিজ্ঞানের সাহায্যে, বিদ্যার সম্পন্নতায়, রুদ্ধগৃহের কোণের ঐ আলোর পথটিকে বড় ক'রে নিতে হবে। যে পৃথিবীতে কেবল ফুলের বাগান, আনন্দের আয়োজন, লোকজন—সেই পৃথিবীকে আমি ধারণা কর্‌তে পারি। আর আমার বিশ্বাস এই পৃথিবীকে সেই রকম ক'রে তৈরী কর্‌বার যথেষ্ট উপায় আছে। আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক রীতি নিয়মকে ভেঙ্গে ঐ নূতন কাঠামর উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুল্‌তে হবে।

আমরা যার রাজত্বেই বাস করি না কেন, অথবা যে শাসনের অধীনেই থাকি না কেন, আমাদের প্রচলিত সামাজিক নিয়ম অভ্যাস, বা ব্যবহারিক জীবনের ভিতর থেকে কোন্‌গুলি আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় আর কোন্‌গুলি যে একেবারে অবান্তর তা ঠিক্ ক'রে জেনে নিতে না পার্‌লে, যারা এই পৃথিবীকে সুন্দর ভাব নিয়ে দেখে, বা সত্যিকারের প্রাণবান্ জীবন যাপন কর্‌তে চায়। তাদের পক্ষে এ পৃথিবী অসহ্ মনে হবেই। আমি আমার এই ত্রিশখানা রচনা-সংগ্রহের মধ্যে এতকাল ধরে এই কথাই বল্‌তে চেষ্টা করেছি।

এই খবরের কাগজে লেখার মৃত্যু-শয্যার পর যদি বিশ্রাম পাই তাহলে হয়ত আরও অনেক কিছু বলব।

এই সাময়িক কাগজে লেখার চাইতে আর যদি অধিক কিছু দুঃসাধ্য কাজ থাকে তা হচ্চে, যাঁরা ধর্ম্মাধিকারী, যাঁরা প্রতি সপ্তাহে বা নির্দ্দিষ্ট দিনে অন্ততঃ আধঘণ্টার জন্য উপদেশের বন্যা বর্ষণ ক'রে সাধারণ মানুষকে ধর্ম্মপ্রাণ ক'রে তোল্‌বার জন্য নিয়োজিত আছেন—তাঁরা।

আমার মনকে ঐ অসম্ভাবিত উদার সভ্যতার দিকে নিয়োজিত ক'রে আমি মানুষের জীবনের দৈনিক জীবন যাপনের নির্দ্দিষ্ট ধারার উপর দিয়ে খুব অসম্ভবের আশার একটা সূক্ষ্ম যবনিকা ফেলে দি সত্য কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে, পরস্পর বল্‌তে বল্‌তে, আমি 'যে সৃষ্টির বিদ্রোহী' বলে নাম পেয়েছি—অন্ততঃ তা আর থাক্‌বে না।

সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে, তাতে বিস্ময় নেই,
কিন্তু পাকা দেওয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে, সে আর-এককথা।

"রক্ত করবী"

ভুঁই-চাঁপা

—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল।

১

"তারপর, তোমায় কি বলা হল ?—"

সুধীর বৌ-দিদির প্রশ্নে থতমত খাইয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। সুনীতি ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, "থাম্‌লে যে ? আর কোন আঘাতই আমায় টলাতে পারবে না—"

সুধীর নতমুখে বলিল, "দরজায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর টল্‌তে টল্‌তে এসে—"

"টল্‌তে টল্‌তে ? কেন ? সেই ছাইপাঁশ খাওয়া হয়েছিল বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর ?"

"বল্‌লে যে, আমি এখন আর যেতে পারব না, আমার অনেক কাজ; আমি অনেক অনুরোধ করলুম, শেষে তিনি চলে যেতে যেতে বল্‌লেন, আমায় বিরক্ত করো না, আমি এখন যেতে পারব না।"

সুধীরের গলা ধরিয়া আসিতে ছিল; কেন যে এমন স্নেহের, করুণার প্রতিমূর্ত্তি বৌ-দিদির উপর তাহার দাদা এমন নিষ্ঠুর অবিচার করিতে পারে, তাহা সুধীর কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। সে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল; ক্রোধে ও অভিমানে সে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিল।

বক্ষের জমাট-অশ্রু চাপিয়া রাখিয়া স্থির কণ্ঠে সুনীতি বলিল, "যে বাড়ীতে তিনি থাকেন, সেটায় কি আর কেউ থাকে, কোনও ?—"

"তা আমি জানি না" বলিয়া সুধীর বেগে বাহির হইয়া গেল।

দূরে নারিকেল বৃক্ষ হইতে কয়েকটা চিল চীৎকার করিতেছিল, রেলের বাঁশীর একটা ক্ষীণ আর্ত্তস্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল; আসন্ন সন্ধ্যার রক্তরাগচ্ছটায় ওই দূরে আমগাছের শীর্ষটা রাঙা হইয়া উঠিতেছিল।

সুনীতির কম্পিত ওষ্ঠাধর কেবলই বলিতে চাহিতেছিল, আর তিনি আসিবেন না। সুনীতি ভাবিতে লাগিল, ইহার কি কোনও উপায় নাই? বিবাহিতা স্ত্রীকে অত্যাচারের, অবিচারের পেষণে শুষ্ক ক'রে দেওয়া, নবীন জীবনের সুরভিপূর্ণ পুষ্পগুলিকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যান করা, সংসারের অপোগণ্ড আত্মীয়ের প্রতি এমন বিশ্বাসঘাতকতা করা, এর কি কোনও উপায় নাই? কাহার দোষ, পুরুষের?—না, না, নারীরই দোষ!—কেন না তাহারা নারী,—তাহারা দুর্ব্বল, অসহায়! তাহারা বিশ্বস্তচিত্তে নীরবে দুঃখ সহ্য ক'রে স্বামীর মঙ্গল-কামনা করিতে পারে। তাহারা উপবাসী থাকিয়া স্বামী-পুত্রদিগকে আহারের দ্রব্য আগাইয়া দিয়া নিজের প্রফুল্লতা টানিয়া আনে; তাহাদের হাসি দেখিবার জন্য আপনার বুকে মর্ম্মন্তুদ ব্যথা চাপিয়া রাখিয়া স্নেহের হাসি হাসিতে পারে,—তাই তাহাদের দোষ! যদি তাহারা তা না করিত,—যদি অত্যাচারের বিপক্ষে তাহারা দাঁড়াইত; যদি তাহারা অবিচারের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত; যদি পুরুষের কামলোলুপ দৃষ্টি হইতে আপনার দেহটাকে সরাইয়া উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিত, তাহা হইলেই বুঝি পুরুষকে কতকটা বুঝিতে পারা যাইত।

সুনীতির কান্না পাইল; ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল, কেন এত অবিচার করছ তুমি? আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নি! কিন্তু কে শুনিবে তাহার ব্যথিত-হিয়ার আকুল প্রতিধ্বনি!

রাত্রিতে শয্যার নিকট আসিয়া সুধীর ডাকিল, "বৌ-দি—"

অশ্রুসিক্ত উপাধানে মাথা রাখিয়া সুনীতির সবে তন্দ্রা আসিতেছিল, বলিল,—"কি বল্‌ছ ঠাকুর-পো?"

"শুয়ে রইলে, খাওয়া দাওয়া করবে না?"

"আজ শরীরটা ভাল নেই, কিছু খাব না ভাই।"

সুধীর চলিয়া যাইতেছিল। অভিমানী দেবরটিকে সুনীতি বেশ ভাল করিয়াই চিনিত, সুতরাং তাহার এই কথায় যে তাহার দেবরকেও উপবাসী রাখিবে, এবং ক্ষুধার মুখে দেবরের এ উপবাস হয়ত তাহার স্বাস্থ্যে বিঘ্ন ঘটাইবে,—এটা সুনীতি আগে ভাল করিয়াই জানিত, তাই পুনরায় বলিল, "আচ্ছা চল, যাচ্ছি।"

সুধীর দাঁড়াইয়া রহিল। সেও কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারিয়া ছিল যে বৌ-দিদির শরীর ভাল না থাকিবার কারণ তাহারই আজিকার আনীত সংবাদের সহিত অনেকটা সংশ্লিষ্ট ছিল।

"ও রকম ক'রে ভেবে নিজের মন খারাপ কোরোনা ঠাকুর-পো, চল রাত হয়ে যাচ্ছে।" মন্ত্রমুগ্ধের মত সুধীর, সুনীতির অনুসরণ করিল।

এইরকম ভাবেই দুই মাস কাটিয়া গেল। এপর্য্যন্তও সুধীর আর তাহার দাদা ললিতের খবর পায় নাই ; সুনীতিও জাইতে বলে নাই। সন্তান-সন্ততি কিছুই হয় নাই, যাহাকে লইয়া সুনীতির সারাদিনের দীর্ঘ অবসরটা কাটাইতে পারে, আর তাহার দিন কাটিতে চাহিতে ছিল না। সুধীরের সঙ্গে গল্প করিতে বসিলে, অর্থাৎ অন্ত কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া নিজেকে অন্যমনস্ক করিতে চাহিলে, সেই এক চিন্তাই মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে ; চক্ষের জল রোধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা পাইয়া দেবরের নিকট হইতে উঠিয়া যাইতে হয় ; সুধীরের দৃষ্টি তাহা এড়ায় না, তার সান্ত্বনা-বাক্যগুলি শেষে সুনীতির লজ্জার কারণ হয়। নির্জ্জনে থাকিলে চিন্তা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে।

কতদিন সে মর্ম্মব্যথায় কাতর হইয়া ললিতকে চিঠি দিয়াছিল, কিন্তু উত্তর পায় নাই। সে মাত্র জানিতে চাহিত, তিনি কুশলে আছেন কি না। নিজের শরীরটা যে পলে পলে তিলে তিলে তুষানলে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে বা সংসারের অভাব অনটন, প্রয়োজন, অপ্রয়োজনের জন্য তাহারা দুই জনে কতটা দায়ী হইয়া পড়িতেছে, তাহা সুনীতি তাঁহাকে জানাইয়া বিরক্ত করে নাই। বিদেশে চাকরী কি কেহ করিতে যায় না ? চাকরী করিতে যাইয়া কি সকলে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব স্ত্রী-পুত্রকে ভুলিয়া যায় ? বার বার কাতর হৃদয়ে সে পত্র লিখিয়াছে, 'ওগো তুমি কেমন আছ ?' এক একবার উত্তর আসিত, 'আমায় জ্বালাতন করিও না, এখন যাইতে পারিব না।—'

ছি ছি, নারী কি কেবল সোহাগ করিতেই পুরুষকে গৃহে আসিতে বলে। স্ত্রী হইলে কি নারীকে সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতে হয়! তারপর সুনীতি, দেবরকে পাঠাইয়া সমস্তই জানিতে পারিল। তবুও সুনীতি স্থির থাকিয়া বার বার প্রার্থনা করে, ভগবান তাঁর সুমতি দাও, দুঃখিনীর অবলম্বনকে গৃহে ফিরাইয়া দাও। কিন্তু সে প্রার্থনা বাতাসে মিলাইয়া গিয়া তাহাকে হতাশ করিয়া দিয়াছে, তাহার দেহের অস্থি-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

"বৌ-দি—"

এ স্নেহের এ ভক্তি-অনুরাগের ডাকে সুনীতির চক্ষু ভরিয়া উঠিল; সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

সুধীর কতকটা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বৌ-দি, কাঁদ্‌ছ তুমি?"

"না ভাই, আর ত কান্না আসে না—" বলিয়া সুনীতি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সুধীর ডাকিল, "বৌ-দি, শোন—"

"কি?"

"তুমি নিজের শরীরের দিকে চাইছ না, এ রকম ভেবে ভেবে আর কতদিন বাঁচ্‌বে বল ত? আমাদের সংসারে আর কেউ নেই, তার উপর তুমি যদি অমন করে দিন-রাত বিষন্ন হয়ে শরীরটাকে কালি ক'রে ফেল, তাহলে আমরা আর কার আশ্রয়ে দাঁড়াই?

"ভাবনা ভিন্ন কি ভাই মানুষ থাকতে পারে? এই দেখ না, ঘরে আজ চাল-ডাল কিছু নেই, পয়সা-কড়ি সব ফুরিয়ে গেছে, এ রকম ক'রে আর কি ক'রে চলে বল দিকি?"

কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া সুনীতি বড়ই অপ্রস্তুত হইল। সুধীর বিস্মিত হইয়া বলিল, "কই, এ কথা তুমি আমায় বল নি ত?—"

"দিন-রাত তোমায় এসব অভাবের কথা বলে আর কি বিরক্ত করতে ভাল লাগে?"

"তাহলে আমি জিনিষ-পত্রগুলো এনে দি,—"

"না, আজ আর কিছু আন্‌বার দরকার নেই, তোমার খাবার তৈরী আছে।"

"আর তুমি?"

সুনীতি একটু ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, "না, আমি আজ আর কিছু খাব না ভাই, আমার মাথাটা একটু ধরেছে"।

একটু বিজ্ঞের ভাণ করিয়া সুধীর বলিল, "খাবার ইচ্ছে না থাক্‌লে বোধ হয় অনেকেরই মাথা ধরে।"

"সত্য ভাই, মিথ্যে কথা বলছি না।"

"কেন, জ্বরের মতন হয়েছে নাকি?"

"কি জানি।"

"দেখি" বলিয়া সুধীর সুনীতির কপালে কতক্ষণ হাত টিপিয়া দেখিল, সত্যই জ্বরে সুনীতির মাথা ফাটিয়া যাইতেছে!

সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এ-ত খুব জর হয়েছে দেখ্‌ছি,—আমায় এতক্ষণ বল নি কেন বৌ-দি'—যদি এ জর বাড়ে?"

"তোমায় বল্‌লে তুমি কি কর্‌তে, আর এখন বা কি কর্‌বে?"

সুধীর ভাবিল, তাইত! সে কি করিবে? ভাণ্ডারে খাদ্য নাই, গৃহে অর্থ নাই, অর্থ কোথা হইতে আসিবে তাহারও ঠিক নাই; ধারে ধারে মাথা বিকাইয়া যাইতেছে, মহাজনেরা তাগাদায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সুনীতি বাড়ীতে একলা থাকে, বাড়ীখানা খাঁ-খাঁ করিয়া যেন তাহাকে খাইতে আসে, সুতরাং এ পর্য্যন্ত সে-ও কোন কর্ম্ম করিয়া সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। ঘটি-বাটী যাহা কিছু খুচরা জিনিষ পত্র ছিল, তাহাও বিক্রয় করিয়া এত দিন চলিয়াছে, কিন্তু আর যে চলে না!

ধীরে ধীরে সুধীর বলিল, "যাই হোক ক'রে একটা জরের ওষুধ এনে দি"।

"যাহোক ক'রে, মানে ফের ধার ক'রে?—না ঠাকুর-পো, আর ধার কর্‌বার চেষ্টা করো-না, মহাজনের কড়া কথা অপমান আর সওয়া যায় না, তার চেয়ে যা বরাতে আছে তাই হবে।"

সুধীর শ্রান্তভাবে বসিয়া হস্তে মুখ ঢাকিল। সুনীতি ঘরে ঢুকিয়া সুধীরের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল, তারপর গৃহ-মার্জ্জনা করিয়া যখন বাহিরে আসিল, দেখিল সুধীর তখনও একভাবে বসিয়া আছে। কাছে আসিয়া সুনীতি গায়ে হাত বুলাইয়া ডাকিল, "ঠাকুর-পো?"

প্রবল জরের উত্তাপে সুনীতির গা থম্ থম্ করিতেছিল।

"এমন ভাবে আর কি ক'রে চলে, বৌ-দি?"

সুনীতি বলিল, "ভয় কি ভাই ঠাকুর-পো? আমি ত আছি।"

বুকের ভিতর হইতে একটা প্রবল উপহাসের অট্টহাসি বাহির হইতে চাহিল, —কিসের অভয় সে দিতে পারে! আর কি আছে তাহার! শূন্য সংসারের অভাব, মহাজনের রক্ত চক্ষু অন্তরীক্ষ হইতে তাহাকে শাসাইয়া উঠিল। তাহার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। বাহিরে অভাবের জ্বালা, ভিতরে জরের অগ্নিসম উত্তাপ! দেওয়ালের গায়ে সুনীতির অবসন্ন দেহটা হেলিয়া পড়িল। চক্ষু জ্বালা করিয়া জল ঝরিয়া, পড়িতে লাগিল। সুধীর চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বলিল, "বৌ-দি, তোমার জরটা যে বড় বেড়ে উঠল, ও কি! আবার কাঁদ্‌ছ?"

"থাক্ থাক্—জর হলে অমন চোখ দিয়ে জল পড়ে ভাই।"

"তা পড়ে বটে, কিন্তু গলাটা অমন ধ'রে' ওঠে না, বৌ-দি—"

সুনীতি হাসিয়া বলিল, "ওঃ তুমি বড় চালাক !"

সুধীর দাঁড়াইয়া বলিল, "চল শোবে চল,—এরপর ঠাণ্ডা লেগে জ্বর বেশী বেড়ে যাবে।"

সুনীতি উঠিতে পারিতে ছিল না, বলিল, "আর একটু থাকি, যাব' খন"

সুধীর বুঝিতে পারিয়া বলিল, "আচ্ছা আমি ধর্‌ছি, আস্তে আস্তে চল।"

সুনীতি শয্যা লইল।

জ্বরটা যে এত ভোগাইবে তাহা সুধীর ভাবিতে পারে নাই, দুই তিন দিন সুনীতির অনুরোধে সে কোনরূপ ঔষধ পত্রের চেষ্টা করিল না ; একেবারে যখন সুনীতি অচৈতন্য বাক্-শক্তিহীন হইয়া পড়িল, সুধীর কম্পিতবক্ষে বৈদ্যের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু দুঃখের পালা শেষই হউক অথবা অন্ত কোনও কারণেই হউক, বিজ্ঞ চিকিৎসক যখন আসিয়া ললাট কুঞ্চিত এবং মুখ ম্রিয়মান করিল, সুধীর অন্ধকার দেখিল। তার যে আর জগতে কেহ নাই ! ডাক্তার বলিল, "জ্বরটা একটু শক্ত রকমের বাপু, প্রথম থেকেই খবর দেওয়া উচিত ছিল। এ জ্বরে দু' তিনটে রোগী,—যাক্ ভাল ক'রে সেবা করতে হবে, তা হলেই বোধ হয়—"

সুধীর উদ্বিগ্ন-কাতর স্বরে বলিল, "সারতে কতদিন লাগ্‌বে ডাক্তার বাবু ?"

"এ জ্বরটা সাতদিনই থাকে। ছাড়্‌বার সময় খুব সাবধানে রাখ্‌তে হয়। তারপর একটা দিন কাটাতে পার্‌লেই সেরে যাবে, আর কোন ভয় থাক্‌বে না।"

ডাক্তার চলিয়া গেল ; মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সুধীর ডাকিল, "বৌ-দি !" তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নিমীলিত চক্ষে সুনীতি বলিল, "কি ভাই ঠাকুর-পো ? উঃ জ্বরটা বড় বেড়েছে, কথা বলতে পার্‌ছি না।"

"ভাল হয়ে যাবে, ভয় কি বৌ-দি ?"

ক্ষীণ হাসিয়া সুনীতি বলিল ? "ভয়—ভয় নয় ভাই, দুঃখ।"

৩

পরিশ্রমী এবং সৎস্বভাব বলিয়া আপিসে ললিতের খুব খ্যাতি ছিল এবং সেই হেতুই সে সামান্য বেতনের কেরাণী হইতে ক্রমে ক্রমে সেই ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ারের পদে উন্নীত হইয়াছিল। সামান্য চল্লিশ টাকা মাহিনা হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তিন শত টাকা মাহিনা পাইতে লাগিল।

কিন্তু এই সৎস্বভাব এবং লাজুক যুবকটি তাহার বাসার অনেকের ঈর্ষার পাত্র হইয়া দাঁড়াইল। কেন না এই চালাক-চতুর এবং ধড়িবাজ লোকগুলি প্রত্যহ নয় ঘণ্টা ধরিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও নিজেদের পোষাক পরিচ্ছদ এবং 'সহুরে বাবুয়ানা' করিতে পায় না, আর এই গেঁয়ো হাবা লোকটা,—না-জানে চাল চলন, না-জানে আজব সহরের কাপ্তেনী, এ কিনা অনায়াসে তিন চার ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া এতগুলি টাকা আনে? এই হেতু ললিতের অনেক কৃত্রিম বন্ধু আসিয়া জুটিল। আজ এটা, কাল ওটা, একদিন থিয়েটারে যাওয়া, পরদিন দু'টো গান শুনে আসা, এইরূপ করাইতে করাইতে ললিতের স্বভাবটা বিগড়াইয়া দিল। ললিত মানব জনমের পরম ও চরম সার্থকতা লাভ করিতে শিখিল।

ইদানীং আপিস হইতে বাসায় ফেরা ললিত প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; তা ছাড়া তাহার শরীরটাও খারাপ হওয়াতে সে একমাসের অবসর লইয়াছিল।

সেদিন বৈকালে অত্যধিক মদ্যপানে বিভোর হইয়া ললিত কক্ষ মধ্যে একটি শয্যায় বসিয়া মাঝে মাঝে ঢলিয়া পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া এক একবার অদূরে উপবিষ্ট মুরলার পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। মুরলা তখন প্রসাধনের সরঞ্জাম লইয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু কি একটা আকস্মিক বিরক্তিতে তাহার আর কিছু ভাল লাগিতেছিল না।

ঘাড় ফিরাইয়া একটু প্রখর করিয়া মুরলা বলিল, "দিন-রাত্তির ওই ছাই-ভস্ম গুলো খেতে হবে, একটা কথা বল্‌বার কি সময় নেই?"

সুরার ঘোরে ললিত বলিল, "কে বাবা তুমি, উল্কার মতন ধপ্ করে আকাশ থেকে পড়্‌লে?"

দৃষ্টিটা আরও প্রখর করিয়া মুরলা বলিল, "এখানে বসে আর তুমি মদ খেতে পাবে না।"

"কেন বাওয়া, তাড়িয়ে দেবে নাকি? তুমিই ত আমায় বাঁচিয়ে রেখেছ, পিয়ারী! গাও, গাও, একটা রসের গান লাগাও!"

ক্রুদ্ধ হইয়া মুরলা বলিল, "আবার? এ সব চাল-চলন আর আমার কাছে চল্‌বে না, বলে দিচ্ছি।"

একেই ত প্রথম হইতে মুরলার আকার ইঙ্গিতে কেমন একটা গম্ভীরতা প্রকাশ পাইতেছিল, তাহার উপর আবার এই তীক্ষ্ণ কথাগুলি শুনিয়া ললিতের সুরাপানের মোহময় উন্মাদনার ঝোঁকটা যেন অনেকটা কাটিয়া আসিতেছিল। একটু আত্ম-সংযতভাবে বলিল, "কি, কি বল্‌ছ, মুরলা?"

"বলছি এ রকম বেয়াদপি আর চলবে না।"

মাতালের হাসি হাসিয়া ললিত বলিল, "অন্য শিকার মিলেছে নাকি, বন্ধু!"

"এত নির্লজ্জতা আমি সইতে পারব না, ললিত!"

ললিতের মোহ টুটিল, বলিল,—আমায় কি বলছ তুমি, মুরলা?"

একটু নরম হইয়া মুরলা বলিল, "অত ক'রে মদ খেয়ে দিন দিন যে একেবারে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

"তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ, মুরলা,—আমি ত তোমায় অনেক পয়সা দিয়েছি।"

মুরলা উত্তেজিত হইয়া বলিল, "পয়সা!—পয়সাই কি সব? শুধু পয়সার জন্যই কি আমরা এ ব্যবসা ক'রে থাকি?"

"তবে?"

"আমরা করি, আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনায় পয়সায় উপলক্ষ্য মাত্র! যখন সে আবেগ কালের সঙ্গে ঘুচে যায়, দেখি, চোখের সামনে একটা বিরাট প্রাসাদের ভগ্ন-স্তূপ! প্রাণ ভয়ে পুরুষকে তুষ্ট করি। যখন চোখের সামনে এই প্রকাণ্ড অভাবটা দেখি, তখন পাগল হয়ে যেতে চাই, কিন্তু তা হয় না। সমস্ত জীবন ধরে যে বিষ খেয়েছি, ঐ পয়সার মধ্য দিয়েই তা অমৃত হয়ে ফুটে ওঠে।"

"আজ এ সব কি বলছ, মুরলা?"

বলছি ঠিক!—যাক্ সে কথা, আমি একটা পরামর্শ করতে এসেছিলুম, যদি—"

"কিসের পরামর্শ?"

"দান-পত্রের।"

ললিত চমকিয়া উঠিল; এ কি কুহকিনী নারী! তুচ্ছ অর্থের বিনিময়ে যে নারী নিজেকে পুরুষের পায়ে ডালি দেয়, যে নারী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পতির ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘৃণিত বিলাসের দাসী হয়, সেই নারী আজ সেই উপায়ে সঞ্চিত অর্থগুলিকে নিঃশেষে পরকে দান করিয়া দিতেছে!

"চুপ করলে যে, রাগ করেছ?"

"না, রাগ নয় মুরলা, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

অবাক হবার কিছু নেই ললিত, এ স্ত্রীলোকের মন! আজ সে বিলাসিনী হয়ে পুরুষকে আলিঙ্গন করতে পারে, কিন্তু কাল আবার সে সত্যই অনুতপ্ত হয়ে স্বামীর কোলে ফিরে গিয়ে চখের জল ফেলতে পারে। যে অর্থের জন্য আমি

স্নেহকে পণ্যের হাটে ছেড়ে দিয়েছিলুম, আজ সে সব অর্থ আমি ঘৃণায় রাস্তার লোককে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই।"

বিভ্রান্ত হইয়া ললিত বলিয়া উঠিল, "এ সবের কারণ ?"

"কারণ কিছু নেই। এ মানুষের একটা ইচ্ছে,—রুচির পরিবর্ত্তন।

"তোমার উপায় ?"

"নারীর উপায় নারী বেশ ভাবতে পারে,।"

ললিত সহসা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তা হলে কি আমায় এখন বুঝ্‌তে হবে যে, আর আমি এখানে আসি তা তোমার ইচ্ছে নয় ?"

"হাঁ তাই, আমি সব জান্‌তে পেরেছি, সেদিন। তোমার ছোট ভাই এসেছিল, মদের ঘোরে তুমি তাকে তিরস্কার ক'রে তাড়িয়ে দিলে, কিন্তু আমার দয়া হল। আমি তার কাছ থেকে, তোমার সংসারের সব খবর নিলুম, কোথায় একটা অজানা পল্লীর নির্জ্জন ঘরে বসে তোমার স্ত্রী দিনের পর দিন চোখের জল ফেলছে,—কিন্তু হেথায়, মদের ঘোরে তুমি তার কোন খোঁজই নাও না।"

"এ একটা হাসির কথা, মুরলা, যে, সে খবর তুমি নিয়েছ !"

"হাসি নয়, ললিত! এ অতি সত্য! নারী, নারীর ব্যথা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী বোঝে।"

ললিতের মুখ-চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, বলিল, "কিন্তু এতে তোমারই অনিষ্ঠ।"

"অনিষ্ঠ ? না ললিত-এ অনিষ্ঠ নয়, এ অতি সৌভাগ্য! যে আমি জীবনে একবারও পরের উপকার করতে পেরেছি, তবুও ভাবতে পারব যে, আমার হৃদয়ের ধনকে, দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব বলে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি, পতিতার ভাল-বাসা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না ললিত ?"

আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, আসন্ন ঝটিকা ভীত এক একটা বায়স এদিক-ওদিক উড়িয়া যাইতেছিল, ট্রাম গাড়ীর ঘর্ঘরধ্বনি ঘরখানাকে কম্পিত করিয়া যাইতেছিল; মুরলা গবাক্ষের নিকট আসিয়া বাহির আকাশের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বিশ্বাস করতে পারবে না, তুমি।"—

"শোন, মুরলা!"

মুরলা মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "না, না আর আমার কিছু বলবার নেই, তুমি যাও—"

বিদ্যুদ্বেগে ললিত উঠিয়া আপনার জামা কাপড় ঠিক করিয়া লইল, পরে

গায়ের চাদরটা লইয়া সত্যই যেমন বাহিরে যাইবে, মুরলা সহসা আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "আর কি আস্‌বে না তুমি ললিত ?"

"আর ? না মুরলা, আর আমি আস্‌ব না।"

মুরলা এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইল! ভবিষ্যৎ জীবনটা তাহার, শুষ্ক-মরুময় সাহারার মত ধূ-ধূ করিতে থাকিবে। অবিশ্বাসের আত্মগ্লানি, অধঃপতনের তীব্র বেদনা লইয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে। মরীচিকালুব্ধ-পথিকের মত ভালবাসার পানে ছুটিয়া যাইবে, দেখিবে—সব শুষ্ক, নীরস, পাষাণ!

"একটা কথা বলে যাও, ললিত।"

"আমি যে ভালবাসতে শিখি নি মুরলা! কি বলে তোমায় সান্ত্বনা দিয়ে যাব।"

বুক ফাটিয়া একটা নিষ্ঠুর আর্ত্তনাদ বাহির হইতে চাহিল, নারীর সর্ব্বস্ব লইয়া এখন একটা সান্ত্বনা পর্য্যন্ত দিয়া যাইতে পারিল না! কিন্তু অশ্রু আর বাধা মানিতে চাহিতেছিল না। ঝর ঝর করিয়া গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। বুকটা তাহার গুমরিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে যে পতিতা; কর্ত্তব্যের তাড়নায় বিবেকের কশাঘাতে আজ সে তাহার প্রথম ভালবাসার পাত্রকে বিদায় দিতেছে।

মুহূর্ত্তের জন্য ললিত দুর্ব্বল হইল; মুহূর্ত্তের জন্য মুরলাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু আর সে বেদনাক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না, বলিল, "আমি চল্‌লুম তবে, মুরলা।"

মুরলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিল না, সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল।

মুরলা একবার চাহিল, শেষবার একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তার-পর নিবিড় অন্ধকার! মোটর গাড়ীর একটা শব্দ হুঙ্কার করিয়া তাহাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেল। কক্ষান্তর হইতে তাহারই এক সঙ্গিনীর কলকণ্ঠ তীক্ষ্ণ বাণের মত আসিয়া তাহার কর্ণে লাগিল।

৪

বাদল-রাতের আকাশটা নিঝুম হইয়া ছিল; টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরিয়া এক একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছিল। এ সবের দিকে ললিতের ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সে দেখিতেছিল, ওই দূরে তাহার চির পরিচিত গ্রামখানা একটা অন্ধকারের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে

তাহার অতীত সুখের কত স্মৃতিই না বিজড়িত। দীন দরিদ্রের মত কতই না ব্যগ্র আশায় তার পথপানে চাহিয়া আছে। তাহার মধ্যে একটি গৃহের কোণে তাহারই অনাশ্রিতা পত্নী কতদিনের অশ্রু সঞ্চিত রাখিয়া আশায় আকুল নয়নে শূন্য পানে চাহিয়া আছে।

পিচ্ছিল পথটা দক্ষিণে বাঁকিয়া গিয়া শ্মশানে মিশিয়াছে। ললিত বাম দিকে ফিরিল, একটা কুকুর দুই একবার চীৎকার করিয়া নিস্তব্ধ হইল; তৃণ শষ্পের মধ্য দিয়া একটা সর্প হিল-হিল করিয়া চলিয়া গেল; দক্ষিণে বহুদূর হইতে একটা শৃগাল প্রহর-বার্তা ঘোষণা করিতেছিল। হন্ হন্ করিয়া ললিত চলিল।

বাটীর দুয়ারে আসিতেই ললিত চমকিয়া উঠিল, দুয়ারে ওটা কি!

"কে দাঁড়িয়ে?"

অধিকতর চমকিয়া ললিত বলিল, "কে, সুধীর নাকি?"

"হ্যাঁ"

"ওটা ওখানে কি?"

শুষ্ককণ্ঠে সুধীর বলিল, "বৌ-দিদি—"

"সে কি! এত ঠাণ্ডায়?" ললিতের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

"বাইরের ঠাণ্ডা আর তাকে স্পর্শ করবে না দাদা।"

বিমূঢ়ের মত ললিত বলিয়া উঠিল, "কেন, কোথায় যাচ্ছ?"

অস্ফুট গাঢ় কণ্ঠে সুধীর বলিল, "শ্মশানে—"

মাঠের বাঁশী শুনে শুনে আকাশ খুশী হ'ল,
ঘরেতে আজ কে রবে গো' খোল দুয়ার খোল।

—"রক্ত-করবী"

আনাতোল ফ্রাঁস্

—শ্রীকালিদাস নাগ।

আনাতোল ফ্রাঁস্‌এর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-সাহিত্যক্ষেত্রে একটি অফুরন্ত হাসির উৎস থামিয়া গেল। মানুষের মুখ এ যুগে বিদ্বেষে ভ্রুকুটি-কুটিল, নিষ্ঠুরতায় ভয়ঙ্কর! ইহার উপর হাসির পবিত্র হিল্লোল যাঁহারা মধ্যে মধ্যে বহাইয়াছেন তাঁহাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অসীম। হাস্য-রসিক ফ্রাঁস্ আমাদের ভক্তি-অর্ঘ্যের পাত্র।

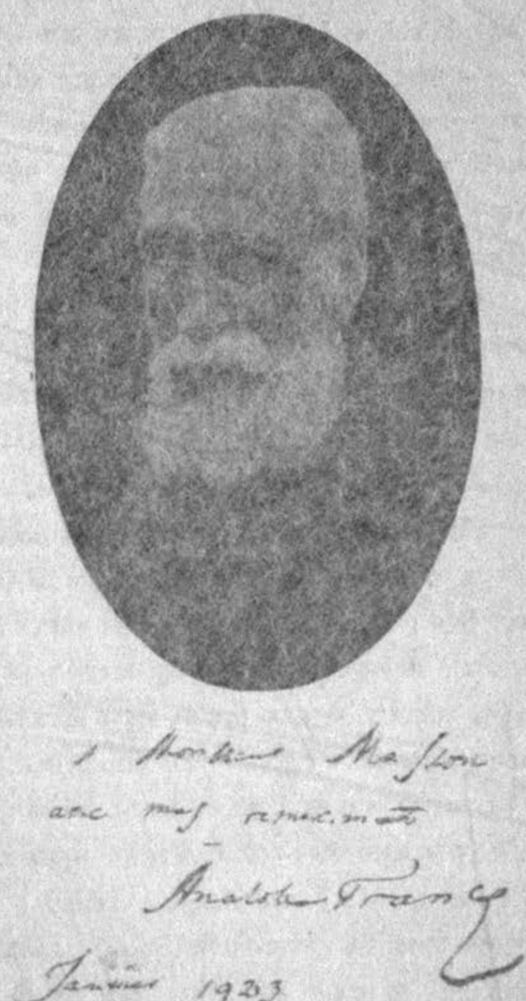
ফরাসী-সাহিত্যগগনে ফ্রাঁস্ যে একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার জীবদ্দশাতেই ফ্রাঁস্ Classic বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। প্যারিসে যখন পৌঁছিয়াছি তখন আনাতোল ফ্রাঁস্, শহরের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে, লোকালয় হইতে বহুদূরে, জনবিরল এক পল্লীতে আশ্রয় লইয়াছেন! চিঠি পত্র আসে, কিন্তু খোলা বারণ! তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ, সেই গ্রামে ছাড়া অন্য কোথাও সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্ত প্যারিস্ মশগুল হইয়া আছে, এই মায়াবীর শিল্প-বাঁশরীর সুরে। Opera Comique-এ তাঁহার Juggler of Notre Dame ও Corinthian Marriage এবং Grand Opera-তে তাঁহার Thais-এর সঙ্গীতানুবাদ মহাসমারোহে শোনা যাইতেছে; Odeon থিয়েটারে তাঁহার Gods are Athirst-এর অভিনয় চলিতেছে এবং ছোট 'ছিব্‌লে' নাট্যাগার বা music hall-এ The Marriage of Anatole France নাম দিয়া বিদ্রূপ-নাট্য, বিদ্রূপ বিশারদ ফ্রাঁস্‌কে ঘিরিয়াই জমিয়া উঠিয়াছে। তরুণের দল (বিশেষ ভাবে তরুণীরা) তন্ময় হইয়া পড়িতেছে তাঁহার The Red Lily, (১৮৭৪) ইতালীয় ছায়া এবং ফ্লরেন্সের আলোর রহস্যে ভরা! প্রৌঢ়েরা তাঁহাদের হারান শৈশবের মাধুর্য্য, কল্পনায় উপভোগ করিতেছে The Book of my Friends (১৮৮৫) পাঠ করিয়া। বৃদ্ধের দল The Crime of Sylvaster Bonnard (১৮৮১) পড়িতে পড়িতে দেশ-কালের চেতনা হারাইয়া ভাবিতেছে —একি অস্ত-রবির শেষ রশ্মিচ্ছটা?—না প্রাতঃ-সূর্য্যের প্রথম অভিবাদন! এক

ওস্তাদ, একই যন্ত্র হইতে কত বিচিত্র রাগ-রাগিনীর আলাপ করিয়া যেন এক বিরাট Orchestra-র সৃষ্টি করিয়াছেন!

অথচ এই মানুষটিকে ধরা-ছোঁয়া যায় না! তাঁহার জীবনী আজও লেখা হয় নাই, এমন কি তাঁহার উপর ভাল সমালোচনার বই-ও মিলে না, আশ্চর্য্য! আনাতোল ফ্রাঁস্-এর উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার মত Dowden বা Boswell তাঁহার সময়ে ছিল না; তবু তিনি নির্ব্বিকার! তাঁহার অনুপম ভাষার ঝঙ্কার, আড়াল হইতে দিয়া যাইতে ছিলেন আর মানুষ সেই সুরের আঘাতে মাতিয়া উঠিতে ছিল! সত্যই কি তিনি মায়াবী? কিন্তু চুপ করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া এক-স্থানে তিনি বসিয়াও ত ছিলেন না; বাহাত্তরের সীমা প্রায় অতিক্রম করিয়া আসিয়াও ব্যাগ হাতে ইংলণ্ডে গিয়া ফ্রাঁস্ তাঁহার ইংরাজ ভক্তদের আপ্যায়িত করিয়া আসিলেন; আটাত্তর বৎসর বয়সে নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়া অক্লেশে Stockholm-এ গিয়া Nobel Academy-তে অভিভাষণ দিয়া আসিলেন; মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বেও প্যারিসের বিরাট Trocadero Hall-এ Renan-র centenary সভায় বক্তৃতা দিলেন। এবং নীতি-বাদীদের দল যখন একজন লেখককে একটা বিপদজনক কেতাব লেখার জন্য অপদস্ত করিতে বদ্ধ পরিকর, তখন ফ্রাঁস্ই প্রথম সেই কণ্ঠরোধকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেন।

এমন মানুষকে দেখিবার লোভ ত হইবেই! কিন্তু হয় কি করিয়া? তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করা গেল—অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্য! নিবিড় রসবোধের সঙ্গে কি গভীর পাণ্ডিত্য! তাহার একটা কারণ মনে হয় এই যে, তাঁহার প্রায় সব বড় লেখাই চল্লিশ বৎসর বয়সের পর লেখা। (লেখকেরা নিরাশ হইবেন না, এখনও সময় আছে)। তাঁহার Garden of the Epicurian (১৮৯৫) পড়িয়া মনে হয় যেন আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল-সূত্রগুলি লইয়া এক প্রাচীন মণীষী খেলা করিতেছেন! Goethe-র গাম্ভীর্য্য যেন Voltaire-এর রুদ্র-হাস্যে রূপান্তরিত হইয়া এক অভিনব শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছে! ইহার এক বৎসর পরেই French Academy (১৮৯৬) ফ্রাঁস্-এর মস্তকে সদস্যের গৌরব মুকুট যে পরাইবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই ছিল না! Penguin Island (১৯০৬) যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন যে, ইউরোপীয় ইতিহাসের এমন গভীর ধারাবাহিক সমালোচনা খুব কমই পাওয়া যায়। শিল্পের সহিত পাণ্ডিত্যের যে স্বত বিরোধ নাই তাহা ফ্রাঁস্-এর লেখায় যেমন স্পষ্ট হইয়াছে এমন কমই দেখা যায়।

অথচ এই পণ্ডিত-শিল্পীর স্কুল-জীবনের শোচনীয় অবস্থার গল্প শুনিয়া হাসি চাপা যায় না। M. Paul Gsell তাঁহার Propos d' Anatole France গ্রন্থে (১৯২৩) ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করা গেল না :—



প্যারিস স্কুলের শেষ পরীক্ষার নাম Baccalauréat, এটি উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার হয়। ফ্রাঁস্ আশৈশব তাঁহার পুস্তক-বিক্রেতা-পিতার দোকানে বই ঘাঁটিয়া এক প্রকার গ্রন্থকীট হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু বই পড়া এবং পরীক্ষা পাশ করা দুইটি এক জাতীয় জিনিষ নয়। বালক Anatole Francois Thibault (আনাতোল ফ্রাঁস্ তাঁহার কলম-ই নাম, Pierre Loti-র মত) পরীক্ষকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, প্রশ্ন চলিতেছে :—"কি হে বন্ধু, (আপ্যায়িত করিয়া শিক্ষকেরা ছাত্রদের বন্ধু বলিয়া থাকেন) তোমার সম্বন্ধে বেশ ভাল রিপোর্ট পেয়েছি, তোমায় বেশ সহজ প্রশ্নই করব—বলত, Seine নদী Manche-এর মধ্যে পড়েছে ত ?"

এমন সহজ প্রশ্ন পেয়ে একগাল হেসে আমি বললাম—হাঁ মহাশয়। শিক্ষক বললেন—"বেশ! আর Loire নদী আটলাণ্টিক-এ পড়েছে ত ?"

আমি বল্‌লাম—আজ্ঞা হাঁ।

শিক্ষক বল্‌লেন—"সাবাস! তুমি খাসা জবাব দিয়েছ! আর Rhone নদীটা Michigan Lake-এর মধ্যে পড়েছে নাকি?"

এ পর্য্যন্ত ভরসা পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমি ভুলেই গেছি যে, প্রশ্নটার মধ্যে পেজোমী কতটা প্রচ্ছন্ন রয়েছে! সুতরাং সস্মিত মুখে বল্‌লাম—হাঁ মহাশয়। অমনি ভ্রুকুটি ও গর্জ্জনের মধ্যে কোথায় মিলাল পরীক্ষকের হাসি! বল্‌লেন—বন্ধুবর; তোমার বিদ্যের দৌড় বোঝা গেছে, তুমি একটি আস্ত গাধা। তোমায় দিলাম—০", শূন্যের মাথায়চন্দ্র বিন্দু!"

উক্ত গল্পটি ফ্রাঁস্ নিজে বলিয়াছিলেন, (দুঃখে কি সুখে, কে জানে?) যখন তাঁহার যশোগৌরবে প্যারিস পরিপূর্ণ এবং রাজ-মন্ত্রী M. Leygues স্বয়ং যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছেন, 'ফ্রাঁস্-এর কোন কাজে তিনি সাহায্য করিতে পারেন কিনা?'—ফ্রাঁস্ তাঁহার নির্ভিক হাসি হাসিয়া বলিলেন—আমায় Baccalauréat পরীক্ষাটা পাশ করিয়ে দিতে পারেন কোন রকমে?—

সত্যকে বিদ্রূপের ভাষায় প্রকাশ করিবার অথবা বিদ্রূপের সাহায্যে উদ্ধার করিবার ব্রত যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের জীবদ্দশায় সম্মান এবং খ্যাতি অল্পই মিলে। ফ্রাঁস্ যে এই কঠিনতম ব্রতের ব্রতী সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারে না। তাঁহার যুগের এমন কিছু সামাজিক বুজ্‌রুকি, রাজনৈতিক ভণ্ডামী বা শিল্প-সাহিত্যের বেয়াড়ামো ছিল না, যাহার প্রতি তিনি তাঁহার বিদ্রূপ-বাণের অমোঘ সন্ধান না করিয়াছেন। Dreyfus Affair (১৮৯০) হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত কত বড় বড় Statesman, Politician ইত্যাদিকে তিনি যে কি ভাবে 'বাঁদর-নাচ' নাচাইয়াছেন তাহার প্রমাণ Mon. Bergeret a Paris (১৯০১) এবং Penguin Island (১৯০৮) ইত্যাদি অনেক পুস্তকেই পাওয়া যায়। সমাজ-বিটেল (Social fraud) ভণ্ডতপস্বীদের (Spiritual humbug) ত কথাই নাই, তাঁহার সমস্ত পুস্তকই তাহাদের অমর করিয়া রাখিয়াছে। এইখানে Revolt of the Angels বইখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে:—

"সয়তান স্বপ্ন দেখিতেছে যেন সে স্বর্গরাজ্য জয় করিয়া লইয়াছে! স্বয়ং ভগবান, দেবদূতগণের সহিত ফেরার! এবং নানা স্থানে লুকাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া নরকে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন; সয়তান ভগবানের সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়াছে।"

বিদ্রূপের মধ্যে তিক্ত ইঙ্গিতের (malice) সাহায্যে এই পর্য্যায় লেখা যায়, কিন্তু ফ্রাঁস্ তাঁহার গল্পের মুখ যে ভাবে ঘুরাইয়া দিয়াছেন, মনে হয় তাহা কেবল তাঁহার দ্বারাই সম্ভব।

"ভগবানের সিংহাসনে বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই সয়তানের মনে ভগবৎ-ভাবের উদ্রেক হইল! মানুষের দুঃখ, শোক, মৃত্যু সব তাঁহারই 'দয়ার লীলা' বলিয়া ধারণা হইতে লাগিল। অপরাধীকে ক্ষমা, দৈববলের (miracle) সাহায্যে পাপ-স্খলন ও মুক্তি ইত্যাদি ভগবত্ত-শক্তি (divine prerogative) সে আত্মসাৎ করিয়া বসিল। নানাপ্রকার হেঁয়ালিভরা আচার-অনুষ্ঠানে খুশী হইতে আরম্ভ করিল। কেহ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিলে চটিয়া উঠিত এবং ক্রমে সমস্ত বিষয়ে নিজেকে অজ্ঞেয় এবং দুর্জ্ঞেয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশ এক বিরাট ধর্ম্মশাস্ত্র তাহার মগজ হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করিল। এবং সে ঠিক তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভগবানের (predecessor) মতই নিজেকে 'একে তিন, তিনে এক' (Trinity) বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিল।

এই সুযোগে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান নরকের আশ্রয়ে বসিয়া বিশ্ব-মানবের উদ্ধারের জন্ত বিদ্রোহের কল্পনা করিতেছেন! সহসা সয়তানের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে সঙ্গীদের ডাকিয়া বলিল—না, স্বর্গে প্রয়োজন নাই। যুদ্ধ হইতে যুদ্ধের জন্ম, এবং জয় হইতেই পরাজয়। ভগবান হারিয়া গিয়া সয়তান হন, এবং সয়তান জয় লাভ করিলেই হয় ভগবান। সর্ব্বনাশ!—"

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ফ্রাঁস্ কেবলমাত্র মানুষকে হাসাইয়া বা হাল্কা-ভাবের আনন্দ (entertainment) দিয়া যশস্বী হন নাই, অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী ভীষণ সংগ্রামে দিনের পর দিন তিনি মানুষের দৃষ্টিকে তাঁহার দিকে টানিয়া লইয়াছেন, তাহাদের শ্রদ্ধা জয় করিয়াছেন।

সাধারণ লেখকের পক্ষে এই সংগ্রামে জয়লাভ করা দূরের কথা, তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও পারে না। ফ্রাঁস্ যে পারিয়াছিলেন তাহার কারণ, ফ্রাঁস্এর-বিদ্রূপের ভিত্তি ছিল গভীর সমবেদনার উপর। যে সমবেদনা, চোখের জল বা হা-হুতাশে আত্মপ্রকাশ করিতে ঘৃণা বোধ করে, শুধু যাহার প্রচ্ছন্ন অগ্নিদাহ জ্বালামুখীর আগ্নেয়-জিহ্বার মত আকাশকে আক্রমণ করিতে থাকে। সে আগুনে যাহারা পুড়িত তাহারা প্রথমে আর্ত্তনাদ করিত বটে কিন্তু ক্রমশ বুঝিত—তাহারা পুড়িয়া পবিত্র হইতেছে এবং যিনি পোড়াইতেছেন, তিনি পূত হোম-শিখা।

কিন্তু তাঁহার প্রতি এই ধারণা মানুষের মনে হয় ত তাঁহার জীবদ্দশায় না

জন্মিতেও পারিত এবং না জন্মানই স্বাভাবিক। শক্রবেশী ফ্রাঁস্ তাঁহার পাঠক-বৃন্দের হৃদয় হরণ করিয়াছিলেন তাঁহার অতুলনীয় লিপি-শিল্পে, যাহা লিপি-চাতুর্য্যের অপেক্ষা বড়। এ ক্ষেত্রে ফ্রাঁস্ ছিলেন একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতি-বাদী পুরুষ, প্রকৃতির মুখের ভাষা, তাঁহার ভাষার আদর্শ।

যে যুগে তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন একদিকে Parnassan কবিরা তাঁহাদের কাব্যে আড়ষ্ট অলঙ্কারের (Rhetoric) ঝঙ্কার দিতে ছিলেন, অন্যদিকে Symbolist-গণ তাঁহাদের 'ধোঁয়াটে' ভাবুকতায় সাহিত্যের আকাশ ঘুলাইয়া দিতেছিলেন! এই দুইএরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া ফ্রাঁস্ তাঁহার প্রকৃতিগত গভীর রসবোধ হইতে বলিলেন—"যে শিল্প-চাতুর্য্য তার চতুরতাকে ঢাকতে পারে না, তা শিল্পই নয়।—ফিরে যেতে হবে প্রকৃতির ভাষায়, প্রকৃতির সরলতায়, সেই হচ্ছে যথার্থ মানব-শিল্পের ভাষা!"

তিনি একবার Symbolistদের (ধূম্রপন্থী) Sublime nonsense-এ বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন :—

"J'ai passé l'âge heureux on l'on admire ce qu'on ne comprend pas. J'aime la lumiere".

"যে বয়সে মানুষ যতই কম বোঝে ততই বেশী ভালবাসে, সে বয়সটা আমি পার হয়ে এসেছি। আমি ভালবাসি—আলো!"

আলোর স্বচ্ছতা আলোকের প্রকাশ ক্ষমতা এবং আলোর সৌন্দর্য্য ছড়াইবার শক্তিই আনতোল ফ্রাঁস্-এর লিপি-শিল্পের (style) প্রাণ। তাঁহার প্রচণ্ড বিদ্রোহী ভাবকে এমন প্রাণ-মুগ্ধকর লিপি-শিল্পের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া ছিলেন বলিয়াই তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সম-সাময়িকদের নিকট হইতে শিল্পীর শ্রেষ্ঠতম গৌরবমুকুট অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এই মানুষকে না দেখিয়া প্যারিস হইতে বিদায় লওয়া যায় না। সুযোগ খুঁজিতেছি। একদিন বিকালে কলেজের কাজের মধ্যে খানিকটা ফাঁক পাওয়ায় বুল্ভার্ সাঁ জ্যার্মাঁ (Boulevard Saint Germain) ধরিয়া চলিয়াছি, চোখে পড়িল এক বিজ্ঞাপন—এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ফরাসী-ভাস্কর Bourdelle-এর খোদিত মূর্ত্তির প্রদর্শনী খুলিয়াছে। ইনি অমর শিল্পী Rodin-র শিষ্য ও তাঁহার মণীষার উত্তরাধিকারী। প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিলাম। শিল্পের স্বর্গ, প্যারিসে শিল্পের সব দ্বার উন্মুক্ত। চারিদিকে তাকাইয়া মূর্ত্তিগুলি দেখিতেছি, দীর্ঘশ্মশ্রু গম্ভীর প্রকৃতির এক বৃদ্ধ আসিয়া আমায় প্রশ্ন করিলেন—"আপনার দেশ

ভারতবর্ষ কি ?" উত্তর দিলাম—আজ্ঞা হাঁ। তিনি বলিলেন—"আমি বুর্দেল। আমি ভারতীয় ও প্রাচ্য-শিল্পের খুব তারিফ করি, সংগ্রহও ক'রে থাকি—"

শিল্পপ্রসঙ্গে আলাপ জমিয়া উঠিল। তাঁহার নিজের কাজ ভাল করিয়া দেখাইলেন। শেষে একটি মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া থামিলেন। বলিলেন—"এটি আমার সেদিন মাত্র শেষ হয়েছে।—Anatole France-এর মূর্ত্তি।"

চাহিয়া দেখি, কোন ফোটগ্রাফও যাহাকে ধরিয়া দেখাইতে পারে না, রূপদক্ষ বুর্দেল্ তাঁহার মর্ম্মর-সাধনায় সেই রূপটিকে স্থায়ী আকার দিয়াছেন, অথচ ইহাকে মূর্ত্তিও বলা চলে না, নিখুৎ প্রতিকৃতিও বলা চলে না! শুধু একখানি মুখ ও মাথার modeling-এর একটু আভাস—আর কিছু না।

কিন্তু সেই মুখে যেন ফ্রাস্এর অশীতি বৎসরের ভাব, চিন্তা, বিদ্রোহ, সংগ্রামের ইতিহাস রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে! উন্নত সুগঠিত নাসা যেন জগতের সমস্ত জিনিষকে সংগ্রামে আহ্বান করিতেছে। গুম্ফ-শ্মশ্রুর আড়াল হইতে বিদ্রূপ-হাস্যের বিদ্যুৎচ্ছটা যেন চমক দিতেছে; অথচ প্রশস্ত ললাটে কি প্রশান্তি! উন্নত দৃষ্টির মধ্যে কি স্নিগ্ধ গভীর উদারতা! যেন দুইটি মানুষের মুখ একত্রে মিলিত হইয়াছে! মুগ্ধ হইয়া ফিরিলাম।

চকিতে একদিন Renan Centenaryর বিরাট অধিবেশনে ঐ মুখ (মর্ম্মরে নয়) জীবন্ত দেখিলাম! সেই প্রথম ও সেই শেষ। সন্ধ্যার আলোছায়ার সঙ্গে মায়াবী ফ্রাঁস্ তাঁহার দৃষ্টি ও তাঁহার কণ্ঠ মিশাইয়া দিলেন—Seine নদীর ওপারে Champ de Mars-এর বাগানের পাশে সূর্য্য অস্ত গেল।

পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিষ আপনি খুসী হয়ে দেয়; কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড় গুলোকে ঐশ্বর্য্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আসে তখন অন্ধকার থেকে একটা কাণা-রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আসে।

"রক্ত-করবী"

ছোট-গল্পের কথা

—শ্রীকুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"কল্লোল" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

বাঙ্গালার মাসিক-পত্রের ছোট গল্প সম্বন্ধে দু'খানি পত্র "কল্লোলে" পড়েছি। এ-সম্বন্ধে অন্যত্রও আলোচনা দেখেছি। আপনাদের পত্রপ্রেরক যাকে ভাল বলেছেন অন্যত্র তার নিন্দা দেখেছি এবং তিনি যাঁর গল্প সম্বন্ধে উল্লেখ করাও যুক্তি-যুক্ত ভাবেন নি, অন্যত্র তার প্রশংসাপূর্ণ উক্তি দেখ্‌তে পেয়েছি। অবশ্য যা' উৎকৃষ্ট, তার প্রশংসা সবাই কর্‌তে বাধ্য, কিন্তু সে-ধরণের লেখা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয় না। প্রতিমাসে সে-ধরণের গল্প সব মাসিকে আশা করাও অত্যন্ত বেশী চাওয়া হবে। সেই জন্যই হয়ত যাহা অক্ষম রচনা নয়, সম্পাদকেরা তার মধ্যে থেকেই বেছে ভালগুলি বের-করেন। এর জন্যে তাঁদের বিচার-শক্তির দোষ দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা বই আর কি? আমাদের অতি উঁচু সুরে বিচার কর্‌তে যাওয়ার সময় তাঁদের অবস্থার কথাও ভাবা উচিত। পাঠকদের গল্পের ক্ষুধা মিটাবার যথা-সাধ্য প্রয়াস, পত্রিকা-পরিচালকদের কর্‌তে হয়। একেবারে 'রাবিশ' মাল চালান নি, তাঁহাদের পত্রিকাকে রচনা শিক্ষার পরীক্ষা-গার ক'রে তোলেন নি এ কলেই সম্পাদক রেহাই পেতে পারেন। মাসিকের সব গল্প স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাবার দাবী কর্‌তে পারে না। পৃথিবীর অন্যত্র যেমন, বাঙ্গালায়ও তেমনি অবস্থা বুঝে সম্পাদকদের চলন্‌ সই গল্পেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হয়। তাঁরা বাজার-চল্‌তি জিনিষই যোগান; লেখকদের রচনা-শক্তি বাড়্‌লে মাসিকেও তার চিহ্ন দেখা যাবে নিশ্চয়।

আসলে দুঃখ কর্‌তে হলে তাহা এই আকারেই প্রকাশ করা উচিত যে, আমাদের লেখকদের হাত হতে উৎকৃষ্ট ছোট গল্প কমই বেরুচ্ছে এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ নানা পত্রিকার ছোট গল্পের আলোচনা চল্‌তে পারে। সম্পাদকদের নিয়ে টানা-হেঁচ্‌ড়া করা অন্যায় ও অশোভন। আমাদের দেশের পত্রিকা-পরিচালকদের অনেকেই নানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সংবাদ পত্র চালান এবং ব্যবসার হিসাবে অপর

দেশের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে এমন কাগজও আমাদের দেশে বিরল! তাই তাঁহারা তাঁহাদের লেখকদের উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে পারেন না। পেটের জন্য অন্যত্র খেটে অবসর সময়ে সাহিত্য-চর্চ্চা যাঁরা করেন, তাঁরা কতই বা দিতে পারেন?

সকল সমস্যার মূলে সেই অর্থনীতির কথা। যদিও প্রতিভা সকল রকম বাঁধ ভেঙ্গে আত্ম-প্রকাশ করতে পারে, তবু শরীরের দাবী মিটাতে অনেক সময় ব্যয় করতে হলে, তাহার মনের প্রকাশ অনেক খানিই ক্ষুণ্ণ হয়েই লোক চক্ষুর গোচরে আসে। জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশা যে মাইকেলের প্রতিভাকে অনেক খানি খর্ব্ব করেছে তা তো আমরা সকলেই জানি। আশা করি আমাদের লেখকদের যাচাই করতে যাঁরা অগ্রসর হবেন, তাঁরা যেন ভেবে দেখেন তাঁদের জীবনের কত-খানি সময় তাঁরা সাহিত্য চর্চ্চায়-ব্যয় করতে পারছেন।

যে অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই
সেটা পাপ হতে পারে কিন্তু অপরাধ নয়।

"রক্ত-করবী"

সংগ্রহ

প্রধান লক্ষ্যের বিষয় এই যে, মারাঠা রাজ্য কালে পত্র ব্যবহারের ভাষা মারাঠী এবং রাজপুরুষদিগের পদবী সংস্কৃত নীতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত। ইহা হইতে শিবাজীর পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে, ভাষার স্বাধীনতা, আচারের স্বাধীনতা, মনের স্বাধীনতা তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। যাবনিক বন্যার প্রবল প্লাবন হইতে স্বজাতিকে তাঁহারা প্রাচীন মহত্ত্বের তীরে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদের রাজত্ব যে একটা খাপ্-ছাড়া ভুঁই-ফোঁড় আকস্মিক উৎপাত এরূপ ভাবনা তাঁহাদের পক্ষে অশান্তিকর—সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাচীন স্বজাতীয় বৃহৎ আদর্শের সহিত আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া একটি ধ্রুব প্রতিষ্ঠার উপর আপন গৌরব স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

*　　　*　　　*　　　*

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, বাংলার সর্ব্বপ্রথম দুইটি সংবাদ-পত্রের সমালোচনা করিয়াছেন।

প্রথম পত্র, বেঙ্গল গেজেট ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, এক বৎসর কাল থাকে। তাহার সম্পাদকের নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। মাসিক মূল্য একটাকা। দ্বিতীয় পত্র, সমাচার-দর্পন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের পাদ্রিগণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাসিক মূল্য এক টাকা। তৃতীয় পত্র, রাজা রামমোহন রায়ের সংবাদ-কৌমুদী, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সাধারণের ধারণা প্রথম সংবাদ পত্র মিশনারীরা বাহির করে, বিদ্যানিধি মহাশয় সেই ভ্রম দূর করিয়াছেন। এখনকার সংবাদপত্র-প্রকাশকগণ সেই সত্যযুগের কথা স্মরণ করিবেন; তখন সংবাদ-পত্রের মূল্য ছিল বারোটাকা, গ্রাহকদিগকে উপহার দিয়া ভুলাইতে হইত না।

*　　　*　　　*　　　*

সকল দেশেই প্রাদেশিক প্রয়োগের বৈচিত্র্য আছে, তথাপি এক একটি

বিশেষ প্রদেশ, ভাষা সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। ইংরাজী ভাষা লাটিন নিয়মে আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করে না। যদি করিত, তবে এ ভাষা এত প্রবল এত বিচিত্র এত মহৎ হইত না। ভাষা সোনা রূপার মত জড়-পদার্থ নহে যে তাহাকে ছাঁচে ঢালিব—তাহা সজীব। তাহা নিজের অনির্ব্বচনীয় জীবনীশক্তির নিয়মে গ্রহণ ও বর্জ্জন করিয়া থাকে।

সমাজে শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচারকে প্রাধান্য দেয়। * * * লোককে না মারিয়া ফেলিলে লোকাচারের নিত্য পরিবর্ত্তন-বৈচিত্র্য কেহ দূর করিতে পারে না। কৃত্রিম গাছের সব শাখাই এক মাপের করা যায়, সজীব গাছের করা যায় না। ভাষারও লোকাচার শাস্ত্রের অপেক্ষা বড়। সেই জন্যই আমরা "ক্ষান্ত" দেওয়া বলিতে লজ্জা পাই না। সেই জন্যই ব্যাকরণ যেখানে "আবশ্যকতা" ব্যবহার করিতে বলে, আমরা সেখানে "আবশ্যক" ব্যবহার করি।

সত্যের সিংহদ্বার খুলুক আমাদের
অন্তর-দেবতার সুবর্ণ-মন্দিরে।

"প্রশস্তি"

গল্প-সাহিত্যে দুঃসাহস

"অনুবাদিত" কথাটা বাংলায় চলিয়া গিয়াছে। আজকাল পণ্ডিতেরা আবার "অনূদিত" লিখিতে সুরু করিয়াছেন।

এই অনুবাদিত কথাটার আশ্রয় লইয়া এতকাল যে-সকল বিদেশী-রচনা বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী লেখকের নামের টীকা পরিয়া প্রকাশিত হইত, আজকাল আবার অনেক পণ্ডিত-লেখক সেই সকল বিদেশী রচনারই "অবলম্বনে" অনেক গল্প ও নাটকাদি বাংলা ভাষায় নিজের নামের চাপ্‌রাশ দিয়া বাংলা-সাহিত্যে আমদানী করিতেছেন।

অনুবাদ জিনিষটাকে বাংলা দেশের লোক বড় পছন্দ করিত না। ভাল ভাল কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশিত হইতেই লোকে অনুবাদের প্রতিও ক্রমে আকৃষ্ট হয়। ভাল জিনিষকে ভাল করিয়া বাংলা ভাষায় আমদানী করিতে পারিলে যে বাংলা দেশের লোক নির্ব্বোধের মত তাহা বর্জ্জন করিবে, সে ভুল ধারণা করিবার মত কিছু আর থাকিল না।

এক রকম অনুবাদ আছে তাহা, অবোধ লোকের পক্ষে অবোধ্য এবং জ্ঞানী লোকের পক্ষে অনাবশ্যক। সে-গুলিকে যদি পাঠকেরা না পড়ে বা পড়িয়া সে গুলিকে অপছন্দ করে, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে দোষ দিলে ভাল হয় না।

এই অনুবাদ যাঁহারা করিতেছিলেন তাঁহাদের দেখিয়া কয়েকজন আবার "অবলম্বনে" ছাপ্‌ দিয়া বিদেশী গল্পগুলি নিজের ভাবে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। সেগুলি কালের সুবিচারে যথাস্থানে স্থান পাইবে এরূপ আশা করা যায়।

অনুবাদ বা অবলম্বনে বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের লেখা সম্বন্ধে বলা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কারণ তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, রচনাগুলি বিদেশী ভাষা হইতে অনুবাদিত বা সে-গুলিকে অবলম্বন করিয়া লেখা হইয়াছে। ভাষা ভাব বা লেখার ধরণের ত্রুটি ভিন্ন তাহাদিগকে কেহ আর অন্য কিছু দোষ দিতে পারিবেন না।

কিন্তু বাংলা দেশে কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তি বিদেশী গল্প উপন্যাস নিজের মনের মত করিয়া লিখিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। চৌর্য্য-অপরাধে তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিবার প্রয়োজন না হইলেও তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই নির্লজ্জ বলা যাইতে পারে। বিদেশী গল্প, নিজের নামে চালাইয়া নাম কেনা একমাত্র বাংলাদেশ বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে মনে হয়। বাঙ্গালীর সুবাদ আছে, তাহারা বড় শান্তিপ্রিয়। হয়ত সেই কারণেই এই নামজাদা সাহিত্যিকেরা পরের জিনিষ চুরি করিয়াও অঙ্গের ভূষণ করিয়া সাধারণে নির্ব্বিবাদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক-একজনের যদি দশখানি করিয়া উপন্যাস বা গল্প-পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে তাহার মধ্যে পাঁচখানা অন্ততঃ হুবহু চুরি বলিয়া ধরা পড়ে, আর কয়খানির ভাব, ঘটনা-সমাবেশ এবং পরিচ্ছেদকে পরিচ্ছেদ চুরি বলিয়া ধরিয়া দেওয়া যায়।

অনেকে জানিয়া শুনিয়াও এ সকলের প্রতিবাদ করেন নাই, অনেকে বা না জানিয়াই লেখকদের বাহবা দিয়াছেন।

যাহা হউক সুখের বিষয় ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়া আজকাল অধিকতর লোভনীয় ও লাভনীয় ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা সাহিত্যকে ব্যবসা হিসাবে ধরিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যবসাতে লাভ করিয়াছেন ইহাও সত্য এবং সে ব্যবসা ছাড়িয়া প্রতিযোগিতার বাজারে অন্য ক্ষেত্রে চলিয়া যাওয়া খুব স্বাভাবিক। অন্য কয়েকজনের মধ্যে কেহ কেহ মৃত, কেহ কেহ অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন—একবারে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে আর তাঁহাদের কোনও সাড়া শব্দ নাই।

যাঁহারা এভাবে সাহিত্যিক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দেখিয়া আজকাল অল্প-বয়স্ক নবীন লেখকের কয়েকজন এই দুঃসাহিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। দুঃখ তাঁহাদের জন্য। তাঁহাদের প্রতিভা আছে, ভাষার সঙ্গতি আছে, ভাব আছে, কিন্তু ধৈর্য্য নাই। ইংরাজী ম্যাগেজিন ঘাঁটিয়া, রুশিয়ার বা ফরাসী উপন্যাস ও গল্পের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া, তাহা হইতে ঘটনা ও বিষয় লইয়া নিজের ভাষায় নিজের রচনা বলিয়া চালাইয়াছেন, চালাইতেছেন। ইঁহাদের অনেকের গল্প পড়িতে খুব ভাল লাগে, গল্পের যে সকল সম্পদ থাকা উচিত তাহাও তাঁহাদের এই-নকল রচনাগুলিতে বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠে। পরের জিনিষকে নিজের বলিয়া চালাইবার মত যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের ক্ষমতা বড় সামান্য নয়।

এই ক্ষমতার অপব্যবহারও সহ্য হয় কিন্তু তজ্জনিত অপরাধ সহ্য হয় না,—এই দুর্নীতি অমার্জ্জনীয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা, যাঁহারা এই পথ দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের সময়ে বাংলা সাহিত্যের সময় ভিন্ন ছিল, অবস্থা ভিন্ন ছিল। মাঝখানে তখন বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। কাজেই তাঁহারা যে আকারে যাহা দিয়াছেন, বাঙ্গালী পাঠক তাহাই নিঃসন্দেহে আপন জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। আজকাল বাংলা ভাষার দিকে আবার যেন সকলেরই নজর পড়িয়াছে। সাধারণের অনেকেই ইংরাজী, ফরাসী, সুইস্, রুশিয়ান্ বা ভিন্ন দেশীয় পুস্তকাদি পাঠ করেন, বাংলা বা সংস্কৃত পুস্তকাদিও সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করেন। এই সময়ে যাঁহারা বাংলা রচনা দিয়া পাঠক সমাজের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের এই সেবার ভিতর অন্ততঃ পবিত্রতা থাকা উচিত।

যে বিশ্বাসে আমরা রচনাগুলিকে পাঠ করি, তাহার রস গ্রহণ করি, সে বিশ্বাসকে এরূপ ভাবে অপমান করা বাঙ্গালী নবীন লেখকদের কাহারও উচিত নহে।

ভদ্রতার খাতিরে কাহাকেও মুখের উপর কিছু বলা চলে না, কিন্তু লেখা পাঠ করিয়া রচয়িতার সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহা অত্যন্ত বেদনাজনক। নবীন লেখকেরা যদি আপনা হইতে এ পথ ত্যাগ না করেন তাহা হইলে, মনে মনে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছু করা চলে না।

মোকদ্দমা-বাজ লোক হইলে হয়ত কেহ বই ধরিয়া, পৃষ্ঠা দেখাইয়া, লাইন বাছিয়া বাছিয়া অনেকের লেখা বিদেশী গল্প বা উপন্যাসের সঙ্গে মিল দেখাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু তাহা করে কে? এমন অবসর কাহারও নাই। আর যাহারা লজ্জাহীন, তাহাদিগকে ধরাইয়া দিলেও, তাহারা যে-এরূপ লোভনীয় কাজ হইতে নিরস্ত হইবে তাহারও কোনও দৃষ্টান্ত নাই। তবুও তাঁহাদের প্রতিভার নামে, এই নবীন লেখকের কাছে অনুরোধ, তাঁহারা এই নকল করিয়া নাকাল না হইয়া, মৌলিক রচনা দ্বারা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন।

বাংলার যাহা নিজস্ব, যাহা বাংলার বর্ত্তমান অবস্থাকে আপন মহত্ত্বের দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারে, যাহা বাংলার ভবিষ্যৎকে বাংলার উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে, এরূপ গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও রচনা প্রভৃতি দ্বারা বাংলার মনকে পরিচালিত করুন।

সাধারণের মনের গতি যুগে যুগে কবি ও শিল্পীরাই চালনা করিয়াছেন, সেই

দায়িত্ব স্মরণ করিয়া বাংলার সত্য-বাদী তরুণ সাহিত্যিকদল আপন প্রতিভার খুদ্ কুঁড়া লইয়া আসিলেও আমরা তাহা পরম আহ্লাদে মাথায় করিয়া লইব।

প্রত্যেক মানুষের প্রতিভা বা চিন্তার ধারা ভিন্ন-পন্থী! যশ ও প্রতিভার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, তাহা শক্তি ও ক্ষমতার অনুযায়ীই বাড়ে কমে। সকলেই কিছু শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না—শ্রেষ্ঠ বলিতে একজনকেই বুঝায়। শ্রেষ্ঠত্বের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা এবং সেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার জন্য নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা করা খুব কল্যাণজনক, কিন্তু পরের অয়-মুকুটের হীরা-পান্না চুরি করিয়া নিজের সোনার টোপরে লাগাইয়া সাহিত্যিকের মিছিলে অগ্রণী হইবার চেষ্টা করা অমঙ্গলজনক।—নিজেরও, দেশেরও।

তোমায় ভাল বাসিনেক, আমায় ভালবাসি।
বুকের পাষাণ ঘাড়ের বোঝা,
তোমার উপর চাপিয়ে সোজা,
পথ চলিতে চাহি ব'লে তোমার কাছে আসি।

—আমার ভালবাসি।

দানব

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মেঘ-লোকের দেবতা এলেন, মর্ত্ত্য-লোকের মানবীর কাছে।

মাথায় তার ইন্দ্র-ধনুর ছটা, গায়ে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এক পোষাক।

কি চাও তুমি দেবতা?—

কিছু না মানবী।

তবে এলে কেন?

কল্পনা-স্বপ্নের ফাঁকি আর ভালো লাগে না যে!

তবে কি চাই?

জানি না!

পৃথিবীর মাটিতে পা দাও দেখি।

ভয় করে!

কোথায় আস্‌বে তবে?

ঐ তোমার স্নেহের কোলে, যেখানে মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত আশ্রয় পায়।

মানবীর মুখ প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌লো।

আয়, আয়!

মানবীর আশীর্ব্বাদে দেবতা পৃথিবীর মাটির ওপর শিশু-স্বর্গ তৈরী কর্‌লে।

মাটির রস আকণ্ঠ পান ক'রে দেবতা দানব হ'য়ে উঠ্‌লো। তার পায়ের নীচে মাটি কেঁপে উঠ্‌লো। ভয়ে ভাবনায় মানবীর বুকটা দুল্‌তে লাগ্‌লো।

কি চায় ঐ দানবটা!

ও সব চায়।

রূপ চায়, যৌবন চায়, সম্ভোগ চায়!

আকাশ-পাতাল মাতিয়ে তুল্‌লে দানব তার চাওয়ার তূর্য্য-ধ্বনিতে।

তখন ঘূর্ণাবর্ত্তে মথিত হয়ে সমুদ্র সুধা-বিষে মিশিয়ে তৈরি কর্‌লে—এক নারী মূর্ত্তি, তার ডান হাতে সুধা-পাত্র, বিষ-ভাণ্ড বাম হাতে শোভে!

সম্ভোগের জোয়ার-ভাঁটা খেলতে লাগলো পৃথিবীর বুকের উপর।

দাও, দাও, আরো দাও!

ক্ষুধা মেটে না।

সূর্য্য শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পশ্চিমে চলে পড়লেন। পৃথিবী বল্লে, ওগো, আর যে পারি নে!—

চাঁদ এসে বল্লে, তোমরা ঘুমোয়—আমি আছি!

দানব বল্লে, কে তুমি?

দেখ না চেয়ে।

চিনি বোধ হয় তোমাকে!

সাদা সূক্ষ্ম মেঘের ওপর চাঁদের আলোয় ইন্দ্র-ধনুর ছটা ফুটে উঠলো!

দানব দুহাত তুলে বল্লে, দাও, দাও, ঐ ধনুক দাও! তীর ধনুক দিয়ে দানব পৃথিবীতে মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে এলো।

মৃত্যু এতদিন অন্ধকার পর্ব্বতের গুহায় নিদ্রিত ছিল। সে এসে নিজের থলির মধ্যে শীকার ভরতে লাগলো। দেখতে দেখতে তার হাত দুটো প্রকাণ্ড হয়ে দানবের ঝুঁটি চেপে ধরলে।

দানব চীৎকার ক'রে বল্লে, মা—মা! কোথায় তুমি?

ছেলের ডাকে অতীতের কবর থেকে মানবী তার বিশাল কোল পেতে দিয়ে বল্লে, আয়, আয়!

কোলের উপর দানব চির-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লো।

মানুষ যে মানুষের সব চেয়ে আপন অথচ সেই তার কাছে নিবিড় রহস্যজালে ঢাকা। মানুষের মন জানবার জন্যে আমাদের সমস্ত মন কাঁদছে, অত কাছে থেকে সে যে অতদূরে, এ বিরহ-বেদনা মানুষ সইতে পারে না।

—আঁধারের যাত্রী

ভাটীর মাঝ্যা

—জসীম উদ্দীন।

আমার, গহীন গাঙের নায়্যা ;
অকূর বেলায় নাও বায়্যা যাও,—
কার পানে বা চায়্যা ?

পরাণডী মোর কাইন্দ্যা বাড়ায়
ভাটীর দ্যাশের কাজল মায়ায় ;
আব্ছা ঘ্যাষে হাতসানি দ্যায়,
কে যেনো মোর সয়্যা !

এইন্না গাঙের বাঁকের ল'গে
আমার বঁধুর বাস ?
কলা বনের বাউরী-বাতাস
দোলায় তাহার ক্যাশ।

কইও খবর তাহার লাইগ্যা
কাইন্দ্যা মরে এক অভাইগ্যা ;
ব্যথার দেয়া থাইক্যা থাইক্যা,
ও তার ঝরে নয়ন বায়্যা।

৮৭৭

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা

—শ্রীরামপরায়ণ রায়।

আজ মাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন! দেশ-দেশান্তর থেকে দলে দলে লোক উৎসব দেখতে এসেছে। যার যা সাধ্য সে তাই মায়ের চরণে উপহার দিচ্ছে। যার যা শিক্ষা, সে তাই মায়ের সামনে দেখিয়ে নিজেকে ধন্য এবং কৃতার্থ মনে করছে। এতদিন দেশে মাতৃ-মন্দির ছিল না, আজ তারা নিজেরা তা প্রতিষ্ঠা করেছে, তাই এত আনন্দ।

প্রথমে কবি তাঁর বাঁশী নিয়ে এলেন। বাঁশীটি মায়ের পায়ের কাছে রেখে, মাকে প্রণাম ক'রে বাঁশীটি তুলে নিলেন। তার পর তাঁর সারাজীবনের করুণ গানগুলি বাঁশীর মুখে আকুল মূর্চ্ছনাতে গাইতে লাগ্‌লেন, সহস্র সহস্র লোকের সাম্‌নে। কোলাহলকারী জনতা আপনি থেমে গিয়ে, নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে তাঁর বাঁশীর স্বর শুন্‌তে লাগ্‌ল। সকল আকাশ, বাতাস তাঁর সেই বাঁশীর সুরে স্তব্ধ হয়ে রইল। কত লোকের মর্ম্মের নিভৃত কন্দরে যে সেই করুণ রাগিনীটি পৌঁছেছিল, তা কেবল বোঝা যাচ্ছিল তাদের সজল আঁখি আর বেদন-ভরা মুখের ছবি দেখে। কবি আপন মনে বাঁশীতেই বিভোর হয়ে পড়্‌লেন, মাকে ভাববার সময় আর তখন তাঁর রইল না। সকলে ধন্য ধন্য কর্‌তে লাগ্‌লো। কবি আপনার বাঁশীটিকেই প্রণাম ক'রে সমবেত জনমণ্ডলীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

তার পর বৈজ্ঞানিক এসে তাঁর নিজের বহু আবিষ্কার এবং বিজ্ঞান জগতের নানারকম আশ্চর্য্য ও কৌতূহলপ্রদ তথ্য মায়ের সাম্‌নে উপস্থিত জনমণ্ডলীর কাছে প্রকাশ কর্‌লেন। লোকে তাঁর সেই অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে চমৎকৃত হয়ে গেল, আর সাদরে তাঁকে সম্মানের অর্ঘ্য দান কর্‌লে!

তার পর এলেন সৈনিক। তিনি তাঁর অসি আর তীর-ধনুক নিয়ে অনেক রকম খেলা দেখালেন। লোকে তাঁর শিক্ষা দেখে চমৎকৃত হয়ে তাঁকে ধন্য

ধন্য করুতে লাগ্‌লো। সৈনিক তাঁর অসি ধনুক নিয়ে বিদায় হলেন—অযুত লোকের প্রশংসাবাদের মাঝে।

সকলেই নিজের নিজের জ্ঞান নিয়ে মাকে পূজা করুতে এসেছিল, কিন্তু শেষে নিজেকেই পূজা ক'রে চলে গেল! মায়ের পায়ে ভক্তের ভক্তি-অর্ঘ্য পড়্‌ল না। পাষাণ-প্রতিমা ধীর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার আর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হলো না।

ধীরে ধীরে বেলা শেষ হয়ে এল। সোনার থালা নিয়ে এসে নিশা লজ্জাবনতা সন্ধ্যাকে বরণ ক'রে নিলে; তার সোনালী আলোর আভা গিয়ে পড়্‌লো ধানের শীষে, গাছের পাতায় আর নদীর জলে!

মেলা ভেঙ্গে গেল। উৎসবকারীরা যে যার ঘরে ফিরে গেল। পড়ে রইল কেবল জনহীন প্রান্তর মাঝে প্রাণহীন মায়ের প্রতিমা। এমন সময় লাঠিতে ভর ক'রে এল এক বৃদ্ধ, হাতে শুধু তার একটি রাঙা জবা ফুল। সে এসে আস্তে আস্তে দরজাটি খুলে মায়ের পায়ের কাছে বসে মায়ের পূজা করুতে লাগ্‌ল। পূজা শেষ হবার পর, সে সেই একটি জবা ফুল মায়ের পায়ে ছুড়ে দিয়ে ভক্তিনত হয়ে প্রণাম করুলো!

বাইরে জগৎ তখন পথশ্রান্তপথিকের মত আঁধারের সীমানা ছাড়িয়ে উষালোকের কিনারায় এসে পড়েছে!

সারা জীবন এ কোন্ অলক্ষ্য লক্ষ্মীর আরাধনা,
জগৎ ভরিয়া দিয়া যাও ছবি-রক্তের আলিপনা?

—ঘুমের ঘোরে



সহ-যাত্রী

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেটা মে-মাসের প্রায় শেষাশেষি। কলিকাতায় ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। তাই ট্রেনে করিয়া চলিয়াছিলাম সিমলা পাহাড়ে। পথে এক ক্ষুদ্র উপন্যাসের আয়োজন! সারাদিন যুক্তপ্রদেশের অসহ্য উত্তাপে শরীরের এবং মনের অবস্থা সপ্তম মাত্রায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফ্যান-এর হাওয়া তখন অগ্নিবৃষ্টির নামান্তর মাত্র! অগত্যা দরজা জানালা বন্ধ করিয়া অন্ধকারে বৃথা নিদ্রার চেষ্টা করিতে-ছিলাম।

গাড়ী যখন কানপুর ষ্টেশনে পৌছিল তখন বেলা চারিটা। ষ্টেশনে নামিয়া দেখিলাম, লোক-সমাগম খুবই কম—সম্ভবতঃ রৌদ্রের প্রকোপে। সহ-যাত্রীদিগের অবস্থা দেখিবার জন্য একটু পায়চারি করিতে লাগিলাম। দেখিলাম উচ্চশ্রেণীর প্রায় অধিকাংশ কামরাই রুদ্ধ। সকলেরই অবস্থা সমান। শরীর পুড়িয়া লাল হইয়াছে এবং লেমনেড-বরফের সদ্ব্যবহার চলিতেছে। সারা গাড়ীতে বড়-একটা বাঙ্গালীর মুখ দেখিতে পাইলাম না। শুধু একটি সেকেণ্ড-ক্লাস কম্পার্টমেন্ট-এ দেখিলাম, একটি বাঙ্গালীর মেয়ে বসিয়া আছে, ষ্টেশনের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া। তাহার নির্লজ্জ ভাব দেখিয়া, সেদিক হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়া, নিজের কামরায় শুইয়া পড়িলাম।

গাড়ীতে আসিয়াই কিন্তু, মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। মনে হইতে লাগিল—তাহার দৃষ্টিটা যেন ঠিক নির্লজ্জ নয়—তাহাতে কি যেন একটা কাতরতা মাখান আছে। মনে মনে মেয়েটির মুখখানি খুব সুন্দর বোধ হইল। সরল লাবণ্যে ভরা। গাড়ী বেশীদূর যাইতে না যাইতে সেই না আমার ভারী

ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল—তাহার ব্যগ্র দৃষ্টি যেন উৎসুক হইয়া কি বলিতেছে! যেন কিসের অভাবে পড়িয়াছে। পরের ষ্টেশন অবধি সারা রাস্তা কিছুতেই সুস্থ থাকিতে পারিলাম না। সেই উজ্জ্বল চোখ দুটি কেবলই মনের কোণে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘণ্টা খানেক পরে গাড়ী থামিতেই, নামিয়া সেই দিকে গেলাম। দেখিলাম মেয়েটি তখনও সেখানে সেই ভাবে বসিয়া আছে! কিন্তু মুখের ভাবে আশঙ্কা ও উদ্বেগের ছায়া স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা হইল কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করি—কিন্তু সঙ্কোচে বাধিল। মনকে লুকাইয়া বাঙ্গালীর ব্রহ্মাস্ত্র 'মা' সম্বোধন করিতে আমার ইংরাজী-পড়া সংস্কার কিছুতেই চাহিল না। অথচ এই অপরিচিতা যুবতীর সঙ্গে পরিচিত হইবারও কোন উপায় তখন খুঁজিয়া পাইলাম না। গাড়ী ছাড়িতে বেশী দেরী ছিল না। নিজের কাম্‌রায় ফিরিয়া আসিলাম।

গাড়ী যখন এটোয়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। গরমের ঝাঁঝ্‌টা সামান্য কমিয়াছে। এইখানে বেশীক্ষণ গাড়ী থামিবে জানিয়া, অবিলম্বে সেই কম্পার্টমেন্ট-এর দিকে যাত্রা করিলাম। কোনও কারণ না থাকিলেও সেই গাড়ীর সামনে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইবার দরকার পড়িল। সৌভাগ্য ক্রমে হুইলার-এর বইএর দোকান ছিল সেই গাড়ীটারই কাছাকাছি। সেখানে গিয়া একখানা অনেকবার-পড়া বইএর দিকে মনঃসংযোগ করিলাম। কিন্তু চোখদুটা প্রায়ই বিশিষ্ট জানালার দিকে ছুটিতেছিল! এবং সেখানেও মনে হইল, অপরিচিতার দৃষ্টি যেন আমাকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছে! এইবার আর একটি নূতন জিনিষ সেখানে দেখিলাম। সেই অপরিচিতার পাশে একটি সুন্দর ফুট্‌ফুটে শিশু জান্‌লা ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে এবং আধ অস্ফুট ভাষায় কাহাকে সম্বোধন করিতেছে। ছোট শিশুদিগের প্রতি আমার স্বভাবতই একটু পক্ষ-পাতীত্ব ছিল। তাহাকে দেখিবার ছলে, আমি সহ-যাত্রিনীকে ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাইলাম। দেখিলাম, সুন্দরীর গাড়ীতে আর কেহই নাই। মহিলাদিগের স্বতন্ত্র গাড়ী নয়, অথচ মেয়েটির সঙ্গে আর কোন আত্মীয় বা অভিভাবক নাই! দেখিয়া একটু বিচিত্র বোধ হইল। হঠাৎ শুনিলাম ছেলেটি 'কাকা' 'কাকা' বলিয়া কাহাকে ডাকিতেছে। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম; ষ্টেশনে একজন বাঙালী ভদ্রলোক বেড়াইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সেই সুন্দর শিশুটির কাকা বলিয়া বোধ হইল না। অন্ততঃ সেরূপ ভাবিতে ইচ্ছা হইল না। নিষ্ফল পাগ্‌লামি করিয়া কতক্ষণ কাটাইব ভাবিতেছি—এমন সময়ে ট্রেণ ছাড়িবার

ঘণ্টা পড়িল। কাজেই নিজের গাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। যাইবার সময় ইচ্ছা করিয়াই সেই জানালার কাছ-ঘেঁসিয়া চলিলাম—ভাল করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইব।

অপরিচিতার জানালা পার হইয়াছি, এমন সময় পিছন হইতে একটি মৃদু অনুচ্চস্বর যেন ডাকিল—'একটা কথা শুনবেন ?' পিছন ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলাম অপরিচিতা আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে! চোখদুটি নিবেদন ইচ্ছুক। ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে—গাড়ী প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় এই মধুর বিচিত্র আহ্বান! এক মুহূর্ত্ত আগে পর্য্যন্ত আমি ছটফট্ করিতেছিলাম তাহার সংবাদের জন্য কিন্তু এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে যখন সেখান হইতেই আহ্বান আসিল—আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। সংস্কারগত অপটুতায় অপ্রস্তুত হইয়া আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। আমার ভাব-বৈচিত্র্য দেখিয়াই বোধ হয় যুবতী মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল—'একবার এদিকে আসবেন ?' আমার চমক ভাঙ্গিতেই লজ্জাকর ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্য, ব্যস্তভাবে প্রায় একরূপ ছুটিয়া গিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম—আমায় কি ডাক্‌ছেন ?

মেয়েটি সম্পূর্ণ সপ্রতিভভাবে বলিল—'হ্যাঁ, আমিই ডাক্‌ছিলাম। আমি একটু বিশেষ বিপদে পড়েছি। তাই কোনও উপায় না দেখে, খোকাকে দিয়ে আপনাকে ডাক্‌ছিলুম—আপনি বোধ হয় শুনতে পান্ নি ?'

মনে মনে ভাবিলাম, শুনিতে পাইয়াছি কি না বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু মুখে বলিলাম—'এখনি গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছে। আমি পরের ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌বা-মাত্র এখানে আস্‌ব'খন—এখন ত দাঁড়িয়ে কথা কইবার অবসর নেই।

মেয়েটি একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া পরক্ষণেই বলিল—'কিন্তু আমার যে এখুনি দরকার'।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মেয়েটি আকুল স্বরে বলিল—'আপনি বরঞ্চ আমার এই গাড়ীতেই উঠে পড়ুন—পরের ষ্টেশনে নেমে যাবেন 'খন। ইতিমধ্যে আমার যা বল্‌বার, বলা হয়ে যাবে। যত দেরী হয়ে যাচ্ছে আমার তত ভয় করছে।'

বিশেষ বিচার করিবার সময় পাইলাম না। অপরিচিত স্থানে, অপরিচিতার এরূপ অস্বাভাবিক আহ্বান, নূতনত্বের মোহে বেশী আকর্ষণ করিল। মেয়েটি বোধ হয় ব্রাহ্ম, এই ঠিক করিয়া সাত-পাঁচ বিচার করিবার পূর্ব্বেই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। মেয়েটি সরল স্বরে বলিতে লাগিল—

'আপনার নিশ্চয় ভারি আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্ছে—এবং বিশেষ অসুবিধেতে পড়তে হ'ল বোধ হয়?'

যদিও দুটো কথাই সত্য, তবুও মুখে বলিতে হইল—না, না, ইত্যাদি। মেয়েটি বলিল—'কি কর্‌ব বলুন? এমনি বিশ্রী দেশ, এলাহাবাদ থেকে এখনও পর্য্যন্ত একজন ভদ্র বাঙ্গালীকে দেখতে পেলুম না! আর তা ছাড়াও মিছিমিছি গোলমাল কর্‌লে, মিথ্যে বিপদ বাড়ান ছাড়া আর কিছুই হয় না। আপনাকে কানপুরের ষ্টেশন থেকে সবকটা ষ্টেশনেই দেখ্‌লাম—কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছিল না। এত বড় গাড়ীতে একটা বাঙ্গালী নেই!'

মনে হইল বলি—আপনি কি দেখেছেন নাকি? কিন্তু মুখে বলিলাম—বলুন আপনার কি দরকার?

আমার জড় উগ্র-দৃষ্টির সম্মুখে মেয়েটির মুখ ক্ষনিকের তরে রক্তে রক্তে ভরিয়া গেল। তারপর ধীরভাবে লজ্জা-রঞ্জিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—'আমার স্বামী, এলাহাবাদ-ষ্টেশনে টিফিন খাবার জন্যে নেমে গিছ্‌লেন—কিন্তু কেন বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, গাড়ী ছাড়্‌বার সময়ও তিনি উঠ্‌তে পারেন নি। আমি সেই থেকে এই গাড়ীতেই বরাবর চলে আস্‌ছি। অথচ তাঁর কাছে টিকিট টাকা সবই রয়েছে। আমি কি কর্‌ব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না! এই রকম ভাবেই বা কতদূর যেতে পার্‌ব তাও জানি না। প্রত্যেক ষ্টেশনেই মনে হচ্ছে—বুঝি বা আমাকে ধরে নামিয়ে দেবে। তখন কি যে কর্‌ব কিছুই জানি না। যত এগুচ্ছি, ততই আমার অবস্থা কম নিরাপদ মনে হচ্ছে!'

মনে ভাবিলাম লোকটা কি Idiot ও দায়িত্বজ্ঞানহীন! এতগুলো ষ্টেশন গেল, একটা টেলিগ্রাম করিবার ব্যবস্থাও মাথায় আসে নাই? বলিলাম—আপনার কিছু ভয় নেই। একটুও ভাব্‌বেন না—আমি এখুনি সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আর একটু আগে আমাকে জানালেই, আপনাকে এত দুশ্চিন্তা ভোগ কর্‌তে হত না।

সে-কথার উত্তর না দিয়া সে বলিল—'একটা টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা করা যায় না?' আমি বলিলাম—হাঁ সেই বন্দোবস্তই আমি করে দিচ্ছি। পরের ষ্টেশনেই আমি এটোয়াতে টেলিগ্রাম ক'রে দোব। তিনি নিশ্চয় পরের ট্রেনে আস্‌ছেন। এক্সপ্রেস্ সেখানে এলেই তিনি টেলিগ্রাম পাবেন। আপনিও তাঁর জন্যে যে কোনও ষ্টেশনে অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন, এবং তিনিও পরে আপনাকে টেলিগ্রাম করতে পার্‌বেন।

মেয়েটি বলিল—'হাঁ তাই ভাল। তাঁর নাম হচ্ছে, রমেশচন্দ্র রায়। ঐ নামে টেলিগ্রাম করলেই হ'বে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনারা কতদূর যাবেন? অপরিচিতা বলিল—'আমরা সিমলা পাহাড়ে যাচ্ছি। আমার স্বামী সেখানে Foreign ডিপার্টমেণ্টে এ চাকুরী করেন। আমার এই দ্বিতীয়বার যাওয়া। খোকা এই প্রথম যাচ্ছে। মেয়েটির মনের জোর, সপ্রতিভ ভাব ও অসঙ্কোচ ব্যবহার আমার আজন্ম-অর্জ্জিত সংস্কারে জোরে ঘা দিতে লাগিল। ভাবিলাম কি সুন্দর শিক্ষা ইহার—আমাদের হিন্দু গৃহস্থ ঘরের মধ্যে শতকরা নব্বই জন, যে ব্যাপারে কাঁদিয়া ভাসাইয়া, কপাল চাপ্‌ড়াইয়া অনর্থ বাধাইত—সেখানে এই সরল মেয়েটি কি সুন্দর ধৈর্য্যের সহিত, আপনার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সহিত খেলা করিতেছে! ভাল-মন্দ বিচার আমি করিতে চাহি না, শোভন অশোভনের কথা আমি তুলিতে চাহি না কিন্তু আমার সম্মুখের এই মেয়েটি আজ, যে সরল অসঙ্কোচের সহিত, আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া এবং সহাস্য-গাম্ভীর্য্যের সহিত বিপদের সম্মুখীন হইল তাহার দোষ আমি কিছুতেই দিতে পারিব না।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অপরিচিতা বলিয়া উঠিল—'কি? চুপ করে গেলেন যে? আমার ব্যবহার ভারি বিচিত্র বোধ হচ্ছে—না? আমার সম্বন্ধে কত কি ভাব্‌ছেন? আপনি যা ভাব্‌ছেন কতকটা সত্যি বটে। আমি ব্রাহ্ম—কিন্তু আমার স্বামী আপনাদেরই দলের।'

মেয়েটিকে দেখিয়া এবং কথাবার্ত্তা শুনিয়া স্বামীটির বুদ্ধি-বিভ্রমের জন্য বিশেষ অপরাধী করিতে ইচ্ছা হইল না। হঠাৎ অস্বাভাবিক প্রগল্‌ভতার সহিত বলিয়া ফেলিলাম—আপনাকে দেখে, আপনার স্বামী বিশেষ অন্যায় করেছেন বলে মনে হয় না।

এই নির্লজ্জ চাটুবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া সহাস্য-বদনে সে বলিল—'না, তা নয়, আমাদের বিয়ে হিন্দু মতেই হয়েছে। আমিও, বলতে কি, আপনাদের ঘরের মেয়েদেরই ভক্ত। তাদের আর কিছু না হোক্‌, একটা সজীব স্নিগ্ধতা আছে।'

এ-ও আর এক নূতন পরিচয়! কথাবার্ত্তার অন্তরালে আমার সঙ্কোচ অনেকখানি কাটিয়া গেল। একটু পরেই গাড়ী ষ্টেশনে আসিল। আমি নামিয়া গিয়া যথোচিত telegram করিয়া দিলাম। তাহার পর অপরিচিতার গাড়ীতে গিয়া সংবাদ দিবার সময় পাইলাম না। পরের ষ্টেশনে কিছু দুধ ও খাবার

কিনিয়া লইয়া গিয়া বলিলাম—আপনি ভাব্‌বেন না। আমি টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি, বোধ হয় পরের ষ্টেশনেই খবর পাবেন। আপনি পথে কোনও ষ্টেশনে অপেক্ষা করবেন ? না একেবারে 'কাল্‌কায়' গিয়ে অপেক্ষা করবেন কাল ?—তবে পথে রাত্রিতে আপনার কষ্ট হ'তে পারে। কাল্‌কায় গাড়ী সকালে পৌছবে। সে বলিল—'তা আমি জানি। এবং আমি তাই ঠিক করেছি।

আমি কালকাতে গিয়েই অপেক্ষা করব।' আমি খোকার খাবার দিয়া বলিলাম—খোকার জন্যে দুধ দরকার হ'তে পারে। তাই টাট্‌কা দুধ এনেছি।

আর এ-বেলার জন্যে কিছু খাবার-টাবার রাখাও দরকার। এখানকার জিনিষ পত্র ভাল।

অপরিচিতা জিনিষগুলি হাতে করিয়া লইয়া বলিল—'আপনার অত কষ্ট করবার দরকার ছিল না। আমার সঙ্গে খাবার আছে। বাড়ী থেকে আস্‌বার সময়ে তৈরী ক'রে এনেছিলুম। আপনি এসে কিছু ভাগ বসান্। আপনার নিশ্চয় কিছু নেই ?' আমি মৃদু ভাবে—'না দরকার নেই' বলিয়া পলাইয়া আসিলাম।

গাড়ীতে আসিয়া ভাবিলাম দু'একটা সন্দেশ খাইয়া দেখিলে হইত। যাহার কথার সুর এত মিষ্ট, তাহার হাতের সন্দেশও নিশ্চয়ই সাধারণ অপেক্ষা একটু অন্যরূপ হইবে। পরক্ষণেই ভাবিলাম,—আমার ঐ রূপে 'না' বলাটা নিশ্চয়ই বিশেষ রূঢ়তার পরিচায়ক হইয়াছে। নিজের এই সভ্যতার বহির্ভূত ব্যবহার-গুলার উপরে বড় রাগ হইল। ভাবিলাম, জীবনে বুঝি এ দোষ যাইবে না।

রাত্রি ৯টার সময় হাতরাস্ জংশন আসিল। আমি তাহাদের গাড়ীতে গিয়া বলিলাম—আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে—আমায় কিছু খেতে দিন। অপরিচিতা প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হইয়া পড়িল, পরক্ষণেই ব্যথিত স্বরে বলিয়া ফেলিল—'আর ত কিছুই নেই! খোকাকে খাইয়ে আমি সব ফেলে দিয়েছি। আপনি চাইবেন জান্‌লে আমি নিশ্চয় রেখে দিতুম। আপনি কিছু মনে করবেন না।' একটু থামিয়া আবার হাসিতে হাসিতে বলিল—'আপনি ত ভারি খাম-খেয়ালী। এই একটু আগে বল্লেন কিছু খাব না—আবার এর মধ্যেই বল্‌ছেন—ক্ষিদে পেয়েছে ?' তাহার কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম, আমার প্রত্যাখ্যান সেবাব্রতা নারীচিত্তে বাজিয়াছে।

ষ্টেশনে গিয়া খোঁজ লইলাম। হাঁ, টেলিগ্রাম আসিয়াছে—অপরিচিতার স্বামী পরের ট্রেনেই আসিতেছেন—দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নাই। টেলিগ্রাম-খানা অপরিচিতাকে দিলাম। পড়িয়া, বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া

উঠিল। বারেক চক্ষের ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, আর কিছু বলিল না। আমি নিজের বার্থ-এ গিয়া শুইয়া পড়িলাম। শুইয়া শুইয়া এলোমেলো চিন্তায় মনটা অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবিলাম—দূর ছাই, এ আপদ জুটিল কেন? আর ভাবিব না। কিন্তু মাথার রক্ত তখন অস্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হইতে-ছিল। ঘুমাইবার জন্য পাশ ফিরিলাম। দেহটা সাড়া দিল—মন জাগিয়া বসিয়া রহিল।

মাঝে মাঝে গিয়া খবর লইয়া আসিতেছিলাম। রাত্রি একটার সময় দিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছিতেই খবর লইবার জন্য অপরিচিতার গাড়ীতে যাইতেই, ভীত ও ব্যগ্র কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—'এই যে আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। আমার ভয়ানক ভয় হয়েছিল।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ব্যাপার? অপরিচিতা বলিল—'আপনাদের দেশের ভিতর দিয়ে যেতে আমার অত্যন্ত ভয় করছে। গাড়ীতে আমি একলা—একটু আগেই দুজন লোক, বদমায়েস বলেই বোধ হ'ল, এই দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিল। আমি একলা থাকতে পারব না। এ পেশোয়ারিদের আমার একটুও বিশ্বাস হয় না।'

আমি বল্লুম—তাহ'লে মেয়েদের গাড়ীতে চলুন। আমি রেখে আসছি। আমি গিয়া দেখিলাম—সে গাড়ীও খালি। আসিয়া বলিলাম—বড় মুস্কিল দেখ্ছি, মেয়েদের গাড়ীও খালি—আপনি কোনও রকমে আজকের রাতটা কাটিয়ে দিন। আমার কথায় আরও ব্যাকুল হইয়া সে বলিল—না, না, আমি তা পারব না। খোকা রয়েছে—আর এ পথে আজকাল ভারি ডাকাতি হয়। আমি কিছুতেই একলা থাকতে পারছি না। আপনি বরং আপনার জিনিষপত্র নিয়ে এই গাড়ীতে আসুন। ক্ষতি কি? আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, চোখে ও ভঙ্গিমায় আকুল অনুনয় ভরিয়া বলিল—দয়া করে আসুন—একটুখানি অনুগ্রহ করুন।'

এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে আমি আরও বিহ্বল হইয়া গেলাম। এই শঙ্কিত ত্রস্ত মেয়েটির কাতর অনুনয় আমাকে যেমন আশ্চর্য্য করিল, তেমনি ব্যথিতও করিল। বিরুক্তি না করিয়া নিজের গাড়ীতে গিয়া জিনিষ-পত্র লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমি আসিতেই মেয়েটির মুখে আনন্দ ও ভরসার হাসি দেখিয়া মনে হইল—না আসিলে হয় ত একটা বিশ্রী ব্যাপার হইয়া যাইত এবং যদিও বা আসিবার সময় নানারূপ বিরুদ্ধ ভাব আসিয়া মনে দ্বিধা জন্মাইয়া দিতেছিল—কিন্তু আসিয়া পৌঁছিতেই মনে হইল, না ইহার ভিতর অন্যায় কিছুই নাই।

সমস্ত রাত্রি এক বিন্দু ঘুম হইল না! আগের রাত্রে ঘুম না হওয়ায় ভাবিয়াছিলাম, আজ রাত্রে একটু ঘুমাইয়া লইব। কিন্তু বিচিত্র অবস্থায় পড়িয়া সারারাত বসিয়াই কাটিতে চলিল। উচ্ছ্বাসপূর্ণ মনে কত কি নভেল-ই কথা মনে হইতে লাগিল! রামায়ণের লক্ষ্মণের কথা মনে পড়িল। রবীন্দ্রনাথের এক-রাত্রির বন্যা প্লাবনে ক্ষুদ্র কুটিরটির কথা মনে পড়িল।

সারাদিন, অত্যধিক মানসিক উদ্বেগের পর আংশিক সুসংবাদে, অবসাদগ্রস্ত চিত্তে অপরিচিতা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিবার পর তাহার বুকের কাছে খোকা নিশ্চিন্ত আরামে ভাবনা ভয়হীন হইয়া বোধ করি পরী-রাজ্যের স্বপ্নই দেখিতেছিল। আর আমি জাগিয়া জাগিয়া, অন্তরের পাগল চঞ্চল বৃত্তিগুলার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম। শেষরাত্রে অপরিচিতা জাগিয়া উঠিয়া মাথার অসম্বৃত আঁচল সম্বৃত করিয়া লইয়া উঠিয়া বসিল। আঙুল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে হাস্যপূর্ণ লজ্জিত স্বরে বলিল—'আচ্ছা ঘুম যা-হোক আমার! এমন রাত্তিরেও আমার ঘুম আসে! আপনি সারা রাত্রি বসে আছেন, আর এমনি স্বার্থপর আমি, দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছি! নিন্—আপনি একটু শুয়ে পড়ুন আর আমার ভয় করছে না।'

যদিও ভয় করা বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবুও বলিলাম—আর ভোর হ'তে বোধ হয় ঘণ্টাখানেক বাকি আছে। আর তা ছাড়া আমার রাত্রি-জাগা অভ্যেস আছে।

সে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—'আপনার কি বিয়ে হয়ে গেছে?' অসাবধানে বলা বাক্যে কথার এমনি ধারা অর্থ হইতে দেখিয়া আমি লজ্জায় বিব্রত হইয়া বলিলাম—না, আমি এখনও কলেজে পড়ি। যদিও কলেজে পড়া না-পড়ার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার যে কি সম্বন্ধ তাহা এখনও ভাবিয়া পাই নাই। অপরিচিত বলিল—'তা আমি আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি।'

বাকি রাতটুকু উভয়ে জাগিয়াই কাটাইলাম। ভোর হইবার আগে, খোকা উঠিয়া আমার সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া ফেলিল। আমার পক্ষে তবু কতকটা নিষ্কৃতি লাভ হইল। এতক্ষণ একই গাড়ীতে বসিয়া টানিয়া টানিয়া বড়ান কথা-বার্ত্তার মাঝখানে অকারণ মৌনতা বড়ই বিসদৃশ লাগিতেছিল। খোকা জাগিয়া উঠাতে অন্তরের মাতামাতিকে আমি উগ্র আদরে প্রকাশ করিবার অবসর পাইলাম। অন্ধকারের মধ্যেই সে আমাকে 'কাকা' 'কাকা' বলিয়া গলা জড়াইয়া চুমু খাইয়া অস্থির করিয়া তুলিল। তাহার সোহাগে উৎপীড়িত হইয়া উঠাতে

খোকার মা বলিল—ও বড় বিরক্ত করছে আপনাকে, দিন্ আমার কাছে দিন্।' আমি বলিলাম—না কিছু না, আমার বেশ ভালই লাগ্‌ল।

একটু পরেই যখন আম্বালা ষ্টেশন আসিল—খোকা আমার কোলে চড়িয়া জান্‌লা ধরিয়া বাহিরের দিকে দেখিতেছে। আম্বালায় গাড়ী অনেকক্ষণ থামে। হঠাৎ দেখিলাম, ষ্টেশন কর্ম্মচারীর পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া একটি বাঙ্গালী আমাদেরই গাড়ীর দিকে আসিতেছে। কাছে আসিতেই চিনিতে পারিলাম, আমার এক পুরাতন বন্ধু। আমাকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল—'কি হে, এদিকে কোথায় চলেছ?' আমি বলিলাম—তাই ত সুরেশ যে। এই ভাই পর্ব্বতাবাসে চলেছি। তারপর তুমি কোথা থেকে এখানে? সে বলিল—'আর ভাই, রেলের চাক্‌রী জানই ত? সম্প্রতি এইখানে ঠেলেছে।' তার পরেই আমার কোলে খোকাকে দেখিয়া গাড়ীর ভিতর লক্ষ্য করিয়া আমার প্রসারিত হাত চাপড়াইয়া ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল—'তারপর তোমার খবর কি? আচ্ছা লোক ত যা হোক! বিয়ে করলেই বা কবে, ছেলে হলই বা কবে, কিছুই ত জেনো নি? এমন ধারা ফাঁকিও দিতে হয়!'

কি সর্ব্বনাশ!—আচ্ছা 'ষ্টুপিড' ত এই সুরেশটা! মানুষ যে এত বড় নির্ব্বোধ হইতে পারে আমি কল্পনাও করিতে পারিতেছিলাম না! আমার এই অবস্থার যে এমন ধারা অর্থ হইতে পারে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার নিজের জন্য কিছুই নয়—কিন্তু এই নির্ব্বোধ অর্থহীন কথাতে অপরিচিতা কি ভাবিল, তাহা মনে করিয়া লজ্জা, সঙ্কোচে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্তে কোন কথাই কহিতে পারিলাম না। আমার অপ্রস্তুত ভাব দেখিয়া, আমার দিকে সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া আছে দেখিয়া চমক ভাঙ্গিল। বলিলাম—না, হে না, আমার বৌ-দিদিকে আর দাদার ছেলেকে শিমলেয় নিয়ে যাচ্ছি। খোকা এতক্ষণ আমার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল। আমি কথা বলাতে বিজ্ঞের মত সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল। অপরিচিতার দিকে তাকাইয়া দেখিবার আমার সাহস হইতেছিল না।

সুরেশ কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিল না। বলিল—'তোমার আবার দাদা কোত্থেকে এল?' আমি কোন রকমে তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম—সে আপনার দাদা নয়—আমার এক মাসতুত ভাই। সুরেশ বলিল—'যাই হোক, তোমরা একদিন আমার এখানে থেকে যাও। বিদেশে আছি, লোকজনের মুখ দেখ্‌তে পাই না। তোমাদের আজ থাকতেই হবে।' আমি বলিলাম—না তা হতে পারে

না। এঁর স্বামী—আমার দাদা—পরের ট্রেনে আস্‌ছেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের কাল্‌কাতে দেখা করতে হবে। সুরেশ শুনিল না। বলিল— সে হবে না। আমি ষ্টেশনে লোক রেখে দিচ্ছি। তিনি এলে তাঁকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাবে।' এই বলিয়া সে গাড়ীর ভিতরে উদ্দেশ করিয়া বলিল—বৌ দি, আপনাকে দেওরের বাসায় পায়ের ধূলো দিতেই হবে।' আমি নিরুপায় হইয়া সঙ্গিনীর দিকে চাহিলাম। অপরিচিতা মৃদুস্বরে বলিল—তাই চলুন। আর আমাদেরও ত কালকাতে অপেক্ষা করতে হ'ত। তার চেয়ে এই ভালো।'

এই অবসরে আমি একবার দেখিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম সুরেশের কথায় তাহার মনে কি চাঞ্চল্য আসিয়াছে কিন্তু আমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি কোন সন্ধানই পাইল না।

২

সুরেশের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া গল্প করিতেছি এমন সময়ে রমেশ-বাবু অর্থাৎ অপরিচিতার স্বামী আবির্ভূত হইলেন। ইতিমধ্যে সুরেশ বাড়ীর ভিতর হইতে সব শুনিয়াছিল। রমেশ বাবু আসিতেই তাঁহাকে অনাবশ্যক ব্যস্ততার সহিত অপরিচিতার কাছে লইয়া গেল। আমি আর সে-দিকে তাকাইলাম না—মিলনের দৃশ্য কল্পনাতেই ভাল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম সুরেশের এখানেই দিন কতক থাকিয়া যাই। খোকা আসিয়া—কাকা এইখানে বলিয়া কোলে চড়িল। তাহার সহিত টাট্টু-ঘোড়া এবং একা-গাড়ীর ঘোড়ার পার্থক্য বিচার করিতে করিতে নিজের মনের বিচার আর করা হইল না।

একটু পরেই রমেশ বাবু আসিয়া আমার একখানা হাত নিজের দু-হাতের মধ্যে নিয়া খুব ধন্যবাদ দিলেন। বলিলেন—'রেবার কাছে আমি সবই শুনেছি। আপনার মতন লোক খুবই কম দেখা যায়। এই ত ষ্টেশনে অত লোক ছিল' ইত্যাদি। আমার মন তখন অন্যদিকে ব্যস্ত ছিল—ভাবিতেছিলাম রেবা নামের চেয়ে মিষ্টি নাম আর আছে কি না। একটু পরেই অনধিকার চর্চা করিতেছি দেখিয়া মুখ তুলিয়া আগন্তুকের দিকে চাহিলাম।' এই প্রিয় দর্শন যুবকটির সম্বন্ধে খুব উচ্চধারণা আমার ছিল না। আমার জিজ্ঞাসু নেত্র দেখিয়া তিনি বলিলেন—'এলাহাবাদে এক মহা মুস্কিলে পড়ে গিয়েছিলাম মশাই। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে উঠ্‌ছি, refreshment room-এ এক-বেটা গোরা-সৈনিক একজন পাখাওয়ালাকে এমন মারলে যে, তার দুটো দাঁত ভেঙ্গে মুখ দিয়ে রক্তারক্তি। তার অপরাধের

মধ্যে ওই ভীষণ গরমে, সারাদিন পাখা টেনে সে একটু ঢুলে পড়েছিল। আমার রক্তটা হঠাৎ তখন কি রকম গরম হয়ে উঠ্‌ল—চোখের সামনে রক্ত দেখে আর থাক্‌তে পার্‌লাম না। আগুপাছু না ভেবে সৈনিকটাকে মার্‌লুম এক লাথি, তারপর মারামারি—তারপর কোর্টে যাওয়া। বললুম আমাকে একবার ট্রেনে দেখা করতে হ'বে ইত্যাদি। ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন গোরাটার স্বজাতি। গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমাকে আদালতে যেতে হ'ল। সেখান থেকে ফির্‌তে অনেক দেরী এসেই এক্সপ্রেস ট্রেন ধর্‌লুম। কানপুরে এসে এক টেলিগ্রাম কর্‌লুম। বোধ হয় আম্বালাতে এতক্ষণ রেবাকে খোঁজাখুঁজি কর্‌ছে।

আগন্তুকের এই বীরত্ব-কাহিনী দুঃখের বিষয় আমাকে স্পর্শই করিল না। যে দেশের চা-কুলীদের পেটের প্লীহা এতদূরে বর্দ্ধিত অবস্থায় থাকে যে, ইউরোপীয় রমণীর কমনীয় জুতার স্পর্শমাত্র ফাটিয়া যায়—সেখানে একজন সামান্যতম পাঙ্খাকুলীর দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহাতে আর হইয়াছে কি! ইহা শুধু ব্যক্তিবিশেষের গায়ে শক্তি আছে বলিয়া গোরার উপর বল প্রয়োগের ব্যবস্থা। চৈতন্যের দেশবাসীদিগের আদর্শ হওয়া উচিত—ক্ষমা, নিরুত্তর সহ্য—প্রতিবাদ নয়।

সে-দিন সকলকে সেখানেই থাকিতে হইল। পরদিন ভোরবেলায় আবার আম্বালা ষ্টেশনে গিয়া গাড়ী ধরিতে হইবে। আমি রমেশ বাবুকে বলিলাম—আমাকে মাপ করিতে হইবে। গৃহস্থ-গৃহিনীর 'চিনে-কাবাব' আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। তা ছাড়া আম্বালা স্থানটিও বড় স্বাস্থ্যকর বোধ হইতেছে। আমাকে এখানে থাকিতে হইবে। অভিপ্রায় শুনিয়া অপরিচিতা আসিয়া উপস্থিত। আয়ত চোখ দুটি আরও আয়ত করিয়া বলিল—তা কি হয়,অপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হ'বে। আমি শিমলে ভাল চিনি না। সেখানে গিয়ে আপ্‌নাকে আমার 'গাইড' হতে হ'বে।

কি ভয়ানক! 'গাইড'! যাহার সহিত একটি দিনের আলাপে আমার জীবন-চরিতে 'সামাল' 'সামাল' রব উঠিয়াছে—তাহার 'গাইড'! আমার পক্ষে মরুভূমিই ভাল। উজ্জ্বল নেত্রকে আমার চিরদিনের ভয়। তবুও বলিলাম—আমায় মাপ করবেন, আমি যেতে পার্‌ব না। সে চোখের দিকে আর তাকাইলাম না—হয় ত সেই উজ্জ্বল চোখদুটি অজানা কিছু একটায় আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—হয় ত চোখের কোণে ব্রহ্মাস্ত্র সজ্জিত হইবে।

পরদিন খোকা আসিয়া, কোলে চড়িয়া বলিল—কাকা বাবু, তুমি না গেলে

আমি যাব না। বুঝিলাম এ কার কারসাজি! ছোট হাত দুটি বুকে লইয়া বলিলাম—আমার হার! চল যাচ্ছি।

সুরেশ ষ্টেশনেই ছিল। যাইবার সময় বলিল—চিরকাল কি একই রকম থাকবে? চিরকালই romantic! আমি বলিলাম—'দূর্, বাজে কথা! আজকে না গেলে আমার চল্‌বেই না। তোমাদের গোলমালে শিমলের কাকাকে খবর দেওয়াই হয় নি। তিনি কাল থেকে ভাব্‌ছেন।

অপরিচিতার সহিত একই গাড়ীতে যাইতে হইল। রমেশ বাবু লোকটি যথেষ্ট সদালাপী, কিন্তু কথা-বার্ত্তার মাঝখানে অপরিচিতা যোগ না দিলে, বোধ হয় আমাকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইত। অন্তরের উচ্ছ্বসিত আনন্দ সে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার এত হাসির কারণ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না কিন্তু সংক্রামক ব্যাধির মত আমাকেও নিরর্থক হাসাইতেছিল। এক একবার মনে হইতেছিল, অপরিচিতা অত্যন্ত প্রগল্‌ভা কিন্তু গতপূর্ব্ব রাত্রের নীরব গাম্ভীর্য্য মনে পড়াতে তখনি গোলমালে পড়িতেছিলাম। ভাবিলাম, আনন্দের উৎস বিদ্যমান আছে বলিয়াই বুঝি এত প্রবাহ! ভারী হিংসা হইতেছিল। খোকা ইহার মধ্যে আমার সহিত পশু-তত্ত্ব আলোচনা সুরু করিয়াছিল।

কাল্‌কা ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া ছোট গাড়ীতে চাপিতে হইল। ভাবিয়াছিলাম, এখান হইতে পৃথক গাড়ীতে চড়িব। কিন্তু স্থানীয় রেজিমেণ্ট ঐ দিন শিমলা যাওয়াতে গাড়িতে অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল। একটি কাম্‌রায় মাত্র একখানি ছোট বেঞ্চি পাইলাম। তাহাতে মাত্র তিনজনে বসা যায়। কিন্তু আজকের দিনে খোকাকে লইয়া চারজনে বসিতে হইল। বাধ্য হইয়া অপরিচিতাকে রমেশ বাবু ও আমার মাঝখানে বসিতে হইল। খোকা আমার কোলে রহিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এখান হইতে রেলপথ ঝাঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহাড়ের গা-দিয়া ও মধ্য দিয়া যাওয়াতে দৃশ্যটি বড়ই মনোরম। গাড়ী আস্তে আস্তে চলিল। খোকার বড় আহ্লাদ বোধ হইতে লাগিল। কাল্‌কা হইতে শিম্‌লার পথে অনেকগুলি টানেল আছে। কিছুদূর গিয়া, ট্রেন একটা টানেল-এ ঢুকিল, হঠাৎ সব অন্ধকার হইয়া গেল। পাশের মানুষকেও দেখা যায় না। খোকা কাঁদিয়া উঠিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। তৎক্ষণাৎ আলো জ্বলিল। খোকা চুপ করিল। ট্রেন যখন টানেল পার হইয়া গেল, আবার দিনের আলো দেখা গেল, খোকার মহা ফুর্ত্তি। অপরিচিতা বলিল—দিন ওকে আমার

কাছে দিন। আপনাকে বিরক্ত করছে। আমি না-বলা সত্বেও খোকা উঠিয়া মায়ের কাছে গেল।

বেলা যত বাড়িতে লাগিল, ট্রেন তত উঁচুতে উঠিতে লাগিল। এই সময় গাড়ী অত্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাওয়ায় অনেকের মাথা ঘোরে। রমেশ বাবুও শরীর অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। আমার কাছে উপযোগী সরঞ্জাম ছিল। পকেট হইতে 'স্মেলিং সল্ট' ও লেবুর আরক বার করিয়া দিলাম। বলিলাম, এই গুলো ব্যবহার করুন আর মাথাটা একটু জান্‌লার ধারে রাখুন্। ট্রেন্ চল্‌বার সময় হাওয়া লাগ্‌লে একটু উপকার হতে পারে।

অপরিচিতার মুখ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। বলিলাম—কিছুই নয়, এখুনি সেরে যাবে। একটু পরে রমেশ বাবু ঢুলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—লজ্জা করবেন না, ওর কাঁধের ওপর মাথাটা রাখুন। গাড়িতে ত যায়গা নেই, যে, একটু শোবেন। আর তা ছাড়া গাড়ীর অপর সকলে বিদেশী। ওরা কিছুই ভাববে না। একটু খানি ইতস্তত করিয়া, বোধ হয় যন্ত্রনাতেই উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি কাঁধের উপর মাথাটা রাখিলেন। আমি খোকাকে ডাকিয়া লইয়া জান্‌লা দিয়া পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ীদের বাড়ী দেখাইতে লাগিলাম!

বেলা অনেক হইয়া গেল। আমি ইচ্ছা করিয়াই খোকার সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়া তাঁহাদের গুঞ্জনের অবসর দিয়াছিলাম। রমেশ বাবু অনেকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। অপরিচিতা গল্প করিতেছিল—সে-দিন রাত্রে আমি খাইতে চাওয়াতে খাইতে না পাওয়ার বিষয়। খোকা আর টানেল আসিলে ভয় করিতেছিল না। আগে হইতেই আলো জ্বলিতেছিল। খোকাকে বলিলাম—এইবার বরোগ টানেল আস্‌বে। এটা সব চেয়ে বড়। গাড়ী অনেকক্ষণ এর ভেতর থাক্‌বে। অপরিচিতা ও রমেশ বাবু উঠিয়া বসিলেন।

টানেল আসিল। ভয়ানক অন্ধকার—আলো জ্বলে নাই। খোকা কাঁদিয়া উঠিল। অপরিচিতা অন্ধকারেই হাতড়াইয়া তাহাকে আমার কাছ হইতে টানিয়া লইল। দু'এক সেকেণ্ড চলিয়া গেল। হঠাৎ আমার গায়ের উপর একটা তপ্ত স্পর্শ অনুভব করিলাম। একটা উত্তপ্ত নিশ্বাস মুহূর্তের জন্য গন্ধ ছড়াইয়া আবার মিলাইয়া গেল! যেন একটি যুগল পদ্মপুট নিমেষের তরে কম্পিত স্পন্দনে বিশ্রাম করিয়া পরক্ষণেই অদৃশ্য হইয়া গেল! আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। এ কাহার গোপন চকিত-চুম্বন নিমেষে নিবেদনের পথে বাধিয়া গেল! এ কাহার সঞ্চিত অন্তর-উচ্ছ্বাস সহসা আত্মপ্রকাশ করিল, অথবা অন্ধকার

গিরি-গহ্বরে পাষাণের অশ্রুবিন্দু বাতায়ন পথে আমাকে স্পর্শ করিল? পরক্ষণেই মনে হইল,দূর ছাই, তাহাই হইবে। আমি কি পাগল হইয়াছি, না স্বপ্ন দেখিতেছি? পাহাড়ের গায়ে জল ঝরিতেছে, তাহারই ফোঁটা হয় ত গায়ে লাগিয়াছে। তখনি আবার মনে হইল, কৈ না, তা ত নয়, পাতালের পরশ হিম শীতল কিন্তু এ স্পর্শ যে তীব্র উষ্ণতা ভরা—আরও যেন কিছু ইহার ভিতর রহিয়া গিয়াছে।

টানেলের ভিতর মুহূর্ত্তগুলি যুগ বলিয়া মনে হইতে লাগিল, চিত্ত অস্থির হইয়া চিন্তাজাল বুনিতে লাগিল। পুনরায় সূর্য্যের আলোক বাহির হইতেই চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—সকলি পূর্ব্ববৎ, অবিকল সেইরূপ। অপরিচিতা নির্ব্বাক, স্বামীর দিকে চাহিয়া আছে। চোখের কোণে বিদ্যুৎ খেলিতেছিল কি না বুঝিলাম না। কিন্তু আমার দিকে চাহিবার বা আমার সহিত কথা কহিবার কোন প্রয়াস দেখিলাম না। মুখখানি অস্বাভাবিক গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন, বোধ করি স্বামীর জন্যই! খোকা কখন আমার কোলে আসিয়াছে বুঝিলাম না! কণ্ঠে তাহার ক্ষুদ্র বাহুর স্পর্শে চমকিয়া উঠিয়া ভাবিলাম, নিশ্চয়ই আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। নানারূপ উষ্ণ ও উগ্রচিন্তায় কল্পনাপ্রবণ মন ইহা রচনা করিয়াছে! নহিলে—না, তবুও কেমন মনে হইতে লাগিল, কোথায় যেন কি গোলমাল হইয়াছে!

দূর ছাই—নিশ্চয়ই খোকার ক্ষুদ্র শিশু-হৃদয়ের সোহাগে, আমার বিমুখ মন অন্যরূপ অর্থ করিয়াছে অথবা অন্ধকারে অলক্ষিতে কোথায় একটা কিছু ভুল হইয়া গিয়াছে। উদ্বেগ-ক্লিষ্ট দম্পতির ত্বরিত অবসরের অন্তরালে, তুচ্ছ দৈনন্দিন অপহৃত প্রণয় নিবেদনের মাঝখানে হয় ত আমি অকস্মাৎ বিঘ্ন হইয়া পড়িয়াছি। দরকার নাই, আমার সে কথা ভাবিয়া। সংসারে কত বিষয়ে কত ব্যাপারে কত অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিচিত্র ঘটনা ঘটে। আকস্মিক ঘটনা সত্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার মানুষের নাই।

খোকা অভিমান করিল—কাকা বাবু কথা কইছ না কেন?

তাই ত! নিজের ভাবনায় ডুবিয়া আর একটি কোমল চিত্তের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। তাহাকে বুকে লইয়া বলিলাম—আচ্ছা খোকা বাবু, তুমি আমাদের বাড়ী যাবে?

প্রথম আগ্রহে চুপ করিয়া থাকিয়া, তার পরে ভাবিয়া বলিল—না, সেখানে মা নেই। তুমি আমাদের বাড়ী চল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম—আমার সেখানে যাইতে নাই! অন্তরকে বুঝাইলাম, সেখানে আমার চিতা সাজান আছে।

শিমলা ষ্টেশনে নামিয়া বিদায় লইবার পালা। অপরিচিতা টানেলেরে পর হইতে আর আমার সঙ্গে কথা কহে নাই। তাহার এরূপ সঙ্কোচ আমার কাছে নূতন। বিদায় লইবার সময় পুনরায় পূর্ব্বতম মুর্ত্তি দেখিলাম। মৃদু হাসিয়া অনুরোধের স্বরে বলিল—সে-দিন আপনি চেয়েও কিছু খেতে পান নি। একদিন দয়া করে আমাদের বাড়ীতে আস্‌বেন। আমি আপনাকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াব। রমেশ বাবু বলিলেন—আপনার আসা চাই। আমি Ellingham Cottage-এ থাকি। দয়া করে আস্‌বেন। শরীরের অসুস্থতার জন্যে আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপই করা হয় নি। মাপ করবেন। কিছু মনে করবেন না।

আমার অসহ্য বোধ হইতেছিল। ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। ভদ্রতার খাতিরে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অপরিচিতা আঁখি পাতে তরঙ্গ তুলিয়া বলিল—আস্‌বেন ত ?—

আমার মনে হইতে লাগিল, ভবিষ্যতে এরূপ একটা আইন করা উচিত —ট্রেনে কোনও যুবতী কোনও অপরিচিতের সহিত আলাপ করিতে পাইবে না। বলিলাম—আমায় মাপ করতে হ'বে। আমায় হয় ত আজই অন্য কোথাও রওনা হতে হ'বে।

দেখিলাম আমার মিথ্যা কথা কয়টা আর এক জন বুঝিল। এবং তাহার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। সে যেন ক্ষুদ্রতম কি একটু আশা করিয়া ক্ষণিকের তরে নয়নে কোন আশার সজলতা ভরিয়া বড় সাধ করিয়া কি যেন চাহিয়াছিল—কিন্তু না পাওয়ায় একটা দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়া সংবরণ করিয়া ফেলিল। বলিল—ওঃ আমি বুঝ্‌তে পারি নি, পারেন ত আমায় ক্ষমা করবেন। তাহার দৃঢ় সংবদ্ধ ওষ্ঠাধর দেখিয়া ভয় হইল—বুঝিবা এখনি রক্ত ঝরিয়া পড়িবে।

মাতাল অবস্থায় ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম। পিছনে তাকাইতে সাহস হইতেছিল না। একবার সেই কম্পিত স্পর্শের কথা মনে পড়িয়া ক্ষণেক বিচলিত হইলাম। পরক্ষণেই ভাবিলাম—ভুল ভুল, সমস্তই ভুল। সৃষ্টি-ছাড়া মনকে লইয়া পারা যায় না। বুঝিলাম, পিছনে তাহারা তখনও দাঁড়াইয়া আছে—কে যেন তাকাইয়া আছে। আরও অগ্রসর হইয়া শুনিলাম—একটি অতি প্রিয় শিশুর কণ্ঠস্বর বলিতেছে—মা-ওমা, কাকা চলে গেল!

বালকের মুখ কে যেন চাপিয়া ধরিল—যেন ওই কথা কয়টাও কাহার কাছে অসহ্য বোধ হইতেছে।

পান্থবীণা

—শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়।

১০

কি যে উত্তর দিবে বংশী কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার মুখের চেহারা খানা দেখিয়া গায়ত্রী ঘরের ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল এবং চট্ করিয়া বারান্দার উপর একটা আসন পাতিয়া দিয়া বলিল, গীত-টিতা কাল পড়ো বাবা, তোমরা আগে খেয়ে নিয়ে আমায় ছুটি দিয়ে তারপর যা-হয় করো। বলিয়াই সে নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিল, বংশী শোন্!

রত্নেশ্বর নিরুপায় হইয়া কহিলেন, তবে তাই হবে বাবা। তুই যা।

বংশী দিদির কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই গায়ত্রী হাসিতে লাগিল।

বংশী কিন্তু সে [illegible]াসিতে যোগ দিতে পারিল না; বলিল, তুই কেমন করে জান্‌লি দিদি?

গায়ত্রী [illegible]লিল, একটু একটু বুঝ্‌তে পারি।—তুই এইখানে বোস্। বাবা ভুলে যাবেন।

বংশী বসিল বটে, রত্নেশ্বর ভুলিয়াও গেলেন কিন্তু নিজের অক্ষমতার এই দুর্বিসহ চিন্তাটা বংশী নিজে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না,—ব্যাপার অতি সামান্য হইলেও অপরাধটা তাহার গুরুতর বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

দিনের বেলা অমরেশ আসিয়াছিল, কি কথা সে বলিয়া গেছে, গায়ত্রী বলি বলি করিয়াও কথাটা তাহাকে বলিল না—হয়ত সে ভুলিয়া গেল। একবার তাহার ইচ্ছা হইল, কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লয়, কিন্তু বাজে কথায় রাত্রি হইল, আহারাদি শেষ করিয়া বংশী শুইয়া পড়িল, সে সম্বন্ধে কোনও কথাই সেদিন আর উঠিল না।

বিছানায় শুইয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। দিনের বেলা পথে পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন সে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠে,—ভাবে, রাত্রিটা আসিলে হয়, বিছানায়

শুইয়া চুপ করিয়া সে ঘুমাইয়া বাঁচিবে, কিন্তু রাত্রি আসে, অথচ ঘুম আসে না। প্রতি রাত্রেই অনেকক্ষণ ধরিয়া এমনি একান্ত নির্জ্জনে তাহাকে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে হয়। অসংযত চিন্তার রাশি নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, সকলে মিলিয়া তাহার মস্তিষ্কের প্রত্যেকটা শিরা উপশিরা ধরিয়া যেন টানাটানি করিতে থাকে,—কি যে হয়, কি যে করে, সে নিজে কিছুই বুঝিতে পারে না, চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হয়, মনে হয়, বালিশে মুখ গুঁজিয়া খানিকটা কাঁদে, কিন্তু তাহাও যখন পারে না, তখন হয়ত বা কখনও বিছানা হইতে উঠিয়া সেই ছোট ঘরটার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, ভাঙা চৌকিটার উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কিম্বা হয়ত জানালাটা খুলিয়া দিয়া তাহার পাশে গিয়া দাঁড়ায়। সুমুখে আগাছার জঙ্গলের উপর শীতের কন্‌কনে বাতাস বহিয়া গায়ে আসিয়া লাগে, অদূরে পড়ো-বাড়ীর ভাঙা সিঁড়িটা দেখিতে পাওয়া যায়, রাস্তার পাশে ওই ভাড়াটে' গাড়ীর আস্তাবলে-বাঁধা ঘোড়াগুলা মাটিতে পা ঠুকিতে থাকে,—পনর দিন অন্ধকারে, আর পনর দিন জ্যোৎস্নায়। তাহার মনে হইত, ইচ্ছা করিলেই মানুষ নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে। জেলখানার কয়েদী,—নিজের অবস্থার উপর যার কোনও হাতই নাই,—দৃঢ়তার সহিত অনশন ব্রত অবলম্বন করিলে তাহারও একটা কিছু ব্যবস্থা হয়, তাহাই বা হইবে না কেন? কিন্তু দিনে-দিনে তার সে-বিশ্বাস সে হারাইয়া ফেলিতেছিল। ইংরাজিতে একটা কথা আছে Man proposes God disposes, যদি তা-ই হয়, তবে এই নিখিল মানবের সে ভাগ্যবিধাতা কোথায়? এই ভাবিয়া কতদিন সে এই খোলা জানালার সুমুখে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধে ওই নৈশ স্তব্ধআকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে,—অবশেষে কোথাও কোনও কূল-কিনারা খুঁজিয়া না পাইয়া আবার ফিরিয়া হয়ত শয্যায় শয়ন করে,—এমনি করিয়াই রাত্রি তাহার প্রভাত হইয়া যায়।

সে-দিন সে তার রাত্রির নির্জ্জনতায় চুপ করিয়া শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, মানুষের নিঃসঙ্গ অবস্থাটাই মারাত্মক। সেই জন্যই বোধ করি নির্জ্জন কারাবাস জেলের কয়েদির পক্ষে সব চেয়ে বড় শাস্তি। মানুষের সঙ্গে যতক্ষণ থাকে, মানুষের কাছে কাছে যতক্ষণ ঘুরিয়া বেড়ায়, সুখে হোক্‌ দুঃখে হোক্‌ সময়টা তার মন্দ কাটে না, কিন্তু এই রাত্রে যখন একাকী সে তার এই ঘরের মধ্যে আসিয়া বসে, তখন সে আর কোন প্রকারেই স্থির হইতে পারে না,—সারা বক্ষ জুড়িয়া কিসের যেন একটা বিরাট অতৃপ্তি অনুভূত হয়, একটা তিক্ত ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস

বুকের তলা হইতে সবেগে ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়,—পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে কেশাগ্রভাগ পর্যান্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। ভয় হয়, বাবার মত সে-ও বুঝি পাগল হইয়া যাইবে।···স্বমুখের দেওয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের ছবিখানির দিকে সে-দিন হঠাৎ তাহার নজর পড়িয়া গেল। শীত কিছু বেশি বলিয়া স্বমুখের জানালাটা বন্ধই ছিল, ঘরের অন্ধকারে ছবিটা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছিল না,—উপরের কাঁচখানা মাত্র চিক্ চিক্ করিতেছে! তথাপি সে-দিক হইতে সে তার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া ঘুমাইতে পারিল না। এম্নি আর একটা ছবি টাঙানোর কথা তাহার মনে পড়িল। বেশিদিনের কথা নয়! অমরেশের বাড়ীতে সে-দিন উৎসবের আয়োজন। একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া দেয়ালে সে পেরেক্ ঠুকিতেছিল,—নিভা তাহার হাতে পেরেক্ তুলিয়া দিল। হাতে হাত ঠেকিবামাত্র সে তার মুখের পানে একবার তাকাইল। অস্তমিত সূর্য্যের স্নিগ্ধ রক্তিম রশ্মি জানালার লাল সার্সীর ভিতর দিয়া নিভার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে,—সে কি বিদ্যুতের মত মনোহারিণী মূর্ত্তি তার! কানের দুল, নাকের পাথর, মাথার চুল, চোখের তারা—সব যেন জ্বলিতেছে,—আগুনের একটি শিখার মত দীপ্তিমতী সে নারীর অপরূপ জ্যোতি জীবনে সে-দিন যেন সর্ব্বপ্রথমে তাহার নজরে পড়িল। আপাদমস্তক তাহার শির্ শির্ করিয়া উঠিল, হাতের পেরেকটা সে অন্যমনস্ক হইয়া দেয়ালের গায়ে একেবারেই গুঁজিয়া ফেলিল, একটা পেরেক্ হাত হইতে পড়িয়া গেল,—অবশেষে সেখান হইতে সে পলাইয়া বাঁচিল। কিন্তু কেন এমন হয়,—কেন হয়, এ-প্রশ্নের মীমাংসা সে-দিন হইতে সে আজও করিয়া উঠিতে পারিল না। সে-দিন হইতে সেখানে সে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে, এমন দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে সে কোন রকমেই চায় না, কিন্তু আজও যেন সে স্পর্শ তাহার রক্তে মিশিয়া রহিল। এখন সে কি করিতেছে কে জানে, কিন্তু এই নিস্তব্ধ রজনীর দ্বিপ্রহরে একাকী এই মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া অন্ধকারে বংশী যেন তার সেই তড়িৎ-স্পর্শ তাহার সর্ব্ব দেহ-মনে স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। ইহাকে সে অস্বীকার করিতেও পারিল না, অথচ ইহা যে নিতান্ত গর্হিত তাহাও তাহার মনে হইতেছিল কিন্তু দৈন্য-প্রপীড়িত মানুষ যখন তার দুর্দ্দিনের দুর্ভোগে জর্জ্জরিত হইয়া একেবারে নিরুপায় হইয়া উঠে, তখন যে-কোনও সুখকর চিন্তাকে হাতের কাছে পাইলে সে আর সহজে তাহাকে ছাড়িতে চায় না; বংশীও বহুক্ষণ ধরিয়া তাহাই ভাবিল, তাহার পর কোন্ এক সময় আজ যেন সে একটুখানি নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

(ক্রমশ)

মনোলোক

আমাদের দেশে প্রত্যহ কাগজের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহা অত্যন্ত শুভ-চিহ্ন। যদিও ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবন স্বল্প-কালমাত্র, তবুও ইহাদের মধ্যে যে চেষ্টা রূপ ধরিয়াছিল ইহাই যথেষ্ট! একটি জাতি জাগিয়া কথা কহিতে চাহিতেছে—জাগরণের আনন্দে ও বিস্ময়ে!

* * * *

কিন্তু অধিকাংশ কাগজগুলিই বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। তাহরা সবাই এক ছাঁচে ঢালাই করা। ইহাতে একটু লোভ আছে—বিক্রী হইবার অধিক সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ধীরে ধীরে মরাল-বাহিনী বীণাপাণীকে আমরা মন্দির হইতে লইয়া পণ্যস্থলে আনিতেছি—বীণা ফেলিয়া দিয়া হিসাবের খাতা তুলিয়া ধরিয়াছি।

* * * *

অনেক স্থলে আমরা মাসিক-পত্রগুলিকে পোষ্ট-অফিসের ব্যাগ করিয়া তুলিয়াছি। এখন সময় আসিয়াছে বিভিন্ন আদর্শ লইয়া বিভিন্ন কাগজের সৃষ্টি করা। হয়ত ইহাতে আশার দিক হইতে বিফলতার সম্ভাবনা বেশী কিন্তু আজ বিফলতাকে লইয়া ঘর করিবার সময় আসিয়াছে; কখন যে সে সহজ হইয়া আশারও অতীত হইয়া আসে কেহ জানে না।

* * * *

কল্লোল প্রকাশ করিবার সময় এইরূপ একটি বিশেষ আদর্শ লইয়াই অগ্রসর হইয়াছিলাম। এতকাল তাহা সমস্ত বাধা ও অনটনের মধ্য দিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছি ইহা আমাদের বিশ্বাস। হিতৈষীগণ আশা দিয়া এবং বিরুদ্ধবাদিগণ অনাদর দিয়া আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করিয়াছেন।

* * * *

দুঃখের মূর্ত্তি বিভিন্ন হইতে পারে কিন্তু তাহার প্রকাশ এক। আমার ঘরের

পাশে আজ যে লোকটি অনাহারে কষ্ট পাইতেছে—দূরে মেক্সিকোর কোন রাজপথে অনাহারে মানুষ সেই একই কষ্ট পাইয়া থাকে। নিরাশায় ও দুর্ব্বলতায় যে অন্তর আজ মুমূর্ষু তাহা বিশ্বকে ছাইয়া রহিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বের অন্তরের এই কম্পন ইহাকে ভাবায় স্থান দিতে হইবে। ইহাই আমাদের আদর্শ।

* * * *

প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি সময় আসে যখন বায়ুর অদৃশ্য তরঙ্গের মত তাহার সমস্ত দুঃখ তাহাকে ঘিরিয়া থাকে অথচ কঠিন মূর্ত্তি ধরিয়া আসে না। যে ভালবাসিল সে নিরাশা লইয়া লুকাইয়া রহিল—জীবনে যে বিফল হইল—সেই বিফলতার গুহায় সেও প্রবেশ করিল—যে অপমানিত হইল, অপমানকে সে ভয়ে বা লজ্জায় মুক্তি দিল না। কিন্তু একদিন সংগোপনতার অসহ্য ভারে সকলি মূর্ত্তি ধরিয়া উঠে—নূতন সাহিত্য সৃষ্টি হয়। নিরাশা, আনন্দ হইয়া ভাবার গতির সাহায্য করে—বিফলতা সফল হইয়া ভাবার অন্তর-লোক সৃষ্টি করে, অপমান জয়মালা হইয়া ভাষা-কবির কণ্ঠে দোলে।

* * * *

গত কার্ত্তিক সংখ্যায় 'সর্ব্বনাশের ঘণ্টা' বলিয়া যে কবিতাটী প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা শুনিলাম, তাহা অনেকে মনে করিয়াছেন বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া লেখা হইয়াছে। ইহা যে কত বড় ভুল, তাহা যাঁহারা মনে করিয়াছেন আশা করি পরে জানিতে পারিয়া তাঁহাদের হঠাৎ-মন্তব্যের জন্য তাঁহারাই লজ্জিত হইবেন। যে কোনও কারণেই রবীন্দ্রনাথকে উপহাস করিয়া কিছু লিখিবার সম্ভাবনা আমাদের নাই—তাহা যাঁহারা পূর্ব্বাপর কল্লোলের সমস্ত সংখ্যাগুলি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

কবিতাকে কবিতা বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত, তাহার মধ্যে দূষনীয় যাহা থাকে তাহাই আলোচনা করিবার কথা, তাহার বাহিরে আর কিছু ভাবিলে তাহার জন্য 'সাফাই' গাহিবার আমাদের প্রবৃত্তি নাই।

অবশ্য ভুল মানুষ না বুঝিয়াই করে, সে ভুলকে মানুষের ভুল বলিয়াই মাফ দিয়ে গ্রহণ করিতে পারিলে অকারণে বিরোধ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকেনা তবু বলিতেছি এইরূপ মারাত্মক 'ভুল' না করিবার একমাত্র উপায়—অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কথা বলা। নহিলে বুদ্ধি-শক্তির অপচয় হয়।

* * * *

শান্তির মধ্যেই সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা, বিরোধের মধ্যে নহে। সাবিত্রী বা

কাব্যের রস-প্রবাহকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শান্তির মধ্যে মিলিত করিয়া যে মহান পরিণাম তাহাই ভারতবর্ষের আদর্শ ও আকাঙ্খার বস্তু। বাহিরের কাজ এবং ভিতরের মনকে এক করিয়া লওয়াতেই ভারতবর্ষের ধর্ম। সে ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া জানিবার জন্য নানা আন্দোলনে নানাভাবে যে মাঝে মাঝে আদর্শ বিক্ষুব্ধ হইতে দেখা গিয়াছে তাহাতে কেবল এই পরিণত সৌন্দর্য্যের প্রশান্তি গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে মাত্র।

* * * *

এই বিশ্ব-প্রবাহের অন্তরের কথাকে সমাজের রুঢ়তার সমক্ষে গল্পের আকারে, কবির চিন্তাতে, নির্ভীকভাবে প্রকাশ করা কল্লোলের একটি উদ্দেশ্য। মানুষের প্রেমের মধ্যে যে ধ্রুবত্ব ও সৌন্দর্য্য, কামনায় যে অশান্তি ও বেদনা তাহাই কথা-সাহিত্যের আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা কল্লোলের প্রত্যেক রচনাতে অন্তর-লোকের আকাঙ্খার মত নীরবে নিহিত থাকে।

প্রাপ্ত পুস্তক ও পত্রিকা

পরিচয়।

রূপ ও রঙ্গ—সপ্তাহিক পত্রিকা। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, এম, এ, বি, এল, মহাশয়দ্বয় দ্বারা সম্পাদিত। প্রতি সংখ্যা ৵০; বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকা।

এই পত্রিকাখানির কয় সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই, কলিকাতার রাজপথে অনেক ছোট ছোট প্লাকার্ডকে চাপা দিয়া, অপেক্ষাকৃত কম-জমকাল অন্ত সব প্লাকার্ডকে নিষ্প্রভ করিয়া এই পত্রিকার বহুবর্ণের বিচিত্র ও বিরাট প্লাকার্ডগুলি লোক-চক্ষু আকর্ষণ করিয়াছিল। বিজ্ঞাপনে সম্পাদকদ্বয়ের নাম দেখিয়া সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া এই পত্রিকাখানির প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলেন। যথা সময়ে 'রূপ ও রঙ্গ' পাইয়া আমরা সানন্দে অভিবাদন করিয়া লইয়াছি।

বাংলার দুইজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্পাদিত এই কাগজখানি হাতে করিয়া আনন্দে ও গর্ব্বে মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। শরৎচন্দ্র বাংলার বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক, নির্ম্মলচন্দ্র বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ধনী ব্যক্তি, এই দুইয়ের সম্মিলনে, চির-দরিদ্রা বাংলা ভাষা যে কি শুভ-সুযোগ লাভ করিল, তাহা ভাবিয়া সকলেই খুব উৎফুল্ল হইয়াছিলাম।

পত্রিকার প্রচ্ছদপটখানিও মনোরম ও সুচিত্রিত। বাংলার অন্যতম শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আঁকা। রূপ ও রঙ্গকে অবলম্বন করিয়া এই চিত্রের পরিকল্পনা। সরোবরে প্রস্ফুটিত পঙ্কজিনীর মুখের উপর মুগ্ধ ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে।

তাহার পরেই ভিতরে ষ্টার থিয়েটার প্রভৃতির বিজ্ঞাপন। থিয়েটারের আদি ইতিহাস ও বর্ত্তমানের অবস্থা প্রভৃতি লইয়াই বিশেষ প্রবন্ধগুলি আলোচিত হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয়ের কাহারও লিখিত কোনও রচনা ইহাতে নাই।

তথাপি আমাদের প্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র ও বাংলার কর্ম্মী নির্ম্মলচন্দ্রের

সম্পাদিত কাগজ বলিয়া সকলেরই প্রীতি ও ধৈর্য্যের সহিত এই পত্রিকাখানি ক্রয় ও পাঠ করা অসঙ্গত হইবে না।

কেবলমাত্র নাট্যশালা ও নাট্যশিল্পেরও আলোচনা লইয়া মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হওয়া এদেশে প্রয়োজন।

কেয়া—মনে হয় মাসিকপত্র। সম্পাদক, পরিচিত কবি শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। প্রতি সংখ্যা ৶০, বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৵০

সম্পাদক তাঁহার পত্রে জানাইতেছেন,—সমস্ত রাজসাহী বিভাগের মধ্যে আর একখানিও মাসিক পত্রিকা নাই, নাটোর হইতে এরূপ একখানা কাগজ বাহির করা তাঁহাদের নিতান্ত দুঃসাহসিকতা।

রাধাচরণবাবু বহুকাল ধরিয়া প্রবাসী প্রভৃতি অনেক মাসিক পত্রিকায় কবিতা লিখিতেছেন। মফঃস্বলে থাকিয়া তাঁহার এই চেষ্টা প্রশংসনীয়।

আমরা প্রথম সংখ্যা "কেয়া" পাইয়াছি। ছাপা, কাগজ, চেহারা, কাগজখানির কিছুই ভাল নয়। সহরে থাকিবার অনেক সুবিধা তাঁহাদের নাই, হয়ত বড়লোকও কেহ কাগজখানির পিছনে নাই। তাহা হইলে, কাগজখানির চেহারা অন্ততঃ ভাল হইত, নামও একটু-আধটু বাহির হইত।

কাগজখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি এবং এই পরিচয়ের সুযোগে আমরা এই পত্রিকাখানির অনুষ্ঠাতাদের আমাদের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি। বাংলা ভাষার প্রতি যদি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকে; অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যগুণে এই পত্রিকা নিশ্চয়ই স্থায়ী হইবে ও রাজসাহী বিভাগের ধনী ও বিদ্যোৎসাহীর সাহায্য ও অনুরাগ আকর্ষণ করিবে।

বাংলার প্রত্যেক সহরে বা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে তাহারই নিজস্ব কাহিনী, স্মৃতি ও মর্ম্মবাণী লইয়া অন্ততঃ এক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। যে জাতির আপন ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা না বাড়িবে সে জাতি আর কিছুতেই বাড়িতে পাইবে না।

নাটমন্দির—কবি সুবোধ রায় লিখিত তিনটি কথা-নাট্য। দাম মাত্র একটাকা। বঙ্গবাণী, বিজলী ও উপাসনায় এই লেখাগুলি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই কথা-নাট্যগুলি কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে অভিনীতও হইয়া গিয়াছে।

আজকাল বাংলা ভাষায় কথা-নাট্য বড় প্রকাশিত হয় না; এ-রকম ছোট ছোট কথা-নাট্যের বিশেষ অভাব ছিল। পরিবারে, বিদ্যালয়ে বা অন্য কোনও উৎসব

উপলক্ষে ছোট ছোট নাটক বা কথা-নাট্যের প্রয়োজন হয়। এই কথা-নাট্যের ভিতর দিয়া একাধারে আনন্দ ও শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

এই পুস্তকের কথা-নাট্যগুলি ভাষায়, ব্যঞ্জনায় ও আদর্শে বাস্তবিকই সুন্দর হইয়াছে।

নাট-মন্দিরের প্রচ্ছদপটখানিও পরিকল্পনায় ও অঙ্কনে চমৎকার হইয়াছে।

এই পুস্তক খানির রচনা গুলি অভিনয় করিতেও যেমন সুবিধা, পাঠ করিতেও তেমনি উপভোগ্য।

প্রিণ্টার্—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, "বাণী প্রেস"
৩৩এ মদনমিত্রের লেন, কলিকাতা।

পৌষ, ১৩৩১ সাল] [দ্বিতীয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

কল্লোল

অমর সমাধি

—শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত।

মৃত্যু মোরে ডাকে !
কত আশা অনুমান, কত ইচ্ছা ভয়
বক্ষ ঘিরি' নিত্য জাগি রয়,
সে-সব আবরি' আজ সমাপ্তির যবনিকা ঢাকে !
মৃত্যু মোরে ডাকে !
বসন্তের রঙীন উষায়
মৃত্যু মোর হাতে দিয়ে যায়
পীত-স্নিগ্ধ নিমন্ত্রন লিপি। তারপর অপলক চোখে নিশিদিন
মোর পানে চেয়ে থাকে বিরাম বিহীন !

কত বর্ণে গন্ধেভরা
পত্রে-পুষ্পে সুশোভিত এই বসুন্ধরা
তারে ঘিরি' ছয় ঋতু নেচে নেচে চলে
নানা কুতুহলে ;—

বৈশাখের তপ্ত-রাঙা ধুলির ধ্বজায়
তপস্বিনী ধরণীরে গৈরিকে সাজায়
কাছে টানি' বলে কানে কানে,—
'আমি আজো বেঁচে আছি, আছি এইখানে।'
তারপর আকাশের কোনে-কোনে মেঘ জমে আসে,
কা'র কথা মনে পড়ে, কা'রে ভালবাসে
মনের বিধবা-বধু, কা'রে যেন চায়
শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর সন্ধ্যায়!
বেদনার ভাষা
আজিকে পাইল রূপ নিয়ে তার উন্মত্ত দুরাশা,
তমালের কালো ছায়া ঘিরে
কোন্ স্মৃতি দীর্ঘশ্বাসে কাঁপে ধীরে ধীরে!
মনে হয়—কবে কোন্ বিস্মৃত-স্বপনে
কা'রে যেন পেয়েছিনু; প্রাণের বন্ধনে
কা'রে যেন বেঁধেছিনু; সজল বাতাস
আজ আনে বারে বারে তাহার আভাষ!
আবার শরতে শুনি আগমনী-বাদ্য ওঠে বেজে
আনন্দের জয়ধ্বনি তার মাঝে ওঠে নেচে নেচে;
ফুলের সুবাসভরা বহে বায় মধুর বাতাস
মনে জাগে কত অভিলাষ।
কতদিন সাধিয়াছি কহেনি'ক কথা!
আজ তাই ঐ হোমানলে ব্যথা জ্বলে, জ্বলে সেই ব্যথা—
তবু তারে ভালবাসি!
আজ আমি শুনিতেছি ঘন-ঘন বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী
ব্যর্থতার হাহাকার মাঝে;
আমারে করিল রাজা এই বেদনা যে!
থাক্ থাক্ গ্লানিভরা যৌবনের এই ব্যথা এই অশ্রুজল
বুকের দুলাল সম। কিছুই ত হয় নি বিফল,
তার সে আঘাত
আজি নব-জন্ম-দিনে যেন মোর শুভ আশীর্বাদ!

না-না, আমি মরিব না,
আবার আসিব ফিরে। প্রিয়া লাগি' মোর দিন গোনা
কভু নাহি শেষ হবে ;
তার মাঝে রবে—
আমার এ ব্যথাখানি বিস্ময়ে ভরিয়া।
মোর এই হিয়া
আজ যেন কা'র সাড়া পায়,
যায়-যায় মোরে ডেকে যায় !
মৃত্যু ?—মৃত্যু ওকি ?—না না, এযে মোর অতি-চেনা মুখ !
নাহি ভয়, নাহি কোন দুখ
অনন্ত কল্যাণ এযে, অভয়ার সান্ত্বনা আশ্বাস,
ঐ, ঐ বুকে পাই যেন ঐ শীতের নিশ্বাস !
মাগো !—এ কি শান্তিময় স্নেহময় তোমার পরশ
দুর্ব্বল হৃদয়ে মোর জাগায় হরষ ;
শিরায় শিরায় একি উন্মাদনা তোলে !
তার মাঝে দোলে
প্রাণের বাসনারাশি ; যারে নিয়ে সৃষ্টি করি মনের মতন
আনন্দের অপূর্ব্ব ভুবন।

হায়, এই সব ফেলে তবে
আজ মোরে চলে যেতে হবে !
ফুরাতে না চাহে তবু ক্ষুদ্র এই প্রাণ
অতৃপ্তির বুভুক্ষার গান
বক্ষ আরো ক্ষুব্ধ করি' তোলে !
কি যে স্নেহ, কি মায়ায় বাঁধিয়াছি কঠিন শৃঙ্খলে
এ-বিশ্বের প্রতি ধূলিটিরে।
না-না, আমি মরিব না, আবার আসিব ফিরে।
মরণেই জীবনের সব শেষ হবে ?
মরণের হাতে হবে মানুষের পরাভব তবে ?

মিথ্যা কথা !—এ পৃথিবী রয়ে গেল ঋণী মোর কাছে ।
আমার বেদনার মূল্য আছে, আছে ।
সেই ঋণ শুধিবে না সে ?
শুনি শুনি বাতাস আকাশে
গান গেয়ে বলে যায়—'পাবে ওগো, পাবে তুমি তাকে
অনাদি অনন্তকাল চাহ তুমি যাকে,
গোপনে রেখেছ যারে হৃদয় আসনে,
স্বপনে স্বপনে
যারে তুমি দেখিয়াছ জীবনের সাথে,
পাইবে তাহার দেখা নবীন প্রভাতে ।'
আমি মরিব না, রহিব বাঁচিয়া ।
সে কোন্ নক্ষত্রপুঞ্জে, কোন্ গ্রহলোকে
প্রতীক্ষায় রহিব চাহিয়া
তব আসা-পথপানে চেয়ে । এ ভূলোকে
বাতাসের কানে কানে রেখে যাব সেই এক কথা
যদি কোন দিন মোর লাগি' কাঁদ তুমি, পাও বুকে ব্যথা
আমার অভাব যদি কাঁদে হিয়া মাঝে
আবার আসিব ফিরে, রব কাছে কাছে
তোমারে শুনাতে গান, তোমারে বাসিতে ভাল নূতন করিয়া
আমি মরিব না, রহিব বাঁচিয়া ।

* * * *

অনাদি-উষার মত তুমি মোর প্রিয়া,
অশ্রুজল ফেল যদি কোন দিন মোর লাগি' কাঁদি'
অসমাপ্ত জীবনের সেই হবে অমর সমাধি ।

পুরুষ

—শ্রীরাধারাণী দত্ত।

পুরুষ যে-দিন প্রথম ধরার বুকে চোখ মেলে চাইলে, দেখ্‌তে পেলে সবার প্রথমেই সে—মায়ের হাসি মুখ। প্রথম যখন সে হাত বাড়িয়ে মানুষের স্পর্শ অনুভব করতে চাইলে, হাতে পড়্‌ল তার—প্রথমেই মায়ের অমৃত-উৎস বুক। প্রথম আস্বাদন করলে সে মায়েরই বুকের সেই ক্ষীরধারা! প্রথম সে কানে শুনলে—মায়েরই মধুকণ্ঠ-নিঃসৃত ঘুম-পাড়ানী গান।

উপরে সমগ্র সৌরজগতের দিকে একবার, নীচের বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে একবার সে অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখ্‌লে; তারপর যখন সে ফিরে চেয়ে দেখ্‌লে আর একবার তার মায়ের দিকে, তার সেই অকলুষ দৃষ্টিতে নারীই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে উচ্চ ও মহানরূপে প্রতিফলিত হ'ল।

ভক্তি-নম্র বিনতির সুর রোদনে রূপান্তরিত হয়ে পুরুষের কণ্ঠ দিয়ে প্রথম নির্গত হ'ল—প্রথম বাণী উচ্চারিত হ'ল—মা—মা—মা!

পুরুষ চলতে শিখ্‌লে, খেলতে শিখ্‌লে। বাইরের আলো ও ছায়া তখন তার শরীর ও মনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। নারীর প্রতি পুরুষ চেয়ে দেখ্‌লে। বার বার দেখে বললে—"নারী আমাদেরই সমান! আমাদের চেয়ে ত বড় নয়!"

পুরুষ যুদ্ধ করতে শিখ্‌লে। পেশী-পুষ্ট লৌহবৎ দৃঢ় দেহ, সবল বাহু। শক্তির মত্ততায় মাতাল হ'য়ে পুরুষ এবার নারীর প্রতি অবহেলার সঙ্গে চেয়ে দেখ্‌লে—ওঃ! অনেক নীচে—অনেক নীচে তার নারী! ছিঃ ছিঃ কি অসহায়—কি দুর্ব্বল ওরা!

পুরুষের প্রদীপ্ত চক্ষুদ্বয়ে অবজ্ঞার ছায়া এসে উঁকি মারতে লাগ্‌ল। ঈষৎ কুঞ্চিত অধরোষ্ঠে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের মৃদু হাসা-রেখা ফুটে উঠ্‌ল!

পুরুষের শক্তির জোয়ার-ভাঁটা সুরু হয়েছে। রক্তের তেজ ক্ষীণ হয়ে

আসছে, উষ্ণতা ক্রমেই কম্‌ছে; পেশীসমূহ শ্লথ ও চর্ম্ম শিথিল হ'চ্ছে। শারীরিক ও মানসিক সম্পদের ভাণ্ডারে তার অনটনের সূত্রপাত দেখা দিয়েছে, চাইলেই সব সময়ে সবটাই ঠিকমত পাওয়া যায় না!

নারীর দিকে পুরুষ চেয়ে দেখ্‌লে—তাইত! এরা যে যেমনটি ছিল ঠিক তেম্‌নিটিই রয়েছে! . . . এরা যদি এইবার উঠে দাঁড়ায়? নিজের নিঃশেষিত-প্রায় শক্তির ভাণ্ডারে দৃষ্টি পড়ায় পুরুষ শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ল!

হাত পা রজ্জুবদ্ধ ক'রে, গলদেশে গুরুভার শৃঙ্খল পরিয়ে, তার কণ্ঠ রুদ্ধ ক'রে, অন্ধকার, গৃহ-কোনে জড়পিণ্ডবৎ নারীকে ফেলে রেখে পুরুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লে!

পুরুষের বার্দ্ধক্য এসেছে। সে শক্তিশূন্য, জরায় অবসন্ন। তার কৃষ্ণ কেশ-রাশি রজত-ধবলে পরিণত হয়েছে। প্রখর কজ্জ্বল চক্ষু-তারকা আজ নিষ্প্রভ! নিরাশায় অবসাদে তার বজ্রবক্ষ যেন চূর্ণ পাষাণস্তূপে পরিণত হয়েছে! হায়! তার সে অমিত তেজ, সে শক্তি আজ কোথায়?

যে শক্তির নেশায়, যে শক্তির দম্ভে সে একদিন সকলই তুচ্ছ করেছিল, নারীকে দুর্ব্বল দেখে অবহেলাভরে যে তাকে নিজের শক্তির চাপে পায়ের নীচে নিষ্পেষিত ক'রে রেখেছিল, কোথায় আজ তার সেই শক্তি?

পুরুষ তার চারিদিকে আকুল হ'য়ে চেয়ে দেখ্‌লে। অন্ধকার গৃহ-কোণে তারই নিজের পদতলে মৃতবৎ ও কি পড়ে? . . . জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ অথচ রবিকরের মত উজ্জ্বল—আবর্জ্জনায় আবৃত মণি-খণ্ডের মত ম্লান অথচ দ্যুতিসম্পন্ন! পুরুষ বিস্মিত আগ্রহে তাকে স্পর্শ করলে! একি! শরীরের সমস্ত নির্জ্জীবতা, জড়তা, দুর্ব্বলতা, অবসাদ, সব সরে গিয়ে, একি নূতন সজীবতা তার সর্ব্বাঙ্গে জেগে উঠ্‌ল!

পুরুষের শক্তির নেশা, স্বার্থের নেশা, ভোগের নেশা প্রশমিত হয়েছে। তার চোখে জল! ক্ষুদ্র স্বার্থ ক্ষুদ্র শক্তি, সুখের জন্য সে তার বৃহত্তর সম্পদের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। সর্ব্বশক্তির উৎস, সর্ব্বশক্তির কেন্দ্র-মুখে সে তার বিপুল অবহেলায় পাষাণভার চাপা দিয়ে শক্তির অফুরন্ত প্রবাহের গতিরোধ করেছে!

পুরুষ সে পাষাণভার অপসারিত করবার চেষ্টা করলে—একবার দু'বার—তিনবার—বহুবার। কিন্তু আজ তার সে শক্তি নাই, যে শক্তিতে সে নিজেই

একদিন এই পাথরকে ঠেলে এনেছিল! পুরুষের নীচ স্বার্থের কুটীলতা আজ সে পাষাণখণ্ডকে আরও দৃঢ়-সংলগ্ন করে দিয়েছে! . . .

হায়, কি ভুলই সে করেছে! কিন্তু ভুল বোঝ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই হতভাগ্য পুরুষের দৃষ্টিপথে অন্ধকারের কালো পর্দ্দাখানি নেমে এল! কানের কাছে পায়ের ঘণ্টা ঘন ঘন বেজে উঠ্‌ল। মৃত্যু-বিবর্ণ পুরুষের সেই পাণ্ডুর বিকম্পিত ওষ্ঠাধর ভেদ ক'রে তার রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ হ'তে অতি ধীরে তখন আর একবার ধ্বনিত হ'ল—মা—

ধরাকে সরা জ্ঞান করা আমরা সকলেই উপহাসের বিষয় মনে করি, কিন্তু সরাকে ধরা জ্ঞান করা আমাদের কাছে একটা মহৎ জিনিস। কারণ ও-মনোভাবটি না থাকলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না।

'হাল খাতা'

কমলা কেবিন

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

এক এক ক'রে অনেক হাত বদলে, ঘনশ্যামের হাতে পড়ে লক্ষ্মীবাজারের 'কমলা কেবিনের' হঠাৎ শ্রী ফিরে গেল আশ্চর্য্য রকমে। দরমার ওপর মাটির সব প্রলেপই প্রায় ফেটে উঠে গিয়ে যে দেয়ালগুলো লোলচর্ম্ম স্থবিরের মত কোন রকমে এত দিন খাড়া হয়েছিল, সেগুলো লাল নীল কাগজের তালিতে সমৃদ্ধ না-হোক্ একটু ভদ্রগোছের চেহারা পেলে। মান্ধাতার আমলের কেরাসিন কাঠের লম্বা বেঢপ্ টেবিলটার বদলে অয়েলক্লথের ঢাকনা-আঁটা একটা গোল টেবিল বস্‌ল ঘরের মাঝে এবং সেই সনাতন বেঞ্চির স্থানে দেখা গেল টিনের ও বেতের চেয়ার। শুধু তাই নয়, কাণা-ভাঙা হাতল-ভাঙা দাগ-ধরা কলাই-করা এনামেলের পেয়ালা ডিশ-গুলোও একদিন অন্তর্হিত হয়ে তার জায়গায় এল ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে চিনে-মাটির সরঞ্জাম! যেখানে কেরাসিন-তেলের বাতিটা ঝুল্‌ত, সেখানে বিজ্‌লী-বাতি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং দোকানের সামনে বৃহৎ কাঠ-ফলকে, বড় চায়ের পেয়ালা হাতে কিম্ভূতকিমাকার বৃদ্ধের ছবির পাশে বড় বড় অক্ষরে লাল রঙে লেখা 'কমলা কেবিন'! সাবেক টিনের পাতের গৌরবহীন অস্তিত্ব বোধ হয় একেবারেই বিস্মৃত হয়ে সগর্ব্বে আপনার নবসৌভাগ্য ঘোষণা করলে।

লক্ষ্মীবাজারে লক্ষ্মীর কৃপাবৃষ্টি হয়ত অনেক খানেই ছিল কিন্তু তাঁর শ্রীর পরিচয় সেখানে বিশেষ পাওয়া যেত না, ঘনশ্যামের দোকানের পাশেই শ্রীদাম মুদি শ্রী ও সৌন্দর্য্যকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ক'রে তার সাত-হাতি নোংরা তেলচিটে কাপড়টি পরে তার সঙ্কীর্ণ কাঠের চৌকিতে বসে তেল-নুন ডাল-চালের বিশৃঙ্খলার মাঝে নির্ব্বিকার মনে দোকানদারী করত এবং তার সাত পুরুষ এম্‌নি করেই দোকানদারী ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে গেছে।

পথের ও-পাশে সারি সারি যে মুচির আড্ডাগুলি মজবুত জুতোর জন্যে বহুদিন ধরে খ্যাতি অর্জ্জন ক'রে এসেছে; কুশ্রীতা, অপরিচ্ছন্নতা, ও দুর্গন্ধই তাদের

প্রধান বিশেষত্ব ছিল, তাদের জুতোর বিশেষত্ব ও শ্রী যতই থাক্ না কেন। কিন্তু সব চেয়ে ঘনশ্যামের অসহ্য মনে হ'ত, তার দোকানেরই মুখোমুখি পথের ও-পারে পানের দোকানের নীচে বুড়ো মেহের দর্জ্জির গর্ত্ত।—গর্ত্ত ছাড়া পানের দোকানের নীচের সেই অন্ধকার পাঁচ হাত উঁচু গহ্বরের মত কুটুরীটিকে আর কিছু বলা চলে না। মেহের যেখানে খুশী সেখানেই থাকুক, তার জন্যে তার ওপর বিরক্ত হবার অধিকার হয় ত ঘনশ্যামের ছিল না কিন্তু মানুষকে অমন ছুঁচোর জীবন যাপন করতে দেখ্‌লে মনের একটু অনিচ্ছাকৃত ধিক্কার হয় ত আসেই এবং তার সঙ্গে হয় ত আরও কিছু আসে। ঘনশ্যামের দোকান থেকে মেহেরের অবিশ্রান্ত সেলাই-এর কল চালাবার একঘেয়ে শব্দ শোনা যেত এবং মেহেরের 'গর্ত্তের' মেঝে, পথের চেয়ে নীচু হওয়ার দরুণ শুধু তার দেহের ওপরের অংশটুকুর অবিরাম ব্যস্ততা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অন্ধকারের ভেতর থেকে অস্পষ্টভাবে চোখে পড়্‌ত। বিশেষত সমস্ত লক্ষ্মীবাজারের মধ্যে সাজ-সজ্জা আয়োজন ও আড়ম্বরের বহরে একটা সাড়া পড়িয়ে দিলেও যখন কিছু দিন থেকে ঘনশ্যামের ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়্‌তে সুরু হয়েছিল তখন থেকেই খদ্দেরের জন্যে প্রতীক্ষা কর্‌বার দীর্ঘ অবসরে মনটা আপনা থেকেই সেলাইএর কলের একটানা বিরক্তিকর শব্দে, ঐ অপরূপ গহ্বর ও তার অধিবাসীর প্রতি আকৃষ্ট হতে আরম্ভ হয়েছিল।

বুড়ো মেহেরকে এ পর্য্যন্ত তার 'গর্ত্তের' বাইরে বেরুতে দেখ্‌বার সৌভাগ্য ঘনশ্যামের কখন হয় নি। ভোর বেলা 'কমলা কেবিনে'র দরজা খোল্‌বার আগেই কখন যে বুড়ো তার সুতো-বাঁধা চশমাটিকে নাকে দিয়ে কলে এসে বস্‌ত তা কেউ কোন দিন জান্‌তে পারে নি। রাত্রে 'কমলা কেবিন-এর দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে ফের্‌বার সময়ও দেখা যেত, বুড়ো হ্যারিকেনের আলোয় নিবিষ্ট মনে হয় ত কাঁচি চালাচ্ছে একরাশ কাপড় নিয়ে! ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই খদ্দেরহীন দোকানে বসে নিয়ত ঐ কলের ঘর্ঘর, কেন বলা যায় না, ঘনশ্যামের অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছিল। তার এ ধারণার মূলে কোন ভিত্তি না থাক্‌লেও তার মনে হ'ত, সামনের ঐ জীবন্ত-সমাধিস্থ অমানুষিক বুড়ো ও তার অন্ধকার স্যাঁৎ-সেঁতে গহ্বরের আত্র মৃত্যু-শীতল স্পর্শেই তার সমস্ত চেষ্টা ও উৎসাহ তার ব্যবসার সমস্ত সম্ভাবনা ও আশা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে!

'কমলা কেবিন' নামটা কে কবে কি জন্যে রেখেছিল, সে ইতিহাস হয় ত খুঁজ্‌লে পাওয়া যেতে পারে। শুধু এই নামটির প্রলোভনে চঞ্চলা কমলাকে বেঁধে ফেলাই হয় ত তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কমলা যে শুধু ঐ নামের অর্ঘ্যে প্রসন্ন হন নি

'কমলা কেবিন'-এর এতবার হাত বদলানই তার প্রমাণ। নানান হাত থেকে ফস্‌কে কখন বা আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে 'কমলা কেবিন' অনেক দুর্দ্দশার পর যখন ঘনশ্যামের হাতে অমন শ্রী ও গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠ্‌ল তখন কেউ ভাবে নি এবারেও সে তার নামের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারবে না—ঘনশ্যাম ত একেবারেই না।

ঘনশ্যাম সংসারে অনভিজ্ঞ নেহাৎ 'কাঁচা' ছেলেও ছিল না। সে নিজের সম্বন্ধে যে গল্প বলে বেড়াত তা বিশ্বাস করলে স্বীকার করতেই হয় যে, তার মনের ও দেহের গাঁথুনি সাধারণ লোকের চেয়ে একটু মজবুতই ছিল। মামার-বাড়ীর অনাদর অত্যাচার থেকে যে অনাথ ছেলে বার বছর বয়সে ছটি আনা মাত্র পয়সা ট্যাঁকে নিয়ে অচেনা সংসারে ভাগ্য-পরীক্ষা করতে বেরিয়ে পড়তে পারে ও সসম্মানে পঁয়ত্রিশ বৎসরের সমস্ত ঝড়-ঝাপ্‌টা অতিক্রম ক'রে আস্‌তে পারে, তাকে অনভিজ্ঞ বলা চলে না এবং তার সমস্ত সৌভাগ্যের মূলে দৈবের অনুগ্রহ আরোপ করাও চলে না। দুনিয়ার অগ্নি-পরীক্ষার পোড় খেয়ে সে একেবারে ঝামা হয়ে বেরিয়েছে।

সে ট্রান্সভালে কুলির কাজ করেছে, আবার কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ির সহিস-গিরিও করেছে; ট্রামের কণ্ডাক্টার হয়েছে, ইট্‌খোলার সরকারি করেছে এবং আরও হয় ত অনেক কিছু করেছে যা সে নিজেও বলতে পারে না। অবশেষে কিছু পুঁজি জমিয়ে 'ব্যবসাই উন্নতির একমাত্র পথ' ঠিক ক'রে লক্ষ্মীবাজারের 'কমলা কেবিনের' স্বত্ব কিনেছে। কিন্তু এ হেন ঘনশ্যামও তার পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রকাশিত ও প্রচ্ছন্ন সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে 'কমলা কেবিনের' পরিচালনা ক'রে সুবিধা করতে পারছিল না!

শূন্য 'কমলা কেবিন' তার সমস্ত সাজ-সজ্জা নিয়েও যখন খদ্দেরের আশায় বিফল-প্রতীক্ষা করত পথের দিকে চেয়ে, তখন কোন রকম নাম বা সাইনবোর্ড না-নিয়েও লক্ষ্মীবাজারের রাস্তার প্রান্তের যে জীর্ণ ঘরের সঙ্কীর্ণ চায়ের দোকানটি শ্রী ও পরিচ্ছন্নতার সকল দাবী অগ্রাহ্য করেও খদ্দেরের ভিড়ে স্থান সঙ্কুলান করতে পারছিল না, তার এই আশ্চর্য্য সৌভাগ্যের কারণ ঘনশ্যামের একেবারে অজ্ঞাত ছিল না।

প্রথম প্রথম নূতনত্ব ও সাজ-গোজের আকর্ষণে যে রকম ভিড় হ'তে আরম্ভ হয়েছিল, তাতে কারবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঘনশ্যাম বেশ নিশ্চিন্তই হয়ে গেছ্‌ল। কিন্তু যেদিন প্রথম এক হিতৈষী বন্ধু সকলবলে নাগাদ আধ ঘণ্টা কারবার 'ফেল' হওয়ার কারণ সম্বন্ধে ঘনশ্যামের সঙ্গে বিস্তর গবেষণামূলক আলোচনার পর ধার দেওয়াই যে ব্যবসার সর্ব্বনাশের কারণ এই সত্য নিঃসংশয়ে প্রমাণ ক'রে সামান্য

চারটা টাকার আহার্য্যের সদ্ব্যবহার ক'রে দামটা বাকী রাখ্‌তে চেয়েছিলেন এবং ঘনশ্যাম তাঁরই উপদেশটা বিনীতভাবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সেই দিন থেকেই ব্যবসার ভাঁটার সূত্রপাত।

ভিতরে হিতৈষী বন্ধু কোন কারসাজী করেছিলেন কিনা বলা যায় না কিন্তু তার পর দিনই হঠাৎ সিগারেটের ধোঁয়া, ঘোড়দৌড় ও অফিসের বড়-সাহেব, বড়বাবুর গল্পে যাঁরা 'কমলা কেবিন' সরগরম্ ক'রে রাখ্‌তেন, তাঁদের অনেককেই দেখা গেল না! আগের দিনের হিতৈষী বন্ধু একসময়ে এসে রুক্ষ স্বরে বল্‌লেন, 'নিন্ মশাই টাকা নিন্, চারটে টাকা নিয়ে আমি পালিয়ে যেতুম কিনা—হেঁঃ!"

ঘনশ্যাম সত্যই এত তাড়াতাড়ি পাওনা আদায় হবে ভাবে নি; এমন কি এ জন্য বেশ একটু বেগ পেতে হ'বে এই বিশ্বাসই তার ছিল; সুতরাং একটু লজ্জিতই সে হয়ে পড়্‌ল। বন্ধু একটা টাকা ঘৃণাভরে ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌লেন, "নিন্—"ঘনশ্যামের লজ্জা এবার কেটে গেলে। সে বল্‌লে, "বাকী তিন্‌টে?—"

বন্ধু বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, "দেব মশাই, আমরা চোর নই—"

ঘনশ্যাম টাকাটা বাজিয়ে বল্‌লে, "কিন্তু এটা যে অচল!"

"অচল? কর্‌-করে নতুন টাকা কাল সকালে পেয়েছি! অচল?—অবাক্ কর্‌লেন যে ঘনশ্যাম বাবু!"

"এই দেখুন না আওয়াজটা।"

"খুব দেখেছি মশাই, সাত বছর কারেন্সিতে কাজ কর্‌লুম, শুঁকে টাকার গন্ধ বল্‌তে পারি—টাকার আওয়াজ চিনি না?" বলে হিতৈষী বন্ধু টাকাটা নিজেই বাজিয়ে যে দুজন ভদ্রলোক টেবিলের অপর প্রান্তে চা খেতে বসেছিলেন তাঁদের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "কোথায় আওয়াজটা এর খারাপ বলুন ত মশাই?"

'দশ-চক্রে ভগবান ভূত' হবার জোগাড় দেখে ঘনশ্যাম চটে উঠে বল্‌লে, "আমি দেখ্‌ছি অচল, আপনারা বল্‌লেই শুনব মশাই? আমি ও-টাকা নেব না, বদ্‌লে দিন।"

টাকাটা পকেটে পুরে বন্ধু বল্‌লেন, "তা হলে নাচার মশাই, আপনি দিনকে যদি রাত করেন তাহলে আর কি করা যায় বলুন।" বলে তিনি বাইরে পা বাড়ালেন। এই অন্যায় অত্যাচারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘনশ্যাম তীব্রকণ্ঠে বল্‌লে, "তাহলে কি টাকা চারটে দেবেন না নাকি? চার টাকার জায়গায় ত দিতে এনেছেন একটি মাত্র টাকা—তাও আবার অচল!"

"কখনও অচল নয়!"

"আল্‌বৎ অচল, আপনি ভালোয় ভালোয় টাকা দেবেন কি না?"

বন্ধু সিঁড়ি থেকে রাস্তায় নেমে রুখে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "কি মারবেন নাকি? বাদ্‌লা! ফণে!—ডাক্ ত বাদ্‌লা, ফণেকে, একবার মজাটা দেখি।"

দোকানের সাম্‌নে কলহের লোভে যে সব পথিক জড় হয়েছিল তাদের মধ্যে বাদ্‌লা বা ফণে কে বাছবার উৎসাহ বিশেষ দেখা গেল না, সম্ভবত বাদ্‌লা ও ফণের পৌরুষ সম্বন্ধে তাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বাদ্‌লা ও ফণে সহসা আবির্ভূত না হলেও দোকানের সামনে একটা কেলেঙ্কারী হ'লে ব্যবসারই ক্ষতি হবে ভেবে ঘনশ্যাম বল্‌লে, "আমি ত মারামারি করতে বসি নি মশাই, আপনি যা খেয়েছেন তার দামটা দেবেন, বাস্ চুকে গেল!"

"মারামারি করতে আসেন নি ত কি? একেবারে রুখে এসেছেন, আবার মারামারি কাকে বলে? আচ্ছা এই মনে রাখ্‌বেন, লক্ষ্মীবাজারে দোকান করা আপনার না ঘুচোই ত আমার নাম প্রতাপ রায় নয়! জলে বসে কুমীরের সঙ্গে বাদ্ সাধা বার ক'রে দেব" বলে লক্ষ্মীবাজারের কুম্ভীররূপী প্রতাপ রায় ঘনশ্যামের পানে অগ্নিদৃষ্টি হেনে প্রশংসমান দর্শকদের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু ব্যাপার আরো অনেকদূর গড়াল। জজকোর্টের বিখ্যাত উকিল শ্যামরতন বাবুর মুহুরি গোলক বাবু সন্ধ্যে বেলায় চা খেতে এসে অনেক ভূমিকার পর পাড়্‌লেন, "আর একি শুনি ঘনশ্যাম বাবু! আপনার দোকান হওয়া অবধি ত ছেড়েই দিয়েছি ওখানে যাওয়া, নেহাৎ বৈরাগীটা দাদা দাদা করে, আর ডেকে আজ আমাকে যেতে অনুরোধ করলে তাই একটু বসেছিলুম, তা আপনি নাকি সামান্য চারটে টাকার জন্যে প্রতাপ রায়কে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছেন? আমি ত বিশ্বাসই করি নি, আমি বললুম, ''আরে ঘনশ্যাম বাবু নেহাৎ ভদ্রলোক, চারটে টাকার জন্যে এ রকম সে কখন করে নি—"

ঘনশ্যাম বিরক্ত হয়ে গম্ভীর স্বরে বল্‌লে, "চারটে টাকা পাওনা ছিল তাই চেয়ে ছিলুম, এতে যদি অপমান করা হয় ত হয়েছে।" গোলক বাবু বল্‌লেন, "কাজটা ভাল করেন নি ঘনশ্যামবাবু, এ পাড়ার ছেলেগুলো যা গোঁয়ার গোবিন্দ—যাক্ য়াক্-টাক্ চেয়ে একটা মিটমাট ক'রে ফেল্‌বেন।"

একটা কড়া জবাব জিভের আগায় এলেও ঘনশ্যাম নিজেকে দমন ক'রে চুপ করে রইল।

মুহুরি মশাই খানিক চুপ ক'রে চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বল্‌লেন,

"তা ওদেরও দোষ আছে বৈকি; বলে কি, আপনি খদ্দের বশ করবার জন্যে চায়ের সঙ্গে কোকেন মেশান, আর কাট্‌লেটে নাকি কুকুরের মাংস দেন !—"

এবারে ঘনশ্যাম আর চুপ ক'রে থাকতে পার্‌লে না। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্‌লে, "বে শা—"

কথাটাকে শেষ না হতে দিয়েই গোলক বাবু বল্‌লেন, "আরে চুপ মশাই, গালাগাল দেবেন না। বে-পাড়ায় এসে শেষকালে কি মার-ধোর খাবেন ! তাগ্যিস্ আমার সামনে বলেছেন তাই রক্ষা ! অন্য কেউ শুনলে এতক্ষণ কি আর ওদের কানে পৌঁছোতে বাকী থাক্‌ত ?"

ঘনশ্যাম অত্যন্ত রেগে বল্‌লে, "আমি কি ডরাব নাকি ? শুনুক না যত শুন্‌তে পারে।"

"আরে থামুন মশাই, মাথা গরম করবেন না" বলে তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালা শেষ ক'রে, দামটা তাড়াতাড়িতেই বোধ হয় দিতে ভুলে গোলক বাবু বেরিয়ে গেলেন এবং খানিক বাদেই বৈরাগীর দোকানের দল এসে শাসিয়ে গেল, গাল-গালাজ দেওয়ার মজাটা তারা যদি দোকানে আগুন ধরিয়ে টের না পাইয়ে দেয় তা হলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর ঘনশ্যাম চায়ের দাম চার পয়সা থেকে তিন পয়সা এবং শেষে দু' পয়সা ধার্য্য ক'রে এবং চপ্-কাট্‌লেটের আকার দেড়া ও ক্রমশ দ্বিগুণ ক'রেও কিছু সুবিধা করতে পার্‌লে না ! বাঙালীর মধ্যে একতা নেই এই অপবাদ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, লক্ষ্মীবাজার তা ভালো করেই প্রমাণ ক'রে দিলে। আগুন ধরিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা তারা কার্য্যে পরিণত করে নি বটে কিন্তু দোকানের ওপরে ও আশে-পাশে প্রতিদিন সকালে নানাপ্রকার অপ্রীতিকর আবর্জ্জনা দেখা যেতে লাগ্‌ল এবং দোকানের দরজাটা প্রত্যেক দিন সকালে খবরের কাগজের 'পোষ্টারে'র মত ঘনশ্যামের পক্ষে উত্তেজক ও অস্বস্তিকর নানা রচনায় শোভিত হতে সুরু হ'ল।

দোকান চালান ক্রমশ দুষ্কর হয়ে উঠ্‌ল। সারাদিন খদ্দেরের প্রত্যাশায় বসে থাকতে ঘনশ্যামের মেজাজ খিট্‌-খিটে হয়ে উঠছিল। কারণে অকারণে বিরক্তি আসে, বিশেষত পথের ওপারের গর্ত্ত থেকে মেহের দর্জ্জির অবিশ্রান্ত একঘেয়ে কল-চালানর অসহ্য শব্দ এবং তার কুশ্রীতা অস্বাভাবিকতা গাত্র-দাহকর মনে হয়। মনের কোন্ দুর্জ্জেয় নিয়মে কে জানে ব্যবসায়ে ব্যর্থ হওয়ার দরুণ তার

সমস্ত ক্ষুব্ধ রুদ্ধ ক্রোধের জ্বালা বেরুবার কোন পথ না পেয়ে সামনের ঐ নিরুপদ্রব নির্দ্দোষ বুড়োর ওপরই অকারণে আক্রোশরূপে সঞ্চিত হতে আরম্ভ হয়েছিল? মনের জটিল কার্য্য-কারণ এমনি বিস্ময়কর!

চুপ ক'রে বসে বসে অন্ধকার গহ্বরের মাঝে দুর্ব্বল বৃদ্ধকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার সমস্ত দেহ বিতৃষ্ণায় ভরে যেত অথচ চোখ ফেরাতেও পার্‌ত না। একটা অপ্রিয়-দর্শন কদাকার অদৃষ্টপূর্ব্ব নিরীহ কীটকে সামনে হেঁটে যেতে দেখ্‌লে মানুষের অনেক সময়ে ঐ রকম বিতৃষ্ণাই আসে হয় ত। বৃদ্ধ দিন দিন ঘনশ্যামের অসুস্থ মনে একটা অস্বস্তিকর উপদ্রব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অকারণে তার মনে হ'ত, তার ব্যবসা নষ্ট হবার আর যে কারণই থাক্, ঐ বুড়োর সাহায্যে একটা অকল্যাণকর প্রভাব তার ওপর পড়েছেই।

মানুষের মনের মধ্যে এমন অনেক অন্ধ গলি-ঘুঁজি থাকে, যেখানে যুক্তির আলোক পৌঁছোয় না।

সত্যিই ঐ অন্ধকার কুটরীর মধ্যে আবদ্ধ অথর্ব্ব বৃদ্ধের সরিসৃপের মত গতি-বিধিতে এমন একটা অস্বাভাবিকতা ছিল, যা মানুষের মনকে পীড়িত করে; কিন্তু যে পীড়নে সহজ অবস্থায় সহানুভূতির উদ্রেক হ'ত, হয় ত সেই পীড়নই ঘনশ্যামের বিরক্ত মনে ঘৃণার ইন্ধন জোগাচ্ছিল।

সে দিন সকাল থেকে বর্ষা সুরু হয়েছিল এবং দ্বিপ্রহর পার হয়ে গেলেও আকাশের ক্ষান্ত হবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। বৃষ্টির জন্যে দুপুরে বাড়ী যেতে না পারায় দোকানে বসে ঘনশ্যাম, এমন ক'রে এ দোকান শুধু শুধু খুলে রাখার নিষ্ফলতা সম্বন্ধেই বোধ হয় মনে মনে আলোচনা করছিল; হঠাৎ "হুজুর" শব্দে মুখ তুলে চেয়ে সে নিজের চোখকে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলে না। বুড়ো মেহের দর্জ্জি তার যুগ যুগান্তরের গহ্বর থেকে বেরিয়ে শিক্-ভাঙা তালিমারা, বোধ হয় মনুর সমসাময়িক ছাতিটি মাথায় দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তা পার হয়ে দোকানের রকে এসে দাঁড়িয়েছে! আজ প্রথম মেহেরকে ভাল ক'রে দেখ্‌বার সুযোগ ঘনশ্যামের মিলেছিল। বৃদ্ধের বয়স যে সত্তরের কাছাকাছি গিয়ে ঠেকেছে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তার দেহে লোলচর্ম্ম নেই, শীর্ণ কঙ্কালে কে যেন আটা দিয়ে বহু দিন অন্ধকারে বর্দ্ধিত গাছের পাতার মত অস্বাভাবিক বিবর্ণ চামড়া এঁটে দিয়েছে! মিশরের পিরামিডের ভেতর থেকে একটা 'মমি' হঠাৎ জীবন্ত জগতে বেরিয়ে এলে বোধ হয় এই রকমই দেখাত! বৃদ্ধ ক্ষীণকণ্ঠে বল্‌লে, "হুজুর এক পিয়ালা চা আর দুটুকরো রোটি যদি দেন—"

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ঘনশ্যাম এত কালের বিতৃষ্ণা ও রুদ্ধ ক্রোধের বিষ, স্বরে মাখিয়ে তীব্রকণ্ঠে বললে, "এটা কি মুসলমানের খানা খাবার জায়গা? উতারো জল্‌দি —"

মেহের চমকে ভীতভাবে পিছু হেঁটে আবার মিনতি করে বললে, "বাবু আমার নাতিন্ আজ বর্ষাতে খাবার নিয়ে আসতে পারে নি, ছটুকরা রোটি, আউর এক পিয়ালি চা হলে দুপুরের খাওয়া হয়ে যায়। আপনার পিয়ালা আমি নেব না, আমার আছে।"

এক পেয়ালা চা আর ছটুকরা রুটি দিলে ঘনশ্যামের জাত অবশ্যই যেত না এবং সত্যি কথা বলতে গেলে বিদেশে বিভুঁয়ে যাতায়াত ক'রে জাত সম্বন্ধে সংস্কারটা তার আলগাই কিছু ছিল কিন্তু মানুষের যুক্তিহীন নিষ্ঠুরতার এক এক সময় সীমা থাকে না। ঘনশ্যাম ধমক দিয়ে বললে, "হবে না এখানে, উতারো—জল্‌দি উতারো।"

বৃদ্ধ থতমত খেয়ে কম্পিত পদে নেমে গেল। যাবার সময় কুণ্ঠিতস্বরে বলে গেল শুধু, "এখানে বহুৎ মুসলমানের বাস হুজুর কিন্তু মুসলমানের হোটেল একটাও নাই, কোথায় আর যাই বলুন?"

মেহেরকে 'চুলোয় যাও' বলে বিদায় ক'রে দিলেও তার কথাটা ঘনশ্যামের মন থেকে সহজে গেল না। তারপর কয়েক দিন তার এই এক ঢিলে দুই পাখী—ব্যবসার উন্নতি ও বৈরাগীর দোকানের দলের ওপর প্রতিশোধ—মারার ফন্দিটা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করতেই কাটল

* * * *

আজকাল লক্ষ্মীবাজারে ঘনশ্যামের সে দোকান আর চেনবার উপায় নেই। বড় বড় কলাই-করা তামার ডেকচি, উনুনের ওপর সাজন মোটা মোটা রুটির গোছা ও শিককাবাবের সারের মাঝে পূর্ব্বতন 'কমলা কেবিন-এর' চিহ্নমাত্র নেই লুঙি ও পাজামা, রঙিন দাড়ি ও ভেলভেটের ওয়েষ্টকোটের ভিড়ের মাঝে গান্ধী-টুপি মাথায়, ধুতি-পরা অপেক্ষাকৃত হৃষ্টপুষ্ট ঘনশ্যাম উৎসাহে দোকানের তদারক করে; সুবিধে পেলেই বলে থাকে, "ওহে হিন্দু-মুসলমানের মিলন মিলন বলে শুধু বক্তৃতা দিলেই কি হয়, হাতে-নাতে কাজে মিলন ক'রে দেখাও—"

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্যে তার যে ঘুম হচ্ছিল না, এ কথাটা অনেক সন্দিগ্ধ মন লোক অবিশ্বাস করলেও তার যে সাহস আছে এটা কেউ অস্বীকার করে না। 'কমলা কেবিন'-কে বহুদিন আগে সাইনবোর্ডের লেখায় একটু-আধটু

পরিবর্তন ক'রে 'কামাল কেবিন' করা হয়েছিল। কিন্তু সে অনেক কালের কথা। সে সাইনবোর্ড কবে পুরোণ হয়ে চোর-কুঠরী বা চুল্লীতে স্থান পেয়েছে, দেয়ালের লাল-নীল কাগজ বহুদিন ছিঁড়ে গেছে এবং কানা-ভাঙা পেয়ালা-ডিশ ও আজকাল ঘনশ্যামের দোকানে নেই এমন নয় কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ঘনশ্যামের আর পথের দিকে চেয়ে খদ্দেরের জন্যে 'হা পিত্যেশ' ক'রে বসে থাকতে ত হয় না! এখন আর মেহের বুড়োর কলের আওয়াজ তাকে বিব্রত বিরক্ত করেও তোলে না। অন্য দিকে কান দেবার তার সময়ই নেই। এমন কি কদিন ধরে যে বুড়ো মেহেরের ছুঁচের গর্ত খালি হয়ে গেছে, নাকে সুতোবাঁধা চশমা আটকে সেখানে যে আর কেউ আধা-অন্ধকারে সেলাই-এর কলে অবিশ্রান্ত সেলাই করতে বসে না, তা বোধ হয় সে লক্ষ্যই করে নি।

মিথ্যা যখন সমাজে আস্কারা পেয়ে সত্যের সিংহাসন অধিকার ক'রে বসে, এবং রীতি যখন নীতি বলে সম্মান লাভ করে, তখনই বিদ্রূপের দিন আসে। পৃথিবীতে সব চাপা যায়, কিন্তু হাসি চাপা যায় না।

—সাহিত্যে চাবুক

স্নেহের জয়

—শ্রীরমেশচন্দ্র দাশ।

অনূ্যন যাট্ বছরের বৃদ্ধ হরিশচন্দ্র দাস যেদিন স্বুবর্ণপুরের বিখ্যাত জমিদার রায়-বংশের কাছারী হইতে দুঃখিত অন্তরে বিদায়-পত্র দাখিল করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, সে দিন বহুকালের পুরাতন জমিদার-বংশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অনেকেই অত্যাধিক শঙ্কিত হইয়াছিলেন। আজ প্রায় চৌদ্দ পুরুষ ধরিয়া রায়-বংশ যশোহর জেলার স্বুবর্ণপুর গ্রামে প্রবল প্রতাপে জমিদারী করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধি এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধিই পাইতেছিল, কিন্তু আজ দুই বৎসর পূর্ব্বে জমিদার অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায় যখন তাঁহার বিপুল জমিদারীর ভার স্বীয় দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়স্ক নব্য-শিক্ষা গর্ব্বিত পুত্র শ্রীমান্ নিখিলকুমারের হস্তে প্রদান করিয়া অকালে পরপারের আহ্বানে চলিয়া যান, সেই দিন হইতে যেন চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁহার চির-পরিচিত নামটির সার্থকতা সম্পাদনের নিমিত্ত একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মৃত্যুকালে বৃদ্ধ জমিদার তাঁহার পিতার আমলের কর্ম্মচারী হরিশচন্দ্রের উপর বিষয়-সম্পত্তি এবং পুত্রের রক্ষার ভার দিতে যে বিস্মৃত হইয়াছিলেন তাহা নহে। যাহার উপর এই রায়-বংশের জমিদারী এবং জমিদার-পুত্রের রক্ষার ভার অর্পিত হইল সেই হরিশচন্দ্র আজ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক এই রায়-বংশের জমিদারীতে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত কার্য্যাদি করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার কার্য্য-কুশলতার ও বিশ্বস্ততা গুণে সামান্য পাঁচ টাকা বেতনের চাকর হইতে প্রবল প্রতাপ জমিদার বংশের ততোধিক প্রতাপশালী সদর-নায়েব পদে উন্নীত হইয়াছেন। জমিদার অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যুর পর তিনি দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত বিশেষ পারদর্শীতার সহিত সমস্ত বিষয় এবং রায়-বংশের মান সম্ভ্রমাদি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অক্লান্তকর্ম্মী পুরুষেরই সেবায় লক্ষ্মীদেবী এ তাবৎ কাল পর্য্যন্ত রায়-বংশের সৌধমালা ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তরুণ বয়সে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী দেখিয়া নিত্য নূতন সঙ্গী আসিয়া নানা প্রলোভনে নিখিল

কুমারের মস্তিষ্ককে বিকৃত করিয়া ফেলিল। প্রথম প্রথম নানা প্রকার আপত্তি প্রদর্শন করিলেও অতি অল্প দিনের মধ্যেই অসৎ প্ররোচনায় নিখিলকুমার তাঁহার নবাগত সঙ্গীগণের পরামর্শে পাপ-স্রোতে জীবনতরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তথা কথিত বন্ধুবর্গের পরামর্শ নিখিলকুমারের নিকট বড়ই মধুর ও কাম্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার এই চরিত্র-পরিবর্ত্তন যে সম্পূর্ণভাবে হরিশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিয়াছিল তাহা নহে, তবে বৃদ্ধ বয়সে তিনি জমিদারীর সমস্ত কার্য্যাদি সমাপনান্তে নিখিলকুমারের চরিত্র সমালোচনার দিকে নজর রাখিতে পারিয়া উঠিতেন না। উপরন্ত তাঁহাকে অনেক সময়ই মফস্বলে নানা মহলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত।

প্রথম প্রথম তিনি মনে করিতেন, কিছু দিন পরে যখন সমস্ত বিষয়-ভার নিখিলকুমারের উপর অর্পিত হইবে তখন বাধ্য হইয়া সমস্ত অসৎ কার্য্যাদি ত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু তাঁহার এই ভ্রম সমূলে নিপাত করিয়া যখন নিখিলকুমার অল্প কালের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে দুশ্চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল যুবক বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং এমন কি পাপ-পথের কণ্টকস্বরূপ হরিশচন্দ্রকে দূর করিবার গুপ্ত প্রয়াস তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল তখন সত্যই তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

পক্ষান্তরে নিখিলকুমার ও তাহার বন্ধুবর্গের পরামর্শে দিব্যালোকে দেখিতে পাইলেন যে, ভোগ-বিলাস ও স্ফূর্ত্তিই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি ও উদ্দেশ্য। তাঁহার বাৎসরিক পঞ্চদশ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা মুনাফার জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারীর পক্ষে সামান্য নীচ-বংশীয় কর্ম্মচারী হরিশচন্দ্রের ইচ্ছাধীন ও অনুমোদিত কার্য্য করা নিতান্ত হেয় বলিয়া নিখিলকুমারের স্বল্প দিনের মধ্যেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। সুতরাং এই শেষ বয়সে হরিশচন্দ্রকে অপদস্থ ও কার্য্য হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টাই তাহার নিকট প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি যে হরিশচন্দ্রকে বার্দ্ধক্য ও শারীরিক অসুস্থতাদি যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের নিমিত্ত দূরদর্শী ও বিজ্ঞ প্রভুর ন্যায় অনুরোধ করেন নাই তাহা নহে, তবে হরিশচন্দ্র তাঁহার পিতৃদেবের মৃত্যু-শয্যার শেষ অনুরোধ স্মরণ করিয়া এবং এই বার ইষ্টদেবের উপর আবাল্য-জড়িত মায়া-জাল ছিন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া নবা জমিদারের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তখন বাধ্য হইয়া এই তরুণ জমিদারকে বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া বৃদ্ধকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিবার সুযোগ অনুসন্ধানে রত হইতে হইল।

বেশী দিন তাঁহাদের অপেক্ষা করিতে হইল না, একদিন প্রাতঃকালে হরিশ-চন্দ্র সবেমাত্র গৃহ হইতে জমিদারের কাছারী বাড়ীর দিকে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, কোনও এক বালিকা-বধূকে দুইজন বরকন্দাজ অজ্ঞানা-বস্থায় ধরিয়া লইয়া আসিতেছে! বৃদ্ধ হরিশচন্দ্রের সমস্ত শরীর যেন আগুন হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত রমণীকে মুক্ত করিয়া গৃহে রাখিয়া আসিতে বরকন্দাজদ্বয়কে আদেশ দিলেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, নবা জমিদারের আদেশেই তাহারা প্রাতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের রাধা জেলের স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া আসিতেছিল। শ্রবণমাত্রই পাপের কলঙ্কময় ছবি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। বরকন্দাজদিগকে যথারীতি আদেশ করিয়া তিনি চিন্তিত মনে নিখিলকুমারের বসিবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন কিন্তু তাঁহাকে অধিক দূরে অগ্রসর হইতে হইল না, দ্বিতল-গৃহের কক্ষ হইতে সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া জমিদার নিখিলকুমার রোষ-কষায়িত লোচনে কাছারী-বাড়ীর দিকে আসিতেছিলেন। তাঁহার অনুমতি গ্রহণের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহারই অধীনস্থ কর্ম্মচারী যে তাঁহারই আদেশ উপেক্ষা করিতে পারে এ কথা মনে করিতেই তাঁহার ক্রোধে সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে আরম্ভ করিল। সম্মুখে তাঁহার ক্রোধের আধার হরিশচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া নিখিল-কুমার নানা প্রকার কটূক্তির দ্বারা তিরস্কার করিলেন। হরিশচন্দ্র সেই দিনই অপরাহ্ণে সমস্ত কার্য্যাদি বুঝাইয়া দিয়া বিদায়-পত্র পেশ করিয়া নিখিলকুমারের মাতৃদেবী মহামায়ার নিকট হইতে সাশ্রুনয়নে পদ-ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক অতীতের কাহিনী চিন্তা করিতে করিতে জমিদার-গৃহ হইতে চির তরে বাহির হইয়া গেলেন।

২

চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও হরিশচন্দ্র জমিদার নিখিলকুমারের ক্রোধ-বহ্নি হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। অবসর গ্রহণের পর নিখিলকুমার তাঁহারই বন্ধুপ্রবর নগেন্দ্রনাথকে সদর-নায়েবের পদে নিযুক্ত করিলেন। নগেন্দ্র-নাথ জমিদারীর কার্য্য কখনও করেন নাই; তাহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাঁহার একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। মাসাধিক কালের মধ্যেই চারিদিকে গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া নগেন্দ্রনাথের পরামর্শে নিখিলকুমার মফঃস্বল হইতে জনৈক প্রতাপশালী নায়েবকে আনাইয়া সদর নায়েবের সহকারীরূপে নিযুক্ত করিলেন। নব-নিযুক্ত কর্ম্মচারীও সুযোগ বুঝিয়া আত্মাদর পুষ্টির

আশায় জমিদারের মন যোগাইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। পথের কণ্টক হরিশচন্দ্র দূর হওয়াতে নিখিলকুমারেও নিত্য নূতন আমোদ ও বিলাসের বস্তুর অন্বেষণে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। জমিদার কোনও কার্য্যের খোঁজ রাখিতেন না, পক্ষান্তরে কর্ম্মচারিগণ জমিদারের শিথিলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা কাজ চালাইতে লাগিল।

নিখিলকুমার মনে করিয়াছিলেন, হরিশচন্দ্র তাঁহারই পদানত হইয়া থাকিবে কিন্তু তাঁহার সে ভ্রান্তি দূর করিয়া যখন তাঁহারই অধীনস্থ কর্ম্মচারী গর্ব্বিত ভাবে জমিদারকে তাচ্ছিল্য করিয়া সগর্ব্বে বিদায় লইল, তখন নিখিলকুমার নিজেকে বিশেষ অপমানিত মনে করিলেন। তাঁহাকে পুনরায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবার সংকল্প তিনি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। এমন সময় মফঃস্বল হইতে সংবাদ আসিল, প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া খাজনা বন্ধ করিয়াছে। স্থানীয় নায়েব মহাশয় স্বীয় কর্ম্ম-অপটুতা লুকাইবার জন্য এবং হরিশচন্দ্রের প্রতি পূর্ব্ব জাতক্রোধবশত জমিদারকে সত্বরে লিখিয়া পাঠাইল, হরিশচন্দ্র প্রজাগণকে বিদ্রোহী হইতে পরামর্শ দিয়াছেন।

হরিশচন্দ্র বিদ্রোহের কথা শুনিয়া দুই এক জন মাতব্বর প্রজাকে খাজনা বন্ধ না করিতে অনুরোধ করিবার জন্য এক দিন ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে হরিশচন্দ্রের বাটিতে আসিতে দেখিয়া নিখিলকুমার নায়েবের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন। এ সংবাদে তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। নগেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে জব্দ করাই তরুণ জমিদারের একমাত্র চিন্তা হইল। কিন্তু যাহার জন্য হরিশচন্দ্র এই বৃদ্ধ বয়সে বিতাড়িত হইয়াও আবল্য-সঞ্চিত মায়া-মোহের জন্য এরূপে ইষ্ট-সাধনে চেষ্টা করিতেছিলেন, আজ পুনরায় সেই রায়-বংশের কুলতিলক জমিদার নিখিল-কুমার তাঁহাকে শত্রু বলিয়া মনে করিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই গুপ্তস্থলে নগেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া নিখিলকুমার এক নূতন ফন্দি আবিষ্কার করিলেন। হরিশচন্দ্রের নামে সহর একখানা পাঁচশত টাকার হ্যাণ্ডনোট জাল করিয়া কোর্টে উপস্থিত করা হইল। যথাসময়ে কোর্টের পিয়ন আসিয়া হরিশচন্দ্রের নিকট সমন জারি করিয়া গেল। তিনি তখন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। যদিও তিনি জানিতেন, নিখিলকুমার তাহার বন্ধুবর্গের পরামর্শে নানা উপায়ে তাঁহাকে অপদস্থ করিতে পারে কিন্তু জাল করিয়া তাঁহাকে আদালতের সাহায্যে শাস্তি দিবার প্রস্তাব যে তাহাদের মনে আসিতে

পারে, এ কথা তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, যদি হ্যাণ্ডনোট জাল বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা বোধ হয় তাঁহার পক্ষে কষ্টকর বা অসম্ভব হইবে না কিন্তু সেই জন্য যদি নিখিলকুমার জাল 'কেসে' পতিত হয় তাহা হইলে বিচারালয় হইতে নানা প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে, এমন কি কারাবাসও ভোগ করিতে পারে। এ কথা মনে হইতেই তাঁহার সর্ব্বশরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইল, বাল্যকাল হইতেই তিনি এই রায়-পরিবারের চাকুরী করিয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহার বলিতে গেলে কিছুই ছিল না; কেবলমাত্র জমিদার নিখিলকুমারের পিতৃদেবের অনুগ্রহে তিনি জমিদার বাটিতে চাকুরী পাইয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহে বর্ত্তমানে তাঁহার অবস্থার সচ্ছলতা হইয়াছে, তাঁহারই অনুকম্পায় তাঁহার পক্ষে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত সুখে দুঃখে জীবন ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে, তাঁহারই কৃপায় আজ লক্ষীদেবী তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিরাগ নহেন। তাঁহার আরও মনে পড়িল, অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু-শয্যার কথা, ভূতপূর্ব্ব জমিদারের সেই অশ্রুপূর্ণ সকরুণ দৃষ্টি! আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে নিজেই স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া নিখিলকুমারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ না হয় তাঁহার আবাল্য প্রতিপালক জমিদার-বংশেরই তাঁহার প্রাণপ্রিয় স্নেহাধার নিখিলকুমার বুদ্ধির ভ্রমে কুমতির প্ররোচনায় তাঁহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত; তাই বলিয়া নিজে কেমন করিয়া তাহার অহিত চিন্তা করিতে পারেন?

দেখিতে দেখিতে মোকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। অনেকেই তাঁহাকে স্বপক্ষে ঋণ শূন্য প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন। কিন্তু হরিশচন্দ্র নির্ব্বিকার চিত্তে সকলের মতামত শুনিয়া গেলেন, কোনও কথা বলিলেন না। অবশেষে বিচারপতির সম্মুখে মৌন সম্মতি দ্বারা হ্যাণ্ডনোট নিজেরই লেখা এবং তদুক্ত সমস্ত সত্য বলিয়া স্থির চিত্তে স্বীকার করিলেন। যথা সময়ে তিনি কোর্টে সুদ সমেত সমস্ত টাকা দাখিল করিলেন।

নিখিলকুমারের এরূপ ব্যবহারে বৃদ্ধ হরিশচন্দ্র যারপরনাই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। কয়েক দিন আকাশ-পাতাল চিন্তা করিবার পর তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই সুবর্ণপুরের সহ পুরাতন বসত-বাড়ী বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধ বয়সে স্বীয় অপুত্রক স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কাশীধামে জীবনের শেষ কয়েকটি দিন অতিবাহিত করিবার জন্য সুবর্ণপুর ত্যাগ করিলেন।

৩

হরিশচন্দ্রকে এরূপে নির্য্যাতন করিয়াও নিখিলকুমারের পাপ ষোল-কলায়

পূর্ণ হয় নাই। নগেন্দ্রনাথের সাহায্যে হরিশচন্দ্রকে এরূপে অপদস্থ এবং গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছেন মনে করিয়া তিনি তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার একান্ত বাধ্য ও অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। নগেন্দ্রনাথের উপর সমস্ত জমিদারীর ভার দিয়া নিখিলকুমার নিশ্চিন্ত মনে নিত্য নূতন স্ফূর্ত্তিতে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রজাদের ভিতর বিদ্রোহের যে দাবানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল তাহার নিষ্পত্তি করিতে নগেন্দ্রনাথের ন্যায় স্বল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন যুবকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রজাগণও হরিশচন্দ্রের শোচনীয় দুর্গতির কথা শ্রবণ করিয়া যারপরনাই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। তাহার উপর আবার কু-শাসনে, দুর্বৃত্ত নায়েবগণের অবৈধ অত্যাচার তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সভা করিয়া স্থির করিল, জমিদারকে আর খাজনা দিবে না। খাজনা বন্ধ হওয়ামাত্রই নিখিলকুমার কর্ম্মচারিগণকে আদেশ দিলেন, যে-প্রকারে হউক, প্রজাগণকে জব্দ করিতেই হইবে। কর্ম্মচারিগণও সুযোগ বুঝিয়া অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া নিজেদেরই আত্মপুষ্টির চেষ্টায় নিরত হইল। ক্রমাগত চার বৎসর কাল নানা প্রকারে নিপীড়িত হইয়া অবশেষে অনেকে আদালতে সুবিচারের আশায় উপস্থিত হইলেন। জমিদারীতে এ-যাবৎকাল পর্য্যন্ত এক কপর্দ্দকও আয় হইল না, উপরন্তু যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল তৎসমুদয়ই নিঃশেষ হইয়া গেল। প্রজা ও জমিদারের মধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণেরই সুবর্ণ-সুযোগ। তাহারা বিনা বাধায় অসঙ্কোচে অর্থ লুট করিয়া লইতে লাগিল।

চারি বৎসর কাল এরূপে ক্রমাগত চেষ্টার পর যখন আদালতের সাহায্য লইতে হইল তখন নিখিলকুমার দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সঞ্চিত ভাণ্ডার কোন্ কালে নিঃশেষ হইয়াছে, এমন কি অনেক টাকা অন্যের নিকট হইতে ধার লইতে বাধ্য হইয়াছেন। মোকদ্দমা চালাইতেও কম টাকার দরকার নহে। নিখিলকুমার অনন্যোপায় হইয়া আরও বিস্তর টাকা ধার করিয়া ফেলিলেন। বৎসরাধিক কাল অনবরত চেষ্টার পর নির্য্যাতনের একশেষ হইবার পর প্রজাদিগের সহিত নিষ্পত্তি হইল বটে কিন্তু তাহাদিগের নিকট হইতে হিসাব করিয়া দেখা গেল, যাহা খরচ হইয়াছে তাহার দশাংশেরও একাংশ আদায় হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কোর্টের নিষ্পত্তি হস্তে লইয়া নিখিলকুমার দেখিতে পাইলেন, তাঁহার জমিদারীর অনেক অংশই ইতিপূর্ব্বে পরহস্তগত হইয়া গিয়াছে! কিন্তু ইহাতেও তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষা হইল না, তিনি পূর্ব্ববৎ কর্ম্মচারিগণের উপর জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া

দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মোকদ্দমা প্রভৃতি ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঘরে পূজার উৎসব-রোল উঠিল। অন্যান্য বারের ন্যায় রায়-বাড়ীতেও এবার পূজার আয়োজন চলিতে লাগিল কিন্তু এবার আর পূর্ব্বের ন্যায় আড়ম্বর নাই। হরিশচন্দ্রের কার্য্য ত্যাগের পর হইতেই নগেন্দ্রনাথ নিখিলকুমারকে বুঝাইয়া দিলেন, অনর্থক মাটীর প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া বৃথা টাকা ব্যয় করা নিতান্ত মূর্খতা, তাঁহাদের ন্যায় মার্জ্জিত রুচি-সম্পন্ন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণের কখনও এরূপ বৃথা অর্থ ব্যয় করিয়া অমূলক বিশ্বাসের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু নিখিলকুমারের মাতৃদেবীর অনুরোধে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত পূজাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

পূজার মাত্র আর কয়েকদিন বাকী আছে। এমন সময় সংবাদ আসিল, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জমিদার মল্লিকদের বাড়ীতে এবার মহা আড়ম্বরে দুর্গা পূজা সম্পন্ন হইবে। অন্যান্য বারের ন্যায় এবার পুতুল খেলা, চপ্ নাচ্ প্রভৃতি ত হইবেই, উপরন্তু কলিকাতা হইতে কোনও এক বিখ্যাত যাত্রার দল গান করিবার নিমিত্ত আসিতেছে। এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে পর নগেন্দ্রনাথপ্রমুখ বন্ধুবর্গ নিখিলকুমারকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এবার তাঁহাদের বাড়ীতে কোনরূপ আমোদ উৎসব না হইলে সাধারণে ত মনে করিবেই যে, রায়-বংশের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে, এমন কি প্রজাগণও জমিদারের আর্থিক দুর্ব্বলতার কথা বুঝিতে পারিবে। তাঁহাদেরই কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে সামান্য কর্ম্মচারী হইয়া পূর্ণচন্দ্র মল্লিক যে সামান্য বিষয় সম্পত্তি করিয়াছেন তাহারই প্রভাবে আজ জমিদার মল্লিক-বংশ, চির-বিখ্যাত জমিদার রায়-বংশকে হীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিতেছে। এ-কথা মনে করিতেই নিখিলকুমার সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, সেই দিনই কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাত্রার দলকে বায়না করিবার জন্য লোক প্রেরণ করা হউক।

তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা বৃথা হইল। ষষ্ঠী পূজার দিন রাত্রি বেলায় প্রেরিত লোক আসিয়া সংবাদ দিল—সমস্ত বিখ্যাত দলই পূর্ব্বে কোন-না-কোনও স্থানে বায়না লইয়াছে, তাঁহাদের বাড়ীতে আসিবার জন্য কোনও দল স্বীকৃত হয় নাই। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জমিদার-বাড়ীতে বায়নাপ্রাপ্ত দলকে ততোধিক অর্থ দ্বারা বাধ্য করিতে চেষ্টারও ত্রুটি করে নাই কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইয়াছে। এ সংবাদে জমিদার নিখিলকুমার নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

৪

সপ্তমী পূজার দিন মল্লিক-বাড়ীতে চারিটা হইতেই যাত্রা শুনিবার জন্য লোক আসিতেছে। পল্লীগ্রামে নৃত্য-গীতাদি উৎসব কদাচিৎ হইয়া থাকে; তারপর আবার বিখ্যাত কলিকাতার যাত্রার নাম শুনিয়া সকলেই মহা কোলাহলে মল্লিক-বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ দেখিতে দেখিতে লোক-জনে ছাইয়া গেল। কখন গান আরম্ভ হইবে এই চিন্তাতেই সকলে উৎসুক ও উদ্বিগ্ন হইয়া আছে।

মহা-সমারোহে সন্ধ্যা-আরতি শেষ হইবামাত্র গান আরম্ভ হইল। উপস্থিত জনমণ্ডলী কলিকাতার বিখ্যাত দলের লোকজনের প্রতি এবং ততোধিক চাকচিক্যময় বেশভূষার দিকে নিবিষ্ট চিত্তে চাহিয়া রহিল। ক্ষত্রকুল-রবি মান্ধাতার অপূর্ব্ব সত্য-পালন এবং আশ্রিত-বাৎসল্য দেখিয়া সকলেই বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে গায়কগণের দিকে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া আছে, কোথাও কোন শব্দ নাই, চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। হঠাৎ অন্তরিক্ষে মার মার শব্দে চীৎকার করিতে করিতে এক দল লাঠিয়াল সেই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী এরূপ কোনও অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, এমন কি রাক্ষস-রাজকে স্বীয় প্রাণোপম স্নেহের পুত্রের মাংস ভক্ষণ করিতে দিতে প্রতিশ্রুত হওয়াতে শ্রোতাগণের মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব বিষাদ-কালিমার উদয় হইয়াছিল, ইতিমধ্যে এরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব চীৎকারে ও অস্ত্র-সস্ত্র হস্তে লাঠিয়াল-দল দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। গায়ক-দল স্ব-স্ব যন্ত্রাদি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল, মল্লিক-পরিবারের ভৃত্যাদি এবং উপস্থিত লোক-সাধারণ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই লাঠিয়াল-দল বীর-মদে মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক লণ্ডভণ্ড করিয়া অদৃশ্য হইল।

সেই দলের মধ্যে রায়-বংশের কয়েকজন কর্ম্মচারী এবং সদর-নায়েব মহেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, জমিদার নিখিলকুমার ঈর্ষা পরবশ হইয়া গান বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এই অনুচিত আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। লাঠিয়াল-দল উদ্দেশ্য সাধন করিয়া চলিয়া গেল বটে কিন্তু তাহাদের এই নীচ এবং জঘন্য কার্য্যের জন্য পরিণামে কি ফল ভোগ করিতে হইবে তাহা ভাবিবার তাহাদের অবসর ছিল না। যত সহজে তাহারা কার্য্য সাধন করিবে ভাবিয়াছিল তাহা হইল না। তাহাদের লাঠির আঘাতে

কয়েক জন শ্রোতাও বিশেষরূপে আহত হইলেন। জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক এ অপমান নীরবে সহ্য করিতে পারিলেন না! তাঁহার প্রতি এই অবৈধ অত্যাচার এবং অপমানের জন্ত তিনি উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

সেইদিন রাত্রেই সালঙ্কারে ঘটনাটি নিকটবর্ত্তী থানার দারোগা বাবুর নিকট বিবৃত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে ইন্সপেক্টর বাবু বহু সংখ্যক পুলিশ লইয়া তদন্তে আসিলেন। মল্লিক-জমিদারের নিকট হইতে কয়েক শত রৌপ্য মুদ্রা দর্শনীস্বরূপ গ্রহণান্তে তিনি রিপোর্ট লিখিলেন। বলা বাহুল্য স্বর্ণপুরের জমিদার নিখিলকুমার রায় এবং তাঁহার সদর-নায়েব নগেন্দ্রনাথ বসুকে প্রধান আসামীর দলভুক্ত করিতে তিনি ভুলেন নাই। দারোগা বাবু তাঁহার দর্শনীর অসদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই; তৎপরিবর্ত্তে সত্য মিথ্যা অনেক কথা লিখিয়া রিপোর্ট দিতে হইল। পরিশেষে আসামীদ্বয়কে সত্বর গ্রেপ্তারের অনুমতি পত্র প্রার্থনা করিয়া আহত ব্যক্তিগণকে তিনি সদরে প্রেরণ করিলেন। দুই দিনের মধ্যেই পুলিসের বড়-সাহেব স্বয়ং আসিয়া আসামীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিলেন। তাহাদের অত্যাচারের কথা পূর্ব্বে অনেক বার পুলিশ-সাহেবের কর্ণে পৌঁছিয়াছিল; এবার দারোগা বাবুর রিপোর্ট পাঠে আসামীদ্বয়ের উপর তিনি অত্যধিক রাগান্বিত হইলেন। নিখিল-কুমার পলায়নের শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সমর্থ হন নাই। স্বর্ণপুর জমি-দারী-বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল।

৫

হরিশচন্দ্র স্বর্ণপুর হইতে আসিয়া কাশীধামে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী লইয়া সস্ত্রীক বস-বাস করিতেছিলেন। প্রতিদিন বিশ্বেশ্বরের চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহারই সেবায় হৃদয়ের ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিয়া তাঁহার দিনগুলি সুখেই কাটিয়া যাইতেছিল। শত বিভ্রাটের মধ্যে থাকিয়াও, এই সুদূর দেশ হইতে তিনি রায়-পরিবারের সংবাদ লইতে কখনও বিরত হন নাই। নিখিলকুমারের জমি-দারীতে পূর্ব্বাপর গোলযোগের কথা যে তিনি সম্পূর্ণ শুনেন নাই তাহা নহে, তবে দূর দেশে থাকিয়া বিশ্বেশ্বরের চরণ সমীপে তাঁহাদের মঙ্গল কামনা ভিন্ন অন্য কোনও প্রতিকার তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পত্রাদির দ্বারা তাঁহার অনুগত লোকজনের নিকট হইতে নিখিলকুমারের সমস্ত সংবাদ লইতে তিনি কখনও ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু আজ বহুদিন যাবৎ স্বর্ণপুরের কোনও সংবাদ না পাইয়া কোনও অজানা বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল।

সেদিন প্রাতঃকালে তিনি মাত্র প্রাতঃস্নানাদি সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন, এমন সময়ে ডাক-হরকরা তাঁহার নিকট একখানি চিঠি দিয়া গেল। পত্রের উপর আঁকা বাঁকা মেয়েলি ছাঁদে তাঁহার নাম ও ঠিকানা দেখিয়া তিনি প্রথমত বুঝিয়াই উঠিতে পারেন নাই, এ চিঠি কাহার নিকট হইতে আসিতে পারে। পৃথিবীতে তাঁহার খোঁজ লইবার মত লোক খুব কমই ছিল; তাঁহার একমাত্র আশ্রয় স্থল সুবর্ণপুর, তাহাও আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জন্মের মত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে নানা প্রকার চিন্তার পর তিনি পত্রখানা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিতে পাইলেন বাঙলা গোটা গোটা অক্ষরে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিত আছে :—

সুবর্ণপুর, ১লা কার্ত্তিক

কল্যাণবরেষু!

ঠাকুর-পো, আজ বহুকাল পরে এই অ-দিনে তোমাকে স্মরণ করিতেছি। না বুঝিয়া তোমার উপর নিখিল যথেষ্ট অন্যায় করিয়াছে, তাহারই প্রতিফলস্বরূপ আজ সে দাঙ্গা-হাঙ্গামার দায়ে অর্থ ও উপযুক্ত তদ্বির অভাবে জেলে যাইতে বসিয়াছে। এ সময় তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকে বলিব। আশা করি এ অ-দিনে তোমার স্নেহের নিখিলকে উদ্ধার করিতে ভুলিবে না। সোমবার ৭ই কার্ত্তিক বিচার ফল বাহির হইবে। এবার বোধ হয় তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। ইতি—

তোমার হতভাগিনী

বৌ-ঠান্

হরিশচন্দ্র পত্রখানি বার বার পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট সমস্তই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। প্রতাপশালী রায়-বংশের একমাত্র বংশধর জেলে চলিল, মনে করিতেই তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল! চির-ঐশ্বর্য্য-পালিত নিখিলকুমার কিরূপে সেই দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিবে! তাঁহার আরও মনে হইল, নিখিলের মাতা মহামায়ার কথা। কিরূপে তিনি সমস্ত সহ্য করিতেছেন! জমিদার-গৃহিণী চিরকালই তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাই আজ এ দুর্দ্দিনে তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী। বিগত দিনের কথা মনে করিতেই তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। তিনি মনে মনে এক্ষণে নানা কথা চিন্তা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিতে গৃহিণীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

* * * *

৭ই কার্ত্তিক, সোমবার। নিখিলকুমারের মোকদ্দমার রায় বাহির হইবার দিন। উপযুক্ত যত্ন ও তদ্বিরের অভাবে মোকদ্দমায় নিখিলকুমারের অনুকূলে বিশেষ কোনরূপ সুবিধা হয় নাই। উপরন্তু দেশের সমস্ত লোকেই প্রায়-অসৎচরিত্র নব্য জমিদারের নিদারুণ অত্যাচারে ও অবৈধ ব্যবহারে একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত জমিদারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে শত্রুতা সাধনে কেহই সাহসী হয় নাই। এবার মল্লিক-বংশীয়গণকে স্বপক্ষে পাইয়া সকলেই উপযুক্ত প্রতি-বিধানের চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। পক্ষান্তরে নিখিলকুমার এবং নগেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারের পরই জমিদার বাড়ীর প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারী আত্মরক্ষার স্ব-স্ব পথ অনুসন্ধান করিয়া লইয়াছে। মহামায়া দেবী শত চেষ্টায় যথাসাধ্য ব্যয় সত্ত্বেও উপযুক্ত ও বিশ্বাসী লোকের অভাবে মোকদ্দমার কোনও রূপ উপযুক্ত তদ্বির করিতে পারেন নাই। এমন কি যাহার ঐশ্বর্য্যে লুব্ধ হইয়া চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া যে বাড়ীতে কয়েক-দিন পূর্ব্বে আমোদ-প্রমোদের মেলা বসাইত, আজ সেই বাড়ীতে বিপদ উপস্থিত হওয়াতে একেবারে জনশূন্য! তাই আজ চির-ঐশ্বর্য্যে লালিত, প্রবল প্রতাপ-শালী জমিদার-পুত্র উপযুক্ত জামিন অভাবে বন্দীরূপে রাজ-কারাগারে দুশ্চিন্তায় ও অনিদ্রায় কালাতিপাত করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। আসামী তখনও কাঠগড়ায় উপবিষ্ট। নিখিলকুমারের হাস্তময় মুখের উপর দিয়া যেন বার্দ্ধক্যের এক প্রবল বন্যা বহিয়া গিয়াছে। এই কয়েকদিনের দুশ্চিন্তায় তাঁহার চক্ষু কোঠরাগত, চুল রুক্ষ, বদনমণ্ডল সম্পূর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আদালত-গৃহ লোকে পরিপূর্ণ। সকলেই উৎসুক নয়নে জমিদার রায়-বংশের কুলতিলক নিখিলের অদৃষ্ট জানিবার জন্ম দণ্ডায়মান। বিচারপতি নিবিষ্ট চিত্তে বিচার-ফল লিপিবদ্ধ করিতেছেন। নিখিলকুমারের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি পাগলের ন্যায় উদাস নয়নে অবস্থিতি করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিচার-ফল প্রচারিত হইল—নিখিলকুমার ও নগেন্দ্রনাথের পাঁচশত টাকা করিয়া জরিমানা, অথবা জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাসের কারাবাস। উপস্থিত জনসাধারণ স্থির চিত্তে সমস্ত শ্রবণপূর্ব্বক স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করি-লেন। অবস্থার অবনতি হইলেও সাধারণের নিকট ঐ টাকা যৎসামান্য বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু তাহারা জানিত না, অখণ্ড প্রতাপ ঐশ্বর্য্যশালী জমিদার রায়-বংশের এক মাত্র উত্তরাধিকারীর পক্ষে অবস্থা বিপর্য্যয়ে এই সামান্য অর্থই

কত অধিক বলিয়া মনে হইতেছিল। এক দিন ছিল, নিখিলকুমার পাঁচ শত কেন পাঁচ হাজার টাকাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সামান্য খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়াও তাঁহাকে এরূপ কত শত টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু আজ এই বৎসামান্য টাকাও ব্যয় করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সে নির্ব্বাক নিস্পন্দ চিত্তে বসিয়া রহিল।

এমন সময়ে দূরে জনতা ঠেলিয়া এক বৃদ্ধ বিচারালয়ে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অতর্কিত আগমনে সকলেই একটু বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীরে যেন ক্লান্তি ও অবসাদের চিহ্ন বর্ত্তমান। সহস্রাধিক চক্ষু এই বৃদ্ধের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি একান্ত ভাবে বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স-সম্মানে অভিবাদন পূর্ব্বক করজোড়ে বলিলেন, "এ বৃদ্ধের শরীরে এক ফোঁটাও রক্ত থাকিতে কখনও স্নেহের কুমার নিখিলকে কিংবা তাঁহার কোনও কর্ম্মচারীকে রাজ-কারাগারে শাস্তির জন্য প্রেরণ করিয়া রায়-বংশের চির-বিখ্যাত মর্য্যাদা ও যশোরাশিতে কলঙ্ক স্পর্শ হইতে দিব না।" এই বলিতে বলিতে তিনি বিচারপতির সম্মুখস্থ টেবিলের উপর আসামীদ্বয়ের নিষ্কৃতির জন্য এক সহস্র মুদ্রা স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের এই কার্য্যাবলী দর্শনে বিচারপতি ও উপস্থিত জনসাধারণ বিস্ময়ে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। সকলেই দেখিতে পাইল, নবাগত বৃদ্ধ তাহাদের পূর্ব্ব পরিচিত নিখিলকুমার কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত, রায়-বংশের চির-কৃতজ্ঞ কর্ম্মচারী—হরিশচন্দ্র! অভিমান ও অপমানের শত শৃঙ্খলও তাঁহাকে স্নেহের আকর্ষণ হইতে দূরে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, তাই তিনি প্রবাস হইতে নিখিলকুমারের মুক্তির জন্য ছুটিয়া আসিয়াছেন।

আসামীর মুক্তির আদেশ হইল। বাহিরে আসিয়াই নিখিলকুমার বৃদ্ধ হরিশচন্দ্রের পদতলে পতিত হইলেন।

মাটীর খেলা

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দাস।

. . . সকাল বিকাল এক বিছানাতেই পড়ে আছি। কতদিন এ রকম ক'রে কাটাতে হ'বে কে জানে? তবে দিন যে ঘনিয়েই আস্‌ছে তা বুঝ্‌তে বাকী নেই। তবু জীবনের এই একঘেয়ে অবস্থা ভালো লাগে না . . . .

ভেবে পাই না জীবনটা কি? একবার মনে হয়, কিছুই নয়—যেন স্বপ্ন, আবার মনে হয়, সবই জীবন!

আজও ওরা এসেছিল। মায়া ভারি সপ্রতিভ মেয়ে। এসেই সে আমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লে, আজ কেমন?—

আর কেমন? ওরে, কেমন তা তোরাও জানিস্, আমিও জানি। মরণ-পথের পথিকের কাছে সংসারের সুখৈশ্বর্য্যের ছবি এঁকে তোরা কি সুখ পাস্?—এ যেন আমার কাছে একটা বিদ্রূপের বাণী বলেই মনে হয়!

রেণু একটি অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে! এমন দ্বিতীয়টি দেখেছি বলে ত বোধ হয় না। রোজই মায়াদের সঙ্গে আসে—এই পর্য্যন্ত। একটি কথাও যখন তার এ পর্য্যন্ত শুনি নি, তখন আর পরিচয় হ'বে কি ক'রে? মায়া একদিন বলেছিল, রেণু তার বৌ-দির বোন্—এইটুকুই শুধু তার সম্বন্ধে আমি জান্‌তে পেরেছি।

অভাবই মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তোলে। রেণুকে আমি এতটুকু জান্‌তে পেরেছি বলেই তার পূর্ণ পরিচয়ের জন্য হৃদয়টি আমার উন্মুখ হ'য়ে আছে। অনেকদিন ভেবেছি, নিজেই রেণুকে কিছু জিজ্ঞেস করব, কিন্তু তা আর হ'য়ে ওঠে নি। ভেবেও কিছু পাই নে যে, ও কেন আমাকে রোজ দেখ্‌তে আসে! অনিমেষ আমার ছেলে-বেলাকার বন্ধু, সে না এসে পারে না, তার সঙ্গে না হয় তার বোন মায়াও এল, কিন্তু রেণু কেন আসে? কোন্‌খানটায় তার সঙ্গে আমার এমন একটি টান রয়েছে—অনেকদিন তা ভেবে মাথা ঘামিয়েছি, কিন্তু কিছু স্থির করতে পারি নি!

*   *   *   *

শান্ত সুন্দর সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নেমে আস্‌ছে। চন্দ্রহীন নিবিড় সুনীল আকাশে শত সহস্র তারকার স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠেছে। জানালা দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম, লাইট-পোষ্টগুলির মাথায় মাথায় চির-দিনের মতই আলো জ্বলে উঠেছে।

আজ ওরা আসে নি। অনিমেষ সেই সকালে একবার এসেছিল। আমাকে ঘুমতে দেখে একটা স্লিপ্‌ লিখে রেখে চলে গেছে।

কেন এলো না তা জানি নে, কিন্তু মনে হচ্ছে আস্‌বে—আস্‌চে . . .

*   *   *   *

আজও মায়া আসে নি! অনিমেষ বল্‌লে, আজ একটা ভারি মজা হ'য়েছে। সেই পুলিনকে তোমার মনে পড়ে? যে আমাদের সঙ্গে পড়্‌তো? দিন সাত হল বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে সে ফিরে এসেছে। হঠাৎ আমাদের বাসায় আজ সকালে এসে উপস্থিত!—সারাদিন তাই আস্‌তে পারি নি। এখন যে হ'য়ে উঠ্‌ত, তা বল্‌তে পারি নি, তবে রেণু খুব পীড়াপীড়ি করায় আর না এসে পার্‌লাম না। তা না হ'লে পুলিনকে বিদায় দিয়েই আস্‌ব ভেবেছিলাম। যাক্‌ কেমন আছ?

কিছু উত্তর আমার দেবার ছিল না, তাই চুপ ক'রে রইলাম। রেণুর দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, সে মাথা নীচু ক'রে বসে আছে। ওগো দুর্ব্বোধ্য মেয়েটি! তোমাকে আমি চিন্‌লাম না! আমার জীবনে এত কি তোমার প্রয়োজন? বল্‌লাম, মায়া এল না?—

ওরে বাপ্‌রে, তার অবসর কোথায়?—অতিথি-সৎকারে লেগে গেছে!

*   *   *   *

বুকের ভেতর যখন অনেক কথা জমে ওঠে, তখন কিছুই বলা হয় না। অনেক কিছুই আজ লিখ্‌ব ভেবেছিলাম, কিন্তু পার্‌লাম না।

মায়াও এসেছিল, কিন্তু তার একটা পরিবর্ত্তন দেখ্‌লাম। তার সে চপলতা-টুকু কোথায় যেন অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে, তার সে অতলস্পর্শী কালো চোখ দুটোর দিকে চেয়ে মনে হল, তার ভেতর কিসের যেন একটি ছায়া পড়েছে! . . .

*   *   *   *

আজ শরীরটা বিশেষ খারাপ লাগ্‌ছে। ডাক্তার বল্‌লে, অতিরিক্ত চিন্তার ফল। ভাবনাকে প্রশ্রয় দিলে ভালো হওয়ার নাকি মোটেই আশা নেই।

আশা যে নেই, তা আর নতুন ক'রে কি শুনব ? মৃত্যুর নিমন্ত্রণ ত অনেক আগে থেকেই পেয়েছি—ডাক্তারকে বল্‌লাম. তোমার ও-মুখস্থ-করা বুলিগুলো আর আমার কানে ঢেলো না। এ সব শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেছে। ইচ্ছে হয়, ওষুধ দাও—না হয় না দাও, একটি কথা আর আমায় বলো না।

* * * *

আজও মায়া আসে নি। পুলিন এসেছে বোধ হয়! অনিকে আজ আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। কি দরকার ?

রেণুর দিকে চেয়ে বুঝ্‌তে আর বাকি রইল না যে, সে বেশ একটু বিপদেই পড়েছে। অনেক দিনের মৌনতার বাঁধ কাটিয়ে বল্‌লাম, আজ পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে বাইরে কোন পরিচয় হয় নি কিন্তু আপনার ভিতরটাকে অনেক আগেই যেন দেখ্‌তে পেয়েছিলাম আপনার চোখে। আজ বাইরের পরিচয়টাও হয়ে যাক— আপনার মুখের কথায়, কি বলেন ?—

দেখ্‌লাম, রেণু খুব সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। গাল দুটো তার একটু লাল্‌চে হ'য়ে উঠেছে। মুখে একটু সলজ্জ হাসি এনে তার স্নিগ্ধ চোখ দুটি একবার আমার মুখের ওপর তুলেই নামিয়ে নিল!

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম। এর পরে কি বলা যেতে পারে ?—আমিও তার দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লাম।

অনিমেষ হেসে বল্‌লে, রেণুর আজো কথা ফোটে নি বুঝি ? তা' হ'লে এসেই বা কি দরকার—একটা কথা বল্‌তেও যদি এত লজ্জা বাপু!

* * * *

দিনের পর দিন যাচ্ছে—শুয়েই আছি। জীবনটাকে এমন পঙ্গু ক'রে রাখার চেয়ে তাকে একেবারে নিঃশেষে ফুরিয়ে ফেলাও অনেকটা ভালো। গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, শরৎ নেই, বসন্ত নেই—এই যে একঘেয়ে বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে স্বপ্ন দেখা, এ আর মোটেই সহ্য হয় না। শুয়ে থেকে থেকে পা দুটো যেন অবশ হ'য়ে গেছে। এক একবার মনে হয়, হেঁটে বেড়ানো বুঝি ভুলে গেছি! পথে দস্যি-ছেলের দাপাদাপি আমার জানালা দিয়ে দেখি, হিংসে হয়!

কয়দিন ধরে মায়া আসে না। বোধ হয় সে শ্রান্ত! হয় ত এখন নূতন কিছুতে যেতে আছে যাতে রোগীর সেবার চেয়ে বেশী তৃপ্তি—হয় ত পুলিন, থাক্‌—কবে শেষে হবে আমার দিন ? আর যে পারি না! . . .

রেণুর সেই ভাবটা একদম বদ্‌লে গেছে। সে এখন আমার কপালে হাত

বুলিয়ে দেয়, মায়া যেমন আগে দিত। চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়ে দেয়, বই পড়ে শোনায়।

আজ আমার একটা খেয়াল চেপে বস্‌ল। রেণু যখন আমার মাথায় তার হাতখানি বুলিয়ে দিচ্ছিল, আমি তা এক মুঠো শেফালী ফুলের মত চেপে ধ'রে বল্‌লাম, রেণু, মৃত্যু-পথের যাত্রীর ভিতর তুমি এমন কি পেয়েছ, যাতে আমার প্রাণটাকে আঁকড়ে ধরে রাখ্‌তে চাইছ? আমাকে আজ তোমায় বল্‌তে হ'বে।

রেণুর চোখদুটো ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌ল, কিছুতেই সে আমার কাছ থেকে তার চোখের দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু লুকোতে পার্‌লে না! আমার আজ আবার বাঁচ্‌তে সাধ হ'ল। ফুলে-ফুলেভরা শ্যামল পৃথিবী আবার যেন আমায় নূতন ক'রে বাঁধ্‌তে চাইলে!

* * * *

অনিমেষ বল্‌লে, পুলিনের সঙ্গে রেণুর বিয়েতে তোমার কি মত?

একি কথা!—বুকের পাঁজরটাতে বড় রকমের একটা আঘাত লাগ্‌লো। আশ্চর্য্য হ'বার কিছুই নেই তাতে। পৃথিবীর কাছ থেকে এর চেয়ে আমি আর কি আশা করতে পারি?—

তবু এ আঘাতের বেগ সাম্‌লে নিতে আমার অনেকক্ষণ লেগেছিল। ওরে ছন্নছাড়া, কি আছে তোর? নিজে ত মরণ-পথের ধারে বসে দিন গুণ্‌ছিস, তবে কিসের জোরে তুই রেণুকে তোর দুর্ব্বল বুকের ভেতর আঁকড়ে ধ'রে রাখ্‌তে চাস?

* * * *

আজ সকাল থেকেই টিপ্-টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়্‌ছিল। জানলাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, এম্‌নি সময়ে একটা দম্‌কা হাওয়ার মত রেণু এসে ঘরে ঢুকে আমার বুকের আশ্রয়টিতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিলে! চোখ দিয়ে তার বাইরের বৃষ্টিধারার মত জল প'ড়ে আমার বুকের মরুতৃষ্ণাকে মিটিয়ে দিচ্ছিল। মনে হোল—পৃথিবী যেন আবার নূতন ক'রে সৃষ্ট হল, পৃথিবী যেন ধন্য হ'ল।

* * * *

ফোঁপাতে ফোঁপাতে রেণু বল্‌লে, কি করেছি আমি তোমায়, যে তুমি তোমার বন্ধুকে এ বিয়েতে মত দিলে?

কি বল্‌ব? বল্‌বার কি আছে যে বল্‌ব!—তবু রেণুকে অনেক ক'রে সান্ত্বনা

দিলাম। বল্লাম, এ দু'দিনের জীবন নিয়ে কি ক'রে তোমায় চাইবো রেণু? আমিও যে একটা মানুষ।

সে বল্লে, আমি এই দু'দিনের জীবনকেই অনেক বড় ক'রে নেব। তুমি শুধু তোমার বন্ধুকে একবার বল, আমি রেণুকে চাই। তাকে আমি আর কাকেও দেব না।—

চিন্লাম না এ সৃষ্টিছাড়া নারীজাতিটাকে!

* * * *

পৃথিবীকে আর ভালো লাগ্ছে না। ঐ যে নীল আকাশের কোলে সাদা মেঘের ভেলা, ঐ যে চাঁদ, ঐ তারকা, ঐ গাছপালা, ফুলফল—সবই ত জন্মাবধি দেখ্ছি। আর ভালো লাগ্ছে না। এখন এসব ছেড়ে অনন্তের যাত্রী হ'তে পারলেই বাঁচি।

রেণুর সঙ্গে পুলিনের কাল বিয়ে হ'য়ে গেছে। রোশুনচৌকির সুরটা যেন একটা কান্নার মত আমার বুকে এসে বেজেছিল। বাড়ীর সাম্নে দিয়ে যখন শোভাযাত্রা চলে গেল—আমার ঘরের একটা জানালাও তখন খোলা ছিল না। অন্ধকারের ভেতর বসেই তবু যেন মনে হ'ল কার দু'টি করুণ চোখ আমার ঘরের প্রত্যেকটি জানালাতে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে গেল! . . .

* * * *

আজ ঠিক পনেরো দিন পরে মায়া আবার এলো। কিন্তু এ যেন সে মায়াই নয়। এত তার পরিবর্ত্তন—চিন্তে পারবার যো'টি নেই! এমন ফুলের মত মুখখানা তার শুকিয়ে গিয়েছে চোখদু'টি কোন্ এক গভীর ভাবনার অন্ধকারে বসে গেছে।

কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে তাকে সাহস হ'লো না।—ইচ্ছেও তেমন ছিল না। নিজের বেদনায় নিজেই অস্থির—অপরের সুখ-দুঃখের হিসাব-নিকাশ কে করে?—

* * * *

অনিমেষ এসে বল্ল, খুব একটা ভুল ক'রে ফেলেছি সতু। মায়া আর রেণুর কিছুমাত্র খবরই নিই নি—যা খেয়াল চেপেছে তাই করেছি।

ভুলই বটে—পাঁজর ভাঙা ভুল!

অনিমেষ আবার ব্যথা-মাখানো সুরে বল্লে, একটা সামান্য ভুলে পুলিনকে

ব্যথা দিয়েছি, রেণুকে মেরে ফেলেছি, মায়ার জীবনটাকে ব্যর্থ করেছি—তোর ব্যথারও অন্ত নেই।—কিন্তু তুই কেন মুখ ফুটে বল্‌লি নে সতু?—

অনিমেষের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল। বুকের বোঝার অন্ত নেই।—এত ভারি হ'য়ে গেছে যে আর বইতে পারিনে। ভেবেছিলাম মায়াকে কিছু সুখী করতে পারব—নিজের ব্যথারও হয়ত কিছু লাঘব হ'বে। কিন্তু মায়াকে পেয়ে আমার বোঝা আরো ভারি হ'য়ে উঠ্‌লো। আমার জীবনটাও ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

এত বড় পৃথিবীর আমার মত একটা হতভাগা জীবনের কি প্রয়োজন ছিল জানিনে। কেবল মানুষকে ব্যথা দিয়ে আর ব্যথা পেয়েই চল্‌লাম তার কাছ থেকে।—

* * * *

নীল আকাশে ফুটে উঠ্‌ছে অযুত তারকার হাসি। চাঁদের আলো জানালা দিয়ে এসে মেঝেতে গলে গলে পড়্‌ছে। বাইরেটা যেন আমারই মত এত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে শুয়ে, রাত্রি-শেষের প্রতীক্ষায় ধুঁক্‌ছে।

একালের ছোট গল্প কিংবা ছোট কবিতার 'বই,—মেধা, হ্রী, ধী, শ্রী প্রভৃতির বর্দ্ধক, এবং নৈতিক-বলকারক বলে' উল্লিখিত হয়ে থাকে। কিন্তু যা' চ্যবনপ্রাশ বলে' কিনে আনা যায়, তা দেখা যায়,—প্রায়ই অকালকুষ্মাণ্ড গণ্ডমাত্র।

'মলাট-সমালোচনা'

শ্লোক শোধ

—শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী।

"তুমি যাবে ?"

"যাব বই-কি।"

"এই রাত্রে! এখন যে ন'টা বেজে গিয়েছে।" বলিয়া মাখনলাল ভ্রূকুঞ্চিত করিল। অমিয়া বলিল "না-গেলেই যে আমার চল্‌বে না।"

"কিন্তু এত রাত্রে একজন ভদ্রলোকের স্ত্রীকে একটি মাত্র ঝি সঙ্গে ক'রে অন্য পাড়ায় যেতে দেখ্‌লে লোকে বল্‌বে কি ?" পুনরায় মাখনলাল বিরক্ত দৃষ্টিতে অমিয়ার মুখের দিকে চাহিল।

অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে অমিয়া বলিল "তার জন্তে তোমার ভাবনা নেই, আমি ত কণে-বৌ নই! অতীতটাকে তুমি ভুলে যেতে পারে, আমি পারিনে।"

"তবে যাও।" অনিচ্ছুকভাবে উত্তর শেষ করিয়া ওয়াল্‌-ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে একখানি মাসিক পত্রিকা খুলিয়া লইয়া মাখনলাল তাহাতে মন সংযোগ করিল।

অমিয়াও নিমেষার্দ্ধ সেখানে দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া লইল, পরে বাহিরে আসিয়া পরিচারিকাকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিল "চাঁদির মা।"

তাহার এই আহ্বানে সে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে অমিয়া বলিল—"একবার অংশু বাবুদের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে চল ত।"

বিস্মিত পরিচারিকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"ওমা, এই রাতে সেই পাড়ায়! তুমি ত কস্মিন কালেও সে পাড়ায় যাও না বৌ-ঠান—"

ইহার পর সে আরো কি বলিতে যাইতেছিল। বাধা দিয়া অমিয়া বলিল—"যাই না-যাই সে খোঁজ করার জন্তে ত তোমাকে ডাকি নি, শুধু আমাকে একবার নিয়ে যেতে হবে কথা হচ্ছে এই।"

তা বেশ চল যাচ্ছি !" চাঁদির মা অপ্রসন্ন মুখে উত্তর শেষ করিল। অমিয়াও বাক্য ব্যয় অনর্থক ভাবিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

গ্রাম্য পথটি জ্যোৎস্নায় উদ্ভাবিত হইয়া সেদিন বড় বিচিত্র বেশেই হাসিতেছিল। পথের দুই পাশে কোথাও তরুলতা, কোথাও বা দুই একখানি গৃহস্থালয় কোথাও বা খানিকটা উন্মুক্ত প্রান্তর, অঙ্কিত আলেখ্যের মতই শোভা পাইতেছিল। কোন স্থান হইতে কোন্ অদৃশ্য বিটপীর অভ্যন্তর স্থিত, বিহগের কণ্ঠ ধ্বনি আসিয়া নিঃশব্দ পথটিকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশিকে উপেক্ষা করিয়াই আজ অমিয়া অনন্য মনে পথ চলিতে লাগিল।

সমস্ত পথটি ধরিয়া তাহার অন্তরের ভিতর একে একে অতীতের অনেক কথাই আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সহসা সে প্রান্তরের মুক্ত বাতাসে একটা চাপা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"চাঁদির মা! আর কত দূর ?"

চাঁদির মা অনামিকা উত্তোলন করিয়া বলিল "ঐ যে গা, সাম্‌নে।"

২

বাহির হইতে দরজার কড়া ধরিয়া নাড়িবার শব্দটা যখন ভিতরে গিয়া পঁহুছিল, সেই সময়ে ভিতর হইতে রমণী কণ্ঠের প্রশ্ন আসিল "কে গা ?"

অমিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া চাঁদির মা উত্তর দিল "এই আমাদের ও-বাড়ীর মা-ঠাকরুণ এসেছেন গো, দোর খুলে দাও !"

পলেকের ভিতরেই রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত হইয়া গেল। অমিয়া চাহিয়া দেখিল সম্মুখে এক বর্ষীয়সী নারী। সে ভিতরের দিকে আসিয়া নতভাবে তাঁহার পায়ের ধূলি তুলিয়া লইল, পরে কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিল "নিতাই-দা এখানে এসেছেন না ?"

"হাঁ, সে এসেছে বটে, কিন্তু আজ দুদিন হতে তার এমনি জ্বর হয়েছে যে, তাকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়ে যেতে হয়েছে। দেখ দেখি, নতুন পাড়ার এই জংলা হাওয়া কি ওর সহ্য হয়! চরকা আর তুলোর বোঝা ঘাড়ে ক'রে এসে এখন এই বিপত্তি !"

বর্ষীয়সীর এ কথার উত্তরে অমিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল "নিতাইদার ধারাটাই যে চিরদিন ওই রকম।"

"সে কি আর জানিনে বৌ, কি আর করা যাবে বল, সেই বোঝাগুলো ওদের কংগ্রেসে ফেলে দিয়ে এসে সেই যে, শুয়ে পড়েছে, উঠে আর কিছুই মুখে দেয় নি।"

বলিতে বলিতে তিনি ক্রমশ অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন। অমিয়াও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। পিছন হইতে চাঁদির মা বলিল—"আমি তা' হলে এই গাছ তলেই বসি মা ?"

এতক্ষণ সম্মুখের চিন্তাটার ভিতরেই অমিয়া লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল, চাঁদির মার কণ্ঠস্বরে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"তা থাক।"

বাড়ীটা কি রকম ধরণের এ পর্য্যন্ত সে তাহাও লক্ষ্য করে নাই, এইবার সে চকিত দৃষ্টিতে একবার বাড়ীটার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া লইল, দেখিল খানদুই তিন কুঠারী ও একখানি রান্নার খড়ের চালা লইয়াই তাহার সীমা শেষ হইয়া গিয়াছে, অতিরিক্তের ভিতর সেই মাটির দেওয়াল-ঘেরা বাড়ীটির ঠিক মধ্যস্থলে কামিনী ফুলের গাছটি পুষ্প-স্তবকে সাজিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এই সময়ে বর্ষীয়সী রমণী সহসা তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন "তা হ'লে বৌ, তুমি কি নিতায়ের সঙ্গে দেখা করবে ?"

আপনি কি মনে করেন ? আমি সেই বলেই এসেছি।" উত্তর দিয়া অমিয়া চুপ করিতেই তিনি বলিলেন—"আমি ত তাই মনে করছি, নইলে কি আর তুমি এতরাতে আমাকে দেখতে এসেছ, কই অনেক কালই ত তুমি এ গাঁয়ে বৌ হয়ে এসেছ। সেই পনর বছর আগে বৌভাতের নেমন্তন্নতে গিয়ে তোমাকে দেখে এসেছিলাম, আর আজ আবার দেখা হ'ল বই-ত নয় !"

অমিয়া তাঁহার এ কথার উত্তর না দিয়া মনে মনে একটু লজ্জিত হইল, এত বড় সত্যের যে কোন প্রতিবাদই চলিতে পারে না। ক্রমে এ-কথা ও-কথার সঙ্গে পথটুকু শেষ করিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া সে চাহিয়া দেখিল,—একখানি চৌকির উপর জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া নিতাই শুইয়া রহিয়াছে। তাহার অনতিদূরে একটা পিলসুজের উপর মৃৎ-প্রদীপটির শিখা অল্প-বিস্তর পরিমাণে আলোক দান করিয়া বাতায়ন-পথ দ্বারা চালিত বায়ু সংযোগে এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে। সে গৃহে প্রবেশ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

বর্ষীয়সী রমণী নিতাইয়ের শিয়রে গিয়া ডাকিলেন "নিতাই।"

তাঁহার এই আহ্বানে নিতাই চোখ মেলিয়া চাহিয়া বিহ্বলের মতই বলিল "ডাকছ দিদি ?"

"হাঁ, ঐ যে ও-পাড়া থেকে মাখনবাবুর বৌ এসেছে রে !"

তাঁহার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল "অমিয়া, কোথায় সে ?"

"এই যে নিতাই-দা, এখানে এসে তোমার খুব জ্বর হয়েছে শুনে একবার না-দেখে মনটা কেমন অস্থির হ'তে লাগ্‌ল'!" বলিয়া অমিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া নিতায়ের বিছানার একপ্রান্তে দাঁড়াইল।

জ্বর-তপ্ত মুখে একমুখ হাসিয়া নিতাই বলিল "জ্বর য'দ না-হতো অমিয়া তা হ'লে আর তুই মনে ক'রে আস্‌তিস নে, এটা খুব খাঁটি কথা নয় কি?

লজ্জা-মিশ্রিত একটু হাসি হাসিয়া অমিয়া বলিল, "অতটা ভবিষ্যৎ বল্‌তে পারিনে নিতাই দা। তুমিই বা দেখা করলে কই?"

"দূর পাগল, আমি সময় পেলাম কখন? এসেই যে জ্বর রে!—যাক্ তুই এখন ভাল আছিস্ তো? শ্বশুর মশায় গা তুলেছেন তো?"

কুণ্ঠিতভাবে অমিয়া বলিল—"কি যে বল নিতাই-দা।"

নিতাই অপেক্ষাকৃত দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—"বল্‌ব না? চামার যে তাকে চামার না বলে দেবতা বললে যে দেবতারও অপমান হয়। যত কাল বেঁচে থাকব, সেই তোর বিয়ের রাত্রির কথা আমার মনে জেগে থাকবে।"

৩

"পর পর আর ক'দিন সেখানে যেতে হবে?"

মাখনলালের এই কথায় অমিয়া স্থির কণ্ঠে বলিল "যে ক'দিন না নিতাই-দা ভাল হয়।"

তাহার এই উত্তরে মাখনলালের মুখটা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, একটু নীরব রহিয়া পরে আবার বলিল—"এতে আমার কতখানি সম্ভ্রম নষ্ট হচ্ছে জান?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অমিয়া বলিল—"কতখানি?"

"এ-বংশের কুল-স্ত্রীর কখনো নিয়ম নয়, একজন পুরুষকে দেখ্‌বার জন্য অত রাতে রোজ বাড়ীর বাইরে থাকা।"

তাহা যে অমিয়া না-জানিত এমন নয়, মাখনলালের পিতামহ যে এই ছোট গ্রামখানির ভিতর তাঁর ক্ষুদ্র জমিদারীটুকু লইয়া প্রবল-প্রতাপ আকবর বাদসাহের মতই একদিন কাটাইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সে অনেকদিন অনেক বার ধরিয়া শুনিয়া আসিয়াছে। তাহার পর যখন সে ঘর-করণ্ করিতে আসিয়াছিল, তখনো তার কিছু-না-কিছু বর্ত্তমান দেখিয়াছে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে, তাহার বিশেষ কিছুই চিহ্ন ছিল না, রহিবার ভিতর পুরানো বাড়ীখানি। সেই জন্য অমিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"সেকাল অনেকদিন চলে গিয়েছে।"

"যেটুকু ছিল, সেটুকুও আর তোমার জন্যে থাকবে না তাও বেশ বুঝতে পারছি।" বলিয়া এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ হইতে অব্যাহতি লাভের আশাতেই মাখন-লাল সহসা গৃহ ত্যাগ করিল।

স্বামীর অন্তঃকরণ যে তাহার উপর বেশ একটু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, অমিয়া তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছিল, তথাপি এইটুকু সহ্য করিয়াও তাহাকে যাইতে হইবে। তাহার আজ বিশেষভাবেই মনে পড়িল কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কাতরকরুণ মুখ।

সেই রাত্রি, সাধারণতঃ যাহাকে লোকে মিলন-রাত্রি, শুভ-রাত্রি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, জীবনের একটি মাত্র ক্ষণ, যাহার আনন্দ-আস্বাদটুকু সমস্ত জীবনে অম্লান পারিজাত-গন্ধের মতই বিজড়িত থাকে, তাহার নিকটে সেই রাত্রি যে কি ভাবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা ভুক্ত-ভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারিবে না।

সেই অবস্থায় যদি নিতাই-দা উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে মাত্র তিন শত টাকার কমের জন্য অনেকখানি কাণ্ডই যে ঘটিয়া যাইত। সে-ই না, সেই রাত্রিতে সাহায্য দিয়া তাহার পিতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। তাও ঋণ নয়, দান। গ্রামস্থ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন। অমিয়া আর যেন ভাবিতে পারিল না, তাহার সমস্ত ললাট বিন্দু বিন্দু ঘামিয়া উঠিল।

পিছন দিক হইতে ডাক আসিল—"মা"—

একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া অমিয়া বলিল "কি বলছিস্?"

"মা? নিতাই মামা বলেছিলেন, আর তোমাকে রাতে কষ্ট ক'রে যেতে হবে না, আজ তাঁর জ্বরটা ছেড়েছে!"

কিশোর পুত্র বিকাশকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার ললাটের বিশৃঙ্খল চুলগুলি সংযত করিতে করিতে অমিয়া বলিল—"সত্যি?"

"হ্যাঁ মা সত্যি, মামা বলেছেন আর যেতে হবে না।" বিকাশ শান্ত স্বরে উত্তর দিল। অমিয়াও নিজের অন্তরে যেন গভীর শান্তি অনুভব করিয়া একবার সম্মুখের উদার আকাশের বুকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

৪

তাহার পর আরো চারিদিন অতীত হইলে, সেদিন অপরাহ্নের প্রায় শেষভাগে বৈঠকখানার খাটখানিতে বসিয়া মাখনলাল যখন বৈষয়িক কাগজ-পত্র দেখিতে-

ছিল। সেই সময়ে ধীরে ধীরে নিতাই আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"মাখনবাবু ভাল আছেন তো ?"

তাহার এই অতর্কিত প্রশ্নে চোখ তুলিয়া চাহিয়া চকিতভাবে মাখনলাল বলিল—"আছি. বসুন !"

"না, বেশীক্ষণ বস্‌বো না, আজ রাত্রেই যাওয়া স্থির হ'ল বলে, একবার আপনাদের সঙ্গে দেখাটা ক'রে যেতে এসেছি।"

"তবু যেটুকু থাকেন চলুন বাড়ীর ভিতরেই যাওয়া যাক।" বলিতে বলিতে মাখনলাল উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে যখন তাঁহারা বাড়ীর ভিতর পৌঁছিল অমিয়া তখন গৃহ-প্রাচীর সংলগ্ন কয়েকখানি ছবি পাড়িয়া লইয়া তাহার ফুলগুলি পরিষ্কার করিতেছিল। সে সহসা নিতাইকে দেখিয়া প্রফুল্লমুখে বলিয়া উঠিল "তাহ'লে এখন বেশ ভাল আছেন নিতাই-দা ?"

নিতাই হাসিয়া বলিল—"ভাল না-ক'রে কি আর ছাড়্‌লি তোরা বোন্ !"

একটু অপ্রস্তুত হইয়া অমিয়া বলিল—"আমি আর কি করেছি, কিছুই পারি নি যে নিতাই দা !"

"অনেকখানি পেরেছিস্ অমিয়া। তোর ওই আন্তরিকতাটুকু কি কম জিনিষ মনে করিস্ !" স্নেহ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই উত্তর করিল।

ইহার পর আরো কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর নিতাই যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তা' হলে আর দেরী করব না অমিয়া !"

অমিয়া তখন গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল "আবার কতদিনে আস্‌বেন ?"

"যে সময় দরকার হবে, আর এসে তোর সঙ্গে কখন না-দেখা ক'রে যাব না এটাও তুই বিশ্বাস রাখিস্ !" নিতাই আর অপেক্ষা করা প্রয়োজনহীন মনে করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

স্নেহের এই বাড়মত্রে কে জানে কেমন করিয়া অমিয়ার চোখ ভরিয়া জল আসিতে লাগিল, সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তদ্‌গতভাবে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে সে দৃষ্টি ফিরাইতেই মাখনলাল বলিল—"কে কোন্ নিয়েছে কি করেছে, তার জন্যে তার কাছে একখানি কৃতজ্ঞ হয়ে আছ. আর আমার দীর্ঘ জীবনটা যে তোমার কাছে ঢেলে দিয়েছি সেটা বুঝি কিছুই নয় ?"

অমিয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর মুখে বলিল—"সেই একটা দিনেরেই যে গলায় আটকে গিয়েছিল, সেই এক দিনেরের মূল্যেই তুমি আজ জীবন ঢেলে দিয়েছ, নইলে দিতে না। মাথা কি আর দিতাদিদার পায়ের কাছে নত হয়, নত হয় তার

মহত্ত্বের কাছে। তোমার এই জীবন ঢেলে দেওয়ার ঋণ, আমি জীবন ঢেলে দিয়েই রোক-শোধ করব, কিন্তু ও-ঋণ কখনো শোধ করবার নয়। ও-যে কি তা তুমি বুঝ্‌তে পারবে না।" ইহার পর সে দ্রুতপদেই স্থান ত্যাগ করিল।

মাখনলাল স্তব্ধ গম্ভীর মুখে সন্ধ্যার সোনালী-আলোক মাখা আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

যা' নিজে ধর্‌তে পারিনে, তা অন্যের কাছে ধরে দেওয়া অসম্ভব; যে ভাব আমরা প্রকাশ কর্‌তে পারিনে, তাকে খেয়াল বলা যায় যায় না। খেয়াল অনির্দ্দিষ্ট কারণে মনের মধ্যে দিব্য একটি সুস্পষ্ট সু-সম্বদ্ধ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। খেয়াল রূপ-বিশিষ্ট, দুশ্চিন্তা তা' নয়।

"খেয়াল-খাতা"

কঙ্কালী

—শ্রীনরেন্দ্র দেব।

পৌষের শীত-জর্জ্জর সন্ধ্যা।

বেদের দল সারাদিন ঘুরে তাদের আড্ডায় ফিরেছে। গাঁয়ের একেবারে সীমানার ধারে, নদীর পশ্চিম কূল-ঘেঁসে যে প্রকাণ্ড পোড়ো মাঠটা ছিল, তারই মাঝখানে ছোট-ছোট কতকগুলো পাতার চালা বেঁধে তারা মাস দু'ই তিন হ'ল এসে বাস করছে।

প্রত্যেক চালার পিছন দিকে দুটো একটা ক'রে টাট্টু ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। চালার সামনে শুক্‌নো ডাল-পালার আগুন ক'রে বেদেরা এক-একদল ব'সে আঁচ-পোয়াচ্ছে। চালাগুলোর একটু তফাতে গরুর গাড়ীর মতো একখানা লম্বা দু' চাকার গাড়ী পড়ে রয়েছে। গাড়ীখানা দেখ্‌লে মনে হয়, কোন্ বাদ্‌শাদার আমল থেকে যেন সেখানা ব্যবহার হ'চ্ছে। গাড়ীর ওপরে ছেঁড়া চট্, রং-বেরঙের টুক্‌রো ন্যাকড়া ও ক্যাম্বিশ জড়ানো একটা ছই খাড়া করা আছে। আর সে-গাড়ীর তলায় তাদের একপাল ছাগল ভেড়া ছাড়া রয়েছে।

চারিদিকে তখন ঝিঁ ঝিঁ-পোকার ডাক সুরু হ'য়ে গেছে। সন্ধ্যা ক্রমেই ঘন হ'য়ে রাত্রির সঙ্গে মিশে যাবার উদ্যোগ কর্‌ছিল। তখনও মাঝে-মাঝে এক-একটা শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। চালার ভিতর থেকে কচি ছেলেদের কান্নার স্বরও এক-একবার উঠ্‌ছিল, কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্য নয়। কান্নার শব্দ কেঁপে-কেঁপে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে ক্রমে নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তারা যে মাতৃক্রোড়ের দোল-দোলায় চড়ে একে-একে ঘুমের দেশে চলে যাচ্ছে সেটা তাদের সেই কচি কণ্ঠস্বরের গতি বেশ স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিচ্ছিল।

সেই সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে আমি নদীতে হাত পা ধু'তে গিয়ে মাঝীর গান তরঙ্গের অস্ফুট কলধ্বনি শুনে চমকে উঠেছিলুম। সে যেন কোন্ অতীতের পরিচিত প্রিয়-কণ্ঠস্বর চুপি ক'রে এসে হঠাৎ আমার কাণে পৌঁছে দিলে! ঠিক্

যেমন ক'রে কম্মালী অন্ধকারের মধ্যে গোপনে আমার কাছটিতে এসে আমার কানে-কানে চুপি-চুপি কথা বল্‌তো, মাত্রী যেন আজ তার জলস্রোতে ঠিক তেমনি করেই আমার কানে সেই সুর এনে দিচ্ছিল!

আমি আর নদীর ধার ছেড়ে ফিরতে পার্‌লুম না। ঠাণ্ডা উত্তুরে-বাতাস নদীর জলের ছোঁয়া লেগে আরও শীতল হয়ে এসে আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতে কাঁপিয়ে তুল্‌ছিল বটে, কিন্তু আমার সমস্ত প্রাণটা সেদিন আরামে ভ'রে দিচ্ছিল, সেই কত দিনের অশ্রুত প্রিয়তম কণ্ঠস্বর। বিগত সুখের স্মৃতি একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে এসে আমার দেহ-মন আলোড়িত ক'রে দিতে লাগ্‌ল! পুলকের শিহরণ শীতের কাঁপুনিকে হার মানিয়ে আমার আপাদ-মস্তক রোমাঞ্চিত ক'রে তুল্‌ছিল!

মনে পড়ে গেল, সেই প্রথম দিনের কথা। ভোর না হ'তেই আমি উঠে এসেছিলুম একটা কাব্‌লী-ভেড়া কিন্‌তে, একেবারে সোজা সেই বেদের আড্ডায়! দরজার ঝাঁপ্‌ ঠেলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। ছিপ্‌-ছিপে গড়ন। পাত্‌লা ঠোঁট দুটি, কচি-ছেলেদের মতো টুক্‌-টুক্‌ কর্‌ছে গাল! টানা-টানা চোখ দু'টি তার গভীর হ্রদের কালো জলের মতো উজ্জ্বল! আমার দিকে একদৃষ্টে অবাক হয়ে চেয়ে রইল! তার সে অপলক চাহনি যেন আমার অন্তর বাহির সকলই নিরীক্ষণ কর্‌ছিল!

মেয়েটির সে কালো চোখের গভীর দৃষ্টিতে কি মোহ ছিল জানি না; আমি একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম! কি কর্‌তে এসেছি ভুলে গিয়ে আমি তার পানে শুধু চেয়ে রইলুম! সে যেন সেই মুহূর্ত্তে আমাকে সম্পূর্ণরূপে দখল ক'রে নিলে!

হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের কোনও অজ্ঞাত আকর্ষণ ছিল কি না জানি না কিন্তু এ সত্যটা বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌ছিলুম, যে আমি এমন ক'রে এক নিমেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সেই মুহূর্ত্তে তা'কেও জয় ক'রে ফেলেছি!

* * * *

ঝাঁপিয়ে এসে পড়্‌ল সে একেবারে আমার অধীর বুকের ওপর! যেন আমারই অপেক্ষা ক'রে ছিল সে এতদিন! নারীর সেই প্রথম স্পর্শে আমার নবীন যৌবন, জীবনের শ্রেষ্ঠতম বেউলে জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল! প্রেমের অভয়-শঙ্খ বেজে উঠে হৃদয়ের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পুলকের বিপুল প্রতিধ্বনি তুলে দিলে! দুইবাহু বেষ্টনে তাকে আমার নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে টেনে নিয়ে পরস্পরে একটি অনন্ত চুম্বনের আদান-প্রদানের মধ্যে আত্মহারা হ'য়ে গেলুম।

* * * *

এখনও যেন আমার মুখের উপর তার সে লঘু উষ্ণ কম্পিত নিঃশ্বাসের কুসুম-স্পর্শ অনুভব করছি! প্রতি অঙ্গে যেন সে-আলিঙ্গনের মোহ আমাকে জড়িয়ে ধরছে! আমি যেন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, সে তার পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে আমার বুকের উপর বুক দিয়ে, মুখের উপর মুখ দিয়ে, আমার কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে ধরেছে! তার মাথার চারু-চিক্কণ কোমল কেশ গুচ্ছে-গুচ্ছে ছড়িয়ে প'ড়ে আমার গণ্ডে চিবুকে স্কন্ধে বক্ষে যেন রেশমের তুলি বুলিয়ে দিচ্ছে!

সেই যে সেদিন ভোরে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলুম আর আমি ঘরে ফিরতে পারি নি। সে আমাকে তার প্রেমের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে তার হৃদয়ের রত্ন-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছিল। তার অগাধ ভালবাসার অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের মধ্যে আমি আনন্দে স্বেচ্ছাবন্দী হ'য়েছিলুম।

লঘু চঞ্চল মুক্ত বিহঙ্গিণীর মত সদা-প্রফুল্ল ছিল তার সরল শুভ্র চিত্ত। চাঁপার কলির মত সে ছিল সুন্দরী। এমনি কোমল এমনি মধুর ছিল তার সুকুমার স্বভাব যে সে অনাঘ্রাত বন্য কুসুমটিকে বক্ষে নিয়ে আমার সমস্ত জীবন, আমার জন্ম-জন্মান্তর ধন্য হয়ে গিয়েছিল।

* * * *

শীতান্তে ফাল্গুনের বসন্ত-দোলায় যখন সমগ্র ধরণী বিবাহের নব-বধূর মতো সজ্জিত হ'য়ে উঠ্‌ল, কমালীর বাপ যেসুভা আমাদের বিবাহের দিন স্থির ক'রে ফেল্‌লে। সেদিন বাসন্তী-পূর্ণিমার রাত্রি। স্নিগ্ধ জোৎস্নার আলোয় দিগন্ত হাস্‌ছে। মলয়-হিল্লোল সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধ ব'য়ে নিয়ে এসে আমাদের বিবাহ-সভা আমোদিত ক'রে তুল্‌ছিল!

রঙীন বেশে সুসজ্জিত হয়ে এসে, মৃদু হেসে কমালী আমার হাত ধ'রে দাঁড়াল। তার কালো চোখে জ্যোৎস্নার আলো নাচ্‌ছে! আমাদের দু'জনকে ঘিরে বেদে-বেদেনীর দল উৎসব-বেশে এসে তাদের চিরপ্রচলিত মিলন-গীত গাইছিল!

গান শেষ হবার পর, সর্দার মার্গো এগিয়ে এলো আমাদের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন ক'রে দিতে! তার মুখের দিকে চাইতেই আমার বুকটা কেমন শিউরে উঠ্‌ল! তার দৃষ্টিতে যেন সয়তানের ক্রূর হিংসা ফুটে উঠেছিল।

বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে মার্গো যখন সোনালী সুতোর মিলন-মালাটি তুলে ধরলে, সেই একই মালা-বন্ধনে বাঁধা পড়্‌বার জন্যে হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে আমরা দু'জনে পাশাপাশি জানু পেতে নতশিরে মাথা পেতে দিলুম।

হঠাৎ একটা বেদনার করুণ আর্ত্তনাদে আমার চমক্ ভেঙে গেল! ফিরে চেয়ে দেখি, হিংস্র বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মার্গো, কম্মালীর গলা টিপে ধরেছে! একখানা শাণিত ছুরিকা তার বুকে আমূল বসিয়ে দিয়ে বল্‌ছে—বিধর্ম্মীকে বিবাহ করার চেয়ে মরাই তোর পক্ষে ভাল—'

*   *   *   *

আমারই আলিঙ্গনের মধ্যে রক্তসিক্ত হ'য়ে কম্মালীর শেষ নিঃশ্বাস বাতাসে মিশিয়ে গেল! সেই রাত্রেই আমি মার্গোকে খুন ক'রে পালিয়ে এলুম!

তারপর পঁচিশ বছর কেটে গেছে। হায় কম্মালী! তোমার অক্ষয় স্মৃতির জ্যোতির্ম্ময়-লোক থেকে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি একপাও পিছিয়ে আস্‌তে পারি নি!

তোমাদের মেয়ে প্রায় পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায় মেয়ে। বুড়ো হলেও তোমাদের ছেলেমি যায় না,—ছেলেবেলাও আমরা বুড়োমিতে পরিপূর্ণ। আমরা বিয়ে করি যৌবন না আস্‌তে, তোমরা বিয়ে কর যৌবন গত হলে। তোমারা যখন সবে গৃহ-প্রবেশ কর, আমরা তখন বনে যাই।

"আমরা ও তোমরা"



রূপকথা

—শ্রীসোমনাথ সাহা।

নীল-সাগরের অতল তলে সাগর-রাজের সাগর-দেশ। সাগর-জলের সঙ্গে বাতাসের যেখানে মিলন, তাহার বহু বহু নীচে সাগরপুরী। ডুবুরীর দল সেখানে কোন দিন পৌঁছিতে পারে নাই। সাগর-জলের সেই অতল তলে সাগরদেশের অধিবাসীরা বাস করে।

সাগর দেশেও গাছপালা আছে। জলের স্রোতের ছন্দে হেলিয়া দুলিয়া তাহারা নাচিয়া উঠে। সে-দেশের গাছপালার পাতার মধ্য দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে মাছের দল সাঁতরাইয়া চলে। সে-দেশের গাছে গাছে বিচিত্র পুষ্প বিচিত্র হাসিতে কাঁপিয়া উঠে। সে-দেশের গাছে গাছে ফলের সম্ভার সাগর-বাসীদের প্রাণে আনন্দ জাগাইয়া দেয়।

কিন্তু সে-দেশের কেহ কথা বলে না। সে-দেশের ফুল গন্ধ বিতরণ করে না।

সাগর-দেশের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে সাগর-রাজার বিচিত্র রাজ প্রাসাদ। সাগর-ছেঁচা মাণিকে সাজান ঝিনুকের শুভ্র দেয়াল। মহার্ঘ্য স্ফটিকে রচিত তার বাতায়ন।

এই অপূর্ব্ব প্রাসাদে থাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী সাগর-রাজকন্যা।

চারিদিকে আনন্দের ঢেউ। কিন্তু রাজকন্যার মনে সুখ নাই। সে শুধু বসিয়া বসিয়া ভাবে, সাগর-দেশের ওপারে যে মানুষের দেশ আছে সেই অজানা দেশের অজানা কথা। স্ফটিকের জানালা খুলিলে চোখে পড়ে, সাগরের স্নিগ্ধ নীলের উপরে যে আলোকরশ্মি, তাহারই আভাষ। আর মাঝে মাঝে সেই স্নিগ্ধ নীলে আঁধার-ছায়া ফেলিয়া মেঘের মত মন্থর গতিতে যে জাহাজ যায়, চিরস্তব্ধ সেই সাগরদেশে মানব-জগতের সাড়া লইয়া আসে তাহারই শব্দ। রাজকন্যার প্রাণে জাহাজের সেই শব্দ, দূরের শব্দ-গন্ধময় মানব-জগতের আহ্বান

বহিয়া আনে। চিরশান্তিময় সাগর-দেশের রাজদুহিতার প্রাণে অশান্তির সাড়া রাজকন্যার সখীরা অনুভব করে! কিন্তু কথা কহিয়া প্রাণের ভার লাঘব করিবে সে শক্তি ত নাই।

আকাঙ্খা ক্রমে বাড়িয়া উঠে!

ভাসিয়া কতদিন সে উপরে উঠিয়া আসে, কিন্তু জলের উপরে মাথা তুলিবার শক্তি নাই। জলের তল হইতে মাঝে মাঝে দেখিতে পায়, মানুষের জগৎ চন্দ্রের শুভ্র কিরণে ভাসিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে যখন অমাবস্যায় কালী পৃথিবীকে ঘিরিয়া রাখে, মুক্ত আকাশে অযুত নক্ষত্রবালা ঘোমটা খুলিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া উঠে। মানব-জনপদে ঘরে ঘরে মঙ্গল প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো, সাগর তীরে দীপালী-উৎসব জাগাইয়া তুলে। স্তব্ধ দেশের মূক-বালার অধীর অন্তকরণে মানুষের ঐ সাগরপ্রদীপের মাঝখানে, শঙ্খধ্বনির সুরে আপনাকে লুটাইয়া দিবার অধীর আশঙ্কা জাগিয়া উঠে।

জল তাহাদের জীবন। জীবনের প্রথম জাগরণ-মুহূর্ত্ত হইতে দেহের প্রতিটি বিন্দু জলে গড়িয়া উঠিয়াছে। যদি সে দেহের লোমকূপ বাতাসের স্পর্শ পায়, বাতাসের স্পর্শে সাগর-জলের অধিবাসী সাগরবাসের অধিকার হারায়।

সাগর দেশের রাজকন্যা তাই জলের উপরে উঠিতে পারে না। মানুষের নব-বিচিত্র দেশের অধিবাসীর মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু চিরপরিচিত পুরাতন হইতে নূতন সুন্দর হইতে পারে, তবু যেখানে পুরাতনকে চিরদিনের মত ত্যাগ করিতে হইবে সেখানে কেবলমাত্র নূতনত্বের মোহই পুরাতনকে ত্যাগ করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিমান নয়।

জলের নীচে জলের পরিপূর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া সাগর-রাজকন্যা মানব দেশের স্বপ্ন-গৌরব কল্পনা করে। দিনের পর দিন যায়—জলের তলে সূর্য্যের রশ্মির ক্ষীণ আভা প্রতিফলিত হয়। জলের তলের সাগর দেশের গভীর আঁধার লইয়া রাতের পর রাত আসে।

একদিন প্রভাতে, পৃথিবীকে মেঘের ঘনঘটা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সাগরবক্ষের উর্ম্মিমালা মাথা উঁচাইয়া পৃথিবীর পাহাড়ের সমকক্ষ হইবার চেষ্টায় তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

সাগররাজ-দুহিতা ঢেউয়ের দোলায় দুলিতে দুলিতে দেখিতে পাইল, মানববাহী একখানি ক্ষুদ্র পোত ঝড়ের আর জলের যুদ্ধের মাঝখানে আপনার মাথা উঁচু

করিয়া রাখিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া হঠাৎ সাগরের অতল তলে যাত্রা করিল। অর্দ্ধ যাত্রীর হাহাকার ঝড়ের জলেও বেদনার কম্পন বহন করিয়া আনিল।

সাগরবালার কোমল বক্ষে সে আর্ত্তনাদ এক অভিনব বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। রক্ষা করিতে হইবে অন্ততঃ একটি মানব-প্রাণীকেও। ঐ শব্দ-গন্ধময় জগতে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

রাজকন্যার কোমল বাহুবল্লরী মানবদেশের একটি তরুণকে আশ্রয় দান করিল। জলের ঢেউ নাচিতে নাচিতে তাহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া গেল মানব-দেশের সাগর তীরে। মানব-তরুণকে জলের সমাধি হইতে রক্ষা করিতে সাগর-তরুণী নিজের অজ্ঞাতসারে আপনাকে বাতাসের রাজত্বে সমাহিত করিল।

* * * *

সাগর কূলের ঝড়ের হাঁক-ডাক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর স্নিগ্ধ বাতাস সাগর-কুমারীর চুলের ঢেউয়ে শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছে। অদূরে মানবগৃহ। সন্ধ্যার সে দীপালি-উৎসব নিভিয়া গিয়াছে—শুধু এক-আধটি ঘরের মৃদু মঙ্গল দীপশিখা স্তিমিত নেত্রে সন্ধ্যার উৎসবের সাড়া জাগাইয়া রাখিয়াছে।

ধীরে ধীরে মানব-তরুণের চেতনা ফিরিয়া আসিতেছে। কি অপূর্ব্ব সে জাগরণের সাড়া! চোখের পাতা ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। ধীরে ধীরে সে তাহার পৃথিবীকে চিনিয়া লইল। কিন্তু যে তাহাকে রক্ষা করিতে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে মানব-তরুণ তাহাকে চিনিতে পারিল না। ভিন্ন জগতের প্রাণী তাহার চোখে ছায়া ফেলে না, বোধ হয় তাই সাগর-বালাকে সে দেখিতে পাইল না!

অদূরের মানব-জগতের দীপরশ্মি তাহাকে আহ্বান করিল। ধীরে ধীরে দুর্ব্বল দেহ বহন করিয়া সে চলিয়া গেল।

সাগরবালা সাগরকূলে আছাড়িয়া পড়িল।

সাগরকূলের বাতাসের প্রতিকণার আজও সাগরবালার ব্যর্থ ক্রন্দন আকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

ত্যাগ

(জাপানী কাহিনী হইতে)

— শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ।

দুই তিন বৎসর অজন্মা হওয়ায় এবারে জন সাধারণ কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। অন্নকষ্ট এমনই ব্যাপক হইতেছিল, যে অচিরে অনেকের অদৃষ্টে এক বেলা এক মুঠা ভাতও আর জুটিবে বলিয়া বোধ হয় নাই !

রাজা অত্যন্ত সদাশয় ছিলেন। তিনি প্রজাদের এ-বৎসারর জন্য খাজ্‌না রেহাই দিলেন। আর আদেশ দিলেন, প্রত্যেক চাষীকে তার নিজের দরকার মত সামান্য কিছু বাদে উদ্বৃত্ত ধান গম কিম্বা অন্য ফসল যা কিছু আছে তাঁহার কাছে জমা দিতে হইবে। এ জন্য দাম অবশ্য তিনি যথেষ্টই দিবেন। যা'দের মোটেই সংস্থান নাই তারা সরকার হইতে নিয়মিতরূপে আহার্য্য লইয়া যাইবে।

রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে অনর্থ ঘটিতে পারে বলিয়াও বটে, আবার এই সুযোগে দ্বিগুণ লাভ করিবার ইচ্ছাতেও, আড়ৎদারেরা যে যা পারিল রাজাকে বেচিয়া গেল। কিন্তু মধ্যবিত্ত যারা, তারা ভবিষ্যৎ ঘোরতর দুর্দ্দিনের কথা ভাবিয়া কিছু দিল না। আর যারা গরীব, তাদের ত কথাই নেই।

নমুরা নামে এক চাষী ছিল। বয়স তার ষাটের কাছাকাছি ;—কিন্তু আজও নিজের হাতে চাষ করিয়া খায়। আর না করিলেই বা কিরূপে চলিবে ? একদিন তার অবস্থা ভাল ছিল ; তার গোলা ভরা ধান ছিল ; তিনটি উপযুক্ত পুত্র ছিল, গায়েও অসামান্য ক্ষমতা ছিল। তারা চারজনে জল ঝড় শীত গ্রীষ্ম কিছু না মানিয়া মাঠের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করিত ; অবসর মত তাঁতে গামছা বুনিত অথবা প্রপিতামহের আমলের একটা ডুগ্‌ডুগি ও একটা কাঁসর বাজাইয়া বুদ্ধ দেবের নাম গান করিত। সন্ধ্যাবেলা তাদের আট-চালাতে পাড়ার অনেক-গুলি যুবা ও বৃদ্ধের মিছিল বসিত। সংসারের অতি তুচ্ছ ঘটনা লইয়া কত না নিখিঁ মনেই তাহারা গল্প-গুজব করিয়া সারাদিনের খাটুনির পর মনটাকে

হাল্‌কা করিয়া লইত। তারপর একদিন রুশের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তার বড় ছেলে দুইটি, সৈনিকের কাজ লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল, আর ফিরিল না। সে বছর প্লেগ আসিয়া যখন গ্রামকে গ্রাম উজাড় করিতে ছিল, বুড়ার নয়ন-মণি, এক মাত্র বংশধর কিমুরা প্লেগ রোগীদের সেবা করিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। বুড়ার শিথিল হস্তের বন্ধন ছিঁড়িয়া তিনটি পুত্রই নিরুদ্দেশের পথে প্রয়াণ করিল, কোন বাধা মানিল না, কোন ওজর শুনিল না। আর তার আপন বলিতে কেহ নাই। সে আজ জীবন-সন্ধ্যায় একা চাস করে, একা তাঁত বোনে, একা গান গায়!

নমুরার আজ তিন বস্তা মাত্র চাল ছিল। সে তার সব ক'টি রাজপুরুষদের সামনে ধরিয়া দিল। নিজের জন্ম কিছু রাখিল না। রাজপুরুষেরা দাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমার মুখের গ্রাস আমি স্বেচ্ছায় দিতেছি, এর যথার্থ দাম তোমরা কেন স্বয়ং রাজাও দিতে পারবে না, আর আমিও কিছু নেব না।

এরূপ উত্তরে সকলেই বিচলিত হইলেন। তাহার দত্ত জিনিষ সে ত ফেরৎ লইল না, দামও চাহিল না। তাঁহারা তখনই এই মহাপ্রাণ কৃষকের কথা রাজার কাছে নিবেদন করিতে গেলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে বুড়া একবার প্রাণ খুলিয়া হাসিল। সে তার ভাঙা শরীরটাকে একবার খাড়া করিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিল। কাঁধ হইতে যেন একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গিয়াছে এই ভাবিয়া সে আনন্দে বিভোর হইয়া ছিল।

তার সকল কাজ ফুরাইয়াছে। সে **আজ মুক্ত**। ক্ষুধায় তার নাড়ী জ্বলিতেছে, সে কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করে না। একদি**ন দু'দিন** এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। বুঝি সে আর সহিতে পারে না! সে তার নিজের জীবন নিজের হাতে দেশ-মাতৃকার পায়ে অর্ঘ্য দিয়াছে, কেমন করিয়া ফেরত চাহিবে?

না—না—আর যে সহ্য হয় না! অনাহারের ব্যথা এত তীব্র সে ত আগে বোঝে নাই! চাই—ভাত চাই! দু'মুঠা ভাত তাহার চাই-ই!

শূন্য মরাইএর ভিতর সে উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া গেল। নিজের জন্ম কিছুই ত রাখে নাই! একবার শয়ন কক্ষে একবার রান্নাঘরে সে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। 'কোথাও কি দুমুঠো চালও পড়ে নেই?' সে চীৎকার করিয়া কাঁদিল—দু'মুঠা ভাত—ওগো দু'মুঠা ভাত আমায় দাও!

সহসা মনে পড়িল, আগামী বৎসরে বীজ বুনিবার জন্ত একবস্তা ধান যে সে লুকাইয়া রাখিয়াছে! আনন্দের আতিশয্যে সে লাফাইয়া উঠিল। তখনই বস্তাটাকে পাড়িয়া আনিয়া ঢেঁকির কাছে গেল। একটা দা লইয়া বস্তার মুখ ছিঁড়িতে যাইতে ছিল। অমনি তার কাণে আসিল, একটা রুদ্ধ হাহাকার।—তার নিজের কথার প্রতিধ্বনি বোধ হয় তখনো তাকে ঘেরিয়া কাঁদিতেছিল—দু'মুঠা ভাত—'ওগো দুমুঠা ভাত!'

সে চমকিয়া উঠিল। দেখিল সারা দেশ তৃষিত ব্যগ্র আঁখিতে তার ঐ অবশিষ্ট ধান ক'টির দিকে চাহিয়া কাঁদিতেছে 'দু'মুঠা ভাত—দু'মুঠা ভাত আমাদের দাও!'

সে দা ফেলিয়া দিয়া দুর্ব্বল বুকখানাকে হাতে চাপিয়া ধরিল। একবার আকাশের দিকে চাহিল। ওকি! ঐ যে তার তিন ছেলে! হাঁ, তারাই ত! ঐ যে তারা—তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিতেছে 'আমরা তোমার ছেলে, দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছি! আর তুমি?—

নমুরা উপরে তাকাইতে পারিল না। একটা ধিক্কারে তার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

সমস্ত দিনের মধ্যে যে সে কতবার ক্ষুধার অত্যধিক জ্বালায় অতিষ্ট হইয়া দা কুড়াইয়া লইয়াছে, কিন্তু তখনই একটা ব্যথাভরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাহাকে চঞ্চল করিয়াছে,—'ওগো দু'মুঠা ভাত দাও আমাকে!'—আর সে দা ফেলিয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

ওদিকে রাজা যখন শুনিলেন, নমুরা তার দত্ত জিনিষের দাম নেয় নাই, তিনি তখন রাজপুরুষদের তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'তার দান আমি নেব? এমনই দুর্ভাগ্য আমি—একটা চাষা আমাকে দান করাবে? তোমরা এখনি ফিরে যাও, তার সমস্ত চাল ফেরত দিয়ে এস। আর সে যা চায়—একটা সহরের অধিকারও যদি চায় তা দিতে স্বীকার পেয়ে আমাকে ঋণ মুক্ত কর। আমার নিজের দশ ঘোড়ার গাড়ী ক'রে তাকে সসম্মানে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি নিজের হাতে তাকে তার প্রার্থিত জিনিষ দেব।

রাজপুরুষেরা আবার নমুরার কুটিরে তাকে তার চাল ফেরত দিতে আসিলেন। সেখানে দেখিলেন একবস্তা ধানের উপর লোকটা শুইয়া ঘুমাইতেছে। মুখ তার অত্যন্ত বিবর্ণ, কিন্তু চোখের কোণে কি যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দের পরশ-ছোঁয়া হাসির রেখা লাগিয়া রহিয়াছে!

শুধু একটা সহর নয়,—রাজার সমস্ত রাজ্য দিতে স্বীকার করিয়াও ময়ূরাকে কেহ আর জাগাইতে পারিলেন না। তার তিন বস্তা চালের দাম সারা পৃথিবীতে মিলিল না।

ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।

'কথার কথা'

গোষ্পদ

—শ্রীযুবনাশ্ব।

রবিবারের অলস দুপুর। চারিদিক নির্জীব, ক্লান্ত। গাছের ডালে কাকটা অনেকক্ষণ পর-পর অবসন্ন ভাবে মাঝে-মাঝে ডাক্‌ছে।

চারদিকের এই শ্রান্ত শান্তির মধ্যে আলস্য নেই—ঐ ভিখারীর দলের। দল বেঁধে, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে, তারা দোরে-দোরে ঘুর্‌ছে। রবিবারেই তাদের যা কিছু রোজগার। দলের প্রায় সবাই মেয়ে।

আর ক্লান্তি ছিল না তার, যে ঐ ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর ধ্বংসপথের যাত্রীদের মাথার ওপরে আগুন ঢাল্‌ছিল! খাঁ-খাঁ রোদে পথঘাট তেতে উঠেছে, হাওয়ায় গা ঝল্‌সে যাচ্ছে—মাথার চাঁদি ফাট্‌বার যোগাড়!

কিন্তু ভিখারীর আবার রোদ-বিষ্টি! পেট চালাতে হবে ত?

সম্প্রতি রাস্তা দিয়ে যারা চলেছে, তারা হচ্ছে পটলডাঙ্গার দল। দলের মধ্যে সব গোণা-গুন্‌তি। বাইরের কেউ যে ফাঁকি দিয়ে এসে দলে ঢুকে তাদের সাথে রোজগার ক'রে যাবে, তার যো'টি নেই। মোড়ল খেঁদি-পিসীর এম্‌নি কড়া নজর! এই ত সেদিন হাটখোলার কুসুম এসে ভিড়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে কি কাণ্ডটাই না হল! খেঁদি ত বেটিকে খুন কর্‌তে বাকী রেখেছিল!

দলের সবাই তাকে ভয় কর্‌তও যেম্‌নি, নামও তেমনি আশে পাশের পাঁচখানা পাড়ার সব দলই জান্‌ত।

এ-হেন ডাক্‌-সাইটে খেঁদির দল চলেছে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ধরে। সাম্‌নেই একটা বড় বাড়ী দেখে সবাই হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়্‌ল। কাচ্চা-বাচ্চা কতকগুলো চাপা পড়্‌বার উপক্রম হয়েছিল—চ্যাঁ-ভ্যাঁ ক'রে কাৎরে উঠ্‌ল। বড়দের মধ্যে এই সূত্রে একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে গেল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা, অর্থাৎ ভিক্ষে পাওয়াটা তখনো বাকী, তাই লড়াই বেশী দূর গড়াল না।

—হরেঃ-কেস্‌টো।—দুটি ভিক্ষে পাই বাবা!

—এই যো—ঠাব্‌ যাও উধর্‌—মৎ আও—মৎ ক।ও—

দরওয়ানজীর হুমকীতে আর কেউ বেশী দূর না এগিয়ে ঐ খানেই থেমে গেল। তার পর আঁচল, কোঁচড়, থলে,—যার যা ছিল, সবাই তাই পেতে, সিকি-মুঠো ক'রে চাল নিয়ে আবার রাস্তায় নেমে পড়্‌ল।

বাইরে এসেই খেঁদি দাঁড়াল। এটা দলের নিয়ম। প্রত্যেক জায়গা থেকে বেরোন মাত্রই সবাইকে একবার ক'রে গুণ্‌তি ক'রে নিতে হয়। আর সবাই যে যার মত বক্‌-বক্‌ কর্‌তে কর্‌তে, অথবা ছেলে পিট্টতে-পিট্টতে এগুলো। হঠাৎ খেঁদি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—এই মাগী, তুই কে লা?

যাকে লক্ষ্য ক'রে এ-কথা বলা হল, সে বুক পর্যান্ত ঘোম্‌টা টেনে চলেছিল। কেউ তাকে এর আগে লক্ষ্য করে নি। তার কাপড়খানা অন্য সবার মতো অত জীর্ণ নয়,—একটু ফর্‌সাই। চলনটাও বাধো-বাধো।

খেঁদি তার হাতে ধরে হিড়্‌হিড়্‌ ক'রে টেনে একপাশে সরিয়ে নিয়ে এল। দলের দিকে ফিরে বল্‌ল—যা, যা—তোরা এগো! তারপর মেয়ের কাছে এসে বল্‌ল—তু মাগী কোত্থেকে এয়েচিস্‌? খেঁদি-মোড়লনীর নাম শুনিস্‌ নি? দেখি দেখি মু'খানা তোর—

বলে এক টানে তার মুখের কাপড় সরিয়ে দিল। দিয়েই অবাক্‌ হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

—ওমা—এ যে ভদ্দর ঘরের মেয়ে গো—!

খানিকক্ষণ তার মুখে কথাই ফুটল না। মেয়েটি ততক্ষণে নিজের মুখের কাপড় আবার টেনে দিয়েছিল। খেঁদি দলের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বল্‌ল—ক্যাষ্ট, আজ তুই খবরদারী করিস্‌। আমি ফিরছি।

বলে, মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ীর পথ ধর্‌ল।

দলের সবাই একটা রহস্যের গন্ধ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ফের্‌বার উপায় নেই, তাহলে পিসী কি আর আস্ত রাখ্‌বে? তা ছাড়া পেটের তাড়া!

গলির পর গলি, সরু, মোটা, আব্‌ড়া, অন্ধকার—নানা রকম রাস্তা পার হয়ে আস্তানায় পৌঁছে খেঁদি বল্‌ল,—এইবার বল ত বাছা, কোত্থেকে এয়েচো?

সার সার মাটি লেপা অন্ধকূপ। বিশ্রী গন্ধ। ধোঁয়া। একটা ঘর থেকে অনবরত ধোঁয়া বার হয়ে দম্‌ ফেল্‌বার উপায় টুকুও বন্ধ করেছে। একটা ঘরে কে মরেছে। মড়াটা টান দিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে। একটু ঢাকাও নেই—সর্ব্বাঙ্গ মাছি ও পোকায় ছাওয়া!

মেয়েটি দু'একবার চারদিকে তাকিয়ে ঘোমটার মধ্যেই শিউরে উঠ্‌ল। তার পর, মা গো—বলে সেইখানে বসে পড়্‌ল।

খেঁদি বিরক্ত হয়ে বল্‌ল—কি গেরো! বলি ভিরমী গেল নাকি! কি গো ভাল-মানুষের মেয়ে—বলি দু' কদম হাঁটতে পারবে? চল চল, আমার ঘরে—সেখানে গে' সব বল্‌বে চল।

ঘরে ঢুকে, দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে, দিনের রোজগার চাল কটি ও গোটাকয়েক পয়সা সযত্নে এককোণে রেখে, খেঁদি এসে মেয়েটির সামনে বস্‌ল। বল্‌ল—এইবারে মুখের কাপড় খোল। ওকি কাঁদচ? তুমি নতুন লোক বুঝি? আর ভাত বটেই, সে ত তোমার চেহারাতেই লেকা রয়েচে। তা এমন দুরন্ত থাক্‌তে ব্যবসা না ক'রে পথে বেরিয়েচ যে বড়? ব্যারাম পীড়ে হয়েচে বুঝি?

মেয়েটি দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠ্‌ল।

খেঁদি মহা বিরক্ত হয়ে বল্‌ল—জ্বালা ঠ্যাকারের মধ্যে পড়্‌নু যে! এ যে রা-বাক্যি কিছুই নেই, যা বলি তাতেই কাঁদে! বলি বাছা, সব খুলে না বল্‌লে কি ক'রে বুঝ্‌ব? আর, তা না বলে ঠাঁইও ত পাবে না এখানে! বাইরের মানুষের হেথা থাক্‌বার নিয়ম নেই। তুমি যদি দলে ভর্ত্তি হও, তবে অবিশ্যি থাক্‌তে পাবে। ঘর নিজেই গড়ে নাও, চাই আর কারো সাথে বক্‌রা ক'রে থাকো, সে তোমার ইচ্ছে! কিন্তু আগে সব শোনা দরকার ত?

মেয়েটি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে ফুঁপিয়ে, কেঁদে, নাকের জল চোখের জলে এক হয়ে যা বল্‌ল; তার মর্ম্ম এই—

সে পাড়াগেঁয়ে গেরস্ত ঘরের বউ। সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, তেম্‌নি এক পুরুষের সাথে কল্‌কাতায় কালীঘাট দেখ্‌তে আসে। তার সাথী তাকে নিয়ে এসে মানিকতলা খালের কাছে এক বাড়ীতে রাখে। একদিন বেড়াতে যাবার নাম ক'রে তাকে নিয়ে, নেবুতলার এক বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে সরে পড়ে। গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি যা ছিল, সব সে নিয়ে গেছে। গলার একটা মালা ছিল, তা সেই নেবুতলার বাড়ীউলি কেড়ে রেখেছে।

তার সাথী চলে যাবার পর প্রথমটা সে কিছুই বোঝে নি। বাড়ীউলি তাকে নানারকম আশ্বাস দিয়েছিল। দিন দুই থাক্‌বার পর, একদিন রাত পোটা এগারোর সময় তার ঘরে দুজন মাতাল ঢোকে। সে ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে।

জ্ঞান যখন ফিরে এল, তখন সকাল হয়েছে, তারা ফিরে গেছে।

বাড়ীওয়ালি এসে বল্‌ল—কি বাছা, খবর ভাল ত?

তার কথা কইবার শক্তি ছিল না। বাড়ীওয়ালি আগের দিনই তার ঘরটা দখল করেছিল, কাজেই জবাব না পেয়ে বিশেষ মেজাজ খারাপ করল না। বরং বল্‌ল—তা ঘুমোও বাছা! প্রথমদিন, একটু কাহিল ত লাগ্‌বেই!

বেলা গোটা দশেকের সময় মনের ও শরীরের অসহ্য যন্ত্রনায় সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। কোন্ পথ আর তার খোলা আছে? সে কয়বাড়ী আশ্রয়ের চেষ্টা কর্‌ল। সবাই কেমন ক'রে যেন তাকায়, সব শুনে ফিরিয়ে দেয়। সব পথ বন্ধ—ভিক্ষেই কর্‌তে হবে! কিন্তু একা-একা, নতুন মানুষ, ভেবে কূল পাচ্ছিল না। তাই পথে এসে দাঁড়িয়েছিল বড়বাড়ী থেকে পটলডাঙ্গার দল বার হতেই তাদের সাথে জুটে গিয়েছিল। ভেবেছিল, এতবড় ভিখারীর দলে মিশে থাক্‌লে কেউ তাকে লক্ষ্য কর্‌বে না।

খেঁদি বল্‌ল—তা—তোমার যে' বাছা, আমাদের দলে যাদের দেখ্‌লে, সবাই ত ওই করত এককালে! পরে, বুড়ো হয়ে, কেউ ব্যায়রামে পড়ে, পথে বেরিয়েচে। তোমার এই বয়েস, অমন চেহারা—তা বাপু নিজে বোঝ।

মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

এবার আর খেঁদি কান্না শুনে খিট্-খিট্ ক'রে উঠ্‌ল না। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কি ভাব্‌ল। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বল্‌ল—আচ্ছা, থাকো! কিন্তু এ চেহারা নিয়ে কল্‌কাতা হেন জায়গায় কি সাম্‌লে থাক্‌তে পারবে? আমার খবরদারীতে যতক্ষণ থাক্‌বে, ততক্ষণ অবিশ্যি ভয় নেই। কিন্তু সব সময় ত আমিও চোখ-রাখ্‌তে পার্‌ব না?

মেয়েটি আবার চোখে আঁচল দিতেই খেঁদি বলে উঠ্‌ল—আচ্ছা আচ্ছা—ভয় নেই; কেউ তোমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। আমি একা থাকি, এইখেনেই দুজনে থাক্‌ব এখন!

মেয়েটি পটলডাঙ্গার দলে ভর্ত্তি হয়ে গেল।

সমুদ্রে এক ফোঁটা জল বাড়্‌ল!

১৩৫

মুক্তি-পথে

—শ্রীসুবোধ রায়।

সকল বাধা হেলায় দলে'
এবার আমি চল্‌ব সোজা,
মাগো আমার মুক্তি-আলো
মিথ্যা যেন হয় না খোঁজা।
চল্‌তে গিয়ে বাজ্‌লে কাঁটা
ব্যর্থ আমার হবেই হাঁটা,
একটা কাজে খাট্‌তে গিয়ে
বাড়্‌বে আরেক কাজের বোঝা।
শক্তি আমার হয় যে প্রবল
পূর্ণ সফলতার লাগি',
মাগো তোমার পুণ্য-পরশ
শূন্য প্রাণে তাই ত মাগি।
ব্যাকুল এ মোর বুকের ক্ষুধা
চায় যে শুধুই পরশ-সুধা;
নইলে নয়ন মেল্‌লে কি হয়
ভেতর যদি থাকেই বোজা।



—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

William Le Quex নিজের জীবন-কাহিনী বিবৃত কর্‌বার কালে যা বলেছেন, তা প্রত্যেক সাহিত্যিকেরই উপভোগ্য হবে। আমি এখানে তা উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

Le Quex লিখ্‌ছেন—"আমার বাবা ছিলেন ফ্রেঞ্চ, মা ছিলেন ইংলিশ, তাই আমি হয়ে উঠেছিলাম একজন বিশ্ব-প্রেমিক। আমার মা-বাবা দু'জনেই খুব দেশ-ভ্রমণ কর্‌তেন। তিনবার তাঁরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন, অতএব আমার মধ্যেও এই ভ্রমণ-স্পৃহা অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল। এবং পঁচিশ বছর ধরে আমি ক্রমাগত বেড়াচ্ছি। প্রতি বৎসরে আমার মতন কেউ বেড়ান্ কিনা সন্দেহ। আমার বই-এর নূতন নূতন কথা ও ভাবের অনুসন্ধানে আমি সমগ্র ইউরোপের এক কোণ থেকে আর এক কোণ ভিশেহারার মতন ঘুরে বেড়াই। এই বেড়ানো আমার ভালো লাগে।

আমার যখন ছ বছর বয়স, তখন বাবা সকলে আমাকে ও মাকে ফেলে জার্মাণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌তে যান—১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। অনেক মাস ধরে আমরা তাঁর কোনো খবর পাই নি এবং মা, তিনি মরে' গেছেন জেনে অবশেষে শোক কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু প্রায় এক বছর বাদে তিনি ফিরে এলেন। তাঁর সে চেহারা এখনো আমার মনে আছে—কৃশ, ম্লান, জীর্ণ, শ্রীহীন। সে মুখ ভুল্‌ব না। তাঁকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল হত্যা কর্‌বার মত্‌লবে, কিন্তু তিনি জীবন নিয়ে পালিয়ে আসেন।

শৈশবে আমি বেশী কিছু শিক্ষা পাই নি। ইংরাজির চাইতে আমি ফ্রেঞ্চ, লাটিন ও স্প্যানিস্ ঢের ভালো জান্‌তুম্। আমার ইংরাজি-ব্যাকরণের ভুল ধরে, যাঁরা আমাকে আক্রমণ করেন, তাঁদের আমি বলি যে, ব্যাকরণ না জেনেই আমি

ইংরাজি শিখেছিলুম। জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ Doctor Leitner-এর কাছে আমি আরবি শিখি। আমি আমার দু'খানা উপন্যাস "The Valley of the Shadow" ও "Behind the Throne" প্রথম ল্যাটিন্ ভাষায় লিখি এবং পরে ইংরাজিতে অনুবাদ করি। জানি না কোনো ইংরেজ উপন্যাসিক এমন অদ্ভুত কাজ করেছেন কি না।

আমার শৈশবের অনেকগুলি বৎসর কাটে, আমার এক প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোভী ও গোঁয়ার-গোবিন্দ শিয়াল-শিকারী কাকার সঙ্গে; ষ্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে একটি ছোট পাড়াগাঁয়ে। আমি গল্প লিখ্‌তে ও ছবি আঁক্‌তে সুরু করলাম। কিন্তু অবশেষে একটি শ্রান্তি এল, ভাল লাগ্‌ল না এই এক-ঘেয়েমি! শেষে হাত-খরচের টাকা বেশ ক'রে জমিয়ে একদিন তল্পি-তল্পা বেঁধে সরে পড়্‌লুম। একটা থার্ডক্লাশ টিকিট কিনে genoa-র দিকে রওনা হলুম। সেই প্রশস্ত সহরে রৌদ্র-তপ্ত মধ্যাহ্নে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লুম চাকরীর সন্ধানে। বাবা মা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপ্‌লেন,—আমি তখন না খেতে পেয়ে মরছিলুম, তবু কোন জবাব দিলুম না।

শেষে বরাত জোরে একটা কেরাণীর চাক্‌রী জুটে গেল। নীরস শুক্‌নো এ সব কাজ-কর্ম্ম ভাল লাগ্‌ল না। Nice-এ চলে গিয়ে একটা রাস্তা মেরামতী আফিসে চাক্‌রী নিলুম। চাকরী-করা আমার বরাতে বিধাতা লেখেন নি। ছয় মাস পরে সেখান থেকে প্যারীতে পাড়ি দিলুম। বাবা আমাকে টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন, যদি আমি শিল্প-চর্চ্চায় মনোযোগ দিই।

তাই দিই। চার বছর ধ'রে বন্ধনমুক্ত খুশীভরা বোহিমিয়ান্-জীবনযাপন করতে লাগ্‌লুম প্রচণ্ড স্ফূর্ত্তিতে। এ-সময় আমার সঙ্গে অনেক লোকের পরিচয় হয়, যাঁরা পরে সমস্ত পৃথিবীর খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। যে পুরোনো ভাঙা বাড়ীটায় আমি থাকতুম, সেখানে Paul Deschanel-ও থাক্‌তেন, যিনি Republic-এর President হন পরে। তিনি আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত।

Emile Richebourg-এর রচনা পড়ে আমার ফের লিখ্‌তে ভারী সখ হল। ছবি আঁকায় যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। গল্পের খোরাক্ জোগাবার জন্যে সন্ধ্যাগুলি ছাত্রদের 'কাফের' কাটিয়ে দিতে লাগ্‌লুম রগ্না ক'রে অজস্র চালিয়ে। অনেকবার কসরৎ ক'রে, ও অনেকগুলি লেখা সিঁদুরের মতন কেটে কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে অবশেষে একটি ছোট্ট গল্প লিখ্‌লুম, তার নাম দিলুম—La Pipe

Cassee, ও ছাপ্লুম। কেন জানি না, গল্পটি Zola-কে ভারি মুগ্ধ করল। Zola এসে আমাকে উৎসাহ দিয়ে গেলেন এবং তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। সেখানে Madame Zola, Alphonse Daudet, Jules Verne প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হল।

Zolaর পরামর্শ-মত আমি লিখে চললুম। ছবি আর আঁকব না স্থির করলুম। এক রাত্রে আমার তুলি রঙ্ প্যালেট্ সীন্-নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম; জুতো থেকে প্যারীর ধুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার যাত্রা করলুম নিরুদ্দেশের অভিসারে। নিঃসঙ্গ নিঃস্ব হয়ে দীর্ঘকাল ধরে ফ্রান্স, বেল্জিয়াম, জার্মাণী বেড়িয়ে বেড়িয়ে শ্রান্ত হয়ে আবার ইংলণ্ডে এসে মাথা গুঁজ্লুম।

এখানে এসে Eastbourne Gazette পত্রিকার সম্পাদনা-বিভাগে ভর্তি হলুম। সাত মাস সেখানে কাজ ক'রে Middlesex Chronicle এর সম্পাদনা হাতে নিলুম। সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে Daily Telegraph, Standard ও Timesএর রিপোর্টার হলুম। তাও দি'লুম ছেড়ে। শেষে Londonএর Globe-এর রিপোর্টার হলুম।

এখানে আমায় বিষম কাজ করতে হত। সকাল সাড়ে-সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত। আর ভালো কাজ পাচ্ছিলুম না হাতে। সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনী খেটে Saint Martins লেনে আমার Flatএ যেতুম। শেষরাত্রি জেগে উপন্যাস লিখ্তুম। খাবারও সময় পেতুম না। আর যা খেতে পেতুম, আমার এক বন্ধু Alfred Harmsworth কে তার কিছু ভাগ দিতে হত।

এমনি অবস্থায় আমি দু'খানা বই লিখি। অনন্ত সাহারার জ্বালা-বিদীর্ণ বুকের ইতিহাস। আমার মনে হয়, যে "Sheik'এর কল্পনা ও ভাব জনসাধারণকে এত মুগ্ধ করেছে, তার সৃষ্টি-মূলে আমার এই বই দু'খানির কিছু ছায়া পড়েছে। আমার 'Zoraida' ও 'The Eve of Ister' সবাইকে মুগ্ধ না করতে পারে, কিন্তু এরা যে একটা নূতন আন্দোলন তৈরী করেছিল তার সন্দেহ নাই। কেন না এ দু'খানি বই এত বিক্রী হয়েছিল যে পনেরো শ' পাউণ্ডেরও বেশী রয়্যালটি আমার পাওনা হয়েছিল প্রকাশকদের কাছ থেকে।

কিন্তু এই রয়্যালটি আদায় করবার দিন শোনা গেল, যে আমার এই দুই ইংরেজ প্রকাশকেরা দেউলে হয়ে গেছেন এবং আমি শুধু রয়্যালটি নয় আমার গ্রন্থস্বত্ব পর্য্যন্ত হারিয়ে বসে আছি। দুই বৎসরের এই প্রাণপাত পরিশ্রম ও সাধনায় গড়া আমার এই দু'খানি বই। জানি না জীবনের এমন কোন শোচনীয় স্মরণীয়

দিনে কেউ এত বড় আঘাত পেয়েছেন কি না। আমার মনে আছে আমার বন্ধু Harmsworth সেদিন আমার এই দুঃখে কতখানি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু আমি বুঝ্‌লুম, যাঁরা প্রথম এই সাহিত্য-সাধনায়, এই কলা-সরস্বতীর বন্দনায় ব্রতী হবেন, তাঁদের পরীক্ষা কর্‌বার জন্যই এই সব ব্যর্থতা ও দুঃখ আসে। St James Parkএ বন্ধুর সঙ্গে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে বন্ধু যখন আমাকে ফের লেখা আরম্ভ কর্‌তে উপদেশ দিলেন, আমি অভিমানে সেই উপদেশকে অস্বীকার কর্‌লুম না। উঠে পড়ে লেগে গেলুম। Globe-এর কাজ ছাড়্‌লুম। Harmsworth তখন Daily Mail নামে একটা কাগজ বের কর্‌ছে। তাতে আমি একটা বড় পদ পেলুম। তা ভালো লাগ্‌ল না। আমি কাগজখানার বিদেশী বার্তাবহের কাজ নিয়ে Nice-এ গিয়ে বাস কর্‌তে লাগ্‌লুম, উপন্যাস লেখ্‌বার অভিসন্ধিতে।

অন্তরে আমি চিরকালই একজন Journalist এবং আজও আমি দেশ-বিদেশে সহরে-বন্দরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই, সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ ক'রে।

হাঁ, জীবনে আমি অনেক ঘা খেয়েছি বটে, কিন্তু ঐ সব আঘাত দৈন্য দুঃখই মানুষকে সহনশীল ধৈর্য্যক্ষম ও অধ্যাবসায়ী ক'রে তোলে। তাই, যে সব তরুণ সাহিত্যিকেরা সাহিত্যে সাফল্য চান্‌, তাঁদের কাছে আমার একমাত্র উপদেশ, অনবরত সাধনা ক'রে যাওয়া—শত বিপদ বেদনা ব্যর্থতা দুঃখ, ধূলোয় পায়ের তলায় মাড়িয়ে এগিয়ে চলা। যাঁরা এই অধ্যাবসায়কে মূলমন্ত্র ক'রে এই সাধনায় ব্রতী হবেন, তাঁদের অভিধানে অকৃতকার্য্যতা বলে কোন শব্দ থাক্‌বে না—এ কথা আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি।"

আমরা কথায় বলি "লেখা পড়া শিখি;" কিন্তু আসলে আমরা অধিকাংশ শিক্ষিত লোক শুধু পড়্‌তেই শিখি, লিখ্‌তে শিখিনে।

"মলাট-সমালোচনা"

প্রকৃতি-সুন্দরী

—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

গান—গজল

কে গো তুমি, বিরহিনী, আমারে সম্ভাষিলে ?
এ পোড়া-পরাণ তরে এত ভালবাসিলে !
কভু, হরিত বসনে সাজি'
কুসুমে ভরিয়া সাজি,
মধুমাসে মধুহাসে মম পানে হাসিলে !
—কে আমারে সম্ভাষিলে ?
শারদ-নিশীথে যবে
বিরহে রহি নীরবে,
শীত-বায়ে মৃদুবায়ে মম পাশে আসিলে !
—কে আমারে সম্ভাষিলে ?
কভু, বাদলে ঢাকি বয়ান
করিলে গভীর মান ;
যামিনীর অন্ধ-ত্রাসে আঁখি-নীরে ভাসিলে !
—কে আমারে সম্ভাষিলে ?
আমি শ্যাম তুমি রাধা
তাই বঁধু এত বাধা ;
তুমিও হায় উদাসিনী, মোরেও উদাসিলে !
—কে আমারে সম্ভাষিলে ?

সংগ্রহ

* * * আমাদের সৃষ্টি-ছাড়া ভারতবর্ষ বরাবর সহজ স্বভাবের নিয়মের উপর জয়ী হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অর্থনীতিশাস্ত্র আর সব জায়গাতেই খাটে, কেবল ভারতবর্ষেই তাহা উলট-পালট হইয়া যায়। ছোট-বড় সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ মানব স্বভাবকে উর্দ্ধে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে আরম্ভ করিয়া ধন মান সম্ভোগ পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই তাহার চাল-চলন সহজ রকম নহে।

* * * *

প্রত্যেক সমাজ নিজের বিশেষ প্রকৃতি এবং বিশেষ আবশ্যক অনুসারে নিজের নিয়মে নিজের কাজ উদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়। দাতা দান করিয়া কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই আমরা অত্যন্ত ঝোঁক দিয়া থাকি; আর গৃহীতা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই য়ুরোপ অধিক ঝোঁক দিয়া থাকে। স্বার্থের দিক দিয়া দেখিলে, যে গ্রহণ করে, তাহারই গরজ বেশী। মঙ্গলের দিক দিয়া দেখিলে, যে দান করে তাহারই গরজ বেশী। অতএব আদর্শভেদে ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন পথ দিয়া নিজের কাজে যাত্রা করে। * * *

স্বার্থসাধনের প্রয়াসই যদি স্বভাবের সহজ নিয়ম হয়, তবে সে নিয়মকে ভারতবর্ষ উপেক্ষা করিয়াছিল। সেই নিয়মকে উপেক্ষা করিয়াই যে তাহার দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহা নহে; কারণ সে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াও গুরুতর দুর্গতি ঘটে—কিন্তু সমাজকে সকল দিক হইতে মঙ্গল জালে জড়িত করিবার প্রবল চেষ্টায় অন্ধ হইয়া, সে নিজের চেষ্টাকে নিজে ব্যর্থ করিয়াছে। ধৈর্য্যের সহিত যদি জ্ঞানের উপর এই মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করি, তবে আমাদের সামাজিক আদর্শ-সভ্য-জগতের সমুদয় আদর্শের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। অর্থাৎ আমাদের পিতামহদের শুভ ইচ্ছাকে যদি বলের দ্বারা সফল করিবার চেষ্টা না করিয়া জ্ঞানের দ্বারা সফল করিবার চেষ্টা করি, তবে ধর্ম্ম আমাদের সহায় হইবেন।

আমাদের সমাজের দুর্ভেদ্য জড়-স্তূপ, হিন্দু-সভ্যতার কীর্ত্তি-স্তম্ভ নহে—ইহার অনেকটাই সুদীর্ঘ কালের অযত্ন-সঞ্চিত ধূলা মাত্র। অনেক সময় অন্য সভ্যতার কাছে ধিক্কার পাইয়া আমরা এই ধূলি-স্তূপকে লইয়াই গায়ের জোরে গর্ব্ব করি। কালের এই সমস্ত অনাহূত আবর্জ্জনারাশিকেই আমরা আপনার বলিয়া অভিমান করি—ইহার অভ্যন্তরে, যেখানে আমাদের যথার্থ গর্ব্বের ধন হিন্দু-সভ্যতার প্রাচীন আদর্শ-আলোক ও বায়ুর অভাবে মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে দৃষ্টিপাত করিবার পথ পাই না। * * *

বাংলা সাহিত্যের কথা

—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

১

এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে হ'লে অতি সংক্ষেপেই আমাকে বল্‌তে হবে। আর আপনারা বোধহয় সকলেই জানেন, এই সংক্ষেপে বলা জিনিষটা একটুখানি শক্ত। শক্ত এই কারণে যে, অনেক সব ছোট-ছোট দরকারী কথা, যেগুলো ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আসল গল্পের ধারাটাও ঠিক রেখে চল্‌তে হয়। তাই আজ ভেবেছি যে, আমাদের সাহিত্যের যে সিয়াই-কলমের ছবি আঁকব তাতে অনেক জায়গা খালি থাক্‌বে, শুধু কয়েকটা রেখা কেটে যাব। আপনাদের অনেকের কাছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অ-জানা; তাই মনে হয় সংক্ষিপ্ত ও রঙ্গ-চঙ্গে না হলেও বিষয়ের নতুনত্ব আপনাদের আনন্দ দেবে।

প্রথমেই আপনাদের বলে রাখা দরকার যে, এখনও পর্য্যন্ত আমরা আমাদের সাহিত্যের বা ভাষার পুরো ইতিহাস জানি না। এ বিষয়ে সবেমাত্র গবেষণা আরম্ভ হয়েছে এবং এখনও পাণ্ডুলিপি সংকলনই চল্‌ছে। এখন যতদূর আমরা জানি, আমাদের সাহিত্যের যে কোন ইতিহাসই লিখ্‌তে চেষ্টা করা হোক্‌ না কেন, তা অসম্পূর্ণ থাক্‌বে। তাই আজ যে সব বিষয় এখনও প্রতিপন্ন হয় নি, সে-সবের ধার দিয়ে না গিয়ে, মোটা-মুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই যুক্তি সঙ্গত মনে করেছি। এখন আমাদের সাহিত্যের সব কিছু আমরা না জান্‌তে পারি কিন্তু আমাদের সাহিত্যের আসল রূপটিকে জানি—আর আজ বোধ হয় সেইটকু জান্‌লেই আমাদের কাজ চল্‌বে।

২

বাংলা সাহিত্য জন্মায়—মুসলমান আসলে। তার কারণ খুঁজ্‌তে বেশী দূর যেতে হয় না। হিন্দু-রাজাদের সঙ্গে-সঙ্গেই সংস্কৃত, যেটা প্রাচীন ভারতের প্রচলিত ভাষা ছিল—সেও সিংহাসনচ্যুত হয়। এই নতুন রাজার আমলে, বাঙালী প্রথম তাদের নিজের ভাষায় মনের কথা বল্‌বার সুযোগ পেল।

কিন্তু মুসলমান রাজ্যে জন্মালেও এ-সাহিত্য জাত হারায় নি। তার কারণ এটা আগা-গোড়া হিন্দু-সাহিত্য। এর সমস্ত কথা, ভাব, অনুরাগ, হিন্দু-পুরাণ হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়ান। সময়ের ফেরে এ সাহিত্য মুসলমান রাজ্যে জন্মালেও এর মনটা ছিল পূরোদস্তর হিন্দু। এ কথা নিশ্চিত যে, বাংলা সাহিত্য হিন্দুর ধর্ম্মভাবে একটা নতুন ধারা এনে দিয়েছে। অবশ্য দেশের তখনকার রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন এই ধারা বিবর্ত্তনের জন্য অনেকখানি দায়ী। এর উপর ইস্‌লামের কোন প্রভাব ছিল কি না তা ধরে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। মুসলমানধর্ম্মের বা তাদের সামাজিক রীতি-নীতির যে-কোন প্রভাবই থাক না কেন—সাক্ষাৎভাবে কিছু ছিল না। ইস্‌লাম সভ্যতার সংস্পর্শে আসার দরুণই বোধ হয় বাংলা সাহিত্য এমন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জন্ম নেয় এবং তার ভাবগুলিও সর্ব্বসাধারণের জন্য হয়। কিন্তু কোন খাঁটি মুসলমান ভাব বাংলা সাহিত্যে স্থান পায় নি। যখনি পেয়েছে সে শুধু কোন অজ্ঞাত-প্রক্রিয়ার বলে, আগে সংস্কৃত হয়ে তারপর বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। ইংরেজি শাসনের আগেকার বাংলা সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্ছে যে, সে-সাহিত্য কখনো অজ্ঞাতসারে কোন বৈদেশিক ভাব ও বিষয় অস্বীকার করে নি; বা আপনার নাম দিয়াও চালায় নি। এ বিষয় কেন আশ্চর্য্য বল্‌ছি, তা যখন আজ-কালকার বাংলা সাহিত্যের কথা বল্‌ব তখন বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

আমাদের প্রথম কবি চণ্ডীদাস চসারের সমসাময়িক। তাঁরা সমসাময়িক ছিলেন এই মাত্র। তা ছাড়া তাঁদের জীবনের বা সাহিত্যের মধ্যে কিছুমাত্র মিল নেই। চসার বহুদেশ পর্য্যটন ক'রে বেড়িয়ে ছিলেন, আর একজন বিশেষ শিক্ষিত বিজ্ঞ ভদ্রলোক ছিলেন আবার তার উপর ছিলেন রাজ-সভাসদ্। এ দিকে চণ্ডীদাস ছিলেন গাঁয়ের এক দরিদ্র পুরোহিত এবং যতদূর জানা যায়, তিনি কখনো দেহে বা মনে আপনার গাঁয়ের সীমানার বাইরে যান নি। চসার এঁকেছেন তাঁর সময়কার লোক ও তাদের রীতি নীতির কথা, আর চণ্ডীদাস শুধু গেয়েছেন আপনার অন্তরের কথা ও আকুলতা। এক কথায় বল্‌তে গেলে, চণ্ডীদাসের কবিতা, ভিতরের মনকে নিয়ে; চসারের কবিতা বাইরের মানুষকে নিয়ে।

আমাদের সাহিত্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম এলেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠও হয়ে এলেন। চণ্ডীদাস ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এমন কোন Lyric কবি নেই, যিনি তাঁদের সঙ্গে একাসনে বস্‌তে পারেন। চণ্ডীদাসের কবিতার সব চেয়ে বিশেষত্ব এই যে, তা প্রকাশ-ভঙ্গিমায় নিখুঁত। কোথাও কাঁচা হাত বা চেষ্টা ক'রে লেখা, কোথাও

ভাব অস্পষ্ট বা দানা বাঁধে নি এমন এক জায়গায়ও দেখা যায় না। চণ্ডীদাসের সাহিত্যে বাংলা ভাষা কথা কইতে শিখ্‌ল; আর ভারতের সাহিত্য আবার নতুন করে জন্ম নিল। তাঁর সরল ও সহজ ভাষা—তাঁর অন্তরের অন্তরঙ্গ খাঁটি অনুরাগ এমন এক নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি করল, যা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রূপ ও ধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কেবলমাত্র একটি মানুষের অন্তরের অভিব্যক্তি সংস্কৃত সাহিত্যে আদৌ ছিল না—সব প্রথম চণ্ডীদাসের গানে তা স্পষ্ট ও পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল।

এখানে আপনাদের বলে রাখা প্রয়োজন যে, আজকাল ইউরোপে যাকে Lyric বলা হয়, চণ্ডীদাসের কবিতা সে হিসেবে Lyric নয়। মিল্টনের Lycidas; শেলীর Epipsychidion বা সুইন্‌বার্ণের Triump of Time-এর দলে চণ্ডীদাসের কবিতা পড়ে না। বাংলার কবিটি আসলে গান রচনা ক'রে গিয়েছেন, আর সেই সব গান এমন ভাবে ও কথায় গেয়েছেন, যা স্বভাবতই বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে পড়ে। এই কারণে তাঁর গানে এমন একটা তাজা প্রাণ ও সৌন্দর্য্য আছে, যা কোন শিক্ষিত যুগের যশপ্রয়াসী-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস গেয়েছেন প্রেমের কথা—প্রেম ছাড়া আর কিছু না। প্রেমের মূর্ত্ত আনন্দ ও বেদনা, তার আকুল আশা ও নৈরাশ্য, মিলনের অতি আনন্দ ও বিরহের গুরু জ্বালা—এই তাঁর কবিতার মূল ধন। তাঁর নিজের কথায় বল্‌তে গেলে:—

"জনম অবধি পিরীতি বেয়াধি অন্তরে রহিল মোর
থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠয়ে, জ্বালার নাহিক ওর!"

তাঁর প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে, তাঁর অন্তরের বেদনাকে এমন অনুরাগে প্রাণবন্ত ক'রে অপূর্ব্ব ভাবায় প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর কবিতা অন্তত বাঙালী আমাদের কাছে শাশ্বত সৌন্দর্য্য ও আনন্দের উৎস হয়ে থাক্‌বে।

চণ্ডীদাসের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে আপনাদের জানাতে চাই যে, যদিও আসলে চণ্ডীদাসের কবিতা ব্যক্তিগত, কিন্তু তাঁর কবিতার বহিরাবরণ ব্যক্তিগত নয়। বস্তুত সেই সময়ে প্রথম পুরুষে কবিতা রচনা করা অন্যায় বলে ধরা হত। তাই রাধাকৃষ্ণের আদর্শ প্রেম—যমুনার তীরে তাঁদের লীলা—সংস্কারগত ভাবে কালানুক্রমে বহুযুগের ভারতবর্ষীয় কবিদের আদরের কাব্য-বিষয় হয়েছিল। চণ্ডীদাসের কবিতাও এই সংস্কারের অন্তর্গত কিন্তু যে-সব ভাব বা অনুরাগ তাতে মূর্ত্তি পেয়েছে, তাতে সংস্কারের কোন ছাপই পড়ে নি। এবং

তাঁর কবিতায় তাঁর আপনার জীবনের ছাপ এত সন্দেহাতীতভাবে সুস্পষ্ট যে, ভারতের বহু অজ্ঞাত রচয়িতার লোক-সঙ্গীত হতে চণ্ডীদাসের কবিতা সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে আছে।

৩

চণ্ডীদাসের পর বাংলার কাব্য-প্রতিভা প্রায় শ'খানেক বছর নিস্তব্ধ থাকার পর আবার সহসা গানে ও কবিতায় প্রবল প্রাচুর্যে দেখা দিল। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রবর্তক চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম এই যোগনিদ্রা ভাঙল। বৈষ্ণবতা ভারতের প্রাচীনতম একেশ্বরবাদী ধর্ম। বৈষ্ণবেরা ভগবানের মানব-দেহ পরিগ্রহণ এবং ভক্তি ও ভগবদ্-কৃপায় মুক্তিলাভ হয় স্বীকার করেন এবং এই দিক দিয়ে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের যথেষ্ট মিল রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের পর বৈষ্ণবধর্ম সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং এখন দেশের সর্বপ্রধান ধর্মই হচ্ছে বৈষ্ণবধর্ম। চৈতন্যের এই ধর্ম-বিবর্তনের দুটি দিক ছিল—একটি ধ্বংসের আর একটি সৃষ্টির। ধ্বংসের দিক দিয়ে এই নতুন ধর্ম একদিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের শুষ্ক পাণ্ডিত্য ও প্রাণহীন বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের—অপরদিকে অর্থহীন অজ্ঞায় লৌকিক আচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। সৃষ্টির দিক দিয়ে বৈষ্ণবধর্ম—পরমাত্মার জন্য মানবের আত্মার আকুল স্পৃহাকে ছন্দে মূর্তি দিল। এই নতুন ধর্মের ঈশ্বর কোন অশরীরি আধ্যাত্মিক সত্বা নন্, কিংবা কোন দণ্ডধারী ভগবানও নন—ঈশ্বরের ত্রিমূর্তির মধ্যে তিনি মধ্যমূর্তি। প্রেম ও দাক্ষিণ্যময় একটি মূর্ত অতিমানব, মানুষের আত্মা যাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও নিগূঢ় ভাবে মিশ্‌তে পারে—শুধু ভক্তির বলে। আর আমাদের কাছে ভক্তি মানে, অহৈতুকী পরা প্রীতি। চৈতন্য সে যুগের একজন শাস্ত্রজ্ঞ ও গণ্য পণ্ডিত ছিলেন; তাঁর সম্বন্ধে গল্প আছে যে, যেদিন তিনি প্রথম অধ্যাত্ম-জীবনে প্রবেশ কর্‌লেন সে দিন তিনি তাঁর সংস্কৃত পুঁথিপত্র সব ভুরি বেঁধে রেখে দিলেন। এই ঘটনা তাঁর সমস্ত ধর্ম-বিপ্লবের প্রতীক্।

চৈতন্য প্রোটেস্‌ট্যান্ ধর্মমতের প্রবর্তক মার্টিন লুথারের সমসাময়িক কিন্তু লুথারের চেয়ে তাঁর সঙ্গে সেণ্ট ফ্র্যান্‌সিসের মেলে বেশী। চৈতন্য অনেক বিবেচনা করেই প্রচলিত মস্তিষ্কচালিত কর্মবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। আধ্যাত্মিকতাকে দূরে পরিহার ক'রে এই নতুন ধর্ম যে দেবতার আশ্রয় নিল, তিনি চির-সুন্দর; তাই বৈষ্ণব-ধর্ম মানুষের মনের আবেগে এত জোরে আঘাত করে।

আপনারা সহজেই ভেবে দেখ্‌তে পারেন, জাতির কাব্য-জীবনে এই নতুন ধর্ম কি রকম গতিসঞ্চার করল। চৈতন্যের ধর্ম প্রচার করল—মন স্বাধীন, এখানে সবাই সমান, সকলেই ভাই-ভাই। মানুষের অন্তরে রুদ্ধশক্তি বাধামুক্ত হল। এই কাব্যময় ধর্মবিপ্লব অন্তরের আবেগের এমন একটা বিচিত্র মূল্য দিল যে, ধর্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনের আবেগও গভীর এবং বিশাল হয়ে উঠল। এবং কিছুই আশ্চর্য্য নয় যে, সে যুগের বাঙালীরা আপনাদের মনের এই সব বিদ্রোহী ও ক্রমবর্দ্ধমান ভাবগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করবার একটা প্রয়োজন অনুভব করেছিল। এই নতুন ধর্ম্মের পূজারীদের অন্তরে নবজাত ভাব সব চণ্ডীদাসের কবিতায় অভিব্যক্ত দেখ্‌তে পেয়ে তাকেই আশ্রয় ক'রে মুক্তি নিল। এই যুগের কবিরা অন্তরের সমস্ত করুণ রসের ধারাকে গানে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের সমস্ত অনুরাগ চলেছে যৌন-প্রেমের পরিপূর্ণতার দিকে। তাই এই নব-বৈষ্ণবধর্ম্মে স্বভাবতই যৌন-প্রেম ভগবদ্-প্রেমের নিদর্শন হয়ে উঠ্‌ল এবং ক্রমশঃ এই দুই অনুরাগ এক হয়ে মূলতঃ অন্তরের একই অনুভূতির অভিব্যক্তি হয়ে উঠ্‌ল। জগতের সমস্ত রোমান্টিক সাহিত্যে দেখা যায় যে, যা-কিছু দেহের তা ক্রমশঃ বিদেহ হয়ে আত্মার হয়ে গেছে—এবং আমরা জানি, খৃষ্টান রহস্যবাদীদের হাতে চার্চ্চ ও ক্রাইষ্ট-এর মধ্যে সম্বন্ধ কতটা মানুষের আকার পেয়েছিল। বাংলার এই ভাবের রূপান্তর খুব সহজেই সম্ভব হয়েছিল, কারণ আমাদের কবিদের কাব্যের বিষয়ই ছিল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও মানবী রাধার প্রেমলীলা, যে ব্যাপার মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের নিদর্শন বলে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

এর ফলে এই কবিদের দ্বারা আমাদের সাহিত্যের সব চেয়ে সুন্দর কতকগুলি Lyric কবিতার সৃষ্টি হয়। এই সব কবিতার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাদের মধ্যে এমন একটি গভীর আকুলতা ও প্রাণের অনুরাগ দেখা যায়, যা চণ্ডীদাসের কবিতায়ও পাওয়া যায় না। অপর সব কবিতার মধ্যে মানব ও দেবতার মিলনে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছিল এবং তাতে যে প্রেমের কথা ছিল, সে প্রেমের মধ্যে মিশিয়ে ছিল পরমাত্মার জন্য একটা আকুলতা, ঈশ্বরে অনুরাগ ও এক রহস্যময় ভাব। অপর পক্ষে, এই সব কবিতায় সাহিত্যের যথেষ্ট অধোগতি স্পষ্ট দেখা যায়। এই সব কবিতায় ভাব কোথাও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে—কোথাও বা ভাষা প্রকাশের সংযম হারিয়ে বসেছে। তাই এই উচ্ছ্বাসময় সাহিত্য পরিশ্রান্ত হয়ে স্বভাবতই গতি-হীন হয়ে পড়ল। নব-জাগরণের মন্ত্র ক্রমশঃ সংস্কারে পরিণত হয়ে এল এবং

তার মন-মাতাবার শক্তি অনেক পরিমাণে কমে এল। পরে যে সব কবিরা এলেন, তাঁরা পূর্ব্ব কবিদেরই ভাবের অনুকরণ ও তাঁদের ভাষার পুনরুক্তি করতে লাগলেন।

একটা খাঁটি রোমাণ্টিক সাহিত্যের অভ্যুদয় বেশীদিন ক্রমান্বয়ে টিঁকে থাকতে পারে না। বিশেষ ক'রে সে জাতির মধ্যে, যে জাতির আর্য্যসভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রধান মন্ত্রই হচ্ছে এই যে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশের জন্য নয়, তা সংযত করবার জন্য। বাংলা দেশে যে সব পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাহিত্যকে বাঁচাবার ভার নিয়েছিলেন, তাঁদের মন বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মে ও দার্শনিকতায় এত প্রাণহীন হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁরা এই ভাবপ্রধান ধর্ম্মের সঙ্গে স্পষ্ট সহানুভূতি দেখাতে পারেন নি, এবং যা-কিছু কবিত্ব, তাঁরা স্পষ্ট বলতেন যে, সে-সব মনের বিকার মাত্র। আমাদের মধ্যে এখনো একদল সাহিত্যিক আছেন, যাঁরা এই মধ্যযুগের আত্মাটাকে আবার এই নতুন যুগের ভাষার দেহে পুরতে চান কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, জীবনে বা সাহিত্যে ইতিহাস কখনো ফিরে আসে না; আর আমরা যদি এখন বৈষ্ণব-কবিদের ধারায় কবিতা লিখি তা হলে শুধু তাঁদের হাব-ভাবের ব্যর্থ অনুকরণ হবে মাত্র। আমরা নতুন মানুষ—আমাদের চিন্তার পরিসর বেড়ে গেছে এবং আমাদের নতুন ধারায় তাকে প্রকাশ করতে হবে।

বৈষ্ণব কবিতার আসল সৌন্দর্য্য হচ্ছে এই যে, জীবনের আকুল আনন্দ ও বাঞ্ছিত ব্যথা এখানে মুক্তি পেয়েছে এবং সে ব্যথা ও আনন্দ অনন্ত জীবনের সঙ্গে এক হ'য়ে গিয়ে থাকতে চায়। কিন্তু এ কথা ভাবা ভয়ানক ভুল হবে যে, আমাদের কবিরা শুধু করুণরসই গেয়ে গেছেন। আমাদের দেশের Lyric কবিতার আর একটি দিক আছে, সেখানে আমাদের জাতির কঠোর ও করাল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। আমি শাক্ত-কবিতার কথা বলছি। শাক্তধর্ম্ম অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে প্রচলিত। প্রাচীনকাল হতেই করাল দর্শনা কালীমূর্ত্তিতে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা প্রকটিত হয়ে আছে। তিনি নরমুণ্ডের মালা প'রে, হাতে রক্ত-তরবারি নিয়ে অনন্তকাল ধ'রে এক তাণ্ডব-নৃত্যে রত। এই শাক্তধর্ম্ম একদল বাঙালীর, বিশেষত যাঁরা উচ্চবর্ণের—তাঁদের মনে যথেষ্ট আধিপত্য করেছিল। এই ধর্ম্মের নিষ্ঠুর কুসংস্কারের প্রতিবাদের জন্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। চৈতন্যের অহিংসা ধর্ম্ম-বিপ্লবের ফলে শাক্তধর্ম্মের অনেক জঘন্য আচার নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এই শক্তিপূজার পিছনে যে প্রাণ ছিল, তা কখনো মরে নি।

বাংলার প্রকৃতি সদাই স্নেহশীল নয়। বাংলা ভূমিকম্প, ঝড়তুফান জল-

প্লাবনের দেশ। আমরা মহামায়াকে নিয়ে ঘর করি, তাই প্রকৃতির ধ্বংস-মূর্ত্তিকে অস্বীকার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। শাক্ত-কবিতা এই ভয়াবহ মৃত্যুময় বিশ্বের অধিবাসী—মানবের ক্রন্দনকে ছন্দে মুক্তি দিল। যে রহস্যময় শক্তি আপনি সৃষ্টি ক'রে চলেছে আপনার সংহারের জন্য, এ তার প্রতি একটা বিচিত্র উল্লসিত শ্রদ্ধা। বাংলা দেশে আমাদের চোখের সামনে নিত্য দেখ্‌ছি, অনন্ত জীবনের ধারা চলেছে অবিরত উচ্ছৃঙ্খল মরণের সঙ্গে। তাই শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমাদের কাছে ঈশ্বরী জননী, কিন্তু সে আপনার ছেলে আপনি খায়! কিন্তু বাঙালীর মন শক্তির এই মাতৃ-মূর্ত্তিকেও করুণাময়ী মানবীর আকারে দেখ্‌তে চেয়েছিল এবং আমাদের সব চেয়ে বড় শাক্ত-কবি রামপ্রসাদ এমন সরল ও গভীর সুরে তাঁর স্নেহ ও করুণার কথা গেয়ে গেছেন যে,' সে-সব গান আজ বাংলার সর্ব্বত্র প্রচলিত। শাক্ত-ধর্ম্ম বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উল্টা দিক মাত্র। এই দুই ধর্ম্মের পার্থক্য তাঁদের দুটি বিভিন্ন নিদর্শনে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়—একটি রক্তজবা আর একটি শ্বেত শতদল। বাংলার গীত-সাহিত্য থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, আজ যাকে আমরা জাতীয়তা বা জাতির আত্মা বলি, সেটা, দুটি পরস্পর বিরোধী ভাবের আধার; কোন্‌টি কখন্ সাহিত্যে পরিস্ফুট হবে—তা সাহিত্য-জগতের নিয়ম ছাড়া অন্য সব কারণে নিরূপিত হয়।*

ক্রমশঃ

একালে আমরা কথার সংখ্যা নিয়েই ব্যস্ত, তার ওজনের ধার বড় একটা ধারি না।

"মলাট-সমালোচনা"

---

* শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

পাহাড়ের পথে

—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

১

কার্ত্তিক মাস। মাসের শেষা-শেষি অকস্মাৎ অকালে বর্ষাদেবী অহৈতুকী-মমতায় প্রবল বর্ষণ সুরু করিয়া গরীব কৃষিজীবিদের পাকা ধানে 'মই' দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আকাশের কোলে ছাই-রঙের ময়লা চেহারার মেঘ-গুলার ছুটা-ছুটি কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগতই চলিতেছিল। রৌদ্রালোকের অভাবে চারিদিকের গাছ-পালার সবুজ রং, ধোঁয়োটে মলিন কুয়াসা-ঢাকা নিরানন্দতায় যেন থম্‌-থম্‌ করিতেছিল। দূর হইতে পাহাড়গুলাকে ময়লা কাগজের পিঠে পেন্সিলে আঁকা ছবির মত অস্পষ্ট ম্লান দেখাইতেছিল। মাঝে-মাঝে দূর হইতে পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ ভাসিয়া আসিয়া পাহাড়ের মাথায় জড়াইয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, কে যেন এক রাশ তুলা ধুনিয়া, ধূম্র পাহাড়ের মাথায় সযত্নে হাল্কা তুলার মুকুট পরাইয়া দিয়াছে!

কয়দিন এই অবস্থায় চলিবার পর আজ হঠাৎ প্রকৃতি দেবীর খেয়াল বদলাইয়াছে। সকাল হইতেই মেঘ কাটিয়া সূর্য্যদেব কড়া মূর্ত্তিতে বিমান-পথে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন; চারিদিকে মানুষ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে।

পঞ্চকোট পাহাড়, পূর্ব্ব দিকে মাথা উঁচাইয়া, পশ্চিম দিকে লেজ গুটাইয়া একটা বিরাটকায় ঐরাবতের মত পৃথিবীর বুকে জানু পাতিয়া বসিয়া আছে। পাহাড়ের পাদমূলে ছোট-ছোট সাঁওতাল ও বাউরী-পল্লীগুলি গাছ-পালার আওতার আড়ালে অদৃশ্যপ্রায়। নিতান্ত ঢুঁড়িয়া না দেখিলে তাহাদের অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না।

বৃষ্টির জলে ধালি-মাটি ধুইয়া, সেই পল্লী-পথগুলির পাথর ছুঁচালো মূর্ত্তি অধিকতর তীক্ষ্ণ কর্কশ হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে খুব খানিকটা জল কাদা জমিয়া আছে, তাই খালি-পায়ে বিচরণশীল পথিকরা কোন রকমে সেই কাদা লেপটাইয়া কষ্টে-সৃষ্টে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছে।

এমনি একটা নির্ম্মম কর্কশ পথ ধরিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের ঝোপ-ঝাপ সমাকীর্ণ একটি ছোট সরু পথের কাছে আসিয়া ছুটি মানুষ দাঁড়াইলেন। ইঁহাদের একজন, মাল-কাটা মহলের বিখ্যাত চিকিৎসক, লক্ষ্মীকান্ত কবিরাজ, অপর ব্যক্তি তাঁহার 'মাইন্দার'—অর্থাৎ বেতন-ভোগী ভৃত্য প্রসাদ বাউরী। প্রসাদের কোমরে একটা কাটারী, কাঁধে একটা শূন্য ঝুড়ি। ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্ম কতক-গুলা পার্ব্বত্য উদ্ভিদের দরকার পড়িয়াছিল, তাই কবিরাজ মহাশয় আজ সভৃত্য পাহাড়ে চলিয়াছেন। পাহাড়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের গাছ অনেক পাওয়া যায়।

কয় দিনের বর্ষায় পাহাড়ের জল-নিকাশের পথগুলা আজ সম্ভ-ধোয়া, বড় পরিষ্কার। এখনো কোন কোন পথ বহিয়া মৃদু স্রোতে জল-ধারা বহিয়া আসিতেছে, কোন পথ একেবারে শুষ্ক। এই পথগুলি ভাঙা-চোরা এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু-নীচু বহুবিধ চেহারার পাথরের ঠাসে তৈরী। মাঝে মাঝে দেড় হাত দু'হাত কিম্বা তার চেয়েও উঁচু পাথরের চাঙড়, উদ্ধতভাবে ঘাড় উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; দেখিলেই মনে হয়, যেন তাহারা পর্ব্বতারোহিদের উদ্দেশে তাল ঠুকিয়া বলিতেছে—'ষণ্ড দেহি!' অথচ এই সকল নিষ্ঠুর-দৃশ্য পথ ছাড়া দুর্গম অরণ্য বেষ্টিত পাহাড়ে উঠিবার পক্ষে নিরাপদ পথ আর নাই।

এমনি ধরণের একটি জলহীন জল-নিকাশের পথ বাছিয়া লইয়া কবিরাজ মহাশয় পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। পিছনে প্রসাদ চলিল। খানিকটা করিয়া কবিরাজ মহাশয় এদিক ওদিক খুঁজিয়া সংগ্রহ-যোগ্য লতা, গুল্ম, গাছের ছাল, ডাল, শিকড় প্রসাদকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন ; প্রসাদ কাটারীর সাহায্যে সে গুলি কাটিয়া-কুটিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিয়া আবার উপরে উঠিতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় সেই অবসরে ধীরে সুস্থে ছাতি মাথায় দিয়া আরও খানিক উপরে উঠিয়া, অন্যান্য গাছ-গাছড়ার খোঁজ করিতে ছিলেন। এইরূপে উদ্ভিদ সংগ্রহ চলিতে লাগিল।

একটা বড় গাছের তলা খুঁড়িয়া খানিকটা শিকড় সংগ্রহ করিতে সেবারে প্রসাদের বড় বিলম্ব হইয়া গেল। কবিরাজ মহাশয় তখন অনেকটা উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। প্রসাদ ঝুড়িটা কাঁধে তুলিয়া একবার উপর দিকে চাহিল, কিন্তু কবিরাজ মহাশয়কে দেখিতে পাইল না, অগত্যা তাড়াতাড়ি পাথর টপ্‌কাইয়া যথাসাধ্য দ্রুতপদে উপরে উঠিতে লাগিল। অনভ্যস্ত লোকদের পক্ষে পাহাড়ে উঠিবার পথ কষ্টকর হইলেও এ-দেশের বলিষ্ঠ সাঁওতাল ও বাউরী যুবকরা এ পথে বেশ সহজ ভাবেই ওঠা-নামা করে।

লম্বা-লম্বা পা বাড়াইয়া উপরে উঠিতে-উঠিতে হঠাৎ পাথরের পাশে একটা ঝোপের দিকে নজর পড়িতেই প্রসাদ বাউরী থমকিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একটি বাউরীর মেয়ে হেঁট হইয়া কাঠ কুড়াইতেছিল। তার পরণে একখানি চটের মত পুরু দেশী-তাঁতের মজবুত কাপড়। কাপড়খানি যেমনি ময়লা, তেমনি দুর্গন্ধে ভরপুর। দেশীয় প্রথানুসারে এ সব কাপড় কচ্চিৎ ক্ষার বা সাবানের স্পর্শলাভে ধন্য হয়, কারণ এই দরিদ্র বেচারীদের অধিকাংশেরই একখানার বেশী দু'খানা কাপড়ও থাকে না এবং তাহা পরিষ্কার করিবার অবকাশও বড় জুটে না। একখানা মাত্র কাপড়েই ইহারা দিনের পর দিন, বেশ নিরুদ্বিগ্ন ভাবে কাটাইয়া দেয়। স্নানের সময় এই কাপড় খানি বদলাইয়া একটি ছেঁড়া-খোঁড়া যা-হোক কিছু পরিয়া কোন গতিকে স্নানটা সারিয়া লয়, তারপর আবার সেই এক কাপড়ই পড়ে।

প্রসাদ বিস্মিতভাবে ক্ষণেক মেয়েটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে কাঁধের ঝুড়ি নামাইয়া নিকটস্থ পাথরের উপর রাখিল। তার পর সেই ঝোপের দিকে অগ্রসর হইয়া মানভূমের বিশিষ্ট টান-যুক্ত বাংলা ভাষায় ঈষৎ রূঢ় কণ্ঠে বলিল "ভেলে অলোগগো! পার্বতি! তু ইহানে!—"

মেয়েটি মুখ তুলিয়া চাহিল। তার ম্লান তারুণ্যের স্নিগ্ধ-শ্রী মাখান বিষাদ-মলিন মুখে চকিতের জন্য একটু আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল; কিন্তু পর মুহূর্তে আত্ম দমন করিয়া সংযত গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"হুঁ,"—অর্থাৎ 'হাঁ আমিই বটে।"

সে আবার মাথা হেঁট করিয়া নিজের কাজে মন দিল, যেন এ লোকটার উপস্থিতি অনুপস্থিতি তার পক্ষে সমান নিষ্প্রয়োজনীয়!

এইখানে ইহাদের একটু পরিচয় দেওয়া উচিত! খুব ছোট বয়সেই প্রসাদের মা, পার্ব্বতীর সহিত প্রসাদের বিবাহ দিয়াছিল, এবং খুব সকালেই অর্থাৎ তের বৎসর বয়সে পার্ব্বতীর একটি সন্তান হইয়া অকালে মারা যায়। তারপর পাঁচ ছয় বৎসর আর সন্তানাদি হয় নাই। এই সময় একদা কয়লার খাদে খাটিতে গিয়া প্রসাদ আর একটি স্বজাতীয় বাল-বিধবাকে দেখিয়া মোহিত হয়, কারণ সে মেয়েটি পার্ব্বতীর মত শান্ত নিরীহ নয়, রীতিমত প্রখর, চঞ্চল, এবং চোট্-পাট উত্তর দানে পরম দুরন্ত,—সুতরাং প্রসাদ মনে মনে বুঝিল, পার্ব্বতীর নিরীহ শান্ত-স্বভাবে তার গৃহে যে অন্ধকার জমিয়াছে, এই চঞ্চল মেয়েটির উজ্জ্বল স্ফূর্ত্তিবাজ প্রাণের আলোয় তাহা দূর হইবে। অতএব নিঃসন্তানত্বের অপবাদ খণ্ডনের জন্য মেয়েটির পানিগ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করা হইল, মেয়েটিরও সে-বিষয়ে আপত্তি দেখা গেল না। কারণ বাউরী-জাতির মধ্যে চেহারায় ও চাল-চলনে

প্রসাদ বেশ একজন সর্দ্দার শ্রেণীর সুপুরুষ যুবক ছিল। সুতরাং উভয় পক্ষের মতানুসারে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে 'সাঙা' করিয়া প্রসাদ নববধূ বা 'লইতুনিকে' ঘরে আনিল।

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নববধূর তাড়নায় অত্যন্ত কোণ-ঠাসা হইয়া পার্ব্বতী বেচারা কিছুকাল অতিকষ্টে স্বামীর ঘরে রহিল, কিন্তু বৎসরান্তে যখন নববধূর একটি পুত্র হইবার পর পার্ব্বতীরও একটি পুত্র হইল, তখন ক্রোধে ঈর্ষ্যায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া নববধূ অত্যন্ত উৎপাত বাধাইয়া তুলিল। প্রসাদ উদ্ব্যস্ত হইয়া দুই স্ত্রীকেই মার-ধোর করিয়া সাংসারিক শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিল, কিন্তু ফলে দু' জনেই, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পক্ষটি অধিকতর ক্ষিপ্ত হইয়া সতীনের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার সুরু করিল। পার্ব্বতী কিছুদিন সহিয়া সহিয়া দেখিল, শেষে আর পারিল না। ছেলেটিকে লইয়া নিজের পিত্রালয়ে গিয়া খাটিয়া খাইতে সুরু করিল।

সতীন বিদায় হইল, নির্ব্বিবাদে স্বামী ও সংসারের উপর একচ্ছত্রী সম্রাজ্ঞী হইয়া কতকটা ঠাণ্ডা মূর্ত্তিতে নববধূ দিন কাটাইতে লাগিল। প্রথমা স্ত্রীর তিরোধানে প্রসাদের মনে দুঃখ শোক কি কতটা হইল, সে খবর কেহ জানে না, তবে দুই স্ত্রীর ঈর্ষ্যাজর্জ্জর সংসার-ধর্ম্মের তাড়ায় সে যে অনেকটাই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছে, সে কথা অনেকেই বুঝিল এবং অধিকাংশ লোকই তার প্রতি সহানুভূতি বোধ করিল। দু'একজন দুর্ম্মুখ, বড় বধূকে তাড়াইয়া দেওয়া সম্বন্ধে প্রসাদের কৈফিয়ৎ চাহিলে প্রসাদ মুহূর্ত্তের জন্য শুম হইয়া থাকিত, তার পর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া জোর গলায় জবাব দিত, "কি করব? ছুটকিটা বড্ড লিড়াইয়া, বটেক!" অর্থাৎ ছোট স্ত্রীটি বড় ঝগড়াটে!—

সুতরাং বড় বধূ সম্বন্ধে প্রসাদ উদাসীন থাকিতেই বাধ্য রহিল!—লোকে বুঝিল,—উপায় নাই।—

২

বহুদিনের পর আজ এই নির্জ্জন পাহাড়-পথে দু'জনের সাক্ষাৎ। এর আগে পথে ঘাটে দু'একবার প্রসাদ পার্ব্বতীকে দেখিতে পাইয়াছে, দু'একটা কুশল জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টাও করিয়াছে, কিন্তু পার্ব্বতী এমন নিষ্করুণ ক্রোধে ও ঔদাসীন্যের সহিত পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে যে, প্রসাদের পক্ষে নিস্ফল বেদনায় ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকা ব্যতীত উপায় থাকে নাই! লোক-লজ্জার ভয়, বিশেষতঃ দ্বিতীয় পক্ষের দুর্দ্ধর্ষপ্রতাপ স্ত্রীটির কাণে কথা উঠিবার

ভয় প্রসাদের যথেষ্ট ছিল, সুতরাং পার্ব্বতীর মত শান্ত নিরীহ মেয়ের এই অবাধ্যতা সংশোধন করিবার ক্ষুদ্র সুযোগটুকুও সে হাতে লইবার সাহস করে নাই!

কিন্তু আজ এই নির্জ্জনে? . . . পূর্ব্বস্মৃতিগুলা প্রসাদের মনে পড়িল। তার মাথার ভিতর উগ্র রক্তস্রোত চন্-চন্ করিয়া উঠিল। প্রসাদ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া, ভারিথ্‌খি আওয়াজে জিজ্ঞাসা করিল, "ছেল্যেটো আছে কেমন?"

কুড়ানো কাঠগুলা এক স্থানে স্তূপাকার করিতে করিতে পার্ব্বতী সংক্ষেপে জানাইল, তার পুত্রটি ভাল নাই, আজ পাঁচ দিন আবার জ্বর হইয়াছে।

প্রসাদ গরম হইয়া বলিল "খবর দিস্ নেই কেনে?"

পার্ব্বতী জবাব দিল না। প্রসাদ নিজের প্রশ্নের নিরর্থকতা বুঝিয়া একটু নীরব থাকিয়া বলিল "লইতুনির ডরে, না? তু ডরেই মলি। আরে তু—ও যে, সে—ও সে! এত ডর্ কিস্ কে?

কথাটা আড়ালে দাঁড়াইয়া বলা সহজ, কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো! পার্ব্বতী ক্ষুব্ধভাবে বলিল "হুঃ! বড়া মরদ্ হইচেক্! তু উয়াকে ডরিস্ কিস্ কে?—"

প্রসাদের পৌরুষমর্য্যাদায় আঘাত লাগিল! সে প্রথমে পার্ব্বতীকে গালি দিল, তারপর তার স্বপত্নীকে,—শেষে সমগ্র স্ত্রীজাতির দুর্ব্বৃত্ততার সমালোচনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল।

এই মূর্খ মানুষগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম-মনোভাব প্রকাশ করিবার মত ভাষা-সম্পদের অভাব যতই থাক, প্রসাদ রাগের মাথায় টানিয়া টানিয়া, অসম্পূর্ণ বিকৃত ভাষায় এমন কতকটা মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল, যার ফলে ক্ষুব্ধা পার্ব্বতী অধিকতর ক্ষুব্ধচিত্তে বুঝিতে বাধ্য হইল, যে প্রসাদ দায়ে পড়িয়া চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেও—যথার্থ পক্ষে সে উদাসীন নয়! এখনও পার্ব্বতীর জন্য, বিশেষ করিয়া 'ছেল্যেটোর' জন্য তার মন কাঁদিতেছে! কিন্তু সে নিরুপায়, কারণ তার দুঃখ বুঝিবার ত কেহ নাই,—"মেয়্যা-জাতিটাই যে বড়া কঠিন!"

পার্ব্বতী রাম-রহিম কোন শব্দ উচ্চারণ করিল না; নীরবে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। প্রসাদ উত্তর প্রতীক্ষায় ক্ষণেক তার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর একবার এ দিক ওদিক তাকাইয়া—হঠাৎ তার পাশে বসিয়া পড়িল, ক্ষিপ্রহস্তে

সবলে তার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া গাঢ় স্বরে বলিল—"পার্ব্বতি—আমি কি করব বল ?—"

এই আকস্মিক আক্রমণের জন্ত পার্ব্বতী কিছুমাত্র প্রস্তত ছিল না। প্রথমটা সে অত্যন্ত চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সভয়ে অনুভব করিল,—প্রসাদের কণ্ঠে যেমনি হতাশা-ভাঙা মিনতির সুর বাজিতেছে, তার বলিষ্ঠ বাহু যুগলের মাঝে ঠিক তার বিপরীত-ধর্ম্মী—উন্মত্ত আবেগের প্রবল বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝনা বহিয়া যাইতেছে। মুহূর্ত্তের জন্ত পার্ব্বতীর যেন দম বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলাইয়া লইল ; সবলে প্রসাদের হাত ছাড়াইয়া দাঁড়াইল।—কর্কশ তিরস্কারপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "বর্‌কে যা খালভরা! তু তোর লইতুনি লিয়ে বই-গে! ফির্ যদি ঘুরে আমার সাথে লাগ্‌বি ত—"

বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া পার্ব্বতী রাগভরা মুখে দ্রুত ফিরিল। অসমতল পথ বহিয়া পাহাড়ের নীচের দিকে নামিতে সুরু করিল। তার সংগৃহীত কাঠ কুটরাগুলা পড়িয়াই রহিল!—

প্রসাদ মুহূর্ত্তের জন্ত হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পরক্ষণেই উন্মত্ত বাঘের মত কাঁটা-ঝোপ মাড়াইয়া বড় বড় পাথর টপ্‌কাইয়া তিন লাফে নামিয়া গিয়া পার্ব্বতীর সামনের পথে হাজির হইল! পাথরে ঠোকর খাইয়া, পায়ের চারিটা অঙ্গুল ছড়িয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল, সেদিকে প্রসাদের ভ্রুক্ষেপ ছিল না। বিজয়-গর্ব্বে ফিরিয়া, বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়া উর্দ্ধে দণ্ডায়মান পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসি মুখে বলিল "আয় ত দেখি, নামি আয়।"

পার্ব্বতী ক্ষণিকের জন্ত থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। তারপর রুষ্ট স্বরে বলিল "সোজা সড়পে না যাতি দিস্, র' তু! আমি উপরি-ই উঠ্ যাব!—"

সত্য সত্যই সে ফিরিয়া হরিনীর মত লঘু লম্ফে পাহাড়ের উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। ঠিক সেই সময় তাহাদের মাথার উপরের অদৃশ্য পর্ব্বত কক্ষ হইতে কবিরাজ মহাশয় হাঁকিলেন "পেসাদ হে—পেসাদ হে—"

এতক্ষণের পর কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্যটির স্মরণ হইল,—সে প্রভুর কাযে পাহাড়ে আসিয়াছে! তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, প্রসাদ পর্ব্বতারোহণ রতা পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিল "যাছিস্ যা। হোই হনুমান ধাড়ার কোথা টুগ্‌রু বসিস্,—দুটো কথা আছে তোর সাথ্। আমার কিরা ছেলেটোর কিরা, শুনি যাস্।

পার্ব্বতী হাঁ না কোন জবাব দিল না। নিজের পথে যেমন চলিতেছিল,

তেমনি চলিতে লাগিল। প্রসাদ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঝুড়ি মাথায় করিয়া বাঁ দিকের একটা পথ ধরিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিল।

৩

ঘণ্টা দুই পরে প্রসাদ বাউরী ঝুড়ি মাথায় করিয়া পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিল। সেখানে একটি ক্ষীণকায় জল-স্রোত পাহাড়ের বন-জঙ্গলের আড়াল দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া বাহিরে আসিয়া আবার তেমনি আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাহাড়ের নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। এই খানে জল-ধারাটির পাশে একটি হাত-দেড়েক লম্বা-চওড়া পাথরের খোদাই করা একটি হনুমান মূর্ত্তি ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। বৎসরের কোন একটি বিশেষ সময়ে এই জল-ধারা ও হনুমান মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া পাহাড়তলীর অধিবাসীরা ছোট-খাট একটি পর্ব্বোৎসব করে। এই স্থানটিকে লোকে হনুমান-ধারা বলিয়া থাকে। এরূপ আরও একটি ধারা পাহাড়ের আরও কিছু উপরে আছে। সেটি "গাই-ধারা" নামে বিখ্যাত। সেখানে বনচ্ছায়ায় একটি অন্ধকারময় পাথরের গহ্বর ভেদ করিয়া, হনুমান-ধারার অপেক্ষা কিছু প্রবল একটি জল-ধারা বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই জল-ধারার উৎপত্তি স্থানে পাথরটির গায়ে গরুর বাঁটের মত চারিটি বাঁট না কি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্ত সে স্থানটি গাই-ধারা নামে সাধারণে অভিহিত হয়। এখানেও প্রতি বৎসর পর্ব্বোৎসব হয় এবং এই ধারা-গুলি সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়।

হনুমান-ধারার কাছে আসিয়া প্রসাদ দেখিল, সেখানে তার 'কিরা'র সম্মান রাখিয়া পার্ব্বতী উপস্থিত আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার খুড়া খুড়ি, এবং খুড়তুত বোন মোহিনী ও উপস্থিত! তারা সকলে বসিয়া চিড়া ভিজাইয়া খাইতেছে। শোনা গেল, ইহারা সকলেই জ্বালানি-কাঠ সংগ্রহ করিবার জন্ত পাহাড়ে আসিয়াছে।

প্রসাদের অপ্রত্যাশিত আগমনে কুটুম্বরা সকলেই আনন্দিত হইল এবং বাউরী জাতিসুলভ কুটুম্ব বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া প্রসাদকে টানিয়া লইয়া খুড় শ্বশুর নিজের সঙ্গে 'এক থাবল' খাওয়াইতে বসাইলেন। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপে এবং ক্ষুৎপিপাসায় প্রসাদ অনেকটাই শ্রান্ত হইয়াছিল, সুতরাং বিশেষ আপত্তি বোধ করিল না! কিন্তু এতগুলি কুটুম্বের মাঝখানে পার্ব্বতীকে দেখিয়া, প্রসাদের মনটা খুবই দমিয়া গেল, পার্ব্বতীর উপর একটু রাগও হইল! ভাল বিপদ! এত গুলি আত্মীয়ের সঙ্গে যে পার্ব্বতী পাহাড়ে আসিয়াছে, সে কথা আগে বলে নাই

কেন ? এবং যদি বা হনুমান-ধারার এই খানেই উহারা আশ্রয় লইয়াছে, তবে পার্ব্বতী একটু আগাইয়া গিয়া, নিভৃত স্থানে প্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না কেন ? প্রসাদের যে দুটা গোপনীয় কথা বলিবার ছিল, সেটা কি পার্ব্বতী বোঝে নাই ! প্রসাদের আদিম মানব সুলভ বর্ব্বরতা পুষ্ট হৃদয়টি পাকিয়া থাকিয়া, ক্ষোভের আতিশয্যে 'গুর্‌গুরাইয়া' উঠিতে লাগিল !

কুটুম্বদের সঙ্গে সময়োচিত দু'একটা মিষ্ট আলাপ-আলোচনা চলিল কিন্তু পার্ব্বতী কোন কথায় ভিড়িল না। সে উদাস গম্ভীর ভাবে, বিমুখ দৃষ্টিতে চুপ করিয়া রহিল। সূক্ষ্ম-মনস্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, মূর্খ প্রসাদ বুঝিল না,—নির্জ্জনতার সুযোগে সে ঝোঁকের মাথায় যে চাঞ্চল্য ও হঠকারিতা প্রকাশ করিয়াছে, তাতে পার্ব্বতীর ব্যথিত মনকে অধিকতর বেদনা-বিক্ষিপ্ত করিয়াই ফেলিয়াছে ! সে মনের মধ্যে এখন প্রসাদের জন্য বিন্দুমাত্র সহানুভূতির স্থান নাই !

আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়া সকলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। প্রসাদ হঠাৎ সকলকে শুনাইয়া খুড় শ্বশুরের উদ্দেশে বলিল "খুড়া হে, অঘান মাসে ধান কাটার সময় আমি পারবতীকে দিন কতকের লেগে লিয়ে যাব। লইতুনি দুটা ছেল্যা লিয়ে ক্ষ্যাতের কাজ ত পারবেক নাই,—ই বারে আমার সাথে ক্ষ্যাতে খাটবেক। আমার শাশুড়ীকে কথাটা বলি দিও।—"

কথাটা বলিয়াই প্রসাদ আড়চোখে পার্ব্বতীর মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, পার্ব্বতী প্রস্তাবটা শুনিয়া রুদ্র দৃষ্টি তুলিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া আছে !—সে দৃষ্টিটা ভাষায় অনুবাদ করিলে, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তোমার কাণ্ডজ্ঞানহীন খেয়ালের ফরমাস খাটিবার জন্য, তোমার প্রিয়তমা গৃহবাসিনীর দাসি বাঁদী খাটিতে তোমার গৃহে যাইব বই কি ? . . . পার্ব্বতী সে পাত্রীই নয় !—"

কিন্তু পার্ব্বতী মুখে কিছুই বলিল না। নিজের কাঠের বোঝাটার জন্য ব্যস্ততা জানাইয়া তাড়াতাড়ি আগাইয়া পড়িল। কাঠগুলা নীচে ছিল।

পার্ব্বতী সরিয়া পড়িতেছে দেখিয়া প্রসাদেরও হঠাৎ স্মরণ হইল তার প্রভু অনেকক্ষণ পাহাড় হইতে নামিয়া গিয়াছেন, তায় আর বিলম্ব করা উচিত নয়। অতএব সেও তাড়াতাড়ি নিজের ঝুড়িটা মাথায় তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে পার্ব্বতীর পিছু ধরিল।

মোড়ের গাছ-পালার আড়ালে আসিয়া পার্ব্বতীর কাঁধের উপর একটা আদরের ধাক্কা হানিয়া প্রসাদ নীরব কণ্ঠে বলিল "তুর লেগে পাহাড় হতি ফুল আনেছিলাম, তু লিয়ে যা —"

কোঁচড় হইতে এক মুঠা পাহাড়ী-ফুল বাহির করিয়া সে পার্ব্বতীর হাতে গুঁজিয়া দিল। পার্ব্বতী বিনাবাক্যে একবার অর্থহীন দৃষ্টিতে প্রসাদের মুখের দিকে চাহিল, তারপর পিছু ফিরিয়া ফুলগুলি হনুমান মূর্ত্তির উপর ছুঁড়িয়া দিয়া, যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিতে করিতে নিজ মনে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল।

প্রসাদ ক্রুদ্ধ তিরস্কারের স্বরে বলিল "সাত অকুপাড়ি বিগ্গা তোর! ফুলগুলা কাবড়াই দিলি যে?—"

পার্ব্বতী প্রস্থানোন্মুখ হইয়া শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল "হনুমানজীর কাছে আসিব্বাদ মাগুছি যেন তোর রীত'টো ভাল হয়, আর আমার ছেলেটো যেন তোর মত না হয়।—

কথাটা শেষ করিয়াই সে তীর বেগে ছুটিয়া নামিতে সুরু করিল। বোঝার ভারে ক্লিষ্ট, প্রসাদের সাধ্য ছিল না যে তত দ্রুত ছুটিয়া পার্ব্বতীর সঙ্গ ধরে,—সুতরাং সে হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া শুধু বিমূঢ়-দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর প্রস্থান-পথটার দিকে চাহিয়া রহিল।—

কল্লোল চাই

১৩৩০ এর শ্রাবণ সংখ্যা
১৩৩১ „ বৈশাখ „
„ „ জ্যৈষ্ঠ „
„ „ আষাঢ় „
„ „ শ্রাবণ „
„ „ আশ্বিন „
„ „ কার্ত্তিক „

ইহার যে কোনও সংখ্যা ভাল অবস্থায় আমাদের পাঠাইলে আমরা প্রত্যেক সংখ্যার জন্ত চারি আনা করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

কল্লোল কার্য্যালয়।
১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

সমালোচনার আলোচনা

আমরা বাঙ্গালী, আমাদের ভাষা বাংলা। সে-বিষয়ে কিছু-কিছু গণ্ডগোল এখনও চল্‌ছে। সংস্কৃত বল্‌ছেন, তুমি বাংলা ভাষা থাক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু সংস্কৃত থেকে অনেক শব্দ তোমার ভিতরে নিয়েছ, সুতরাং তুমি সংস্কৃত-বাংলা হয়ে যাও। উর্দ্দু, ফারসী ভাষাও সেই হিসেবে বাংলা ভাষাকে তাড়া ক'রে আস্‌তে পারে। কারণ বাংলা ভাষাতে তাদের ভাষার শব্দও বড় কম আম্‌দানী হয় নি। ইংরাজি ভাষাও বাংলা ভাষাকে 'টেবিলের' ওপরে 'গেলাসে পুরে যে দিন খুশী একনিশ্বাসে গলাধঃকরণ কর্‌বার দুরাশা কর্‌তে পারে। সুখের বিষয় বাংলা ভাষাকে গিল্‌তে চেষ্টা করেও আজ পর্য্যন্ত কেউ তা' ক'রে উঠ্‌তে পারে নি। বাংলা ভাষা সমস্ত বিক্ষোভের মধ্যে ক্রমেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, আপনার জাতীয়তার বৈশিষ্ট নিয়ে।

আর কেউ না মানুক, আমরা বাঙ্গালী এবং আমাদের জাতীয়তার একটা বৈশিষ্ট আছে একথা আমরা মানি। অন্যরা হয়ত বল্‌বে, তোমরা বাঙ্গালী হতে পার, তা'তে আমরা কোন আপত্তি করি না, কিন্তু তোমরা যদি নিজেদের কোনও বিশেষ জাতী বলে জাহির কর্‌তে চাও, তাহলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

সে কৈফিয়ৎ বাঙ্গালী কেবলমাত্র ভাষায় নয়, তার প্রতিদিনের সাংসারিক কাজেও বহুকাল ধরে দিয়ে আস্‌ছে। বাংলার আপাত-বিভিন্ন সমস্ত জীবনের মধ্যে বাংলার সাহিত্যে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে, নিস্তরঙ্গ নদীর অন্তর-স্রোতের মত এই বাংলার মন। এই মনই বাংলা ভাষার ঠাট।

আমাদের বিশ্বাস, সাহিত্যকে যে কোনও বিশেষ মানুষ গড়ে তোলে, তা নয়। এমন কথা ধারণা না করাই ভাল যে, কোনও দেশের সাহিত্য তার জন্মকাল থেকে বিধিলিপির মত পূর্ণতা নিয়ে প্রকৃতির অন্তরালে আদ্যোপান্ত লেখা হয়ে পড়ে আছে, একজনের পর একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক দৈবপ্রেরিত হয়ে এসে, সেই সাহিত্যকে বইয়ের আকারে, ছাপাখানার সাহায্যে লোকচক্ষুর গোচরে আনেন।

তা' যদি হ'ত তাহলে ভাষা কোনও দিনই প্রাণের গতিবেগ পেত না। কারণ ক্রমবিকাশ বলে আমরা যে অবস্থাটাকে মেনে নিই, সেটা দৈব নয়, সেটা মানুষের চেষ্টারই পুরস্কার।

প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক মানুষটি, অনেক সময় আপনার অগোচরেও ভাষা ও সাহিত্যকে গড়ে তোল্‌বার সাহায্য করে। দেশের নানাবিধ শুভ ও অশুভ অবস্থার ভিতর দিয়াই জাতির সাহিত্য সৃষ্ট হয়। পথের ধারে বা জীর্ণ কুটিরে যে মানুষটি অনশনে মরে পড়ে রইল, সেও দেশের সাহিত্যকে প্রাণ দিয়ে গেল। বাংলার গ্রামে গ্রামে, সমাজে সমাজে যে প্রায় ও আচারের উৎপীড়ন, তাতে যারা আত্মবলি দিল, তারাও সাহিত্যকে অজ্ঞাতসারে গড়্‌ল। কালে কালে যারা অস্ত্রের অনাচারে প্রাণ দিল, তাদের লাঞ্ছিত মূক বেদনা, দৃষ্টির অতীতলোকে সাহিত্যের রসাগারে সঞ্চিত রইল। বাংলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা, যারা জীবনকে মান্‌ল শুধু একটা অক্লান্ত, অনির্দ্দিষ্ট যাতায়াত বলে, তাদের মৃত্যুময় জীবন গোপনে অস্থি দিল—সাহিত্যের সৃষ্টির জন্যে। যে মেয়েরা মানুষের সমাজে ঠাঁই না পেয়ে, পথের ধারে দাঁড়িয়ে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সমানে, অভাবিত মনোবেদনা, অপমান ও দুঃখ সহ্য ক'রে সেই মানুষেরই মুখের দিকে রাত্রিদিন চেয়ে রইল, তাদেরও এই ক্ষুধাতুর অসহায় দৃষ্টি ব্যর্থ হ'ল না। সাহিত্যের সৃষ্টির সঙ্গে সে নীল চোখের মিলন হোল। এমনি যারা প্রত্যেক বাঙ্গালীর জীবন থেকে সুখ দুঃখের মন্থন-মুহূর্ত্ত হতে যে অমৃত রস বাংলার জীবনপাত্র পূর্ণ করছে, তাই বাংলার সাহিত্যকে সতেজ ক'রে চলেছে, প্রাণবান করেছে। তাইজন্য মনে হয়, আমাদের বাংলা-সাহিত্য বা যে কোনও সাহিত্য যে কেবলমাত্র কোনও একটি মানুষ বা কয়টি মানুষ গড়ে দিয়ে যান্‌, তা নয়।

বাংলা সাহিত্যের প্রসার আজ বেড়ে চলেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাছের সঙ্গে আগাছার মত বেড়ে চলেছে—সমালোচক। বাংলা সাহিত্যে ছোট বড় যে-সব লেখকরা তাঁদের রচনা প্রকাশ করেছেন, তাঁরাও সাহিত্যকে গড়ে তুলেছেন। আর এঁদের সমালোচক হয়ে যাঁরা দেখা দিয়েছেন, তাঁদের সমালোচনাতে আর কিছু থাকুক না থাকুক, সমালোচকের যে একটা দরদ থাকা উচিত সে-টুকুও তাঁদের সমালোচনাতে নেই। কোনও লেখক যদি লেখার মধ্যে বিশেষ কোনও অন্যায় ক'রে বসেন তাঁকে সত্য কথা বলে সমালোচনা করা অন্যায় নয়। কিন্তু তার মধ্যেও সৌন্দর্য্যবোধ ও সহানুভূতি থাকা বাঞ্ছনীয়। লেখককে শুধু কশাঘাত না ক'রে, রসাঘাত কর্‌লে, লেখক তবু নিজের দিকে ফিরে চাইবার সুযোগ পান্‌।

শুধু যদি তাঁকে চাবুক দেখিয়ে শাসান যায়, তাহলে লেখক নিরুপায় হয়ে পড়ে, নয়ত বে-পরওয়া হয়ে ওঠে। এই দুই অবস্থার কোনটিই সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর নয়। কিন্তু তার জন্ত দায়ী আমরা, যারা কলমকে চাবুক বলে মনে করি। কারুর গায়ের কাপড় খুলে নিয়ে, যদি বেছে বেছে তার গায়ে কোথায় কালো তিলটি আছে তা খুঁজে বের করতে হয়, তাহলে যে তিলগুলি মানুষের মুখশ্রীকে সুন্দর ক'রে তোলে, সে-গুলিও ঐ তিলবাছাইয়ের মধ্যে পড়ে যায়। তাহলে হয় এই যে, তেমন-তেমন জবরদস্ত লেখক না হলে, সাধারণ লেখকের যে একটা তিলাতঙ্ক হতে পারে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সে বেচারা তখন নিজের অপরিচিত অক্ষমতাকে ঢাক্‌তে চেষ্টা করতে, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-তিলগুলিও উপ্‌ড়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করবে।

সাহিত্যে সমালোচনাটা খুব ভাল জিনিষ, একথা সবাই স্বীকার করি। কিন্তু সমালোচনা যদি অসম হয়ে পড়ে, তাহলেই অকেজো হোল। একটা কথা, আমার মনোভাবের মূল্য আমার কাছে যতই বহুমূল্য হোক্ না, অন্তের কাছে তার কতখানি মূল্য হবে, তা নির্ভর করবে ঐ মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতার উপর। আমাদের মনে অহর্নিশি নানারকমের ভাবের উদয় হয়। কোনগুলি আব্‌ছা, কোনওগুলি স্পষ্ট। যে গুলি অব্‌ছাভাবে মনে আসে, সেগুলিতে ধরা পড়ে, আমাদের নিজেদের জ্ঞানের অভাব, আমাদের চিন্তার ভিতর একাগ্রতাহীনতা। যেগুলি স্পষ্ট হয়ে মনে আসে, সেগুলি ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা কতটুকু আমাদের আছে, তাও আমরা সর্ব্বদা বিচার করি না। ফলে হয়, এক বল্‌তে আমরা আরএক জিনিষ বলে বসি। কিংবা বলার উদ্দেশ্য যা, তা একেবারে ভুলে যাই। মনের এই দুই অবস্থার ভাবকেই প্রকাশ করবার প্রবৃত্তিটা আমাদের খুব স্বাভাবিক। সেই জন্য সবাই আমরা স্রষ্টা, নয় ত সমালোচক হবার লোভ সাম্‌লাতে পারি না। কতখানি জ্ঞান থাক্‌লে যে সমালোচক হতে পারি, কোন্ বিষয়ে কে কথা বল্‌তে পারি, একথা আমরা একবারও ভাবি না, ভাববার অপেক্ষাও রাখি না। বলার প্রবৃত্তির তাড়ায় বলে বসি, তাতে অনেকক্ষেত্রে বিরোধের সৃষ্টি হয়, সাহিত্যের কল্যাণ কিছুই হয় না!

অনেকে হয়ত বল্‌বেন, বাজে লেখক বাংলা সাহিত্য থেকে সরে পড়াই মঙ্গল। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাতে মঙ্গল নয়, এবং তা কোনও কারণে সম্ভব নয়। কারণ ভাষা-সাহিত্য যে গড়ে উঠ্‌ছে তার একটা স্পষ্ট চিহ্নই হচ্ছে যে, সাহিত্যের বুকের মধ্যে যার যা ভাবনা, অভিজ্ঞতা বা চিন্তাটুকু আছে, তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়্ছে। এই ঝাঁপিয়ে পড়ার মানে হচ্ছে, কোনও ব্যক্তিবিশেষ তার সাহিত্যে কিছু সমর্পণ করছে। দেশের সাহিত্য যখন দেশের মানুষ ও দেশের অবস্থাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে পৃথিবীর জাতীয়তার ক্ষেত্রে যাত্রা ক'রে, তখন দেশের ছোট বড় সবাই যে যার সর্ব্বস্বটুকু সাহিত্যকে অর্পণ ক'রে তৃপ্ত হয়। তার মধ্যে অনেকখানিই হয়ত কাদা-মাটির সামিল। বাংলার সাহিত্যেও হয়ত তাই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বাণীর পায়ের তলায় যে শতদলটি ফুটে উঠ্বে, তা এ কাদামাটি থেকেও রস সঞ্চয় করবে। তাই আমরা বলি, থাক-না এই বাজে লেখকরা ও আর দশজন বড় সাহিত্যিক। অসম্পূর্ণ জীবনের তাড়নায় সাহিত্যের দ্বারে এসে যারা ক্ষণিকের শান্তি চায়, তারা অক্ষম হলেও, তাদের চাবুক নিয়ে খেদিয়ে দেওয়ার অধিকার ও শক্তি কারুর নেই। যে সাহিত্যের শ্রী-সম্পদ বাড়াবার ক্ষমতা রাখে, সে বড়দের লেখা দেখে, তাঁদের সৃষ্টির উৎকর্ষতা দেখে নিজেদের সামলে নিতে পারবে এতে কি কোনও সন্দেহ আছে? এদেরই মধ্যে যে কেউ একজন সাহিত্যের পরিপূর্ণতার মস্ত বড় একটা কারণ হবে না তা কে জানে?

তাই মনে হয়, সাহিত্য গড়্তে গিয়ে ব্যক্তিবিশেষকে বা কয়েকজন লেখককে অক্ষম মনে ক'রে তার লেখার রসটুকু বাদ দিয়ে তাকে সমালোচনার পাচন-বাড়ি হাতে ক'রে সাত্-তাড়াতাড়ি 'হেঁইও—হাটো' বলে তাড়া করবার কোনও প্রয়োজন নেই। হয়ত কোনও লেখকের রচনার বিশেষ অংশ বা তাঁর লেখার ধরণ আমাদের মনোমত না হতে পারে, সেই বিশেষ অংশ বা ধরণকে নিয়ে আমাদের যদি সমালোচনা করবার মত উপযুক্ত সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও অন্তর-দৃষ্টি থাকে, তাহলে আলোচনা করা চল্তে পারে; আর তা' অসঙ্গতও হয় না। কিন্তু সেই আলোচনাকে চাবুক ক'রে তুল্লে মানুষের মনের মর্য্যাদা রক্ষা করা ত হয়ই না, বরং সমালোচকের আত্মমর্য্যাদার ওপরও লোকের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়ে।

আমরা বোধ হয় মনেই রাখ্তে পারি না যে, গাছের ঝাল-ঝাড়া এক, আর ধুলো-ঝাড়া আরেক বস্তু। ধুলো-ঝাড়ার প্রবৃত্তিটার মধ্যে পরিচ্ছন্নতার প্রতি একটা আকর্ষণ দেখা যায়। এই পরিচ্ছন্নতার প্রতি যার দৃষ্টি আছে, তার শুধুই ধুলো ঝেড়ে মন তৃপ্ত হয় না। সে ঐ অবসরে এখানকার জিনিষ ওখানে, ওখানকার জিনিষ ওখানে ঘুরে ফিরে সাজিয়ে সুখ পায়। মানুষের মন নিয়ত মনের মধ্যে অনেক কিছু সাজায়, আর বাইরেও তার সাজাবার প্রীতিটা প্রকাশ পায়। এই সাজান হচ্ছে মনের খেলা। মন খেল্তেই চায়। এই খেলার আনন্দের স্থান জগতে আছে, সাহিত্যেও থাক্বে। সাহিত্যে ফলের চাষ করতে যাঁরা নামেন,

তাঁরা সাহিত্যের মধ্যে যে প্রাণের খেলা তা' বুঝ্তেই পারেন না। শিশু যেমন বেড়ে ওঠ্বার সঙ্গে সঙ্গে খেল্তে থাকে, তাতে তার শরীরও সুস্থ থাকে, মনও সুস্থ থাকে; খেলা কমে গেলেই একদিকে জরা আসে। মনোজগতের খেলাকেও নিবৃত্তির খাঁচায় পুরে ফেল্লে, মনও খেলে না শরীরও খেলে না।

সাহিত্যেও আমাদের এই খেলা করবার অধিকার আছে। এই খেলার উদ্দেশ্য—নিজে আনন্দ পাওয়া, পরকে আনন্দ দেওয়া। কিন্তু আনন্দ দেওয়া মানে মনোরঞ্জন করা নয়। আনন্দ দেওয়া ও মনোরঞ্জন করা, এই দুইয়ের ভিতর অনেকখানি প্রভেদ। মনোরঞ্জন করাতে অন্যের হাততালির অপেক্ষা থাকে, কিন্তু আনন্দ দেওয়াতে সবার সঙ্গে আপন মনের রং মিশিয়ে হাততালি দিয়ে আনন্দ করবার স্বাভাবিকত্ব থাকে। তা বলে এই খেলা ক'রে জিনিষকে খেলো ক'রে তৈরী করা কোনও কাজের নয়। তাতে খেলা ত হয়-ই না, আর তার ভিতর যে খেলো আনন্দ সেটা 'রেশ্মী-মেঠাইয়ের' মত ঝুর-ঝুর্ ক'রে প্রাণের ফাঁক দিয়ে পড়ে যায়। মুখে তুল্তে গিয়ে দেখা যায়, হাতটাই চট্-চটে হয়ে আছে, কিন্তু সমস্ত মিষ্টি জিনিষটার কোনও চিহ্নমাত্র নেই!

সাহিত্য-জগতে এই খেলার ছুটোছুটি আগাগোড়া উদ্দেশ্যশূন্য। সারাজীবন ধরে হয়ত এই তার খেলা। মানুষের নিরুদ্ধ নষ্ট-জীবনের হয়ত এই করুণ অবসর। আপনার গোপন-আনন্দটিকে বাইরের আনন্দের সঙ্গে খেলিয়ে বেড়াবার হয়ত এই তার ক্রীড়া-ভূমি। সে চায় সাথী, সে পায় অনাত্মীয় সমালোচক। অনাদৃত এই লেখকের দল, জনহীন প্রান্তর-প্রান্তে দাঁড়িয়ে শোনে—নিষ্ঠুর সমালোচকের কর্কশ-ধ্বনি!

দ্রষ্টব্য

বাংলা-সাহিত্যের কথা—

৭৬১ পৃষ্ঠায় ১৫ লাইনে 'অঙ্গীকার' স্থানে 'অঙ্গীকার' হইবে। ৭৭২ পৃষ্ঠায় ১ম লাইনে 'মহামায়াকে' স্থানে 'মহামায়ীকে' হইবে।

পান্থ-বীণা

—শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১১

বংশীর ঘুম যখন ভাঙিল, প্রভাতের রৌদ্র তখন জানালার পথে ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। এত বেলায় ঘুম তাহার কোনদিন ভাঙে না, আজ কেন যে এত দেরি হইয়া গেল, বংশী কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিল, রত্নেশ্বর আহ্নিকে বসিয়াছেন, গায়ত্রী কল-তলায় দাঁড়াইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিতেছে!

বংশী কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই গায়ত্রী বলিল, এত দেরি যে? রাত্রে ঘুমোস্ নি বুঝি?

অপরাধীর মত মুখখানি মলিন করিয়া বংশী বলিল, ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু ছি, ছি আজ বড় বেলা হয়ে গেল উঠ্‌তে, নয়? ক'টা বাজ্‌বে?

গায়ত্রী হাসিতে হাসিতে বলিল, তুই ত' পূজোও কর্‌বি নে, আহ্নিকও কর্‌বি নে, তার আবার এত আফ্‌শোষ কিসের? হলোই বা বেলা।

আমায় এক্ষুনি বেরোতে হবে দিদি। বলিয়া বংশী তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

বংশীকে চা দিতে আসিয়া গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবি? শীগ্‌গির ফিরতে হবে কিন্তু।

হঁ্যা ফির্‌ব। বলিয়া চা খাইয়া বংশী বাহির হইয়া যাইতেছিল, দরজার কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, অমরেশ কাল কি বলেছিল কই বল্‌লি নে যে দিদি?

গায়ত্রী বলিল, সেইখানেই যাচ্ছিস্ ত?

হঁ্যা।

তোর যাবার কথাই বলেছিল। যাস্ যেন।

কিন্তু গায়ত্রীকে হাসিতে দেখিয়া বংশী বলিল, না, আর-কিছু ? হাস্‌ছিস্ যে ?

গায়ত্রী কহিল, একটিবার হাস্‌তেও পাব না ? কত আর কাঁদ্‌ব বংশী !

ইহার উপর আর কথা চলে না। বংশীও আর বেশী কিছু বলিল না, মাত্র তাহার দিদির মুখের পানে তাকাইয়া একটুখানি শুষ্ক ম্লান হাসি হাসিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

অমরেশের বাড়ীর দিকেই বংশী হাঁটিতেছিল। পথ চলিতে চলিতে তাহার মনে হইতেছিল, মানুষ গরীব হয় কেন ? তার স্বভাব, তার বুদ্ধির দোষে, না তার অদৃষ্টের দোষে ? কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা সে কোনপ্রকারেই করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। পথের পাশে চায়ের দোকানগুলার ভিড় তখনও কমে নাই। যে ফুটপাথের উপর দিয়া বংশী চলিতেছিল, দেখিল, সুমুখে একটা চায়ের দোকানের খোলা দরজার পাশে একজন খোঁড়া ভিক্ষুক গিয়া তাহার হাতের ভিক্ষাপাত্রটি তুলিয়া ধরিল। বিড়ি টানিতে টানিতে দুইজন বাবু দোকান হইতে বাহির হইতেছিল, ভিক্ষুককে একপ্রকার ঠেলিয়া দিয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে রাস্তাটা পার হইয়া ওপাশের ফুটপাথে গিয়া পৌঁছিল। সম্ভবতঃ তাহারা কোনও আফিসের বাবু। বংশী ভাবিতেছিল, তাহাদেরও ত সংসার আছে, দারিদ্র্য আছে, দুঃখ দুর্ভোগ হয়ত তাহাদেরও নিত্যসহচর, কিন্তু সে কেন তাহাদের মত অমন করিয়া হাসিতে পারে না ! তবে হয়ত তাহার নিজের দারিদ্র্যই সকলের চেয়ে উৎকট, তাহার অভাব সবার চেয়ে বেশি।—আর ঐ খোঁড়া ভিখারী ! লাঠি ধরিয়া সে তখন তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ যদি সে তার ভিক্ষা-পাত্রটি তাহারই সুমুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহার ঐ ক্ষুধাশীর্ণ কঙ্কালসার দেহ এবং তার খোঁড়া পা দেখাইয়া কিছু ভিক্ষার প্রত্যাশায় তাহার দুঃখের কাহিনী তাহাকে শুনাইতে আরম্ভ করে—তাহা হইলে একটি পয়সাও সে তাহাকে দিতে পারিবে না ! এই লজ্জায় বংশী তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়া ফুটপাথ হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। সেও ত আজ এমনি ভিক্ষার জন্যই বাহির হইয়াছে ! আট আনা পয়সা পাইলে একখানি গীতা কিনিয়া সে তাহার পিতাকে দিতে পারে ! গাড়ী-ঘোড়া বাঁচাইয়া কয়েক পা অগ্রসর হইতেই একটা মোটর তাহার পাশ দিয়া পার হইয়া গেল। আচম্‌কা বংশী তাকাইয়া দেখিল, মোটরের ভিতর অমরেশ ও তাহার ডানধারে কে একজন ছোক্‌রা বসিয়া আছে ভাল চেনা গেল না। দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানাও অনেক দূরে গিয়া পড়িল।

অমরেশের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া বংশী ভাবিল, অমরেশ যখন বাহির

হইয়া গেল তখন আর তাহার সেখানে গিয়া কাজ নাই, কিন্তু যাইবে কি যাইবে না এই কথাটা ভাবিতে ভাবিতেই সে অনেকখানা পথ চলিয়া অমরেশের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ী না ঢুকিয়া কাল সে এইখান হইতেই ফিরিয়াছিল, আজ কিন্তু তাহার আর ফিরিবার পথ রহিল না। রাস্তার উপর একটা লোক পুঁথির মালা ফেরি হাঁকিয়া গেল। তাহাকে ডাকিয়া দিবার জন্য বিভা তখন তাহাদের দোরের কাছে দাঁড়াইয়া কৈলাসের হাতে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। হঠাৎ বংশীর উপর তাহার নজর পড়িতেই কৈলাসের হাতটা সে ছাড়িয়া দিয়া 'বংশীদা' বলিয়া ছুটিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, দাও না বংশীদা আমার রাণীর একছড়া নেক্‌লেস্ কিনে ? বিয়ের সময় থেকে মেয়েটাকে কিছু দেওয়া হয় নি। বলিয়াই সে নিজেই ডাকিতে আরম্ভ করিল, এই মালা, এই পুঁতির মালা-ওয়ালা !

ফেরিওয়ালা তখন কয়েকখানা বাড়ী পার হইয়া গিয়াছিল, বিভার ডাক শুনিয়া ফিরিয়া আসিল।

বংশী যে কি বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি বিভার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সস্নেহে তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, পয়সা যে আমার কাছে এখন নেই দিদি, এর পর আমি ভাল নেক্‌লেস্ তোমায় এনে' দেব।

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কি জানি কেন হঠাৎ তাহার চোখ দুইটা ছলছল্ করিয়া উঠিতেই আর-কিছু সে বলিতে পারিল না ; চোখদুইটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইয়া বিভার হাতখানা আরও একটুখানি জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, কেমন ?

পয়সা তোমায় দিতে হবে না—এই দ্যাখ কি এনেছি। বলিয়া বিভা তাহার বাঁ হাত দিয়া জামার পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে হাত বাড়াইয়া বংশীকে তাহাই দেখাইয়া দিল।

ফিরিওয়ালা কাছে দাঁড়াইয়াছিল। ভাল দেখিয়া আট-আনার মালা কিনিয়া বিভা বলিল; থাক্ আর চাইনে বংশীদা। এতে আমার সব মেয়েগুলোর গয়না হবে।

চল তবে। বলিয়া বংশী তাহাকে বুকের উপর তুলিয়া লইল। একবার ভাবিল, বিভার কাছ হইতে তাহার ওই আট-আনা পয়সা আজ যদি সে চাহিয়া লইতে পারে তাহা হইলে একখানা গীতা আজ সে তাহার বাবাকে কিনিয়া দিতে পারিবে, কিন্তু মুখ দিয়া সে কথাটা তাহার কিছুতেই বাহির হইল না।

অমরেশের বাড়ীর নীচের তলায় রাস্তার ধারে যে কয়েকখানা ঘর ছিল, প্রয়োজন হইত না বলিয়া সেগুলো প্রায় অধিকাংশ সময় বন্ধই থাকিত, আজ সেগুলা খোলা হইয়াছে দেখিয়া বংশী একবার সেইদিকে তাকাইয়া দরজা পার হইয়া আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। ঘরগুলা শুধু খোলা নয়, বাড়ীর সহিত সেগুলার সমস্ত সংস্রব দেওয়াল দিয়া একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বাহিরে রাস্তার দিকে দেওয়ালের গায়ে কাঁচ দিয়া শো-কেশ্ (show case) তৈরী হইয়াছে, ঘরের মধ্যেও কাঠের দেওয়াল, কাঁচের আলমারি, মার্ব্বেল-টেবিল, চেয়ার বেঞ্চি ইত্যাদি বিস্তর মূল্যবান আস্বাব-পত্রের অন্ত নাই। ঔষধের শিশি, বোতল এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম দেখিয়া নূতন একটা ডাক্তারখানা খোলা হইবে বলিয়াই মনে হয়।

বংশী জিজ্ঞাসা করিল, এ-সব আবার কবে হলো রে বিভা?

বিভা তখন ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ছোট একটা আল্মারির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, এই আল্মারিটা তুমি একবার খোলো না বংশীদা?

কেন?

দেখ না একটা মজার জিনিষ দিচ্ছি তোমায়।

আলমারিটা খোলাই ছিল। কাঁচের সার্শীটা বংশী খুলিয়া ধরিতেই বিভা একটা বোতল দেখাইয়া দিয়া বলিল, এইটা দেখ না খেয়ে, ভারি মিষ্টি! আমায় একটুখানি দাও না বংশীদা এই গেলাসে ঢেলে?

বংশী বলিল, এটা সিরাপের বোতল। এ খেয়ে কি হবে?

হ্যাঁ সিরাপ। দাও, আমি খাব। বলিয়া কাঁচের গ্লাসটা সে নিজেই বাহির করিয়া টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিল।

বোতলের ছিপি খুলিয়া সেই গ্লাসের উপর একটুখানি সিরাপ ঢালিয়া দিয়া বংশী জিজ্ঞাসা করিল, কবে হলো রে এ-সব? ঘরটা কি ভাড়া দেওয়া হল নাকি?

আবার সিরাপ চুরি ক'রে খাচ্ছিস্ বিবি?

সহসা পশ্চাৎ দিক হইতে নিভার কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া বংশী বোতলটা রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া তাকাইল।

নিভা বলিল, এই যে! ডাকাতির সর্দ্দারি করছেন নাকি আপনি?

বংশী সে কথার কোনও উত্তর দিল না। জিজ্ঞাসা করিল, অমরেশ বেরিয়ে গেছে, নয়?

নিভা এতক্ষণ হাসিতেছিল, এইবার তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল।

বলিল, জানেন ত আবার জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আসুন, দাদা হয়ত আপনার ওখানেই গেছেন। বলিয়াই সেখানে আর সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, যেমন আসিয়াছিল, তেমনি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল।

দিদির ভয়ে বিভা এতক্ষণ একটা বড় টেবিলের আড়ালে দাঁড়াইয়া সিরাপটুকু খাইয়া ফেলিতেছিল, এইবার বংশীর কাছে আসিয়া বলিল, দিদির জ্বালায় কিচ্ছুটি করবার জো নেই আজ কাল। চল বংশীদা, আমরা উপরের ঘরে গিয়ে বসিগে চল।

বিভাকে লইয়া বংশী উপরে উঠিয়া গেল। বংশীকে অমরেশের ঘরে বসাইয়া রাখিয়া বিভা বলিল, তুমি বসো বংশীদা, দিদিকে আমি এই গয়না গুলো দেখিয়ে আসি।

এসো। বলিয়া বংশী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অমরেশের ছবি আঁকিবার সাজ-সরঞ্জাম সর্ব্বদাই তাহার টেবিলের উপর সাজানো থাকিত, বংশী দেখিল, সেগুলো ইহার মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। লিখিবার প্যাডের উপর কয়েকখানা চিঠি ও হিজি-বিজি কাটা একটা হিসাবের কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। টাকা আনা পয়সার বড় বড় অঙ্কগুলার উপর নজর পড়িতেই সুবৃহৎ এই ব্যাপারের বহরটা দেখিবার ইচ্ছা বংশীর হইতেছিল। ভাবিতেছিল, ইহার এই এতগুলা অঙ্কের মধ্যে যে কোন একটা অঙ্কের মূল্যে তাহার মত কতগুলা লোক দুবেলা খাইয়া বাঁচিতে পারে।

কাগজ খানা সে তুলিয়া দেখিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে, এমন সময় নিভা তাহার এক হাতে চা ও বিভা একটা থালির উপর কতকগুলা খাবার আনিয়া টেবিলের উপর ধরিয়া দিল। এ ব্যাপার আজ তাহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়াই মনে হইল। হঠাৎ সে নিভার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, কেন, তোমার বয়, তোমার খান্‌সামা?

বন্ধু যে রকম উঠে-পড়ে লেগেছেন, তাতে বয় খানসামা এবার আপনি নিজেই রাখ্‌বেন।

কথাটা বংশী বুঝিতে পারিল না, বলিল, কি বল্‌লে কিছু বুঝ্‌লাম না!

নিভা বলিল, কিছু বলি নি। দিদি ভাল আছেন?

দিদির কথায় হঠাৎ একটা কথা বংশীর মনে পড়িয়া গেল। বলিল, হঁ্যা ভাল আছেন। তোমাকে সে আজ ক'দিন ধরেই যেতে বল্‌ছে, আমি আসতে পারি নি।

নিভা কহিল পারবেন না কেন ? দরজা পর্য্যন্ত আসতে পেরেছিলেন, বলুন, ভেতরে ঢুকতে পারেন নি।

বংশী অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে একবার তাকাইল। কাল সে তাহাদের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, নিভা যে তাহা কেমন করিয়া টের পাইল বংশী প্রথমে কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না। একটু খানি হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, তাই—

নিভা পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল। কথাটা বলিয়াই বংশী সেই টেবিলের উপরের কাগজটার দিকে তাকাইয়া চা খাইতেছিল। নিভা বলিল, দাদা আজকাল আর্ট ছেড়ে শাঁক ধরেছেন।

বেশ ত! উন্নতি হবে। বলিয়া বংশী চুপ করিয়া রহিল।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, বাবার হাত ভাল হয়েছে ?

বংশী বলিল, সে ত ভাল হবার নয়।

নিভা আর কোনও কথা বলিল না, দেয়ালের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল দেখিয়া বংশী কহিল, নীচের ঘর গুলো কি ভাড়া দেওয়া হলো ?

হ্যাঁ।

কেন ?

মালিকের খুশী। নিভা চলিয়া যাইতেছিল ; বাহিরের মার্বেল বারান্দায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দাদা হয়ত আপনার সন্ধানেই গেছেন, এক্ষুনি ফিরবেন।

বংশী বলিল, না, আমায় এক্ষুনি যেতে হবে। এখনও বাজার হয় নি।

কথাটা নিভা শুনিতে পাইল কি পাইল না কিছুই বুঝা গেল না। সে চলিয়া গেল।

বিভা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ফিরির অরে একটি কথাও বলে নাই, এইবার বলিল, না বংশীদা যেও না তুমি।

বংশী বলিল, না গেলে যে চলবে না বিভা ; আমায় এরপর বাজার যেতে হবে, তার পর আমাদের রান্না হবে।

বিভা তাহার আরও কাছে সরিয়া আসিল, বলিল, তুমি নিজে বাজার যাবে বংশীদা ? একটা চাকর রাখ নেই ত পার ?

চাকর ? হুঁ। বলিয়া বংশী চুপ করিয়া রহিল। চাকর যে সে কেন রাখে না সে কথাটা স্পষ্ট ভাবে এই মেয়েটাকে বুঝাইয়া দিতে পারিল না।

বিভা বলিল, তুমি আর আমায় দিদির কাছে নিয়ে গেলে না বংশীদা,—তুমি ভারি দুষ্টু!

আমাদের সে ভাঙা ঘরে গিয়ে কি করবি বিবি?

হ্যাঁ ভাঙা ঘর! কেমন কুকুর আছে, খেয়াল আছে, পায়রা আছে,—

বংশী বলিল, ওরা বড় গরীব, খেতে পায় না, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়,—আমাদের ঘরে তাই ওদের থাক্‌বার একটু খানি জায়গা দিয়েছি।

কই, তবে আমাদের ঘরে নেই কেন?

তোমাদের ঘরে? আছে। আজকাল মানুষগুলোও ওই সব কুকুর বেরালের মতই খেতে পায় না, তারা আবার ওদের চেয়েও গরীব,' তাই তোমরা মানুষ পুষেছ।

হ্যাঁ, মানুষ আবার পোষে? বলিয়া বিভা হাসিতে লাগিল।

এতক্ষণ পরে বংশী, তাহাকে অনেক কষ্টে কহিল, তোমার সেই আট আনা পয়সা কোথায় রাখ্‌লে বিভা?

কেন তোমার চাই? আমি এনে দিচ্ছি। বলিয়া বিভা ছুটিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

বংশী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না, না, চাইনে চাইনে রে বিভা—

বিভা তখন চলিয়া গিয়াছে; কথাটা সে শুনিতেই পাইল না।

ফিরিতে তাহার একটুখানি বিলম্ব হইল। মিনিট কুড়ি পরে সে তেমনি ছুটিতে ছুটিতেই ঘরে আসিয়া ঢুকিল। বংশীর কাছে আসিয়া বলিল, এই নাও দেখ, কি এনেছি।

বংশী দেখিল, তাহার হাতে এক খানা দশ টাকার নোট। বলিল, এ তোকে কে আন্‌তে বল্‌লে রে?

বিভা বলিল, দিদি সেটা দিলে না। বল্‌লে তোর সে আধুলিটা খরচ করে ফেলেছি বাপু, এইটে নিয়ে যা। আর কি বল্‌লে জানো বংশীদা?

কি?

এসো তোমার কাণে কাণে বলি। বলিয়া বিভা তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, বল্‌লে, তোর বংশীদা ভারি গরীব।

কথাটা শুনিয়া বংশী মনে মনেই একটুখানি হাসিল, তাহার পর বলিল, না,

তুই ফিরে দিগে যা, এ আমার চাইনে। বলিয়াই সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নোটখানা বিভা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, তবে এই রইলো আমি পারব না ফিরে দিতে,—কে ওর গাল খাবে ?

বংশী আর কোনও কথা না বলিয়াই বাহির হইয়া আসিল। মার্ব্বেল বারান্দাটা পার হইয়া সিঁড়ি ধরিয়া সে নীচে নামিতে যাইবে, এমন সময় পিছন হইতে শুনিল, বিভা বলিতেছে, বিবি তুই নিয়ে আয় আমার টাকা। বড়বাবুর মেজাজ দেখ্‌লে আমার অষ্টাঙ্গ পুড়ে যায়।

ক্রমশঃ

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ কর্ত্তৃক ১০।২ পটুয়াটোলা লেন হইতে প্রকাশিত ও শ্রীশরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা "বাণীপ্রেস" ৩৩এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

মাঘ, ১৩৩১ সাল]

[দ্বিতীয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

কল্লোল



কবি-নাস্তিক

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

এই ভুবনের মধুর দিনের পথিক যত,
আস্‌ল যারা
হাস্‌ল যারা
ক্ষণেক ভালবাসল যারা,
আজকে তারা সন্ধ্যা তোমার
পাকা সোনার
গলার হারে,
গগন পারে
যে-কথাটি গেল থুয়ে,
কপোল ছুঁয়ে
গেল চলে
যাহা বলে,

হায়রে হায়,
হারিয়ে যায়
সকল কথা আসন্ন ঐ অন্ধকারে।
আর যারা সব
বইল বোঝা, সইল ব্যথা,
মনের কথা কইল না;
ফুলের তরী বাইল শুধু, ফলের কড়ি চাইল না;
নীড়েতে পাখ্ পুড়্‌ল যাদের আকাশে হায় উড়্‌ল না—
ঘুর্‌ল না;
তাদেরও আজ দিবা শেষে
ভালবেসে,
জড়িয়ে বুকে মুছিয়ে আঁখি
অশ্রু-জলে অধর রাখি,
ডাক্‌বে না কেউ হায়রে হায়!
জানি, জানি, সন্ধ্যারাশি, দিনের বাণী সব বৃথায়!
ধূলা সে যে ধূলাই শুধু
পরশ-পাথর নাই রে নাই।
মিথ্যা বোঝা, মিথ্যা খোঁজা
বৃথা ওরে সব বোঝা-ই
মরমে যে মার খেয়েছে
মিথ্যা যে তার সব ওয়াই!
বুকের ভিতর যা থাকে থাক্
ঢেকেই তা রাখ্
ওষ্ঠে প্রিয়ার ভণ্ডামি নাই, নাই পেয়ালায় বুজরুকি,
পরকালের পুঁথি ফেলে, আয় রে হতাশ, আয় দুখী,
আয় রে আয়
দিন যে যায়!
উপবাসী প্রাণ যে চায়
বিপুল নিদারুণ ক্ষুধায়।
স্বর্গের কড়ি আগ্‌লে আছিস্ মোক্ষ আশায় মূর্খ কে?
অর্ঘ্য দে।

এই দেহ তোর দেবতা শুধু,
দিন দুয়েকের স্বর্গ রে!
অর্ঘ্য দে।
নর-দেহের চেয়ে মূর্খ, মোক্ষ নয় মহার্ঘ রে!
অর্ঘ্য দে।
মৃত্যু শাসায়, শুন্‌তে কি পাস্?
দেখ্‌তে কি পাস্, শ্মশান পাতা সকল ঠাঁই,
বিশ্ব জুড়ে চিরটা কাল কালের হাতের নেই কামাই?
ওরে অন্ধ, ওরে হতাশ!
লুট্ ক'রে নে যেথায় যা পাস্
আকাশ বাতাস,
প্রেমের প্রকাশ,
নারীর দেহে রূপের বিকাশ,
যেথায় যা পাস্।

ভিখারী তুই আছিস্ ভুখা,
শিকারী সুখ নেয় লুটে,
এ কিরে তোর মনের বিকার—
রইবি খুশী চিরকুটে?
হাঁক উঠে
মুখ ফুটে
মোক্ষ-মোহের ডোর টুটে,
"এই জীবন মোর সাধন
স্বর্গ মোর এই ভুবন!"
দুখ যে চায়, দুখ যে পায়,
আর যে সুখের পিছনে ধায়,
দিনের শেষে সব সমান, সব সমান!
পুঁথির পাতায় ধাপ্পাবাজি পরকালের সব প্রমাণ।
ডাক্‌ছে কবি—আয়রে আয়
তিলে, তিলে, প্রাণ-পেয়ালায়
চুমুক দেবার সময় যে যায়!

সময় যে যায়—সময় যে যায়, বাজছে কালের ডঙ্কা রে,
সকল সুখের পাছে আছে সমাপ্তিরই শঙ্কা রে!
শিবের সাথে শ্মশ্‌ছে রে সব,
সৃষ্টি সাথে ধ্বংসোৎসব
কালভৈরব হুঙ্কারে।

যৌবনেরও মউ-বনে সব মউ-মাছিদের মর্ম্মরে
শুন্‌ছি বাজায় বিসর্জ্জনি কঙ্কালেরা পঞ্জরে ;
বাজায় ফুলে বাজায় পাতায়
পাখীর পাখায় লাজুক লতায়,
সুখে, আশায়, ভালবাসায়
সব ভরসায়
বাজায়, বাজায় কেবল বাজায়!

—বসন্তেরি রঙিন খাতায়
রঙের সাথে কালো কালি-ই লিখ্‌ছে শমন পাতায় পাতায়।
ওরে ভাই—
চোখের জলের সময় যে নাই!
রূপের মেয়াদ দু'দিন মোটে
দু'দিন মেয়াদ যৌবনের ;
প্রিয়ার ঠোঁটের গুল্‌বাগে ভাই
ইজারা যে দুই দিনের!
ঠিকানা নেই ঠিকানা নেই
আশার ফানুষ কখন ফাঁসে ;
জীবন স্বপন ভাঙেরে তোর
মহাকালের অট্টহাসে।
ভাব্‌বি কি আর, কর্‌বি বিচার
বৃথা কি আর খাট্‌বি বেগার?
কালকে প্রিয়ার মুখে পাবি
হয়ত চিহ্ন বলি-রেখায়!
আজ দরজায়
তাই ত কবি ডাক্ দিয়ে যায়—

ফাগুন ফুরায়—
আগুন জুড়ায় !
মধু-মাসের মহোৎসবে দস্যু হ'য়ে লুট্ বি কে আয় !
ছিনিয়ে নেবার সাহস যে চাই—
বিনিয়ে কাঁদিস্ কার ভরসায় ?

বদ্ধদ্বার অন্ধকারে
কুঁড়ির প্রাকারে
স্ফুটন-আশায় কাঁপে অস্ফুট প্রসূন।

'সে কবে'

মুক্তি

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

প্রথম অঙ্ক

[ফাল্গুনের সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় এখনও গ্যাস্ জ্বলিতে সুরু হয় নাই। প্রাচীরের মাথায় হাট বসাইয়া কাকগুলি মহলা বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে। একটি ভাঙা বাড়ীর একতলার ছাদে দেওয়ালের রেলিঙের কাছে একটি যুবক ও তাহার ডান পাশে একটি তরুণী দাঁড়াইয়া ছিল। তরুণীটির পরণে রঙিন একখানি শাড়ী, মাথায় শিথিল একটি ঘোম্‌টা, সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর-রেখা, হাতে সোনার আভরণ,—বয়সে সতেরো আঠারো হইবে, নাম মুকুল। যুবকটির রোহারা চেহারা, পরণে খদ্দরের একটা পাঞ্জাবী, চোখে একটা মোটা ফ্রেমের চশমা, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের কম হইবে না, নাম হিমাংশু। এম. এ. পাশ করিয়া মার্চেণ্ট আফিসে কাজ করিতেছে। যুবকের হাতে তরুণীর একখানি পুষ্ট শিথিল হাত, সন্ধ্যার একটু কিরণ চুড়িগুলিতে ঝিকিমিকি করিতেছে, বাতাসে মাথার ঘোমটার আড়াল হইতে প্রচুর কালো চুল যুবকটির কাঁধের উপর খেলা করিতেছে, বুকের আঁচলটা এলো হইয়া রেলিঙের ধুলার উপর লুটাইতেছে। তাহারা পরস্পরের আরো একটু কাছে আগাইয়া আসিল।]

মুকুল। এ আমার স্বপ্নাতীত মনে হচ্ছে! আমি এ-আনন্দ বইতে পারছি না—

হিমাংশু। মুকুল! (হাতখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।)

মুকুল। এই ম্লান ধূসর সন্ধ্যা কি অপরূপ লাগ্‌ছে চোখে! ঐ একটা ভিখারিণী, ঐ গাছের পাতার ঝিরি-ঝিরি, এই মেঘের স্নিগ্ধ আকাশ!—যদি তোমাকে না পেতাম! (দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল।)

হিমাংশু। তোমার হাতখানি কি ঠাণ্ডা! তোমার চুলের গন্ধটি নিশ্বাসে এসে লাগ্‌ছে। কোনোদিন ত এমন মধুর ক'রে কাঁদি নি মুকুল!

[দুই জনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইতেছিল না। আব্ছা অন্ধকারে কয়েকটা তারা জাগিয়া উঠিয়াছে, মই কাঁধে বাতি-ওয়ালা চলিয়াছে, পাখীর কলরব আর বেশী শুনা যায় না।]

মুকুল। ওরা সব আমাকে সাজাচ্ছিল, চন্দন অগুরু আল্‌তা শাড়ী অলঙ্কার—কোন সমারোহেরই আর শেষ ছিল না। সমস্ত সজ্জা ভার মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে! এত আলো, ঝাঁক্‌-জমক, আনন্দ সমস্ত বিষ মনে হচ্ছিল . . . ভাব্‌তে পারছি না আর! কি চমৎকার অপরূপ এই পৃথিবী! মাছিটা কি মিষ্ট গুন্‌গুন্ করছে! . . .

হিমাংশু। (মুকুলের আঙুলগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে) কিন্তু আমি তা জান্‌তাম—

মুকুল। (আয়ত চোখ দুইটি হিমাংশুর মুখের পানে তুলিয়া) জান্‌তে?

হিমাংশু। হাঁ, মোটে তিন দিন আগে জান্‌তাম। জানতাম তুমি আমার ছাড়া আর কারুর—(হাতখানি আবার বুকের উপর চাপিয়া ধরিল)

মুকুল। মুখ-চন্দ্রিকার সময় একবার মুখের দিকে চাইলাম। ভাব্‌লাম দেখি, কে সে ধূমকেতুর মতো আমার খুশীর বাগান পুড়িয়ে দিল?

হিমাংশু। (উৎসুক কণ্ঠে) কি দেখ্‌লে?

মুকুল। কিছুই দেখ্‌লাম না। তিনি আমার মুখের দিকে চাইলেন না।

হিমাংশু। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) এদেরই বলে মানুষ, না মুকুল?

মুকুল। (জলভরা চোখে) মানুষ?—না-না দেবতা। রাত্রে খালি ইচ্ছে হচ্ছিল, উঠে ওঁকে প্রণাম করি। কিন্তু তিনি এত দূরে শুয়ে রয়েছিলেন! . . .

হিমাংশু। কোন কথা বলে নি?—

মুকুল। (কতগুলি চুল দিয়া হিমাংশুর ডান হাতের মণি-বন্ধটি জড়াইতে জড়াইতে) বলেছেন।

হিমাংশু। কি বল্‌লে?

মুকুল। বল্‌লেন, 'আপনাকে আমি মুক্তি দিতে এসেছি . . . আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।'

হিমাংশু। তারপর?

মুকুল। (ঘোমটা পড়িয়া গিয়াছিল, মাথায় উঠাইয়া দিয়া) আমি কিছু বুঝ্‌লুম না। আপনি সম্বোধনটা কানে কি-রকম শোনাল! একটু আশ্চর্য্য হলুম।

হিমাংশু। বাধিত হলে না?

মুকুল। কেন?—

হিমাংশু। (আব্ছা একটু হাসিয়া) বিংশ-শতাব্দীর শিক্ষিত ছেলে, বাসর-রাতে স্ত্রীকে আপ্নি বলে সম্বোধন করেছে . . .

মুকুল। (দুষ্টামির সুরে) যাও! তখন লোকটার ওপর আমার ভারী ঘৃণা হচ্ছিল।

হিমাংশু। (গম্ভীর সুরে) অসিতকে প্রণাম করেছ?

মুকুল। যাবার সময় প্রণাম ক'রে যাব।—আচ্ছা, উনি কোথায়?

হিমাংশু। নীচে, পড়্ছে।

মুকুল। এখানে যদি এসে পড়েন?—

হিমাংশু। পাগল! আমাদের এখন যে সে মুক্তি দিয়েছে . . .

মুকুল। (মিষ্ট হাসিয়া হিমাংশুর আঙুলের আঙটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে) তুমি . . .

হিমাংশু। তার পর তুমি কি বল্লে?

মুকুল। উনি বল্লেন, এই অনুষ্ঠান, এই সামাজিক আচারের কিছু মূল্য নেই। আপনার ভয় নেই, আমি আপনার সত্যের অমর্য্যাদা করব না।

হিমাংশু। সন্ধ্যাতারাটা আমাদের দিকে কি করুণ চোখে চাইছে! . . . তুমি কি বল্লে?

মুকুল। আমার কাছে সমস্ত রহস্য লাগ্ছিল। উনি বল্লেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার ওপর আমার কোন দাবী নেই—থাক্তে পারে না। (দুই চোখ জলে ছল্ছল্ করিয়া উঠিল।)

হিমাংশু। কি সুশীতল স্নিগ্ধ একটি অন্ধকার আমাদের বেষ্টন ক'রে ধরেছে! মুকুল—

মুকুল। উনি বল্লেন, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন, বৃথা উপবাস করায় আপনাকে ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি কাল বাড়ী পৌঁছেই হিমাংশুর হাতে আপনাকে স'পে দেব।' . . . সত্যিই এ স্বপ্ন!—নয়?

হিমাংশু। অসিত যদি এমন উদার না হত!—

মুকুল। (হিমাংশুর বাহুর উপর মুখ লুকাইয়া) না না, সে চিন্তা আর ক'রোনা। কি মধুর তৃপ্তি এ! আমরা দুই সমাজহীন ঘর-ছাড়া ছন্ন-ছাড়া পথিক!

হিমাংশু। একটা পাখী অন্ধকারে দুই ডানা মেলে উধাও হয়ে উড়ে চলেছে!

মুকুল। চল, অসিতবাবুকে প্রণাম ক'রে আসি। আজকে হয় ত তিনি ছেড়ে দেবেন না।

হিমাংশু। মনে পড়ে মুকুল, একদিন এম্‌নি পালিয়ে যাবার মতলব করে-ছিলুম? সব ভেস্তে গেল। কি শক্ত লোহার আগল তোমার বাড়ীর! ...হাঁ, আজ রাত্রেই যাব। এখানকার চাক্‌রী ছেড়ে দিয়েছি, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে একটা নিয়োগ-পত্র এসেছে; চল, বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু অসিতের সাহায্য চাই এ বাড়ী থেকে নির্ব্বিঘ্নে বেরিয়ে যেতে।—অসিত, বন্ধু, দেবতা!...

[তাহারা আবার পাশাপাশি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। আকাশের অগণিত চোখ মিটি-মিটি করিতেছে। কেহ কিছু না বলিলেও দুই জন পরস্পরের উৎসুক দুইখানি মুখ বাড়াইয়া দিয়া ব্যগ্র অধর-সঙ্গমে আসিয়া স্থির হইল। গীর্জ্জার ঘড়িতে আটটা বাজিতেছে। অসিতের বাবা অক্ষয়বাবু পিছনের দরজা দিয়া ছাদে আসিতেছিলেন। এই দুই তরুণ-তরুণীর অভিনব প্রেম-পরিবেশন দেখিয়া খানিকক্ষণ 'থ' হইয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন। হিমাংশু ও মুকুল দুইজনে চোখের জল মুছিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। নীচে রাস্তা দিয়া পাড়ার একটা ছেলে বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিতে-দিতে চলিয়াছে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[সেই রাত্রি। নীচে বসিবার ঘরে ইজি চেয়ারে শুইয়া একটি যুবক একখানি ইংরাজি মাসিক-পত্রিকার পাতা উল্‌টাইতেছিল। পাশের টেবিলের উপর অয়েল-ক্লথ্‌ পাতা, তাহার উপরে একটা বড় লণ্ঠন, চারিপাশে রাশীকৃত কাগজ-পত্র পুঁথি খাতা বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে। ঘরের সমস্তগুলি জানালা খোলা, বাতাসে লণ্ঠনের আলোটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। যুবকটির বলিষ্ঠ দেহ, উন্নত ললাট ও দীপ্ত চক্ষু দেখিলেই সম্ভ্রম করিতে ইচ্ছা হয়। কলিকাতার কোন কলেজে প্রফেসারি করে ও মাঝে মাঝে আদালতে ঢুঁ মারিয়া আসে। মাথায় কোঁক্‌ড়ানো চুলগুলি হাওয়ায় দোল খাইতেছে, মুখখানিতে একটি অপরূপ শান্তি মাখানো। বয়স সাতাশের বেশী হইবে না। হঠাৎ অক্ষয়বাবু চটি-জুতার

শব্দ করিতে করিতে এক রকম দৌড়াইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সে চমকাইয়া উঠিল।]

অক্ষয়। এ-কি কাণ্ড অসিত ?—

অসিত। (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কি হয়েছে বাবা ?

অক্ষয়। (ভাঙা-ভাঙা গলায়) ছাদে হিমাংশু আর বৌ-মা . . . ছি ছি ! এমন কুলটাকে পুত্রবধূ করেছি ! (মাথায় হাত দিয়া মেঝের দিকে চাহিয়া রহিলেন।)

অসিত। (ক্ষণকাল মেঝের পানে চাহিয়া থাকিয়া, শান্ত ধীরভাবে) কি করেছে বাবা ?

অক্ষয়। (অসিতের গলার স্বরে বিস্মিত হইয়া) কি করেছে ? হিমাংশুকে বলি, এই কি বন্ধুত্বের প্রতিদান ? ছি ছি ! তার বন্ধুর পরিণীতা পত্নীর অঙ্গ স্পর্শ করা ! তাকে তুমি এক্ষুনি দারোয়ান দিয়ে চাবুকে বাড়ীর বা'র ক'রে দাও অসিত। আর আমি ঐ চরিত্রহীনা বধূকেও ঘরে স্থান দিচ্ছি নে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি,—স্বচক্ষে—(বৃদ্ধ রাগে ফুলিতে লাগিলেন।)

অসিত। (হাতের ম্যাগিকপত্রটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া গলার স্বরকে সংযত শান্ত করিয়া) ওরা এমন কিছু অন্যায় ত করে নি বাবা—

অক্ষয়। (বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে) এঁ্যা ? অন্যায় নয় ?—

অসিত। (শান্তস্বরে) না।

অক্ষয়। (লাফাইয়া) তুমি এ-কথা বলছ ?—স্বামী হয়ে ?

অসিত। আমি তার স্বামী নই।

[অক্ষয়বাবুর কাছে সমস্ত ধাঁ ধাঁ লাগিতে লাগিল। তিনি ইহার কিছুই সমাধান করিতে পারিলেন না। তিনি একটা চেয়ারে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, অসিতও সামনের একটা চেয়ারে বসিল। অক্ষয়বাবুর ঠোঁট কাঁপিতেছিল, একবার তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়া অসিত চোখ নামাইয়া লইল।]

অক্ষয়। তুমি কি পাগল হয়েছ অসিত ?

অসিত। না বাবা, পাগল হই নি।

অক্ষয়। তবে ?—

অসিত। তবুও আমি মুকুলের স্বামী নই।

অক্ষয়। (কর্কশকণ্ঠে) স্বামী নও ? এ কি-রকম কথা ? কাল বিয়ে ক'রে

বউ ঘরে আন্‌লে, আজ তুমি তার স্বামী নও?—পাগলের মুখ ছাড়া এমন আজ্‌গুবি কথা আর কার মুখ দিয়ে বেরোয়? দাঁড়াও, আমিই এর একটা হেস্ত-নেস্ত করছি। [বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভিতরের দরজা দিয়া উপরে যাইবেন, অসিত তাঁহাকে বাধা দিল।]

অসিত। যাবেন না, সমস্ত কথা শুনুন। ওদের বাধা দেবার অন্যায় অধিকার আমার বা আপনার কারুর নেই।

অক্ষয়। কেন?

অসিত। কেন না, কালকের বিবাহকে আমি অস্বীকার করি। ঐ প্রাণহীন আচারের দাবীতে আমরা কোনো অধিকারই দেখাতে পারিনে।

অক্ষয়। তার মানে?—

অসিত। তার মানে,—আপনি অত অস্থির হবেন না, সব স্থির হয়ে শুনুন—তার মানে, যে-বিবাহে দুইটি অপরিচিত প্রাণীর স্থূল-দেহের মিলন ঘটিয়ে দেওয়া হল, সে-মিলন আমার চোখে নেহাৎ অগৌরব ও ক্ষুদ্রতায় বিষয় ব'লে মনে হয়। মুখের মন্ত্রের গুরুত্বকে আমি স্বীকার করি নে। আপনি ত জানেন, আমার কোন দিনই বিয়ে করবার মত্‌ ছিল না। হঠাৎ—

অক্ষয়। (তাড়াতাড়ি) তবে হঠাৎ বিয়ে করার ঝোঁক্ হল কেন?—

অসিত। (শান্তস্বরে) বিয়ে করলুম, মুকুলকে মুক্তি দিতে। আপনি ত জানেন, আমাদের বাংলার সমাজে তরুণ-তরুণীর বিয়ে খুব অল্পই পূর্ব্বরাগের থেকে হ'য়ে থাকে। যে ক'টা হয় বা হতে চায়, তাদের দাবিয়ে রাখা অন্যায়—অমানুষিকতা, পাপ।

অক্ষয়। (চঞ্চল হইয়া) তুমি এ-সব কি বললে অসিত?—

অসিত। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে, পেতে চায়, পেলে সুখী হবে।

[একটা দমকা হাওয়া আসিয়া পাখীগুলি নাড়িয়া দিয়া গেল, রজনী-গন্ধার একটু গন্ধ বহিয়া বাতাস, পিতা ও পুত্রের ললাট স্পর্শ করিল, পথবাসী কোন্ পথিকের করুণ বাঁশীর সুর বাজিয়া চলিয়াছে]

অক্ষয়। (বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে) তবে তোমার বিয়ে করার কি দরকার ছিল?

অসিত। (মাসিকপত্রটা দুই হাতে মোচ্‌ড়াইতে-মোচ্‌ড়াইতে) বললাম যে, এই হীন সমাজকে ঠকিয়ে মুকুলকে মুক্তি দিতে। নইলে বিয়ে আমি কক্ষনো করতাম না।

অক্ষয়। মুকুলকে মুক্তি দেবার ভার তোমার ওপর পড়্‌ল কেন?—হিমাংশুই ত তাকে নিজে বিয়ে করতে পার্‌ত?

অসিত। (একটু হাসিয়া) বিয়ে কর্‌তে পার্‌ত বটে, কিন্তু মুকুলের বাবা বিয়ে দিত না।

অক্ষয়। কেন?

অসিত। হিমাংশুরা কায়স্থ।

অক্ষয়! (চমকাইয়া উঠিয়া) কায়স্থ? ছি—ছি! বামুনের সঙ্গে কায়েতের পরিণয়? ছি ছি ছি! একেবারে—

অসিত। বাবা!

[ডাক শুনিয়া অক্ষয়বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। একবার অসিতের সুন্দর দীপ্ত মুখের পানে চাহিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না। হাওয়ায় আর একটা কি ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিল। একটা নিদ্‌-হারা তারা আনন্দে কাঁপিতেছে।]

অক্ষয়। (কপালে হাত রাখিয়া) আমি এ-সব আয়ত্ত কর্‌তে পার্‌ছি না!

অসিত। (দৃঢ়স্বরে) অনুদার সঙ্কীর্ণ সমাজকে আঘাত দেওয়া চাই। আঘাত না পেলে সে আর বাঁচ্‌বে না।

[অক্ষয়বাবু অসিতের মুখের পানে চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইলেন]

অক্ষয়। বল—

অসিত। সমাজের কাছে মন্ত্রই হল মূল্যবান, হৃদয় নয়। গোত্র হল মিলনের মাপকাঠি, প্রেম নয়। আপনি একবার ভাবুন। মানুষ ত শুক্‌নো পুঁথি-কেতাবের জীব নয় বাবা, তার দেহ যে রক্ত-মাংসে গড়া, সেখানে যে সব খাটি।

অক্ষয়। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে, তর্ক কর্‌বার ক্ষমতা আমার চ'লে গেছে।

অসিত। ভেবেছিলুম, বিয়ে কোন দিন কর্‌ব না জীবনে। হঠাৎ আপনারা একদিন আমার মত্‌ বদ্‌লে যেতে ভারী খুশী হয়েছিলেন। কেন মত্‌ বদ্‌লেছিলাম?—

অক্ষয়। বুঝেছি।

অসিত। ভাব্‌লুম, বন্ধুর জীবন নষ্ট হতে দেব না। শুধু মূল্যহীন কতকগুলি কথার জালে মুকুলকে টেনে এনে হিমাংশুর হাতে উপহার দিব। আমি করেওছি তাই। অনেক আগেই ওদের বিয়ে হয়েছিল, আর সেই-ই সত্যিকারের বিয়ে, আর

এটা একটা ভুয়ো জুয়ো খেলা। (হাসিয়া) আমি মন্ত্র কিছু শুনিওনি, আওড়াইও নি। সমস্ত জিনিষকে সুন্দর ক'রে দেখ্‌বার একটা মনীষা আছে বাবা। ওদেরও সুন্দর ক'রে দেখ্‌তে শিখুন।—

[কথা অস্পষ্ট হইয়া আসিল। অন্ধকার মা'র স্নেহের মত নিবিড় হইয়া রহিয়াছে। অক্ষয়বাবু অসিতের একখানি হাত টানিয়া লইয়া তাহাতে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অসিতের হারা মা'র মুখখানি চাঁদের আলোর মত তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিল, চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। তারাগুলি আনন্দ-গানের ফিন্‌কির মত দপ্‌-দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। ঘর-ছাড়া একটা পাপিয়া ব্যথা-বিদীর্ণ কণ্ঠে 'পিউ কাঁহা' ডাক ছাড়িয়া আকাশে মিশাইয়া গেল। গীর্জ্জার ঘড়িটা এই সুন্দর সুষুপ্তির হৃদয়ের শব্দ করিতে লাগিল—টং টং টং।]

. . . নগরের ছন্দহীন বিপুলতার মাঝে মানুষের মনের একটা রূপ ও রূপক একসঙ্গে আমি দেখ্‌তে পাই—মানুষের মনের মত জটিল ও অপরূপ, এক ধারে দুর্ব্বল আর এক ধারে উচ্ছৃঙ্খল শক্তিমান।

'বাড়ী বদল'

বসন্ত-বেদনা

—শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

অল্প কয়েক ঘন্টার আড়া-আড়িতে জোয়ান দু'টি ভাই যখন মারা গেল, ধনঞ্জয় বৈরাগীর মনে হল, তার শরীর থেকে দু'টি অঙ্গ যেন কে খসিয়ে নিল! এর বেদনার তীব্রতায় যখন সে জ্ঞানশূন্য, তখন তার বুকের কলজেটাও গেল ছিঁড়ে, স্ত্রী-রূপসীও শেষ-নিশ্বাস ফেল্‌ল! এ ত মরণ নয়, এ যে ভোজবাজী! দুঃখের চেয়ে আশ্চর্য্যটাই বেশী মনে লাগে।

গরীব দুঃখীর প্রতি দেবতার যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান—স্বাস্থ্য, তা এই পরিবারের সকলের শরীর এবং মনে অটুট ছিল। দুঃখ-দৈন্য হয় ত ছিল অনেক; কিন্তু শোক?—সে ত জানা ছিল না! কি বিষাক্ত তার দংশন, কি ভীষণ তার জ্বালা!

কলে যারা কাজ করে, মাহিনা পাবার দিন তাদের ঘরে সাধারণত যেন পর্ব্ব লেগে যায়। সমস্ত মাসের কড়া-কড়ি, অর্দ্ধাশন এবং পরিশ্রম, ঐ একটি দিনের পান-ভোজন এবং আমোদ-আহ্লাদের ভিতর দিয়ে যেন সার্থক ক'রে তুল্‌তে চায় তারা। একটি দিনের আমীর-ই কর্‌তে গিয়ে সমস্ত মাসটি যে তাদের ফকীর-ই গ্রহণ কর্‌তে হয়, তাতে তাদের অসন্তোষ নেই।

এমনি একটি মাহিনা-পাওয়ার দিন রাত্রে, প্রচলিত প্রথা অনুসারে ধনঞ্জয়ের ঘরে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনটা কিছু জোয়াদা-ই হয়েছিল এবং এই জোয়াদা কথাটাই সবার মনে সেদিন গভীর তৃপ্তি ছেয়ে দিয়ে ছিল।

রাত তখন একটু গভীর হয়েছে সবাই হাসি মুখে শু'তে গেল। কিন্তু তিনটি প্রাণী শয্যা থেকে চীৎকার ক'রে জেগে উঠ্‌ল—মরণ বেদনা বুক নিয়ে, প্রায়, একই সঙ্গে . . . ভোর হ'তে তখনও অনেক দেরী!

হাতে পায়ে ধ'রে, সাধ্যমত অর্থ দিয়ে যে ডাক্তারকে ধনঞ্জয় ডেকে আন্‌ল তিনি বল্‌লেন—খাবারের সঙ্গে বিষ মিশেছে—

বিষ? কি সর্ব্বনাশ! কে মিশাল?—

ডাক্তার বল্‌লেন—যে পাত্রে রান্না হয়েছে, সম্ভবত সেইটেই খারাপ।

ধনঞ্জয় বল্‌ল— তা হ'লে আমরা সবাই ত খেয়েছি ; আমাদের হ'ল না কেন ?—

কিন্তু এই 'কেন'র উত্তর শোন্‌বার পূর্ব্বে ধনঞ্জয়ের ছোট ভাই ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত মানুষের মত বেঁকে-চুরে, দাঁতে দাঁতে চেপে বিকৃত কণ্ঠে ডাক্‌ল—দাদা একবার আয়—

তার কাছে গিয়ে তার বুকে হাত রাখ্‌তেই ধনঞ্জয়ের মেজ ভাইটি শ্বাস-রুদ্ধ মানুষের মত গুম্‌রে উঠ্‌ল—মা গো—'এবং ঠিক এই সঙ্গেই আর একটি অতি ক্ষীণ শব্দ ধনঞ্জয়ের কানে এল—ওগো—

ডাক্তার ওষুধ দিল কিন্তু সে ওষুধ কারো গলা দিয়ে নাম্‌ল না !

ধনঞ্জয়ের কেমন সব যেন গোল-মাল হয়ে গেল ! তিনটি মরণাহত মানুষকে নিয়ে সে যে কি করবে তার কিছুই যেন সে ভেবে পাচ্ছিল না !

ঘরের বাইরে, দাওয়ায়, ধনঞ্জয়ের মেয়েটি জেগে উঠে ঘরের ভিতরকার ঐ দৃশ্য দেখে আছাড়-পিছাড় খাচ্ছিল। তার চীৎকারে উঠানে পাড়ার লোক এসে জড়ো হ'ল, কিন্তু তাকে জিগ্‌গেস ক'রে কোনই কিনারা কেউ পেল না। দু'এক-জন ক'রে ঘরের ভিতরে এসে সবাই দেখ্‌ল—পাশা-পাশি তিনটি মানুষ শুয়ে আছে, আর তাদের মাথার কাছে ব'সে ধনঞ্জয় তাদের কপালে মুখে বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ! অন্য কিছুর প্রতিই তার খেয়াল নেই ; আর ধনঞ্জয়ের স্ত্রী, রূপসীর পায়ের ওপর মাথা চেপে একটা ছেলে পড়ে আছে, মাঝে মাঝে কান্নার বেগে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে ! তার দিকে চোখ পড়্‌তেই ধনঞ্জয়ের যেন চেতনা ফিরে এল। সে ভাঙা গলায় ডেকে বল্‌ল—গৌর, আমার কাছ্‌কে আয়—'

ছেলেটি চাপা গলায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল—মাগো-মা-মা—

মৃত মানুষদের জন্তে শোক প্রকাশ করবার কেউ আর ঘরে ছিল না, তবু পাড়ার মানুষের চোখের জল ঝর্‌ল। মানুষ মানুষের কাছ থেকে বিদায় নেয় কিন্তু বিদায় দেওয়া, সে কি মানুষের সাধ্যে আছে ? সহ্য তারা করে, সে শুধু উপায় নেই বলেই

* * * *

সন্ধ্যাবেলা শ্মশান থেকে ফিরে ধনঞ্জয় তার নিজের ঘরখানাকে যেন চিন্‌তেই পার্‌ল না। আতঙ্কে তার সর্ব্ব শরীর শিউরে উঠ্‌ল। ঐ নিস্তব্ধ, অন্ধকার ঘর এমন বীভৎস রূপ নিয়ে তার চোখে ফুটে উঠ্‌ল যে, সে আর এগিয়ে আস্‌তে পার্‌ল না, উঠানের এককোণে জড়-সড় হয়ে বসে পড়্‌ল।

প্রতিবেশিনী ক্ষ্যান্ত-পিসি, মানুষের দুঃখে শোকে আনন্দে কাজে কর্ম্মে সবার আগে এসে দাঁড়ায়। সবাই তাকে ধনঞ্জয়ের কাছে গিয়ে তাকে বোঝাতে বলাতে, পিসি বল্‌ল—দু'শ' মড়া নে' বসে একলা রাত জাগ্‌তে পারি বাপু, কিন্তুক অমন শুম্‌-খাওয়া লোক দেখ্‌লে আমার হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যায়—

কিন্তু সাহস না হ'লেই বা চলে কি ক'রে? ধনঞ্জয়ের কাছে এসে কান্নাভেজা ভাঙা গলা শক্ত ক'রে পিসি বল্‌ল—বলি ধনা, তোর আক্কেলটা কি? এক-রত্তি মেয়েটা সকাল থেকে ডা-পিট্টিতে নাগ্‌ল, এক ফোঁটা জল পেটে পড়্‌ল না, আর তুই হাতী-হেন মিন্‌ষে বসে রইলি?—তোর দোষে মরেচে ওরা?—ভগোমান কেড়ে নে'চে, তুই কি কর্‌বি?—এই ত আমি, এক কুড়ি বয়েসের সময় ভাতার-পুত্তের মাতা খেয়ে, পির্‌থিমির সব্বস্তি পেটে পুরে বসে আচি।—চোক নেই, দেখ্‌তে পাস্‌ নি? দোরে দোরে ভিক্কে মেগে খাই।—পেটের জ্বালা বড় জ্বালা রে ধনা, খেতে হবেই, আজ না হয় কাল। নে ওঠ, আমি রেঁদে রেকেচি, মেয়েটাকে খাওয়াবি চ'।

ধনঞ্জয় কি যেন বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ল কিন্তু পার্‌ল না, উঠ্‌তেও তার ইচ্ছে কর্‌ল না, সে যেমন ছিল তেম্‌নিই বসে রইল। পিসি বল্‌ল—তবু বসে রইলি? ওটাকেও শেষ না ক'রে ছাড়্‌বি নি নাকি?

ধনঞ্জয় এবার ধীরে ধীরে উঠে এসে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল। পাড়ার দু'একজন যারা উপস্থিত ছিল, তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌ল—যাক্‌, আর ভয় নেই, এবার সাম্‌লে নে'চে।

ধনঞ্জয় একবার চারিদিকে তাকিয়ে বল্‌ল—গৌরকে দেখ্‌চ নি যে পিসি, সে কোতায়?

পিসি বল্‌ল—কে জানে, হাড়্‌হাবাতে কোতা ম'স্তে গেচে! কোন্‌ যমের বাড়ী আর যাবে? পড়ে আচে কোতাও ঘাড়-মোড় গুঁজে; পেটের জ্বালা ধর্‌লেই উঠে আস্‌বে'খন্‌।—রাক্কোস! তিন বচোর বয়েসে বাপ-মা খেয়ে নতুন ক'রে মা-বাপ পেলে, তাও পেটে পুরে নিশ্চিন্দি হ'ল!

ধনঞ্জয় চোখ মুছে বল্‌ল—ওকে কড়া-কতা বলিস্‌ নি পিসি, রূপসী ওকে পেটের ছেলের মতন দেখ্‌ত, তার মনে কষ্ট হবে।

কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও পিসি সে-রাত্রে গৌরকে বার কর্‌তে পার্‌ল না। পরের দিনও ধনঞ্জয় অনেক খোঁজ করেও তার কোন উদ্দেশ পেল না! সবাই বল্‌ল, সে কোতাও চলে গেচে।

ধনঞ্জয় বুঝ্‌ল, রূপসীকে সে যে মা বলে ডাক্‌ত, তার মধ্যে কতখানি সত্য ছিল। মা নেই, তাই এই ঘরের সমস্তই তার চোখে শূন্য হয়ে গেছে; এ-ঘর তার ভাল লাগ্‌ল না।

পিসি বল্‌ল—নেমোখারাম—'

ধনঞ্জয় বল্‌ল—না-না; ও-কথা বলিস্ নি পিসি, আমি কি আর রূপ্‌সীর মত ওকে যত্ন ক'র্ত্তে পার্ত্তুম?

২

রাজার দেশে তখন সবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, তাই প্রজার দেশের যত পাটের কল, চটের কল, লোহা-লক্কড়ের কার্‌খানা সমস্ততেই গোলা বারুদ বন্দুকের কল-কব্‌জা প্রভৃতি মানুষ-মার্‌বার হাতিয়ার অবিশ্রান্ত ভাবে মানুষ গ'ড়ে চলেছে,—এই সব অস্ত্র-শস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে চালান্ যায়। মিস্ত্রিদের পরিশ্রমের শেষ নেই। কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছুটি নিয়ে দিন রাত্রি সকলে খেটে চলেছে। ধনঞ্জয়, কাশীপুরের গোলা-বারুদের কারখানার একজন প্রধান মিস্ত্রি। তার ভাই দু'টিও তার সঙ্গে কাজ করত। আজ সে একা।

সেদিন কাজ করতে করতে তার হাসি পেল। যে মানুষকে বাঁচাবার জন্মে তার আগ্রহের অন্ত ছিল না, সেই মানুষেরই ধ্বংসের জন্যে সে সাহায্য ক'রে চলেছে! ইচ্ছে হ'ল—এ-কাজ ছেড়ে দেয় কিন্তু দিল না, একান্ত নির্ব্বিকার ভাবেই সে দিনের পর দিন কাজ করতে লাগ্‌ল।

যুদ্ধ যারা করে, তারাও বোধ হয় এই সব মিস্ত্রিদের মতই নির্ব্বিকার। যে ছুরি তৈরী হয়ে তাদের হাতে এসেছে, সেটাকে শত্রুপক্ষের বুকে বসিয়ে দেওয়াই যেন তার কাজ। ছুরি মার্‌তে হবে, এইটুকুই তার ভাব্‌বার অধিকার আছে। ফলাফল, জয়-পরাজয়, মৃত্যু—সে ভাব্‌ছে আর একজন।

খাটতে খাটতে মিস্ত্রিদের হাত যখন অবশ হয়ে আসে, তাদের পরিশ্রান্ত দেহ-মনকে নাড়া দিয়ে ধনঞ্জয় বলে—ভাই সব, তোদের হাত ঢিলে চল্‌লে তাদের হাতও বন্ধ হয়ে যাবে—কলের একটা চাকা না ঘুর্‌লে সমস্ত কারখানাটাই থেমে যায়—তোদের হাতেই তাদের মরন-বাঁচন কাঠি—'

মিস্ত্রিরা আবার নবীন উৎসাহে কাজ আরম্ভ করে। ধনঞ্জয় ভাবে, যে গোলা হাতে ক'রে ছাড়্‌ছুম সাম্‌নের দিকে, তা ঘুরে এসে কখন কেমন ক'রে নিজেরই বুকে লাগে কে জানে? . . .

অসাবধানে কাজ করবার সময় একদিন একটা গোলা ফেটে একটা দেওয়ালের

সঙ্গে কয়েকজন মানুষ উড়ে গেল! সবাই দেখ্‌ল, মানুষের শক্তির চেয়ে মানুষের জিঘাংসা-বৃত্তিটা কত প্রবল! সহ-কর্ম্মীদের মৃত্যুতে দুঃখের চেয়ে তাদের আশ্চর্য্য লাগ্‌ল বেশী। আকাশের বজ্রকে যেন ঐটুকু একটা লোহার আবরণের মধ্যে তারা ধরে রেখেছিল!

খবরের কাগজে খবর আসে—আজ এত সহস্র শত্রু সৈন্য ধ্বংস হয়েছে . . . আজ এতগুলি শত্রুদের গ্রাম দখলে এসেছে . . . ধনঞ্জয় ভাবে—আমার গেছে চারটি বন্ধু, আমার গেছে একখানি ঘর।

শেষ রাত্রে ধনঞ্জয় ঘরে ফেরে, খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়, একটু বেলা হলে সে ওঠে, ঘরের কাজ-কর্ম্ম করে, সুরভিকে খাওয়ায়, নিজে খায় তার পর আবার বারোটার মধ্যে কাজে যায়।

ক্ষান্ত-পিসি, পাড়ার ছোট-বড় সবারই পিসি। সুরভিও তাকে পিসি বলে; ক্ষান্তরও তা'তে আপত্তি দেখা যায় না। ধনঞ্জয় কাজে বেরিয়ে গেল, সে সুরভিকে নিজের কাছে নিয়ে যায়, রাতে নিজের কাছেই রাখে, সকালে ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

পাড়ার লোক বলে—তুই একটা বে' কর্‌ মিস্তিরি; কারখানার খাটুনি খেটে ঘর-সংসার দেখা আর ক'দ্দিন পার্‌বি? মেয়েটারও অযত্ন হ'চ্চে। বলিস্‌ ত একটি ডাগর দেখে মেয়ে আমরা দেকি—'

ধনঞ্জয় হাসে।

মানুষ ছাড়ে না, বলে—বে' না করিস্‌ কাউকে রাখ্‌, সে সব দেখুক্‌ শুনুক—'

ধনঞ্জয় শান্তভাবে বলে—রূপ্‌সীর বিচেনাটা আর কেউ এসে দখোল কর্‌বে, এইটে ভেবেই গৌরটা আমায় ছেড়ে গেচে।

মানুষ বিরক্ত হয়, বলে—কোতাকার কে, কি ভাব্‌লে না ভাব্‌লে তাই ভেবে তুই সকাস্ত জলাঞ্জলি দিবি?—

ধনঞ্জয় উত্তর দেয় না, কাজের অছিলায় উঠে যায়।

এমনি ক'রেই দু'টি বছর কেটে গেল। সুরভি এখন দশ পেরিয়ে এগারোয় পা দিয়েছে। গরীবের ঘরে এরই মধ্যে অনেক কিছু শিখ্‌তে হয়।—'লোকের' সাম্‌নে 'সমিহ' ক'রে চলা-ফেরা, ঢেঁকিতে পা-দেওয়া, চাল-ডাল ঝাড়া, বাসন মাজা, ঘর নিকানো—ক্ষান্ত-পিসি এরই মধ্যে এমন কত কাজ তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছে। ভারী-ভারী জলভরা কলসী কেমন ক'রে দুলিয়ে-দুলিয়ে মাটি থেকে হাঁটুর ওপর এবং সেখান থেকে কোমরে এনে ধর্‌তে হয়, সুরভির তা অজানা নেই,

এমন কি বে' হলে শ্বশুড়-বাড়ীতে কেমন ক'রে থাকতে হয় তাও সুরভি জানে। দিনে দিনে তার শরীরে রূপসীর সমস্তই যেন ফুটে উঠ্ছিল।

কিন্তু ধনঞ্জয়ের কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। সে আজও তেম্নি ভাবে দিন কাটায়। খেয়ালের মধ্যে—গৌরের ছোট-বেলাকার দোলাই, পিরানগুলি কাঠের প্যাট্‌রা থেকে বার ক'রে রোদে দেওয়া, ধুলো ঝাড়া, আবার পাট ক'রে তুলে রাখা।

গৌর যখন তার কাছে ছিল, তখন সে যে ঠিক তাকে নিজের ছেলের মত ভালবাস্ত তা বলা যায় না। রূপসী যখন তাকে তার বাপের-বাড়ীর দেশ থেকে নিয়ে আসে তখন ধনঞ্জয় একটু আশ্চর্য্য এবং বিরক্তও হ'য়েছিল। কিন্তু রূপসী যখন বল্‌ল—ও 'মকরের' ছেলে, ত্রি-সংসারে ওর আর কেউ নেই, শুধু 'ভগোমান' ছাড়া—মানুষ হয়ে ঐ একরত্তি ছেলেকে শুধু তেনার দয়ার ওপরই ফেলে রেকে দিতে কি মানুষ পারে?—ও যদি আমারই হ'ত, তুই কি নিতিস্ না? ফেলে দিতিস্?—

ধনঞ্জয় আর আপত্তি করে নি। রূপসীর কোন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দিন সে কোন কাজ করে নি, পারে না। গৌরকে সে রাখ্‌ল।—কিন্তু ভালবাসল সেই দিন, যে দিন রূপসীর পায়ের ওপর পড়ে গৌর মা—মা ব'লে কাঁদ্‌ছিল, আর যে রূপসী গৌরের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাক্‌তে পারে নি, সে-ই যখন উত্তর দিল না, গৌরের প্রতি মমতায় ধনঞ্জয়ের বুক ভরে উঠেছিল।

তিন বছরের ছেলেটি কোলে ক'রে রূপসী যখন তাকে আদর কর্‌ত; চোখে কাজল পরাত, ধনঞ্জয়ের মন্দ লাগ্‌ত না। ধনঞ্জয়ের দুই ভাই প্রথম থেকেই ত ছেলেটাকে 'চট্‌কে-মট্‌কে' এমন তালিম ক'রে তুলেছিল যে, কাকাদের কাছে সে সব সময় থাক্‌ত। গৌরের প্রতি কাকাদের এই 'ন্যোওট' ভাবটা রূপসীর ভাল লাগ্‌ত। ও তার নিজের হ'লে ত কাকারা অমনি ক'রেই আদর কর্‌ত—?

গৌরের বয়স হল যখন আট, তখন সুরভি রূপসীর কোলে এল। অত ছোট মেয়েকে আদর ক'রে, কাকারা বা বাপ বেশী সুবিধা পেত না, কিন্তু গৌর দিব্যি উপুড় হয়ে, খুকীর ছোট-ছোট, রাঙা-রাঙা হাত পা নিয়ে তাতে চুমা দিয়ে, পেটে কাতুকুতু দিয়ে হাসিয়ে, ভয় দেখিয়ে কাঁদিয়ে, তাকে কোলে নিয়ে, এমন ক'রে খেলা জু'ড়ে দিত যে, রূপসীও অবাক হ'য়ে যেত!—ছেলেটা যেন কি! এত ভালবাস্‌তেও পারে!

ধনঞ্জয়ের সংসার দিনে দিনে যেন ভ'রে উঠ্‌ছিল। রূপসীর তাড়া খেয়ে

সে ছোট ভাই দু'টির বিয়ের জোগাড়ও আরম্ভ ক'রেছিল, মনের মত মেয়েও জুটে ছিল দু'টি। সামনের অঘ্রাণে বিয়ে হবে, এমন কথাও হয়ে ছিল, এমন সময় এই বিপত্তি! এক সঙ্গে তিন জনে তাকে ছেড়ে চলে গেল! আবার নতুন ক'রে সংসার পাতা! সে কি এই ভাঙা হাড়ে সইবে?—আজ যদি গৌরটাও থাকত...

ক্ষ্যান্ত এসে বল্‌ল—ওরে ধনা, তুই ত কোন দিকেই চোক দিস্‌ নি কোন দিন; সুর এখন ডাগরটি হয়েচে, বে' না দিলে আর ভাল দেখায় না, লোকে পাঁচ-কথা কইবে। এবার সুরর বে' দে', মেয়ে-জামাই নিজের কাচে থাক্‌।

সুরভির যে বিয়ে দিতে হবে, ধনঞ্জয় তা জান্‌ত, কিন্তু জামাইকে নিজের কাছে রাখার কথা তার ভাল লাগ্‌ল না, বল্‌ল—সুরকে এই শ্মশানে ঘর বাঁধ্‌তে দিই কি ক'রে পিসি? এ ভিটে আমার সাথেই শেষ হবে।

অনেক খোঁজ ক'রে ধনঞ্জয় কোন্নগরের প্রসন্ন জানার ছেলের সঙ্গে সুরভির বিয়ে দিল। ঘর বর দু'ই ভাল, নগদ-পয়সা, জমি-জমা কিছু আছে, মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। ছেলেটি ইলেকট্রিকের কাজ করে, সুরভি সুখেই থাকবে।

কিন্তু ভাঙন যখন একবার ধরে, তখন মানুষের শত চেষ্টাতেও কিছু হবার নয়। বাঁধ বাঁধা?—সে ত দৈবের সঙ্গে লড়াই। বছর না ঘুরতে সুরভি বিধবা হ'ল! ধনঞ্জয় যেন জীবন নিয়ে যমের সঙ্গে পাশা খেল্‌তে বসেছিল, একটির পর একটি ঘুঁটি তার গেছে, আজ সে নিজে কিস্তি-বন্দী!

সেই দিন জীবনে প্রথম ধনঞ্জয় একটা ভাঁটি-খানায় গিয়ে খুব খানিকটা ধেনো মদ খেয়ে, পথের ধারে আবর্জনার ওপর পড়ে সমস্তটা রাত কাটিয়ে দিল। তার পর থেকে এই মদের নেশা তাকে ছাড়তে চাইলেও সে ছাড়্‌ল না। আর কিছুই তার আশা করবার নেই, কিছু ভাববার নেই,—একটি মাত্র কাজ, মরণের পথ চেয়ে থাকা।

এক দিন ক্ষ্যান্তকে সে বল্‌ল—দেখ্‌ পিসি, সুর যদি আগে মরে, ভগোমানকে হাত জোড় ক'রে পেন্নাম করব। কিন্তুক আমি যদি আগে মরি, ভাব্‌ব, ভগোমান মুদ্দোফরাসেরও বেহদ্দো—

কিন্তু এবার তাদের অপেক্ষাটা যেন একটু বেশীই করতে হ'ল। সুরভি এগারো থেকে ষোলয় পা দিয়েছে। সে আর-এক ভাবনা। দিন-কাল যে মোটেই ভাল নয়!

৩

ধনঞ্জয়ের শরীর ক'দিন ভাল ছিল না, কাজেরও কামাই যাচ্ছিল। সেদিন সকালে ঘরের দাওয়ায় রোদে বসে, রূপসীর হাতে-লাগান ফলভরা একটা ডালিম গাছের দিকে সে তাকিয়ে ছিল, এমন সময় ভুবন মণ্ডল, একটি জীর্ণ-শীর্ণ লোককে নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—একে চিন্‌তে পাচ্চিস্‌ মিস্তিরি ?—

ধনঞ্জয়ের বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল—গৌর ! কিন্তু ওকি চেহারা তার !

গৌর মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। ধনঞ্জয় ছুটে তার কাছে এসে তার মুখখানা তুলে ধ'রে কি বল্‌তে চেষ্টা করল, পারল না।

ভুবন বল্‌ল—কলকেতায় সওদা কোত্তে গেছ্‌নু কাল,শ্যামবাজারের মোড়ে একটা ফুটপাতের ওপর ও বসে ভিক্ষে কর্‌ছেল। ওর কাচে গে' একটা পয়সা দিতে যেয়ে মুকখানা কেমন চেনা-চেনা নাগ্‌ল ! নাম জিগ্‌গেস কোত্তে বল্‌লে, গৌর। বাড়ী কোতায় জিগ্‌গেস কোত্তে চুপ ক'রে রইল।—চেহারা হয়েচে দেক্‌ না, যেন বেম্বুশো কাট ! কলকেতার শহরে ভিকিরীর ভিড় কি না বাড়ালেই নয় ? তোর ঘরের ভাত রইল পড়ে, তুই গেলি ভিক্ষে কোত্তে ! তাও কি পেলি দু' মুটো ? সে হ'ল বড় নোকের জায়গা, গরীব দুঃখী সেখেনে কি বাঁচে ? পথের ধারে পড়ে থাক্‌লেও কেউ ফিরে তাকায় না।

ধনঞ্জয়ের পায়ের কাছে বসে গৌর কেঁদে ফেল্‌ল। ধনঞ্জয় রাগের সুরে বল্‌ল—চ' হতোভাগা, তোকে চালের বাতায় টানিয়ে আচ্ছা ক'রে জল-বিচুটি দি, নৈলে তোর চৈতন্য হবে না—

কিন্তু কার্যাত দেখা গেল, সে তাকে এক রকম বুকে করেই দাওয়ায় এনে বসাল, তার পর সুরভিকে ডেকে বল্‌ল—সুর, যা ত মা চট ক'রে এক সরা মুড়ি আর গোটা কতক নারকোল নাড়ু নে' আয় ত—

সুরভি খাবার এনে গৌরের সাম্‌নে ধ'রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি ব্যাকুলভাবে জ্ঞানহীনের মত সে খেয়ে চলেছে ! এমন ক'রে মুখে গ্রাস তুলতে সে কা'কেও দেখে নি। চিবোবার দেরী যেন তার সইছিল না !—এই কি সেই গৌর ?—

গৌর ফিরেছে, এ কথা পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে গেল। দলে-দলে সবাই তাকে দেখে গেল। সেই সঙ্গে ক্ষান্ত-পিসি তার স্বাভাবিক বকুনির আড়াল দিয়ে যে কথা ব'লে গেল, তাতে গৌরের মনে চিরস্থায়ী গভীর একটা শ্রদ্ধা জন্ম হ'য়ে উঠ্‌ল।

পিসি বল্‌ল—চোকের মাতা খেয়েচিস্ উন্‌পাঁজুরে! দেক্ না এসে তোর মা'র ঘরটা একবার; ধনা ত ওটাকে যেন ঠাকুর-ঘর ক'রে তুলেচে। ও নিজে ত এই বাইরে পড়েই রাত কাটায়।—আমরা বলি, হাঁরে ধনা, এত ক'রে ও-ঘরটা সাজাচ্চিস্ কা'র তরে? ও বলে, আমার গৌর এসে থাকবে! ও আমার পোড়াকপাল! গৌর আস্‌বে! নেমোখারাম কি চোকে দেক্‌তে পায় যে, ধনার কল্‌জেটা ছিঁড়ে যাচ্চে তার ত'রে।—আমরা যেন তোর কেউ নই, সাত-পাড়ার ক্ষ্যান্তি-পিসি, কিন্তুক এটা ত তোর মা'র ঘর—কি ছুঃখুটাই দিলি পিচেশ! নিজেও একেবারে যমের দোরে যেয়ে দাঁড়িয়েচিস্। ম'রে থাক্‌তিস্ রাস্তায় পড়ে, আমরা জান্‌তুমও না—'

ধনঞ্জয় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

* * * *

নিয়মিত আহার এবং যত্ন পেয়ে অল্প দিনের মধ্যেই গৌর সুস্থ হয়ে উঠ্‌ল। বাড়ী ছেড়ে শব্দময় জনাকীর্ণ অপরিচিত শহরে এসে যেমন দিশাহারার মত পথের ধারে সে প্রথম দিন ব'সে ছিল, শেষ-দিনও ঠিক তেমনি অসহায় ভীত-চাহনি তার চোখে ছিল। শহরের সঙ্গে এতগুলি বৎসরের পরিচয় যেন তার পক্ষে একান্ত বেদনার। সেই পুরাতন দিনগুলির স্মৃতি তার মনে জেগে উঠে মাঝে মাঝে গভীর দুঃখে তার বুক ভরিয়ে তুল্‌ত। সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে ব্যাকুল ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তার মাকে খুঁজ্‌তে চেষ্টা করেছে,—কিন্তু কোথায় মা? একটি মানুষের চোখে সে স্নেহ-করুণার ছায়া সে দেখ্‌তে পায় নি!—যাকে না দেখে সে বাঁচে কি ক'রে? মা কি একটিমাত্রই থাকে এ পৃথিবীতে?

সে দোকানে কাজ নিল, অফিসের বেয়ারা হ'ল, দিন-মজুরী করল, কিন্তু এখানে কেবলই পুরুষ, নির্মম, কঠিন, পাষাণ, লোভী, সহানুভূতিশূন্য। বেশী দিন কোথাও থাক্‌তে পারে না। কিছুদিন কাজ করে, আবার ছেড়ে দেয়। শেষে কি মনে ক'রে গৃহস্থের সংসারে কাজ নিল—নারীর দেখা পেল। ব্যাকুল ভাবে সে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, প্রত্যেককে নীরবে চোখের চাওয়ায় প্রশ্ন করে—তুমি আমার মা?—

কিন্তু এ প্রশ্ন, এ চাহনি অন্য ভাবে নারী দেখে। কেউ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, কেউ এমনভাবে তার দিকে এগিয়ে আসে যে, ঘৃনায় সে নিজে মুখ ফিরিয়ে দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়ায়।

সংসারের কাজ ছেড়ে সে হ'ল দেব-মন্দিরের দ্বারের ভিখারী।— 'মাগো, গরীবকে কিছু খেতে দাও মা' বলে নারীর মুখের দিকে তাকায়, নারীর মনে করুণা জাগে, কেউ এক মুঠো চাল কেউ একটি পয়সা দেয়, কিন্তু ওতে কি তার ক্ষুধা মিটবে? সে অভুক্তই রইল। শেষে একদিন তার মনে হ'ল, মা নেই। সে সব ছেড়ে-ছুড়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। তারপর ভুবনের সঙ্গে তার দেখা। আজ দেখে মা তার ঘরে, মা তার সবার মধ্যে!

গভীর আনন্দে তার বুক ভ'রে উঠ্‌ল। সে ধনঞ্জয়কে বল্‌ল– আমি তোর সাথে কাজে বেরুব বাবা, আমি ত এখন বড় হইচি।—

ধনঞ্জয় তার বুকের বেদনা অনেকখানি যেন কম অনুভব কর্‌ল।

গৌর কাজে লেগে গেল।

ধনঞ্জয় গৌরকে দেখে আর ভাবে—গৌর আমার ঠিক তেম্‌নিটি আছে,—রূপ্‌সীর খাম-খেয়ালী পাগ্‌লা ছেলেটা! কিন্তু সুরভি ভাবে অন্য কথা। তার মনে হয়, এ সে-গৌর নয়; এ কোন নতুন মানুষ! সময় সময় তার কথা হাব-ভাব্‌ চাল-চলন সমস্তই তার অপরিচিত মনে হয়—কেমন যেন লজ্জা করে! ভাল লাগে, বড় আপনার মনে হয়, কিন্তু ভাই মনে হয় না। কিছুতেই ও-কথা সে ভাব্‌তে পারে না।

আর ঠিক এই কথাগুলিই গৌর অবাক হয়ে ভাবে। দশ বছর যে সুরভিকে নিয়ে কোলে পিঠে ক'রে খেলা ক'রে এসেছে, এ সে-সুরভি নয়! মাঝের এই ছটা বছরের মধ্যে এমন ক'রে সে বদ্‌লে গেছে যে, তাকে সুরভি না ভেবে অন্য যে-কেউ ভাব্‌তে তার আশ্চর্য্য লাগে না।

একদিন পুকুর-ঘাট থেকে স্নান ক'রে এসে উঠানে দাঁড়িয়ে মাথার ভিজে চুল গামছায় জড়িয়ে নিংড়ে ফেল্‌তে-ফেল্‌তে হঠাৎ সুরভির চোখ পড়্‌ল গৌরের ওপর। বিস্ময়ে মুগ্ধ দুটি চোখের দৃষ্টি তার সর্ব্বশরীরে গৌর বুলিয়ে নিচ্ছে! সুরভির সমস্ত শরীর যেন জ্বর-তপ্ত হয়ে উঠ্‌ল! তাড়াতাড়ি বসন সম্বৃত ক'রে নিয়ে সে ঘরের দিকে চ'লে গেল। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তার পা যেন বেধে যাচ্ছিল।

এর পর থেকে সুরভি বিশেষ সাবধানে গৌরের সঙ্গে ব্যবহার কর্‌ত। কখন আবার সমস্ত সাবধানতার বাঁধ ভেঙে ছোটবেলাকার সুরভির মত সে গৌরকে নিয়ে সহস্র প্রকারে তাকে বিরক্ত ক'রে অভিমান ক'রে ঝগড়া ক'রে ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে 'কিছু নয়' প্রতিপন্ন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ত। কিন্তু

গৌরের দৃষ্টি বলে দিত—ঠিক তার বিপরীত কথা। সুরভির বুকের কাঁপন বেড়ে চল্‌ল।

এই চিন্তার অভূতপূর্ব্ব বেদনা এবং আনন্দের মধ্যে ডুবে সে সময় সময় সব যেন ভুলে যেত। তার সুপ্ত-নারীত্ব আকুল তৃষ্ণা বুকে নিয়ে যেন জেগে উঠেছে!

কয়েক মাস এই চোখের চাহনি এবং মুখের হাসির অর্থ অনুসন্ধান ক'রে সুরভির কাট্‌ল। গৌরের প্রতিটি কথা এবং কাজ, চোর বা অপরাধীর মত সে লুকিয়ে আপনার মনে তন্ন-তন্ন ক'রে আলোচনা ক'রে দেখ্‌ত। হাস্‌ত, কাঁদ্‌ত, অভিমান কর্‌ত ঐ চিন্তাদের সঙ্গেই, লোক-চক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু গৌরের দৃষ্টি, সময় সময় এই নির্জ্জন গভীর, গুপ্ত স্থানে এসে প'ড়ে তাকে জানিয়ে দিত—আমিও জান্‌তে পেরেছি সুরভি তোর মনের কথা—

একদিন গৌর হঠাৎ সুরভিকে এসে বল্‌ল—সুর, আমার কতগুলো টেকা তোর কাচ্‌কে জমেচে বল্‌তে পারিস্‌?

সুরভি হিসাব ক'রে বল্‌ল—পেরায় আট-ন'কুড়ি হবে।

গৌর বল্‌ল—ও-থেকে পাঁচকুড়ি এখন দে।

কি কর্‌বি অত টেকা নে'?

এক ছড়া কোড়ি-হার গড়াতে দি'চি' কেষ্ট স্যাক্‌রার কাচ্‌কে।—তা পাঁচকুড়ি না দিস্‌ তিনকুড়ি এখন দে; ওর কাচ্‌কে ত আমার আরো অনেক কাজ হবে, একটু-একটু ক'রে শোদ্‌ দিলেও চল্‌বে।

সুরভি চকিতভাবে একবার গৌরের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝে নিতে চেষ্টা কর্‌ল, তার পর বল্‌ল—এত গয়না গড়াচ্ছিস্‌ কা'র তরে?

পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাট্‌তে-কাট্‌তে গৌর বল্‌ল—বে' কর্‌ব। এক জোড়া অনন্ত আর চুড়ি গড়াতেও দি'চি'—তোর হাতের মাপ্‌টা দে ত সুর, তোর মতই তার হাতের গড়ন, তোর হাতের মাপ তার ঠিক হবে।

এ-রহস্যের সন্ধান সুরভির কানে কানে তার মন ব'লে দিল। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। সমস্ত রক্ত যেন তার মুখে এসে জমা হ'ল। তবু আপনাকে সংযত ক'রে নিয়ে সহজ পরিহাসের সুরে তাকে বল্‌তে হ'ল—কার মেয়ে রে গৌর? তাদের ঘর কোতায়? আমায় বল্‌ তাকে একবার দেকে আসি—

গৌর হেসে বল্‌ল—হুঁ, তোকে বলি, আর তুই সব্বাইকে ব'লে বেড়া, তা আর নয়? তোর অত বাতা-বাথায় কাজ কি বাপু, তুই টেকাটা দে' দে না; ফুরিয়ে যায় ন্যাটা।

সুরভি এবার পরিপূর্ণভাবে চোখ তুলে গৌরের মুখের দিকে তাকাল কিন্তু গৌর মাথা নামিয়ে নিয়ে সেখান থেকে সরে গেল, যেন সে ভয়ানক এক অপরাধ করেছে।

সুরভির চোখ দিয়ে জল ঝর্‌ছিল। গৌরকে বল্‌ল,—টেকাটা নে'যা'—

গৌর বাইরে যেতে যেতে বল্‌ল—থাক্‌ আজ আর ও-দিকে যাব না; কাল দিস্‌।

৪

সে-দিন দুপুর বেলা ঘরের কাজ সেরে কয়েকটি পিতল এবং কাঁসার বাসন নিয়ে সুরভি চৌধুরীদের পুকুর-ঘাটের পৈঁটায় বসে ছাই দিয়ে সে-গুলি পরিষ্কার ক'রে মেজে ঘসে ধুয়ে একধারে সাজিয়ে রাখ্‌ছিল। মনে তার ভাবনার মেঘ যেন ভ'রে উঠেছে! কত রকমের ছবি তার চোখে ফুটে ওঠে, কত সুখ-স্বপ্নে মন ভেসে যায় কিন্তু কি জানি কেন গভীর নিরাশা তাকে যেন বারে-বারে শুষ্ক তৃষিত ক'রে তোলে!

কাজ সারা হ'লে নিজের শরীরের ওপর তার চোখ পড়্‌ল। হাতের ওপর হাত রেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে—নিটোল, রক্তাভ, শীতল। হাত দু'টি উত্তপ্ত গালে ছোঁয়াল। পা দু'টি জলে নামিয়ে দিয়ে তার পরিপুষ্ট গড়ন দেখে অবাক হ'য়ে নিজেই তাকিয়ে রইল। সাড়ীর আবরণে ঢাকা শরীরের মধ্যে কাণায়-কাণায় পূর্ণ যৌবনকে সে যেন দেখ্‌তে পে'ল! সুখের শিহরণ তার সর্ব্ব শরীরের ওপর দিয়ে ব'য়ে গেল! আজ তৃষ্ণা যেন সর্ব্ব শরীরে তার বাসা বেঁধেছে! তার শরীর যেন বারে-বারে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ছে—আমি অভুক্ত, আমি তৃষিত . . . এমন সময় বসন্ত-দূত তার কানে কানে বলে গেল —সুরভি, তোমার বয়স সতেরো . . .

কিন্তু সে-কথা শেষ না হতেই, মানুষের শাস্ত্র শুষ্ক কণ্ঠে তার আরএক কানে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল—সুরভি, তুমি বিধবা . . .

ঠিক এই সময় পুকুরের দক্ষিণ দিকে বোসেদের প্রাচীর-ঘেরা বাগান থেকে গানের শব্দ ভেসে তার কানে এল—

পাগরী ভাসায়ে জলে,
কাঁচলি খসায়ে ছলে,
কুতূহলে পড়ে ঢ'লে রাই!
হায় গো, পড়ে ঢলে বিনোদিনী রাই॥

সুরভি চম্‌কে উঠ্‌ল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, একটা বাতাবী-নেবুর গাছে চ'ড়ে একটা লোক বিশেষ মনযোগের সঙ্গে ফলগুলি দেখ্‌ছে। তবু বিরক্তিতে তার মন ভ'রে উঠ্‌ল।—আমি যেখুনি ঘাট্‌কে এসব, মুকপোড়া হয় নেবু গাচ, নয় পেয়ারা গাচ, নয় জাম গাচে থাক্‌বেই!

পাকা ফল পেড়ে সাবধানে মাটিতে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি গাইছে—

হেথা, কেলি-কদম্ব মূলে
কি জানি কি গুণে ভুলে
আপনা পাসরে শ্যামরায়!
হায় গো, গোপীবল্লভ শ্যাম রায়॥

সুরভি সঙ্গীতকারীর উদ্দেশে মনে মনে গালি বর্ষণ করল, কিন্তু গান থাম্‌ল না—

রাধা-তনু মধু-ভরা
যেন কনাই-এরই মনোহরা!
আহা, জগতে তুলনা দিতে নাই!
হায় গো, চ'লে পড়ে বিনোদিনী রাই॥

কিন্তু এবারকার গানের কথা শুনে রাগের মধ্যেও সুরভি হেসে ফেল্‌ল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে, বাসনগুলি হাতে নিয়ে উঠ্‌তে যাবে এমন সময় চৌধুরীদের নতুন-বৌ হাসি-মুখে পান চিবোতে-চিবোতে ঘাটের দরজা দিয়ে কয়েক ধাপ্‌ সিঁড়ির নীচে নেমে এসে, সুরভিকে বল্‌ল—কি লো সুরি!—আজ যে এত বেলা?—

সুরভি বল্‌ল—আর দিদি, রেঁধে বেড়ে, ঘর-সংসারের কাজ সেরে এই বাসন ক'খানা ধুতে এইছিনু তোমাদের ঘাটকে।

তা আজ কি রাঁধ্‌লি?

কি আর রাঁদ্‌ব দিদি, গরীব মানুষ, বেশী কিছু ক'ত্তে পারি নি—এই তোমার সে কেঁট্‌কি মাচের কাঁটা আর পেঁজ্‌কালি দে' বেশ ঝাল্‌ ঝরু-ঝর একটা চচ্চড়ি ক'রে ছিলুব; আর কুসো-চিংড়ির টক্‌।—খেতে ত আমরা তিনটি প্রাণী।

নিরমিষ্যি কিছু করিস্‌ নি? তুই খেলি কি দিয়ে?

নিরমিষ্যি আর কোতায় পাব দিদি? আমিও ঐ খেলুম।

ওমা! তুই না বিধবা?—তুই সব খাস্‌?—মাংস?—

না খেলে বাবা যে দুঃখু করে দিদিমণি।

মরণ আর কি! বাপের দুঃখুর জন্যে পরকাল দিবি?—

তা বাবাই ত আমার ইহকাল পরকাল সব--

তবে বল্ না কেন ও-সব ভালবাসিস্।—একাদশীর দিনও খাস্?

সুরভি স্বীকার কর্‌ল, সে এ-অপরাধও করে।

নতুন-বৌ বল্‌ল—তবে ফের্ বে' কর্ না কেন?

কথাটা সুরভির ভাল লাগ্‌ল না। বল্‌ল—বে' কি আর দু'বার হয় দিদিমণি? —তবে বেঁচে থাকতে ত হবে, তাই খাই।

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে নতুন-বৌ বল্‌ল—তোকে কে গান শোনাচ্ছিল রে সুরি?—

সুরভি বল্‌ল্—আমাকে শোনাতে যাবে কেন? ঐ বোসেদের ছোটবাবু গাইছেল।

জিভ দিয়ে ঠোঁট দু'টি রঙিয়ে নিয়ে নতুন-বৌ বল্‌ল—রবিবাবুর একটা কবিতায় প'ড়েছিলুম—রতি যখন নাইতে নেমেছে, মদন তাকে দেখ্‌ছিল।—তা বেশ কবিত্ব কর্‌ছিলি ত তোরা দু'জনে?

কে রবিবাবু, কে মদন, কে রতি, সুরভি তা যে ঠিক বুঝ্‌ল তা মনে হ'ল না কিন্তু সে হঠাৎ বেজায় চ'টে উঠে বল্‌ল—হেঁ, ও-সব ধম্ম কতা ও-মুকপোড়া জানে কি না? ও পাঁচালী গাইছেল। বাঁশবুকো খালি মেয়েমানুষের পেচোন্-পেচোন্ ঘুত্তে জানে। বাগ্‌দী আর ডোম-পাড়ায় আনা-গোনা। সে-দিন কি মারটাই না খেলে গণ্‌শা ধোপার হাতে! আবার বলে ভদ্দোর নোক!—নজ্জা কি আচে?—

নতুন-বৌ শহরের মেয়ে, সে কথা বল্‌তে জানে। বল্‌ল—ছোটবাবুর ওপর খুব চটেছিস্ ত? কিছু পাস্ নি বুঝি?

অবাক হ'য়ে সুরভি বল্‌ল—কি পাব?

নতুন-বৌ হেসে বল্‌ল—এই গৌরের কাছ থেকে যা পাস্।—কেষ্ট সোক্‌রা বল্‌ছিল সে-দিন মা'র কাছে, গৌর তোকে অনেক গয়না গড়িয়ে দিয়েছে।

এবার সুরভি হেসে ফেল্‌ল। বল্‌ল—আমার পোড়া কপাল! আমাকে দেবে কেন? ও ওর বো'র জন্তে গড়িয়ে রাকৃচে।

নতুন-বৌ বল্‌ল—তার মানেই তাই। আর ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ কত কর্‌বি? তুই বাপের বেশ রোজগারী মেয়ে তা সবাই জানে—'

এক নিমেষে সুরভির মুখ রক্তশূন্য হ'য়ে গেল। নতুন-বৌ-এর দিকে তাকিয়ে সে বল্‌ল—আমাদের ঘরে ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ থাক্‌বে কেন দিদি, সে আচে তোমাদের ঘরে, যত ভদ্দোর নোকের ঘরে। এই ত ঘোষাল-দিদি, কত

ধিঙ্গি, পিট্‌-পিটে ; ছোটনোকের ছাওয়া মাড়ায় না। এদিকে একাদশীর দিন একগলা গঙ্গায় দাঁড়িয়ে সুর্য্যি-পেন্নাম কর্‌বার সময় সন্দেশ মুকে পুরে দেয়। ডুব দে' জল খায়—আমরা ছোটনোক খাই ত খাই। সে সব্বাই জানে। বে' যদি কর্‌ব মন করি ত কর্‌ব। তা ব'লে চাটুয্যে-বো'র মত ভাসুরের সাথে বচোর বচোর কাশীতে তিথি ক'ত্তে যাবো না।

নতুন-বৌ কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই সে তর্‌-তর্‌ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে বাগানের ভিতর দিয়ে পথে নেমে সোজা ঘরের দিকে চ'লে গেল।

বাতাবী-নেবুর গাছ থেকে, পাঁচীলের ধারের পেয়ারা গাছে এসে বোসেদের ছোটবাবু নতুন-বৌ-এর দিকে তাকিয়ে তখন গাইছে—

কিবা ঢল-ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনী বহিয়া যায়!

কিন্তু আর কোন কথা শোন্‌বার পূর্ব্বে নতুন-বৌ তাড়াতাড়ি জিভ কেটে, একগলা ঘোম্‌টা টেনে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

৫

সন্ধ্যাবেলা সুরভি একলাটি চুপ্‌ ক'রে বসে ছিল। কিছু দিন থেকে আপনাকে নিয়ে চিন্তার তার যেন আর শেষ ছিল না। একটানা ভাবে সে ভাব্‌ত। কিন্তু সেই ভাবনাটা ঠিক একটা বিষয় নিয়েই নয় ; প্রত্যেকটির রূপও ছিল বিভিন্ন। কোনটা রঙিন, কোনটা নেশায় ভর্‌পুর, কোনটা মর্ম্মদাহকারী এবং প্রত্যেকটি চিন্তা অতৃপ্তি দিয়ে ভরা! সে শান্তি পেত না কা'রো মধ্যে।

এই অন্ধকারের মধ্যে মানুষের চোখের দৃষ্টি সে যেন সমস্ত শরীরে অনুভব কর্‌ছিল। সবাই তাকে অমন ক'রে দেখে কেন? তাদের সে-চাহনিতে অমন লোলুপ ভাব থাকে কেন? এবং সব চেয়ে বেশী সে আশ্চর্য্য হ'ত এই কথা মনে ক'রে যে, ও-গুলো তার ভাল লাগে!

তার এই সমস্ত চিন্তার মধ্যে গৌর যে কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে জানতে পারে নি! সে তাড়াতাড়ি উঠে বল্‌ল—চ' তোকে খেতে দি'।

গৌর বল্‌ল—সে হ'বে'খন। বেহারীর জ্বরটা খুব বেড়েচে। চার পাঁচ রাত ত পিসি তার কাচ্‌কে ছেল, আজ আবার তারও অসুক! পিসি বল্‌লে, আজ রাতটা তুই গে' যদি থাকিস্‌, পিসি একটু ঘুমিয়ে নেয়। পিসি সেতায়ই থাক্‌বে; আমিও যাব ভাব্‌চি।

ধনঞ্জয় ঘরে এলে তাকে এবং গৌরকে খাইয়ে নিজে খেয়ে ঘর পরিষ্কার ক'রে বাসন মেজে গৌরের সঙ্গে সুরভি যখন বিহারীর ঘরে এল তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। বিহারী জ্বরের ঘোরে কত কি বক্‌ছে। জাগরণ-শ্রান্ত ক্ষ্যান্ত-পিসি তার মাথার কাছে ব'সে ঘুমে ঢুলে পড়্‌ছে।

ক্ষ্যান্তকে ঘরের একপাশে শুইয়ে সুরভি রোগীর বিছানার পাশে জায়গা নিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই রোগী তার দিকে ফিরে ছেলেমানুষের মত বল্‌ল—একটু বাতাস কর্‌ না মা, বড্ডো গা জ্বল্‌চে যে—

সুরভি তাকে বাতাস কর্‌তে কর্‌তে মাথার ওপর তার ঠাণ্ডা হাতখানা রাখ্‌ল, রোগী কেমন যেন গভীর তৃপ্তিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চোখ বন্ধ করল।

সুরভির সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। এমন চাউনি তার বাবা ছাড়া তাকে ত আর কেউ দেয় নি! গৌরের দৃষ্টিও অমনি স্নিগ্ধ কিন্তু সেটা যেন প্রাণ-পোড়ানি একটা আবরণে ঢাকা থাকৃত সব সময়। তার বুক কেঁপে উঠ্‌ত। অশান্তি সে-চাহনিতে বাড়্‌ত—কম্‌ত না। আজ বিহারী প্রথম তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-সারে সুরভিকে তৃপ্তি দিল।

তিন জন মানুষের প্রাণপাত পরিশ্রমে ও সেবায় বিহারী প্রায় একমাস পরে সুস্থ হয়ে উঠ্‌ল। ক্ষ্যান্ত-পিসিকে বিহারী তার মনের কৃতজ্ঞতা জানাতে গেলে সে বল্‌ল—তোর যা বল্‌বার তা সব সুরুকে বল্‌। ওই ত তোকে বাঁচালে। জ্বরের ঘোরে তুই যে ওকে মা বলিছিলি, তার পর থেকে ওর চোকে কি আর ঘুম ছেল? মায়ের সেবা কল্‌লে বটে আমার সুরু!

বিহারী সুরভিকে কোন কথা বল্‌ল না বটে কিন্তু এমন মানুষ পাড়ায় রইল না, যার কাছে সে সুরভির স্নেহের কথা বল্‌ল না। এর ফল কিন্তু ভাল হ'ল না।

ভুবন মণ্ডলের মেয়ে শশীর সঙ্গে বিহারীর বিয়ের কথা পাকা-পাকি হয়ে ছিল। ভুবনের স্ত্রী গোলাপ, কিছুদিন থেকে সুরভির ওপর হাড়ে চটেছিল। গোলাপের প্রথমে ইচ্ছা ছিল, গৌরের সঙ্গে শশীর বিয়ে দেয়; কিন্তু এই গৌরকে সুরভি 'গিলে খেয়েচে' এবং সুরভির সম্বন্ধে পাড়ার লোকের পাঁচ-কতাও সে বিশ্বাস ক'রে—ঢলানি ছুঁড়ি সুরিইত যত নষ্টের মূল!

গোলাপের কাছে কথায় কথায় সুরভির প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ কর্‌তে গিয়ে বিহারী দেখ্‌ল 'ঘেন্নায়' তার মুখে কতকগুলি রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এবং গোলাপ বিশেষভাবে বিহারীকে জানিয়ে দিল, সুরি সর্ব্বনাশী শতেক-খোয়ারীর সাথে ভাব রাখ্‌লে এ বাড়ীতে তার বে' করা হবে না।

বিহারী বড় বিপদে পড়্‌ল। শশীকে তার পছন্দ হয়েছিল। তা ছাড়া মণ্ডলের ঘরের জামাই হ'লে তার সব দিক দিয়েই মঙ্গল। কিন্তু সুরভির অপমানও সে সইতে পারল না। সে-ও বেশ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল—তার পায়ে ধ'রে না 'সাধ্‌লে' শশীকে সে নেবে না।

মণ্ডলের অবস্থা ভাল ছিল; সে অন্যত্র মেয়ের সম্বন্ধ করতে লাগ্‌ল। বিহারী কেমন মন-মরা হয়ে গেল।

সুরভি সব দেখ্‌ল, শুন্‌ল, কি ভাবল। তার পর একদিন বিহারীকে ডেকে বল্‌ল—তুই বে' যে ভেঙ্গে দিলি?

বিহারী প্রথমটা কিছু মানতে চাইল না, শেষে সুরভির কথার ফেরে ধরা প'ড়ে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে, খামোকা একটা মানুষ তার মা'র নামে দুষবে, ছেলে হ'য়ে এটা কি ক'রে সে সহ্য করে?

সুরভির বুক কান্নায় কান্নায় ছাপিয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সে-ভাব চেপে, হেসে বল্‌ল—তুই জেতে কৈবোর্ত্ত বলিস্‌ নিজেকে কিন্তুক আমার মনে নেয় তুই চাষা খোপা। নইলে এমন বুদ্ধি!—কে তোর সাত-কুলের মা? রোগে ধ'রে ছেল তাই সেবা করেছি। সবাই ত করেছে।

বিহারী বল্‌ল—সে কথা ত হ'চ্ছে না; তুই আমার কে, সে আমি বুঝি। কিন্তুক ওরা বলে, বোসেদের ছোট কর্ত্তা—

সুরভি বল্‌ল—তার মুখে আগুন।

কথা কয়টি ব'লে সে তার ডান হাতের অনন্তটার দিকে তাকিয়ে মুখটিপে একটু হাস্‌ল। তার পর ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ দু'টি বিহারীর মুখের ওপর তুলে বল্‌ল—পেলে তুই ছাড়িস্‌?—

সুরভির শরীরে কোন অলঙ্কার সে দেখে নি কোন দিন। বিহারীর কেমন যেন সব গোলমাল হ'য়ে গেল। হঠাৎ তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে এল। জলন্ত চোখ দু'টি সুরভির মুখের ওপর তুলে বল্‌ল—সুরভি, তুই—

কিন্তু কথা তার শেষ হ'ল না। সুরভির মুখের কদর্য্য সে হাসির ইঙ্গিত সহ্য করতে না পেরে সে আস্তে আস্তে উঠান থেকে পথে বেরিয়ে গেল।

সুরভি তার অবসন্ন দেহটা টেনে এনে তার মা'র ঘরের মাটিতে লুটিয়ে দিল। সে-দিনকার মত বুকভাঙা কান্না সে জীবনে কোন দিন কাঁদে নি। ভাঙা-ভাঙা

গলায় বল্‌ল—আজ আমার একটা রাজার সম্পত্তির চেয়ে বড় জিনিস গেল মা, তুই তাকে দেকিস্‌—

* * * *

বিহারী নিজের থেকে সেধে গিয়ে গোলাপের কাছে ক্ষমা চাইল। তার একটা মস্ত ভুল হয়েছিল স্বীকার কর্‌ল। গোলাপের মন প্রফুল্ল হ'ল, এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শশীর সঙ্গে বিহারীর বিয়ে হয়ে গেল।

সুরভি তার মা'র ঘরে এসে সে-দিন সন্ধ্যাবেলা আবার কেঁদে বল্‌ল—মাগো, আমার বুকের রক্ত দে' শশীর পায়ে সদোবার আল্‌তা পরিয়ে দিলুম—ও অক্ষয় হোক।

সুরভির এ কান্না গৌর দেখ্‌ল, তার পর সে হ'য়ে গেল সেই ছোটবেলাকার গৌর! গাম্ভীর্য্য বলে তার মধ্যে আর কিছুই রইল না। সদানন্দ, প্রাণ-খোলা হাসি, সহস্র রকমের ছেলেমানুষি-বায়না। কথায়-কথায় অভিমান, রাগ—সুরি পোড়ারমুখী ম'লে সে বাঁচে।

কিন্তু এ-সব যে ফাঁকি তা সুরভি বোঝে, তার মন বেদনায় টন্‌-টন্‌ ক'রে ওঠে। চেষ্টা ক'রে গৌরের সুরের নকল ক'রে সে মাঝে মাঝে বলে—বাবা, গৌরের বে' দে, আমি আর পার্‌ব না ঘরের কাজ ক'ত্তে।

ধনঞ্জয় মেয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা ক'রে।

গৌর বলে—ফের্‌ যদি আমায় ঘাঁটাবি আমি চলে যাব—

* * * *

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে। বসন্ত-দূত সুরভির কানে কানে ব'লে গেল—আর একটা বছর কাট্‌ল সুরভি—তোমার বয়স আঠারো—

অন্ধকার

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

অন্ধকার ওগো অন্ধকার,
আজি ভাদ্র-অমানিশাযোগে
ক্ষুদ্র ঘরে বন্ধ করি' দ্বার
তোমারে করিব আবাহন—
তোমারে করিব নমস্কার।

২

অন্ধকার ওগো অন্ধকার!
জ্যোতিরূপ এ-বিশ্বের তুমি সুনিশ্চিত মহাভবিষ্যৎ।
অজ্ঞাত গহনে তব একদিন সমগ্র জগৎ
ছুটাইয়ে সপ্ত-রশ্মি-রথ,
অন্ধ বৎ
হারাইবে পথ।
বিচিত্র ভুবনভরা আলোক চিত্র করি একাকার
দিকে দিকে ব্যাপিবে তোমার
সর্ব্ব গ্রাসী স্থির কৃষ্ণ হাসি;
অন্ধকার ওগো অন্ধকার!

৩

তোমার নিঃশূন্য গর্ভ হ'তে,
রক্তালোক স্রোতে
ভরি' দিয়া ব্যোম,
যে দিন প্রথম

জন্ম মাত্র শিশু-বিশ্ব করিল ক্রন্দন
ওম্‌ ওম্‌ ওম্‌—
তুমি মাতা মূর্চ্ছাগতা,
কে করে সান্ত্বন !—
অদ্যাবধি তাই,
বিশ্ব হায়
কেঁদে কেঁদে ফিরে নিঃসহায়,
কেঁদে ফিরি আমরা সবাই।
সম্মুখে আলোকে খুঁজে যতটুকু পাই,
পিছনে ছায়ায়
অনন্ত ব্যাপিনী তব ঘুমন্ত মায়ায়
দ্বিগুণ হারাই।
জনমক্ষণের সেই অশান্ত ক্রন্দন
যুগে যুগে জীবে জীবে হ'ল চিরন্তন।
দিশা হারা বিদেশী সবাই
কেহ নাই
ঘুচাইতে ভ্রমণের ভ্রম ;
যত কাঁদি তত জপি আদি আলোকের ক্রন্দনের বীজ
ওম্‌ ওম্‌ ওম্‌ !

৪

অন্ধকার ওগো অন্ধকার !
আঁখির এ ক্ষুদ্র তরণীতে যে হয়েছে পার
আলো পারাবার,
শুধু তার কাছে ধরা দে'ছে তব অপরূপ
কালো রূপ।
সে দেখেছে—
আলো-রূপী শিবে করি' শব, চরণে চাপিয়া
কাল-রূপী মহাকালী, নৃত্যপরা নিখিল ব্যাপিয়া।

আঁখি মুদে সে বলেছে কেঁদে
'তিমিরে তিমিরহরা সর্ব্বনাশী তুমি মা আমার !'
ওগো অন্ধকার !
তাহার শ্রবণে,
জীবনের বাদল-পবনে
কেবল পশিছে আসি'
তমঃপুঞ্জ তমালের কুঞ্জ হ'তে
তোমারই সুদূর আহ্বানের বাঁশী ।
ঘন ঘোর ভাদরের রাতে
সুরের পশ্চাতে
তোমারি গহনে এসে
পেয়েছে সে
নব-ঘন শ্যাম শ্যামে তার ।
অন্ধকার ওগো অন্ধকার !

৫

অন্ধকার ওগো অন্ধকার !
বন্ধ ঘরে মুক্ত করি দ্বার
আজি এ অনিদ্র আঁখি তারা
হেরিছে অগণ্য তারা তোমার মাঝার ।
ওরা নাকি নহে ক্ষুদ্র ; সব সুবৃহৎ
তেজে ও বিদ্যুতে ওরা জনে জনে বিশাল জগৎ !
এত শক্তি, এত তেজ, আলো—
না জানি তাহারা,
তোমার সাহারা গাঁ'য়, বিন্দু বিন্দু বারি প্রায়
কোথায় মিলালো ?
শত সূর্য্য নাকি
তব মহারণ্য-পুরে ঘুরে ঘুরে হয়েছে জোনাকি !
তাই ভাবি আমি,—
আলোরে করেছে ক্ষুদ্র আলোকের স্বামী ;

তোমা' 'পরে তার
নাই কোন অধিকার !
আঁখি তারা হ'তে
গগন তারার পথে পথে,
চির প্রসারিত নিত্য অদ্ভূত তব বিরাট বিস্তার।
নিদ্রিতা জননী বক্ষে সুপ্তোত্থিত শিশু
খেলা করে ল'য়ে কণ্ঠহার।
কোন মহাশিশু ক্রীড়া সুখে
তব বুকে
ঘুরাইছে জ্যোতির্ম্মালা বিশ্ব শৃঙ্খলার ?
অন্ধকার মহা অন্ধকার !

৬

অন্ধকার ঘোর অন্ধকার !
অসীম মানসাকাশে মম
জনম জনম,
কোটি কোটি বৃহৎ আলার
জলে যে নক্ষত্ররাজি ক্ষুদ্র হয়ে বিস্মৃতির পার,
তারি 'পরে তব
দাও টানি কৃষ্ণ-যবনিকা,
নভুক নির্ব্বাণ—শেষ রশ্মি-শিখা।
দাও সমাপন-শান্তি, দাও সুপ্তি মহা-সান্ত্বনার।
শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধহীন
রসে ভরা তোমার পাথারে
হউক বিলীন
সত্তা মোর, মোর অহঙ্কার।
অন্ধকার, চির অন্ধকার !

বাংলা সাহিত্যের কথা

—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সাধারণত কবিতার দুটো ভাগ হ'তে পারে, একটা Lyric আর একটা narrative বা কাব্য। কারণ মানুষের অন্তরের অনুভূতি ও বাইরের ক্রিয়া-কলাপ নিয়েই কবিতা। প্রথমেই যে বাংলার Lyric-কবিতার বিষয়ে এত বল্‌লাম তার কারণ আমাদের সাহিত্যের এর চেয়ে সুন্দর সৃষ্টি আর কিছু হয় নি এবং ভাবের গভীরতা বা কমনীয়তার দিক দিয়ে বাংলার Lyric-কবিতা জগতের যে-কোন সাহিত্যের সঙ্গে একাসনভুক্ত হ'তে পারে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে কাব্য কখনও প্রাধান্য লাভ কর্‌তে পারে নি। তার মূলে বোধ হয় আমাদের সামাজিক জীবন। কারণ উপযুক্ত ক্ষেত্র ও উপকরণের অভাবে কাব্য এখানে বৃদ্ধি পায় নি। কাব্যের সৃষ্টি হয়,জাতির জীবনের বহু ঐশ্বর্য্যশালী শক্তির উৎস থেকে তার দ্বন্দ্ব ও আকাঙ্ক্ষার নিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বাঙালীর জীবনে এই অমর কাহিনী রচনা করবার ক্ষেত্র ছিল না। তাই আমাদের ভাষায় যখনি কোন কাব্য রচনা করা হয়েছে, তার মূল বিষয় নেওয়া হয়েছিল অপর কোন সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে। তাই বাংলা ভাষার দুটি প্রধান কাব্যই সংস্কৃত মহাকাব্য, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ। বাংলা ভাষায় রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাসের সমসাময়িক ছিলেন। Lyric ও কাব্য এক সময়েই সৃষ্ট হয়।

আমরা জানি কি আব-হাওয়ার মধ্যে আমাদের সাহিত্যে কাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল। রামায়ণ অনূদিত হয়েছিল, পাঠান রাজাদের ইচ্ছায় ও অনুগ্রহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম প্রচারে মুসলমান রাজাদেরই সাহায্য ও অনুগ্রহ সংশ্লিষ্ট। মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালেই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র ও মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার বলে পরিগণিত। ইউরোপে সাধারণ ভাষায় বাইবেলের অনুবাদের মত

রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা সংস্করণ জাতির ধর্ম্মজীবনে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

এ কথা ঠিকই যে, ভারতবর্ষের সাহিত্যে রামায়ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ romance এবং মহাভারত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য। কিন্তু বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ার ফলে মূলকাব্যের সৌন্দর্য্য ও ভাবের মহিমা বহুপরিমাণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার কারণ রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস কিংবা মহাভারত রচয়িতা কাশীদাস কেউই কোন বীরযুগে জন্মগ্রহণ করেন নি, তাই মূলকাব্যের মধ্যে অতীত বীরযুগের যে ঐশ্বর্য্য ও তেজ ছিল, বাংলাভাষায় তা ফুটে ওঠে নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বাঙালী কবিদ্বয়ের হাতে মূলকাব্যের নায়কগণ তাঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এমন ভাবে অনেক সময় হারিয়ে ফেলেছেন যে, তাঁদের চেনা কষ্টসাধ্য হয়। করুণভাবপ্রধান দিকটাই অন্য সব রসকে ছাপিয়ে উঠেছে। প্রমাণস্বরূপ কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে একটা ঘটনা নেওয়া যেতে পারে।

কৃত্তিবাসে আছে, লঙ্কার সমর-অবসানে রাবণ রণ-ক্ষেত্রে রোদন করছেন। অত্যাচার ও হিংসার মূর্ত্ত বিগ্রহ লঙ্কাধিরাজ রাবণকেও কৃত্তিবাস শেষে একজন পুরো বৈষ্ণব ক'রে দিয়েছেন। সাহিত্যের দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে এই দুই কাব্যের তত বেশী সার্থকতা ছিল না কিন্তু লোকশিক্ষার হিসাবে এই দুই কাব্য অতুলনীয় সাহায্য করে'ছিল। সাহিত্যহিসাবে আর যাই ত্রুটি থাক্ না কেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই দুখানি কাব্য আমাদের সাহিত্যে দুখানি সবচেয়ে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান্ বই। কাব্যদুটির কথাবস্তু এত চমৎকার যে, যে কোন অনুবাদে তার বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। আমাদের সাহিত্যে আমাদের মাটী থেকেও কতকগুলি কাব্য জন্মগ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক সংগ্রাম থেকেই সমস্ত জাতীয় কাব্যের সৃষ্টি। আমাদের সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। প্রচলিত লৌকিক কাহিনী নিয়ে এই সব কাব্যের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মানুমোদিত ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি ও লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপার নিয়ে এই সমস্ত কাব্যের উৎপত্তি।

এই সমস্ত কাহিনীর দুটী প্রধান ভাগ আছে—একটি চণ্ডীর পূজা আর একটি মনসা পূজা। চণ্ডী ও মনসা কালক্রমে অজ্ঞাতসারে হিন্দুর সর্ব্বদেবতা-মণ্ডলীর মধ্যে অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীর মূল বিষয় হচ্ছে, যে কোন লোক কোন বিশিষ্ট দেবদেবীকে না মানার দরুণ তাঁর কোপ দৃষ্টিতে পড়েছিল; তার ফলে, সেই লোকটিকে অশেষ রকম দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল।

যারা এই দেবদেবীদের কোপদৃষ্টিতে পড়ত তারা সাধারণত হয় কোন রাজকুমার নয় কোন সওদাগর। তারা এই সব লৌকিক দেবদেবীদের মানত না। তাদের ধর্ম্ম আরও গভীর ছিল। তারা শৈব ছিল এবং তারা তাদের ধর্ম্মের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার দরুণ অশেষ রকম দুঃখ দৈন্য সগৌরবে সহ্য করত। এই সমস্ত গল্পের মধ্যে যদিও গ্রীক্ ট্রাজেডীর সমস্ত উপকরণ দেখতে পাওয়া যায় তবুও বাংলার কবিদের হাতে এই সমস্ত বিষয় নিতান্ত একঘেয়ে ও নীরস বর্ণনামাত্র হয়ে উঠে ছিল। এই সমস্ত গল্পের সৃষ্টি হয়ে ছিল সাহিত্য-সৃজনের দিক দিয়ে নয়; লোকের মনে এই সমস্ত দেবদেবীর অলৌকিক ক্ষমতা ও তার নির্ম্মম প্রয়োগের কথা বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যে এই সব কাব্যের সৃষ্টি হয়। স্বভাবতই সেই জন্য এই সব কাব্য সাহিত্য-সৃষ্টির সহায়তা করতে পারে নি।

এই সমস্ত কাব্য বাংলার লোকসাহিত্যের অন্তর্গত এবং এদের বিশেষত্ব এই যে, এর কোথাও কোন কষ্ট কল্পনা নেই। যাহাই হ'ক আমাদের কাছে এই সমস্ত কাব্যের একটা বিশিষ্ট প্রয়োজনের দিক আছে। বাংলার অতীত যুগের জীবনের ও অন্তরের কথা এই সমস্ত কাব্যে নিখুঁতভাবে আঁকা আছে। এমন খোলাখুলি ও সঠিকভাবে এই সমস্ত গ্রাম্য কবিগণ তাঁদের সমসাময়িক জীবনের কথা গেয়ে গেছেন যা সকলের প্রিয় না হয়ে যায় না। এবং এই সমস্ত গল্পের মাঝে মাঝে একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্যে এমন সরস গোপন রসিকতা ও শ্লেষের স্পর্শ আছে যা কখনও অশ্লীলতা বা নোংরামির পরিচয় দেয় নি। এটা আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই জন্যে যে, ইংরাজ-বিজয়ের পূর্ব্বে আমাদের সাহিত্যে এড়িয়ে যাওয়া বা গোপন করাকে সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় বলে ধরা হত না। এই সমস্ত সহজ সুন্দর সুখভরা গ্রাম্য জীবনের ছবি দেখে আমরা আজ দীর্ঘশ্বাস ফেলি। এবং কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, আমাদের মধ্যে যিনি একটু বেশী কল্পনা-প্রবণ তিনি এই সমস্ত ছবি থেকে আপনার কল্পনার সাহায্যে মনে মনে এক অপূর্ব্ব পার্থিব স্বর্গের সৃষ্টি করেন। তাই আজ রাজনৈতিক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে রব উঠেছে—গ্রামে ফিরে চল। মন স্বভাবতই চায়, আধুনিক যুগের এই ঝঞ্ঝা-দাপট থেকে অন্ত কোথাও কোন চিরশান্ত নিরালা নীড়ের আশ্রয় নেয়। কিন্তু আমার মনে হয় আজ আমরা ফিরতে পারি না—সমাজের দিক দিয়েও নয়—মনের দিক দিয়েও নয়। আর আমাদের মত অল্প বয়সের জাতির কি এরি মধ্যে পেন্‌সন্ নেওয়া চলে? আমাদের অতীত জীবনের একটা বিষয় আমরা যেন না

ভুলি যে আমাদের, পূর্ব্বপুরুষেরা সমুদ্র-বাহী ছিলেন। এই কথা বারে বারে আমাদের কাব্যে পাই।

ধর্ম্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার দরুণ আমাদের সাহিত্য ধর্ম্মভাবাপন্ন ও সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এর একটা মস্ত বড় ব্যতিক্রম আছে—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর। দোষেগুণে অপূর্ব্ব ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সর্ব্বপ্রথমে আমাদের সাহিত্যে রক্তমাংসের সৃষ্টি করল। বিদ্যাসুন্দর প্রেমের কাহিনী, কাব্যে একখানি পুরো নভেল। বিদ্যাসুন্দরের প্রেমে স্বর্গীয়তা বা অলৌকিকতা কিছু নেই; সে প্রেম এই জগতের অতিবাস্তব বাসনা ও ক্ষুধার অভিব্যক্তি-তার গতি কখনও রঙ্গময় কখনও ভত ন্যায়ানুমোদিত নয়। ভারতচন্দ্রের কাছে প্রেম, জীবনের একটি অতি রঙ্গভরা অভিজ্ঞতা এবং ভারতচন্দ্র রঙ্গরসটুকুর সমস্ত স্বাদ আমাদের আস্বাদনের জন্য রেখে যেতে ভোলেন নি। মনে হয়, ভারতচন্দ্রের কবিতা নারীর নগ্ন-মূর্ত্তির মত। কোন দেবীর নয়, সে অপ্সরীর নগ্ন-মূর্ত্তি। ভারতচন্দ্র কিন্তু তার কাব্যে প্রথাগত পৌরাণিক আবরণ দিতে ভোলেন নি। কিন্তু এমন কৌশলে তিনি দেবদেবীদের অবতারণা করিয়েছেন যে, দেবতার লীলা সাহিত্যের স্থলে এখানে একটি পার্থিব ব্যাপার সংক্রান্ত নাটক হয়ে উঠেছে। স্বয়ং একজন রাজার পুত্র এবং পলাশীর রঙ্গভূমির বিশিষ্ট অভিনেতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি।

তিনি তাঁর সাহিত্যে তখনকার মুমূর্ষু আভিজাত্য সম্প্রদায়ের বাইরের চাকচিক্যময় জীবন ও তার সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ব্যাভিচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন।

কখন আনন্দময় কখনও তুচ্ছরঙ্গপ্রিয় কখন জ্ঞানী কখনও বা তিক্ত ব্যঙ্গমগ্ন কখন রসিক কখনও গম্ভীর ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর রক্তমাংসের মানুষটিকে এঁকেছেন। ভারতচন্দ্রের কবিতার মধ্যে কোথাও অস্পষ্ট বা রহস্যময় কিছু নেই—সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল।

ভারতচন্দ্রের যশ আজ মেঘে ঢাকা পড়েছে। ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে বিদ্যাসুন্দর গুরুপাক পদার্থ। বিদ্যাসুন্দরে আগাগোড়া একটা নৈতিক অবনতি ও নষ্টজীবনের ছায়া অতি সূক্ষ্ম ও স্পষ্টভাবে আছে—যেটা আজকালকার পাঠকের মনে একটা বিশ্রী অসোয়াস্তির সৃষ্টি করে। একথা আমি নিঃসংশয়ে স্বীকার করি যে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর fleur de mal হতে পারে কিন্তু তবু সে ফুল, অতুলনরূপ—পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে ভরা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এমন কোন বই নেই যা সাহিত্যহিসাবে বিদ্যাসুন্দরের সমকক্ষ হতে পারে। এক-

মাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোনও বাংলা কবি ভাষা ও ছন্দের উপর এমন অসামান্য অধিকার দাবী করতে পারেন নি। কাব্যের ব্যবহারিক কৌশলের দিক দিয়ে মনে হয়, এমন কি ফ্রান্সের নূতন কবিদের মধ্যে কেহ ভারতচন্দ্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারেন না। আমি জানি আজকাল technique বা ব্যবহার-কৌশলের প্রতি সাধারণের একটা বিতৃষ্ণা এসেছে। এবং তাঁরা ভাবেন যে, ওটা একটি নিষ্প্রয়োজন যন্ত্রবিশেষ। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আজকাল আমরা একাগ্র পরিশ্রম দিয়ে যে জিনিবটার সৃষ্টি হল, তার মূল্য দিই না। আমরা এমনি ছুটে চলেছি যে, চিরস্থায়ী কিছু তৈরী করবার বা ভাববার সময় বা অবসর আমাদের নেই।

ভারতচন্দ্রের ভাষার কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, তার তুলনায় স্বচ্ছসুন্দর অবাধ ভাষা সারা বাংলা সাহিত্যের মধ্যে আর কোথাও নেই। ভারতচন্দ্রের আগে আমরা জানতাম না যে, আমাদের ভাষাকে কতরকম ভাবে কতদিকে নোয়ান যায়। ভারতচন্দ্র এসে বাংলাকে ইচ্ছামত ছাঁচে ঢেলে এমন মূর্ত্তি দিয়ে গেলেন যা রূপে ও রেখায় ও সৌষ্ঠবে অপরূপ। ভাষাকারু হিসাবে ভারতচন্দ্র চিরদিন বাংলা সাহিত্যিকদের গুরু হয়ে থাকবেন। তিনি যে শুধু কবি ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন সেই সময়কার একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধীমান্ পুরুষ। তিনি এই পৃথিবী ও তার রীতিনীতির বিষয় তাঁর পূর্ব্ব কবিদের অপেক্ষা বেশী জানতেন। তিনি সেই সময়কার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার ও বিপ্লবের এমন তীব্র করুণ প্রতিচ্ছবি এঁকেছিলেন বা স্পষ্ট বলে দিয়েছিল যে, বাঙালীকে যদি বেঁচে থাকতে হয়, তা হলে নতুনের জন্য পুরাতনকে সরে দাঁড়াতেই হবে। অপূর্ব্ব সরল সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ভারতচন্দ্র শিবের আহ্বানে লিখেছিলেন,—

"নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।"

তাঁর প্রার্থনা ভগবান শুনেছিলেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই পলাশীর যুদ্ধ হয় এবং ইংরেজ বিজয়ী হয়ে বাংলায় পদার্পণ করে।

(ক্রমশ)

---

* শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

মৃত্যুঞ্জয়

—শ্রীযুবনাশ্ব।

খেঁদি-পিসীর পটলডাঙ্গার দল যখন পথে ভিক্ষে করতে বেরুত, তখন দলে একটিও পুরুষ থাকত না বটে, কিন্তু তাদের আস্তানার অন্ধকূপগুলির বাসিন্দা শুধু ঐ মেয়ে ক'টিই ছিল না। দু'একজনের ঘরছাড়া প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই দুটি একটি ক'রে পুরুষ থাকত। পথে বেরোন ছাড়াও তাদের অন্য রোজগার ছিল। রাত-বিরেতে পকেট্‌কাটা অথবা ছোটখাট চুরিচামারি করা—অবশ্য এ'সব আয়ের কথা প্রায়ই দলে ফাঁস করা হ'ত না। মোড়ল তাদের খেঁদি।

চঞ্চু থাকত ক্ষ্যান্তর ঘরে। বিশেষ যে কোন সম্পর্ক ছিল তা নয়। বছর চারেক আগে সে ক্ষ্যান্তর ভাই-পো পরিচয় দিয়ে এসে দলে ভর্ত্তি হয়। ক্ষ্যান্ত, খেঁদির ডান হাত। কাজেই, খেঁদির বিশেষ ইচ্ছে না থাকলেও ক্ষ্যান্তর অনুরোধ ঠেলতে না পেরে তাকে নিয়ে নেয়।

পটলডাঙ্গার দলের পুরুষগুলো নামকরা। ও-তল্লাটে অমন বদ্‌মাইস, হৃদয়-হীন জানোয়ার আর কোন দলেই ছিল না। দলের সেরা লোক ঐ চঞ্চু। সে না পারত এমন কাজই নেই। তার এই গুণের জন্তেই খেঁদি তার ওপর খুশী ছিল। তা না হলে এতদিন তাকে পথ দেখ্‌তে হত।

একবার সে বাইরে রাত কাটাতে গিয়ে ভিন্‌-দলের এক মেয়ের কান কেটে নিয়ে এসেছিল। মেয়েটা নাকি তার কি প্রস্তাবে আপত্তি করেছিল, তাই। আর একবার, পথে একটা ছোট ছেলের গলার হার ছিনিয়ে নিতে গিয়ে সে তার চোখ দুটো আঙুলে টিপে গেলে দিয়েছিল। পটলা স্বচক্ষে দেখে এসে খবর দেয়। সে-রাতে চঞ্চুর আদরের আর সীমা ছিল না।

এ হেন চঞ্চু যখন একদিন ময়লা, রোগা ও বোবা এক ছুঁড়ীকে নিয়ে এসে দলে ভর্ত্তি ক'রে নেবার সুপারিস্ কর্‌তে লাগ্‌ল, তখন সবাই অবাক হয়ে গেল। ছুঁড়ী দেখ্‌তেও এমন কিছু নয়, আর তার সাথে চঞ্চুর ভাবের কথাও আগে কিছু

জানা যায় নি। কোথায় যে তার দরদ ঠাহর কর্‌তে না পেরে সবাই আরো অস্থির হয়ে উঠ্‌ল।

ছুঁড়ী ত ভর্ত্তি হয়ে গেল। রোজ সবায়ের সাথে পথে বেরোয়। ক্যাম্পের ঘরখানা ছিল বড়, সেই ঘরেই থাকে। যতক্ষণ সে ঘরে থাকে, চক্ষু তার খবরদারী করে। অন্য কোনো পুরুষের সাথে মিশ্‌তে দেয় না। নিজেও সে কাজে বেরোন অনেক কমিয়ে দিলে।

হরিমতীর ঘরের রতন একদিন তাকে বল্‌ল—কোত্থেকে এক বেটীকে জুটিয়েচিস্ চক্ষু, তুই যে ব'য়ে গেলি!

চক্ষু তার কথায় কান না দিয়ে বল্‌ল,—আলাস্ নে রতনা, নিজের কাজ দেক্‌গে যা!

—বাবাঃ এযে কেউটে সাপ! বলি ফোঁস্ ক'রে ত এলি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বল দিকি! বলি বাঁধিয়ে বসেচিস্ কিছু? কিন্তু তুই ত সে পাত্তর নোস্! অমন কত বাঁধিয়েচিস্, কিন্তু নিজে ত কখনো এমন বেঁধে পড়িস্ নি!

চক্ষু তাকে ধমক দিয়ে বল্‌ল, চুপ র' হতভাগা! আমি যা করি না-করি তোর তাতে কি রে? ফের যদি যা-তা বল্‌বি অমন, তবে—, জানিস্ ত চক্ষুকে—

রতন বিলক্ষণই জান্‌ত, তাই আর না ঘাটিয়ে স'রে পড়ল।

সে স'রে পড়্‌ল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা এখেনেই চাপা পড়্‌ল না। চক্ষুর আর আগের মতো ফুর্ত্তি নেই। পথে বেরোন ত ছেড়েচেই, রাত-বিরেতে রোজগারও আর কর্‌তে চায় না। দিন-রাত ঘরে ব'সে থাকে। ছুঁড়ী ফিরে এলে তাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়, রাত বারোটা একটায় ফেরে।

এ সব খেঁদির চোখ এড়ায় নি। কিন্তু সে মুখ বুঁজেই ছিল। একদিন ব্যাপারটা এতদূর গড়াল যে, আর চুপ ক'রে থাকা চল্‌ল না।

সন্ধ্যেবেলা পটলা এসে বল্‌ল যে, সে রোজগারের মৎলবে ঘুর্‌ছিল। একটা মেয়ের হাতের বালার ওপর তার নজর ছিল। বালাটা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে সে তার একটা আঙুল মুচ্‌ড়ে ভেঙে দেয়। চক্ষু কোত্থেকে দেখ্‌তে পেয়ে এসে তাকে ঠাস্ ঠাস্ ক'রে দুটো চড় কসিয়ে দিয়েচে।

খবর শুনে দলের স্ত্রী-পুরুষ সবাই খাপ্পা হয়ে উঠ্‌ল। সকলে মিলে খেঁদিকে ধরে পড়্‌ল,—এর একটা বিহিত কিন্তু তোকে আজই কর্‌তে হবে পিসী! নইলে সব যে যেতে বসেচে! ড্যাক্‌রার কি যে হয়েচে কদিন থেকে—সাধুগিরী ফলাতে সুরু করেচে!

খেঁদিও কারো থেকে কম চটে নি। চক্ষু ফিরবা মাত্র সবাই তাকে নিয়ে পড়্‌ল।

—বল্ মুকপোড়া, তুই ভেবেচিস্ কি ? দলের নাম ডোবাতে বসেচিস্ যে !

চক্ষু কোনো জবাব দিল না।

একজন বল্‌ল,—আরে ও তো আর এমোন ছেল না ! ওই শুঁটকী মাগী এসেই ত ওকে বিগ্‌ড়েচে ! ওকে না তাড়ালে চক্ষুকে ফেরাতে পার্‌বি না—

খেঁদি বল্‌ল, সত্যি করে বল তুই, ও-মাগী তোর কে ? আমি কেন, দশজনে দেক্‌চে, ও-ই তোকে সার্‌চে ! ও কে তোর ?

চক্ষু মুখ তুলে দেখ্‌ল সেও এসেচে। সে তার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট ক'রে বল্‌ল,—ও, আমার বোন্।

দলের মধ্যে দু'জনা পট্ পট্ মরে গেলেও কেউ অত আশ্চর্য্য হত না। বোন্ ? খেঁদির দলে বোন্ ? মা-বোনের ছোঁয়াচ ত ঢের দিনই এড়িয়ে আসা গেচে !

খেঁদি বল্‌ল, কোতা পেলি তুই ওকে ?

চক্ষু বল্‌ল, রোজগারের মৎলবে শেয়ালদা গেছ্‌নু। এক কোণায় ও হাত পেতে দাঁড়িয়েছেল। এক ভদ্দর লোক ওর হাতে একটা পয়সা দিয়ে গেল। তাই দেকে, বেলেঘাটার মাণ্‌কে এসে সেটা তুলে নিয়ে ছুট্ মার্‌তে যেতেই ধাক্কা খেয়ে ও পড়ে গেল। কিন্তু তাজ্জব হলুম দেকে যে, একবারও কাৎরাল না ! এগিয়ে এনু। দেকি যে, দু'চোক দিয়ে জল পড়্‌চে কিন্তু মুকে রা'টি নেই ! স'ন্দ হল, বোবা নাকি ? শেষে দেক্‌নু তাই। সাথে ক'রে নে' ভিড় কেটে বেরিয়ে এনু। তা ওকি আসে ? চোকের দিকে তাকিয়ে বুঝ্‌নু আমায় বিশ্বেস কর্‌চে না। বলনু, আমায় সন্দ কোরো না, আমি তোমার ভাই। ও খানিক ভেবে আমার সাতে চলে এল। তা' পর এনে দলে ঢুকিয়ে দিইচি !

—কিন্তু তুই দিনকে দিন অমন ম্যাদামরা হয়ে যাচ্চিস্ ক্যানো ? রোজগারে বেরোস্ না যে আজকাল ?

—ভাল লাগে না।

রতন তাড়ি খেয়ে এসেছিল। হাতে তখনো গাঁজার কল্কে। একধার থেকে টেনে যাচ্ছিল। চক্ষুর জবাব শুনে কল্কে নামিয়ে বল্‌লে—কি বাবা সোনার চান্—ভালো লাগে না ? হুঁম্ ! বাবা, পিরীত বাঁধিয়েচ, সে কথা বল্‌লেই হয় ?—আচ্ছা সত্যি ক'রে বল্ দিকি, কি রস তুই পেলি ওর মধ্যে—

রতনের মুখের কথা মুখেই রইল। চক্ষু তড়াক্ ক'রে এক লাফ দিয়ে তার ঘাড়ের ওপর পড়ে দোহাত্তা কীলচড় মেরে যেতে লাগ্ল।—মুখ সাম্লে কথা কইতে জানিস্ নি শুয়ার—বল্‌বি আর—বল্‌বি—বলবি—

সবাই হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এসে ছাড়িয়ে দিল। কিন্তু রতনের আর বস্‌বার অবস্থা ছিল না। ভুঁয়ে পড়ে গড়াতে লাগ্ল।

খেঁদি অবাক্ হয়ে দেখ্‌ছিল। তারই চোখের ওপর চক্ষুর যে এতটা সাহস হবে তা সে ভাবে নি। হোক না চক্ষু দলের মধ্যে সব চেয়ে ফুখোড়—সব চেয়ে নামজাদা। তা বলে মোড়ল ত সে-ই।

খেঁদি বল্‌ল,—শোন্ চক্ষু, এই তোকে বল্‌চি—ও মাগীকে তোর ছাড়তে হবে। যেখান থেকে ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিস, কাল গে' সেই খেনে রেকে আস্‌বি, নইলে—

চক্ষু খেঁদির দিকে তাকাল।

—নইলে তোকেও দল ছাড়তে হবে। আগেকার মতো যদি হতে পারিস্, তবে ঢুকতে পাবি, নইলে আর নয়। বুঝেচিস?

চক্ষু চুপ ক'রে শুনল। হাঁ না কিছুই বল্‌ল না। খানিক পরে বোবা মেয়েটার হাত ধরে উঠে ঘরের দিকে চলে গেল।

যে যার নিজের নিজের গর্ত্তে ঢুকে পড়্ল।

ভোর রাতের আবছা আলোয় দুটি লোক খেঁদির আস্তানা থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়্ল।

সকালবেলা চক্ষুর সেই ঝুঁড়াটাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সেদিন গেল, তার পর দিন,—তা'পর অমন কত দিন চলে গেল, কিন্তু তাদের কোনো হদিস্ আর মিল্‌ল না।

রতন টিপ্‌নী কাট্‌ল,—বলেছিনু কি না। শক্ত একটা কিছু বেঁধেছে বাবা। নইলে চক্ষুর মতো গুণ্ডা ঘাঘী—

* * *

হৃদয়হীনের হৃদয়—মরুভূমির আকণ্ঠ তৃষ্ণার মধ্যে ছোট জলাশয়ের মতো। শুকিয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। যদি না যায়, তবে তৃষাতুরকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে।

বন্ধ্যা

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী।

সৌদামিনীর বিয়ে হ'য়ে গেল।

ক'নের বাড়ীতে সকলে বল্‌লে, 'দিব্যি সুপাত্তর, যেমন রূপ তেম্‌নি গুণ, এরি মধ্যে তিন-তিন্‌টে পাশ করেছে!

বরের বাড়ীতে ক'নেকে দেখে সবাই বল্‌লে যেন জগদ্ধাত্রী: একেবারে ঘর আলো ক'রে এলো!

*　　*　　*　　*

বছর দুই হ'য়ে গেছে।

সৌদামিনীর শ্বশুর-বাড়ীর কারো মনে স্বস্তি নেই। তার শাশুড়ী পদ্মাবতী, নাতি কোলে কর্‌বার জন্যে আকুল। কত মাদুলী, কত ওষুধ বৌকে পরালেন, খাওয়ালেন কিছুতেই কিছু হল না। 'নাতি স্বর্গে বাতি' কিন্তু তাঁর নাতিও হল না, অতএব স্বর্গের পথও অন্ধকার এই ভেবে তিনি বড় ক্ষুণ্ণ হলেন।

নিজের পাড়া-প্রতিবাসীর কাছে পদ্মাবতী ব'লে বেড়ালেন যে, বউ বন্ধ্যা।

বাইরে সৌদামিনী লজ্জিত হতে লাগ্‌ল। ওর দিকে সকলেই চেয়ে একটু হাসে। যার ছেলে আছে সে একটু গর্ব্ব ক'রে হেঁটে চলে।

*　　*　　*　　*

আবার একদিন ওবাড়ীতে সানাই বেজে উঠ্‌ল। পদ্মাবতী স্বর্গের বাতি আন্‌বেনই আনবেন, তাই ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছেন।

*　　*　　*　　*

সৌদামিনী আগেই বাপের বাড়ী চলে এসেছে। যিনি সৌদামিনীকে ছেলেবেলা কোলে ক'রে মানুষ করেছিলেন, তিনি আবার সৌদামিনীকে বুকে ক'রে বর্ষার মেঘের ন্যায় অঝোরে অশ্রু ফেল্‌লেন।

*　　*　　*　　*

হঠাৎ একদিন সৌদামিনীকে পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে বাড়ীর কাছেই এক পুকুরে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল।

ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বল্লেন, 'গর্ভলক্ষণ।'

• • • •

সৌদামিনী বন্ধ্যা ব'লে শ্বশুর-বাড়ী থেকে বিদায় নিয়েছিল, আর আজ বন্ধ্যা নয় ব'লে তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল।

এত দিন ধ'রে যে ভুল ক'রে এসেছি তাকে ত আর শোধ্‌রাবার সময় নেই, কিন্তু তাতে কি, যাবার আগে যে আমার ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ, এই ধরণীর পুষ্পগন্ধ ভাবের গৌরবের সন্ধান যে জেনেছি, তাকেই আমি ধন্য . . .

"মেঘের হাসি"

দুই দিন

—শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়।

সন্ধ্যার আঁধার কালো পাথরের মত পৃথিবীর বুকে চেপে বস্‌ল। একখণ্ড সাদা কুয়াসা সে কালিমার উপর মুহূর্ত্তের মধ্যে মরণের পাণ্ডুরতা লেপে দিল, মাথার উপর অর্দ্ধেকের বেশী চাঁদ একটু একটু ক'রে উঠে এল। মৃতের চোখ যেন কে জোর ক'রে মেলে দিয়েছে, তার সেই কলঙ্ককালিমাময় মুখের জ্যোতি-শূন্য ভাষাহীনতা পৃথিবীর বুকে এলিয়ে পড়্‌ল! ট্রেঞ্চের ভিতরে শীতে আড়ষ্ট সৈনিকেরা প্রকৃতির সেই মৌন উপেক্ষায় যেন মুশ্‌ড়ে গেল।

সবাই মাথার উপর দূরবীক্ষণ লাগিয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে—জার্ম্মান এরোপ্লেন হয় ত কোথায় ঘুরছে—টপ্‌ করে মাথার উপর বোমা ফেল্‌বে, একজন প্রৌঢ় সৈনিকও তা'দের মধ্যে ছিল।

একবার ভাবল কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই অধীনতার সহস্র নিগড়ে আপনাকে সে বেঁধে রেখেছে। কোথায় তার সুদূরের সেই ইংরেজ পল্লী আর কোথায় এই ফ্রান্সের রণক্ষেত্র! নূতনত্বের যে এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বসে থাক্‌তে দেয় না—সেই তাকে আত্মীয় স্বজনহীন এই দূরদেশে এনে ফেলেছে। বড় একটা কিছু কর্‌বার আশা সে কোনদিন করে নি।

অনেকদিন সে গোলাগুলির ভিতর দিয়ে এসেছে; কিন্তু আজ হঠাৎ এই প্রান্তরের পরিখায় মনটা যেন একটু শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ল। সমস্তদিন তা'রা এরই মধ্যে ছিল—সম্মুখে শত্রুরাও পরিখা আক্রমণ করবার অপেক্ষা কর্‌ছিল। সমস্তদিন সে বিরাট প্রান্তরের অসীম শূন্যতা তার মনে কিছু ভাব আনে নাই।

বাস্তবিক দিনের আলো যেখানে কল্পনার জাল বোনে—রাত্রির অন্ধকার সেখানে ভয়ের পাষাণ চাপায়। এর অর্থ কি—এ কি শুধু মানুষের একটা মিথ্যা দুর্ব্বলতা—আজন্মার্জ্জিত একটা ভুল সংস্কার, না অন্ধকারের অসীম শূন্যতা? এর মধ্যে আরো কিছু আছে। আলোকে মানুষ জানে, কিন্তু আঁধারকে সে জানে

না—বোঝে না। সৃষ্টির প্রথম হ'তে সে আঁধারকে বোঝ্‌বার চেষ্টা করছে—কিন্তু যুগের পর যুগ সে পরাজিত হয়ে এসেছে। জীবনের আলো যখন মৃত্যুর আঁধারে লুকিয়ে যায়, মানুষ তখন সবজানার চেয়ে অজানার মধ্যে গিয়ে পড়ে। রাত্রির আঁধার তার সেই পতনের চিরবর্ত্তমান সাক্ষী—তাই না তাকে এত ভয়।

হঠাৎ বাঁ-দিকে দপ্‌ করে একটা আলো জ্বলেই নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিরাট শব্দে ট্রেঞ্চের খানিকটা একেবারে বিধ্বস্ত হ'য়ে গেল। শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন আলো লক্ষ্য ক'রে বোমা ফেলেছে, এক বেচারী সৈনিক এই শীত রাত্রিতে সিগারেটের লোভ সামলাতে পারে নি। উপর্য্যুপরি গোলাবর্ষণ হতে লাগ্‌ল—মুহূর্ত্ত মধ্যে অর্ডার হ'ল ট্রেঞ্চ বদ্‌লাতে হ'বে।

নূতন ট্রেঞ্চে এসে সব একেবারে চুপ। কারো মুখে কথাটি নেই। পাশাপাশি অনেক প্রাণী—কিন্তু কারো সঙ্গে কারো আলাপ নেই! এই কুয়াশামাখা বীভৎসতার মাঝখানে এরূপভাবে থাকা কি বিশ্রী! এ যেন আশাহীন ভাষাহীনভাবে এ 'কিছু-না'র জন্য জেগে থাকা—এর শেষ নেই। উদ্দেশ্যহীনতার দারুণ অভিজ্ঞতা নীরব অপেক্ষাকে আরো অনেক দুর্বিসহ ক'রে তোলে!

কুয়াশা খুব একটু বেশী ক'রে চেপে বসল—জেনারেল ভাবলেন, প্রকৃতি তাঁর সহায়। একটু একটু জল পড়তে লাগল, তা' বৃষ্টির কি কুয়াশার বোঝা গেল না। জেনারেল সৈনিকদের ট্রেঞ্চের উপর আসতে হুকুম দিলেন। প্রৌঢ় সৈনিক সমস্ত দিনের মধ্যে এই মুক্তির আনন্দটুকুকে উপেক্ষা করতে পারলেন না, তা'র সঙ্গে আরো অনেকে বেরিয়ে এল।

একসঙ্গে পট্‌ পট্‌ ক'রে অনেকগুলি শব্দ হ'য়ে গেল। এপাশে ওপাশে অনেকগুলি লোক প'ড়ে গেল। কুয়াশাজাল ভেদ ক'রে দূর-আকাশের বুক আগুনের রঙে জ্বলে উঠেছে—উপর হতে নানারূপ লাল নীল আলোকের খেলা কুয়াশার বুকে মায়া রচনা করল। পিছন হতে শাঁ ক'রে দুই 'হাউইৎজার' থেকে গোলা উঠল কল্পলোকের সে মায়াকে গ্রাস করতে।

জেনারেল অর্ডার দিলেন—Lie in load—aim—fire… সহস্র রাইফ্‌ল এক-সঙ্গে গর্জ্জে উঠ্‌ল—সহস্র বেয়োনেট চন্দ্রালোকের সুধা পান ক'রে নেচে উঠ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জার্ম্মান সৈন্য কাছে এসে পড়ল। দুইদিকে অসংখ্য গোলা-গুলি বৃষ্টি হচ্ছিল। অবশেষে দু'-দল বড় বেশী কাছাকাছি হয়ে পড়ল—বেয়োনেট অনিবার্য্য। অকস্মাৎ যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চের কথা মনে হ'য়ে প্রৌঢ় সৈনিক শিউরে উঠ্‌ল। যুগের পর যুগ মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে চেয়েছে—কিন্তু পারে নি।

আর আজ কিনা সে নিজে মাথা পেতে সে পরাজয় স্বীকার কর্‌ছে—মানুষকে তার বাঁচ্‌বার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত ক'রে।

যুদ্ধ আরম্ভ হল। চারিদিকে মারামারি কাটাকাটি, উপরের এরোপ্লেন সমূহের বহু বর্ণ আলো চোখে মুখে মরণের জিঘাংসা জাগিয়ে তুল্‌ল। ব্যাণ্ডের শব্দ ধমনীর রক্ত নাচিয়ে দিল, বেয়োনেটের এক এক ঘায়ে এক একজন পড়্‌ছে! প্রৌঢ় সৈনিক দেখ্‌ল তার পাশের লোকটি প'ড়ে গেল, একটা বেয়োনেট তার নিজেরই বুকের উপর উঠেছে! এক মুহূর্ত্তে পাশ ফিরে সে চার্জ্জ করল, জার্ম্মান বুকে হাত দিয়ে প'ড়ে গেল। সৈনিক যুবক, চোখে মুখে দীপ্তি তখনও ভরা ভরা।

মাথার উপর নিশীথের চন্দ্র তখনও তেমনি ভাবে জ্বল্‌ছিল।

* * * *

ছোট্ট কুঠরির ছোট্ট জানালার সামনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্দ্দা ঝুল্‌ছিল। সমস্ত-গুলি তার্পিন তেলে ভেজা। ভিতরে দুইটি প্রাণী, বিছানায় একখানা পরিষ্কার চাদর। একটি যুবক, বয়স বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে হ'তে পারে। তারই পাশে বসে এক বৃদ্ধ, মাথায় তাঁ'র এক রাশ সাদা চুল।

সমস্ত ঘরে একটা বিশ্রী গাম্ভীর্য্য— টেবিলের উপর একটা মুখঢাকা "স্পিটুন", এক কোণে আর একখানা টেবিলের উপরে অনেক রকম ছোট-বড় ঔষধের শিশি। যুবক যক্ষ্মারোগে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে গেছে! কিছু আর তার শরীরে ছিল না। ব্যারামের বিরাট বুভুক্ষা দিনের পর দিন তাকে চুষে খেয়েছে।

আচ্ছা, কত দিন চল্‌বে আর মানুষের উপর রোগের এই বিপুল বিজয় অভিযান? মানুষ দিনের পর দিন বিরাট যন্ত্র আবিষ্কার করে—আকাশের বিদ্যুৎ, সাগরের জল নিয়ে খেলা করে—পৃথিবীর বুক যন্ত্রের ভারে পীড়িত হয়ে উঠে কিন্তু কি এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু মানুষকে অব্যবহার্য্য ক'রে তুলেছে। মানুষ কবে আর একে জয় কর্‌বে?

বৃদ্ধ, যুবকের পিতা। গত যুদ্ধে সে মরে নি, কিন্তু মরণের পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সে ছিল বয়সে প্রৌঢ়, উৎসাহে যুবক সৈনিক, আর এখন সে বয়সে প্রৌঢ়, মনে ও দেহে বৃদ্ধ। এক দৃষ্টে পুত্রের মুখের দিকে চেয়েছিল। যুবক চোখ বুজে রয়েছে, হঠাৎ ডেকে উঠল—'বাবা!'

কেন—?

আজকে নূতন বৎসরের প্রথম দিন, না?

হাঁ বাবা।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে যুবক ব'লে উঠ্‌ল, মা কোথায় ?

এই তার প্রথম ভুল কথা। তার মা অনেক দিন আগেই চ'লে গিয়েছিল। দুই ফোঁটা অশ্রু তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়্‌ল।

বাবা, আমি আবার ভাল হয়ে নূতন বছরের আমোদ করব।

হাঁ বাবা, তাই করো। এখন একটু সিরাপ খেয়ে নাও, কেমন ?

উত্তর নেই। একটি চাম্‌চে ক'রে লাল বর্ণ সিরাপ দেওয়া হল—কিছুতেই খাবে না···অনেক কষ্টে একটু গলায় ঢেলে দিল, দু তিন বার চেষ্টা ক'রে খেল।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ ব'লে উঠল—তোমরা কি আমায় বিশ্রাম দেবে না, বাবা ?

বিশ্রাম !—বিশ্রাম কোথায় ? এই বিরাট কর্ম্মকোলাহলময় জগতে বিশ্রাম কোথায় ? চলা—শুধু চলা, বালক যুবক হয়, যুবক বৃদ্ধ হয়, সৃষ্টি বিনাশের কোলে গড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে কি বিশ্রাম আছে ? উষার আলো দিনের সৃষ্টি করে, রাত্রির আঁধার সন্ধ্যার সমাধি দেয়; মানুষ মানুষকে সৃষ্টি করে, মৃত্যু তাকে কেড়ে নেয়—এ তো চিরকাল চল্‌ছে, এর বিশ্রাম নেই।

বৃদ্ধ পিতা কেঁদে ফেল্‌লে। দু'হাতে নিজের প্রিয়পুত্রকে জড়িয়ে ধরল। সে তিন চার বার কেশে ফেল্‌ল—লক্ষ জীবাণু ছড়িয়ে পড়্‌ল কিন্তু কে তাকে ভয় করে ?

যুবক হঠাৎ পা দু'খানি টেনে উঁচু করল, ভীষণ ভাবে তা' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। বৃদ্ধ হু হু ক'রে কেঁদে পুত্রকে আরো জোরে চেপে ধর্‌ল।

যুগের পর যুগ মানুষ জীবন-পথের মোড় হারিয়ে অবশ হয়ে পড়ে—একদিকে টানে তাকে মৃত্যু, অন্য দিকে মানুষ।

আমি বাঁচ্‌তে চাই বাবা।

বাঁচ্‌তে চাও তুমি ?—কে বাঁচ্‌তে না চায় ? কিন্তু মানুষ আজও মৃত্যুর হাতে খেলার পুতুল। একটা উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালহীন দুর্দান্তের মত সে তোমার বোকে উপস্থিত হয় তার বুভুক্ষা নিয়ে। তোমার বুকের রক্ত দিয়ে তা মেটাতে হবেই, এর উপায় নেই। মানুষ পারছে না, একেবারে পারছে না মৃত্যুর সাথে।

বৃদ্ধ পুত্রের বুকের উপর প'ড়ে রইল। বাইরে কুয়াশা। আকাশে চাঁদ উঠেছে কিন্তু চাঁদের সে আলো আঁধারের চেয়ে বীভৎস, তাতে বোঝ্‌বার, পাবার

কিছু নেই। আর তিন বৎসর আগে ফ্রান্সের সেই যুদ্ধক্ষেত্রের কথা মনে হ'ল। সেদিনও, এমনি মরণ তালে তালে নেচে আস্‌ছিল!

বুকের কাপড় সে সরিয়ে ফেল্‌ল, প্রত্যেকটি হাড় গোণা যায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসের দারুণ অভিনয় সেখানে চল্‌ছিল। হাত ধ'রে দেখ্‌ল নাড়ী ঘণ্টায় একশ' বিশ বার চল্‌ছে। সমস্ত শরীরে মরণের ছায়া, নিদ্রিত চোখদুটি দুটি কালো রেখার মত প'ড়ে রয়েছে! হাতের চামড়া বিবর্ণ, নাক একটু হেলে পড়েছে।

হঠাৎ সে চোখ খুলে চাইল—সে দৃষ্টি যেমন স্থির তেমনি উজ্জ্বল—বৃদ্ধ উৎফুল্ল হয়ে ডাক্‌ল—

বাবা—

নীরব।

বাবা—বাবা—আমার দিকে চাও।

কে কার দিকে চায়? সে দৃষ্টি বাবাকে দেখ্‌বার জন্ম নয়, সে চোখের ক্ষুধা মানুষের মুখ মেটাতে পারবে না। তা' মৃত্যুর অন্ধকারে অমৃত খুঁজ্‌ছে চিরকাল বেঁচে থাক্‌বার জন্যে।

বৃদ্ধের চোখের জলে যুবকের বুক ভিজে গেল। দুই হাতে সে তার মাথা নেড়ে দিল—শীর্ণ ঠোঁটের উপর চুমো খেল—কিন্তু সে চোখ দুটি স্থির।

বৃদ্ধ তার বুকের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল—জীবনের স্পন্দন থেমে গেছে—বিকট চীৎকারে সে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল।

বাইরে তখনও চন্দ্র বীভৎস ভাবে দুল্‌ছিল।

যতক্ষণ তুমি নারী, আমি পুরুষ, ততক্ষণ কেবলই হার-জিতের মোকদ্দমা!

"পাষাণ পুরী"

মানসী

—শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মন যখন ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখের ছবি আঁকিতে বসে তখন সেই কাল্পনিক সুখ-দুঃখের মাঝে কাহার যেন একখানি আসন আপনা হইতেই পাতা হইয়া থাকে :

যাহার চিন্তা মনকে সর্ব্বক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কাজে-অকাজে দিবা-রাত্রি যাহার মায়াময়ী মূর্ত্তি মনকে উদাস করিয়া ফেলে—সে কে জানি না।

বহুদিন-বিগত-স্বপ্নের স্মৃতির মত অস্পষ্ট এক রহস্যময়ী মূর্ত্তি মনের মাঝে অনুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়ায় কিন্তু যখনই মনকে একাগ্র করিয়া তাহাকে সমগ্ররূপে স্পষ্টভাবে পাইবার প্রয়াস পাই তখনই সে আরো অস্পষ্ট হইয়া যায়। সে এমনি।

আমি চাহি না বলিলেও তাহার ছবি মন হইতে একবারে মুছিয়া যায় না—আবার যখন তাহাকে সমগ্রভাবে—সম্পূর্ণরূপে পাইতে চাই—স্পষ্টভাবে ধরিতে যাই—তখন সে তীব্র বিদ্যুৎ সঞ্চালনের মত ক্ষণিকের জন্য মনকে আলোড়িত করিয়া পরক্ষণেই ছায়াময় দূরে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সর্ব্বপ্রথমে কবে এবং কিরূপে মন এক অপরিচিতার পরিকল্পনা করিয়াছিল জানি না, কিন্তু হঠাৎ একদিন নিজের প্রকৃত অবস্থা যখন প্রথম নিজের কাছে স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল তখন কি-জানি-কেন গভীর বিস্ময়ে ও ঔৎসুক্যে মন ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বিগত জন্মের স্মৃতির মত, সুখ-স্বপ্নের আভাষের মত, সুদূর প্রিয়জনের চিন্তার মত—কার এ ছবি সময়ে-অসময়ে মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে?—কে এ? আকুল-বিস্ময়ে কতবার নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছি—কে এ নারী? এই কৌতুকময়ী নারী-মূর্ত্তির আবেশময় চিন্তা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে অবাধ্য মনকে কতবার শাসন করিয়াছি—কতবার আপনাকে তিরস্কার করিয়াছি। কিন্তু বৃথা অনুশাসন। মন যে তখন নিজের অজ্ঞাতসারে কখন এই রহস্যময়ীর কাছে নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছে! সে কেন এমন?

দিন যায়। বিরক্তির পরিবর্ত্তে এক মধুময় মাদকতা সমগ্র মনকে প্রকাশ্যভাবে অভিভূত করিতে লাগিল। প্রথমে যাহাকে ভুলিতে চাহিতাম—যাহার চিন্তা আসিলে নিজেকে জোর করিয়া নানা কাজে ব্যাপৃত রাখিবার চেষ্টা করিতাম—ক্রমে সে-ই যেন আমার সমগ্র জীবনকে—আগের সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিস্ময়ের স্থান ভরিয়া গেল দুর্জ্জয় কৌতূহলে। ধ্যানের তন্ময়তাও যখন তাহার সমগ্র মূর্ত্তিকে মনের আশা পূরিয়া ধরিয়া দিতে পারিল না—তখন স্বপ্নময়ী কল্পনায় সে অভাব পূরণ হইয়া গেল। যাহা এতদিন নিজেকে অস্পষ্টভাবে অনুভব করাইত, ক্রমে কল্পনা তাহাকে গোলাপের রক্তরাগ, কুন্দের শুভ্রতা, চম্পকের উজ্জ্বলতা, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা, সূর্য্যকিরণের তীক্ষ্ণতা, কুসুমের কোমলতা লইয়া স্পষ্ট করিয়া তুলিল!

সে কেমন—কেমন করিয়া বলিব? তাহার কথা যতটুকু যেমনভাবে বলিতে চাই ততটুকু ঠিক্ তেমন করিয়া বলিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না যে!

আমার প্রতি পাদক্ষেপে এক রূপময়ী নারী আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। আমার প্রতি কার্য্যে, আমার প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে সে তরুণী আমার অনুসরণ করিয়া চলে। তাহার ছায়া আমার নয়নে আসিয়া পড়ে, নয়নের আগে সে কখনও পড়ে না।

গভীর তিমিরান্ধ নিশীথে অনুভব করিয়াছি—আমারই অন্তরবাসিনী সেই ছায়ানারী যেন রাত্রির সহিত মিশিয়া রহিয়াছে—আমারই চারিদিকে। অন্ধকার যেন তাহার স্পর্শ। চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত রজনীতে তাহাকে দেখিয়াছি—জ্যোৎস্নার মৃদু কম্পনে তরুবল্লরীর আলোছায়ায়, ছায়াময় দূরে। রাত্রিকে আহ্বান করিয়াছি, জ্যোৎস্নাকে শত প্রিয় নাম দিয়া ডাকিয়াছি—সুদূরকে সুমিত্র বলিয়াছি, তবু সে নারী তেমনি রহিল। সে এমনি।

* * *

মন কাঁদিয়া মরে। আর বলে, হে চিরনারী, তোমার ছায়া আমার নয়নে আসিয়া পড়ে তবু তুমি আস না; বাতাস তোমার গন্ধ বহিয়া আনে—কোন্ দিক হইতে আনে তাহা বলে না।

চিরকাল কি গো এমনি রহিবে?

রাত্রির অতল অন্ধকারের সায়র ঈষৎ দুলিয়া উঠে। পাগল মন দীপ-শিখার মত তবু দুরন্ত দূরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে—সে আসিবে! হয় ত সে আসিবে।

পান্থ-বীণা

—শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়।

১২

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একে ত' এই দীনতা প্রকাশের লজ্জায় বংশী এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর নিভার ঐ অভদ্র মন্তব্যটা তাহার কানে ঢুকিতেই একটা প্রচণ্ড আঘাত খাইয়া সে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল; কিন্তু যাহার প্রতি নজর পড়িবে ভাবিয়াছিল, তাহাকে সে দেখিতে পাইল না। পাইলে কি হইত বলা যায় না,—দেখিতে না পাইয়াই বরং সে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল।

বিভার কাছে চাহিবার দুর্ব্বুদ্ধি তাহার যেন না হইলেই ভাল হইত! পথ চলিতে চলিতে ঘৃণায় লজ্জায় বারে বারে শুধু সে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগিল। সে ত' তাহাকে টাকা আনিতে বলে নাই, বরং মুখ হইতে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই পুনরায় তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে নির্ব্বোধ মেয়েটা যে এমন করিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার দিদির কাছে চাহিয়া আনিবে,—না বুঝিয়া তাহার এই দৈন্য-প্রকটিত মূর্ত্তিখানি প্রকাশ্য রাজপথে টানিয়া বাহির করিয়া দিবে, তাহা সে প্রথমে ধারণাই করিতে পারে নাই। আপনার অতিরিক্ত বলিয়া ভিক্ষুক যদি দাতার অযাচিত দান পুনরায় দাতার হাতেই ফিরাইয়া দিতে চায়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে দাতার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইবার মত এমন কি যে অহঙ্কার লুকাইয়া থাকিতে পারে এই কথাটাই সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শীত প্রভাতের খর রৌদ্রদগ্ধ পথের উপর দিয়া চলিতে চলিতে মনে মনে বারংবার সে নিজেকে বুঝাইতে লাগিল যে, এমন করিয়া নিতান্ত পরিচিতের কাছে করুণার ভিখারী হইয়া কোন দিন দাঁড়াইতে নাই!

বাড়ী ফিরিয়া তাহাকে বাজার করিতে হইবে! দিদি হয় ত' তাহার পথ

চাহিয়া বসিয়া আছে, হয় ত' বেলা হইয়া গেল, এই ভাবিয়া পথের পাশে একটা বড়বাড়ীর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল, দশটা বাজিয়া গেছে; অথচ যে কাজের জন্য আজ সে এত প্রত্যুষে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল, সে কাজ তাহার এখনও অসমাপ্তই রহিয়াছে।—একখানা গীতা না কিনিয়া সে আজ বাড়ী ঢুকিবে কোন্ মুখে?

বংশী আবার ফিরিল। বৌবাজার হইতে এইবার সে একটা বাঁ-পাশের গলি ধরিয়া হ্যারিসন রোডের দিকে চলিতে লাগিল; তাহার এক সহপাঠী বন্ধু নাকি সেখানে একটা মনোহারী জিনিষের দোকান খুলিয়াছে,—তাহারই সন্ধানে। কিয়দ্দূর গিয়া একটা কাঠ-গোলার সুমুখে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। পথের পাশে দুইটা কাক একটা মরা ইঁদুর লইয়া টানাটানি করিতেছিল। দাঁড়াইয়া দেখিবার মত সেখানে কিছুই ছিল না; তথাপি সেইদিক পানে তাকাইয়া মিনিট কয়েক্ চুপ করিয়া বংশী তদবস্থায় সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। বন্ধুর সন্ধানে তাহার আর যাওয়া হইল না,— যে পথে আসিয়াছিল, আবার সেইপথে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে বংশী পুনরায় বাড়ীর দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার এই অদ্ভুত খেয়াল অন্যের নজরে পড়িলে কে কি ভাবিত কে জানে, কিন্তু তাহার নিজের মনে আজ ইহা এতটুকু রেখা-পাতও করিল না। আনমনে সে অনেকখানি পথ চলিয়া আসিয়াছিল, ফিরিবার সময় পথের দৈর্ঘ্য আর ফুরায় না দেখিয়া সে কথাটা একবার তাহার মনে হইল মাত্র। বৌবাজারের ফুটপাথে উঠিয়া বংশী একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু অনেকগুলা বড়বাড়ীর আড়ালে অমরেশের বাড়ীটা সেখান হইতে দেখিতে পাওয়া গেল না।

আপন মনে হাটিতে হাটিতে বংশী যখন তাহাদের গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল, সূর্য্যরশ্মির প্রখরতায় বেলা তখন অনেক বেশী হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইতেছিল। তামাকের দোকানের ঘড়িটা সেখান হইতে ভাল দেখা যাইতেছিল না, বংশী একটুখানি কাছে গিয়া দেখিল, এগারটা বাজিতে তখন মিনিট পাঁচেক বাকি। এখনও তাহাদের বাজার হয় নাই!...তাহার মনে হইল, সব ঘড়িগুলাই ভুল, নিশ্চয়ই এখনও এত বেলা কখনও হইতে পারে না। কিন্তু তাহাদের সে-গলির রাস্তায় বাহিরের ঘরে বা দোকানে আর কাহারও ঘড়ির বালাই ছিল না,—অগত্যা তাহাকে চোখ-কান বুজিয়াই তাহার ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। দরজায় খিল বন্ধ ছিল না, একখানা কবাট ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখিল, উঠানের রৌদ্রে একখানা আসনের উপর বাবা তাহার দরজার দিকে পিছন্

ফিরিয়া বসিয়া আছেন ; রান্না ঘর হইতে দিদির রান্নার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। চোর যেমন করিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করে, বংশীও তেমনি ভাবে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়াই দরজার খিলটা ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দিল। উঠান পার হইয়া সে বারান্দায় উঠিতে যাইবে এমন সময় পদশব্দে সচকিত হইয়াই বোধ করি যজ্ঞেশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বংশীকে দেখিতে পাইয়াই সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, এই যে! এই যে বাবা, এই স্থাখ্—এই শোন্ শ্রীভগবানের উক্তি! আমি যে ডাক্লাম, দু'বার,—দু'বার কেন, তিন বার ডাকলাম। এই স্থাখ্—এই শোন্—বলিয়া তিনি যে বস্তুটি হাত দিয়া তুলিয়া দেখাইলেন, এতক্ষণ সেদিকে বংশীর নজর পড়ে নাই। স্বপ্নে যাহা সত্য ছিল না, অকস্মাৎ ঘুম ভাঙিবামাত্র তাহাই যদি কেহ চোখের সুমুখে সত্যই ঘটিতে দেখে, তাহা হইলে বিস্ময়ে সহসা যেমন তাহার বাকরোধ হইয়া যায়, যজ্ঞেশ্বরের হাতে লালরঙের নূতন গীতাখানা দেখিয়া বংশীর অবস্থাও ঠিক তেমনি হইয়া গেল,—মুখ দিয়া তাহার একটি কথাও বাহির হইল না।

বইখানা খুলিয়া তাহার কি একটা শ্লোক যজ্ঞেশ্বর তাহাকে পড়িয়া শুনাইতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বংশীর সে চোয়ালবন্ধ রুক্ষ মলিন মুখখানির দিকে তাকাইয়া হঠাৎ তিনি সে কথা ভুলিয়া গিয়া আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া বকিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার এক সময় বলিয়া উঠিলেন, এখন এই নাওয়া-খাওয়ার সময়। তখন যে তোকে ডাকলাম, তুই এলি নে। এই বলিয়া তিনি একবার রান্না ঘরের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, হ্যাঁ মা গায়ত্রী, আমি তখন বংশীকে অনেক বার ডেকেছিলাম, নয়? গীতা হাতে নিয়ে আবার ভুল-টুল কিছু বলে ফেলছি নে ত'? দেখিস মা!

গায়ত্রী রান্না ঘর হইতে বংশীকে আসিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু এতক্ষণ কোন কথা বলিবার অবসর হয় নাই। এইবার উনান হইতে শব্দায়মান কড়াইটা মাটিতে নামাইয়া বাহিরের দিকে তাকাইতেই বংশীর সঙ্গে তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। বলিল, এই বুঝি তোমার তাড়াতাড়ি ফেরা হচ্ছে বংশী?

বংশী কোনও উত্তর দিল না। যজ্ঞেশ্বর বলিয়া উঠিলেন, ও হ্যাঁ, তুই ত' বাড়ী ছিলি নে। সেই সকালে বেরিয়ে ফিরে এই এত বেলায়—নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কি করিস তুই সারাদিন? রোদে রোদে টোঁ টোঁ করে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরে বেড়াচ্ছিস বুঝি? বি-এ পাশ করলি, ঘরে বসে, বরঞ্চ তাই বই-টইগুলো দ্যাখ,—তা নইলে খাবি কি? আমি বুড়ো হলুম, পেনসেনও কতদিন। তারপর

আমি মরে গেলে ? এই পর্য্যন্ত বলিয়াই গলার স্বর তাঁহার আবার নরম হইয়া আসিল, এবং তাঁহার অভ্যাস মত এই বার তিনি যে সব কথা বলিতে লাগিলেন তাহার একটি বর্ণও বুঝিতে পারা গেল না। মিনিট দুই পরে আবার তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। বলিলেন, না, না, এ-সব চলবে না বাপু, তার চেয়ে এখন থেকে হাকিম-টাকিমের পোষ্ট কোথাও খালি-টালি আছে কি না ভাখ,—এণ্ডারসন সায়েবের সুপারিশে হয় ত' লেগেও যেতে পারে! হ্যাঁ, সে-ই ভালো। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে চল্ না হয় এক দিন আমায় নিয়েই চ'তার কাছে। আমার কথা সে ঠিক শুনবে! তার আমি অনেক করেছি, অনেক কষ্ট সয়েছি আমি তার জন্যে;—সে সব কথা সে ভুলে নি।—কেন ভুলবে ? যতই হোক্ রাজার জাত— রাজার জাত তারা, ন্যায় ধর্ম্ম না থাকলে কি তারা থাকতো এত দিন ? ধ্বংস হয়ে যেতো,—কোন্ দিন ধ্বংস হয়ে যেতো।

রান্না ঘর হইতে গায়ত্রী বলিল, এত বেলায় এসে আবার অমন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন বংশী ? যা না, চান করে নে!

রত্নেশ্বর আর একবার সস্নেহ নয়নে বংশীর মুখের পানে তাকাইলেন। বলিলেন, হ্যাঁ যা, মুখখানা শুকিয়ে গেছে।—দেবে, দেবে, তার জন্যে ভাবিস্ নে, এণ্ডারসন্ দেবে, পেন্‌সেন আমি মরে গেলেও দিতে হবে। অন্তত তোদের এই দুটো ভাই-বোনের মুখ চেয়েও দেবে। অনাথকে দেখে' দয়া হবে না ? বলিস্ কি রে ক্ষ্যাপা ? এমনি সব আরও অনেক কথাই তিনি মনের আবেগে বলিয়া যাইতে লাগিলেন; তাহার পর হঠাৎ যেন কি ভাবিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু সেই দন্তহীন বৃদ্ধের এই অট্টহাসি শুনিয়া দূর হইতে মনে হইল, ঠিক যেন তিনি কাঁদিতেছেন। বংশী তখন তাহার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া জামা কাপড় ছাড়িতেছিল, সহসা এই চীৎকারে সচকিত হইয়া তাহার রুদ্ধ দুয়ারটা একবার ঈষৎ ফাঁক করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। দেখিল,— না, কিছুই হয় নাই, বাবা তখনও ঠিক্ তেমনি ভাবেই নত মুখে বসিয়া আছেন।

উঠানের পাশ দিয়া ধীরে-ধীরে বংশী তাহাদের কলঘরে গিয়া ঢুকিল। রান্নাঘর ও এই ঘর দুইটা পাশাপাশি,—মাঝখানে মাত্র একটা ভাঙা টিনের ব্যবধান। দোর বন্ধ করিয়া দিয়া চৌবাচ্চার কাছে বংশী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মাঝের সেই টিনের পর্দ্দাটার কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, গীতা কে এনে দিলে দিদি ?

এ ধার হইতেও তেমনি চাপা গলায় উত্তর আসিল, তুই ত' পারলি নে, তাই আমিই এনে' দিলাম।

বাজার ?

গরম কড়াই-এর উপর ছ্যাঁই করিয়া কিসের একটা শব্দ উঠিল। বংশীর প্রশ্ন গায়ত্রী শুনিতে পাইল না।

শীতে আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকাও যায় না! বংশী আর কোনও প্রশ্ন করিল না; হড়্ হড়্ করিয়া মাথায় জল ঢালিতে লাগিল।

স্নানান্তে সে উঠানের রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, খেয়েছেন ?

রত্নেশ্বর কোনও জবাব দিলেন না। গায়ত্রী তখন বারান্দার উপর তাঁহার ঠাঁই করিতেছিল। বলিল, না। বল্লুম দশটার সময়, কিন্তু উনি খেলেন না কিছুতেই।

রত্নেশ্বর এই বার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, এঁ্যা, দশটা ? হ্যাঁ দশটাই হবে। ডাক্তার বলেছিলেন, দশটার সময় খেতে। তা, হ্যাঁ,—দশটা কি বেজে গেছে মা ?

গায়ত্রী ঈষৎ হাসিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, না, দশটা এখনও বাজে নি—বারোটা বেজে গেছে।

রত্নেশ্বর সে কথা বোধ করি শুনিতে পাইলেন না।

বংশী তাহার ঘরের ভিতর গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল। মেঝের উপর আসন ও জলের গ্লাসটা নামাইয়া দিয়া গায়ত্রী হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্বাস হলো না তোর ?

বংশী বলিল, কি ?

—বাবার শীতবস্ত্র আমি নিজে গিয়ে কিনে' এনে' দিলাম ?

বংশীর চুল আঁচড়ানো তখন শেষ হইয়াছিল, তথাপি জানালাটার কাছে আরও একটুখানি সরিয়া গিয়া চুলের উপর চিরুণীটা অনর্থক খুব জোরে জোরে টানিতে টানিতে উত্তর দিল, হ্যাঁ, জানি—জানি,—

গায়ত্রী বলিল, কি জানিস ? কই, বল্ দেখি বাজার আজ কেমন করে হলো ?

হ্যাঁ হ্যাঁ সব জানি। বলিয়া একটু খানি থামিয়াই বংশী আবার বলিতে লাগিল, কিন্তু এ তোর ভারি অন্যায় দিদি। অমরেশকে দিয়ে কেন এ সব করানো ? কি দরকার ছিল ? আজ না হয় একটুখানি দেরীই হতো . . .

গায়ত্রী বলিল, তোর মেজাজ আজ ভারি গরম দেখ্‌ছি! কি হয়েছে কি?

বংশী বলিল, হবে আবার কি?

গায়ত্রী তেমনি ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়াই উত্তর দিল, বারণ যদি কেউ আমার না শোনে ত' আমি কি করব? বল্‌লাম, বাজার বংশী এসেই করবে, তা সে কথা সে শুন্‌লে না। এমন্ কি, পয়সা দেবার জন্যে দরজা পর্য্যন্ত ছুটে গেলাম কিন্তু সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে মোটরে চ'ড়ে বস্‌লো।

বংশী কহিল, তা হ'লে পয়সাও সে নিজেই দিয়েছে?—না, না, এমন ক'রে আমাদের আর বেঁচে থাকায় কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আমাদের একদিন ম'রে যাওয়াই ভালো।

কথাটা বলিয়াই নীচু জানালার উপর একটা পা রাখিয়া বংশী মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গায়ত্রী আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি তাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, বালাই! ছি! এ সব আবার কি অলক্ষণে কথা রে তোর?—তোর ঘরে যদি কেউ আসে, আমি হাত আড়াল দিয়ে তাকে কতক্ষণ আটকে রাখি বল্?

হাত আড়াল দিতে হবে না, তুই যা বাবাকে খেতে দিগে যা। বলিয়া বংশী সেখান হইতে সরিয়া গিয়া দেওয়ালের একটা তাকের উপর আর্শী চিরুণীটা তুলিয়া রাখিল।

বংশী মনের ভাব সহসা এরূপ রুক্ষ হইয়া উঠিবার কারণটা গায়ত্রী ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না; তদবস্থায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, বাবা বকেছে বলে' রাগ হয়েছে, বুঝেছি। কিন্তু এই ভরা দুপুরে রাগ-অভিমান ছেড়ে এখন চুপটি করে বোস্, আমি ভাত আনি।

বলিয়াই গায়ত্রী বাহির হইয়া গেল।

অসুখের পর হইতে রত্নেশ্বর দিনে-দিনে অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং অথর্ব্ব হইয়া পড়িতেছিলেন। লাঠি কিংবা লোকের সাহায্য ব্যতীত নড়িয়া বসিবার সামর্থ্য ছিল না।

ভাতের থালা ধরিয়া দিয়া গায়ত্রী কাছে আসিয়া তাহার ডান-হাতখানি ধরিয়া বলিল, ওঠো বাবা, ভাত দিয়েছি।

কাঁপিতে কাঁপিতে কোন প্রকারে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধরিয়া ধরিয়া গায়ত্রী তাঁহাকে তাঁহার আসনের কাছে লইয়া আসিল। বলিল, এদিকে তোমার ত' দেখি সোর-ঘোর কিছু থাকে না বাবা, কিন্তু বংশী যে বেরিয়ে গেছে এখনও

খায় নি সেটি বেশ মনে আছে। এক দিন না হয় সে দেরিতেই খেতো! কেন তুমি তাকে বকৃতে গেলে এই দুপুর বেলা?

রত্নেশ্বর অর্থহীন দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, বকলাম—হ্যাঁ, তাকে বকলাম, নয়? কি যেন সব বললাম! কিন্তু,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘুরে বেড়াচ্ছে যে দিন রাত টো টো করে'—এই রৌদ্রে। ওর মুখখানা দেখেছিলি আজ? ও কি আর লুকোবার জো আছে রে পাগ্‌লী? গেল যে,—গেল যে শরীরটা ভেঙে এই কাঁচা বয়সে।

যাবে না? রেখেছে যে তোমার সেই এণ্ডারসন্ ওর জন্যে একটা টাকার সিন্দুক, তাই বসে' বসে' খাবে—বলিতে বলিতে গায়ত্রী পুনরায় রান্না ঘরে গিয়া মিনিট কয়েকের মধ্যেই বংশীর ভাতের থালা লইয়া তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল। আপন মনে তখনও সে কি যেন বলিতেছিল; বোধ করি তাহার সমস্ত আক্রোশ গিয়া পড়িয়াছিল সেই এণ্ডারসন্-সাহেবের উপরেই। ভাতের থালাটা নামাইয়া দিয়া দেখিল, বংশী তাহার ভাঙা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পেন্সিল দিয়া এক টুকরা সাদা কাগজে আপন মনেই হিজি-বিজি কাটিতেছে। গায়ত্রী বলিল, এনে দিতে পারিস তোর সেই এণ্ডারসন্-সাহেবকে আমার কাছে? আঁস্-বঁটি দিয়ে তার নাক-কান কেটে আমি ঝাঁটা মেরে তাকে বিদেয় করি এ দেশ থেকে। মানুষ খুন করবার আর জায়গা পায় নি!—আয়, বোস্ এসে'।

বংশীর হাতের পেন্সিলটা তখন আরও জোরে জোরে চলিতেছিল। সে দিকে মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, খাব না।

গায়ত্রী বলিয়া উঠিল, খাব আর রাগাস্ নে বংশী, এখনও মুখে আমি জল দিই নি। আমার এঁটো হাত, নইলে তোকে আমি চড়্ চড়্ করে টেনে এনে বসাতাম।

হাতের পেন্সিলটা কাগজের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে বংশী বলিল, আচ্ছা, বস্‌ছি। কিন্তু তুই বল্—অমরেশ এলে' তার সুমুখে আর কখনও বেরোবি নে, তার সঙ্গে কথা বল্‌বি নে।

অর্থ তাহার যাহাই হউক, কথাটা শুনিবামাত্র সে তরুণী বিধবার সমস্ত মুখখানা হিঙ্গুলের মত লাল হইয়া উঠিল।

—ক্রমশ

বিদ্যা-বণিক

অতীতের সাহিত্য থেকে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, তখনকার লেখকেরা রাজা-রাজ্‌ড়া, রাজ-কন্যা, উজীরপুত্র বা এমন কোনও নায়ক-নায়িকাকে অবলম্বন ক'রে আখ্যায়িকা বা কাহিনী লিখ্‌তেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই হোত। তখনকার সাহিত্য বহুর দখলে ছিল না, দু'চারজন লেখক কাব্যে বা গল্পে তখনকার দিনে তাঁদের সৃষ্টির বিজয়স্তম্ভ গ'ড়ে রেখে যেতেন। সে স্তম্ভ কুতব-মিনারের চাইতে মাপে বড় না হলেও, সাধারণ লোকের পক্ষে যেন দুরারোহ ছিল।

আজকালকার সাহিত্যে একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, সেই তখনকার দিনের বিজয়স্তম্ভগুলির বদলে, বহুসংখ্যক লেখকের গদ্য পদ্য গল্প রূপক প্রভৃতি ছাপার যন্ত্রের সাহায্যে দেশের মাটির মধ্যে, গণ-সমাজের বাস্তুভিটার আনাচে-কানাচে ঘাসের মত চারিয়ে যাচ্ছে।

এ রকম অবস্থাটা ভাল কি মন্দ সে নিয়ে তর্ক করলে তার ফলাফল নিয়ে পাঁচ সাতখানা দমে-ভারী বই ছাপিয়ে ফেলা যায়।

তবে এটা নিশ্চয় সুখের কথা, দেশের ছোট-বড় সবাই কিছু-কিছু বিদ্যা অর্জ্জন ক'রে নিজে নিজে অনেক কথা ভাব্‌তে আরম্ভ করেছেন। সেই ভাবনা-গুলিই সাময়িক পত্রের দৌলতে ছাপার অক্ষরে নানা নামে প্রকাশিত হচ্ছে। এতে যাঁরা দোষ ধর্‌বেন, তাঁদের আমরা একথা বল্‌তে পারি যে, পূর্ব্বকালের লেখকেরা যা কিছু গড়ে' গেছেন, তা সাহিত্যের আকারে হলেও, তা দিয়ে দু'চারজনকে বহুলোক হতে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পুরাকালের সেই সাহিত্য-গুলিকে শুধু এ কারণে মন্দ বলার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। কারণ আমরা শিশুকাল থেকে শুনে আস্‌ছি যে, ওসব সাহিত্যের মত "এমনটি আর হয় না"। তাছাড়া, বয়স বাড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গে যে দু'চারখানা বই পড়ে' তার খানিকটা বুঝে' খানিকটা না-বুঝে যা' ধারণা হয় তাতেও সেই সব সাহিত্যের কাছে আমাদের সকল বিদ্যা

ও ধারণাকে অহঙ্কারের তাজ খুলিয়ে কুর্ণিশ্ করাব, শ্রদ্ধায় মাথা নত করিয়ে দেয়। এক হিসেবে একেবারে হতবুদ্ধি করে দেয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একালের লেখার মধ্যে আমরা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছি ব'লে আমাদের এ সম্বন্ধে কথা বল্বার যা নিতান্ত আমাদেরই অস্থি-মজ্জার জিনিষ ব'লে ভাববার বেশী অধিকার আছে।

একটা কথা এইখানে উঠ্বে যে, একালের সব লেখাই সাহিত্যে পরিণত হচ্ছে কি না? মোট কথায় ধরে নেওয়া যাক্, তা হয়ত হচ্ছে না। কিন্তু তা' হচ্ছে না বলেই আমরা সে লেখাগুলিকে সাহিত্যের বিস্তীর্ণতা থেকে একেবারে বাতিল করে দিতে পারি কি?

লেখক ও আমরা, যারা পত্রিকা চালাই, এই দুই সম্প্রদায় সম্বন্ধে ক'টা কথা বল্তে চাই।

প্রথম কথা এই যে, আমাদের আজকালকার নব্য-সাহিত্যিকেরা হয়ত কিছু কিছু তত্ত্বকথা সমুদ্রপার থেকে আমদানি কর্ছেন। সেটা না হয়ে' উপায় নেই। কারণ বল্তে গেলে অনেক। তার মধ্যে দু'একটা আমরা চোখ ঠারা-ঠারি করে' বুঝে নিতে পারি, কিন্তু এই বিশেষ লক্ষণটি নিয়ে আজকালকার সমগ্র সাহিত্যের আলোচনা হতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা—আজকাল আমাদের ভাব্বার সময় নেই, ভাব্বার অবসর যদি মেলে, লিখ্বার ফুরসৎ নেই, তার উপর লিখবার সময় থাক্লেও লিখ্তে দেবার ইচ্ছা নেই, অথচ আমাদের মনের অবস্থাটা চারিদিকের দুরবস্থায় এমন করে দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের না লিখে উপায় নেই। তার উপর আমরা কাগজওয়ালারা লেখকের এই সকলপ্রকারের অক্ষমতার মধ্যেও তাঁদের কাছ থেকে তাড়া দিয়ে লেখা আদায় করি। আমাদের তাতে কিছু দোষ আছে বলে' মনে হয় না। কারণ আমরা বসেছি বিদ্যা-বণিক হয়ে। যেমনতর লেখাই হোক্ না কেন, যেনো কোনও রকমে পয়লা তারিখে বা যার যার কাগজ প্রকাশিত হবার নির্দিষ্ট সময়ে কাগজ বের করার ভিতর আমাদের অনেকখানি প্রয়োজন আছে।

সময়ে কাগজ বার করা আজকাল রেওয়াজ হয়ে গেছে। তবে এর মধ্যে কেউ হয়ত দীর্ঘকাল চুপ করে থেকে একেবারে [illegible] সময় ছুটোছুটি ক'রে এক-পা ছাপাখানায়, এক-পা লেখকের দরজায় রেখে কাগজ ঠিক্ সময়ে বার করেন। তাঁদের নজর রয়েছে, কাগজখানি সচিত্র হওয়া চাই। কাগজের মূল্য যতই হোক্ না লেখার মূল্যের দিকে তাঁরা একেবারে বেপরোয়া।

তাঁরা হয়ত মনে করেন, রচনা ছাপার হরপে প্রকাশিত হলেই তার মূল্য বাড়ে। এঁদের আমরা বড়দরের বণিক বলতে পারি। নিজের আত্মীয়-পরিত্যক্ত অর্থ বা অপর কোনও ধনীর অর্থের মূলধন দিয়ে এঁরা এ ব্যবসা ফাঁদেন। এ ব্যবসাতে তাঁদের সাহিত্যের কাছে যেন কোনও দায়িত্ব নেই। যেটুকু দায়িত্ব তা' কেবল নিজেদের কোলের দিকে ঝোল্ টানার মত। তাঁদেরই হ্যাপাতে পড়ে' নব্যসাহিত্যিকেরা জুতো শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যান্ত যে-কোনও বিষয়ে সমান অধিকার অনুভব করে' লিখে যান্। আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে শ্রম-বিভাগ বলে' কিছু আর নেই। তার কারণ, যে ক্ষেত্রে শ্রমেরই অভাব, সে ক্ষেত্রে তার বিভাগ আর কেমন করে থাকে?

আর একদল বিদ্যা-বণিক আছেন, তাঁরা নম্বরি মালের দিকে খুব ঝোঁকেন। যথা, সারদাচরণ বড় কলেজের একজন প্রফেসার, তাঁকে দিয়ে একটি গল্প লেখাতে হবেই। অথবা এককালে বিনোদবাবু খুব ভাল লিখিয়ে ছিলেন, এখন নানা কারণে হয়ত আর লেখ্‌বার অবসর পান্ না, তাঁর দুয়ারে ধন্না দিয়ে, তাঁকে রীতিমত তাগিদ দিয়ে একটি লেখা বার ক'রে নিয়ে এলেন! লেখাটি হয়ত বিনোদ-বাবুর, কিন্তু যে-বিনোদবাবু এককালে পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন করেছিলেন, এ লেখা সে বিনোদ বাবুর নয় বলেই মনে হয়। তবু এঁদের চেষ্টা, বিনোদ বাবুর লেখা বের করতে হবেই। কাজেই নূতন লেখকত দূরের কথা, কোনও-কালে-বিখ্যাত বিনোদবাবু পর্য্যন্ত ভেবে চিন্তে অবসর মত কিছু লেখার সুযোগ পান্ না। এই বিদ্যা-বণিকের দল, দেশের লোকের উৎসুক আগ্রহে ঘেন্না ধরিয়ে দেন্।

তাই আমাদের লেখকদের গল্প, স্বল্প হয় না, এমন কি স্বল্পায়তনও হয় না। প্রবন্ধগুলি মণিবন্ধের চালনায় যতই বড় হয়ে উঠুক্ না, তার ভিতরে রস্-কস্ কিছুই থাকে না। কবিতাগুলি ভাব-ছন্দময় শ্লোকের মত মনে হয় না, মনে হয় যেন আদালতের নিলামের ইস্তাহার। এরই মধ্যে যাঁরা নব্যলেখক, তাঁরা একটু ভয়ে ভয়ে থাকেন বলে' তাঁদের লেখার মধ্যে তবু নব সূর্য্যোদয়ের প্রথম আভার মত উদয়মুখ প্রতিভার রশ্মি-রেখা একটু একটু ফুটে' ওঠে।

এঁদের লেখার মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, সমগ্র সমাজকে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ করা প্রভৃতি কতগুলি মনের খেলার আনন্দ ধ্বনি শোনা যায়। হয়ত বহু-শক্তিশালী অল্পসংখ্যক লেখকের দিন চ'লে গিয়ে' আজ-কাল অল্প-শক্তি-শালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন এসেছে, তবুও তাঁরা বাঙলা সাহিত্যের

বাড়বাড়ন্তর দিকে তাঁদের ক্ষমতানুযায়ী কিছু কিছু সাহায্য করছেন। আমরা কাগজওয়ালারা এই নবসাহিত্যকে বেচে খাই, ভাঙিয়ে খাই, তবু যাঁরা আমাদের এই বৈশ্য-বৃত্তিকে সহায়তা করেন, তাঁদের হাত তুলে' কিছু দিই না। কিছু দিই না বল্‌তে এক্ষেত্রে আমরা টাকাকেই বোঝাচ্ছি। অবশ্য একথা অনেকে বল্‌তে পারেন যে, কোনও লেখার দাম কেউ দিতে পারেন না। তাই এই নজিরের সুবিধাটুকু নিয়ে যে সব কাগজওয়ালারা ইচ্ছা থাকলে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিতে পারেন, তাঁরাও হাত গুটিয়ে বসে' থাকেন।

লিখে পয়সা পাওয়া এদেশে হয়ত নূতন ব্যাপার। আগেকার দিনে লিখে পয়সা পাওয়া যেত না, তার এক কারণ ছিল, কাগজ বের করে তখনকার দিনে এত টাকা কেউ উপার্জ্জন করতে পারত না। কাগজকে বাঁচিয়ে রাখাই দুষ্কর ছিল, তা' লেখককে আবার টাকা দেওয়া—সে'ত আরো দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এখন ত আর তা' নয়। যাঁদের কাগজ বেশ চল্‌তি, যাঁরা কাগজ বেচে বাড়ী হাঁক্‌ছেন, নিজেদের প্রেস করছেন, তাঁরা ত ইচ্ছা করলেই লেখকদের টাকা দিতে পারেন। কেউ কেউ যে একেবারে দেন্ না তা' নয়। কিন্তু তাও অতি সামান্য। আজকালকার দিনে হয়ত দু' একজন নামজাদা লেখক এক আধখানা উপন্যাস বেশ দামে বিক্রী ক'রে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু আর যে সব লোক, সাহিত্যের সেবা করবে ব'লে কায়ক্লেশে প্রাণ ধারণ ক'রে আছে, তাদের কারুর অতিশয় পরিশ্রম ক'রেও মাসে সব কাগজের বকশিস্ জড় করে পঞ্চাশ টাকার উপরে আর ওঠে না। তাঁরা ভাল লিখ্‌বেন কি করে? খাবেনই বা কি, ভাববেন-ই বা কখন, আর ভাল ভাল বই কিনে অধ্যয়নই বা করবেন কি দিয়ে? তবু আমরা কাগজ-ওয়ালারা বাঁধি গৎ আওড়াই, "ভাল লেখা আর কই!" এ ত অবশ্য ঠিক কথা' সরস্বতী ও লক্ষ্মীর চিরকালই বিরোধ। কিন্তু এ প্রবাদ বাক্যের ও ত বিপর্য্যয় ঘটতে সুরু করেছে আজ কাল, হয় নি কি?

কাগজের সংখ্যাও যেমন বেড়েছে, লেখকের সংখ্যাও তেমনি বাড়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই লেখকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। লেখার মধ্যে যে আনন্দ, তৃপ্তি তা' বাংলার বুকে বুকে ছোঁয়াচ লেগেছে। দেশে যত দুঃখ বাড়ছে, অশান্তি বাড়ছে, ততই মানুষ ভাবতে সুরু করে দিয়েছে। এই ভাবনার ফলই মানুষের রচনা। এই রচনাগুলি মানুষের মন থেকে বেরুতে বেরুতে বহু মানুষের মনে সখ্যতা স্থাপন করেছে। লেখকে ও পাঠকে যে সম্প্রীতি বাড়ে আমরা তার মধ্যে কোথাও ঠাঁই পাই না। আমরা লেখকের

লেখা বেচি, পাঠকের টাকার হেফাজতি করি, কিন্তু তার শতাংশের কত খানি লেখককে দিই ?

যারা কোন আদর্শ নিয়ে সত্যিকারের প্রাণপণ ক'রে কোনও কাগজকে খাড়া করতে চেষ্টা করছেন তাঁদের হয়ত লেখকদের কিছু দেওয়া আপাতত অসম্ভব, দিতে গেলে ভাঁড়ে মা ভবানী হয়ে দাঁড়াবে। তখন আদর্শ ঘুচে গিয়ে জোচ্চোরি সুরু করতে হবে। এ-দলকে তাদের চেষ্টায় সময়টুকুর জন্য রেহাই দিয়ে যাঁরা সমর্থ, সক্ষম এমন সব বিদ্যা-বণিকদের এ বিষয়ে বল্‌বার কি থাকতে পারে ? তাঁরা হয়ত বল্‌বেন, আমার খরচ কত তা' জান ?—বেশ ভাল কথা। তোমার খরচ বেশী মানেই তোমার খরচ কর্‌বার মত ক্ষমতা হয়েছে। কিন্তু তা' ব'লে একটা কাগজের আমদানি টাকা দিয়ে যদি তুমি কেবলই অর্থাগমের নানা ফন্দি আরম্ভ কর, তা হলে খরচের হিসাব করা শক্ত। বেশ ত টাকা রোজগার কর, কেউ তাতে তোমাকে পরোপকার-ব্রত সাধন করতে বলছে না, কিন্তু যার প্রসাদে আজ তুমি রামের মা' তাদের ভাগেও কিছু কিছু 'আমানৎ' রাখ। তোমরা চিত্রকরের কাছ থেকে ছবি নিয়ে ছাপো বিনি পয়সায়, কারণ সেটা চিত্রকরেরই গরজ। ছবি দু-একখানা কাগজে না ছাপ্‌লে, তার নিজের বিজ্ঞাপন হয় না। কবিতার ত কথাই নাই, কবিতা যে ছাপো এ ত তোমার অনুগ্রহ। প্রবন্ধগুলিও লেখকের বাড়ী গিয়ে চেয়ে আন্‌বার জন্য ট্রামভাড়া পর্য্যন্ত খরচ করতে হয় না। তার পর পাঁচমিশালী ব্যাপারটি, ওটা ত' আমেরিকা, ইংলণ্ডের ম্যাগাজিনগুলির দৌলতে একখানি চার পয়সার কাঁচি কিনলেই বহু কাল চলে যায়। কিছু ব্লকের খরচ হয়। কিন্তু তা' না দিয়েও উপায় নেই।

কোনও উপায় যদি থাকৃত তা' হলে কি খরচ করতাম ? এত বড় বোকা আমরা নই। বাকী রইল গল্প আর উপন্যাস। ছোট গল্পের দর নেই, কারণ তা' যে-সে লিখ্‌তে আরম্ভ করেছে। তার মধ্যে ভাল মন্দ বাছাই কর্‌বারও একটা ভয় আছে। একবার ভাল বল্‌লেই ফিরে বারে সে লেখক টাকা চেয়ে বসতে পারে, তার চাইতে চুপ্‌ চাপ্‌ করে ছেপে যাওয়াই সুবিধা! নেহাৎ যে দু' একজন লেখক একটু নাম করেছে, তাদের কিছু না দিলে নয়, তাই হয়ত নামকাওয়াস্তে কিছু দিতে হয়। লেখকের নেহাৎ দুর্দ্দিন, তাই হাত পেতে নিতে হয়, কিন্তু সে টাকার মোট সংখ্যার কথাটা হয়ত লেখকের অতি বড় আত্মীয়ের কাছেও বলতে লজ্জা করে। তাই বা কটা কাগজে দেয় ? কারা কারা দেয় নাম করে হয়ত তাদের কথা বলা যায়। তবু তাঁরা লেখকদের নমস্ত, সেই মামার চাইতে

কানা মামা ভালো। কিন্তু যারা অগাধ টাকা ক'রে, মাইনে করা, দাদন-খাওয়ান সম্পাদক রেখে, লোহার সিন্দুকের পাশটিতে বসে কর্ত্তাগিরি করছেন, তাঁদের কথা আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু না করে উপায় নেই। এমন ভাবে তাঁদের এই বৈশ্য-বৃত্তিকে সাহিত্যের আনন্দ-মেলায় অবাধে চল্‌তে দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাঁরা যে কত বড় স্বার্থপর তা' তাঁদের কাছে যারা গলায় ফাঁসি প'রে সব বিকিয়ে পড়ে আছে তাদের মুখে গোপনে শোনা যায়। লেখকের লেখা ছাপা, এটা তাঁরা মনে করেন লেখককে মহা অনুগ্রহ করছেন। টেক্স দেওয়ার ভয়ে কথা তাঁরা কম কন্, যা বলেন তা' অতি 'মিষ্টি'। বাংলায় প্রত্যেকটি লেখক যে ঐ ক'টি বিদ্যা-বণিকের চাইতে বিদ্যায়, বুদ্ধি ও চিন্তাতে কত বড় তা' তাঁরা মনেই ভাবতে পারেন না। লেখকের সম্মান তাঁরা কি ক'রে বুঝ্‌বেন? আত্মসম্মান কাকে ব'লে তাই তাঁরা জানেন না, জান্‌লে, পরের সম্মানও রক্ষা করতে জান্‌তেন। বিনা খরচায় যা' হয় তাই তাঁরা করেন না তার ওপরে লেখককে পারিশ্রমিক দেবেন? বাড়ীতে নাচ গান যাত্রা—"আমি বড় হয়েছি" এ কথা যত রকমে প্রচার করতে পারা যায় তার জন্য তাঁরা লেখকের লেখা বেচে যে অর্থ সংগ্রহ করেন তা' অকাতরে খরচ করেন। কিন্তু লেখকরা—যে তিমিরে, সেই তিমিরে। তার ওপরে গোদের ওপরে বিষ ফোঁড়া—কতগুলি সম্পাদক অদ্ভুত শক্তি-বলে অনেকগুলি কাগজ বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের শক্তির প্রচুরতা, আত্মবিশ্বাসের জোর, সততার তেজ, চেষ্টায় ও চিন্তায় প্রাধান্য এ সবই পুরোণ গোদের ওপর টনটনানি ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কড়িকাঠি যাঁরা এতকাল চালিয়ে এসেছেন, তাঁদের দুর্দ্দিন এসেছে নিশ্চয়। আজকালকার লেখকদের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান যথেষ্ট হয়েছে, বিদ্যা-বণিকের কাছে তাদের আত্মসম্মান ও লেখার সম্মানকে কখনও ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না।

নবযুগের লেখকেরা নিজেদের লেখা সম্বন্ধে সম্বৃত হয়ে নিজেদের প্রকৃতিস্থ রেখে একটু ধৈর্য্য ধ'রে ক'দিন এ বণিক-দলকে একটু রোয়াব দেখালেই এদের থলির দড়ি খুলে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের অন্ততঃ মানুষ ব'লে সম্মান করতে এঁরা শিখ্‌বেন।

লোহার সিন্দুকের চাবী ওঁদের থাক্, সে টাকা দিয়ে ওঁরা আরও পাঁচখানা কাগজ বার করুন, বইয়ের দোকান করুন, বা থিয়েটার চটকলের সেয়ার কিনুন তাতে লেখকের কিছু যায় আসে না, কিন্তু বাজে খরচের জন্য রোজ যে টাকাটা ব্যয় হয় সেই টাকার থলেটা লেখকদের নামে থাক্‌লেই হোল।

আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম উঠে যাচ্ছে তাতে উদারমতের সূচনা দেখা যায়। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন করে সবাই মিলে বৈশ্যবৃত্তি ধরলে বাংলার সরস্বতীর কাশীপ্রাপ্তি ঘট্‌বে এ কিছু আশ্চর্য্য নয়।



অবস্থান্তর



—শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী।

(১)

মহেশগঞ্জ গ্রামের ভিতর ভূধর ঠাকুরের বস্তুত কোন রকম খ্যাতি-প্রতিপত্তি না থাকিলেও উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি যাহা পাইয়াছিলেন, তাহার মূল্যও বড় কম ছিল না। তাহারই বলে ওই মহকুমার দশ জনের ভিতর দাঁড়াইলে কেহই তাঁহাকে অবহেলা করিতে পারিত না। সাধারণ লোকে ইহা মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করিত যে, তাঁহার পিতা পিতামহের আমলে কত জন কত রূপে উপকৃত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়াছেন, কত বিদ্যার্থীকে উৎসাহ দিয়া ব্যবস্থার গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাদের ভিতর সব চাইতে বড় প্রমাণ শ্রীপতি রায়।

কথাগুলি কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভূধর ঠাকুরের বুকটাও যেন আরো এক হাত চওড়া হইয়া উঠিত; কিন্তু পরক্ষণেই দমিয়া পড়িতেন নিজের কাজের ভাবনায়। কি কুক্ষণেই পাটের কারবারে হাত দিয়াছিলেন, যাহার জন্য আজ সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন, এক মাত্র পৈতৃক অট্টালিকাখানি, তাও কিনা আজ সেই শ্রীপতি রায়ের কাছেই বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। বাকী আর ছয় মাস—যদি এই ছয় মাস পরে টাকা সংগ্রহ করিতে না পারেন তাহা হইলে কে জানে তাঁর এই অবশিষ্ট সম্পত্তিটুকু বজায় রহিবে কি না।

শরীর খারাপ সে দিন বিনিদ্র শেষ রাতের ভিতর পায়চারি করিতে করিতে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করিয়া তিনি চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। শৈশবের কত সময়ের খেলা, কত প্রিয়জনের হাসিমুখের স্মৃতি বসন্তের ঝরা পাতার মতই অন্তরের ভিতর পুঞ্জীভূত হইল,—সব চাইতে বড় বেশী ভাবেই চোখের নিকট ফুটিয়া উঠিল দুটি দিনের দুটি বিপরীত স্মৃতি।

একটি দিন, যে দিন জীবনের প্রথম অঙ্কে রঙিন স্বপ্নভরা অন্তরটাকে লইয়া দাম্পত্য-গ্রন্থির সঙ্গে নবপরিণীতা সঙ্গিনীর সহিত অট্টালিকার অভ্যন্তরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে দিন এই নীরব স্তব্ধ বাড়ীটি কি আনন্দমুখর ভাবেই না তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিল। আর এক দিন,—সেদিন তাহাকেই চির বিদায়ের বেশে সাজাইয়া দিয়া অজস্র শূন্যতার সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখনো যে ইহারই বুকে আত্মগোপন করিয়াই তিনি ক্রমশ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র এই কয় মাস পরে যদি ইহাকেও ত্যাগ করিতে হয়! ভূধর বাঁড়ুয্যের মস্তিষ্কের ভিতর বিপুল দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেল, শ্রান্ত ভাবে তিনি বিছানার এক পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, পৃথিবীর সব চাইতে দৃঢ় বন্ধন হইতে ত' তিনি মুক্ত, কিসের এত চিন্তা, এত মনস্তাপ তাঁর!

শয্যার প্রান্ত দেশ হইতে ইতিমধ্যে বালকের সরল কণ্ঠস্বর আসিল, "এখনো ঘুমোন নি বাবা?"

এ যেন তাঁর মুক্তির আনন্দকে বিদ্রূপ করিয়াই ভগবানের বিকট রহস্য! ভূধর বাঁড়ুয্যে শিহরিয়া উঠিলেন,—না, না, এখনো যে গভীর বন্ধন, কঠোর কর্তব্য তাঁর সম্মুখে, এই মাতৃহীনের সমস্ত দায়িত্ব যে একমাত্র তাঁহারই। চিন্তা স্রোতটাকে কোন রকমে সংযত করিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "না, এতক্ষণ ঘুম পায় নি মাণিক।" পরে তিনি তাহার পাশেই শুইয়া পড়িলেন। মাণিক তন্দ্রাজড়িত চোখে অনেকখানি তৃপ্তির সঙ্গেই নিজের বাঁ হাত খানি দিয়া তাঁহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা, আমার কিন্তু এক ঘুম হয়ে গেল, আপনার ঘুম পায় না কেন?"

তাহার পর মাণিক একান্ত নির্ভরশীল ভাবেই তাঁহার বুকের ভিতর ঘুমাইয়া পড়িল। ভূধর বাঁড়ুয্যে দ্বিগুণ আগ্রহে তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন কিন্তু কয় বিন্দু অশ্রু অনেকটা অনাহূত ভাবেই আসিয়া তাঁহার চোখের প্রান্ত পূর্ণ করিয়া তুলিল।

(২)

ছয় মাস নির্ব্বিবাদেই চলিয়া গেল। ভূধর বাঁড়ুয্যের মুখের দিকে চাহিয়া পা ফেলিবার সময়ে সে একটুও ভুল করিল না। প্রভাতের সোনার আলো সমান ভাবেই আসিয়া পৃথিবীর বুকের উপর পড়িল, সমান ভাবেই নবজাগরণের বাণী

আনিয়া দ্বারে দ্বারে প্রচার করিল। এই সময়ে একজন আগন্তুক আসিয়া তাঁহার বৈঠকখানার দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। ভূধর বাঁড়ুয্যে তখন অতীত কালের দরুণ একখানা আরাম কেদারায় ঠেসান দিয়া নিস্তব্ধ ভাবেই পড়িয়াছিলেন। আগন্তুকের পদশব্দে চকিতভাবে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং শিষ্টাচার সঙ্গতভাবে আর একটা চেয়ার আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভাল আছ ত হে!"

"ভাল, ভাল আর কই!" পরে অনেকটা অপ্রসন্ন মুখেই আগন্তুক চেয়ারখানি দখল করিয়া লইয়া বলিল, "বেশীক্ষণ বসবার মত সময়ও আমার নেই, তবে একবার যদি না আসি মনে করবে, শ্রীপতি এদিকে আর খোঁজটা নেওয়াও উচিত মনে করে না, ওদিকে আবার মক্কেলের দল এসে ব'সে রয়েছে,—হাঁ ভাল কথা এদিকের কতদূর কি করলে?"

খোঁজ নিতে আসার উদ্দেশ্যটা ভূধর বাঁড়ুয্যের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই, কথার গতিটা কোন পথে তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হইল না, তথাপি বলিলেন, "কোন্ দিকের?"

"এই টাকাটার হে!"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "গাছের ফল হলে আর কোন ভাবনা ছিল কি, তবে যদি দিন পনের' সময়টা দিতে তা হলে একবার চেষ্টা করে দেখা যেতো!

উভয় ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর মুখেই শ্রীপতি রায় বলিল, "একদিন সময় তো তোমার হাতেই ছিল, এখন আর যে আমার সময় দেবার যোটি নেই—এই দেখ ষোলই বোশেখেই মেয়েটার বিয়ের সব ঠিক করেছি, এখন টাকা ক'টা জুটিয়ে না দিলে তো আর কাজ চলবে না, অন্ত লোক হলে কি আর আমি দিয়ে তোমার সে টাকা নিতে আসি, কেবল তোমার বংশের কাছে উপকৃত ব'লে তাই।"

ইহার কিছুমাত্র উত্তর না দিয়া ভূধর বাঁড়ুয্যে গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন। শ্রীপতি রায় পুনরায় বলিল "দেখ এই যে টাকা [illegible], একে রাখতে হ'লে বিদেশী হওয়ার দরকার, এত বড় সম্পত্তিটা তুমি কেবল বে-হিসেবীতে উড়িয়ে দিলে, এদিকে আমার দেখ টাকা না হলে চলছে না, কাজেই দেখ ইচ্ছে না থাকলেও . . ."

বাধা দিয়া এইবার ভূধর বাঁড়ুয্যে বলিলেন, "সে কথা আমাকে বিশেষভাবে

স্মরণ করিয়ে দেওয়ার যে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে তা আমার মনে হয় না শ্রীপতি !"

অন্ধকারের মত মুখ করিয়াই এবার শ্রীপতি রায় বলিল, "তবু তোমাকে একবার নিজে এসে জানান উচিত মনে হ'ল। জানি লোকে দোষটা আমারই দেবে।" ইহার পর সময়ের দাবী করিয়া শ্রীপতি রায় গৃহ ত্যাগ করিল।

ভূধর বাঁড়ুয্যেও স্তব্ধ মূর্চ্ছাহতের মতই বসিয়া রহিলেন। "এই শ্রীপতি রায় না আই, এ, পড়ার অর্থ-সংগ্রহ করিতে না পারিয়া পড়া ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছিল, তিনিই না পিতাকে অনুরোধ করিয়া তাহার সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আজ কিছু দিনের সময় দিতেও সে অপারগ। কত বড় জ্ঞানপাপী সে, কতখানি দাম্ভিকতার সহিত আজ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিতে গিয়া তাঁহার বুকটা অপমানের বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিল, মনে হইল, পৃথিবীতে স্নেহ দয়া কৃতজ্ঞতা ব'লে কিছু নেই, নিষ্ঠুর নির্মম এই পৃথিবীর বুকটা।

মাণিক আসিয়া এই সময়ে তাঁহার হাত ধরিয়া ডাকিল, "বাবা, বেলা হল, হরির মা ভাত নিয়ে ব'সে আছে উঠুন!"

"যাই," সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিয়া তিনি পূর্ব্বের মতই বসিয়া রহিলেন, তাঁহার ভিতরটায় তখন হাতুড়ীর ঘা পড়িতেছিল। 'এই পাচিকা এই পরিচারিকা আজও তাঁহার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু কয়দিন পরে!' ক্রমশ তাঁহার যেন চিন্তা শক্তি লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

মাণিক আবার ডাকিল, "বাবা, উঠুন!"

চকিতের ভিতরে চমক ভঙ্গের মতই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত শিথিলপদ চলিতে চাহিল না, আবার সেইখানেই অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন।

(৩)

"কাঁদ্‌চো হরির মা, কাঁদ কাঁদ, খুব কাঁদ; কিন্তু কেঁদে কি কিছু করতে পারবে মনে ভেবেছ?—মোটেই নয়! উন্মাদের মতই আকস্মিক ভাবে কথাগুলি শেষ করিয়া ভূধর বাঁড়ুয্যে থমকাইয়া দাঁড়াইলেন তখন পূর্ব্বোক্ত সময় হইতে পনর দিন সরিয়া আসিয়া বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে, আরো সেই দিন দ্বিপ্রহরেই বাড়ীখানির নীলাম ডাকা শেষ হইয়া গিয়াছে, মাত্র সাতদিন সময়ের উপর নির্ভর!

গৃহস্থের এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে অনেক দিনের পাচিকা হরির মা অজস্র অশ্রুর সঙ্গে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ভূধর বাড়ুয্যে বাড়ীর ভিতর আসিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মতই কথা কয়টি উচ্চারণ করিলেন।

হরির মা অসংবৃত কাপড়টাকে টানিয়া মাথায় দিয়া এই কথায় আরো দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া বলিল, "ওগো দাদা বাবু, এমন যে হবে তা তো একদিনও ভাবি নি।"

সহসা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া তিনি কিছুক্ষণ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, পরে আপনাকে একটু সংযত করিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "কাঁদলে চলবে না হরির মা! ওঠ, এখন আমার খাবার বন্দোবস্ত করো, সাতদিন কেন, আমি আর একদিনও এ বাড়ীতে থাকবো না, শ্রীপতি রায়ের এ দয়া আমি কিছুতেই মাথা পেতে নিতে পারবো না। আমার যা-কিছু জিনিষ-পত্র সুরেশের বাড়ীতে রেখে গেলাম, সেগুলোর খোঁজ-খবর নিও, আর এই খুচরা যা আছে সব তোমাকে দিয়ে গেলাম। তুমি তোমার ঘরে নিয়ে যেও, অনেক দিন ছিলে, আমাদের ছেড়ে যে তুমি, হরি মানুষ হ'লে তার কাছেও যেতে পার নি।"

ভূধর বাড়ুয্যের গলাটা ভারী হইয়া উঠিল, অসমাপ্ত কথাতেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

হরির মা আকুল স্বরে বলিয়া উঠিল, "ওগো দাদা বাবু, মাণিক আর, মাণিককে ছেড়ে কেমন করে থাকবো গো, ওকে যে বুকে ক'রে মানুষ করেছি গো।"

ভূধর বাড়ুয্যে ইহার যেন আর কোন সদুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া উভয় হাতে মুখ ঢাকিয়া ধূলিমলিন বারান্দার উপরেই ভিত্তি-গাত্রে ভর দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

এই রকম বেদনা ও অশ্রুর ভিতর অপরাহ্ণটা অতীত হওয়ার পর যখন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল, দূরে দূরে গ্রাম্য দেবালয়ের শঙ্খ ও কাঁসরের শব্দ ধীরে ধীরে বাতাসের সঙ্গে আকাশের বুকে মিশিয়া পড়িল, ক্রমশ নীলাকাশের বুকে যখন একটির পর আরো একটি, পরে আরো একটি করিয়া ঝিকিমিক ভাবে গুটিকয়েক নক্ষত্র নব প্রস্ফুটিত ফুলের মতই শোভা পাইতে লাগিল, সেই অবসরে নিজের শেষ বক্তব্য হরির মাকে জানাইয়া মাণিকের হাত ধরিয়া ভূধর বাড়ুয্যে শেষবিদায় গ্রহণ করিলেন।

তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়া উঠিয়াছে। পথে নামিয়া যে পথে জন-মানবের সমাগম বিশেষ কম তিনি সেই পথটাই আজ শ্রেয় বিবেচনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। সম্মুখে নিস্তব্ধ গভীর অন্ধকার, কয়েক পদ চলিবার পর আর্ত্তভীতকণ্ঠে মাণিক বলিল, "কোথায় যাবেন বাবা!"

এতক্ষণ তিনি আচ্ছন্নভাবেই পথ চলিতেছিলেন, বালকের কণ্ঠস্বরে এতক্ষণে ভিতরে যেন একটা সাড়া আসিল, তিনি সুগভীর স্নেহের সঙ্গে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আমি আছি, ভয় কি মাণিক।"

তাহার পর মাণিককে বিপুল আগ্রহে বুকের ভিতর চাপিয়া তিনি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবেই কোথায় ছুটিয়া চলিলেন, নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার গমন-পথে বাধা দিবার জন্ম কোন আহ্বান আসিল না।

(৪)

পল্লীর নদীটি শান্ত গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। গোধূলির মন্দবাতাসে ঢেউগুলি লীলায়িত গতিতে কোন্ অচেনার সন্ধানে ছুটিয়াছে, বিশ্বের বিরাট সভ্যতার সংস্পর্শহীনভাবে বেলাভূমির কয়েক হাত উপরে উদার আকাশের উদার স্নেহ মাখিয়া কয়েকখানি তৃণাচ্ছাদিত কুটীর হাসিতেছিল। কয়জন কৃষিজীবীকে লইয়াই এই পল্লীর সীমার শেষ হইয়া গিয়াছিল। ইহার তিন দিকে সীমানার শেষ চিহ্ন-রূপে বর্ত্তমান ছিল, এক উদাস প্রান্তর আর অবশিষ্ট দিকটিতে এই স্বচ্ছতোয়া তটিনী চপলা বালিকার মতই বিচিত্র ভঙ্গীতে বহিয়া যাইত। তখন পূর্ব্বকাল হইতে প্রায় পনর বৎসর সরিয়া আসিয়াছে।

গভীর তন্ময়তার সঙ্গে জনৈক প্রৌঢ় ব্যক্তি সম্মুখের নদীটির বুকের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁহার বিশাল চক্ষের নীচে আধ মিবিড় ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল রিক্ত পথিকের চিহ্নটি।

নদীটির উপর দু' একখানি নৌকা যাতয়াত করিতেছিল, প্রৌঢ়ের দৃষ্টি সেই দিকেই পড়িয়াছিল যেন কাহার প্রতিক্ষায়। এই অবসরে একখানি নৌকা আসিয়া ধীরে ধীরে নদীর কিনারে আসিল, তাহার অভ্যন্তর হইতে একটি তরুণ যুবক কূলে উঠিয়া আসিল, এবং পরক্ষণেই সম্মুখে প্রৌঢ়কে লক্ষ্য করিয়া সেখানে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলি লইয়া ডাকিল, "বাবা!"

আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হইয়া বৃদ্ধ বাড়ুয্যে এতক্ষণ কেমন হতচেতন হইয়া গিয়া ছিলেন, গাঢ় স্বরে তিনি বলিলেন—"এসেছ মাণিক।"

"এসেছি বাবা, কাজ শেষ ক'রে ফিরেছি, চলুন আবার আপনাকে মহেশগঞ্জে নিয়ে যাই,—দেখবেন শ্রীপতি রায়ের অবস্থা, মাতাল হয়ে কি ক'রে সে সর্ব্বস্ব খুইয়ে ফেলেছে, কি ক'রে আমি আবার সেই বাড়ী দখল নিয়েছি চলুন।"

উত্তেজনার সঙ্গে কথাগুলি শেষ করিয়া মাণিকও সেই খানেই বসিয়া পড়িল।

নিবিড় ঔদাসীন ভাবে বৃদ্ধ বাঁড়ুয্যে বলিলেন, "আমি আর যাব না মাণিক।" অশ্রু রুদ্ধ গাঢ় গলায় মাণিক বলিল—"কেন বাবা? মামা যে আপনার অপেক্ষায় আছেন।"

"তাঁকে বলো, তোমাকে মানুষ করার জন্যে আমি তাঁর কাছে যথেষ্ট ঋণী, কিন্তু আমার যে এখন এই ভাল লাগে,—এই স্বচ্ছন্দ সুখ, পরিশ্রমশীল মানুষ, যাঁরা আমার বড় দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছে তাদের যে আমি বড় ভালবাসি মাণিক।"

মাণিকের চোখে জল আসিল, বলিল, "তবে আমি কেন চেষ্টা করলাম এত, আমি উপায় করতে শিখে পর্য্যন্ত, বিকেলের জল পর্য্যন্ত না খেয়ে, আজ পাঁচ বছর ধরে যে ঐ করেছি। হয় মহেশগঞ্জে নতুন বাড়ী ক'রে আপনাকে নিয়ে গিয়ে বসাব, না হয় সুযোগ মত ঐ বাড়ীই কিনে নেব এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আমি দিন কাটিয়েছি, বাবা।"

একান্ত শান্তভাবে বৃদ্ধ বাঁড়ুয্যে তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "তা বে তোমাকে কৃতজ্ঞ হবে মাণিক, আমার অপহৃত সম্মান সে যে তোমাকেই উদ্ধার করতে হবে,—তাই বলে আমায় নিয়ে আর টানাটানি করো না,—এই মাটি মায়ের কোল, এই মুক্ত আকাশ— এরাই আমার প্রিয় সঙ্গী হয়ে শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাকে সুখে ক'রে রাখবে।"

মাণিক ব্যথিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া নীরব হইয়া রহিল। দিগন্তরেখার কোলে অস্তগামী সূর্য্যের চিহ্ন মুছিয়া উঠিল। অজস্র জোৎস্না আসিয়া তটিনীর সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গন করিয়া বেলাভূমি চুম্বন করিল। অদূরে কুলবধূদের অন্তরাল হইতে সন্ধ্যার শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিল— বাঁশরীর সাঁঝ করুণ সুর।

৮৬৯

প্রতীক্ষায়

—শ্রীসুবোধ দাশ গুপ্ত।

দু'হাতে দরজাটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে লেখা মৃদুস্বরে ডাকল, 'রাঙ্গা-দাদা'—হাতের মৃদু-গতিতে চুড়িগুলো এক সঙ্গে রণিয়ে উঠ্‌ল।

অন্ধকার ঘরে বিছানার উপর উপুড় হয়ে সুনীল নিশ্চল ভাবে প'ড়েছিল, ডাক শুনে তাড়াতাড়ি উ'ঠে ব'সে বল্লে, কে ?—এস।

সন্ধ্যার আগেই বাড়ীর সকলে এক বাড়ী নেমন্তন্ন রাখ্‌তে গেছিল, শুধু লেখা ছিল বৃদ্ধ রুগ্ন ঠাকুর-দাদার পরিচর্য্যায়, আর ছিল তার বাপ-মা হারা জ্যেঠতুতো ভাই সুনীল।

লেখা আস্তে আস্তে ঘরে ঢুক্‌ল। অনেক কথা ভেবে এসেছিল সুনীলকে বল্‌বে ব'লে কিন্তু এই নিবিড় অন্ধকারে এসে সব ভুলে গেল। স্তব্ধ হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

সুনীল বল্লে, দাঁড়িয়ে রইলে যে, বোস।

—আলো যে এখনো জ্বাল নি,—যে অন্ধকার!

ব'লে লেখা অন্ধকারে হাত্‌ড়ে সুইচ্‌টা খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল, পরক্ষণেই শক্ লেগে উঃ ক'রে হাতটা সরিয়ে নিল। সুনীল উঠে আলোটা জেলে বল্লে, খুব লেগেছে ?

লেখা বল্লে, না। তোমার ওপর আমার ভারী রাগ হয়, তুমি কেন—মাঝ পথে লেখা থেমে গেল। সুনীলের ব্যথিত চোখ দু'টির দিকে চেয়ে লেখার আর কোন কথা বল্‌তে সাহস হ'ল না

সুনীলের মুখে একটা বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠ্‌তে উঠ্‌তে মিলিয়ে গেল। খুব নরম হয়ে বল্লে, কি ?

—তোমার নামে বাড়ীর সকলে এত কথা বলে, তুমি কেন সব মুখ বুঁজে সহ্য কর ?

—কৈ আমি ত' কিছু জানি না, কেউ কিছু বল্‌ছিল নাকি ?

লেখার রাগ হ'ল, বল্লে, জান্‌বে আবার কি ? সেই সকাল থেকে বেরিয়ে যাও, খাবার সময় এসে খেয়ে দেয়ে আবার বেরিয়ে যাও, এতে মানুষের মনে কি ধারণা হতে পারে তা-ও তুমি বোঝ না ?

সুনীল গম্ভীর হয়ে বল্লে, ধারণাটাই সব সময়ে মানুষটার চাইতে বড় বা সত্য হয় না। আচ্ছা কি ধারণা হয়, তুমিই বল না তোমার কি ধারণা হয়েছে ?

—আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম ; কিন্তু বাড়ীতে এতগুলো লোক,—কাকা, বাবা, দাদারা—এঁদের কথাগুলো, এত উপেক্ষার নয়।

—তা আমি কি করব ?

—কি আর করবে, এই ভবঘুরের মত টোঁ-টোঁ ক'রে ঘুরে বেড়াও আর মাথা মুণ্ড কবিতা গল্প লেখ।—

কথা কয়টা খুব ঝাঁঝাল সুরে ব'লেই লেখা উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল। সুনীল সহজ সুরে বল্লে, যেও না লেখা !

লেখা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, কেন ?

—মনে পড়ে শিউড়ীতে একটা চিঠি লিখেছিলে চ'লে আসতে ?

—সব দোষই যেন আমার। তুমিই তো নিজে বলেছিলে জাহাজের চাকরী বড় জঘন্য।

—আমি বলেছিলাম চাকরী করাটাই জঘন্য।

লেখা খুব নরম হয়ে বল্লে, আচ্ছা তুমিই ভেবে দেখ না, এই রকম ছন্নছাড়া হয়ে কাটানোই কি জীবনের চরম সার্থকতা ? নিজের জন্য না হোক, পরের জন্যও তো একটু ভাবতে হয়। বাড়ীর সমস্ত লোক তোমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছে, একটু চেষ্টা করলেই কি তুমি এর প্রতিকার করতে পার না ! খুশীর খেয়ালে চলায় আনন্দ আছে স্বীকার করি, কিন্তু সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে চললে যে, পদে পদে বেসুরো হয়ে যায়, তুমি কি তা একটুও বোঝ না ?

কথাগুলো শুনতে শুনতে সুনীল অধীর হয়ে উঠ্‌ল, বল্লে, দেখ লেখা, পৃথিবীতে আমি অনাবশ্যক। বড় হবার কোন দুঃসাহস আমার ভেতর নেই। আমি চাই নিজেকে নিয়ে থাকতে। এতে আনন্দের চাইতে জ্বালা বেশী। তবু আমি জানি আমার এই সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ব্যথা, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা বুকে ক'রে মরণ আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে আমার জীবনের জয়মালা গেঁথে। এই আশা-ভরা আনন্দ নিয়েই আমি বেঁচে আছি, আরো অনেক দিন বাঁচ্‌বো।

লেখা রাগ ক'রে ব'লে গেল, যা খুশী তোমার কর, ভবিষ্যতে নিজেই কষ্ট পাবে।

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সুনীল আবার বিছানায় উপুড় হয়ে প'ড়ে রইল। চোখে ঘুম নেই, তন্দ্রা নেই, এই অনন্ত অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে,—কবে, কবে যে সে এই অন্ধকারের ভিতর বিপুল সুদূরের পথ খুঁজে পাবে, কে জানে!

সুনীলের চোখ দুটো জ্বালা ক'রে উঠল। . . .

* * * *

পরদিন অতি প্রত্যুষে বাড়ীর সকলে জাগবার আগেই অভ্যাস মত সুনীল পথে বেড়িয়ে পড়ল। কোন্ দূরে দূরান্তে কোথায় কোন্ বনের ছায়া, পাহাড় জঙ্গল, সমুদ্র তাকে যে কবে ডেকে গেছে, সে তাই আর স্থির হয়ে থাকতে পারে না।—

"সে যে পথের চিরপথিক তার কি সহে ঘরের মায়া
দূর হতে যে দূরান্তরে ডাকচে তারে পথের ছায়া।"

চলতে চলতে দেখল আকাশ আলো ক'রে সূর্য্য উঠছে। সে আলো গাছের পাতায় পাতায়, বাড়ীর মাথায় মাথায়, মেঘের বুকে বুকে ঝিলমিল ক'রে উঠল। সে আলোর স্পর্শে পাখীর বুকে সাড়া জাগল, ফুলের কানে তার বার্ত্তা পৌঁছল। সুনীলের মনে হল, এই সুরটি শুধু মানুষের বুকে পৌঁছয় নি। যে দিন পৌঁছবে, সে দিন মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা সমস্ত সংকীর্ণতা সমস্ত বিদ্রোহ ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে, সেইদিন মানুষ সত্যি ক'রে ভালবাসতে শিখবে, পৃথিবী সেই দিন ধন্য হবে। কি এক অজানা পুলকে সুনীলের সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

সারা রাত সে ঘুমাতে পারে নি, পা দু'টো তাই ক্লান্ত, চলতে আর চায় না। সে চুপ ক'রে নদীর ধারে এক পাথরের ওপর ব'সে পড়ল। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, নদীর জলে আলোর খেলা। নতুন কিছুই নয়, রোজই এ পথ দিয়ে বেড়াতে সে বেরোয় আর রোজই এসব দেখে, কিন্তু আজ তার মনের একটা দিক একেবারে ফাঁকা ছিল, তাই দৃশ্যটি তার চোখে এক নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। . . .

দেখতে দেখতে তার চোখে মুখে রোদ এসে লুটিয়ে পড়ল। সুনীল ব্যস্ত হয়ে উ'ঠে দাঁড়াল। আরো কিছুক্ষণ খামখেয়ালি ভাবে পথে পথে ঘুরে সে সহসা অনুকূল বাবুর বাড়ীর কড়াটা জোরে নেড়ে দিল।

ভেতর থেকে প্রশ্ন হ'ল, কে ?

—অনুকূল বাবু আছেন ?

অনুকূল বাবু নিজেই এসে দরজা খুলে ব'লে উঠ্‌লেন, আরে কি সৌভাগ্য আমার, সকালে উঠেই আপনার দর্শন পেলাম !

সুনীল একবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

—বলুন।

—আমি বই ছাপাব না।

অনুকূল বাবু বিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌লেন, বলেন কি ! অর্দ্ধেক যে ছাপা হয়ে গেছে।

—পুড়িয়ে ফেলুন। আমি আপনার খরচটা শীগ্‌গিরই দিয়ে দেবো।

এই অদ্ভুত কথাগুলো শুনে অনুকূল বাবুর বিস্ময় আরো বেড়ে গেল, পরক্ষণেই সস্নেহে সুনীলের একটা হাত্‌ ধ'রে বল্লেন, সুনীল, তোমার কি হয়েছে বল্‌বে ?

সুনীলের চোখ দুটো জলে ভ'রে এল। অনুকূল বাবু বল্লেন, চল চল্‌, ভিতরে বসবে চল, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

বৈঠকখানার দরজাটা খুলে সুনীলকে ভিতরে নিয়ে একখানা চেয়ারে বসিয়ে অনুকূল বাবু বল্লেন, একটু চা'য়ের যোগাড় করি, কেমন ?

সুনীল কোন আপত্তি করল না।

অনুকূল বাবু বাড়ীর ভিতর থেকে চা'য়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফিরে এসে দেখেন, সুনীল চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। স্নেহে ও সহানুভূতিতে তাঁর অন্তরটা অস্ফুট ব'লে উঠ্‌ল, আহা !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস সুনীলের বুক ছেড়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।...

ভৃত্য এসে টেবিলের উপর চা রেখে চ'লে গেল। চায়ের পেয়ালার শব্দে সহসা সুনীল সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। সাম্‌নেই অনুকূল বাবুকে ব'সে থাকতে দেখে একটু লজ্জিত হয়ে সুনীল বল্লে, আশা করি কিছু মনে করবেন না। ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

নিঃশব্দে চা'য়ের পেয়ালাটা শেষ ক'রে সুনীল উঠে দাঁড়াল। অনুকূল বাবু বাধা দিয়ে বল্লেন, আবার কোথায় চল্লে ?

—বাড়ী।

—তা হলে তোমার বইটা ?

—আপনাকে দিলুম, যা খুশী করবেন।

. . . নিজের ঘরে ঢুকে সুনীল বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। তার সমস্ত শরীরটা যেন অবশ হয়ে আস্‌ছিল। লেখা তিন বার দরজার কাছে এসে এসে ফিরে গেল, কোন বারই সাহস ক'রে কোন কথা বল্‌তে পারলে না।

অনেক বেলায় যখন সুনীল উঠ্‌ল তখন সে প্রকৃতিস্থ হয়েছে, মুখের উপর থেকে সমস্ত রকম দুশ্চিন্তার ভার একেবারে দূর হয়ে গেছে। . . .

. . . ঘরের ভিতর সে তার সামান্য জিনিষ-পত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিল। ড্রয়ার বাক্স খুলে কাগজ-পত্র যা যেখানে ছিল, সব টেনে বার ক'রে একে একে আগুন ধরিয়ে দিল। লেখা এসে জিজ্ঞেস কর্‌ল, এ সব কি হচ্ছে ?

সুনীল একটা সীল করা মোটা এন্‌ভেলেপ বার ক'রে বল্লে, তোমার সব চিঠি-গুলো, ফেলি ওই আগুনের ভিতর ?

সভয়ে শিউরে উঠে লেখা বল্লে, না।

কিন্তু কোন কথা বল্‌বার আগেই সুনীল সেটা আগুনে ফেলে দিয়েছিল, আগুন আবার দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো।

লেখা তীব্র স্বরে ব'লে উঠ্‌ল, কি কর্‌লে, নিষ্ঠুর!

সুনীল সহজ সুরে বল্লে, আমি শুধু ভালবাস্‌তেই জানি না, আঘাতও দিতে জানি, তাই প্রমাণ হয়ে গেল।

ড্রয়ার থেকে সুনীল আর একটা খাতা টেনে বার কর্‌ল, সেটা তার ডায়েরী। জীবনের কত সুখ-দুঃখের কান্না-হাসির ইতিহাস এর পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে, . . . সুনীলের বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছিল এটা নষ্ট কর্‌তে, সহসা লেখা আবার প্রশ্ন করল, এ সবের মানে ?

অগ্নিকুণ্ড থেকে মুখ না তুলেই সুনীল বল্লে, আমি চলে যাচ্ছি, বাড়ীর সকলকে বোলো, আমি আর আস্‌ব না।

সভয়ে লেখা ব'লে উঠ্‌ল, কোথায় যাবে ?

ডায়েরীর খাতাটা নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সুনীল বল্লে, যেখানে মরণ জয়-মালা হাতে নিয়ে আমার প্রতীক্ষায় ব'সে আছে !

সুনীল খাতাটা আগুনের দিকে ঠেলে দিল। তারপর আর একটা ড্রয়ার খুলে গল্প কবিতা লেখা খাতাগুলো একে একে আগুনে ফেলে দিল। লেখা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখ্‌ল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বার হ'ল না। . . .

সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়ে হঠাৎ লেখা ব'লে উঠ্‌ল, যেতে দোব না, তোমাকে কিছুতেই যেতে দোব না।

সুনীলের বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল, বল্লে, আমার ওপর তোমার যেটুকু অধিকার ছিল তা তুমি হারিয়েছ।

লেখা সুনীলের খুব সামনে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে চেয়ে ডাকল, সুনীল!

সুনীল নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

লেখা ব'লে যেতে লাগল, তুমি ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না; কিন্তু বুঝি, সব বুঝি। আমি যে কত অসহায় তা যদি বুঝ্তে তাহলে তখন অত নিষ্ঠুর হতে না। তোমরা পুরুষ-মানুষ তোমাদের সব সাজে, কিন্তু নারীর তা সাজে না, তাই তারা বুক ভ'রে শুধু ব্যথাই সঞ্চয় ক'রে রাখে। তুমি পুরুষ, নারীর ব্যথা তুমি বুঝ্বে না, কিন্তু আমরা সব বুঝি। জানো, এটা সমাজের চোখে কত বড় অন্যায়!

সুনীল লেখার ভিতর এই স্বাধীন মূর্তিটির অস্তিত্ব কোন দিনই টের পায় নি, তাই সে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইল। পরে আস্তে আস্তে বল্লে, মিথ্যা কথা। জন্ম থেকেই শুনে আসছি; জগৎ নশ্বর, কেউ কারু নয়, আর তোমার আমার সামাজিক সম্বন্ধ যা, তা একেবারে মিথ্যা হ'তে পারে না? আর ভালবাসাটা সব সময়েই খণিক নয় লেখা! তুমি তাকে ঘৃণা করতে পার, কিন্তু অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই।

দু'জনেই সহসা স্তব্ধ হয়ে পড়ল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোন কথা বল্তে পারল না।

সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সুনীল প্রথম কথা বল্লে, তোমার সমস্ত শক্তিও আর আমার বাধা দিতে পার্বে না, আমার পথ ছেড়ে দাও লেখা।

শুষ্ক অশ্রুহীন চোখে লেখা দরজার এক পাশে স'রে বল্লে, যাও কিন্তু আমি জানি তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আস্বে, আমি সেই দিনেরই প্রতীক্ষায় থাক্‌ব।

* * * *

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে।

লেখার দু'চোখের পাতায় ভারী হয়ে নেমে এসেছে একটি অনন্ত কালের বিনিদ্র রজনী। সে নিদ্রাহারা চোখ দু'টি মেলে চেয়ে আছে অনন্ত পথের দিকে, কার যেন মিলিয়ে যাওয়া চরণ-ধ্বনি শুন্তে পায় বুকের স্পন্দনের তালে তালে।—এ প্রতীক্ষার যেন শেষ নেই, অন্ত নেই—

"ওগো জানি জানি শুধু চলার সুখে
তুমি পা ফেলেছো আমার ব্যথার বুকে
ঐ চলাই তোমার আমার গভীর দুখে
শেষে প্রেম হ'য়ে সে করলো অবতরণ!"

—·—

…প্রকৃতির মায়া দেখিতে পাইতেছ না, কেননা সেই মায়ার ফাঁদে আপনাকে জড়াইয়াছ। যে সুন্দর রূপ দেখাইয়া আজ তোমাকে সে ভুলাইয়াছে, প্রয়োজনের দিন ফুরাইয়া গেলেই সেই রূপের মুখোস সে খসাইয়া ফেলিবে; যে তৃষ্ণার চসমায় ঐ রূপকে বিশ্বের সমস্তের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতেছ সময় গেলেই সেই তৃষ্ণাকে সুদ্ধ একেবারে লোপ করিয়া দিবে। যেখানে মিথ্যার ফাঁদ এমন স্পষ্ট করিয়া পাতা, দরকার কি সেখানে বাহাদুরি করতে যাওয়া?

—কাহিনী

রমাঁ রলাঁ

—শ্রীকালিদাস নাগ।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে রলাঁর স্থান সম্বন্ধে বিচার বহু পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, কৃতজ্ঞ মানুষ তাঁহাকে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিয়া তাঁহার পদতলে অর্ঘ্য দান করিয়াছে। তাঁহার চিন্তার ধারাকে মানুষ অতুল সম্পদের মত বক্ষে তুলিয়া লইয়াছে। তাঁহার সৃষ্টির ভিতর দিয়া মানুষ জীবনকে নূতন করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলিবার নাই। তাঁহার জীবনের ইতিহাস এত উদার এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, সে সম্বন্ধেও অল্প কথায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে বলিয়া শেষ করা সম্ভবপর নয়। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ মানুষ তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে তাহা আপনি খুঁজিয়া পাইবে। যাহার ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি বা চিনিয়াছি, সেই অপূর্ব্ব গ্রন্থ—'জাঁ ক্রিস্তফ' এবং তাহার জন্ম-রহস্য লইয়া সংক্ষেপে কিছু আমরা বলিব এবং আমাদের বিশ্বাস, ইহার মধ্যেই কতক পরিমাণে রলাঁর ব্যক্তিগত বিশেষত্ব আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে।

১৮৬৬ সালে রমাঁ রলাঁ ফরাসী দেশের অন্তর্গত বারগ্যাণ্ডীর একটি পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা একজন অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণা রমণী ছিলেন। পিতা ছিলেন আমোদপ্রিয় ও উদার মতাবলম্বী। তাঁহার পিতামহ ছিলেন ফরাসী-বিপ্লবের সময়কার মানুষ। এবং তখনকার কোন কোন আন্দোলনে তিনি লিপ্ত ছিলেন। এই তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশ রমাঁ রলাঁর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ফরাসী-বিপ্লবের 'Liberty, Equality এবং Fraternity'—এই তিনটি মূলমন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ তাঁহার রচনায় বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। তিনি ফরাসী হইয়াও তাঁহার উপন্যাসের প্রধান নায়ক জাঁ ক্রিস্তফকে জার্ম্মান করিয়াছেন। তিনি ইহাদের বিশেষ ভক্তি

শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন তাঁহাদের অনেকেই বিদেশী। যেমন—বেটোভেন্, মাইকেল এঞ্জেলো, টল্‌স্টয় ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত ভাবে টল্‌স্টয়ের সহিত তিনি যখন পরিচিত হন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর হইবে। শিল্প সম্বন্ধে আংশিক মতভেদই উভয়ের মধ্যে পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটায় এবং ক্রমে তাহা নিবিড় স্নেহে ও শ্রদ্ধায় পরিণত করে। টলস্টয় What is Art নাম দিয়া যে পুস্তক প্রণয়ন করেন তাহার মধ্যে জগতের সমস্ত শিল্পের প্রতি তাঁহার বীতরাগ প্রকাশ পায়। শিল্প মানুষকে সৌখিন করে, অনর্থক প্রয়োজনের সৃষ্টি করে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি শিল্পকে 'অপ্রয়োজনীয়' প্রমাণ করিতে চান। তরুণ শিল্পী রলাঁ তাহাতে ব্যথা পান এবং তাঁহার প্রশ্ন ও সংশয় একটি চিঠিতে টলস্টয়ের নিকট প্রেরণ করেন। তখন তিনি সামান্য একজন বিদ্যালয়ের ছাত্র (১৮৮৬—১৮৮৯)।

টল্‌স্টয়-এর 'War and Peace' হইতে উপন্যাস সম্বন্ধে অনেকখানি জ্ঞান প্রথম তাঁহার মনে জন্মে। ইহা হইতেই বড় একটি আদর্শও তাঁহার মনে স্থান পায়। তিনি অনুভব করেন যে, নভেলই আধুনিক জীবনের মহাকাব্য।

১৮৮৯ হইতে ১৮৯১ পর্য্যন্ত রলাঁ রোমে ছিলেন। এবং এইখানে অবস্থান-কালে তিনি Malwida Von Meysenburg-এরসহিত পরিচিত হন। এই বিদুষী মহিলা জাতিতে জারমান এবং স্বদেশ হইতে বিতাড়িত। তিনি সেই সময়কার সমস্ত সমাজ-সংস্কারক, উদার এবং চিন্তাশীল মানুষের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ম্যাট্‌সিনি, ইব্‌সেন, নিট্‌শে, ভাগ্‌নার প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এই মহিলার অনেকখানি প্রভাব রলাঁর মধ্যে আসিয়া পড়ে। রলাঁর প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে Malwida Von Meysenburg যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি ছিলেন যেন রলাঁর আধ্যাত্মিক জননী।

এই সময় হইতেই রলাঁ History of the European Opera লিখিতে থাকেন। ১৮৯৫ সালে এই বইখানি প্রকাশিত হয়। এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডক্টর উপাধি লাভ করেন।

১৮৯০, ১০ই আগাষ্ট তারিখে তিনি Malwida-কে একটি চিঠিতে লেখেন :—

"তোমাকে কি বলেছি যে, নূতন রকমের একটা রচনার কাঠামো আমার মনে এসেছে? সে হবে একটা উপন্যাস বা কাব্য যার ভিত্তি হবে সঙ্গীত।

"সাধারণত উপন্যাসের উপাদান হয় ঘটনা। তয় সেই ঘটনা নানা মানুষের কাজের জোড়াতাড়া বা তালিকা যেমন ফরাসী-সাহিত্যে বরাবর চলে আসছে অথবা এক বা একাধিক জীবনের ঘটনাবলীর সংঘাত, যেমন টল্‌স্টয়ের উপন্যাসে দেখি। কিন্তু আমি Musical Romance বলতে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস বুঝি। তার মধ্যে শুধু ঘটনা সমাবেশ অথবা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ থাকলেই চলবে না। তার প্রাণ হচ্ছে একটি বিরাট ভাব, একটি নিবিড় অনুভূতি এবং সেই হবে তার মূল সুর, যা থেকে নানা রাগিনীর ঢেউ উঠবে, মিলিয়ে যাবে, কখনও আবার সংঘাতের মধ্য দিয়েই এক সুর-সঙ্গতির (harmony) সৃষ্টি করবে। এই বিরাট অনুভূতি একই কালে হবে সেই লেখার উপাদান এবং প্রাণ।' আপাতবিরোধ থাকলেও এ দুটি জিনিষ একই মহান অভিব্যক্তি ও শিল্পের সুসঙ্গত প্রকাশ।"

এই সুরেরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই ১৯১৬ সালের তাঁর একটি ডায়েরীর পাতায়—

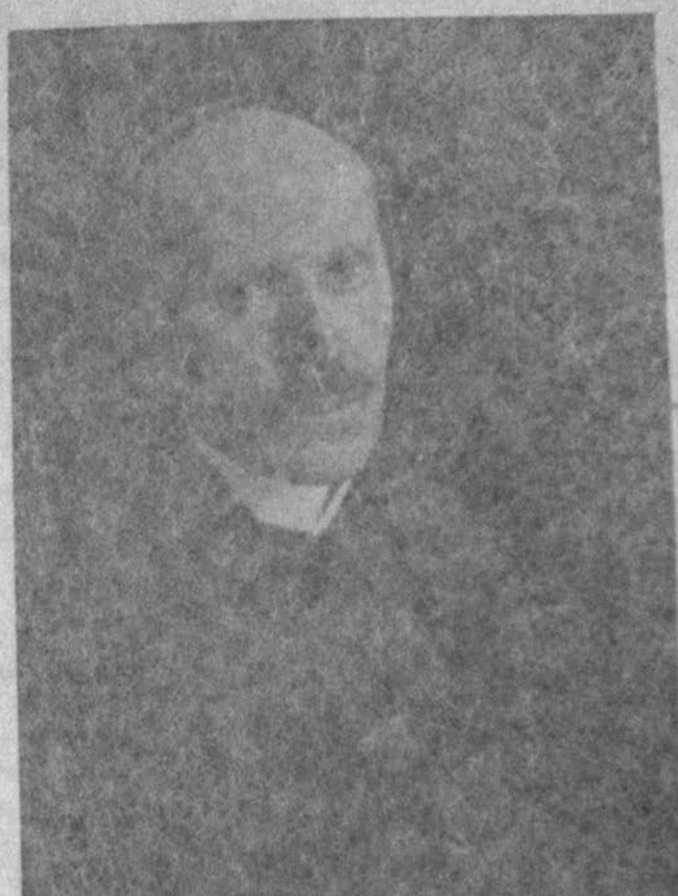
"রাগিনীর মধ্যে প্রত্যেক স্বরের (note) যেমন স্থান আছে, অথচ শুধু তার মধ্যেই তার আবদ্ধ থাকা চলে না, স্বর থেকে সুরে আসতে হয়, তেমনি জীবনের ইতিহাসে প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা থাকলেও পরিপূর্ণতার দিকে যে গতি তাই দিয়েই তার বিচার করতে হয়। এই গতির ছন্দ, নৃত্য ও রূপকে ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর যথার্থ কাজ।"

চল্লিশ বৎসর বয়সে যাহাকে সত্য বলিয়া তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও তাহার প্রতি রলাঁর শ্রদ্ধা অবিচলিত দেখিতে পাই।

জাঁ ক্রিস্‌তোফ-এর প্রথম খণ্ড L'Aube (ঊষসী) তিনি ১৮৯৮, ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে শেষ করেন। তাহার পর কিছুকাল তাঁহার জীবন অত্যন্ত অশান্তির ভিতর দিয়া কাটে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে না পারিলেও তাঁহার মনের মধ্যে জাঁ ক্রিস্‌তোফ পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। ১৯০৩, ২০শে মার্চ তারিখে তাঁহার ডায়েরীতে তিনি লিখিতেছেন, "আমি আজ থেকে নিয়ম ক'রে জাঁ ক্রিস্‌তোফ্‌ লিখতে আরম্ভ করলাম।" এবং ইহার পর তাঁহার লেখার আর বিরাম ঘটে নাই।

১৯১২, ৬ই ডিসেম্বর, সমগ্র উপন্যাসখানি শেষ করিয়া তাঁহার ডায়েরীতে লিখিতেছেন—

"যাত্রা শেষ" (জাঁ ক্রিস্‌তোফ-এর শেষ পর্ব)। ইহার প্রথম অংশের মূল সুর প্রেম। দ্বিতীয় অংশের বিশ্বাস, তৃতীয় অংশের শান্তি অথবা আনন্দ।



Romain Rolland

BANI PRESS, CALCUTTA

এই তিনটির সম্মিলনে হয়েছে একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি—আমি যাকে বলি Harmony."

বই লেখা হইল ; এবার ছাপার কথা। অনেক বড় বড় পুস্তক-বিক্রেতা বা প্রকাশককে তিনি হয় ত' ইহা দিতে পারিতেন, বিক্রয় এবং অর্থসমাগমও যে হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার নানান অভাব যে যথেষ্ট ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। দুঃখ দারিদ্র্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জাঁ ক্রিস্তোফ-এর ছত্রে ছত্রে তাহা অনুভব করিবেন কিন্তু ভিতরের সংগ্রামই তাহার কার্য্যের একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল না ; বাহিরে, অতি জীর্ণ শরীর ও ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া মরণের সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছেন। তাহার উপর আর্থিক অনটন! শুধু সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখিয়া সে যুগে বাঁচিয়া থাকা কঠিন ছিল। এমন অবস্থায় পড়িয়াও তিনি আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। লেখা, যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। লেখা শেষ হইলেও সুবিধার পায়ে সে আদর্শকে তিনি বলি দেন নাই। তাঁহার বন্ধু Charles Peguy তখন একটি দ্বৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাহার নাম Cahiers de le Quinzaine ; এই পত্রিকায় ১৯০৪, ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯১২, অক্টোবরের মধ্যে দশখণ্ডে জাঁ ক্রিস্তোফ্ প্রকাশিত হইল।

কিন্তু ফরাসী দেশে তাঁহার এতবড় সৃষ্টির মর্য্যাদা প্রথমে কেহ বুঝিল না! তিনি সম্মান পাইলেন সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ড এবং জারমানীতে।

জাঁ ক্রিস্তোফ্ একটি গ্রন্থমাত্র, ইহা শিল্প-জীবনের একটি অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। বিংশ শতাব্দীর এই অশান্ত বৈচিত্র্যহীন জীবনকে লইয়া এত বড় একখানি গদ্য মহাকাব্য যে লেখা হইতে পারে তাহা পূর্ব্বে কেহ ভাবে নাই।

১৯২১ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত এই মনীষীর সহিত বিশেষ কতকগুলিত কার্য্যের মধ্য দিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার পরমসৌভাগ্য ঘটে। এবং আমার গভীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার অমরকীর্ত্তি, জাঁ ক্রিস্তোফ্-কে আমার মাতৃ-ভাষায় রূপান্তরিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কাজটি কত কঠিন তাহা বেশ জানি, তবুও আমার জাতীয় সাহিত্য ইহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে ভাবিয়া অনেকদিন হইতে বেদনা পাইয়াছি। তাই আমার এ দুঃসাহস। একদিন তাঁহার বাসগৃহ Villa Olga-তে তাঁহার সহিত বসিয়া আছি, তিনি তাঁহার পুরাতন রচনা, পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মানুষের পত্রাবলী ইত্যাদি আমাকে দেখাইতেছেন ; সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম, "জাঁ ক্রিস্তোফ-এর অঙ্কুর কি ক'রে আপনার মনে বিকশিত হয়?"

তাঁহার গভীর দৃষ্টি আমার মুখের উপর রাখিয়া স্নিগ্ধ হাস্যে বলা বলিলেন, "যেমন ক'রে সমস্ত জিনিষ জন্ম নেয়। এ আমার সমস্ত প্রাণের সঙ্গেই বেড়ে উঠেছে।"

তাহার পর ধীরে ধীরে এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা তিনি বলিয়া গেলেন।

জোনভা হ্রদের উপর প্রশান্ত সূর্য্যাস্ত দেখিতে দেখিতে যে কথাগুলি শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহার একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিলাম।

গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে ত' দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিয়াছেন আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

—শ্রীবিলাস।

পথের আলো

—শ্রীবিজয় সেন-গুপ্ত।

পথের ধারে একটি আলো ; সাঝের বেলা মই কাঁধে-করা একজন লোক এসে তার অন্তরের সুপ্ত শিখাটিকে বাইরে প্রকাশ ক'রে দিয়ে গেছে তাকে পথের অন্ধকার দূর করতে হবে ব'লে। বহুদূরে এরি মতো আর একটি আলো জলচে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে দূরত্ব এত বেশী যে, একে অন্যকে চেন্‌বার সুযোগ কোনদিনই হ'ল না।

রাস্তা থেকে একটু দূরেই একটি বটগাছ তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে অনেকখানি স্থানের ওপর আপন অধিকার প্রচার করুচে। তলে তার বিষম অন্ধকার, পথের আলোর ক্ষুদ্র শিখার এমন ক্ষমতা নেই যে, সে আঁধার সে দূর করে। তাই সে ব্যর্থ প্রয়াস ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে তার সমস্ত আলোকটুকু যেন সরিয়ে নিয়েচে।

পথ প্রায় নীরব, কদাচিৎ কোনো গৃহাভিমুখী পথিক মসীমাখা সেই পথ ধ'রে সভয়ে এ-দিক ও-দিক দৃষ্টিক্ষেপ করতে করতে চ'লে যায়···

রাতের পর রাত এমনি যায়, পথের আলোর অপলক আঁখি চেয়েই থাকে না-জানি কোন্ দূরের পানে, আকাশের কোটি তারার সঙ্গে তার যে কি মৌনভাষণ চলে কে তা বল্‌বে ?

রাস্তার এ-ধারে সমুখে খানিকটা খালি জমির পর একখানি বাংলো-ধরণের বাড়ী। কেউ সেখানে নেই এখন, বিষম একটা শূন্যতা যেন কোন্ হতভাগ্যের হতাশ্বাসের মতো সেই বাড়ীখানাকে দখল ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছে। কোথাও একটি আলো জলে না ; কেবল পথের আলোর ম্লান আলোক অস্পষ্ট দেখা যায় বাড়ীর সমুখের একটা জীর্ণ উদ্যান। সবই প্রায় আ-গাছায় ভ'রে উঠেচে তার, কেবল দু-একটা পাম-গাছ কোন রকমে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে কোন্ অতীত সৌভাগ্যের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে।

পথের আলো একবার মিট্‌মিট্‌ ক'রে উঠ্‌ল, যেন কোন্‌ পুরাণো কথা তার মনে পড়্‌চে।

অনেকদিন আগে এই বাড়ীতে থাকৃত একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। তাদের দুজনের মধ্যে ভারী সম্প্রীতি ছিল, কেননা, দু'জনে প্রায় সমবয়সী। ছেলেটি এ-বাড়ীর কেউ ছিল না; এ-বাড়ীর গৃহিণীর কোন্‌ এক আত্মীয়ার ছেলে সে, মা মারা যাবার পর বাপ কোন খোঁজই রাখ্‌তেন না তার, তাই এ-বাড়ীর গৃহিণী তাকে আপনার কাছে এনে ছিলেন।

বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল এই মেয়েটি, কাজেই তার প্রতি স্নেহ-যত্নের অপর্য্যাপ্ত ধারা তাকে যে নিয়তই অভিষিক্ত করে' রাখ্‌ত, এটা খুবই সহজ কথা; আর তার সাথী বাপ-মা হারা ছেলেটিরও যে এ-বিষয়ে কোন অভাব ছিল, তা তার ব্যবহারে পরিচয় পাওয়া যায় নি কোন দিন।

এ বাড়ীর কাছে এখনো যেমন কোনো বাড়ী নেই, তখনো তেমনি ছিল না। বাড়ীর সাম্‌নে খানিকটা পথ সোজা বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় আপনার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেচে। ঠিক তার' ও-পারেই পথের' আলো দাঁড়িয়ে। বাড়ীর দুই পাশে গোটাকতক শীর্ণ আমগাছ যেন আপনার ফলহীনতায় চিরদিন ম্রিয়মান হয়ে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে আছে। আর পিছনের দিকে আছে লম্বা লম্বা ঘাসের ঝাড়; এত ঘন যে, এ-পার থেকে ও-পারের কিছু দেখা যায় না। ঠিক তার পরেই একটা ডোবা, যেখানে বর্ষাকাল ছাড়া আর কোনো সময়েই এমন জল থাকে না, যা তার পক্ষে কিছুমাত্র গৌরবের কারণ হতে পারে।

এ সবই ঠিক আগের মতোই আছে। নাই কেবল বাড়ী-খানির সেই শ্রী, আর সেই শ্রীবিধান যারা কর্‌ত, তারাই।

মেয়েটির নাম ছিল শোভনা, আর ছেলেটির নাম সুহৃৎ।

অন্য-অন্য বাড়ী থেকে এতখানি দূরে থাকার দরুণ তাদের আর অন্য সঙ্গী জোটে নি। সে-জন্যে যে তারা ক্ষুণ্ণ ছিল এমন মোটেই মনে হত না। তাদের দু'জনেরই মধ্যে তারা একটি রম্য জগতের সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিল। শোভনার বাবা-মা'ও মাঝে-মাঝে তাদের খেলায় যোগ দিতেন, তাঁদের হারাতে পারলে এদের আর আনন্দের সীমা থাকৃত না।

পথের আলো যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, সেই হাসি-ভরা দিনগুলি যেন মনে পড়্‌চে . . .

এখানকার এই নীরব স্থান তাদের দু'জনের কলহাস্যে সারাক্ষণ মুখরিত হ'য়ে

থাকৃত। সকাল থেকে সুরু ক'রে তাদের নব বিকশিত প্রাণের অফুরন্ত আনন্দের উৎস সারাদিন বেয়েই চলত। নিঝুম দুপুর বেলাতেও তারা ছুটিতে এসে ঐ বটতলায় ব'সে কত কি গল্প করত। এমন কি, কখনো কখনো তাদের তিরস্কারও সইতে হয়েছে এ জন্যে।

সন্ধ্যার পর যতক্ষণ না তারা ঘুমিয়ে পড়ত, ততক্ষণ তাদের চঞ্চলতার নিবৃত্তি ছিল না। তারা যেন ভরপূর প্রাণের নেশায় অধীর হয়ে ছুটে চলেছিল। . . .

দিনের বেলা অবশ্য পথের আলো উপস্থিত থাকৃতে পারৃত না, এ সকল তার শোনা কথা।

একদিনের কথা তার বেশ মনে আছে, তখন সবেমাত্র সে মই-কাঁধে-করা লোকটির জলন্ত কাঠির স্পর্শে জেগে উঠেচে, এমন সময় একটা কোলাহল তার কানে এল ঐ বাড়ী থেকে। শোভা আর সুকুৎ কোথায় গেছে এখনো বাড়ী ফেরে নি ; তাই বাড়ীময় এই ব্যস্ততা।

খানিক বাদে মেয়েটি তার অনন্ত অধীরতা নিয়ে মা'র গায়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বললে, কেমন লুকিয়েছিলুন !

মা তাদের দু'জনকেই তিরস্কার করলেন ; শোভনার বাবা বললেন, বক্‌চ কেন ? খেলা করৃতে করৃতে না হয় একটু দেরীই হয়েচে ; ফিরে তো এসেচে— ব'লে তিনি সুকুৎকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, আর এত দেরী কোরো না বাবা, তোমার মাসি-মা বড় রাগ করেন।

সুকুৎ বেচারী বোধ হয় একটু অপ্রস্তুতে পড়েছিল, সে নীরবে সম্মতি জানালে।

শোভনার মা বললেন, তুমিই এদের মাথা খেলে . . .

ঝড় থেমে গেল, পরদিন সকালে আবার যা তাই! তাদের উচ্ছল আনন্দের স্রোতকে কে রোধ করে ?

কিছুকাল কেটে গেল। ছেলেটি ইস্কুলে যেতে সুরু করলে। সন্ধ্যাবেলা সে আর শোভনা দুজনেই এক সঙ্গে পড়ৃত, শুন্‌তে পাওয়া যেত। তাদের কলরবও আগের চেয়ে অনেকটা সংযত হয়ে এসেছিল।

সঙ্গী তাদের নতুন কিন্তু জোটে নি আর কেউ। ছেলেটির সহপাঠীরা মাঝে মাঝে আসৃত, কিন্তু তাদের সঙ্গে সুকুৎ কোন দিনই ভালো ক'রে মিশতে পারে না ; তা ছাড়া তার বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে সব সহাধ্যায়ী তার জুটেছিল, তাদের সঙ্গে শোভনা বিশেষ মিশৃত না, তাই তাদের সাহচর্য্যে সুকুৎ তেমন আনন্দ পেত না।

শোভনা মাঝে-মাঝে তাকে জ্বালাতন করার উদ্দেশ্যে বল্‌ত, সুরুৎ-দা বড় লাজুক, কারো সঙ্গে মিশ্‌তে পারে না।

কিন্তু মনে মনে সে খুশীই হত; কেন না সুরুতের ইস্কুল যাওয়ার পর না-ফেরা পর্য্যন্ত তার সময় যেন আর কাটতে চাইত না।

নিজে সে পড়্‌ত বাবার কাছে আর সেলাই প্রভৃতি শিখ্‌ত মা'র কাছে। কেননা তাঁদের ধারণা ছিল, মেয়েদের ইস্কুলে পড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই, কেবল তাতে মেয়েরা বড় বড় কথা কইতে আর বাবুয়ানা করতে শেখে।

সন্ধ্যার পর বারান্দায় বসে যখন সকলে মিলে কথাবার্ত্তা হত, তাই থেকেই পথের আলো সারাদিনের খবর পেত, কতক তা বুঝ্‌ত অনুমানে . . .

(২)

তারপর একদিন সুরুৎ চলে গেল কলেজের পড়া পড়্‌তে। যাবার আগের দিন তারা দুজনে সাঁঝের ঘনায়মান অন্ধকারে বেড়িয়ে ফের্‌বার সময় ঐ বটগাছের কাছাকাছি এসে শোভনা বল্‌লে, সুরুৎ-দা, আমাদের ছেড়ে তোমার ভাল লাগ্‌বে, সেখানে থাক্‌তে ?

বল্‌তে বল্‌তেই তার চোখ দিয়ে জল ঝ'রে পড়্‌ল। সুরুৎ তাতে কি রকম বিব্রত হয়ে পড়েছিল, কেমন ক'রে শোভনার মাথায় হাত রেখে বলেছিল কত-কি সান্ত্বনার কথা, সব আলোর একে একে মনে পড়ে গেল . . .

তবে চলে যাওয়ার পরদিন শোভনা যখন তাদের দুজনে মিলে-পোঁতা চাঁপা গাছ থেকে গোটা দুই ফুল হাতে ক'রে কি মনে ক'রে সটান পথের আলোর কাছে এসে থমকে দাঁড়াল, সেদিনের কথা আলো কখনো ভুল্‌বে না। এক-একটি চাঁপার পাঁপড়ি ছিঁড়ে ফেল্‌তে লাগ্‌ল; যেন নিঃসঙ্গতার ভার তাকে অত্যন্ত পীড়িত ক'রে তুলেচে . . .

মা তাকে ডাক দিলেন, শোভনা, আর কতক্ষণ বাইরে থাক্‌বি, অন্ধকার হয়ে গেছে যে!

চোখ মুছে শোভনা বাড়ীর দিকে চলে গেল।

শোভনার অবসরকাল রমণীয় ক'রে তোল্‌বার সব চেয়ে মধুর উপায় তখন থেকে হল সুরুৎ-দা'র চিঠিগুলি। শোভনার বাবা-মাও সুরুৎকে আপনার ছেলের মতোই মানুষ করেছিলেন, কাজেই একদিন তার সংবাদ না পেলে তাঁরাও অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তেন বটে, কিন্তু শোভনার মতো অত কেউ নয়।

দিনগুলো তার পক্ষে সহসা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে উঠ্‌ল; কেমন ক'রে যে সে সময় কাটাবে ভেবে পেত না। মা তার মনের ভাব বোধকরি কতকটা আন্দাজ ক'রে বেশী ক'রে তাকে ঘরের কাজের মধ্যে টেনে নিলেন। তাঁরো সুবিধা হল এতে, কেননা, এই মেয়েটি ছাড়া আর তাঁকে সাহায্য কর্‌বার কেউ ছিল না।

এক-একদিন শোভনার বাবা-মা'র মধ্যে কথা হত, তার বিয়ে সম্বন্ধে। একটি-মাত্র সন্তান সে, কাজেই তাকে এমন ক'রে পর ক'রে দিতে কারোই যে বিশেষ উৎসাহ ছিল তা নয়, তবু কথাটা কথনো কথনো উঠে পড়্‌ত; কেননা শোভনার বয়স তখন সতেরোর কাছাকাছি।

সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে কথনো মেশে নি ব'লে বিবাহিত-জীবন সম্বন্ধে শোভনার ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল; মা'কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে লজ্জা আসে, অথচ এ-কথাটা মন থেকে সে দূর কর্‌তেও পারে না। একমাত্র যাকে জিজ্ঞাসা করা চল্‌তে পার্‌ত, সে কাছে নেই; কিন্তু শোভনার মনে হয়, হয় তো সুকুৎ-দা'কেও সে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌বে না। কেন, তা সে জানে না। . . .

মা তাকে বিয়ে সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে ইঙ্গিত কর্‌তেন, তাতে কিছুই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ত না, কেবল তাতে অনিশ্চয়তা বেড়ে উঠ্‌ত। তবু তারি মাঝে যেন একটা অনির্দ্দেশ্য মধুরতা জেগে থাকৃত, যার যথার্থ স্বরূপ বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌লেই সে হাতছাড়া হয়ে পালিয়ে যেত।

ছুটিতে সুকুৎ যখন বাড়ী এল, সে শোভনার বিয়ের কথা শুন্‌লে; কিন্তু মনে হাজারবার তোলাপাড়া ক'রেও শোভনা নিজে এ-সম্বন্ধে একটি কথাও সুকুৎ-দা'কে বল্‌তে পার্‌লে না।

একদিন সন্ধ্যার বৈঠকে যখন এই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তখন সুকুৎ বললে, তা বেশ তো . . .

তার কথায় মোটেই উৎসাহ ছিল না।

সুকুৎ-দা'র মুখে এই কথা শুনে শোভনার লজ্জা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল, সে মাথা নত ক'রে ব'সে রইল।

তার সেই লাজনত মুখখানি সুকুতের যেন নতুন ক'রে বড় ভালো লাগ্‌ল; শোভনা যে এত সুন্দর তা সে এই এতকালেও বুঝ্‌তে পারে নি। আজ হঠাৎ যেন সন্ত-জ্বালা টেবিল-ল্যাম্পের আলোকে কোন্ একটা যবনিকা সরে গিয়ে তার চোখে শোভনাকে অতি মনোরম সুষমামণ্ডিত ক'রে তুল্‌লে।

সেদিন রাতে ভোর হতে তখনো ঘণ্টা দুই বাকী, এমন সময়ে সুকুৎ ঘর থেকে

সমুখের রাস্তায় পায়চারি সুরু করলে ; নিশ্চয়ই রাতে তার ঘুম হয় নি। খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর পর যেন ক্লান্ত হ'য়ে পথের আলোর অনতিদূরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল আকাশের পানে চেয়ে।

তখন ভোরের দিকে পথের আলোর আয়ু শেষ হয়ে এসেছিল, তাই সে একটুখানি মিট্‌মিট্ করে দেখ্‌লে, সবটা তার দেখা হয়ে উঠল না ; কিন্তু সেদিন তারি কাছে যে একটা বিষম ট্রাজেডির অভিনয় হয়ে গেল, তা তার আজো মনে আছে . . .

পথের আলো একবার দপ্ দপ্ ক'রে উঠল।

ক্রমে সুকৃতের ছুটি ফুরিয়ে এল, সে আবার চ'লে গেল। শোভনার অনেক কথাই জিজ্ঞাসা কর্‌বার ছিল সুকৃৎ-দা'র কাছে, একটাও জিজ্ঞাসা করা হয়ে উঠ্‌ল না কিন্তু। যতবারই সে চেষ্টা করেচে, ততবারই সে অনুভব করেচে, তাদের মধ্যে কেমন ক'রে না জানি একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে গেছে, সে জন্যে আর আগের মতো মনের আদান-প্রদান চল্‌তে পারে না।

এবার চ'লে যাওয়ার পর সুকৃতের চিঠিগুলোও আর ঠিক নিয়মিতভাবে আস্‌ত না, যা আস্‌ত, তাও শোভনার মা'র নামে। এইটাই আরো তাদের মধ্যেকার দূরত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাকে ব্যথা দিত। একদিন সে খুব অভিমান দেখিয়ে সুকৃৎ-দা'র কাছে চিঠি লিখে পাঠালে ; তাতে সুকৃৎ তাকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিয়ে এবং পরিহাস ক'রে জবাব দিল বটে, কিন্তু তারপর থেকে আবার চিঠি আস্‌তে সুরু হ'ল তার মা'র নামে, তার' নামে নয়।

এদিকে তার বিয়ে সম্বন্ধে পাকাপাকি কথা হতে সুরু হল, এমন কি সময়ে সময়ে শোভনার মা'কে বল্‌তে শোনা যেত, আর তো দেরী করা চলে না। . . .

তবু যতদূর সম্ভব তাঁরা দেরী কর্‌ছিলেন।

কি একটা অব্যক্ত বেদনা শোভনার মনে থেকে-থেকে জেগে উঠ্‌ত, যার একমাত্র সাক্ষী আছে এই পথের আলো। সহসা সে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল। বাপ-মা হয় তো ভব্‌লেন, এ ভালোই ; কিন্তু দীর্ঘ দাঁড়ের বেলা তার কাছে যে ক্রমে কি বেদনাদায়ক হয়ে উঠ্‌ল, তা আলোই জানে . . .

বিয়ে তার হয়ে গেল। বিয়ের সময় সুকৃত কলেজ-কামাই ক'রে চ'লে এল, আবার চ'লে গেল বিয়ের শেষে।

সেই থেকে এ-বাড়ীর তাণ্ডব সুরু হল ; পথের আলো তখন থেকে সমস্ত ব্যাপারের নির্ব্বাক সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শোভনা যাওয়ার পর তার বাবা-মা'র সময় আর কাটতে চাইত না; এতদিন তাঁরা আপনার ঘরের ব্যাপারের মধ্যে এমন ক'রে নিজেদের আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন যে, বাইরের দিকে তাকাবার কোনো প্রয়োজনই বোধ হয় নি। কিন্তু যাদের নিয়ে তাঁরা এমন ক'রে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছিলেন, তাদের যখন কেউই কাছে রইল না, তখন বিষম শূন্যতা একটা বোঝার মতো তাঁদের উপর চেপে বস্‌ল।

পরীক্ষার পর সুহৃৎ বাড়ী এল; কিন্তু বাড়ীর যে আকর্ষণ তাকে এখানকার বন্ধু-মহলে অমিশুকতার অখ্যাতি দিয়েছিল, সে আকর্ষণ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। যে গৃহে এককালে তার সমস্ত আনন্দ কেন্দ্রীভূত ছিল, সেখানে আর আনন্দের সন্ধানই মেলে না যে!

একদিন সে শোভনার মা'কে বল্‌লে, আমার আর এখানে ভালো লাগ্‌চে না মাসি-মা, শোভনাকে শ্বশুর-বাড়ী থেকে পাঠাবে না?

এই কথাটা অনেকদিন থেকেই তার মনে জাগ্‌ছিল, কিন্তু আসল ভালো-না-লাগার কারণ সে এতদিন কিছুতেই মুখ ফুটে বল্‌তে পারে নি। ব'লে ফেলে সে ভারী আরাম বোধ কর্‌লে।

মাসি-মা বললেন, না বাবা, তারা বলেচে এখন পাঠাবে না। তা তুই এখুনি যাবি কি? পরীক্ষার খাটুনিতে তোর শরীরে কি আর আছে কিছু?

একজনের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্নেহ-কোমল হৃদয় যেন আর এক স্নেহাস্পদের উপর নিজের সমস্ত রুদ্ধ স্নেহধারা বর্ষণ ক'রে তৃপ্তি পেতে চাইছিল।

সুহৃৎ বুঝ্‌লে; তাই সে র'য়ে গেল।

এই রকম ভাবে দিন কাটানো যখন ক্রমে সহজ হয়ে আস্‌ছিল, তখন সেই সদ্য-স্থাপিত শৃঙ্খলা সমস্ত বিপর্য্যস্ত ক'রে দিলে একখানা টেলিগ্রাম এসে। শোভনার অসুখ, খুব বেশী . . .

শোভনার বাবা অতিমাত্র ব্যাকুল হয়ে মেয়েকে দেখ্‌তে চ'লে গেলেন; সুহৃৎকে ব'লে গেলেন, তোমার মাসি-মাকে দেখো বাবা! আমি গিয়েই টেলিগ্রাম কর্‌ব কেমন থাকে . . .

টেলিগ্রাম তাঁকে করতে হল না; পরের দিনই তিনি ফিরে এলেন। সব শেষ হয়ে গেছে।

সেই দিন রাত দুপুরে সুহৃৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এল; পাগলের মতো তার চাহনি। খানিকক্ষণ সে শূন্য-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পথের দিকে। পথের আলো

যতখানি সম্ভব তার আলোক বিস্তার ক'রে দেখ্‌লে, সে খানিকবাদে বাড়ীর পিছন দিগের দীর্ঘ ঘাসবনের অন্তরালে অন্ধকারে কোথায় চলে গেল . . .

তার পরদিন শোভনার বাবা-মাও বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন, আর ফিরেন নি।

কতদিন হয়ে গেছে। এখন বাড়ীর এই অবস্থা।

পথের আলো কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ল,—হাওয়ায় ?

— —

...সব জিনিষ পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টি ভিক্ষা নহেন, যদি তাঁকে পাই ত' আমিই তাঁকে পাইব নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।

—শ্রীবিলাস।

নিবেদন

আগামী ফাল্গুন সংখ্যা হইতে কল্লোলে মনীষী রমঁ্যা রলাঁর সুপ্রসিদ্ধ "জাঁ ক্রিস্তোফ" সমগ্র উপন্যাসখানি শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ ও শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগ মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে মূল ফরাসী হইতে অনূদিত হইয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

ইংরাজী ১৯২১ হইতে ১৯২৩ সন পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় পৃথিবীর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল সাধক, ফরাসী ঔপন্যাসিক ও সঙ্গীত-শিল্প-সমালোচক মঁসিও রলাঁ্যার সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কাটাইয়াছেন।

১৯২২ সনে রমঁ্যা রলাঁ্যা, ইংলণ্ডের বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জারমানীর হারমন্ হেসে প্রভৃতির মিলনস্থান সুইটজারল্যাণ্ড-এর লুগানো কংগ্রেস-এ কালিদাস নাগ India and Internationalism সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই সূত্রে তিনি মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লেখ করিয়া ছিলেন তাহাতেই রলাঁ প্রভৃতির ভারতবর্ষ ও গান্ধী সম্বন্ধে আরও বিশেষ ভাবে জানিবার আগ্রহ হয়। এই সময় হইতেই রলাঁ মহাশয়, 'মহাত্মা গান্ধী' পুস্তকখানির প্রণয়ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং এই পুস্তকের ভূমিকা-লিপিতে কালিদাস নাগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'He has guided my faultering steps in the forest of Hindoo thoughts.'

তাহার পর ১৯২৩ সনে ইনি Prague কংগ্রেসে আরও কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স-এ যাতায়াত ও রলাঁর সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবার সঙ্গে সঙ্গে রলাঁর একমাত্র বন্ধু ও সহোদরা মাদাম রলাঁ বাংলাভাষা শিখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হন। বাংলা শিক্ষা ও বাংলার সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার মধ্য দিয়া কোন বাংলা রচনার ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হইতে পারে কি না এ বিষয়ে রলাঁ ও তাঁহার ভগিনী চিন্তা করিতে থাকেন ও কালিদাস নাগকে এ বিষয়ে চেষ্টা

করিয়া দেখিতে অনুরোধ করেন। তাহারই ফলে ফরাসীর আধুনিক বিখ্যাত কবি ও রঁলার বন্ধু—P. Jouve মহাশয়ের সহিত একযোগে ইনি, রবীন্দ্রনাথের "বলাকা" ফরাসীভাষার অনুবাদ করিয়া 'Cygne' নামে প্রকাশিত করেন।

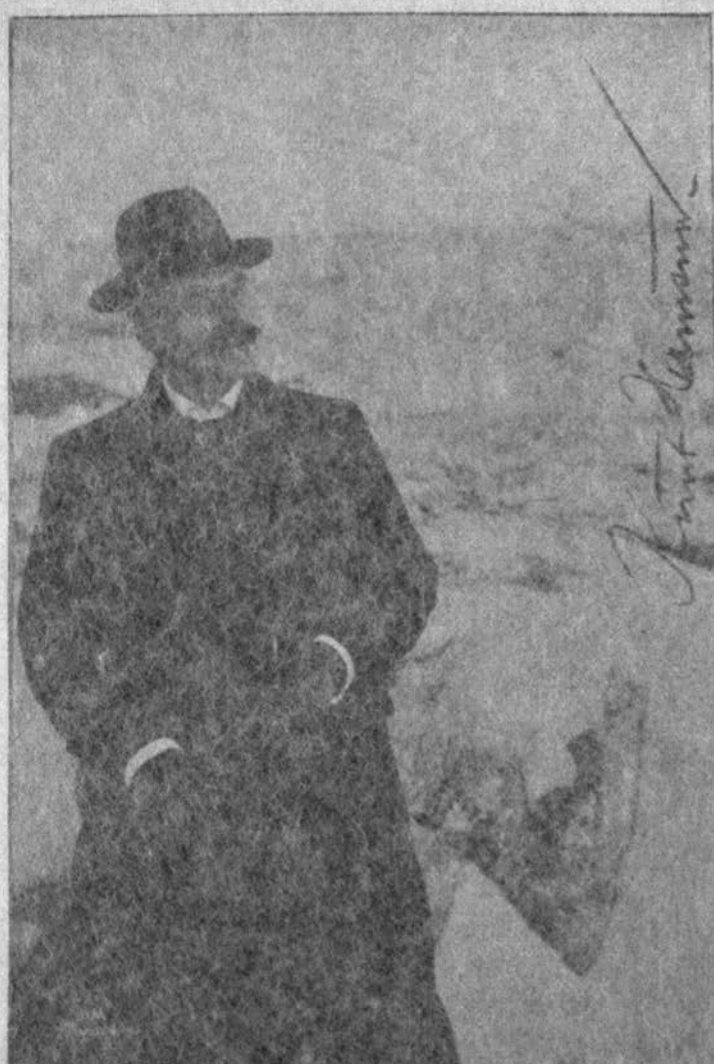
এই কয় বৎসরের বন্ধুত্ব ও সাহচর্য্যের ভিতর দিয়া রঁলা ও কালিদাসবাবুর মধ্যে যে আত্মীয়তার সৃষ্টি হয় তাহার ফলে তিনি তাঁহার রচিত সমগ্র রচনার বঙ্গানুবাদ করিবার অনুমতি ও স্বত্ব কালিদাস নাগকে দান করিয়াছেন।

'জঁা ক্রিস্তোফ্' দশ খণ্ডে সমাপ্ত। বংলা-ভাষায় উপন্যাস বলিলে সাধারণে যাহা বুঝে এই উপন্যাসখানি সেই জাতীয় নয়। সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল ধরিয়া রঁলা এই গ্রন্থখানি লইয়া অবিশ্রান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন। গতানুগতিক ভাবে প্লট বজায় রাখিয়া চলিবার প্রয়াস তিনি করেন নাই। 'মানুষ' এবং তাহার পারিপার্শ্বিক 'অবস্থাকে' যে-চোখ দিয়া দেখিয়াছেন, দুঃখের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা, দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি, অত্যাচারের নির্ভীক প্রতিবাদ এবং জাতীয় সমস্ত গোঁড়ামীর উপর যে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন, তাহা জগতের অন্য কোন সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। ভাবার খেলা, চমকপ্রদ বা রোমহর্ষণ ঘটনাবলীর সমাবেশ প্রাকৃতির ভিতর দিয়া পাঠকের মনে বিস্ময় আনিয়া দিবার প্রয়াস ইহাতে নাই। পাঠক আপনি মুগ্ধ হয় তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া। তাঁহার দৃষ্টির ভিতর দিয়া মানুষ নূতন করিয়া জগৎকে দেখিতে শিখে।

উপন্যাসখানি ফরাসী ভাষায় লিখিত, ইহার অনুবাদে হয় ত' অনেক ত্রুটি থাকিয়া যাইবে, কারণ দুই ভাষার প্রকাশ-ভঙ্গিমা সব সময় এক হয় না; তবে মনে হয়, এই অনুবাদে মূল গ্রন্থের মর্য্যাদা নষ্ট হইবে না, কারণ ডাঃ কালিদাস নাগ ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত, এবং যাহাতে এই প্রয়াস সফল হয় তাহার জন্য তিনি ও শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগ মহাশয় বিশেষ ভাবে যত্ন লইতেছেন।

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ কর্ত্তৃক ১০।২ পটুয়াটোলা লেন হইতে প্রকাশিত ও শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা "বাণীপ্রেস" ৩৩-এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।



কল্লোল

অনাগত কবি

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

ওই যেথা তারায় তারায় কাঁপে জ্যোতির আনন্দ,
কাননের দীর্ঘশ্বাসে আন্দোলিয়া ওঠে যূথ-মল্লিকা সুগন্ধ,
ব্রীড়ায় বঙ্কিম অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত চম্পার কম্পনে,
মধু-রসমদিরামুগ্ধ চকোরীর মঞ্জুল গুঞ্জনে,
শ্রাবণের বৃষ্টি-ছন্দ-মুখরিত
শ্যামস্নিগ্ধ আনন্দ-কম্পিত
রাত্রির হৃদয়ে,
কিম্বা কোন্ মুগ্ধ শুভ্র সুকোমল জ্যোৎস্নার বিস্ময়ে,
প্রচ্ছন্ন ধূসর-ব্যথা গোধূলি-বেলায়,
বিশ্রব্ধ বিমুগ্ধ রাত্রি-প্রভাত-খেলায়,
পুষ্পাঞ্জন সৌম্য কল্পনা-নিবিড় অন্ধকারে,
হেমন্ত-প্রদোষে কিম্বা নবঘন-আন্দোলিত লুণ্ঠিত আষাঢ়ে,—
কোথা তুমি ওগো কবি
কল্পনা-গরবী,

অনাগত যুগের সম্রাট,
হে বিরাট,
নিঃশব্দ নিষ্কম্প ক্লান্ত অন্ধকার-তলে,
সৃষ্টির তরঙ্গ-মগ্ন-নৃত্য-কল্লোলে,—
কোথা তুমি লুক্কায়িত অমর সন্ন্যাসী,
আনন্দ-বিলাসী !—
নত-চক্ষু নিবিড় ব্যথায় নম্র সন্ধ্যা-ম্লানিমায়,
কিম্বা কোন্ যৌবন-চঞ্চল-তপ্ত পূর্ণ পূর্ণিমায়,
বিবর্ণ দিগন্ত-প্রান্তে, কুজ্ঝটিকা-লীন ক্লান্ত নভে,
কিম্বা কোন সপ্তাঙ্কুর অর্দ্ধস্ফুট পুষ্পের সৌরভে,
বন্ধহীন নিরুদ্দেশ মেঘের যাত্রায়,
দুর্দ্দম ভৈরব ঝটিকায়,
কিম্বা কোন কলকণ্ঠ তটিনীর লোলনৃত্য-ভঙ্গিম সজ্জায়,
শীত-বিজড়তায়,—
কোথা তুমি মহাকাল-স্রোতের পশ্চাতে
মৌনব্রতে
একমনে করিছ ধেয়ান,
বাজিতেছে বীণা;
বিস্মিত কোন্ ঋষি পথ-চিহ্নহীন
খুঁজিছেন, শুনে তব জ্যোতি-শতদলের গান ?
মোদের এ অন্ধকার ধরণীর ধূলির প্রাঙ্গনে,
কখন্ গোপনে
নীরব নিশার মত একান্ত নিভৃতে,
কেমনে আসিবে তুমি কি গান গাহিতে
কত দিনে ?
নীলাভ-নিবিড় নব-শেফালিকা-সুরভি আশ্বিনে,
শ্রাবণ-মুখরিত-ঘোর ঘন বরষায়,
কিম্বা কোন্ পুষ্পিত ফাল্গুন-উৎসবে ?

হায়,
ধরিত্রীর দুই চোখে ব্যথা মুরছায়
ক্লান্ত বেদনায়
যুগে যুগে চেয়ে আছে তব প্রতীক্ষায়,
কখন্ বাজিবে তব চরণের ধ্বনি,
আনিবে অমৃত-সঞ্জীবনী !

হে কবি, কোথায় আসি
কোন্ সুরে বাজাইবে বাঁশী,
কোন্ নব ছন্দের আঘাতে,
কি ভৈরব সুরের আহ্লাদে
খুলি দিবে ধরিত্রীর বদ্ধ দ্বার, আবদ্ধ অর্গল,
স্নেহের সান্ত্বনা দিয়া মুছাইবে তপ্ত অশ্রুজল !
অশুচি কলঙ্ক-কণ্টকিত ধরিত্রীর বুকে
আবার জাগিবে সুখে
মৃত্যুহীন অপরূপ উদ্দাম যৌবন ;
তার দুই রিক্ত হস্তে পরাইবে কল্যাণ কঙ্কন,
উজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দু আঁকি দিবে সীমন্ত-সীমায়,
ওষ্ঠাধর উল্লসিবে রাগ-রক্তিমায়,
চুম্বনে মুছিয়া লবে শ্রম-দগ্ধ ললাটের রেখা,
হাসিতে উদ্ভাসি তুলি' আনন্দ-চপল শশী-লেখা,
নীলাম্বুধি-উর্ম্মি-জালে গড়িবে মেখলা,
নবস্ফুটশস্যশ্যামাঞ্চলা,
পরিবে মহিমালক্ষ্মী শিরে শত সূর্য্যের মুকুট,
পূর্ণ করি নক্ষত্র-কুসুমে শুভ্র করপুট !
কোন্ শুচি বরমাল্যখানি
উপহার দিবে তার কণ্ঠতটতলে,
সাজাইয়া কোন্ শতদলে
তাহা নাহি জানি ।

এই ম্লান দুঃখী ধরিত্রীরে
হতভাগিনীরে
মুঞ্জরিবে কোন্ গানে ওহে কবি নবপ্রিয়,
দীর্ঘ-নিশ্বাসত ক্লান্ত ধরিত্রীর হিয়া
বিগত-তিমির-বক্ষা প্রভাতের মত
হবে প্রস্ফুটিত ?

ছিন্নবাসা এ দীনারে
কোন্ নব সজ্জা-উপহারে
সম্রাজ্ঞী করিবে তুমি কোন্ নব মন্ত্র-গুঞ্জরণে ?
তোমার মৃদঙ্গ-ছন্দে নিস্কম্প সুরের স্ফুরণে,
পৃথিবীর যত দুঃখ যত দৈন্য গ্লানি
মৃত্যু অপমানি'
গোলবৃন্ত জীর্ণ পত্রসম যাবে উড়ে
তব ঝঞ্ঝা-ঝঙ্কারিত তীব্র সুরে সুরে !
দেখা আসি কোন্ মহামিলনের গানে
উল্লাস বিয়োগাকুল ফুটাইবে ধরণীর প্রাণে,
তাহার সকল ক্ষতে বুলাবে প্রলেপ,
সস্নেহে মুছিয়া লবে বিক্ষোভ আক্ষেপ,
ঘুচাবে সকল ক্ষুধা তার !
তাই বারবার
দুই দীর্ঘ নেত্রপাতে আঁকি
একখানি অশ্রুসিক্ত মলিন প্রতীক্ষা রহে চাহি
সুদূর আকাশে,
দীর্ঘশ্বাসে !

হে কবি, আসিবে কবে,
মোরা এই তপ্ত ধূলি সিক্ত করি অশ্রু বাঁধিয়াছে
নিরালায়,
পাছে এ ধূলার কাঁটায়
তোমার চরণ-পদ্মে ব্যথা দিয়ে যায় !

কণ্টকিত এ-পথের 'পরে
সাজায়ে রেখেছি স্তরে স্তরে
মোদের এ ব্যর্থ চিত্তগুলি,
তুমি আস দেরী করে' যদি
হে দরদী,
তবে ঝরে' পড়ে' হয়ে যাবে ধূলি,
বিক্ষত বিদগ্ধ প্রাণে নামিবে যে মরণ-গোধূলি!
তুমি যবে আসিবে হেথায়
মিলন-মেলায়,
দুটি হাতে নিয়ো তুলি
তোমার পায়ের কাছে যেটুকু রয়েছে ধূলি;
মোদেরে কি পারিবে চিনিতে তার মাঝে?
যে-অশ্রুত হাহাকার বাজে
পঞ্জরের ঝঞ্ঝা-রাগিণীতে,
তাহারে কি পাইবে শুনিতে?
দেখিতে পাইবে কি গো মোর অশ্রুজ
পাষাণ হইয়া আছে সুকঠিন,
সব আয়োজন দুর্ব্বল নিষ্ফল
ধূলাতে বিলীন!
বুঝিবে কি মোদের যন্ত্রণা,
জীবনের বিফল সাধনা,
শুনিবে কি সকরুণ দীর্ঘশ্বাস,
পিপাসা-পঙ্কিল যত আশ?

তবু একবার দুটি ফোঁটা আঁখি-নীরে
ধন্য করো কলঙ্কী-ধূলিরে,
তার পরে ফেলে দিও;
বাজাইও
নববীণাতন্ত্রীলীন নবমন্ত্রগান
হে কবি হে মহীয়ান্,

আমাদেরে যদি কভু পড়ে মনে,
একবিন্দু অশ্রু শুধু এনো ডাকি'
থাকি' থাকি'
নয়নের কোণে ;—
এই শুধু সাধ,
হে সন্তান, তব তরে এই আশীর্বাদ

হানি হানি সন্ধ্যা-বাণী
দিনের বাণী সব ঘুচাই।

—কবি-শ্রমিক।

"সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে—"

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে
আপনাতে আপনি মগন,
আনন্দের স্পন্দহীন নিশ্চল গগনে ;
তাই বুঝি সৃজিলে আমারে
কাঁদিবার লাগি।
কাঁদিবার সাধ,
তাই তুমি মোর সাথে ছোট হবে, লুটাবে ধুলায়,
আঘাত করিবে আপনারে,—মূঢ় অবিশ্বাসে
আবার ভাসিবে আঁখিনীরে !

সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে,—
শুধু সেথা ছিল না ক' আঁখিজল,
বিরহ বেদনা আর উষ্ণদীর্ঘশ্বাস।
আমার মাঝারে তাই
এমন করিয়া তুমি কাঁদ ;
কাঁদ এত রূপে !
অকারণে কাঁদ একবার
জীবনের তীরে নামি
চিহ্নহীন বালুচরে ;
পুনঃ কাঁদ প্রেয়সীর, প্রেয়সীর লাগি
বার বার দুরন্ত যৌবনে ;
তার পর সমস্ত জীবন ধরি'
সংশয়ে, দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে,

আঘাতে ও হতাশায়
কাঁদ এত রূপে।
নিখিল ভুবন ভরি' খেলিতেছ কাঁদিবার খেলা
অনাদি অতীত কাল ধরি'।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি
সে খেলায় মাতি
কোথায় নেমেছ তুমি মোর সাথে,
জঘন্য পাপের মাঝে, বীভৎস ক্ষুধায়,
অসহ্য গ্লানির পঙ্কে, পূতি-গন্ধভরা,
অচিন্ত্য কলুষে হীনতায়।

মোর সাথে পাপী হলে
বুকে তুলে নিলে মোর তাপ
মোর সাথে দুর্বহ ব্যথার বোঝা স্কন্ধে নিলে তুলে,
পিশাচ সেজেছ মোর সাথে,
কুটিল, নির্মম, ক্রূর, নৃশংস, নিষ্ঠুর;
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, আর বসে রই
স্তব্ধ হয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে—
তোমার কান্নার খেলা অপরূপ, অদ্ভুত, কৌশল, বুদ্ধির অতীত।
এক কান্না তরঙ্গেতে; তার মাঝে তুমি কাঁদ
এই শুধু জানি——
আর সব আপনারে ভাবি।

—— -

যৌবন-বিদায়

—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ।

ওরে মোর চঞ্চল যৌবন,
মোর কাছে কেঁদে তোর কি হইবে বল ?
আমি তোরে কিছু দিই নাই,
দিতে কিছু পারি নাই সত্য তাহা।
সাজে, ওরে সাজে তোর
মোর 'পরে অভিমান করা ;
বারে বারে পরাজয়-লিপি
চোখের সমুখে ধরি মোরে করা অপমান।
কিছু নাহি বলিবার মোর ?
আছে, বুঝি আছে,
তুই যদি ছেড়ে যেতে চাস্
শেষ দিনে কিছু বলিবার।
এ জীবনে তারও যদি অবসর
নাহি হয়, ওরে মোর শুষ্ক আশা,
মোরে ফেলি চ'লে যাস্ তুই,
এক ফোঁটা অশ্রু তোরে ডাকিবে না পিছে।

এই চোখ, এই মুখ এই রূপ হেরি
যারা এল তৃষাতুর হ'য়ে,
যারা এল মোর স্বর মোর বাণী শুনি
ভিক্ষা-ভাণ্ড হাতে ; যারা এল
সেবিকা হইয়া পরিপূর্ণ মমতায়

প্রসাদ যাচিতে ;
যারা এল নয়নের বাণে
আমারে করিয়া পঙ্গু,
বুকে চাপি' উষ্ণ তপ্ত রক্ত মোর
করিবারে পান,
এল যারা বন্ধু সাজি'
ধরিত্রীর সব বাধা
হাসি মুখে স'বে বলি
আমারে পাইতে কাছে
জন্ম হতে জন্মান্তরে,
তার পর চলে গেল
শুভ্র উষাকালে
মোর সঙ্গ ছাড়ি
অন্যে অন্যে লালসার টানে ;
মোর ভগবান,
দিল সবে সবকিছু
যাহা পূর্ণ করি, হে যৌবন,
তোরে করি সব-হারা।
তোরে করি আপন নিঃস্ব,
বিধাতা বাঁধিল দিতে
বিন্দু বিন্দু রক্তটুকু,
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি ছিঁড়ি মোর
পিণ্ড পিণ্ড মাংস দিল
লালসার মুখে ;
রূপ দিল, স্বাস্থ্য দিল,
সুধার সুষমা সব দিল
লোভীর মিটাতে ক্ষুধা।
তোরে রাখি গেল অমরার দিকে,
দিয়ে মোরে নির্ভীক সাধনা !
পুরস্কার কলঙ্ক-তিলক !

তবু তোর আশা মিটিল না !
চঞ্চলি উঠিতে চাস্ অকূলের বায়ে,
দু'বাহু বাড়ায়ে, মরু-তৃষ্ণা কণ্ঠে ধরি'
আজও তোর মৃত্যু-হানা ডাক্
পিছনের পথ চাহি ?—
আমি বলি নাহি নাহি,
কোনো তাপ, কোনো শোক তোর।
আপনারে করিয়া বঞ্চিত
কতজনে দিলি ঠাঁই,
তোর মৌনতায়
কত মিথ্যা সত্য হয়ে গেল,
কত ভুল গেল ভুলে,
কত দুঃখী হোল সুখী,
কত মৃত্যুমুখী
নূতন জীবন পেল,
দিল কত অচিন্ত্য জীবন.
হে যৌবন, তবু তোর
সব বৃথা গেল ?
অমৃতের অধিকারী হয়ে
তবু চাস্ মৃত্যুরে করিতে পান ?

ঋতুর প্রলয় হতে ঐ আসে
বসন্ত আবার ; বাতাসে কুসুমে
ধরণীর অঙ্গভঙ্গী ভরি'
উঠিতেছে যৌবনের গান,
কত হিয়া তারি পথ চাহি'
কণ্টকের রুক্ষ পার্শ্বে রবে বসি
অঞ্চল পাতিয়া, যদি পায়
হারান যৌবন, আবার ভরিয়া লবে
জীবনের জয় ডাকখানি !

এই বেলা যা রে তুই অনাদৃত
অভিশপ্ত যৌবন আমার
আমার মন্দির ছাড়ি,
এই বেলা শুভ অবসর!
রজনীগন্ধার বুকে লুকাইয়া থাক্,
বকুলের আকুল সুগন্ধে
আপনারে আবরিয়া রাখ্,
নহে, ভ্রমি উতলা বাতাসে
কোনো মতে থাক্ বাঁচি।
যেই দিন বাতাসের দোলা ছাড়ি
বসন্ত নামিবে ধরণীর
তৃণহীন বুক-ফাটা
মাটির উপরে, সেই দিন
অকালের আড়ালে লুকায়ে
নব বসন্তের,
মানুষের ব্যর্থতার মাঝে
নিস্ ঠাঁই, সে লবে টানিয়া বুকে,
অতৃপ্ত জীবন তার যৌবনের
স্পর্শ-শিহরণে নাচিয়া উঠিবে
শেষ বার। ভুলে-যাওয়া সুখ তার
নয়নের বাতায়ন-পথে
আনন্দের অশ্রুপাত হয়ে
বিদায় লইতে চাবে,
আমি মোর সর্বস্ব
যেমন পারি
ধ'রে লয়ে যাব সেই বাঁধ,
হে মোর যৌবন, তুই যদি
আপন তাদের, যারা তোরে
কহিবে আপন।
নহে ইহা বিদায়ের অভিশাপ,

নহে তোরে বাঁধিয়া রাখিতে ছল,
ফাল্গুনের আগুন-খেলায়
এ যে তোর বিদায়-উৎসব !

আজ আমি সত্য মুক্ত
বিপাশ বিক্রম,
জননীর প্রসব-বেদনা
আজি হোল শেষ !
আজ, মাতা মুক্ত
সুত মুক্ত, পিতা মুক্ত
সর্ব্ব ভয় হতে ;
আজ তুই গৃহহারা
আমি গৃহবাসী !

সমুখে আলোকে খুঁজে যতটুকু পাই,
পিছনে ছায়ায়
অনন্ত ব্যাপিনী তব মুমন্ত মায়ায়
দ্বিগুণ হারাই।

—অন্ধকার।

> "সৃষ্টির প্রথম প্রাতে বিধাতার মনে
> যে কথাটি ছিল সংগোপনে"
>
> —শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

এস নারী,
আজ তব কানে কানে,
কই কথা প্রাণে প্রাণে;—
সৃজন-রহস্য-কথা
—নিখিলের আদিম বারতা।
যৌবনের মায়ালোকে,
অনাদি ক্ষুধার সেই অনির্বাণ জ্বালা নিয়ে চোখে,
এস নারী, আরো কাছে এস,
বুকে বুক রেখে শুধু ক্ষণিকের তরে মোহভরে, ভালবেসো।
চুপে চুপে যে কথাটি
শিখায়েছে নারী
প্রতি নরস্তরে,
ইঙ্গিতে যে কথাটিরে প্রকাশিয়া গেল সুরে সুরে
আলোকের অস্ফুট সুরে,
সৃষ্টির প্রথম প্রাতে বিধাতার মনে
যে কথাটি ছিল সংগোপনে,
সে গোপন কথাটি করিব প্রকাশ,
এস নারী, এস আজ যৌবনের মহিমা-প্রকাশ।

মুখে নয়, শুধু বুকে বুক দিয়ে নয়,
ব্যঞ্জনা-ব্যাকুল সর্ব্ব অঙ্গ মোর, মন প্রাণ দিয়ে
শিখাইব সে রহস্য প্রিয়ে!
জানিবার উগ্র আগ্রহে
তোমার ও-দেহের মাঝে শোণিতের বন্যাবেগ বহে!
যৌবন-সুষমা তব, এ যে সেই বাসনার ভাষা!
এরি মাঝে জেগে আছে নিখিলের অনির্ব্বাণ আশা!
এই তব হেঁয়ালি ভাষায়
সৃষ্টির কামনাখানি নবরূপে ফুটে পুনরায়।
ভয়ঙ্কর সুখে,
এস নারী, ওই তব তনুলতা নিষ্পেষিয়া বুকে
কই মোর রহস্য-বারতা;
জন্মে জন্মে এ দেহের প্রতি অণু-পরমাণু মাঝে বহিয়া এনেছি যেই কথা,
সে বাণী সুগন্ধ করি অগণন ফাল্গুনের সুরভি নিশ্বাসে,
রঞ্জিয়া বিচিত্রবর্ণে, সিক্ত করি' সঙ্গীতের আনন্দনির্য্যাসে
রূপে, রসে অপরূপ করি'
কই ধীরে,—দেহমন, এ জীবন,—উঠুক শিহরি!
হে প্রিয়া আমার,—
তবু যদি আরো কিছু রয়ে যায় বাকি,
অসমাপ্ত রয় কিছু থাকি,
হাস্যে তব, লাস্যে তব, ছলনায়, কৌশলে, কলায়,
সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজালে মুগ্ধ করি' দুলাইয়া আবেগ-দোলায়
ধাঁধিয়া কটাক্ষপাতে, বাঁধিয়া অক্লেশ মায়াফাঁসে,
সমস্ত চেতনা হরি' মগ্ন করি' আলিঙ্গনে, কুহক-বিলাসে
উদভ্রান্ত করিয়া মোরে করিয়া বিহ্বল,
লুটে নিও সকল সম্বল!

ফাল্‌গুনের গান

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

ফাল্গুন এসেছে রে, উল্লাস হিল্লোল,
চমকের ঝলকের পুলকের হিন্দোল!
দখিনের হাওয়া, কী যে সুখ পাওয়া!
জ্যোছনায় চান্ করে' পরাণের খিল্ খোল্,
সব ভুলে আজ ভোলা হও খোলা দিল্‌ডোল!

কোথা তুই কই সাকী, আজো কাছে আয় না,
আজ শুধু আব্দার, সোহাগের বায়না!
নেয়ে আয় চাঁদনী, নিয়ে বুক-বাঁধনি,
নয়নের কাছে আন্ নয়নের আয়না,
আঁখির জ্যোছনা ছাড়া আঁখি যে গো না'য় না!

এক হাতে আন্ বীণা, আর হাতে পিয়ালা,
চোখ ভরে' নিয়ে আয় খুশীর ঐ দিয়ালা!
মুহু মুহু মহুয়ায়, কুহু কহি কে যে গায়,
প্রাণ যে চায় না হায় থাকতে গো নিরালা,
চুমুতে চুমুক দিই আন্ ঠোঁট-পিয়ালা!

ক্যাজিন মাতাল হাওয়া ঝিরিঝিরি বইছে,
চাঁপার গোপন কথা মালতীরে কইছে!
চটুল হাস্নু-হানা দখিনারে করে মানা,
তবু তার মাত্‌লামি বুক পেতে সইছে!
চাঁদের নিঝুম আলো প্রেমে থইথইছে!

কাঁদব না আজ আর, আজ শুধু ফুর্তি,
ঠোঁট চায় মাখ্‌তে যে চুম্বন-স্ফূর্তি,
প্রাণ চায় কইতে, বুকে বুক বইতে,
ফাগ-রঙে গান লিখে অনুরাগ-সুর দি',
নীল শিশা নিংড়ে যে নেশা, আজি ফুর্তি!

নেচে নেচে আয় সখি দোলদুল্ ঝর্ণা,
রক্তিম সুখ নিয়ে চম্পক-বর্ণা!
আঁখিজল মোছ্ না, ঝুরুঝুরু জোছ্ না
ঝরিয়ে ভরিয়ে দে অন্তর-ভর্ণা,
আজ শুধু জোৎস্নায় প্রেম-ঘর-করনা!

পাপিয়ারা পিউ-কাঁহা কহি কারে খুঁজছে,
কেতকীর কানে-কানে দখিনা কি পুছ্ ছে!
তারকারা মিটিমিটি লিখিছে প্রেমের চিঠি,
এই লেখে এই ফের লজ্জায় মুছ্ ছে,
মেঘেরা মলিন মুখ জ্যোৎস্নায় ধুচ্ছে!

পারিজাত-পাপ্ ড়ি, আয় উড়ে চঞ্চল,
আকাশের নীল পরী, ওড়া নীল অঞ্চল!
প্রজাপতি-পিয়া লো, তোর চোখে কি আলো!
নেশাতে ঘায়েল্ করি' পেয়ালায় মন ছল,
খুনীর ফড়িঙ্, আয় পাখ্ মেলে চঞ্চল!



—রম্যাঁ রলাঁ।

উষসী

১

গৃহ-প্রাঙ্গণের তরুবীথিকার অন্তরালে প্রবাহিত-তটিনীর চঞ্চল-গুঞ্জনধ্বনি শুনা যাইতেছে। রুদ্ধ-বাতায়নে বরষা-জলধারা অবিশ্রান্তভাবে আঘাত করিয়া ফাটল দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। দিন-শেষের ম্লান-পাণ্ডুর আলো ধীরে ধীরে মুছিয়া আসিতেছে। বদ্ধ ঘরের উষ্ণ নিবিড় বাতাসে নিশ্বাস যেন বদ্ধ হইয়া আসে।

নব-জাত শিশু তাহার শয্যায় নড়িয়া উঠিল।

বৃদ্ধ জঁা মিশেল্ অতি সন্তর্পণে তাঁহার সিক্তকর্দ্দমাক্ত জুতা দ্বারের নিকট খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, তবুও তাঁহার শরীরের ভারে পায়ের তলার মেঝেয় ঈষৎ শব্দ হইল। শিশু কাঁদিয়া উঠিল। শিশুর জননী তাহার দিকে ঝুঁকিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে দোলা দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বৃদ্ধ আলো জ্বালিলেন, শিশু জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারে না ভয় পায়। সেই আলোকে বৃদ্ধের শুভ্র রুক্ষ গুম্ফ-শ্মশ্রুমণ্ডিত রক্তাভ মুখ স্পষ্ট হইয়া উঠিল,—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মুখে বিষাদের ছায়া। তিনি ধীরে ধীরে শিশুর দোল্‌নার নিকট অগ্রসর হইয়া আসিলেন, তাঁহার সিক্ত পরিধেয় বসন হইতে বিশ্রী একটা গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া লুইসা বলিল, খোকার অত কাছে যেও না বাবা—'

লুইসাকে দেখিতে সুন্দর কিন্তু যেন বর্ণহীন! তাহার সমস্ত শরীর যেন শুখাইয়া উঠিয়াছে। মুখে স্বাস্থ্যহীনতার চিহ্ন। ওষ্ঠ দুইটি রক্তশূন্য এবং ফুলা, তাহাতে সঙ্কোচভরা একটু হাসির রেখা। চোখের দৃষ্টিতে কোন চাঞ্চল্যের আভাষ

নাই—অজ্ঞান নির্ব্বোধ শিশুর মত নীল এবং অভিজ্ঞতার অভাব প্রকাশ করিতেছে। তারা দুইটি ছোট কিন্তু গভীর স্নেহ যেন সেখানে বাসা বাঁধিয়া আছে। লুইসা অপলক চোখে তাহার শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সহসা জাগিয়া শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! রাত্রির নিবিড় গভীর অন্ধকারে তীব্র সে দীপালোক তাহার তরুণ চোখ দুইটিকে যেন ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল। সে ঔজ্জ্বল্য যেন সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অন্ধকারের বুক চিরিয়া শাণিত অস্ত্রের মত সে আলো তাহার চোখে লাগিতেছে, তাহারই তীব্র আঘাতে তাহার চোখের সম্মুখে কত অদ্ভুত হৃৎকম্পকারী বীভৎস ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে!—বর্ণনাতীত দুঃখ এবং ভয় তাহার মনকে ধীরে ধীরে ঘিরিয়া ধরিতেছে। তাহারই চোখের সম্মুখে বিশাল কাহাদের চোখ তাহাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতে চাহিতেছে।—সে-মুখ সে-দৃষ্টি সে চিনে না। তাহার কাঁদিবার শক্তি যেন ছিল না, আতঙ্কে তাহার কণ্ঠে ক্রন্দনবেগ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাহার মনের সে-ভয় রেখায়-রেখায় তাহার সমস্ত মুখে কপালে গালে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখ হাতের রঙ যেন আগুনতাপে ঝল্‌সান, লাল, তাহাতে হলুদ রঙের ছোপ্‌ ধরা!

শিশুর মুখের নিকট হইতে আলোটি সরাইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বৃদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, ইস্‌, কি কুৎসিৎ দেখ্‌তে হয়েছে এই ছেলেটাকে!

বৃদ্ধের কথায় তিরস্কৃত অভিমানিনী বালিকার মত ঠোঁট ফুলাইয়া লুইসা তাহার বিছানায় বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, তবে কি বল্‌তে চাও, ও একেবারে কার্ত্তিকটি?—বাজে কথা ব'লে কি হ'বে? নিজেই দেখ্‌তে পাচ্ছ। সুন্দর বল্‌লেও বিশ্বাস কর্‌বে না।—তা এ ত' তোমার দোষ নয় মা, ছেলে মাত্রেই এমনি বিশ্রী কদাকার!

ভয়ে মুহ্যমান শিশুর শরীর এবং মনে আবার জাগরণের আভাষ দেখা গেল। আলোকের তীব্রতা এবং বৃদ্ধের অদ্ভুত মুখ এবং চোখের দৃষ্টি তাহার চোখে অনেকটা যেন সহিয়া আসিয়াছে। মায়ের চোখের স্নিগ্ধ-করুণ দৃষ্টি চিনিতে পারিয়া সে যেন তাহার কাছে নালিশ করিতেছে—ওঁআ—ওঁয়া . . .

লুইসা হাত বাড়াইয়া বলিল, ওকে আমার কোলে দাও না বাবা—

বৃদ্ধ বলিলেন, কাঁদ্‌ছে? কাঁদুক না, কাঁদ্‌লেই যদি কোলে নাও, ভারি বদ্‌ অভ্যাস হয়ে দাঁড়াবে। শেষে আর কোল থেকে নাম্‌তেই চাইবে না।

কথা বলিতে বলিতে জাঁ মিশেল্ শিশুকে তাহার দোলা হইতে তুলিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, সত্যি, এমন কুৎসিৎ ছেলে আমি কারো দেখি নি বৌ-মা।

শিশুকে বৃদ্ধের হাত হইতে আপনার কোলে লইয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া আদর-ঢালা স্বরে লুইসা বলিতে লাগিল, ও-রে আমার বিশ্রীটা, . . . আমার কুচ্ছিৎটা, . . . আমার বাঁদরটা! . . . এবং সেই সঙ্গেই তাহার মাথায় হাতে মুখে গালে পায়ে চুম্বন দিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরকে জানাইয়া দিল—তবু সে তাহাকে কত ভালবাসে!

ঘরের এককোণে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের কাছে আসিয়া বৃদ্ধ জাঁ মিশেল্ একটি লোহার কাঠি দিয়া আগুন খোঁচাইতে লাগিলেন, যেন তিনি তাঁহার পুত্র-বধূর কথার নীরব প্রতিবাদ করিতেছেন। কিন্তু ইহারই সহিত মৃদু একটি হাসির রেখা তাঁহার মুখের সমস্ত গম্ভীর এবং তিক্ত ভাবটিকে যেন সরাইয়া দিল! বলিলেন, দুঃখ করিস্ নে মা, এখনো ঢের সময় আছে। বাইরের আলো বাতাসের স্পর্শে আর মানুষের যত্নে ও হয় ত' দিনে-দিনে সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে—আর যদি তা না-ই হয়, ক্ষতি কি? ও পুরুষ। শুধু সৎচরিত্র হ'লেই আমি খুশী হব। আর কিছুই চাই না।

মাতার তপ্ত কোমল বক্ষে আশ্রয় পাইয়া শিশু শান্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষুধার্ত্ত শুষ্ককণ্ঠে স্তন্যপানের শব্দ শুনা যাইতেছে। বৃদ্ধ জাঁ মিশেল্ তাঁহার চেয়ারে অর্দ্ধ-শায়িতভাবে বসিয়া বিশেষ জোর দিয়া আবার বলিলেন, চরিত্রবান মানুষের চেয়ে সুন্দর আর কিছুই নেই—'

কথা কয়টি বলিয়া কিছুক্ষণ তিনি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, মানুষের সততা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যটা বধূকে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন কি না। কিন্তু আর কোন কথা তাঁহার মনে আসিল না। এই ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর, তিনি বধূর দিকে চাহিয়া বিরক্তি পূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, সে হতভাগা কোথায়? এখনো ফেরে নি?—

শান্তকণ্ঠে লুইসা উত্তর দিল, বোধ হয় এখনো থিয়েটারে আছেন। আজ একটা রিহার্সাল ছিল আমায় যেন বলেছিলেন মনে হচ্ছে।

জাঁ মিশেল্ বলিলেন, ও তার হাজার মিথ্যে কথার একটা। থিয়েটার বন্ধ, আমি আস্‌বার সময় ও-পথ হয়ে এসেছি।

ব্যাকুলভাবে লুইসা বলিল, না বাবা, সব সময় ওঁকে দোষ দিয়ো না। বোধ

হয় আমারই শোন্‌বার ভুল হয়েছে, হয় ত' কাকেও বেহালা শেখাবার কথা ছিল, তাই—

রুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, হ'লেও এতক্ষণে তার ফেরা উচিত ছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঘৃণায় লজ্জায় জড়িত কণ্ঠে বধূকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, আবার কি তার ঐ সব আরম্ভ হয়েছে না কি?

ব্যাকুল মিনতিপূর্ণ প্রতিবাদের সুরে লুইসা বলিয়া উঠিল, না—না বাবা— কিন্তু বৃদ্ধের চোখের দৃষ্টির তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ নীচু করিয়া লইল।

জাঁ মিশেল্‌ বলিলেন, এ কথা সত্যি নয়। তুমি মিথ্যে আমায় ভোলাতে চেষ্টা কর্‌ছ বৌ-মা।

বধূর চোখ হইতে জল ঝরিতে লাগিল।

মর্ম্মভেদী গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ একটা কাঠে লাথি মারিয়া আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। নাড়া পাইয়া আগুন খোঁচাইবার লোহার কাঠিটা শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে শিশু কাঁদিয়া উঠিল! রুদ্ধকণ্ঠে লুইসা ডাকিল, বাবা—

শিশুটি মা'র মুখের দিকে তাকাইয়া কাঁদিতে হইবে কি না তাহাই যেন ভাবিয়া লইল, শেষ নিবিষ্ট মনে স্তন্য পান করিতে লাগিল।

ব্যথিত গম্ভীর ভগ্ন কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, ভগবানের কাছে কি এমন অপরাধ করেছি যার শাস্তিস্বরূপ এত বড় অপদার্থ মাতাল ঐ ছেলেটাকে তিনি আমায় দিলেন? ওর জন্যে বছরের পর বছর এই যে অসহ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য ক'রে আস্‌ছি,—কেন? জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন দিয়েছি, এর অর্থ কি? তুমি—তুমি তার স্ত্রী তুমি পার না তাকে থামাতে, তাকে ঘরে রাখ্‌তে? সেই ত' তোমার কাজ। কেন সে বাইরে যায়?—

বধূর চোখে অশ্রুবন্যা নূতন করিয়া নামিল। থামিয়া থামিয়া ধরাগলায় বলিতে লাগিল, আমি কি করব? তাকে ধ'রে রাখ্‌তে পারি না . . . আমার সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে! রাত্রে অন্ধকার ঘরে একা বসে থাকি, কোন শব্দ হলে মনে হয়, সে টল্‌তে টল্‌তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আস্‌ছে . . . এইবার দোর খুলে ঘরে ঢুক্‌বে . . . তার মুখে কি দেখ্‌ব? আমার মাথার ভিতর যেন কি রকম কর্‌তে থাকে, আমি আর ভাবতে পারি না।

ক্রন্দনের বেগে বধূর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে ছিল। তাহার

কাছে আসিয়া একখানি শাল তাহার গায়ে চাপা দিয়া তাহার মাথার চুলে হাত দিয়া সস্নেহে জঁা মিশেল্ বলিলেন, কাঁদিস্ নি মা, ভয় কি? আমি ত' আছি।

শিশুর জাগিয়া উঠার ভয়ে লুইসা শান্ত হইল। লজ্জিতভাবে হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, এ-সব কথা তোমায় না বলাই উচিত ছিল আমার—তোর জীবনটা যে এমন ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে তা ভাবি নি মা—'

বৃদ্ধের কথা শেষ না হইতেই লুইসা মুখ তুলিয়া বলিল, কিন্তু সে-দোষ আমারই বাবা। আমাকে বিয়ে করা ওঁর উচিত হয় নি। আজ সে এর জন্যে নিজেই অনুতপ্ত।

জঁা মিশেল্ বলিলেন, কি বল্‌লে? সে অনুতপ্ত? অনুশোচনা প্রকাশ কর্‌ছে সে?

লুইসা জবাব দিল, সে ত' তুমিও জান বাবা, তোমারও মনে রাগ হয়েছিল, আমি ওঁর স্ত্রী হয়েছি বলে—

জঁা মিশেল্ প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, যাকগে মা, ছেড়ে দাও সে সব কথা। আমি স্বীকার কর্‌ছি, এ বিয়ে আমার ভাল লাগে নি। ওর মত গুণী ছেলে, কিছু মনে ক'র না মা, আমার হাতে গড়া অত বড় ওস্তাদ বাজিয়ের উচিত ছিল তার চোখের দৃষ্টিটাকে তোমাদের শ্রেণীর মেয়েদের থেকে অনেক উঁচুতে রাখা। আমাদের ক্রাফ্‌ট্-বংশে একশ' বছরের মধ্যে কেউ সুরবোধহীনা কোন মেয়েকে বিয়ে করে নি; কিন্তু তুমি জান মা, ঠিক এই জন্যেই তোমার উপর আমার মনে কোন বিদ্বেষ নেই। তোমার স্বভাবের পরিচয় পেয়ে তোমাকে আমি ভাল-বাসতে আরম্ভ করেছি। তা ছাড়া যা হবার তা হয়েছে, ইচ্ছে কর্‌লেই ত' আর সব বদ্‌লে ফেলা যাবে না? তেবে আর কি হবে? নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের নিজের কাজ ক'রে যাই।

বধূর নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া তাঁহার আসনে বসিয়া জঁা মিশেল যথার্থ জ্ঞানীর মত গভীর শ্রদ্ধার স্বরে আবার তাঁহার নীতিবাক্য আওড়াইলেন মানুষের জীবনের সর্ব্বোত্তম কাজ কর্ত্তব্য পালন।

কথা শেষ করিয়া বধূর নিকট হইতে প্রতিবাদের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন, আগুনের মধ্যে থুথু ফেলিলেন, কিন্তু লুইসা কোন উত্তর দিল না, শিশুও কাঁদিল না। সুতরাং আরো খানিক বকিবার ইচ্ছা থাকিলেও বৃদ্ধ নীরব হইতে বাধ্য হইলেন।

* * * *

উভয়ের মধ্যে আর কোন কথা হইল না বটে কিন্তু অশান্তির সমাপ্তি হইল না। তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং দুঃখের স্মৃতি বুকে লইয়া দুইজনেই নিজের নিজের মত করিয়া মনকে দোলা দিতেছিল। পুত্র-বধূকে সান্ত্বনা দিবার সময় যে সমস্ত স্নেহের কথা জাঁ মিশেল্‌ বলিয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও তাঁহার মনে পুত্রের এই বিবাহিত জীবনের সম্বন্ধে অনুশোচনা জ্বলিয়া উঠিতেছিল। বধূও ভাবে ঐ কথা। সহস্রবার আপনাকে সহস্র প্রকারে তিরস্কার করে; কিন্তু কেন করে, তাহা ভাবিয়া পায় না। তাহার কি অপরাধ?—

সে ছিল অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর এক পরিচারিকা। কিন্তু একদিন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সে জাঁ মিশেল্‌ ক্রাফট্‌-এর পুত্র-বধূ হইয়াছে। লুইসা নিজেও বার বার আপনার মনে ভাবিয়াছে—সে মেল্‌শিয়োর-এর পত্নী!

এই ক্রাফ্‌ট-বংশের গৌরব করিবার মত ধন-সম্পত্তি বিশেষ কিছুই না থাকিলেও রাইন শহরে তাঁহাদের সুনাম এবং প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। এই শহরে জাঁ মিশেল্‌ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়া সংসার পাতিয়া বসেন। পিতা ও পুত্র উভয়েই সঙ্গীতজ্ঞ এবং কোলোন্‌ হইতে মান্‌হাইম্‌ পর্য্যন্ত সমস্ত শহরে প্রতিভাবান ওস্তাদগণের নিকট পরিচিত ছিলেন। পুত্র হফ্‌-থিয়েটারের বেহালাবাদক ছিল, পিতা ছিলেন গ্র্যাণ্ড-ডুকাল্‌ কন্‌সার্ট-এর পরিচালক। পুত্রের এই নিম্ন পর্য্যায়ের বিবাহে তাঁহার যথেষ্ট মর্য্যাদার হানি হইয়াছে। নিজে একজন বিশেষজ্ঞ হইয়াও যে যশোরাশিকে চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই, ভাবিয়াছিলেন সেই দুর্লভ বস্তুকে তিনি ধীরে ধীরে পুত্রের হস্তে তুলিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার সে অভাবিতের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে পুত্রের পাগলামীতে। দুঃখ এবং ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বৃদ্ধ প্রথম পুত্র ও পুত্র-বধূকে অজস্র তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির মানুষ। তাঁহার ক্রোধ শীঘ্রই প্রশমিত হইল। দিনে দিনে বধূর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন, ভালবাসিলেন। এবং সে ভালবাসা তাঁহার সমস্ত অসন্তোষ তিরস্কারের উপর ফুটিয়া থাকিত।

কেহ জানে না মেলশিয়োর কেন এ বিবাহ করিল, সে নিজেও না। লুইসার রূপ যে এই অঘটন ঘটাইয়াছে তাহাও নহে। মানুষকে মুগ্ধ করিবার বা তাহার মনে মোহ আনিবার শক্তি তাহার ছিল না। ছোট-খাট গড়ন, অত্যন্ত রোগা এবং তাহার শরীর যেন ঈষৎ রক্তশূন্য। তাহার স্বামী এবং শ্বশুরের পাশে তাহাকে অত্যন্ত অদ্ভুত দেখাইত। উভয়েই দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, পানভোজনে

ক্ষুদ্র রাক্ষসবিশেষ, হাস্য-কৌতুকপ্রিয় এবং সর্ব্বদাই অত্যন্ত জোর দিয়া কথা বলার অভ্যাস। ইঁহাদের মধ্যে পড়িয়া বেচারী লুইসা দিনে দিনে যেন আরও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল; কেহ তাহার মধ্যে দেখিবার মত বিশেষ কিছুই খুঁজিয়া পাইত না। যাহা কিছু ছিল, তাহা চেষ্টা করিয়া সে নিজে চাপা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। মেল্‌শিয়োর যদি একজন হৃদয়বান মানুষ হইত তাহা হইলে লোকে হয় ত' ভাবিতে পারিত যে, গুণ দেখিয়া লুইসাকে সে বিবাহ করিয়াছে! কিন্তু উচ্চ আশা এবং গর্ব্বে যাহার হৃদয় পূর্ণ, শ্রীমান এবং সে সম্বন্ধে যে অজ্ঞ নয়, ঈষৎ স্থূল বুদ্ধি হইলেও বহু গুণে ভূষিত, সমাজের ধনকুবের গণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার মত সাহস এবং সহায় যাহার আছে, ইচ্ছা করিলেই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রীবৃন্দকে যে মুগ্ধ করিতে পারে, সে যে নীচ বংশের দরিদ্র অশিক্ষিত রূপহীন এই কন্যাকে বিবাহ করিয়া আপনার জীবনের সমস্ত উচ্চাভিলাষ বিসর্জ্জন দিবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল?

মেল্‌শিয়োর ছিল সেই প্রকৃতির মানুষ যাহারা সাধারণের চিন্তা বা ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করিয়া ফেলে। এমন কি মনে হয় যেন তাহারা নিজেদের নিকট হইতেও এমন অদ্ভুত ঘটনার আশা কোন দিন করে নাই। যুক্তি-তর্কের দ্বারা যাহা নিষিদ্ধ প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহা যাহারা জানে এবং ঐ নিষিদ্ধ বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক, বড় সহজে তাহাদিগকে কেহ ঠকাইতে পারে না। কথায় আছে, একজন সতর্ক মানুষ দুইজন মানুষের শক্তির সমতুল্য। ইহারা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত প্রতিকূলতাকে সরাইয়া আপনাদের জীবন-তরীখানি বাহিয়া চলিতে চায়। কিন্তু একটিমাত্র দোষে সমস্তই বৃথা হইয়া যায়।—তাহারা আপনাদের জানে না। এই অক্লান্ত যাত্রায় কোন এক মুহূর্ত্তে পথের কথা ভুলিয়া হাল ছাড়িয়া বসে। নিজেদের জীবনের সমস্ত দায়িত্বের ভার যাহারা নিজেদের হাতে তুলিয়া লইয়াছে, শুভাকাঙ্খী বন্ধুগণের চোখের সম্মুখে সেই জীবনকে যেমন-খুশী চালিত করিবার উৎকট ইচ্ছা স্বভাবতই তাহাদের মনে জাগে। পিতার সমস্ত আশা আকাঙ্খার বিরুদ্ধে মেলশিয়োর লুইসাকে বিবাহ করিয়া বসিল। এবং এই কাজটি সে মদের নেশার ঝোঁকে বা অজ্ঞান অবস্থায় করে নাই; শারীরিক বা মানসিক কোন উত্তেজনাও ইহার কারণ নয়, এ সমস্তের সম্পূর্ণ বিপরীত কূলে সে ছিল।

মনে হয়, মানুষের মন এবং শরীর ছাড়াও অন্য এমন একটা জিনিষ আছে, মানুষের জ্ঞান বা অনুভূতি হইতেও যাহা শক্তিশালী এবং ইহাদের

সকলের সুপ্তির অবসর মুহূর্ত্তে তাহারই অদ্ভুত প্রভাব ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, সম্ভবত এই শক্তিই একদিন সন্ধ্যাবেলা নির্জ্জন নদীতীরে লুইসার শান্ত আঁখি-পল্লব হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার হৃদয়-মনকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। সে হাসিয়াছে, লুইসার সহিত কথা বলিয়াছে, তরু-বীথিকার নিবিড় ছায়ায় বহুক্ষণ ধরিয়া লুইসার হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে লইয়া বসিয়া থাকিয়াছে এবং কখন অজ্ঞাতসারে তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু বিবাহ শেষ হইতে না হইতেই সে এই ব্যাপারের গুরুত্বকে উপলব্ধি করিয়াছে এবং এ-কথা সে লুইসার নিকট গোপন করিবার প্রয়াসমাত্র করে নাই।

লুইসা গভীর দুঃখের সহিত তাহাকে বলিয়াছে, আমি কি কর্‌ব? আমায় ক্ষমা কর—

মেল্‌শিয়োর হৃদয়হীন নয়, সে লুইসাকে অপরাধী করে নাই। কিন্তু বন্ধুদের মজলিশে আসিয়া যোগ দিলেই তাহার অনুশোচনা উপস্থিত হইত। তাহার ছাত্রীদের হাতের আঙ্‌গুলি ধরিয়া বেহালার পর্দ্দায় নির্ভুলভাবে ফেলিতে শিখাইবার সময় তাহার হাতের স্পর্শে এখন আর পূর্ব্বের মত পুলকে তাহারা কাঁপিয়া উঠে না। বিমর্ষ ম্লান মুখে সে এখন গৃহে ফিরে। লুইসা দেখে, ভয়ে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠে, সে তিরস্কারের প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া থাকে। কোন কোন দিন মেলশিয়োর সমস্ত সন্ধ্যাটি বন্ধুগণের সহিত কাফিখানায় কাটাইয়া গভীর রাত্রে গৃহে ফিরে এবং বিশেষ করিয়া এই দিনগুলিতে তাহার মুখে হাস্য কৌতুকের বন্যা বহিয়া থাকে। ইহাই লুইসার পক্ষে বিশেষ বেদনাদায়ক। এ হাসির অর্থ সে বুঝে, মেলশিয়োরের এই পাগলামীর খেয়ালের মধ্যে যে সংসারের সুখ শান্তি এবং অর্থ উড়িয়া যাইতেছে, তাহার জন্য সে নিজেকেই এখন অনেক পরিমাণে দোষী ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মেলশিয়োর ধীরে ধীরে ডুবিতে লাগিল—সেই বয়সে, যখন তাহার সমস্ত একাগ্রতা এবং শক্তি দিয়া নিজের প্রতিভাকে সাধারণ শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সে আর কোন চেষ্টা করিল না, অন্যে তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইল।

কিন্তু যে অদৃশ্য অজ্ঞাত শক্তি তাহাকে টানিয়া আনিয়া একজন সামান্য পরিচারিকার পতিত্বের অধিকার দিয়াছে, তাহার উত্থান বা পতনে সে-শক্তির কি আসে যায়? এই মহা রহস্যের সমাধান করিতে যতটুকু তাহাকে প্রয়োজন

ছিল, ততটুকু মাত্র সে আপনাকে দিতে পারিয়াছে এবং শিশু জঁা ক্রিশ্তফ্ পৃথিবীর কোলে আজি জন্ম গ্রহণ করিল।

* * * *

রাত্রি গভীর। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসিয়া বৃদ্ধ জঁা মিশেল বিগত জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। লুইসা ডাকিয়া বলিল, অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে বাবা, অনেকখানি পথ তোমায় হাঁটতে হবে,তুমি আর দেরী কোরো না, যাও—

বৃদ্ধ জাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, সে আসুক, আমি যাচ্ছি।

লুইসা—না, তা করো না বাবা। আমার মনে হয়, তুমি না থাকলেই ভাল।

জঁা মিশেল—কেন?

লুইসা কোন উত্তর দিল না।

জঁা মিশেল বলিলেন, তুমি ভয় পাও না? তুমি চাও না যে, আমি তার সঙ্গে এখন কথা বলি?

লুইসা—তাতে কোন লাভ হবে না বাবা, মিথ্যে দু'জনে তোমরা মন কষাকষি করবে। সে আমি চাই না, তুমি যাও।

জঁা মিশেল—বেশ আমি যাচ্ছি—

বৃদ্ধ উঠিয়া আসিয়া সস্নেহে লুইসার মাথায় হাত বুলাইয়া তাহার কিছু প্রয়োজন হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে আলো নিভাইয়া দিয়া চেয়ার টেবিল প্রভৃতিতে ধাক্কা খাইতে খাইতে অন্ধকারে দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। সিঁড়ির কাছে আসিয়া সহসা তাঁহার মনে হইল—মেল্‌শিয়োর মাতাল অবস্থায় এখনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র প্রকারের ভয়ও তাঁহার মনটিকে ঘিরিয়া ধরিল। কাণ্ডজ্ঞানহীন মাতালের কাছে অসহায় লুইসা...

লুইসার বুকের কাছে শুইয়া শিশু আবার অশান্ত হইয়া উঠিল! যেন কোন গভীর বেদনা তাহার জীবনের মূলে বাসা বাঁধিতেছে। ক্ষুদ্র শরীরটিকে ভাঙিয়া চুরিয়া সহস্র প্রকার আকার দিতে লাগিল। সে বেদনার উপশম হয় না। তাহার সমস্ত তীব্রতা সে অনুভব করিতেছে। জীবনের এ-বেদনা বিরাট—অসীম! শিশু অশান্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। লুইসা তাহাকে বুকে লইয়া দোলাইতে দোলাইতে তাহার সর্ব্বশরীরে হাত বুলাইয়া দিল। শিশু শান্তি পাইল, কিন্তু তাহার কান্না থামিল না। প্রতি মুহূর্ত্তে এই বেদনাকে নিবিড় ভাবে বুকের মধ্যে যেন সে অনুভব করিতেছে।

মানুষ তাহার বেদনার কারণ বা উৎপত্তি স্থলের সন্ধান পাইলে চেষ্টা করিয়া যত্ন লইয়া তাহার নিবৃত্তি করিতে পারে, শরীরের আহত অংশে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বা প্রয়োজন হইলে সেই অংশটি শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াও বেদনা হইতে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু শিশুর সে শক্তি নাই। এই অনাদি অনন্ত বেদনা যেন তাহার জীবনের তাহার শরীরের একমাত্র বিধাতা। এই শরীর এই রক্ত-মাংসপিণ্ডকে তিল-তিল করিয়া যতদিন না সে নিঃশেষ করিতে পারিবে, ততদিন সে ছাড়িবে না।

শিশুর কান্না থামে না। লুইসা তাহাকে বুকে চাপিয়া আদরঢালা স্বরে বলে, যা-যা, আর নেই, সব ভাল হয়ে গেছে। গোপাল আমার—মাণিক আমার . . .

শিশু থামিল না! তাহার অপূর্ণ শরীরে, তরুণ মনে, তাহার অনাগত জীবনের সমস্ত তিক্ত দুঃখের অভিজ্ঞতা যেন এখন হইতেই সাড়া দিতেছে!

নিস্তব্ধ, নিথর রাত্রির বুকে সঁ্যা মারৃত্যাঁ গীর্জ্জার ঘড়ির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—ধীর, গম্ভীর, সংহত।

শিশুর ক্রন্দন সহসা থামিয়া গেল। অপূর্ব্ব সুর-মাধুরী মাতৃস্তন্যের মত তাহাকে যেন পূর্ণ করিল, তাহার চারিদিকে যেন স্বপ্নমায়া বিছাইয়া দিল। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া যেন কোন্ অপূর্ব্ব আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! শান্ত বাষ্পমন্থর বায়ু-হিল্লোলে তাহার শরীর মন যেন জুড়াইয়া যাইতেছে। কোন দুঃখ বেদনা তাহার মনে আর নাই। ভয়মুক্ত মনের হাসির রেখা তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। চোখের পাতা তন্দ্রায় মুদিয়া আসিতেছে; গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল!

এই সুরের মোহন স্পর্শে লুইসার বুকও দুলিয়া উঠিয়াছে। একটির পর একটি চিন্তা তাহার মনে আসিয়া উঁকি দিয়া যায়—এই যে শিশুটি তাহার কোলের কাছে ঘুমাইয়া আছে, ভবিষ্যতের অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে তাহার জন্য কি অপেক্ষা করিতেছে, কে জানে? এই চিন্তা-স্রোত তাহার মনের কূল ভাসাইয়া চলিয়াছে। তাহার শরীর বেদনায় যেন ভরিয়া উঠিয়াছে। গভীর অন্ধকার যেন পাষাণের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিতেছে। তাহার চোখের পাতা, তাহার হাত পা যেন জ্বালা করিতেছে, কিন্তু তাহার নড়িবার সাহস হইল না। সে মুখ নীচু করিয়া একবার শিশুর মুখের দিকে চাহিল এবং এই অন্ধকারের মধ্যেও শিশুর মুখের ঐ অস্বাভাবিক রেখাগুলির অর্থ বুঝিতে তাহার

কষ্ট হইল না। অবসাদে তাহার চোখের পাতা ক্রমে ভারি হইয়া আসিল। সহস্র দুশ্চিন্তার ছিন্ন সূত্রগুলি ধীরে ধীরে তাহার মন হইতে সরিয়া গেল। ঘুমের ঘোরে হঠাৎ একবার তাহার মনে হইল, যেন সে মেলশিয়োরের পায়ের শব্দ শুনিতে পাইয়াছে! যেন সে আসিতেছে! . . . তাহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত উঠিল।

নদীর স্রোতধারার কলধ্বনি স্পষ্ট হইয়া উঠে, জানালার ফাঁকে বৃষ্টি পড়ার শব্দ মাঝে মাঝে হাল্কাভাবে তাহার কানে আসে। গীর্জ্জার বিলম্বিত ঘণ্টাধ্বনি আগামী দিনের আনন্দোৎসবের কথা শুনাইয়া ক্রমে তাহাও মিলাইয়া আসিল। লুইসা তাহার শিশুপুত্রের পাশে ঘুমাইয়া পড়িল।

এই সমস্ত সময়টি বৃদ্ধ জঁ মিশেল্ দরজার বাহিরে বৃষ্টির মধ্যে বসিয়া আছেন—পুত্রের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায়! তিনি গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। যাইলেও শান্তি পাইতেন না। মাতাল পুত্রের সহস্র অত্যাচারের কথা কেবলই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। গীর্জ্জার ঘণ্টার শব্দে তাঁহার মনও প্রনষ্ট আশার স্মৃতিতে ও গভীর বেদনায় ভরিয়া উঠিতেছিল। সহসা তাঁহার মনে হইল, তিনি এ কি করিতেছেন! পুত্রের গৃহের দরজার পাশে, বৃষ্টির মধ্যে, অন্ধকারে, উন্মুক্ত পথে . . . ?

দারুণ লজ্জায় তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

* * * * *

দিনগুলি অতি ধীরে আপনার ছন্দে বহিয়া যায়। রাত্রি আসে, যায়—বিরামবিহীন, যেন বিরাট কোন্ সাগরের জোয়ার-ভাঁটার মত! এক-একটি দিন গিয়া সপ্তাহের সংখ্যা পূর্ণ করে; সপ্তাহ মাসের কোলে গড়াইয়া যায় এবং এই সমস্ত দিন এবং রাত্রির আসা-যাওয়া যেন একটি পরিপূর্ণ দিনেরই বিচ্ছিন্ন অংশ-বিশেষ!

বিপুল এই দিনের রহস্য ভেদ করা কঠিন। সে যেন আলো-অন্ধকারের হৃদয় স্পন্দনও গুণিয়া গুণিয়া চলে। সুখসুপ্ত ঐ তরুণ জীবনের সমস্ত অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-আনন্দ এমন নিয়মিত ভাবে আসা-যাওয়া করে যে, মনে হয় যেন ঐ দিনগুলিই তাহাদের বহিয়া আনে।

তাহার স্পন্দিত জীবন ঘড়ির মত অপ্রতিহতভাবে আপনার নিয়মের তাল রাখিয়া চলিয়াছে। তাহার শরীরও এই নিয়মের অধীন। ইহার বাহিরে আর যাহা কিছু ঘটনা ঘটে, তাহা যেন স্বপ্ন-ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরিপুষ্ট অণু-

পরমাণুর মত সমস্তই তাহার সম্মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। দুঃখ, আনন্দ বা ভয় তাহার মনে ক্ষণেকের জন্য ঝড় তুলিয়া বহিয়া চলিয়া যায়। স্বপ্ন—স্বপ্ন—সমস্তই স্বপ্ন! এই মিশ্রিত স্বপ্ন-স্রোতের মধ্যে দিশাহারা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে মায়ের মুখের হাসি তাহাকে পথ বলিয়া দেয়, আনন্দে তাহার বুক দুলিয়া উঠে। মাতার বক্ষের ক্ষীরধারায় তাহার ক্ষুদ্র শরীরে অসীম রহস্যপূর্ণ বিপুল মানব-শক্তির জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। যাহাদের দেখিবার শক্তি আছে তাহারাই দেখে কেমন করিয়া ঐ শিশুর শরীরটি অবলম্বন করিয়া জগত তাহার সমস্ত রহস্যের আবরণ সরাইয়া যেন ধীরে ধীরে আপনার পরিপূর্ণ রূপ বিকসিত করিয়া ধরিতেছে। তাহার চোখের সম্মুখে যেন নূতন করিয়া জগতের সৃষ্টি হইতেছে। ঐ ক্ষুদ্র শরীর তাহার কাছে বিরাট—অসীম . . . এ জগতের সমস্তকে আশ্রয় করিয়াই যেন সে বাড়িয়া উঠিতেছে—তাহাকে ছাড়া কিছুই নাই।

* * * * *

মাসের পর মাস বহিয়া চলিয়াছে। শিশুর প্রবাহিত দিগন্ত বিস্তৃত জীবন-নদীর বুকে অতীত দিনের স্মৃতিগুলি অর্দ্ধনিমজ্জিত অস্পষ্ট দীপপুঞ্জের মত ভাসিয়া বেড়ায়। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে এই দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি হইতেছে, মাঝে মাঝে সূর্য্যকিরণে তাহারা যেন ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠে। অরূপ আত্মার অতল তলদেশ হইতে উঠিতেছে সুনির্দ্দিষ্ট-সুস্পষ্ট ঘটনা-বৈচিত্র্য! অনন্তকালের একটানা নৃত্যছন্দে প্রভাতের পর প্রভাত আসিয়া দেখা দেয়—একই ভাবে হাত ধরা-ধরি করিয়া তাহারা আসে কখন হাসিতে কখন কাঁদিতে। মাঝে মাঝে তাহারা আপনার নিয়মে খণ্ড-খণ্ড হইয়া ছিঁড়িয়া যায়, স্মৃতি আসিয়া তাহাতে গ্রন্থী বাঁধিয়া দিয়া যায়—দিনের সহিত সপ্তাহ, সপ্তাহের সহিত মাস . . .

নদীর মর্ম্মর মুখরধ্বনি, গীর্জ্জার ঘণ্টার শব্দ, শিশু তাহার জীবনের নব-জাগরণের এই গভীর অতল দিনগুলিতে যতবার বাজিয়া উঠিতে শুনে, ততবারই তাহার মনে হয়, সে পূর্ব্বে উহা যেন শুনিয়াছে! বড় পরিচিত সে সুর।

নিশীথে, আকাশের ম্লান আলো জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া দেখা যায়, সুপ্ত স্তব্ধ ধরণী ব্যাপিয়া নদীর কলতান জাগিয়া থাকে—যেন কাহার ঘুমপাড়ানি গান . . . কখন আপনার সুরের স্রোতে আপনি ডুবিয়া যায়, কখন সহসা তীব্র কর্কশ হইয়া উঠিয়াই আবার শান্ত হইয়া যায়, যেন দূরাগত বাঁশীর শব্দের মত! সে শব্দ শিশুর হাসির সুরের মত মধুর, উচ্ছৃঙ্খল। সে শব্দ যেন কাহার গানের সুরে নাচের তাল মিলাইয়া চলিয়াছে। মায়ের উৎকণ্ঠাপূর্ণ চির-জাগ্রত

কণ্ঠস্বরের মত সে শব্দ যেন তাহাকে দোলা দেয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সে শব্দ যেন মানব-শিশুকে সমান উৎকণ্ঠায় বক্ষে চাপিয়া রাখে। ঐ শব্দ তাহার সমস্ত চিন্তায় ভরিয়া থাকে। স্বপ্নেও ইহা সে শুনিতে পায়। সেই সুরের অপূর্ব্ব হিল্লোল তাহার শরীর যেন আচ্ছন্ন করে। মনে হয়, সে যখন ঐ নদীকূলে চির বিশ্রামের মধ্যে সমাহিত হইবে তখনও এমনি করিয়া তাহাকে সুরের নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিবে।

রাত্রির শেষপ্রহর বাজিয়া উঠে। দিকে দিকে তাহারই শান্ত গম্ভীর উদাস সুরের প্রতিধ্বনি শুনা যায়। শিশুর বুকে আশা কামনা দুঃখের স্বপ্ন-খেলা সুরু হয়। কাহাদের যেন সে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের পরিচয় যেন সে ঠিক জানে না, তবু মনে হয় যেন সে তাহাদের মধ্যেই ছিল কোন দিন। স্বপ্নে কাহারা তাহার মনে জন্ম লইতে থাকে। জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি ঐ শব্দ তাহার যেন প্রাণ পায়। . . . উষার আলো তাহার চোখের পাতায় স্পর্শ দিয়া যায়। চারিদিকে আনন্দের রোল পড়িয়া যায়। শিশু তাহার রুদ্ধ গৃহের বিছানায় শুইয়া শুনিতে পায়, যেন প্রভাত-আকাশের বুকে ঐ শব্দ-শিশুগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে, পাখীর হাল্কা পাখার শব্দ তাহার কানে লাগে, বাতাস বাঁশী বাজাইয়া যায়, জানালার ভিতর দিয়া আকাশের নীল রূপ তাহার চোখে পড়ে, পর্দ্দার আড়াল দিয়া রবির আলো তাহার শয্যায় লুটাইয়া পড়ে, শিশু প্রতিদিন এইরূপ বৈচিত্র্য দেখে, মনে রাখিতে চিনিতে পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করে—যেন কোনদিন ঐ সমস্তকেই সে আপনার আয়ত্বের মধ্যে পাইবে এবং ঐ সমস্তর সমন্বয়ে হইবে তাহার জগত। ঘরের মধ্যে টেব্‌লটি পাতা রহিয়াছে, ওখানে সকলে আহার করে। জিনিষ-পত্র রাখিবার আলমারি, যাহার তলায় দুষ্টামি করিয়া সে লুকাইয়া থাকে। টলি-বিছান মেঝেটি, যাহার উপর দিয়া সে 'হামাগুড়ি' দিয়া চলে। দেওয়ালের গায় লাগান চিত্র বিচিত্র কাগজ, যাহার ছবিগুলি কত অদ্ভুত রূপ ধরিয়া তাহার চোখে ফুটিয়া থাকে। ঐ ঘড়িটি টিক্-টিক্ করিয়া কত কি কথা অবিশ্রান্তভাবে বলিয়া যায়, যাহার অর্থ শুধু সে-ই বুঝিতে পারে। ঐ ঘরে এমন আরও কত জিনিষ আছে?—সে কিছুরই যেন কূল-কিনারা পায় না। প্রতিদিন নব নব আবিষ্কারের ভিতর দিয়া সে তাহার জগতকে পায়—সমস্তই তাহার আপনার, কোন কিছুই তাহার অপ্রয়োজনীয় মনে হয় না। মানুষ হইতে মাছিটি পর্য্যন্ত সমস্তই তাহার নিকট সমান মূল্যবান। সমস্তই জীবন্ত। ঐ বিড়াল-ছানাটি, ঐ আগুন, ঐ টেবলটি, রৌদ্র-কিরণে যে পরমাণু সদৃশ ধূলি-কণাগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া

বেড়ায়, সে সমস্তই জীবন্ত। ঘরটি তাহার কাছে যেন একটি মহাদেশ। একটি দিনই যেন তাহার সমস্ত জীবন! এত বৃহৎ আকাশের মধ্যে মানুষের আপনাকে জানা, আপনার সীমানির্দ্দেশ করা কি সম্ভব? কি বিশাল এই পৃথিবী! মানুষ তাহার মধ্যে যেন হারাইয়া গিয়াছে! মানুষের সুখ, মানুষের কাজ, মানুষের চলা-ফেরা সমস্তই এক বিরাট অস্থিরতার ঘুর্ণিপাকের মধ্যে যেন তাহাকে টানিয়া রাখিয়াছে! তাহার শ্রান্তি আসে, ঘুমের ভারে চোখ দু'টি মুদিয়া আসে। তাহার চোখে এই ঘুম আসার কোন কালাকাল নাই। মায়ের কোলে, খাটের তলায়—যেখানেই হোক, সে ঘুমাইয়া পড়ে। সমস্তই তাহার ভাল লাগে, যেন সমস্তই সুন্দর এ পৃথিবীর!

ধানের শিষে, গাছের পাতায় হাওয়ার দোল খাওয়ার মত মাটির বুকে নিবিড় মেঘের ঘনছায়ার মত ঐ শিশুর জীবনের প্রথম দিনগুলি আপনার চির-চঞ্চল গতিতে আসে, আবার ভাসিয়া যায়।

* * * * *

ছায়া সরিয়া যায়; অন্ধকার আলোকময় হইয়া উঠে, দিনের এই রহস্যময় জটিল পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে শিশু ক্রিশ্‌তফ্‌ আপনার পথটি খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে।

বেলা বাড়িয়া উঠে। স্বামী-স্ত্রীর তখনও ঘুম ভাঙ্গে না। শিশু তাহার বিছানা হইতে কড়িকাঠে প্রতিফলিত আলোর খেলা দেখে, আনন্দে তাহার মন নাচিয়া উঠে। সে তাহার শিশু-হৃদয়ের সমস্ত চপলতা ঢালিয়া চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠে। সেই শব্দে জাগিয়া উঠিয়া শিশুর জননী জড়িতকণ্ঠে বলে, নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারবার জো নেই! ঘুমো দস্যি ছেলে——

ক্রিশ্‌তফ্‌ আবার হাসিয়া উঠে—যেন তাহার হাসি শুনিবার শ্রোতা যে আছে, ইহা সে জানিতে পারিয়াছি। হাসিবার ইচ্ছা তাহার বাড়িয়া যায়। মা তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া চোখ ঘুরাইয়া ভয় দেখাইয়া বলে, গোলমাল করতে নেই, এখুনি বাবুর ঘুম ভেঙ্গে যাবে——

কিন্তু মাতার শ্রান্ত চোখের পাতায় ছেলের দস্যিপনার হাসির আলো ঠিকরিয়া উঠে। বুকের উপর শিশুকে লইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা অর্দ্ধস্ফুট কত অর্থহীন কথা বলিয়া যায়! সহসা পিতার বিরক্তিপূর্ণ স্বর তাহারা শুনিতে পায়, জ্বালালে বাবা! একটু ঘুমোতে দেবে না——

শিশু ও মাতা উভয়ের সমস্ত আনন্দের কাকলি সহসা স্তব্ধ হইয়া যায়। মাতা পাশ ফিরিয়া ঘুমাইবার ভাণ করে, শিশু লেপের মধ্যে মুখ লুকাইয়া লয়। ভয়ে তাহার বুক কাঁপে। স্তব্ধতা আবার নিবিড় হইয়া উঠে।

কিন্তু কতক্ষণ এই ভাবে থাকা যায়? শিশু ধীরে ধীরে লেপের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া চারিদিকে তাকায়। বাড়ীর ছাদে হাওয়ার গতিনির্দ্দেশ করিবার যন্ত্রটি শব্দ করিতে করিতে ঘুরিতে থাকে, নলের গা বাহিয়া জল পড়ার শব্দ শুনা যায়, নদীর পরপারে গ্রামগুলি হইতে ঘণ্টার শব্দ ভাসিয়া আসে, আইভি-বেষ্টিত দেওয়ালে নানা জাতের পাখী কলরব করিতে থাকে, তাহার মধ্যে দুই-একটির উচ্চ তীব্র স্বর আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠে, চিম্‌নির উপর হয় ত' একটি সঙ্গীহারা কপোত অবিশ্রান্তভাবে ডাকিয়া যায়, এই সমস্ত শব্দই ঘুমপাড়ানি গানের মত তাহার মনে আসিয়া সঞ্চিত হয়। সে ঐ সুরের সহিত আপনার কণ্ঠ মিলাইতে চেষ্টা করে—প্রথমে অতি ধীরে, ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া তাহার কাকলি চীৎকারে পরিণত হয়। তখন সহসা সে পিতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায়—নাঃ, এই বাঁদরের কেঁচ্‌কেচানি আর থাম্‌বে না! দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা—কান পাকিয়ে ছিঁড়ে দেব শুয়ার . . .

ক্রিশ্‌তফ্‌ ক্ষিপ্রগতিতে লেপের মধ্যে আবার ঢুকিয়া পড়ে, বালিশের নীচে মুখ রাখিয়া হাসিবে, কি, কাঁদিবে, তাহা ভাবিয়া পায় না। সে ভয় পায়, আপনাকে অপমানিত মনে করে, কিন্তু সেই সঙ্গেই বাঁদর, গাধা, শুয়োর প্রভৃতি নাম যে তাহার পিতা তাহাকে দিয়াছে, তাহাতে সে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করে। হাসি আর চাপিতে পারে না, লেপের ভিতর হইতেই বাঁদর বা গাধার স্বর নকল করিবার চেষ্টা করে, ক্রুদ্ধ পিতা হয় ত' তাহার পিঠে এক চড় বসাইয়া দেয়, সে কাঁদে, তাহার চোখের সমস্ত অশ্রুবিন্দু যেন সে ঢালিয়া দেয় তাহার সেই কান্নায়। নিজের অপরাধ খুঁজিয়া পায় না। তাহার হাসিতে ইচ্ছা করে, উঠিতে চায়, শুইয়া থাকিতে তাহার ভাল লাগে না। তবু তাহাকে শুইয়া থাকিতেই হইবে। তাহার নড়িবার উপায় নাই! ভাবে—মানুষ এত ঘুমায় কি ক'রে? ওরা কখন উঠ্‌বে?

এমনি দুঃসহ বন্দী অবস্থায় থাকিয়া একদিন সকালে সে শুনিতে পাইল, পথে কুকুর, বিড়াল বা অন্য কোন একটা জন্তু ডাকিতেছে। সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বিছানা হইতে অতি সন্তর্পণে নামিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে গিয়া দেখিল, দ্বার বন্ধ! কিন্তু বাহিরে তাহাকে যাইতেই হইবে। সে

একটি চেয়ারে উঠিয়া খিল খুলিবার জন্য হাত বাড়াইতেই হঠাৎ পিছলাইয়া সব শুদ্ধ মাটিতে পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার উপর পিতার নিকট প্রহার!— সে সব সময় মার খায়! ক্রমশ—

অনুবাদক—শ্রীকালিদাস নাগ।
শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

শুনেছি কাছের মিলন খণ্ড। পূর্ণ মিলন লাভ করতে হ'লে বিচ্ছেদের অগ্নি-পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া চাই। কিন্তু এই যে অন্তরের নিগূঢ় বিরহ, এর মাঝে কোথায় কেমন ক'রে মিলন সম্ভব?—

—বাদল বেলা



কাব্য-কানন

—শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১)

একটা বুনো গাছে লাল রঙের একটা ফুল ফুটিয়াছিল। অণিমা আব্দারের স্বরে বলিল, ঐ ফুলটা নেবো, চলুন।

অণিমার মা, কন্যাকে ধমক দিয়া বলিলেন, কি একটা বাজে ফুল,—ও নিতে হবে না।

অণিমা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, তোমার সব তাতেই বকুনি!

অমল একটু হাসিয়া বলিল, সামান্য একটা ফুলের জন্যে অত গোলমালে কাজ কি? আমি এনে দিচ্ছি।

অমল একটু দ্রুত হাঁটিয়া ফুলটা তুলিয়া আনিয়া অণিমার হাতে দিল। সে ছোট ফুলটি প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিল, কেমন সুন্দর ফুলটি, দেখ ত' মা!

অমল বলিল, 'গন্ধহীন পুষ্পে কেবা ক'রে সমাদর'?

অণিমা ঘাড় তুলিয়া বলিল, কেউ না?

অমল মাথা নাড়িয়া বলিল, কেউ না। জগতে গুণ না থাকলে কারুর আদর নেই।

অণিমা বলিল, জগতে গুণহীন কোন জিনিষ আমাকে দেখাতে পারেন?

অমল বলিল, পারি। উপস্থিত তোমার এই ফুলের কথাটাই ধর।

অণিমা হস্তস্থিত ফুলটাকে একবার দেখিল। বলিল, এর আদর কি কারুর কাছে নেই?

অমল একটু হাসিয়া বলিল, উপস্থিত তোমার কাছে আছে বলেই দেখ্‌ছি।

অণিমা বলিল, আমার কথা ছেড়ে দিন।

অমল বলিল, তবে কার কথা ধর্‌বো ?

অণিমা বিরক্ত হইয়া বলিল, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক কর্‌তে চাই নে। আপনি তর্ক কর্‌তে জানেন না।

অমল বলিল, যখন স্কুলে পড়্‌তুম, তখন ডিবেটিং ক্লাবে ঐ রকমই একটা অপবাদ দিয়ে আমাকে কেউ কথা বল্‌তে দিত না।

এ তর্কের অবসান হইল দুর্গারাণীর কথায়। দুর্গারাণী বলিলেন, হাঁ বাবা, ফির্‌তে রাত হবে না ত' ?

অমল বলিল, না মাসি-মা, সন্ধ্যে হ'তে এখনও ঢের দেরী। এ দিকটা ঝোপ আছে ব'লে এমন বোধ হচ্ছে।

অণিমা বলিল, মা তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না ত' ?

দুর্গারাণী বলিলেন, না এইটুকু হাঁটায় কোন পরিশ্রম হ'য়েছে ব'লেই বোধ হচ্ছে না।

অমল উৎসাহিত হইয়া বলিল, না হওয়াই ত' উচিত, মাসি-মা! আগেকার মেয়েরা—

অণিমা বাধা দিয়া বলিল, থাক্ আর আগেকার মেয়েদের এখানে টেনে আন্‌বার কোন দরকার নেই। এ-কাল ত' আর সে-কাল নয়।

অমল দুর্গারাণীর প্রতি চাহিয়া বলিল, দেখুন ত' মাসি-মা, অণিমা কথায় কথায় আমার সঙ্গে ঝগড়া করে কেন ?

দুর্গারাণী কোন উত্তর করিলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র।

প্রান্তরের মাঝখানে একটা অশ্বত্থগাছের উপর নানাপাখীর কোলাহল হইতেছিল। সম্মুখে মেঘের কোলে নীল পাহাড়ের শ্রেণী আকাশের গায়ে ছবির মত দেখাইতেছিল। নদীর ও-পারে কুলিদের বস্তি হইতে বক্রাকারে ধূম ছিন্নভাবে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সন্ধ্যার আবছায়া-রংয়ের সহিত মিশিয়া দূরাগত কোলাহলের অস্পষ্ট শব্দ একটি মধুর করুণ রস সৃষ্টি করিতেছিল। অমল অণিমার দিকে চাহিয়া দেখিল, সে অন্যমনে চলিয়াছে। সে বলিল, অণিমা!

অণিমা বলিল, কি বল্‌ছেন ?

অমল বলিল, তুমি কবিতা লিখ্‌তে পার ?

অণিমা অমলের এই প্রশ্নে একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন বলুন ত' ?

অমল বলিল, অম্‌নি জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি, পার ?

অণিমা বলিল, না।

অমল আর কোন কথা কহিল না।

অণিমা একটু পরে বলিল, আজ আপনার মনে হঠাৎ এ প্রশ্ন উঠ্‌লো কেন ?

অমল বলিল, কি জানি কেন। তবে যেন আজ মনে হচ্ছে, শুধু ইতিহাসের নিরস ঘটনা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাক্‌তে পারে না। সব জিনিষের মধ্যে একটু মাধুর্য্য আছে ; সেটুকুকে বাদ দিলে বাকীটা নিয়ে জীবন কাটানো একটা মস্তবড় দায় হ'য়ে ওঠে।

অণিমা অমলের দিকে চাহিল। যে-লোক শুধু ইতিহাসের চর্চ্চা লইয়াই জীবন কাটাইবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে, কাব্য যাহার কাছে নিছক ক্ষণিক খেয়ালমাত্র, তাহার মুখে হঠাৎ কাব্যের প্রশংসা শুনিয়া সে শুধু কৌতুক অনুভব করিল না, আশ্চর্য্যও হইল। শ্লেষের স্বরে বলিল, আপ্‌নার এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি ? স্থান মাহাত্ম্য, না সঙ্গদোষ ?

অমল সহজভাবেই বলিল, এ স্থানের মাহাত্ম্য আর আমার কাছে কিছু নেই। সঙ্গদোষও যে আমার মত পরিবর্ত্তনের কারণ, একথা বলা যায় না। কারণ এ সঙ্গ আর নতুন নয়।

একটু পরে অণিমা বলিল, আপ্‌নার এ ভাব্‌টা আর ক'সেকেণ্ড থাক্‌বে ?

অমল উত্তর করিল, সে কথার সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। হয় ত' পরের মুহূর্ত্তেই কবিদের প্রতি আমার স্বাভাবিক ঘৃণাটা আবার মাথা তুল্‌তে পারে, আবার সারা জীবনটাই হয় ত' কবিদের পূজো ক'রে যেতে পারি।

ক্ষণেক পরে অণিমার প্রতি যেন একান্ত নির্ভরশীল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, আচ্ছা যদি শেষেরটাই সত্যি হয়, তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমার আর কোথাও অমিল থাক্‌বে না, নয়

অমল কি ভাবিয়া কথাটা বলিল, তাহা হয় ত' অণিমা ঠিক্ বুঝিতে পারিল না ; কিন্তু অমলের কথার মধ্যে একটা আন্তরিকতা এবং অকৃত্রিমতা ছিল, যাহা অণিমাকে মুহূর্ত্তের জন্য রাঙাইয়া তুলিল। অমলের কথার কোন উত্তর না দিয়া দুর্গারাণীর দিকে ফিরিয়া সে বলিল, মা, এইবারে ফিরি চল।

অমল সামান্য অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, আজ কথায় কথায় একটু বেশী সন্ধ্যে হ'য়ে প'ড়েছে।

দুর্গারাণী ফিরিয়া বলিলেন, তাতে আর কি হ'য়েছে ?

একটা মোড় পার হইবার পর অণিমা বলিল, অমল বাবু, আপ্‌নার এই পরিবর্ত্তিত মত বরাবর থাকৃলে আমার সঙ্গে আর আপনার মতের অমিল হ'তে পারে কিনা ;—তার উত্তর হচ্ছে এই যে, এই মত বরাবর থাকৃলে অমিল নাও হ'তে পারে।

অমল বলিল, অমি ঠিক্ তা বলি নি।

অণিমা বলিল, তবে কি বল্‌ছিলেন ?

অমল বলিল, বল্‌ছিলাম, এই বিরুদ্ধ-স্বভাবের জন্যে তোমার সঙ্গে আমার মনের মিল ছিল না। বোধ হয় আর এ অমিল থাকৃবে না।

অণিমা জড়িতস্বরে কি উত্তর দিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল, অমল তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইল না, কিন্তু বুঝিল একটা অনুচিত কথা সে বলিয়া ফেলিয়াছে। এবং তাহারই কৈফিয়ৎস্বরূপ দুর্গারাণীকে বলিল, দেখুন মাসি-মা, গল্প করতে করতে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখন কাকে কি বলা হচ্ছে জ্ঞান থাকে না।

দুর্গারাণী গোড়া হইতেই কোন কথা মনোযোগ দিয়া শোনেন নাই, এবং অমলের কথাটাও ছেলেমানুষী মনে করিয়া স্মিত-মুখে নিরুত্তর রহিলেন।

২

অণিমার সহিত পরিচয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস অমলের মনে ছিল না ; বা মনে থাকিলেও পুরাতন পাতাগুলো উল্টাইয়া দেখিবার আবশ্যকতা সে কোনদিনই অনুভব করে নাই। বাধাহীন পথ চলার আনন্দ যতক্ষণ স্বভাবগতিতে আসিতে থাকে, ততক্ষণ মানুষ কোনদিন সে আনন্দের অতীত বা ভবিষ্যৎ দেখিতে চায় না। কিন্তু যখন সে আনন্দ অতীত নির্দ্দেশ করিয়া দেয় সেই মুহূর্ত্তে মানুষ ভবিষ্যতের পানে নিতান্ত আগ্রহান্বিত দৃষ্টিতে চাহিতে চায়। ভবিষ্যতের আসলরূপ তখন গাঢ় যবনিকার অন্তরালে ঢাকা থাকে,—যাহা দেখা যায় তাহা কল্পনার রঙ্গে রঙীন।

অমল আজ অণিমার সহিত ঘনিষ্ঠতার ভবিষ্যৎ ফল দেখিতে চাহিল। ভবিষ্যতের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে যাহা দেখিল, তাহাতে নিরাশার লেশমাত্র দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইল জীবনটাকে গদ্যের মধ্য দিয়া, শুষ্ক বিদ্যার মধ্য দিয়া, নীরস পাণ্ডিত্যের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া অতিশয় মূর্খতা। পৃথিবীর সঞ্চিত রসটুকুকে বাদ দিয়া মাটি লইলে জীবন কোনদিন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

আকাশের মধ্যখানে একটা চিল কেবলই ঘুরিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া অমলের মনে হইল, এই বিশেষত্বহীন ব্যাপারগুলাও কবির দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

একটা জামা পরিয়া অমল অণিমাদের বাড়ীর দিকে চলিল। অণিমা বাহিরের বাগানে বেড়াইতেছিল। অমল তাহার নিকটে গিয়া বলিল, আচ্ছা অণিমা, তোমার মনে আছে, তোমাদের সঙ্গে আমার প্রথম কি ক'রে আলাপ হয়?

অণিমা বলিল, হঠাৎ আপনার আবার কি খেয়াল চাপলো?

অমল বলিল, কোন খেয়াল চাপে নি। তোমার মনে আছে?

অণিমা বলিল, আছে। পরে অন্যদিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, একদা সান্ধ্যভ্রমণে এই প্রবাসের মাঝে পথভোলা হওয়ায়—

অমল বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমার ঠাট্টা রাখ।

অণিমা বলিয়া যাইতে লাগিল, পথভোলা হওয়ায় মহাশয়কে সাহায্য করবার জন্য প্রার্থনা করা হয়। অতঃপর সেই শুভ বা অশুভ মুহূর্ত থেকেই—

অমল বাধা দিয়া বলিল, থাক্, আর বল্‌তে হবে না।

অণিমা ছেলেমানুষের মত খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, আজ কি খবর? হঠাৎ এত তাড়ার কারণ কি?

অমল কোন উত্তর করিল না।

অণিমা বলিল, অমল বাবু, এ বাড়ীটায় আগে কারা ছিল?

অমল বলিল, একজন মাড়োয়ারী ভাড়াটে ছিল।

কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিল। অণিমা একটা ফুলকে নাড়া দিতে দিতে এক সময় অমলের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিল। অল্পক্ষণ কি ভাবিল; বলিল, আমি মা'র কাছে চল্‌লুম্। যাবেন ত' আসুন।

অমল বলিল, একটু পরে যাব। এসো একটু বেড়াই।

দুজনে বেড়াইতে লাগিল। অমল বলিল, আজ বিকালে বেড়াতে যাবে ত'?

অণিমা বলিল, সে নিয়মের ব্যতিক্রম ত' কোনদিন হয় নি।

অমল একটু অপ্রস্তুত হইল। বলিল, তোমরা এখানে আর কতদিন থাক্‌বে?

অণিমা বলিল, যতদিন দাদার ইচ্ছে হয়। আপ্‌নি কতদিন?

অমল বলিল, আর কুড়িদিন পরে কলেজ খুল্‌বে। বোধহয় দিন পনের এখানে থাক্‌বো।

আরো খানিক ঘুরিয়া অণিমা বলিল, ভেতরে চলুন।

অমল বলিল, তুমি যাও, আমি এখন যাব না।

আচ্ছা, বলিয়া অণিমা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

অণিমা চলিয়া গেলে অমলের মনে হইল, সে অণিমাকে কিছু বলিতে আসিয়াছিল। কি তাহার বলিবার আছে, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিল যে, বলিবার কিছুই নাই। বাগান হইতে বাহির হইয়া ডান্ দিকের লাল পথ ধরিয়া হাঁটিতে লাগিল।

সেদিন বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে অমল দুর্গারাণীকে বলিল, মাসি-মা, আপ্‌নি বল্‌তে পারেন বাংলায় ও পশ্চিমে প্রভেদ কোন্‌খানে?

দুর্গারাণী বলিলেন, প্রভেদ এই যে, বাংলায় যে ধুলো আর ধোঁয়া আছে, এখানে তা' নেই।

অমল বলিল, তা নয়। বাংলায় পল্লীগ্রামেও ত' ধুলো-ধোঁয়া নেই।

দুর্গারাণী বলিলেন, আম্‌রা ত' আর বাবা পল্লীগ্রামে থাকি না।

অণিমা বলিল, বাংলায় আর পশ্চিমে প্রভেদ কি, আমি বল্‌তে পারি।

অমল তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, কি?

অণিমা বলিল, বাংলার অ-কবিরা এখানে এলে হঠাৎ-কবি হ'য়ে ওঠে।

অণিমার খোঁচাটুকু পরম আনন্দের সহিত গায়ে মাখিয়া লইয়া অমল বলিল, তুমি ঠিকই ব'লেছ। বাস্তবিকই মানুষ যে কোন্ মুহূর্ত্তে কবি হ'য়ে ওঠে, সে কথা বোধ হয় কোন শাস্ত্রই বল্‌তে পারে না।

অমল আরও কি বলিতে যাইতেছিল, অণিমা বাধা দিয়া বলিল, এখন আর আপ্‌নাকে বক্তৃতা কর্‌তে হবে না।

দুর্গারাণী কন্যাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুই বড্ড বকিস্।

অণিমা বলিল, অমল বাবু শীগ্‌গীরই আমাকে ছাড়িয়ে উঠ্‌বেন না।

পরে অমলের পাশে গিয়া বলিল, আপনি আমার ওপর রাগ ক'রছেন অমল বাবু? জানেনই ত' আমি বড্ড ফাজিল!

অমল অণিমার দিকে চাহিয়া একটা প্রবল আকাঙ্খা দমন করিয়া লইল। দৃষ্টি নামাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, না।

অণিমা ছেলেমানুষের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সত্যি সত্যি?

(৩)

অল্পদিনের মধ্যেই অমল আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, অণিমা আর তাহার সহিত

তেমন ঘনিষ্টভাবে মেশে না। এই কথাটা লইয়াই সে মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। ক'দিন হইতে সে দেখিয়া আসিতেছে, অণিমা তাহার সহিত একাকী বড় কম থাকে। এবং সে যখনই যায় তখনই অণিমা তাহাদের মাঝখানে দুর্গারাণীকে আনিয়া হাজির করে। তাহার অনেক দিন পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল। একদিন অণিমার সহিত কবিতা লইয়া তর্ক চলিতেছিল। তুমুল তর্কের অবসর-পথ দিয়া সময় যে কতক্ষণ চলিয়া গেল কাহারও খেয়াল ছিল না। এক সময়ে অণিমার দাদামহাশয় আসিয়া দু'জনের মাথা ঠুকিয়া দিয়া সে দিনকার তর্কের অবসান করিয়া দিলেন।

আর একদিনের কথা মনে পড়িল। সে দিন তাহার অণিমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল। আহার্য্যের গুণাগুণ লইয়া গল্প হইতে হইতে ক্রমে প্রাচীন মিশর, ভারতের আহার্য্যের আলোচনা আসিয়া পড়িল। দুর্গারাণীর ধমকে উভয়কে চুপ করিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বের অণিমার সহিত এখনকার অণিমার অনেক প্রভেদ অমল দেখিতে পাইল। অমল অণিমার মা'য়ের সহিত দেখা করিতে প্রায়ই আসিত। আজ কয়দিন ধরিয়া সে তাহাদের বাড়ীতে আসা বন্ধ করিয়াছে। অমল স্থির করিয়াছিল, সে-দিন সে আর অণিমাদের বাড়ী যাইবে না। কিন্তু একটা অভিযোগ লইয়া সে অণিমার সহিত দেখা করিতে চলিল। অণিমা কেন আর তাহাদের বাড়ী যায় না,—এই অভিযোগটা কিরূপে ব্যক্ত করিবে, পথে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

যাহা বলিবে স্থির করিয়াছিল, অণিমার সহিত দেখা হইলে সে কথা না বলিয়া বলিল, আমি আর এক সপ্তাহ বাদে কল্‌কাতা যাব।

টেবিলের দুই দিকে দু'জনে মুখোমুখী হইয়া বসিয়াছিল। অণিমা মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, ওঃ।

এবং কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

অমল একাকী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, অণিমা ফিরিল না। অমল আর একটু বসিয়া থাকিয়া চলিয়া আসিল। অণিমার এই তাচ্ছিল্য তাহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়া দিতে লাগিল।

বিকালে অমল অণিমাদের সহিত ভ্রমণে যোগদান করিল না। ফিরিবার পথে দুর্গারাণী কন্যাকে বলিলেন, আজ অমল আসে নি, বোধ হচ্ছে যেন বেড়ানই হ'ল না।

অণিমা বলিল, অমল বাবু যে আজ বাদে কাল কলকাতা চ'লে যাবেন, তখন ত' তা'হলে তোমার বেড়ানই হবে না।

দুর্গারাণী বলিলেন, অমল কবে যাবে?

আজ সকালে বল্‌ছিলেন, আর এক সপ্তাহ বাদে যাবেন।

দুর্গারাণী বলিলেন, সকালে অমল এসেছিল নাকি?

অণিমা বলিল, এসেছিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকেন নি।

দুর্গারাণী আপন মনেই বলিলেন, বেশ ছেলেটি!

অণিমা চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন অণিমা দুর্গারাণীর সহিত অমলদের বাড়ীতে গেল। অমল বাড়ীতেই ছিল। অণিমাকে দেখিয়া সে পড়ার ঘর হইতে বাহির হইল না। সেই ঘর হইতেই সে তাহার মায়ের, দুর্গারাণীর এবং অণিমার কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

অণিমা তাহার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, কি গো কবি-মশাই, কি হচ্ছে?

অমলের মন বহুপূর্ব্ব হইতেই দুলিতেছিল, এক্ষণে একদিকে ভার পড়িল। চেষ্টাকৃত উদাসীনতা দেখাইয়া অমল বলিল, পড়া হচ্ছে। হঠাৎ কি মনে ক'রে?

কিছু মনে ক'রে নয়। আপনি কাল যান্ নি কেন?

অমল বলিল, আমারও ঠিক সেই কৈফিয়ৎ।

তরুণ হৃদয়ের গভীর রহস্য এই এক যে, যেখানে সে বিরাগী হয়, সেখানেই সে অতি সহজে গভীরভাবে অনুরাগী হইয়া পড়ে। অমল অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত সঙ্কল্প ভুলিল, নিজের কয়েক মিনিট পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত-স্থিত বেদনা ভুলিল। অণিমা যে এককালে তাহাকে এড়াইতে চাহিয়াছিল, সে কথা তাহার মনে আনিতে ইচ্ছা হইল না। বরং এই কথাই তাহার মনে হইল যে, জীবনের স্বচ্ছন্দ গতির পথে একটা বাধা পড়িয়াছিল, সেটা আজ সরিয়া গিয়া জীবনকে আরো মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। যে সম্পদ সে হাত বাড়াইয়া লইতে যাইতেছে, সেটা হঠাৎ একটা আবরণের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল,—আজ সে আবরণ উন্মুক্ত হইয়া গেল।

শেষকালে অমল অণিমাকে বলিল, আমি কাল তোমাকে একটা উপহার দেব।

অণিমা বলিল, উপহার? কি দেবেন?

আন্দাজ কর ত'।

অণিমা ইচ্ছা করিয়াই এমন কতগুলো দ্রব্যের নাম করিল, যাহা কোনো দিন

উপহারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিল, বলুন্ কি দেবেন।

অমল বলিল, আগে থেকে ব'লে দিলে কোন মূল্য থাকে না।

বল্‌বেন্ না ?

না।

অণিমা মুখভার করিয়া চলিয়া আসিল। তাহার কৃত্রিম রোষ-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল।

বিকালে নিতান্ত সকাল-সকাল অণিমা দুর্গারাণীকে বেড়াইতে যাইবার জন্য তাগাদা দিতে লাগিল।

দুর্গারাণী বলিলেন, অমল আসুক্ না, একসঙ্গে যাব।

অণিমা রাগ করিয়া বলিল, তবে আমি একাই চল্লুম।

যখন অমল আসিল, তখন অণিমার খোঁজ করিয়া দুর্গারাণী জানিলেন, সে সত্যই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দাদামহাশয়ের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে।

পরের দিন অমল অণিমার সহিত বেড়াইতে যাইবার সময় সাক্ষাৎ করিল না। সন্ধ্যার সময় কয়েকটা বই হাতে লইয়া সে বরাবর অণিমার ঘরের দিকে চলিল। অণিমার ঘরে তখন আলো জ্বলিতেছিল; সেই আলোকে অমল বাহির হইতে দেখিল অণিমা একটা ছবির সম্মুখে হেঁট হইয়া প্রণাম করিতেছে। অণিমার এতখানি ভক্তি আছে বলিয়া অমল জানিত না। ছবিটা কিসের তাহা দেখিতে না পাইলেও অমল আন্দাজে বুঝিল কোনো দেব-দেবীর হইবে। এরূপ কোন ছবি সে কোন দিন অণিমার ঘরে দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িল না। পরক্ষণে যখন দেখিল, পাশে বাক্স খোলা পড়িয়া আছে, তখন তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ছবিটি অল্পক্ষণ হইল বাক্স হইতে মুক্ত হইয়াছে।

ঘরে ঢুকিবে কি না ভাবিতেছিল, এমন সময় দেখিল দুর্গারাণী আসিতেছেন। তিনি নিকটে আসিলে অমল বলিল, অণিমা যে পূজো করে আমি জানতুম না।

দুর্গারাণী একবার পূজারতা কন্যার প্রতি চাহিলেন, পরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, বাবা এখন একটু এ-দিকে এস।

অমল দুর্গারাণীর সহিত দালানের অপর প্রান্তে গেল। বাহিরের আলোকে সে অতিশয় বিস্ময়ের সহিত দেখিল, দুর্গারাণীর দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতেছে। সে কোন প্রশ্ন করিল না, কিন্তু সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গারাণী নিজেই আর্দ্র কণ্ঠে কথা কহিলেন। বলিলেন, ওটি ওর স্বামীর ফটো।

অমল যেন অন্ধকারে হঠাৎ সাপ দেখিল। বিকৃত কণ্ঠে কহিল, অণিমার স্বামী কি রকম? ওর কি বিয়ে হয়েছে!

দুর্গারাণী চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, আজ দেড় বছর হ'ল ও বিধবা হ'য়েছে। সেই অবধি স্বামীর ফটোখানিকে রোজ নমস্কার করে। আর বিয়ে ও' কিছুতেই করলে না।

অমলের চোখের সম্মুখে একটা উজ্জ্বল আলোক নিবিয়া গেল। তাহার বড় ইচ্ছা হইল এই বৃদ্ধাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পালায়। তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে এ কথা বলেন নি কেন?

দুর্গারাণী বলিলেন, ও-কথাটা আমরাই ভুলে থাকতে চাই। ঐ টুকু মেয়ে যে বিধবা, ভাবতে গেলেও বুকটা কেমন করে। ছোট-বেলায় বাপ মারা গেছে,—

তিনি আর বলিতে পারিলেন না; চোখ মুছিতে লাগিলেন। অমলের মনে হইল, এ বাড়ীর বদ্ধ হাওয়ায় তাহার দম আটকাইয়া যাইতেছে। হাতের বই-গুলার দিকে চাহিল;—সেগুলা ধপাস্ করিয়া পাশে জানালার উপর রাখিয়া দিয়া একপ্রকার ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাগানে পৌছিয়া অমল পিছন ফিরিয়া একবার হলদে বাড়ীটার দিকে চাহিল। অণিমার ঘরের আলোকময় জানালা দেখা গেল। সেই দিকে চাহিয়া অমলের শ্বাস-রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। উজ্জ্বল আলোক চোখ ধাঁধাইয়া হঠাৎ নিবিয়া গেলে যেমন সমস্ত অন্ধকারময় করিয়া দেয়, অমলের চোখের সম্মুখ হইতেও তেমনি এক আলোক নিবিয়া গিয়া জগতকে তাহার নিকট অন্ধকারময় করিয়া দিল। পথহারা শ্রান্ত পথিকের ভয়-সঙ্কুল বনের মধ্যে সন্ধ্যা হইয়া গেলে সে যেমন ইতস্তত ভয়চকিত দৃষ্টি-চালনা করে, অমল তেমনি অন্ধকার ঢাকা পৃথিবীর চারিদিকে এক একবার দেখিতে লাগিল। এবং অনির্দ্দিষ্ট ভাবে সম্মুখে যে পথ পাইল, তাহা ধরিয়া চলিতে লাগিল।

অমল যখন ছুটিয়া চলিয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তে দুর্গারাণীর যেন একটা দৃষ্টি খুলিয়া গেল। এবং তখনই জানিতে পারিলেন কত বড় এক ভুলকে তিনি সযত্নে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। অলক্ষিতে সে ভুল যে কতখানি ক্ষতি করিয়া গেল, সে কথা সামান্য একটু ভাবিতেই তাঁহার শোক-জর্জ্জরিত হাড় ক'খানার ভিতর দিয়া একটা শীতলতা বহিয়া গেল।

ক্ষণপরেই অণিমা আসিয়া বলিল, মা, অমল বাবুর গলা শুনতে পাওয়া গেল না?

দুর্গারাণী বলিলেন, হাঁ এসেছিল, চ'লে গেছে।

এই বলিয়া দুর্গারাণী চলিয়া যাইতেছিলেন, অণিমা জানালার উপর বইগুলা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ বই কোথা থেকে এলো মা?

দুর্গারাণী চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, অমল রেখে গেছে।

অণিমা সমস্ত বই ক'টা নিজের ঘরে আনিয়া দেখিল,—সমস্তই কবিতার বই। প্রত্যেকটাই তাহার নামে উপহার দেওয়া হইয়াছে। নীচে অমলের নাম স্বাক্ষর করা রহিয়াছে। অণিমা কয়েকটা বইয়ের পাতা উল্টাইল,—কয়েকটা খুলিল না। সে-গুলো কোলের উপর রাখিয়া জানালা দিয়া বাহিরের ঝিল্লি-মুখরিত অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

পরের দিন অমলের দেখা পাওয়া গেল না। সে সম্বন্ধে দুর্গারাণী বা অণিমা, কেহই কোন কথা কহিল না। বিকালে দুর্গারাণী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গিয়া প্রতি পদক্ষেপ-ধ্বনির সঙ্গে এক জনের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। অমলকে তিনি এই কয় দিনের পরিচয়েই ভালবাসিয়াছিলেন। তাঁহার অসতর্কতার দরুন অমলের মাথায় যতখানি বেদনা চাপাইলেন, তাহা নিঃশেষে মুছিয়া লইবার জন্য তাঁহার মাতৃ-হৃদয় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

তাহার পরদিন অমলের মা' বেড়াইতে আসিয়া বলিলেন, অমল পড়া সম্বন্ধীয় কোন এক বিষয়ে আবশ্যকবশত পূর্ব্বরাত্রের গাড়ীতে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে।

দুর্গারাণী সমস্তই বুঝিলেন। নিঃশব্দে বেদনা-পীড়িত একটা নিশ্বাস তিনি শূন্যে ছাড়িয়া দিলেন।

অমলের মা চলিয়া গেলে অণিমা নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিল। কয়েক মিনিট সে বাহিরের রৌদ্র-দগ্ধ শূন্যের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে তাকের উপর হইতে অমলের প্রদত্ত বইগুলা পাড়িয়া একে একে তাহার উপহার-পৃষ্ঠাগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিল। ছিন্ন পাতাগুলি কুচি কুচি করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। কাগজের টুকরাগুলা নাচিতে নাচিতে পড়িতে লাগিল, অণিমা স্তব্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। অর্থহীনদৃষ্টিতে বহুক্ষণ সেই ভাবে সে চাহিয়া রহিল। রৌদ্র সরিতে সরিতে অনেকখানি সরিয়া গেল।

এক সময়ে অণিমার যেন চমক ভাঙিল। বাক্স খুলিয়া স্বামীর ফটোখানা বাহির করিয়া প্রাণহীন মূর্ত্তির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। পরে সেটিকে বুকের উপর লইয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

—— ——

ন্যুট হাম্‌সুন

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

এক

দু'টি বিভিন্ন প্রবৃত্তি মানুষের সমস্ত সভ্যতার মূলে রয়েছে। একটি তাকে পথিক করেছে—চির অশান্ত পথ-প্রেমিক যাযাবরের মত, আর একটি তাকে গৃহী করেছে; নীড় নির্ম্মাতা পাখীর মত পথ থেকে খড়-কুটো তু'লে এনে যার প্রেরণায় সে ঘর বেঁধেছে। একটি তাকে উদাস ক'রে পথের ধূলার সঙ্গে এক ক'রে দিয়েছে আর একটি তাকে সন্ধ্যায় তুলসী-মূলে প্রদীপ জ্বালাতে শিখিয়েছে।

আজ যাঁর কথা বল্‌ব, তাঁর সাহিত্য ও জীবন, এই দু'ই প্রেরণার অভিব্যক্তি। ন্যুট হাম্‌সুন-এর সমস্ত সাহিত্যে মাত্র দু'টি নায়ক আছে। একটি উদাসিয়া পথিক, গহনতম বনের তৃণাঙ্কুরের সাথী আর একটি এই মাটীর শিশু, তৃণাঙ্কুরেরই মত মাটীর বুক আঁকড়ে থাক্‌তে চায়—একটি Glahn আর একটি Isak. হয় ত' এই দুই নায়ক একই ব্যক্তির প্রকাশ এবং সেই ব্যক্তি স্বয়ং ন্যুট হাম্‌সুন্।

দুই

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা আগষ্ট, নরওয়ের লুম গ্রামে হামসুন এক কৃষক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাটীর সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক। যখন চার বছর বয়স তখন তাঁরা সব আর্থিক উন্নতির জন্য নর্ডল্যাণ্ডের Lofoten Island-এ উঠে যান।

এই নর্ডল্যাণ্ড প্রকৃত পক্ষে ন্যুট হামসুনের জননী ও ধাত্রী। সমস্ত শৈশব এই মায়াময় রাজ্যে অতিবাহিত হয়। Bjornson ও Jonas Lie তাঁদের সাহিত্যে নর্ডল্যাণ্ড-কে অমর ক'রে রেখে গেছেন। এখানকার মানুষেরা ভয়ঙ্করের সঙ্গে বাস কর্‌তে বাধ্য হ'য়ে ভয়কে সুন্দর করেছে। সমুদ্রে তাদের উপজীবিকার ধন। আকাশে মাসের পর মাস সূর্য্য নেই। এক স্তিমিত আলো-ছায়ার ধরণী রহস্যময়

হয়ে ওঠে। তাই রহস্তকে তারা শ্রদ্ধা করে। আবার সূর্য্য আসে, রৌদ্র হয় অবিরত দিনের পর দিন। রাত্রি রৌদ্রময়ী দিন। এ রৌদ্র আমাদের এই গ্রীষ্ম-উষর দেশের অবহেলার নিত্যসামগ্রী নয়!—এ রৌদ্র যেন আকাশের স্বপ্ন। এ রৌদ্রের উৎসব হয়। নিবিড় বন থেকে নিয়ত সুগন্ধ উঠ্‌ছে—আকাশের কাছে ধরণীর প্রার্থনার মত। জোনাস লাইতে আছে,—"এখানকার সূর্য্য এত স্নেহগাঢ় ভাবে ধরণীকে চুম্বন করে—কেননা সে জানে ধরণীর সঙ্গে তার সহবাসের সময় অল্প।"

ন্যুট হামস্থনের সাহিত্যে প্রকৃতির যে স্তব পাই, তাহা প্রথমে এইখানেই তিনি আহরণ করেন। শৈশবে তাঁর একজন অতিপ্রিয় সঙ্গী ছিল। সে ছাড়া হয় ত' আর কোন সঙ্গী শৈশবে ও কৈশোরে ন্যুট হামস্থনের ছিল না। সে শৈশব সঙ্গী তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনেরও প্রিয়তম সাথী। সে প্রকৃতি।

তাঁর কাজ ছিল ছাগল চরান। নর্ডল্যাণ্ডের মোহময় প্রকৃতির একান্ত নির্জ্জনতা ছিল ন্যুট হামস্থনের শৈশবের স্বপ্নভূমি। প্রায়ই একলা বনের মধ্যে সারাদিন ঘুরে বেড়া'তেন Pan-এর Glahn-র মত। এই শৈশবটুকু যেন একখানি তন্ত্রীর মত—প্রকৃতির ক্ষীণতম রূপতরঙ্গে যেখানে মূর্চ্ছনা জাগ্‌ত। এই মূর্চ্ছনা থেকেই পরে Pan-এর সৃষ্টি হয়।

কিছুদিন পরে ন্যুট হাম্‌সুনকে তাঁর কাকার কাছে লেখাপড়া শেখ্‌বার জন্যে পাঠান হয়। কাকা ছিলেন সামান্য একজন ধর্ম্মযাজক। তিনি চাইলেন নিয়ম ক'রে প্রায় সারাদিন ধ'রেই বই মুখস্থ করা। বালক হামসুন্ অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। আনন্দ যেন সঙ্কুচিত হয়ে এল! যেটুকু ছুটি পেত যেখানে গ্রামের সব কবর বহু যুগ ধ'রে প'ড়ে আছে বালক সেই মাঠে একা ঘু'রে বেড়াত। কবরের উপর যে সব লেখা থাকৃত সেগুলি জোরে জোরে পড়্‌ত। মনে মনে তাদের নিয়ে গল্প তৈরী করৃত। ভাঙা কবরের পাশ দিয়ে যে যাতায়াত ক'রে যেত তাকে ডেকে কথা বল্‌ত। যে লোকটা মড়া পোঁতবার জন্যে মাটি খুঁড়্‌ত মাঝে মাঝে জোর ক'রে তার সঙ্গে সে-ও মাটী খুঁড়্‌তে লেগে যেত।

কাকার কাছে থেকে সুবিধে হ'ল না। স্কুলে মাইনে দেবার পয়সা নেই। অবশেষে এক মুচীর দোকানে ন্যুট হামসুন চাকরী পেল। এই সময় ছেঁড়া-জুতো সেলাই করতে করতে ন্যুট হামসুন প্রথম কবিতা লেখেন। তারপরে সেই সময়ে আর একটি গল্প লেখেন। নিজে মুচীগিরি ক'রে যা জমিয়েছিলেন তাই দিয়ে বই ছাপান হ'ল। এবং সেখানকার দুই একজন লোক কিনেও ছিল।

বেশী দিন মুচীর কাজ ভাল লাগ্‌ল না। জাহাজের ডকে কয়লা বোঝাই করার কাজ নিল। তার পর থেকে দীর্ঘ দশ বৎসর ধ'রে ছন্নছাড়া পথিকের মত কখনো রাস্তায় পাথর-ভাঙার কাজ করে—কখনো কারুর বাড়ীর বাসন ধুয়ে য়ুরোপের শহরে শহরে পথে পথে দিন কেটেছে। এই সময়কার অভিজ্ঞতার কথা —Under the Autumn Star ও With Muted Strings-এ আছে।

পথিক পথে চলে, পথে থাকে। পথে তার রাত্রি আসে, দিন যায়। দূর থেকে দীপান্বিত গৃহের আলো তাকে লোভ দেখায়। অন্তরে তখনও কাব্যের প্রতি গাঢ় অনুরাগ অন্তর্হিত হয় নি। শেষকালে নরওয়ের রাজধানী ক্রিশ্চিয়ানা শহরে (বর্ত্তমান অস্লো শহর) Hunger-এর রঙ্গমঞ্চের, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হয়ে বহুকষ্টে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তখন ন্যূট হামসুনের মুখে চোখে এবং সারা গায়ে যে ছাপ ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তা বড় ভাল লাগ্‌ল না। এবং সতীর্থগণও এই নোংরা অসভ্য যুবকটিকে তাদের সহপাঠী বন্ধু ব'লে নিতে নারাজ হওয়ায় অবশেষে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে হল। তখন তিনি আবার পথে বেরোলেন। এখানে দু'দিন কারুর বাড়ী চাকর হয়ে, কোথাও কোন আস্তাবলে সহিস হয়ে, আবার নরওয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষে কোন রকমে ভাড়া জোগাড় ক'রে আমেরিকা রওনা হলেন।

এক সময়ে আমাদের এই দেশকে য়ুরোপীয় বণিক ও নাবিকেরা যে চোখে দেখ্‌ত, তখনকার নরওয়ের লোকেরাও সেইচোখে আমেরিকার দিকে চাইত। আমেরিকা যেন স্বর্ণের খনি—সেখানে অর্থ আছে, খ্যাতি আছে—যশোপার্জ্জনের উপায় আছে। তাই দেখতে পাওয়া যায় Bjornson, Ibsen ও Bojer-এর বহুনায়ক সব আমেরিকায় চলেছে। ন্যূট হামসুন্‌ও সেই লোভে আমেরিকায় পদার্পণ করেছিলেন। কিন্তু আমেরিকা স্বর্ণখনি নয়। আমেরিকার পথে সোনা প'ড়ে নেই। অবশেষে চিকাগো শহরে এক ট্রামগাড়ীর কণ্ডাক্টারী করতে হল। আর মাঝে মাঝে নরওয়ের কাগজে লেখা পাঠাতেন। কিছুদিন পরে —এক জেলের জাহাজে মাছের ঝুড়ি ব'য়ে উপায় করতেন। কিছুদিন পরে আবার নরওয়েতে ফিরে আসেন। এবং তখন থেকে তাঁর সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হয়।

একদিন একটি যুবক, গায়ে ময়লা চিরকুট, মুখে কদাকার রেখা—ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন শহরের একটি বিখ্যাত পত্রিকার আফিসে হাতে এক গাদা কাগজ নিয়ে সম্পাদকের নিকট উপস্থিত। কাগজগুলি Hunger-এর

পাণ্ডুলিপি। সম্পাদক গায়ের জামার দিকে চেয়ে তখনই লেখককে বিদায় দিচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ মুখের দিকে চাইতে বিদায় দেওয়া হল না। যুবকের মুখের রেখাগুলি কাঁপ্‌ছিল। সম্পাদক পাণ্ডুলিপি চেয়ে নিয়ে এবং লেখকের ঠিকানা নিয়ে লেখককে বিদায় দিলেন। রাত্রে সম্পাদক পাণ্ডুলিপি পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। দুঃখে ও লজ্জায় তার মন ভ'রে উঠ্‌ল। গল্পে ছিল—একজন ক্ষুধাজীর্ণ নিরন্ন প্রতিভাশালী যুবকের কথা—তার অনাহারের মুহূর্ত্তগুলি। একটি ক্ষুধাজীর্ণ দেহ থেকে মস্তিষ্ক ও মন যেন ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে এসে মুখোমুখি আলাপ কর্‌ছে বা প্রলাপ বক্‌ছে।

তখনই পাণ্ডুলিপি পড়া অসমাপ্ত রেখে সম্পাদক একটি দশ-ক্রোনার নোট খামে ক'রে পাঠিয়ে দিয়ে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি পড়্‌তে লাগ্‌লেন। যেখানে গল্পের নায়ক অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে আপনার ঘরে উঠ্‌ছে—পাছে বাড়ীওয়ালা জান্‌তে পারে, ঘরে এসে দেখে একটি খামে কোন সম্পাদকের কাছ থেকে দশ-ক্রোনারের একখানা নোট এসেছে। আনন্দে তার মন ভ'রে উঠ্‌ল। সম্পাদক গল্পের সহিত ঘটনার আশ্চর্য্য সম্মিলন দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে Hunger পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'Hunger'-ই ন্যুট হামসুনকে নরওয়েতে প্রসিদ্ধ কর্‌ল। নরওয়ের বাইরে প্রথমে রুশিয়াতে Hunger অনূদিত হয়।

তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি Shallow Soil, Pan, Victoria, Wanderers, Children of Our Age, Growth of the Soil প্রভৃতি লেখেন। এবং তাহার ফলে তাঁহার যশ স্বদেশে এবং দূর দূরান্ত দেশে প্রচারিত হয় এবং ১৯২০ সালে তিনি নোবেল প্রাইজ পান।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, ন্যুট হামসুন্ কৃষক-বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ তাঁর গর্ব। মাটি তাঁর বন্ধু। তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পুস্তক এই মাটির কথা নিয়েই লেখা। Growth of the Soil-এর নায়কের মত তিনি জনমানবের কোলাহল থেকে বহুদূরে এক বিশাল ভূমি-খণ্ড কিনে সেইখানেই থাকেন। সেখানে একখানা একশো বছরের পুরাতন বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীটা কিনেছেন। তিনি এখন যেখানে আছেন সেই গ্রামে ইব্‌সেন তাঁর যৌবনে এক হাতুড়ে ডাক্তারের শিক্ষানবীশ হয়ে অতি কষ্টে দিনপাত ক'রে গেছেন। বিংশশতাব্দীর সভ্যতামুখর পথে আর ন্যুট হামসুনকে দেখা যায় না।

তিন

ন্যুট হামস্থনের বাইরের জীবনের ছবি একমাত্র Hunger-এ শুধু আছে। তাঁর অন্য সব বই তাঁর চঞ্চল পথিক-হিয়ার সৃষ্টি—নর্ডল্যাণ্ডের সেই রাখাল-শিশুর মনের সৃষ্ট গল্পকাব্য কখনো বা মৃত্তিকার শিশু আদিম কৌতুহলে আবার মৃত্তিকার সুকোমল ক্রোড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করছে—তারি স্তবগান। শুধু একবার মাত্র তিনি সত্যকার জীবন থেকে পাত্র-পাত্রী ও ঘটনা নিয়ে লেখেন। সে Shallow Soil-এ।

তখনকার নরওয়ের যুবকদের মধ্যে বিদ্যাভিমানের বন্যা এসেছিল। তাঁরা সবাই ভাব্‌তেন যে, তাঁরা এক একজন স্রষ্টা। কাফিখানা ছিল এই সব স্রষ্টাদের ঘর ও মন্দির। অপরের স্ত্রী ছিল এঁদের কল্পনার নায়িকা। এবং নায়িকাগণের সম্মুখে তাঁরা পুরাকালের নাইটদের মত চল্‌তেন ফির্‌তেন। এই সব স্রষ্টা অবশ্য কেহ কবি, কেহ নাট্যকার, কেহ পত্রিকা-সম্পাদক। কোন কোন কবির কাব্য-প্রেরণাই আস্‌ত না, যদি না নায়িকার অর্থে কিছুদিন কোন দূর শৈলাবাসে বিশ্রাম করা হত। নগরের দুর্গন্ধ আবহাওয়ায় তাঁদের সৃষ্টির প্রেরণা মাঝপথ থেকেই ফিরে যায়। নগর তাঁদের সহ্য হয় না। এই সমস্ত স্রষ্টাদের অপূর্ব্ব ছবি তুলির রেখার মত Shallow Soil-এ আঁকা আছে। অলস কর্ম্মহীন সঙ্কুচিত জীবনে শুধু অপব্যয়ের লজ্জিত অহঙ্কারে মহত্বের বাণী কাফির পেয়ালার চুমুকের সঙ্গে সঙ্গে ঝ'রে পড়্‌ছে এবং সেই খানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। ডিকেন্সের উপন্যাসের মত Shallow Soil নরওয়ের যথেষ্ট উপকার সাধন করেছে।

কিন্তু ন্যুট হামস্থনকে সেখানে পুরোপুরি পাই, যেখানে সে যেন এক অতি বর্ব্বর যুগের এক চঞ্চল যুবক—অনাড়ম্বর, স্বল্প তার ভাষা। ভাষা যেটুকু উচ্চারিত, সেটুকু যেন স্তব। আর অসীম ভাষা অনুচ্চারিত হয়ে শুধু অঙ্গে বিস্ময়ে বিকশিত হয়ে উঠল; তার প্রতিধ্বনি জাগ্‌ল ক্ষুদ্রতম তৃণাঙ্কুরে—ঝরণার মৃদুতম মর্ম্মরে—রাত্রির ক্ষুদ্রতম তারায়। সে যেন আকাশ, বাতাস, ধরণীর সদ্যোজাত শিশু—তাই তার সারা অঙ্গে ব্যঞ্জনা-ব্যাকুল ক্রন্দন।

"Pan" প্রকৃতির স্তব-বাক্য। গল্পের নায়ক Lieutenant Glahn এক-জন শিকারী। গভীর বনে সে থাকে। সে যেন এই বনেই জন্মগ্রহণ করেছে। সামান্য তার কুঁড়ে ঘরখানিতেই সে সুখী। তার চারিপাশে নর্ডল্যাণ্ডের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। Glahn যেন শুধু কতকগুলি তন্ত্রী—তাতে প্রকৃতির সামান্যতম হিল্লোলে মূর্চ্ছনা উঠ্‌ছে। তার সাথী—গাছ, পালা, তৃণ, লতা, নদী,

আকাশ ও রাত্রি। যদি কোন পথবাহীদের সঙ্গে দেখা হয়, সে চঞ্চল হয়ে উঠে। কি করবে বুঝ্‌তে পারে না। মেয়েদের সঙ্গে ভালবাসা বা আলাপ তার দুদিনের বেশী থাকে না—থাকতে পারে না। সে পাহাড়কে ডাকে—তৃণকে আহ্বান করে—নির্জ্জনতায় নিত্য অবগাহন করে। পাহাড় তার ডাকে সাড়া দেয়, Glahn মাথা তু'লে তাকে নমস্কার জানায়। তৃণাঙ্কুর তাকে ডাকে—সে তৃণাঙ্কুরকে স্পর্শ করে। সে সেই একটি তৃণাঙ্কুরের মধ্যে ধরণীর অন্তর-স্পন্দন শুনতে পায়। আগষ্ট মাসের কয়েক রাত্রিকে নরওয়েতে Iron Night বলে। তখন সবে বরফ ও কুয়াসা পড়্‌তে থাকে। Glahn সেই প্রথম রাত্রিকে আহ্বান ক'রে স্তব রচনা করল। জগতে সে-স্তবের স্তব আমরা আর একবার শুনেছিলাম সে বহু—বহু যুগ আগে আমাদের দেশে কুৎস ঋষি এমনি ভাবে আকাশ-নন্দিনী উষাকে আহ্বান করেছিলেন,—হে উষা, এই পথ দিয়া কত পূর্ব্ব উষা চ'লে গেছে—আজ তুমি এস—হে জননী উষা!

প্রথম তিমির-ঘন রাত্রি!

জাগো! অরণ্য জাগে, বিহঙ্গ জাগে, মানব জাগে। প্রথম তিমির-ঘন রাত্রি! জাগো!

হে তিমির! তোমার আবরণে তাঁর মৃত মর্ম্মর চরণধ্বনি ভূর্জ্জপত্রে নবীন পত্রে জাগে! জাগো!

জীবনের অনাহত নিরুদ্ধ রাগিণী শ্রবণে আসে। তৃণাঙ্কুরের জন্ম-ক্রন্দনের শব্দ আসে। জাগো!

প্রণাম হে মৌন করুণ ধরণী—প্রণাম মৌন তারকা—প্রণাম হে মৌন অর্দ্ধচন্দ্র! আমি জাগি!

হে চির মৌনী, তুমি ধন্য! এই নিবিড় নির্জ্জন রাত্রে, এই শিখর পর্ব্বতে, অন্তরে প্রবহমান এই অন্ধকারে সমুদ্রের আহ্বানে আমাকে ধন্য করেছ! তুমি ধন্য!

এই একটি রাত্রি অঙ্গে আমার অনুভব করবার জন্য তুমি আমাকে জীবন দিয়েছ—এই একটি রাত্রের জীবনের জন্য তোমাকে নমস্কার!

Victoria-র Johannes এমনি প্রেমের স্তব করছে। Wanderers-এ দীর্ঘ অলস পথের নবপত্র-গন্ধ-মধুর রাত্রির, কমলার অবনত বৃক্ষের স্তব আছে। Growth of the Soil-এ অকলঙ্ক মৃত্তিকার তৃণ-শিশুর জন্ম-দিনের গৌরবগানের স্তব আছে।

Glahn-এর জীবনে কোনও মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা বা আলাপ দু'দিনের বেশী হয় নি। তার আদিম বর্ব্বর প্রাণ একবার শুধু সত্যকার ভালবেসে ছিল। শিশু-সুলভ খেয়ালে পাহাড়ের খানিকটা অংশ সমুদ্রে ফেলে একটা বিকট আওয়াজ ক'রে তার অস্তিত্ব সে প্রমাণ করতে চাইল। যাকে সে ভাল বেসেছিল এই ঘটনা তারি মৃত্যুর কারণ হল। Glahn-এর ভালবাসা, সে-ও যেন সেই আদিম যুগের। সে-ও তৎক্ষণাৎ সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করল। এই হল Pan-এর কথা-বস্তু।

Pan ও Wanderers-এর মধ্যে যেমন একটি উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের ছবি আছে—Growth of the Soil-এ একটি গৃহীর ছবি আছে। সারা বইটার মধ্যে একটি মরীচিকার সৃষ্টি আছে, যা বিংশ-শতাব্দীর যন্ত্র-মুখর সভ্যতার চোখে বড় সুন্দর লাগে। Sellanraa নব-অলকার মত ক্ষুব্ধ মানবতার সম্মুখে শুধু একটি সুদূর মোহময় সম্ভাবনার আলাময় আকাঙ্ক্ষার দীপ ধ'রে দিয়েছে। Rousseau-র মত আজ শুধু সাহিত্য। Sellanraa-র ছবিও শুধু সাহিত্য। অন্য দিক সমাজ-তত্ত্ববিদের পর্য্যালোচনার বিষয়।

"বনের ভিতর দিয়ে এই যে পথ গেছে—দূরে, বহুদূরে—কার প্রথম পদচিহ্ন ওখানে পড়েছিল?—একটি মানুষের। তার আসার আগে কোন পথ ছিল না। তারি পদ চিহ্নে পথ সৃষ্টি হল!"

এই Growth of the Soil-এর আরম্ভ। এ যেন Garden of Eden. আইজাক যেন প্রথম মানব আদম। আইজাক একলা বনের পথ বেয়ে পাহাড়ে পর পাহাড় বেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে সে হাতের লোহার বস্তু দিয়ে মাটী পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছে। এখানে বাসা বাঁধা যায় কি না। তারপর একদিন জায়গার ঠিক হল। সেই খানেই সে থাকে। মাটী চষে। আপনার বুদ্ধি দিয়ে সব কল-কব্জা করতে লাগ্‌ল। সে যেন সত্যযুগের বহু আগে জন্ম গ্রহণ করেছে। তারপর তার সঙ্গে অনেক লোক সেখানে বসবাস করতে এল। মাটী চষে, ধান রোয়, গাছ পোতে—এই তার কাজ। এই সমস্ত জীবনের অতি সামান্য বিষয়। এত সামান্য যে, তাকে আলাদা ক'রে বড় একটা চোখে পড়ে না এবং Growth of the Soil-এ এই সমস্ত সামান্য বিষয়গুলিকে এমন একটি আদিম অকৃত্রিম বিস্ময়ের ছোপে রাঙান আছে—যা অপূর্ব্ব লাগে। ধান কাটা বা বীজ বপন করা—এর মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই। সহস্র সহস্র চাষী অহরহ অবিচলিত মনে বীজ বপন ক'রে চলেছে। কিন্তু সাধারণ চাষার সঙ্গে

আইজাকে-এর প্রভেদ আছে। এবং এই প্রভেদটুকুই সমস্ত বইয়ের সৌন্দর্য্যের উপাদান জোগায়।

আইজাক আরো ছ'দিন অপেক্ষা ক'রে রইল। আকাশে বৃষ্টি দেখা দিল। সে বীজ বপন করল।

বহু—বহু শতাব্দী আগে কোন্ বিস্মৃত দিবসে তার পূর্ব্ব-পুরুষেরা এমনি শ্রদ্ধানমিত সন্ধ্যায় বীজ বপন ক'রে চ'লে গেছে; বৃষ্টি-ঝরা আকাশের পথে হংসবলাকারা এমনি উ'ড়ে চ'লে গেছে

সে বপন ক'রে চলেছে—ধীরে ধীরে। ছোট ছোট অঙ্কুর আকাশের মেঘের দিকে হাত পেতে জন্ম নেবে—মেঘ-করুণ আকাশের দিকে চেয়ে....

প্রকৃতির সঙ্গে একটা নিবিড় সম্বন্ধে আমরা আচ্ছন্ন—এই কথা বারে বারে মনে পড়ে। আইজাকের চরিত্রে সেই কথাই ফুটে উঠেছে।

"তোমরা এই আকাশ, এই পর্ব্বতের স্পর্শে জীবন্ত হয়ে আছ। বাতাস জীবনভরা। এখানে মুক্ত হাতে নেমে এসো—তরবারি রেখে। এই স্নেহভরা তৃণ, এই উদার-শস্যভূমি, এই আকাশ, এই তারা—অফুরন্ত এদের দান। আমার চারিদিকে অনন্ত জীবন চলেছে—অপূর্ব্ব ছন্দে। আমি জন্মেছি। আমার থেকে শত জন্ম আবার চলেছে। অনন্ত জীবন-নির্ঝরিণী ছুটে চলেছে।"

আইজাক স্বয়ং ন্যুট হামস্থন, তিনিও তাঁর নায়কের মত চাষী। চাষ করাতেই তাঁর আনন্দ। বহু ত' দূরে বহুদূরে, তিনি ৯ই মাত্র নরওয়ের সমুদ্র-ধ্বনির ছন্দে বীজ বপন ক'রে ঘরে ফিরছেন। হেজল গাছের পাতায় পাতায় সন্ধ্যার স্তিমিত আলো এসে পড়েছে—আইজাক বাড়ী ফিরে চলেছে।

হৃদয়-হীনের হৃদয়, মরুভূমির আকণ্ঠ তৃষ্ণার মধ্যে ছোট জলাশয়ের মতো।

—মৃত্যুঞ্জয়।

ফাগুন-হাওয়া

—শ্রীবিজয় সেন-গুপ্ত।

অনেক দিন আগে আমার মস্ত বড় রহস্য বলে মনে হয়েছিল একটি জিনিষ, যার আমি আজো কোনো সমাধান ক'রে উঠ্‌তে পারি নি। সেই কথাই আজ বল্‌ব।

আজকের মতো সে-দিনও ছিল হোলির উৎসব। তখন মনে হয়েছিল, পৃথিবী যেন রঙের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেচে। গাছে-গাছে বিচিত্র রঙের সমাবেশে চারিদিকে রঙের তুফান উঠেচে। পৃথিবীর বুকে আনন্দ আর ধরে না। মানুষের মনেও বুঝি সেই রঙের ছাপ পড়েছিল,—এখনো বোধ হয় পড়ে,—তাই বাহির জগতের খুশীতে যোগ দিতে মানুষের মন সেই আদিকালের ছেলে-মানুষটির মতোই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল।

এই দিনটি যেন মনে করিয়ে দেয় সেই দিনকে, যখন মানুষের সকল ব্যবহার সহজ ছিল, যখন সভ্যতার গণ্ডী মানুষকে তার বেড়া-জালের মধ্যে ফেলে তাকে বদ্ধ ক'রে তোলে নি। অবশ্য এই সব ধারণা আমার সেই তরুণ বয়সের, যখন ছিলুম ছাত্র; এখন আর এ সব সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নেই।

হোলির দিনের এই রঙের লীলাকে বর্ণনায় অতি রমণীয় ব'লে মনে হলেও এর রুক্ষ সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে একটা উত্তেজনা আছে, সেটা আমার কখনো ভালো লাগ্‌ত না; কেননা, তাকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে হলে যতখানি সজীবতার প্রয়োজন, তা আমার কখনোই ছিল না। তাই সেবার দোল-পূর্ণিমার দিনকতক আগে বিমান যখন আমাদের মেসে আসে, তখন তাকে ব'লে দিয়েছিলুম যে, দোলের দিন আমি তাদের বাড়ী গিয়ে আশ্রয় নেব, যেহেতু সে-দিন মেসে উৎপাতের শেষ থাক্‌বে না। বিমান বলেছিল,—তাতে আর কি? যেয়ো। আমাদের বাড়ীতে ও-সব বালাই আর নেই এখন, যদিও এককালে খুবই ছিল।

সেই অনুসারে দোলের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা হাজির হলুম তাদের বাড়ীতে,

বিমান তখন বাড়ীতে ছিল না, কোথায় যেন গিয়েছিল দিন কয়েকের জন্যে। অবশ্য আমার তাতে কোনোই অসুবিধা হল না; কেননা, তাদের বাড়ীতে ছোট-বড় সবারি সঙ্গে আমার জানা ছিল, বিশেষ গভীর ভাবেই। বাদ ছিল কেবল একজন ;—

পরদিন সকালবেলা উঠেই বারবার ক'রে ব'লে দিলুম,—আমাকে তোমরা কেউ যেন তোমাদের ঐ রঙের মাতনের মধ্যে টেনে নিয়ে যেয়ো না!

আবার অভয় পেলুম,—কোনো ভয় নেই।

বাড়ীর একটি ছেলে ছোটদের ব'লে দিলে,—ওরে তোরা মণি-দা'র গায়ে রঙ দিস্ নে, দিলে মার খাবি। বুঝ্‌লি ?

তারা হয় তো বুঝলে না, তবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে একবার আমার দিকে চেয়ে রঙের উৎসব সমাধা করতে চ'লে গেল।

খানিকবাদে চা-পান ইত্যাদি শেষ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লুম, নীচে হোলির সূচনাস্বরূপ প্রচুর আবীর আর রঙ এসে জমা হয়েচে এক জায়গায় আর তারি চারি পাশে ছোটর দল দাঁড়িয়ে কলরব সুরু ক'রে দিয়েচে। একজন বর্ষীয়সী মহিলা তাদের বার বার বল্‌ছেন একটু সবুর করতে, কিন্তু তাদের মন আজ আনন্দটুকু পুরোমাত্রায় উপভোগ করতে এমন উৎসুক হয়ে উঠেচে যে, আর একটুও দেরী সইচে না তাদের।

কেমন ক'রে এই সব সবুজ মনগুলি নিজেদের চারিধারে একটা আনন্দ-জগতের সৃষ্টি ক'রে তাতেই মগ্ন হয়ে আছে, এই আমি দেখেছিলুম অবাক হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সহসা চমক ভাঙ্‌ল একটা কথা শুনে,—

—মণি-দা'র গায়ে রঙ দিস নে,—

চমকে পেছন দিকে মুখ ফেরাতে-না-ফেরাতে এক বালতি গুলে-গোলা রঙ আমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিলে। দেখলুম তাপসী দাঁড়িয়ে হাস্‌চে। আমার সঙ্গে চোখো-চোখি হওয়ামাত্র সে ব'লে উঠল,—কেমন মণি-দা, রঙ না রঙের ভয়ে পালিয়েছিলেন ?

আবার এক তরফা রঙ বর্ষণ আর সঙ্গে সঙ্গে হাসি।

এতক্ষণ আমার একটা কথা বলারও অবসর হয় নি; আমার তাতে সত্যিই কোনো দোষ ছিল না। তাপসী বিমানের খুড়তুত বোন, বয়স হবে বছর পনের-ষোল। বিমানদের বাড়ীর অন্যান্য সবারি সঙ্গে আলাপ থাকলেও তাপসী একদিনও আমার সঙ্গে কথা বল্‌ত না। কেন যে বলত না, সে-ই জানে—

তাই তাকে রঙ দিতে দেখে আমি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলুম ; অন্য কেউ হলে হয় তো বিস্মিত হতুম না।'

রঙ দিয়ে আমাকে উত্তরের অবকাশ না দিয়েই সে চ'লে গেল। যে-ছেলেটি সবাইকে রঙ দিতে নিষেধ করেছিল, সে এতক্ষণ ঘরের মধ্যে বসেছিল ; বেরিয়ে এসে বললে,—তাপসীটা শুনলে না বুঝি ?

তারপর একবার ভালো ক'রে দেখে বললে,—যাক, এ-রঙ থাকবে না, এখুনি উঠে যাবে।

প্রশ্ন করলুম,—কি রকম ?

ছেলেটি বুঝিয়ে দিলে যে, নতুন এক রকম রঙ আমদানি হয়েছে জার্মানি থেকে, যা দেবার একটু পরেই উবে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে সে রসায়ন-শাস্ত্র থেকে কতকগুলো জিনিষের নাম করলে, যাদের সংমিশ্রণে কমই রঙ তৈরী হয়।

কিছুই বুঝলুম না বটে, তবে রঙটা একটু পরেই মিলিয়ে গেল।

খানিক বাদে তাপসী আবার এসে হাজির। এবারে সে আমার সামনে এসেই বললে,—মণি-দা', রঙ দেব ?

সকলের আনন্দ-হিল্লোল আমারও বুকে বোধ করি আঘাত করেছিল ; বললুম, —দাও।

সে তার হাতে যতখানি রঙ ছিল, সব ঢেলে দিলে। দিয়ে যেন মজা দেখবার জন্যে মুখ টিপে হাসতে লাগল।

ভেবেছিলুম এ-বারেও বুঝি আগের মতো রঙ উবে যাবে, কিন্তু তা না হয়ে দারুণ লালরঙে আমার সারা জামা-কাপড় রঞ্জিত হয়েই রইল।

ঠকে গিয়েছি মনে ক'রে কোন্ এক হঠাৎ-খুনীর প্রেরণায় তার হাত থেকে শিশিটা কেড়ে নেবার জন্যে এগিয়ে আসতেই সে ছুটে পালিয়ে গেল।

আগে তাকে অনেকবার দেখেছি বটে কিন্তু ছুটতে কখনো দেখি নি . . .

খানিকটা তার পেছনে ছোটার পর দাঁড়িয়ে পড়লুম, সে-ও যেখানে ছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে, কেমন ধরুন দিকি ?

আমার মধ্যে যে একটি ছেলেমানুষ সুপ্ত ছিল, তা সেই দিন টের পেয়েছিলুম। তখন তাকে আর ধরবার চেষ্টা না ক'রে পকেট থেকে পয়সা বার ক'রে বাড়ীর একটি ছোট ছেলেকে বললুম,—যাও তো ভাই, গোটাকতক কুমকুম নিয়ে এসো তো। তাপসীকে রঙ না দিয়ে ছাড়চি নে।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলে, কেন, শুধু রঙে হবে না ?

বললুম, না, কে আবার হাঙ্গামের মধ্যে যাবে! তার চেয়ে এ বেশ, দূর থেকে ছুঁড়ে মারা যাবে!

সে উৎফুল্ল হয়ে চ'লে গেল!

হঠাৎ দেখলুম বিমানের বোন সবিতা এক গাদা আবীর বয়ে নিয়ে আমার দিকে আসচে। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি সবিতা, রঙ দেবে নাকি?

সে নিজে একেবারে আবীরে রাঙা। বললে,—দেব বইকি,—ব'লে সে এক মুঠো আবীর আমার মুখে মেরে হাততালি দিয়ে উঠল।

আমার মন ততক্ষণ রাঙা হয়ে উঠেচে, আমিও তাকে আবীর ছুঁড়ে মারলুম, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এসে আমার সঙ্গে যোগ দিলে। আবীরে আবীরে জায়গাটা পিছল হয়ে উঠল।

সবিতাকে বললুম, দেখ এককাজ করতে পার? তাপসী আমায় রঙ দিয়ে পালিয়েচে, তার মুখে খানিকটা আবীর মাখিয়ে দিয়ে আসতে পার?

সে বললে, খুব পারি, তবে আপনাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে।

—আচ্ছা চল,—ব'লে তার পিছু নিলুম। ততক্ষণে আমার কুমকুম এসে পৌঁছেচে, তাই পকেটে ভ'রে নিলুম।

একটু এগোতেই দেখি তাপসী নীচের রোয়াকে পান সাজতে বসে গেছে। আমাকে দেখতে পেয়েই সে খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বললে, রঙ দেবেন নাকি! তা হলে কিন্তু সব পান নষ্ট হয়ে যাবে।

কুমকুম আর ছোঁড়া হল না; বেগতিক দেখে সবিতাকে বললুম, কি করা যায় এখন?

সে বললে, আপনি চুপিচুপি নীচে চলে যান, গিয়ে পেছন থেকে ওর মুখে রঙ মাখিয়ে দিন।

সবিতার বয়স বছর তের-চোদ্দ; তার মুখে আবীর মাখিয়ে দিতে আমার মনে একটুও দ্বিধা জাগে নি, বরং ভালোই লেগেছিল, কিন্তু তাপসীর মুখে রঙ মাখিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবটা কেন জানি নে অত সহজে নিতে পারলুম না, চুপ ক'রে রইলুম।

হঠাৎ চুপ ক'রে যেতেই সবিতা জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবচেন? এইবেলা চলুন,—ব'লে সে আমায় এক ঠেলা দিলে। তার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না; কিন্তু আমার মনে সেই যে খট্‌কা বাধ্‌ল যৌক্তিকতা সম্বন্ধে, সে আর ঘুচ্‌তে চাইল না।

সবিতাকে বল্লুম, যাও, তুমি গিয়ে দিয়ে এস। আমার তো ছুটাছুটি অভ্যাস নেই, আবার যদি পালিয়ে যায়!

সবিতা বল্লে, বেশ!

দেখ্লুম, সে নীচে গিয়ে তাপসীর মুখে আবীর মাখিয়ে দিলে। আমার মুখের দিকে একবার চেয়েই, বোধ করি পরাজয়ে তার মুখ আরো রাঙা হয়ে উঠ্ল; সবিতা জিজ্ঞাসা করলে, হয়েচে?

বললুম,—হুঁ।

খানিকবাদে সবিতা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জানালে যে, তাপসী ওপরে উঠে এসেচে, এইবার আমাকে নিজে গিয়ে রঙ দিতেই হবে। তার উৎসাহে আমার সঙ্কোচ কোথায় ভেসে গেল; অবশ্য আপন হাতে তাপসীর মুখে রঙ মাখিয়ে দেবার গোপন ইচ্ছাও যে জাগ্‌ছিল না, সে কথা বল্লে মিছে কথা বলা হবে।

সবিতার সঙ্গে-সঙ্গে তাপসীর সন্ধানে চল্লুম।

একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে সবিতা বল্লে, এই ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে তাপসী ব'সে আছে।

মাথায় আমার কি চেপেছিল জানি নে; চেঁচিয়ে ডাক্লুম, তাপসী!

এমন ক'রে তাকে ডাক্‌বার সুযোগ আগে পাই নি।

তাপসী ভেতর থেকে জবাব দিলে, আবার বুঝি রঙ দিতে আসা হয়েছে! একবার সবিতাকে পাঠিয়ে হল না? আচ্ছা, দেখি কেমন ক'রে দিতে পারেন? আমি ঘর থেকে বেরোব না!

হেসে বললুম, কেন তুমি রঙ দিয়ে পালিয়ে এলে?

জবাব এল, বেশ করেচি। কি করবেন করুন?

কথা শুনে মনে হল যেন সে ঝগড়া করবে ব'লে কোমর বেঁধে বসে আছে। এখন আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়, কিন্তু সে-দিন কেমন যেন জেদ চেপে গিয়েছিল। তাকে বলেছিলুম, আচ্ছা, এই রইলুম বসে, তুমি কি সারাদিনেও বার হবে না!

ভেতর থেকে তার হাতের চুড়ির আওয়াজমাত্র কানে এল।

সবিতা ততক্ষণে বিফল প্রয়াসের বদলে উৎসবকে পূর্ণ ক'রে তোল্‌বার সন্ধানে চলে গিয়েছিল।

বসে আছি। হঠাৎ আবার পুরাণো খট্‌কা জেগে উঠে আমার সমস্ত আনন্দ নিভিয়ে দিয়ে গেল। আমি উঠে প'ড়ে বল্লুম,—আচ্ছা, এইবার তুমি বেরিয়ে এস আর তোমায় রঙ দেব না।

তাপসী জবাব দিলে, আহা আমি আর বুঝি নি! এই ব'লে আমাকে ঘর থেকে বার করার মতলব!

আরো ঘণ্টাখানেক বাদে সবিতা তাপসীকে আমার কাছে এনে হাজির করলে। আমি তখন সেই আগেকার ঘরে বসে ছিলুম। ঘরে ঢুকেই তাপসী বললে, এ ঘরে ঢুকতে আমার বড় ভয় করচে!

চোখ মুখ তার বড় উজ্জ্বল, প্রশ্ন করলুম, কেন?

আহা! তা যেন জানেন না আপনি—ব'লে সে সবিতাকে বললে, চল।

বললুম, তা তো হল, কিন্তু রঙ দেওয়ার সঙ্গে খেতে দেওয়াও যে নিয়ম, সেটার কি হচ্ছে?

ঠোঁট বাঁকিয়ে তাপসী বললে, অত তাড়াতাড়ি করলে কিছু পাবেন না!

কি যেন একটা উত্তর দিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু দিই নি। কথাটা মনে নেই।

হোলির উৎসব মিটে গেল। কিন্তু যে-প্রশ্নটি প্রহেলিকার মতো রয়ে গেল সেটি হচ্ছে এই, যে তাপসী কখনো আমার সঙ্গে কথা কইত না, এমন কি চোখে চোখে চাইতে পারত না, সে সহসা এমন সাহসী আর মুখরা হ'য়ে উঠেছিল কিসে? ফাগুয়ার দিনে রঙের নেশা কি সত্যিই এমনি ক'রে সকল সঙ্কোচের বাঁধন ঘুচিয়ে দেয়?

ছোট বেলায় প'ড়েছিলুম প্রথম হোলির কাহিনী; তখন বিশ্বাস হয় নি' কিন্তু আজ—

তারপর আজ বহুকাল হল তাপসীকে আর দেখি নি এবং হোলিতেও মাতি নি; কিন্তু সেই প্রশ্ন এখনো সমাধান করা হয় নি। আজো আমার সেই কথাটাই বারে বারে মনে পড়্চে—

আজ দোলের ছুটি।

কালনেমী

—শ্রীযুবনাশ্ব।

জোয়ান মরদ ডাকু যখন রেলে পা কাটা পড়ে কাজের বার হয়ে গেল, তখন এই এতবড় ছনিয়া তাকে বেঁচে থাক্‌বার কোন পথই বাৎলাতে পারল না।

অনেক ঘোরা-ফেরার পর, শেষকালে, সে সোমত্ত স্ত্রীকে নিয়ে পটলডাঙ্গার ভিখারী-পাড়ায় এসে খুঁটী গাড়ল। সেখানকার বাসিন্দারা স্থান দিতে তাকে কোনো আপত্তিই করল না, কিন্তু ঐ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা বরদাস্ত করতে আদপেই রাজী হল না। বল্‌ল—থাক্‌বি থাক্! কিন্তু ইস্তিরী-ফিস্তিরী ক্যানো বাবা! এখেনে ও-সব চল্‌বে না,—মুড়ি-মিছরীর এক দর হেতায়!

শুনে, ডাকুর মন এই শেষ আশ্রয়ের ওপরও বিমুখ হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌ল, শুন্‌চিস্ ত' ময়না? এর পর . . . .

ময়না বল্‌ল, আর কোথা যাবি তবে? আজ ছ'মাস ত' সমস্ত পিরথিমী ঘুরে বেড়ালি, ঠাঁই পেলি কোতাও? মাথা গোঁজবার কুঁড়ে যখন মিলেচে একটা, তখন আর তোকে টো-টো ক'রে বেড়াতে দিচ্চি নে। আমার কতা?—কি করবে ওরা আমার? সে জন্তে তোকে কিছু ভাব্‌তে হবে না!

ডাকু বল্‌ল, সব বুঝ্‌লাম। কিন্তু শুন্‌লি ত'! একে ওরা দলে ভারী, তার ওপর . . . . .

থাম্ তুই! দলে ভারী! আমার কাটারী থাক্‌তে ঐ মড়ার দলকে ভয় করি আমি?

স্ত্রীর প্রায় অনশনক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে দো-মনা ভাবে ডাকু বল্‌ল, থাক্ তবে! কিন্তু . . . . .

আর 'কিন্তু' করিস্ নে তুই—

তারা থেকে গেল।

কিন্তু তেলে জলে যেমন মিশ্ খায় না, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটুকু অটুট রেখে তারাও তেম্নি দলের সাথে মিশে উঠ্‌তে পারল না।

মেশ্‌বার জন্যে ব্যস্ততাও তাঁদের বিশেষ ছিল না। ময়না ভোরে উঠে ডাকুকে নিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে বসিয়ে দিয়ে আস্‌ত। তারপর দলের সাথে পথে বেরিয়ে পড়ত। দুপুরে স্বামীকে নিয়ে এসে খাইয়ে দাইয়ে সন্ধ্যের আগেই আবার রেখে আসত। কোন দিন তার সাথেই থাকত, কোন দিন আবার চলে আস্‌ত। রাত বারোটা একটায় তাকে নিয়ে এসে দুজনে শুয়ে পড়ত। রোজকার রোজ এমনি কাটত। কারো সাথে ঘনিষ্ঠতা করবার সুবিধেও তাদের হত না, ইচ্ছেও করত না। নিজেরটা নিয়েই নিজেরা থাকত।

হরিমতীর ঘরের রতনা একদিন সন্ধ্যের সময় অনেকের সাম্‌নেই ময়নাকে জড়িয়ে ধরেছিল, ও-পাড়ায় এ সব কিছু নতুন ব্যাপার নয়, হামেশা হচ্ছে।

কিন্তু ঠিক দু' সেকেণ্ড পর যা ঘট্‌ল, তার সাথে বিশেষ পরিচয় কারোই ছিল না। দু' হাতে নাক চেপে ধরে ভুঁয়ে প'ড়ে রতন গোঙাতে সুরু করল। ময়না কাপড়-চোপড় ঠিক ক'রে গম্ভীর ভাবে নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

রসিকতার জেরস্বরূপ নাক দিয়ে পোয়াটাক রক্ত বেরিয়ে যাবার পর রতন উঠে বস্‌ল।

পটলা বল্‌ল, হয়েছ্‌ল কি রে? একটা মাগীর হাতে ঘাড়া বঁনে গেলি?

কাৎরাতে কাৎরাতে রতন বল্‌ল, এমন আচম্‌কা ঘুসী চালালে, মাইরি, তাল রাখ্‌তে পারলুম না! আর একেবারে নাকের ঠিক ডগাটার—উঃ!

একটা বছর আটেকের মেয়ে বল্‌ল, থাক্ থাক্—আর কথা কস্ নে! অমন ধঁাড়ের মত মরদ—লজ্জা করে না!

তার দিকে একবার বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রতনা বল্‌ল, আচ্ছা বাবা, এক মাঘে শীত পালায় না, আমিও দেখে নোব! ও-শালীর ড্যামাক্ না ভাঙ্‌তে পারি ত' . . . . . .

পটলা বল্‌ল, থাক্, হয়েচে। এখন ঘরে যা ত'! নাক যে রক্তারক্তি হয়ে গেচে!

তীব্র দৃষ্টিতে ময়নার ঘরের দিকে তাকিয়ে রতন টল্‌তে টল্‌তে নিজের ঘরে ঢুক্‌ল।

যে যার গর্ত্তে ডুব মারল

এর মধ্যে ময়নার এক ছেলে হল। ছেলে নিয়ে সে এমন মেতে উঠল যে, সবারই কাছেই তা বেজায় বেখাপ্পা ঠেকতে লাগল। দিন-রাত যত্ন-আত্তি, নাওয়ানো-খাওয়ানো, কত কি! স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই রোজগারে বেরোন ছেড়ে দিল। পুঁজিপাটা যা ছিল তাই ভেঙে খাওয়া চলতে লাগল।

খেঁদি-পিসির দলে যে এটা খাপ খাবে না, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সেখানে স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বাপ-মা, কোনো সম্পর্কেরই অস্তিত্ব ছিল না। প্রতি সোমত্ত মেয়েরই ফি বছর ছেলে হত,—একটি বছরও কামাই পড়ত না! কিন্তু ঐ হওয়া পর্য্যন্তই। তার পর, সে সব শিশুদের ধর্ম্মের নামে ছেড়ে দেয়া হত, দেখবার শোনবার কেউই থাকত না। বেশীর ভাগই মরত,—যারা হঠাৎ বেঁচে যেত, তারা আর দশ জনের মতো বন্ধনহীন ভাবে বেড়ে উঠত। বাপ মা'র ঠিক ঠিকানা কেউ জানত না। তারা জানত, দলের প্রত্যেকেই যেমন একা, তারাও তেমনি।

মেয়েগুলোকে বয়েস হবামাত্র নেবুতলার মতন সব জায়গায় চালান করা হত। দলের এ একটা মস্ত আয়। ছেলেগুলো পকেট কাটা থেকে হাতে খড়ি পেত।

এই সেখানকার নিয়ম।

এ হেন জায়গায় ময়না যখন তার ছেলে নিয়ে চলাচলি সুরু করল, তখন, সবায়ের কাছেই সেটা বাড়াবাড়ি, আদিখ্যেতা ব'লে মনে হল।

খেঁদি বল্‌ল,—ঘেন্না ধরালে! এ কি ভদ্দরনোকের ঘর নাকি না? সোমত্ত মাগী, কোতায় দু' পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেখ্‌বি, তা না, সোয়ামী সোয়ামী করেই গেল! আবার একটা কাঁটা খসেচে ত' কি নাগিয়েচে ত্তাকো না! বলি, দু' মরলে ওকি তোর ছেরাদ্দ করবে?

ময়না শুনত সবই, কিন্তু গায়ে মাখ্‌ত না।

ছেলে মাস দু' আড়াইয়ের হলে তারা আবার রোজগারে বেরোতে সুরু করল। বুড়ী হরিমতীর ময়নার ওপর একটু টান্ ছিল, সে-ই থাকত ছেলের পাহারায়।

একদিন সন্ধ্যে বেলায় সে রাস্তার মোড়ে ভাকুকে রেখে ফিরে আসচে। আস্তানার গেটের ভেতর পা দিতেই রতন এসে তার পথ আটকে দাঁড়াল।

কি বাবা বড় যে তেজ দেখিয়ে ছিলে সে-দিন!

তাড়ির গন্ধে চারি দিক ভ'রে গেল।

ময়না বল্‌ল, পথ ছাড়্ . . .

রতন বল্‌ল, ফোঁস কেউটের ছা,
কম নয় তার হাঁ—

মাইরি,

ছুব্‌লে দিয়ো না যেন! বলি আজও কি ছুরী চালাবার মৎলব না কি?—ব'লে সে ডাক্‌ল, পটলা . . .

ময়না তাকিয়ে দেখ্‌ল, সাম্‌নের ঘরটা থেকে আরো দু'জন নেমে এল।

তার ভয় হল। কিন্তু সে ভাব চেপে সে বল্‌ল, কি চাস্‌ তোরা, শুনি?

হুঁ বাবা, পস্তে এসো! গুটী গুটী ঐ ঘরটিতে ঢুকে পড়ো ত' যাহ, না বেইজ্জৎ হবার সক্ আছে?

তীব্র দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম ক'রে ময়না বলল, আচ্ছা, একটু সবুর কর্ না তোরা! ছেলেটাকে ছেড়ে এইটি চেরখন, এক পাক তাকে দেখেই আমি চলে আস্‌ব।

পট্‌লা বল্‌ল, যেতে দাও, যেতে দাও,—ছেলে দিয়ে কি হবে? ছেলে আর দেখ্‌তে হবে না! বেঁচে থাক্‌লে অমন কত ছেলে হবে—ছেলের দুঃখু কি বাবা!

রতন জড়িত স্বরে ছড়া কাট্‌ল,—

আমার সাগর-পারের ময়না
শিক্‌লি বাঁধা রয় না!
দেবো চাঁদির গয়না,
বাবার কত্তা কয় না!

ছিঃ মাণিক, অমন কত্তা কইতে আছে?

ময়না দেখ্‌ল মহাবিপদ। এক মাত্র সম্বল তার ছুরীখানা, তাও ঘরে রয়েছে। খালি হাতে তিনটে পশুর সাথে লড়া ত' সম্ভব নয়!

এ-ধার ও-ধার তাকাতে তাকাতে হঠাৎ সে ছুট্ দিল। পট্‌লা দৌড়ে গিয়ে তার কাপড় চেপে ধর্‌ল। কাপড় ছেড়ে দিয়ে সে আবার ছুট্‌তে যেতেই রতন গিয়ে তার ওপর চেপে পড়ল।

ভেল্‌কী দেখাবার আর ঠাঁই পেলে না ধন! চল দিকি একন হুসরুড্ ক'রে—কত ভেল্‌কী জানো ওই হোতা ঘরের ভেতর দেখাবে চল . . .

ময়না ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি কাকুতিমিনতি অনেক করল। কিন্তু ফিরে আর

পশু-লালসা ছাড়া যাদের আর সমস্ত বৃত্তিই মরে গেচে, মিনতিতে তাদের মন ভিজ্‌বে কেন ?

তিন জনে তাকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে গেল।

রাত হয়ে গেচে। ডাকু পথের ধারে বসে বসে হয়রাণ হয়ে উঠেচে। ময়নার আসতে এত দেরী ত' কোন দিনই হয় না ?

আরো খানিকক্ষণ ব'সে অস্থির হয়ে শেষে সে লাঠিতে ভর ক'রে উঠে দাঁড়াল। তার পর একাই ঢিকোতে ঢিকোতে আস্তানার দিকে চল্‌ল।

সেখানে পৌঁছেই সে দেখ্‌ল, মহা হৈ-চৈ বেধে গেচে। সাম্‌নেই একটা ঘরে অনেক লোক মিলে জটলা করচে। সে আস্তে গিয়ে এক পাশে দাঁড়াল।

খেঁদি বল্‌ছিল,—তা এতে আর দোষের কি হয়েচে বাছা! রতনাকে ত' ছুঁড়িরা পছন্দই করে! তোমার যেমন ছিষ্টিছাড়া স্বভাব!

ময়না এক কোণে এলিয়ে পড়েছিল। মাথার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, মুখ শুক্‌নো, চোখ দু'ইঞ্চি বসে গেচে।

খেঁদি বল্‌ল,—এখানে পড়ে থেকে আর কি করবে বাছা, ঘরে যাও। ডাকু কিছু অবুঝ নয়, সে এলে বুঝবে। তাও বলি, যেখানকার যা নিয়ম, তা মান্‌তে হবে ত'? পেট চালাবার জন্যে পথেই বেরুতে হচ্চে যখন, তখন কি আর সোয়ামী-ইস্তিরী ওসব ভড়ং চলে? ভদ্দরনোকী করতে হলে তার ঠাঁই আলাদা!

ঠিক্ ধরতে না পারলেও ডাকু মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝল! সে নিঃশব্দে নেমে নিজের ঘরে চলে গেল।

খানিক পরে, ময়না ঘরে আস্‌তেই সে বল্‌ল,—তু কিছু ভাবিস্ নে ময়না, দোষ আমারি!

ময়না বল্‌ল,—তু' একটা বিহিত করবি নে? এম্‌নি করে . . . সে দু'হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠ্‌ল।

ডাকু উঠে তার কাছে এগিয়ে এসে বসল। একটু চুপ ক'রে থেকে তাকে বুকে সাপ্‌টে ধরে, লালসাজড়িত স্বরে বল্‌ল,—তা হোক গে, . . . থাকতেই হবে যখন হেতায়, তখন কি হবে আর ঘাঁটিয়ে! . . . আয় তুই . . .

ময়না অবাক্ হয়ে তার দিকে তাকাল।

তার মুখে মরমীর দরদের ছাপ একটুকুও নেই, আছে কেবল শুধু ভুখের জ্বালা! মত্ত পশুর মতো দু'চোখ জ্বলচে।

রতনা ত' ? আর কেউ ছেল ?—ব'লে ডাকু তাকে কোলের ওপর টানতেই সে গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তার পর এক হাতে চোখের জল মুছে আরেক হাতে গায়ের কাপড়টা টেনে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

অস্ফুট শুষ্ক গলায় ডাকু বল্‌ল,—কোতা চল্‌লি ময়না ?

রতনার কাছে—

ব'লে সে চল্‌তে সুরু করল।

যেতে যেতে সে শুনতে পেল ডাকু বলচে—দোহাই তোর, আমার একেবারে ফাঁকি দিস্‌ নি ময়না, একটি বার আসিস্‌ যেতে . . .

লোকে আঁধারে যেতে ভয় পায়। কেন ? সেখানে আছে কি ? জানা নেই, তাই ভয়।

—মনের কথা।



ভিখারী

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।



বিকেলবেলা রাস্তার ধারে একটা গ্যাস-পোষ্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নিরবচ্ছিন্ন জনস্রোতের দিকে তাকিয়েছিলুম। মনের ভেতর যে বিশেষ কোন ভাবনা ছিল, তা বলতে পারি নে—বোধ হয় ছিল না। সামনের লোকগুলোর মতই অজস্র চিন্তা মনের ভেতরে একটুখানি উঁকি মেরেই চলে যাচ্ছিল। মনের ভেতরটার মত বাইরেটাও সেজন্যে আমার কাছে বড় ঘোলা বোধ হচ্ছিল—যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা মস্ত বড় পুতুল-খেলা দেখ্‌ছিলুম।

বাবা—অন্ধকে দয়া কর, বাবা,—

চম্‌কে উঠে পিছনের দিকে চেয়ে দেখি, ফুটপাথের ও-পাশে একটা বাড়ীর দেয়ালে হেলান দিয়ে ছেঁড়া কাপড়-পরা একটা অন্ধ ভিখিরী হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রাস্তার লোকের কাছে কৃপাভিক্ষা করছে।

সারাদিন কিছু খাই নি বাবা—একটা পয়সা দিয়ে যাও বাবা—

মুখটা রাস্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আবার গাড়ী-ঘোড়া আর মানুষের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে রইলুম—মাঝে মাঝে ভিখিরীটার করুণ স্বর কানে এসে লাগ্‌ছিল তবে আমি সেটা তত গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌ছিলুম না।

সামনে দিয়ে আমার এক ধনী বন্ধু তাঁর মোটরে চ'ড়ে সাঁ ক'রে চ'লে গেলেন। যাবার সময় আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে গাড়ীর জানলা দিয়ে হাতটা একটু নেড়ে গেলেন। আমি জান্‌তুম তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন। সে-দিন সন্ধ্যার সময় টাউনে তাঁর 'ভারতের দারিদ্র্য ও তাহার প্রতিকারের উপায়' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়্‌বার কথা ছিল—তিনি সেইখানেই যাচ্ছিলেন।

রাস্তা দিয়ে কত বড় বড় লোক চ'লে গেল—কেউ বা মোটরে, কেউ বা জুড়িতে কিন্তু কেউ রাস্তার পাশের অন্ধ ভিখিরীটার দিকে তাকালও না—

ভিখিরীটার দিকে আবার তাকিয়ে দেখি, সে তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে

আর মাঝে মাঝে কাতরভাবে নিজের আবেদন জানাচ্ছে—দয়া কর বাবা, অন্ধকে দয়া কর বাবা—

একটা ঝাঁকা-মুটে সমস্তদিনের পরিশ্রমের পর বোধ হয় বাড়ী ফিরছিল—হঠাৎ ভিখিরীটার সামনে একটুখানি দাঁড়িয়ে ট্যাঁক থেকে একটা পয়সা বার ক'রে তার হাতে দিয়ে চ'লে গেল। সে পয়সাটার উপর আঙুল বুলোতে বুলোতে দাতার উপর আশীর্ব্বাদের পর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করতে লাগল।—

রাজা হও বাবা—ভগবান্ তোমার ভাল করুন—

দূর বোকা! আশীর্ব্বাদ কর্‌ছে দেখ—'রাজা হও'! তাও আবার কর্‌ছে কিনা একটা ঝাঁকা-মুটেকে। বেটা কানা কিনা!

হঠাৎ ঠক্ ক'রে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে চেয়ে দেখি, পয়সাটা কি ক'রে তার হাত থেকে প'ড়ে গেছে। সে প্রথমে একটা ছোট্ট চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—তারপর হেঁট হয়ে ব'সে ফুটপাথের উপর হাত বুলিয়ে পয়সাটা খুঁজতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

পাশে একটা ছোট্ট খোট্টা ছোঁড়া দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখ্‌ছিল—সে এইবার অবসর বুঝে আস্তে আস্তে অন্ধের পাশ থেকে পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে দে ছুট্! মনে মনে খুব হাসি পেল। ছোকরা আচ্ছা বাহাদুর বটে ত'!

ভিখিরীটা কিছুই জানতে পারে নি। সে এক মনে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পয়সাটার সন্ধান করছিল। দেখে মনে হল, দূর কর ছাই। একটা পয়সা ওকে দিয়ে দিই না কেন? আবার তখুনি ভাবলুম—পকেটে ত' আছে মোটে চার আনা, এর থেকে এক পয়সা দিয়ে দিলে পনেরো পয়সায় তো আর বায়স্কোপের টিকিট মিলবে না। অথচ আজ যে ফিল্‌মটা আছে, এমন সুন্দর ফিল্‌ম্ শীঘ্র আর দেবে কিনা সন্দেহ! যাক্ গে! ওর পয়সা হারিয়েছে, তা আমার এত মাথাব্যথা কেন?

এমন সময় দেখলুম একজন লোক—সাজ সজ্জা দেখে মনে হয় একজন মস্ত বড় লোক—সঙ্গে আবার দু'জন আর্দ্দালি—সেই ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে আস্‌ছেন। যে জায়গাটায় ঐ ভিখিরীটা হেঁট হয়ে পড়েছিল সেই খানটায় এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। একবার বুঝি পথ থেকে তাকে স'রে যেতে বল্‌লেন—সে বোধ হয় শুন্‌তে পেলে না। তার পরেই তাকে লাঠির এক খোঁচায় সরিয়ে দিয়ে তিনি গম্ভীর ভাবে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। আর্ত্ত চীৎকার ক'রে ভিখিরীটা রাস্তার পাশে প'ড়ে গেল।

একজন আর্দ্দালিকে জিগ্‌গেস্ ক'রে জানলুম—ইনি পশু-ক্লেশ-নিবারিণী সভার সভাপতি। মনটা শ্রদ্ধায় ভ'রে গেল। ওঃ কত বড় মন! অবল পশু জাতির কষ্ট দেখে মন ব্যথায় ভ'রে উঠেছে! যত দিন এই রকম লোক সব জায়গায় না হবে ততদিন আর জাতির মঙ্গল নেই!

আর এই ভিখিরী বেটার মরণ দেখ না—পড়বি ত' পড়—এত বড় একটা লোকের পথ আট্‌কে পড়েছে!

ঐ যাঃ! পাঁচটা বেজে গেছে যে! ঊর্দ্ধশ্বাসে বায়স্কোপের দিকে ছুটলুম!

সে-দিনকার ফিলিমটা ভারী সুন্দর ছিল—এখনো সেটা বেশ মনে আছে—গল্পটা সংক্ষেপে হচ্ছে এই—

এক দেশের রাজপুত্র আর এক দেশের রাজকন্যার প্রেমে পড়লেন। কিন্তু এই দুই দেশের রাজার মধ্যে ছিল বিষম শত্রুতা। পরে অনেক বাধা-বিঘ্নের পর দুই প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হয়ে গেল—আর বিবাহ-রাত্রিতে দুই রাজায় মিলে দিলেন মস্ত বড় একটা ভোজ!

সে-দিন রাত্রে স্বপ্নেও দেখলুম এক রাজাকে! যেন প্রকাণ্ড একটা হল। আর তার মাঝে একখানা খুব উঁচু সিংহাসনে বসে একজন রাজা। কী ভয়ানক গম্ভীর তাঁর মুখখানা! পরণে তাঁর সব আগুনের কাপড়-চোপড়, তার আভায় সমস্ত হলটা আলো হয়ে উঠেছে। হলে মন্ত্রী নেই, পাত্র নেই, সভাসদ নেই—কেবল সিংহাসনের উপর তার দু পাশে বসে' খুব দামী দামী পোষাক প'রে দু'জন লোক। সেই কানা ভিখিরী আর সেই ঝাঁক্‌ড়া-চুলোটা!

রাজাটার ওপর কেমন একটা অশ্রদ্ধা হয়ে গেল।

বাংলা-সাহিত্যের কথা

—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(৫)

ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে বাংলা-সাহিত্যে গদ্যের সৃষ্টি হল। ছন্দের স্থান অধিকার করল বিচার-বুদ্ধি। বাংলা-সাহিত্যের নূতন যুগ আরম্ভ হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের খাতায় বিশেষ কিছু রেখাপাত করে নি। এই সময় আমরা নূতন রাজ-শাসনের সঙ্গে নিজেদের জীবনের সামঞ্জস্য আনতে বোধ হয় এত ব্যস্ত ছিলাম যে, তখন লেখবার বা গান রচনা বা গল্প বলার অবসর ও ইচ্ছা ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা-সাহিত্যে নূতন যুগের জন্ম হল। তখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল হয়ে উঠেছে এবং এক নূতন মানুষের দল জন্মগ্রহণ করেছে। এই নূতন সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্য থেকে জন্মগ্রহণ করে নি। এর বিষয়, ভাব বা অঙ্গাবরণ বিবর্তন-অনুযায়ী হয়ে আসে নি। এখানে যেন জাতির মন নূতন জন্ম পরিগ্রহণ করল।

ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে আমরা একটি নূতন জগতের সঙ্গে পরিচিত হলাম। বাস্তব জগতের সঙ্গে পরিচয় হল, রক্ত-মাংসের জীবনের সঙ্গে পরিচয় হল। জার্ম্মাণ দার্শনিকগণ যাকে will to know বলেন, সহসা আমাদের মধ্যে সেই স্পৃহা পূর্ণতেজে জেগে উঠল। এই সময়কার বাঙালীরা সবকিছু ছেড়ে প্রয়োজনীয়তার দিকে ঝুঁকে পড়ল। স্বভাবতই এই যুগটা সাহিত্য-অনুবাদের ও Text-book-এর যুগ হয়ে উঠল। ইংরেজরা বাঙালীর উপকারের জন্য বই লিখতে লাগলেন, বাঙালীরাও ইংরেজদের উপকারের জন্য বই লিখতে লাগলেন। এই দুই জাতি পরস্পরকে শিক্ষা দেবার জন্য যেন উৎসুক হয়ে উঠলেন। এই

সমস্ত বাংলা বই-এ কতদূর শিক্ষার বা জ্ঞানের বিষয় ছিল এবং কতদূরই বা তারা এই দুই জাতির শিক্ষাদান ব্যাপারে সহায়তা করেছিল সে বিষয়ে ইতিহাস কিছু বলে না। তবে সে সমস্ত সাহিত্য আজ নিঃসন্তান হয়ে লোপ পেয়ে গেছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যে সর্ব্ব প্রথম মুদ্রিত পুস্তক যা আমি জানি, বোধ হয়, প্রবোধ-চন্দ্রিকা। প্রবোধ-চন্দ্রিকা একখানা অদ্ভুত জিনিষ। এই বইয়ের গ্রন্থ-কার একজন বাঙালী পণ্ডিত। গ্রন্থারম্ভে তিনি বলেছেন যে, ইংরেজ ভদ্রমহোদয়-গণের কিঞ্চিৎ শিক্ষার জন্ত এই পুস্তক লিখিত হইল। এই বই থেকে ইংরেজ ভদ্রমহোদয়গণ যে কি শিক্ষালাভ করেছিলেন তা আজও আমার কাছে রহস্যের মত লাগে। বইখানি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশ ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, দর্শন ও ভাষাতত্ত্বের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ; ভাষা একান্ত দুর্বোধ্য ও শ্রুতিকটু এবং তার বারো আনা ভাগ সংস্কৃত, চার আনা ভাগ বাংলা। দ্বিতীয় ভাগ নীতি-শিক্ষার জন্য কথামালা এবং গল্পে পরিপূর্ণ। নীতি-শিক্ষার বই এ রকম জবড়জঙ্গ ভাষায় আর কখনো লেখা হয় নি।

যে সমস্ত অনুবাদ এখনও দেখতে পাওয়া যায়, সে সব দেখে মনে হয় যে, এই সমস্ত অনুবাদ কোন নিয়ম বা ধারা অনুসারে করা হয় নি। Bacon-এর অনুবাদের সঙ্গে Uncle Tom's Cabin, Comedy of Errors, Rasselas ইত্যাদির অনুবাদ দেখেছি। Johnson-এর Rasselas যে রকম ভাষায় অনূদিত হয়েছিল তা দেখলে Dr. Johnson-এরও মন আনন্দে ভ'রে উঠত। এ বিষয়ে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কেননা এটা সাহিত্যে শিক্ষানবীশের যুগ। এই সমস্ত নূতন লেখকগণ শুধু ভাষা নিয়ে নয়, নূতন নূতন বিষয়ও পরীক্ষা ক'রে গেছেন। এই সমস্ত ভূগোল, পশুতত্ত্ব সম্বন্ধে বই ছাড়া নাটক ও গল্প রচিত হয়েছিল। এই সমস্ত শিক্ষানবীশ-সাহিত্যের স্তূপ থেকে একখানি বই মাথা তুলে আছে। সেটি বাংলা সাহিত্যে একটি অপূর্ব্ব প্রতিভার শ্রেষ্ঠদান। গ্রন্থকার মাইকেল মধুসূদন জীবনে ও সাহিত্যে বহুবার বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছেন। যৌবনে তিনি খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং একজন ইংরেজ-মহিলার পাণি-পীড়ন করেন এবং ইংরেজীতে কবিতা লেখেন। ইংরাজী শিক্ষিত প্রথম যুগের বাঙালীরা এক ভ্রান্ত ধারণায় অভিভূত হয়ে সকলেই ইংরেজীতে লিখতেন, আমরাও আজ ইংরেজী লিখি বটে কিন্তু কোন ভ্রান্ত ধারণায় অভিভূত হয়ে নয়। সর্ব্বপ্রথম মাইকেলই অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাঙালীকে যদি সাহিত্য-সৃষ্টি করতে হয়—সে শুধু বাংলা ভাষায় হবে। নানা

ভাবের ও ছন্দের ইংরেজী কবিতা লেখার পর মিল্টনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বাংলা ভাষায় এক কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন। আর কোন সাহিত্যে সাহিত্য-সৃষ্টি নিয়ে এত বড় পরীক্ষা হয় নি। মাইকেল এই অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত করেছিলেন। Paradise Lost-এর গম্ভীর ভাষার প্রতিধ্বনি কোমল-তন্ত্রী বাংলা-ভাষার বীণায় অনুরণিত করা অসম্ভব। মাইকেল ভাল রকমই জানতেন যে, তিনি বাংলা-ভাষার বীণার তারে যতই কেন আঘাত করুন না, church-organ-এর সুর তা থেকে বেরুবে না। এই জন্ত এই দুঃসাহসী কবি এক নতুন ধরণের ভাষা সৃষ্টি করলেন যা সুরের সামঞ্জস্যে ও মিলনে মিল্টনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে গাঁথা যায়। মাইকেল অভিধান থেকে শব্দসংগ্রহ করলেন। বাংলা ভাষায় মেঘনাদ-বধ কাব্য অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যদিও এখানি একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য, তবুও এ কাব্য গ্রন্থশালায় সৃষ্ট হয়েছিল। এ যেন মহাকাব্যের স্ফটিক প্রাসাদ। এই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যাই মতামত থাকুক না কেন, বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় মেঘনাদ-বধ কাব্য রচিত হয় নি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বাংলা ভাষায় এমন কিছু সৃষ্ট হয় নি যা সাহিত্য ব'লে ধরা যেতে পারে। শিক্ষাদানই ছিল এই সমস্ত লেখার উদ্দেশ্য। এটাকে সংস্কারের যুগ ব'লে ধরা যেতে পারে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্ম, সমাজ, ভাষা ও শিক্ষা—সমস্তকিছুর সংস্কারে ব্যাপৃত ছিলেন। বিগত শতাব্দীতে বাংলা দেশে অসাধারণ মনীষী ও দূরদর্শী রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই সমস্ত সংস্কারের অধিনায়ক। আজও পর্য্যন্ত ইংরেজী আমলে রাজা রামমোহন রায়ের অপেক্ষা মনীষী ব্যক্তি আর জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি একাধারে অতীত জ্ঞানের এবং নবযুগের মন্ত্রের মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিখর থেকে তিনি সমগ্র ইউরোপীয় সভ্যতার রূপ পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যা-কিছু প্রাণময় ও প্রাণদায়ক, তা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাংলা গদ্যের স্রষ্টা; সেই হিসাবে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টাও বলা যেতে পারে। আমাদের সাহিত্যে বিগত শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—এক নতুন চিন্তার ধারা এবং এক নতুন প্রকাশের ভঙ্গী।

(৬)

বৃটিশ-শাসনের প্রথম শতাব্দীর শেষের সঙ্গেই আমাদের সাহিত্যে শিক্ষা-নবীশের যুগ শেষ হয়ে আসে। যেন নতুন সৃষ্টি হতে থাকে।

আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য এত অল্পকালের যে, তা নিয়ে ঐতিহাসিক পর্য্যালোচনা সম্ভবপর নয়। কোন্ খানে দাঁড়ালে আমাদের সাহিত্যের ছবি ঠিক ও স্পষ্ট দেখা যাবে—সে স্থান এখনো ঠিক হয় নি। আবার আমরা এই বর্ত্তমান সাহিত্যের ধারার সঙ্গে এমন ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং প্রত্যেকেই এক একটি বিশিষ্ট ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যের কলেবর পুষ্টি করতে সচেষ্ট আছি যে, ব্যক্তিগত ছাপকে এড়িয়ে উঠে সমালোচনা করা এখন সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে, তারি শুধু একটু পরিচয় দেব।

এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, বাংলা ভাষায় শুধু দু'জন অসামান্য প্রতিভাশালী লেখক জন্মেছেন—একজন ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র আর একজন কবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের রচনা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, যদিও তাঁদের দু'জনেরই চিন্তার ধারা আমাদের এই মাটী থেকেই রস-সঞ্চয় করেছে, তবুও পাশ্চাত্য চিন্তার ধারা ও ভাব সেখানে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। তাঁদের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন সংঘটিত হয়েছে। বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য এই দুই জাতীয় প্রতিভার মিলনে জন্মগ্রহণ করে এবং এই সংমিশ্রণের ফলে যে দ্বন্দ্ব ও মিলনের সৃষ্টি হয়েছে, বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্য তারি রূপান্তর।

বাংলার মাটীর উপর হিমালয়ের ছায়া এসে পড়ে, বাংলার বাতাসে সমুদ্রের কথা আসে; অন্তরেও আমরা এই রকম এক দেশে আছি। আমাদের পশ্চাতে অতীত ভারতের ধ্যান-দীক্ষা অত্যুচ্চ গাম্ভীর্য্যে বর্ত্তমান—সামনে আমাদের বিশাল প্রসারে পাশ্চাত্য সভ্যতা প'ড়ে রয়েছে, তার অন্তরের গভীরতা এবং বাইরের সমস্ত চাঞ্চল্য নিয়ে। আমাদের কাছে এই দুই-ই সমান মোহময়, দু'জনেই ডাকে।

আমরা অতীতকে অস্বীকার করতে পারি নে—বর্ত্তমানকেও অবজ্ঞা করতে পারি নে। মানব-অন্তরের এই দুই মহাপ্রকাশের সামঞ্জস্য আমাদের জীবন ও সাহিত্যে সমাধান করাই আমাদের ব্রত। এই ব্রতের শুভ-উদ্‌যাপন হবে কি না, তা শুধু সময়ের অধিনায়ক পুরুষই জানেন। কিন্তু এ কথা ঠিক, আমাদের সাহিত্য ও জীবনে যতটুকু এই সামঞ্জস্যকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করব—ততটুকু তারাও প্রাণ ও শক্তি আহরণ করবে। *

---

* শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ইংরেজী থেকে অনূদিত।

পান্থ-বীণা

—শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১৩)

শীতের রাত্রি। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বংশী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। গায়ত্রী রান্নাঘরটা পরিষ্কার করিতেছে। রাত্রি তখন প্রায় দশটা, কিন্তু পাড়াটা এমনি নির্জ্জন যে ইহার মধ্যে আর কাহারও সাড়াশব্দ পাইবার উপায় নাই। পাশের ওই প্রকাণ্ড পড়োবাড়ীটার মধ্যে কয়েকটা কুকুর সম্ভবত এই শীতের রাত্রি কাটাইবার জন্য একটুখানি জায়গা লইয়া কাওয়া-কাওয়ি মারামারি করিতেছিল, গায়ত্রীর ঝাঁটার শব্দ তখনও থামে নাই।

বংশী ভাবিয়াছিল, দেশে খরচ কম; শহরে বাস করা তাহাদের পক্ষে যদি অসম্ভব হইয়াই ওঠে, তাহা হইলে বহু দিনের পরিত্যক্ত তাহাদের দেশের বাড়ীতে সকলে চলিয়া যাইবে, আর সে নিজে কোথাও চাকুরি করিয়া সংসার চালাইবে। সর্ব্বশেষে যখন আর কোনও পথই অবশিষ্ট থাকিবে না, তখন শুধু এই সঙ্কীর্ণ পথের সন্ধানটুকু বংশী মনে-মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু গায়ত্রী এইমাত্র যে-সংবাদটুকু দিয়া গেল তাহাতে মানুষের মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িবারই কথা। এ সম্বন্ধে সে নিজে কোনদিন খবর রাখে নাই,—রাখিবার প্রয়োজনও হয় নাই। এণ্ডারসন কোম্পানী নাকি তাহাদের সেই পরিত্যক্ত গ্রামের সীমানায় একটা কয়লার খনি তৈরী করিয়াছিল। ব্রজেশ্বরের সহিত সেইখানেই এণ্ডারসনের প্রথম পরিচয় এবং মিত্রতার সূত্রপাত;—গায়ত্রী-বংশীর তখন জন্ম হয় নাই। নিজের জমি-জায়গা তেমন বিশেষ কিছুই ছিল না। যেটুকু ছিল এণ্ডারসনকে দিয়া ব্রজেশ্বর কলিকাতায় কোম্পানীর হেড অফিসে চাকুরি লইয়া আসেন। তাহার পর সুদীর্ঘ পঞ্চাশটি বৎসর পার হইয়া গেছে।

এভারসনও বাঁচিয়া আছেন, রত্নেশ্বরও রহিয়াছেন, কিন্তু এখন আর সে কয়লার কুঠিও নাই—তাহাদের সে রুক্না গ্রামখানাও নাই। কোম্পানীর প্রয়োজনের দিন অতীত হইয়াছে, মাটির নীচে যেটুকু কয়লা ছিল সেটুকু তাহারা তুলিয়া লইয়াছে, যাহা তুলিতে পারে নাই তাহাতে আগুন ধরাইয়াছে,—সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত গ্রামখানাও মাটির নীচে সেই পাতাল পুরীর সুড়ঙ্গের তলায় বসিয়া গেছে। বিরাট সেই ধ্বংসস্তূপের উপর প্রকাণ্ড গাছগুলা এখন পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছে, চারিদিকের গহ্বরের মুখে রাত্রি-দিন হু হু করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, ধোঁয়া উঠিতেছে,—জীবন্ত কোনও প্রাণী আর সেখানে বাস করিতে পারে না, পূর্ব্বে যাহারা বাস করিত প্রাণের ভয়ে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাহারা যে কোথায় চলিয়া গেছে কেহই বলিতে পারে না,—ত্রিসীমানার মধ্যে লোকালয়ের কোনও চিহ্নই আর সেখানে নাই . . .

ঘরে আলো ছিল না; লণ্ঠনটা গায়ত্রী লইয়া গেছে। অন্ধকার ঘরে ভাঙ্গা চেয়ারের উপ্টাদিকে বংশী এতক্ষণ বসিয়াছিল, এইবার সে ধীরে-ধীরে বিছানার উপর উঠিয়া গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। ব্যাপারটা আর একবার সে ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু অন্ধকার সেই কক্ষের মধ্যে বহ্নিধূমাকীর্ণ ভয়ঙ্কর একটা বীভৎসতা ছাড়া আর কিছু তাহার নজরে পড়িল না। শুধু তাহাদের সেই বহু পুরাতন এবং পরিত্যক্ত বাসগৃহটিকে ঘিরিয়াই নয়,—রুক্না গ্রামে কয়খানা ঘরই বা ছিল!—একটা সমগ্র দেশের মেরু-মজ্জায় যেন আগুন ধরিয়াছে, এ আগুন কে ধরাইল কে জানে, এবং কে যে নিভাইবে তাহারও কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই, ইহাই তাহার মনে হইতে লাগিল।

রাত্রির কাজ শেষ করিয়া গায়ত্রী তাহার নিজের ঘরে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া বন্ধ আছে কি না-আছে দেখিবার জন্য বংশীর দরজায় একটু-খানি ধাক্কা দিতেই খোলাদরজা আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইয়া গেল। বংশী শুইয়াছে দেখিয়া বাহির হইতে গায়ত্রী পুনরায় দরজাটা বন্ধ করিতে যাইবে এমন সময় বংশী ডাকিল, কে?—দিদি?

হ্যাঁ। কিছু দরকার ছিল?

না।

গায়ত্রী চলিয়া যাইতেছিল, বংশী আবার ডাকিল, দিদি!

গায়ত্রী এইবার তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; সস্নেহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি? কি বল্‌চিস বংশী?

বংশী ঈষৎ হাসিল। বলিল, দেখেচিস দিদি, ভেবেছিলাম আমরা দেশের বাড়ীতে চলে যাব কিন্তু তাও ত' হল না।

না, সে পথ নেই। বলিয়া গায়ত্রী তাহার শিয়রের কাছে চাপিয়া বসিল। ডান হাতখানি বংশীর কপালের উপর রাখিয়া কহিল, কিন্তু দিন-রাত তুই ওই এককথা নিয়ে এত ভাবচিস কেন বল্ ত' বংশী? যা হবার তা হবেই,—কেউ তাকে হাত আড়াল দিতে পারবে না।

না—না দিদি, আমি ভাবি নে, আমি কখ্‌খনো ভাবি নে। বলিয়া বংশী একবার গায়ত্রীর মুখের পানে তাকাইল, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিবার সময় আলোটা গায়ত্রী বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছিল, ঈষৎ উন্মুক্ত দরজার ফাঁক দিয়া যে রশ্মিটুকু ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকারে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বংশী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, দিদি, নিভা কাল আসবে তোমার কাছে।

কিন্তু এই নিস্তব্ধ নিশীথে এই দুই ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে তাহাদের সংসারিক দুঃখ কষ্টের আলোচনা-প্রসঙ্গে হঠাৎ এই মেয়েটির আগমন বার্তা জানাইতে গিয়া বংশীর কণ্ঠস্বরে যে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল, অন্য কেহ হইলে হয় ত' তাহা ধরিতে পারিত না, কিন্তু গায়ত্রী তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। বলিল, সত্যি?

হাঁ, সত্যি না ত' কি আমি মিছে কথা বলছি দিদি?

গায়ত্রী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কি জানি, বড়-লোকের মেয়ে হয় ত' ভুলেও যেতে পারে।

বংশী এ কথায় আর জবাব দিল না, চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

গায়ত্রী বলিল, চুপ করে ঘুমো বংশী, রাত অনেক হয়েছে। বলিয়াই সে সেখান হইতে উঠিল এবং দরজাটা বাহির হইতে টানিয়া দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ঘরের মেঝের উপর বিছানাটা পাতিয়া লইতে বড় বেশি বিলম্ব হইল না, মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে মুড়ি-সুড়ি দিয়া এক পাশে শুইয়াও পড়িল, কিন্তু সমস্ত দিন গৃহকর্ম্ম করিয়া অন্য দিন যেমন শুইবামাত্র চোখ দুইটা তাহার ঘুমে জড়াইয়া আসে, আজ না জানি কেন তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চোখে তাহার ঘুম আসিল না, এবং এই বলিয়া সে মনে-মনে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিতে লাগিল যে, রাত্রি অধিক হইয়েছে বলিয়া ক্ষণকাল পূর্ব্বে

বংশীকে সে রাত্রি জাগিতে নিষেধ করিয়া আসিল, কিন্তু তাহারই নিতান্ত সন্নিকটে থাকিয়া নিজেই সে তাহার বাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিতেছে। নিভাকে সে আসিতে বলিয়াছিল,—সে আসিবে; এবং এই সংবাদ বংশী সানন্দে তাহার কাছে বহন করিয়া আনিয়াছে। ইহার ভিতর এমন কিছু বিশেষত্ব নাই যে, এই ভাবিয়া তাহাকে বিনিদ্র রাত্রি কাটাইতে হইবে। অবশেষে ইহাই সে নিজেকে বার-বার বুঝাইতে লাগিল।

পরদিন ছিল রবিবার, বাড়ীর বাহির হইবার প্রয়োজন বংশীর ছিল না। দুপুরে আহারাদির পর গায়ত্রীর সঙ্গে বসিয়া সে গল্প করিতেছিল। সুমুখের সেই পড়োবাড়ীটার দিকে তাকাইয়া বংশী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা দিদি এই বাড়ীটার লোকজন কি আর আসবে না কোনদিন?

খোলাজানালাটার উপরেই গায়ত্রী বসিয়াছিল; মুখ ফিরাইয়া একবার সে নিজেও সেই দিকে তাকাইল। বলিল, ছিল, সে অনেক দিন আগে। কেন? তোর মনে পড়ে না?

হ্যাঁ, মনে হয়, ছিল। ওই ছাতের ওপরে কাপড় শুকতো,—আমি অত লক্ষ্য করি নি।

গায়ত্রী তখনও সেই ভাঙাঘরের ছাতের দিকে তাকাইয়া ছিল। বলিল, ওদের বাড়ী একটি মেয়ে ছিল—ভারি সুন্দর! আমার মনে হতো ওকে আমাদের বৌ করব। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই গায়ত্রী একটুখানি চুপ করিল, বংশীর মুখের পানে একবার তাকাইল, তাহার পর আবার সেই পড়োবাড়ীর ছাতের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া বলিতে লাগিল, ভারি সুন্দর মেয়ে বংশী, দেখতে কতকটা আমাদের নিভার মত। তুইও হয় ত' দেখেছিস, কিন্তু ভুলে গেছিস্। মেয়েটি রোজ ওই ছাতের উপর দাঁড়িয়ে থাকতো—কখনও বা এসে দাঁড়াতো সুমুখের ওই বড় জানালাটার কাছে। আর একটা মজা হতো জানিস্?—আমায় দেখ্‌লে সে আর নড়তে চাইতো না। হেঁসেলে অনেক দিন হয় ত' আমার ভাত-তরকারি পুড়ে ছাই হয়ে যেতো, চুপ করে এই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমিও তাকে দেখতাম। কোনদিন তার সঙ্গে আমার আলাপ হলো না, পরিচয় হলো না, মুখে একটা কথা কইলাম না কোনদিন,—ভারি ভাব হয়ে গেল দু'জনার; শুধু ওই চোখে-চোখে চেয়ে থাকা।—তারপর হলো কি, মেয়েটি গেল মরে! খুব কাঁদলাম সেদিন, লুকিয়ে,—তোরা কেউ জানতে পারিস নি। ভারি কষ্ট হতো, এই বাড়ীটার দিকে তাকাতে পারতাম না। মনে হতো, জীবনে

আমার ওই একটি বন্ধু পেলাম, তাও আর বিধাতার সইলো না!—তার পর থেকেই বাড়ীটা ফাঁকা হয়ে গেল। কোথায় গেল তারা? এঁ্যা?

কণ্ঠস্বর তাহার অত্যন্ত ভারি হইয়া উঠিল, চোখ দুইটাও ছল-ছল করিতেছিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে তাহার মুখখানি আবার সেই পড়োবাড়ীটার দিকেই ফিরাইয়া লইল। বংশীও যে ব্যাপারটা বুঝিল না তাহা নয়। তথাপি মনটা তাহার কেমন যেন উড়ু-উড়ু করিতেছিল বলিয়া হাসিতে হাসিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কাল রাত্রে গোটাকতক কুকুর চেঁচাচ্ছিল ওই বাড়ীটার ভিতরে।

গায়ত্রী মুখ ফিরাইয়া দিব্য সহজ কণ্ঠে বলিল, কুকুর?

হাঁ। শিয়াল-কুকুরেরই ত' আড্ডা হয়েছে বাড়ীটা।

তা হবে।

আর তুই কি ভাবছিস্, খুঁজলে দু'দশটা ভূত-প্রেতও পাওয়া যায় না ও-বাড়ীতে? নিশ্চয়-ই আছে। এই বলিয়া বংশী হো হো করিয়া উঠিল।

গায়ত্রীও যে সে-হাসিতে যোগ দিল না এমন নয়। কিন্তু সে-হাসি বড় করুণ।

হাঃ! ভূত রয়েছে! আঁধার-ঘুটঘুটে রাত,—সেদিক পানে তাকাতে ভয় করে, এমন কত দুপুর রাতে উঠে আমি আমার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। একটা সাড়া-শব্দও ত' পাই নে কারও। হাঁা পাগল আর-কি! ভূত রয়েছে!—বলিয়া শুষ্ক-কাষ্ঠহাসি হাসিতে হাসিতে গায়ত্রী সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বংশী কিন্তু বসিয়াই রহিল। কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া সুমুখের চটা-ছাড়ানো দেওয়ালটার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, কোথায় কোন চট্-কলে একটা চাকুরি-খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহার বক্স-নম্বরটা সে কাল লিখিয়া আনিয়াছে,—সেখানে একটা দরখাস্ত করা উচিত। তৎক্ষণাৎ সে তাহার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং দেয়ালের গায়ে পেরেকে-ঝুলানো জামার পকেট হইতে নম্বরটি আনিয়া ইংরাজিতে একটা দরখাস্ত লিখিতে বসিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিখিবার ধৈর্য্য তাহার রহিল না, খানিকটা লিখিয়াই সে উঠিল। গায়ত্রীর ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকিল, দিদি!

তুলা অভাবে কয়েকটা ছেঁড়া কাপড় দিয়া গায়ত্রী তখন একটা লেপ সেলাই করিতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল, কি রে?—কই নিভারা ত' এলো না?

তা আমি কি জানি! বলিয়া বংশী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুচটা গায়ত্রী লেপের উপর ফুঁড়িয়া রাখিয়া কহিল, কি বল্‌ছিলি বল্ না?

কিছু বলি নি। এম'নি—। বলিয়া বংশী যেমন আসিয়াছিল তেমনি আবার ফিরিয়া তাহার ঘরে গিয়া বসিল। আধ-লেখা দরখাস্তটা সুমুখে পড়িয়াছিল, তাহাই শেষ করিবার জন্য আবার সে কলম লইয়া লিখিতে লাগিল As regards my qualifications,—এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই সে একবার থামিল, তাহার পর লিখিল, no no no no, nothing nothing. এমনি করিয়া যা' তা' লিখিয়া দু' তিন লাইন সে ভরাইয়া দিল। আবার কিয়ৎক্ষণ থামিয়া কাগজের নীচের সাদা অংশটায় বড় বড় করিয়া লিখিল, Now we are known to each other, I am for you, and you are for me.

এমন সময় গায়ত্রী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ইংরেজী সে জানিত না, তবুও দরখাস্তের কাগজখানা বংশী তাড়াতাড়ি উল্টাইয়া ফেলিল।

গায়ত্রী বলিল, আচ্ছা পাগল যা-হোক্! আমায় কি বল্‌তে গিয়ে ফিরে' এলি বল্ ত'?

কিছু না। বলিয়া শিশুর মত সহজ সরল ভাবে বংশী তার দিদির মুখের পানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। অবশেষে হাসি থামাইয়া বলিল, বলছিলাম, ওরা হয় ত' এক্ষুণি আস্‌তেও পারে, কি আন্‌তে হবে বল্‌ছিলি এই সময় বল, এনে দি। নইলে সে সময় আমি আর পারব না দিদি!

তাই বল্। বলিয়া গায়ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বংশীর হাতে একটি সিকি দিয়া বলিল, ঘি একটুখানি আছে বাড়ীতে, এই দু'আনার আদসের ময়দা—

পয়সা লইয়া বংশী আর বিলম্ব করিল না, জামা জুতা পরিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। কিন্তু এই ময়দা আনিতে গিয়া ভারি একটা মজার ব্যাপার ঘটিয়া গেল। বাজার হইতে সে ফিরিয়া আসিতেছিল, দরজায় প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় অমরেশের ঘোড়ার গাড়ীখানা তাহাদের দোরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বংশী পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইবে ভাবিয়াছিল কিন্তু পারিল না। মিতা ও বিতা গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার পথরোধ করিয়া ফেলিল। বিতা হাসিতে হাসিতে বলিল, বংশী-দা!

মিতা তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, হাতে ও কি?

বংশী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, ময়দা,—

আমাদেরই জন্যে ত', তবে দিন, আপনার আর কষ্ট কেন? বলিয়া কাগজের ঠোঙাটা হাতে লইবার জন্য নিভা হাত বাড়াইল।

গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ পাইয়া দরজাটা খুলিয়া দিবার জন্য গায়ত্রী উঠান পার হইয়া দোরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পরিচিত গলার শব্দ পাইয়া দরজাটা সে খুলিয়া ফেলিল।

সুমুখে দিদিকে দেখিয়া বংশী তাহার হাতের ঠোঙাটা নিভার হাতে ঠিক তুলিয়া দিতে পারিল না, বিভার হাতটাও কেমন যেন কাঁপিয়া উঠিল; ফলে এই হইল—ঘোড়ার গাড়ীর পা-দানির উপর কাগজের থলিটা উল্টাইয়া গিয়া ময়দাগুলা সব মাটিতে পড়িয়া গেল।

বিভা ও গায়ত্রী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া নিভা না পারিল হাসিতে, না পারিল কোনও কথা বলিতে।

যাক্ গে। বলিয়া পুনরায় ময়দা আনিবার জন্য বিভাকে সরাইয়া দিয়া বংশী আবার বাজারে ছুটিতেছিল; নিভা একবার সেইদিক পানে তাকাইয়া ভাবিল তাহাকে নিষেধ করে, কিন্তু দিদির সুমুখে একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, সমস্ত মুখখানা তাহার আগুনের মত রাঙা হইয়া উঠিল মাত্র।

—ক্রমশ

জীবনে, মরণে, কর্ম্মে ও জ্ঞানে থাকিব না পরাধীন,
আমার আদেশ না পাইয়া যেন কাটে না আমার দিন।

—মরীচিকা।

মিলন

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(১)

রঘুনাথ জেলা কোর্টে ওকালতি করিত। বছর পনরর মধ্যে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ওকালতির অর্থ, মিথ্যাকে সত্যের পোষাকে আইনের সহিত সঙ্গত করিয়া খাড়া করা। রঘুনাথ কিন্তু ইহা বিশ্বাস করিত না। বিশ্বাস এমন অনেক লোকেই করে না। রঘুনাথ নিজের বিশ্বাসটিকে কায়মনোবাক্যে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় চতুর্দ্দিকে শত্রু বৃদ্ধিই করিয়াছিল।

একদল উকিল তাহাকে ঈর্ষা করিত; কিন্তু মনে মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করিত; কিন্তু আর একদল সত্য সত্যই তাহার অনিষ্ট চিন্তা করিত।

(২)

তখন রাত ভারি হইয়াছে, রঘুনাথ নির্জ্জন কক্ষে বিপুলকায় আইনের পুস্তক-গুলির মধ্যে ক্ষিপ্রতার সহিত নজির খুঁজিতেছিল। রবিরাম গরীব, ঘোড়ার ঘাস কাটিয়া দিনাতিপাত করিত; কিন্তু দুর্দ্দৈবক্রমে সে পুলিশের কু'নজরে পড়িয়া দায়রা সোপরদ্দ হইয়াছে। এই নির্দ্দোষ-দোষীকে কেমন করিয়া রক্ষা করা যায়—তাহারই পথ সে প্রাণপণে বাহির করিবার চেষ্টায় নিবিষ্ট—এমন সময়ে বাহিরে শব্দ হইল। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিবার সময় জুতার বাঁধা লোহার নালের তীক্ষ্ণ শব্দের সহিত ভারি গলায় ডাক—বাবু, বাবু!

রঘুনাথ দোর খুলিয়া বলিল, কে?

উত্তরে তকমাপরা চাপরাশি ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া বলিল, হজুর, সাহেব সালাম দিইন্—মোটর তৈয়ারি!

এক বাক্যে—সেলাম!—মোটর! ব্যাপার কি?

(৩)

হপ্‌কিন্‌ সাহেব রঘুনাথের কর-কম্পন করিয়া বলিলেন, বসুন।

আরাম কুর্শির উপর রঘুনাথ আড়ষ্ট হইয়া বসিতেই সাহেব ভূমিকা করিয়া বলিলেন, কাজটা অত্যন্ত জরুরী বলে এত রাত্রে কষ্ট দিলেম—কিছু মনে করবেন না।

রঘুনাথ কথা কহিল না।

আমি খয়িরামের মামলার কথা বলিতেছি। আপনি তাঁর পক্ষ সমর্থন না করলেই ভাল হয়।

রঘুনাথ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, কেন? তার কারণটা কি জানতে পারি?

হপ্‌কিন্‌ বলিলেন,—ওটা ক্রমে একটু পলিটিক্যাল্‌ আকার ধারণ করচে—তাছাড়া ওটাতে কয়েকজন বড় অফিসারের প্রেস্‌টিজ জড়িত আছে।

কিন্তু লোকটি যে নির্দ্দোষ—

সাহেব গ্লাস হইতে রক্তের মত কি একটা পদার্থ পান করিতে করিতে বলিলেন—বেটা বদমায়েস, পাজি হারামজাদা—শূয়রকা বাচ্চা—ব্লাকি নিগার—

রঘুনাথের দেহের মধ্যে রক্ত টক্‌বগ্‌ করিয়া যেন ফুটিয়া উঠিল। তাহার কথা বাহির হইল না।

সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিল, আমার হুকুম, তোমাকে খয়িরামের মামলা ছেড়ে দিতে হবে।

দীপ্ত আলোতে সাহেবের কম্পমান, মাথার উপর সিগারেটের ধূমাঙ্কিত ছাপ সমেত স্থূল তর্জ্জনী রঘুনাথের নাকের সন্নিকটে উঁচু হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আমি তোমার হুকুম অগ্রাহ্য করি—যাহা জোর এবং যাহা অন্যায় থেকে আসে—আমরা ভারতবর্ষের লোক তাহাকে অবজ্ঞ মনে করি।

রঘুনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া শুনিল অট্টহাস্যে হপ্‌কিন্‌ বলিতেছে,—স্বরাজবাদীর আবার দম্ভ!

মোটরখানা নিমেষে গর্জ্জন করিয়া তাহাকে ফেলিয়াই চলিয়া গেল।

নিঃশব্দ রঘুনাথ মাথা তুলিয়া দেখিল—গম্ভীর অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য নক্ষত্র অনিমেষ চাহিয়া আছে।

(৪)

এক পেগ হুইস্‌কি নিমেষে নিঃশেষ করিয়া কড্ বলিল, কালার এত বড় স্পর্দ্ধা! জব্দ করতেই হবে—শূয়ারকে!

সে-সব দিন আর নেই কড্!

তোমাদের জন্যেই নেই;—তোমরা যত ডিমর‍্যালাইজড্—পুলিশ তত নয়।

হপকিন্ টাক-মাথায় তর্জ্জনির লঘু আঘাত করিতে করিতে বলিল, আমাদের যে দায়িত্ব ঢের বেশী, কড্।

বটে!

থাকগে বাজে তর্ক—এখন কাজের কথায় এসো।

কি?

ওই নিগারটাকে ত' কাল আট্‌কাতেই হচ্চে নইলে ঐ হাদা বেটা ডেভিল-টাকে বে-কসুর খালাস দেবে। আর যদি এখানে না পায় ত'—আরো বিরাট মুখুজ্যের হাতে ত' পড়লেই হলো।

হাইকোর্টে?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

তবে?

তুমি এই কাগজটায় সই দিলেই আমি বেটাকে তিনদিন হাজতে রেখে দেব।

উপায় কি?—দাও—

হপ্‌কিন্—সহি করিয়া দিল।

(৫)

তখন আন্দাজ নয়টা বেলা। রঘুনাথ বাহিরের ঘরে বসিয়া আইনের পুস্তক পড়িতেছিল। মাথায় খাকির বাঁকা টুপি, পরণে খাকির হাফ্‌পেন্ট, একজন পুলিশের কর্ম্মচারী আসিয়া একখানা কাগজ তাহার সম্মুখে ধরিল।

বাড়ী-সার্চের পরওয়ানা! লোকটি মুসলমান, বাঙলা দেশেই জন্ম কিন্তু সরকারের চাকরি স্বীকার করার পর উর্দ্দুতেই কথা-বার্ত্তা কহেন। খুব কায়দা দোরস্ত্।

আপনি অনুমতি করলেই কাজ শুরু করা যেতে পারে।

কিসের অনুমতি বাপু?

লোকটি মাথা চুল্‌কাইয়া একটু মোলায়েম হাস্য করিল।

রঘুনাথ বলিল, বাড়ীর মেয়েদের কি অন্য বাড়ী পাঠিয়ে দেব?

না, একটা ঘর আগে সার্চ্চ ক'রে নিয়ে তার পর সেই ঘরে তাদের দিতে হবে —বাড়ী ছেড়ে কারুর যাবার নিয়ম নেই!

হুঁ, বলিয়া রঘুনাথ চিন্তা করিতে লাগিল।

রামকানাই বাবু একজন উকিল—তাঁহার সামনে তল্লাস সুরু হইয়া গেল।

(৬)

খানাতল্লাসীর পর রঘুনাথের বাড়ী হইতে নানাবিধ দ্রব্য বাহির হইল। তাহা পিস্তল, একটা বোমার খোল, যুগান্তর, বন্দেমাতরম্, সখারামের দেশের কথা।

দেশের লোকের বিস্ময়ের অবধি রহিল না; রঘুনাথ ওকালতির সঙ্গে—এত-গুলি কাজ কি করিয়া করিত!

রঘুনাথ কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না। নেপোলিয়ানের মত সে-ও বলিল, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়!

রঘুনাথের পাঁচ বছরের জন্য সশ্রম কারাবাস হইল। হাজত হইতে রঘুনাথ তাহা শুনিল।

ছোট জাঙ্গিয়া পরা; গলায় তারে ঝোলান কাঠের তক্তিতে ইংরেজিতে নম্বর দাগা রয়েছে। লোহার থাল-বাটিতে প্রাতর্ভোজন সমাধা করিয়া সুকুমার কয়েদিটি আসিয়া ঘানি গাছের ডাল ধরিল—তার পর? ছুট-ছুট—

পায়ের তলায় মাটি দুলিতে লাগিল—চারিদিকের সব জিনিষ যেঁাটে ঘোঁটে কোথাও লাগিল— ডালের উপর ভর দিয়া—তবুও ছুট ছুট—কানে বেতের সপাং সপাং শব্দ বাজিতেছে।

কপালের উপর কাল-ঘাম; জিভ আর মুখের মধ্যে থাকে না—সশব্দে রঘুনাথ পড়িয়া গেল। চারিদিকের ক্রুর হাস্যে—ইনস্পেক্টরের বোলগুলা গর্জ্জিয়া ধন্ ধন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

• • • •

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘণায়মান। ছোট ষ্ট্রেচারের উপর রঘুনাথ অর্দ্ধ-অচৈতন্য, মাথার শিয়রে বসিয়া বত্রিশ নম্বরের কয়েদী মৃদু মৃদু হাওয়া দিতেছে।

রঘুনাথ চক্ষু চাহিয়া চারিদিক দেখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল,—তাহার পর চক্ষু তুলিয়া শিয়রের লোকটির মুখ অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—ব বরাম, তুই !

চাপাকান্নার সঙ্গে—অশ্রুর সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল !

অভিনেত্রী

—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

সে ছিল বিখ্যাত অভিনেত্রী। দেশের জন-সাধারণের উপর তার অভিনয়-কুশলতা এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, প্রশংসার সে গুরুভার সে যেন আর কিছুতেই বইতে পার্‌ছিল না। তার অন্তরাত্মা হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল এমন একটা কিছুর জন্যে, প্রশংসার আতিশয্যের উগ্রমদের ফেনায় যা ফেনিল নয়।

তারপর একদিন এল, সেদিন সে তার সমগ্র দেহমনপ্রাণ দিয়ে এক তরুণকে ভালোবেসে ফেল্লে। সেদিন থেকে তার কাছে অভিনয়, দর্শকের হাততালি, প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি, ফুলের তোড়ার অশ্রান্ত বর্ষণ—সমস্তই অবাঞ্ছনীয় মূল্যহীন হ'য়ে দাঁড়াল। ভালোবাসাই হ'য়ে উঠ্‌ল তার একমাত্র কামনার ধন, তার জীবন-মরণ। অভিনয়-শিল্পের বাইরে দুনিয়ায় আর যে কিছু আছে বা থাক্‌তে পারে, এত দিন এ বিশ্বাস এ ধারণা তার ছিল না। যেদিন সে বিশ্বাস সে ধারণা তার হল, সেই দিনই সে তার ইহকাল পরকাল একখানি নৈবেদ্যের মত ক'রে প্রেমের পূজার নিঃশেষে অঞ্জলি দিয়ে বস্‌ল; কিন্তু সর্ব্বস্ব দিয়ে যাকে সে ভালোবাসল, তার সেই প্রেমাস্পদ তরুণের অন্তরে তার প্রশংসা তার সম্মান একটা দারুণ ঈর্ষার ভাব এনে দিলে।

সে-দিন তরুণ তরুণীর কাছে দাবী ক'রে বস্‌ল, তাকে রঙ্গমঞ্চের কাছ থেকে চির-বিদায় নিতে হবে। হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ তার কথায় তরুণী সম্মতি দিলে, সে জন্যে তার প্রাণে কিছুমাত্র ক্ষোভের উদয় হল না। সে তরুণকে বল্লে, ভালোবাসা দুনিয়ার সব চাইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ, এর কাছে শিল্প-কলা যশ-মান অর্থ, এমন কি জীবনও নগণ্য।

দিন যায়। ক্রমে তরুণের ভালোবাসার স্রোতে ভাঁটা প'ড়ে এল, আর যে যুবতী তার ভালোবাসার খাতিরে তার জীবনের সব ছেড়ে আজ নিঃস্ব হ'য়ে

দাড়েচে, তার কাছে প্রেমাস্পদের এই প্রাণহীন ভালোবাসার কপট অভিনয়টা ধরা পড়তে বেশী দেরী হল না। এই উপেক্ষা তার দেহমনকে শীতের সন্ধ্যার কুয়াসার মত একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্লে। কিন্তু তার প্রাণশক্তি ছিল নাকি অদম্য, সেই কারণে বিপদের মুখে এগিয়ে যেতেও তার যেমন ভয় ছিল না, দুঃখকে তেমনি সে অতি সহজেই বরণ ক'রে নিতে পারত। সে জানতে পেরেছিল যে, তার জীবন এমন একটা সন্ধিস্থানে এসে পৌঁছেচে, যেখানে দুঃখের সমুদ্র হয় তো প্রতিমুহূর্ত্তে গর্জ্জে উঠে তার প্রাণের বেলা-তটকে আঘাত ক'রে তা হাজার খণ্ডে ভেঙে রেণু রেণু ক'রে ধূলিকণায় মিশিয়ে দিয়ে যেতে পারে।

তাই সে তার আসন্ন বিপদটাকে নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণ বিচারের শাণিত ছুরি দিয়ে দক্ষ অস্ত্র-চিকিৎ- ক মত চিরে চিরে যাচাই ক'রে দেখ্‌লে। সে তার জীবনের সফলতা প্রেমে ই উৎসর্গ করেচে, কিন্তু হায়, আজ সেই প্রেম তাকে ধরা দিয়েও দিলে না। যে ব্যর্থ প্রেমের শিখা তার ধীরে ধীরে যবনিকার অন্তরালে স'রে যাচ্চে, সে জানত যে, তা অচিরেই নিবে যাবে। তখন সে তার ব্যর্থ-জীবনের প্রেমের রিক্ততার মাঝে একা একান্ত নিঃসঙ্গ হ'য়েই পড়বে।

যে তরুণী একদিন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ব'লে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেছিল, আজ সে বুঝ্‌তে পারলে যে, সে তার নিজের দোষেই সেই শিল্পচাতুর্য্য ও অভিনয়-নিপুণতাকে হেলায় পায়ে দলে এসেচে, যা অতি বড় দুঃসময়েও তাকে হয় তো বেদনার কশাঘাত থেকে মুক্তি দিতে পারত। প্রেমের জন্যে আজন্মের সাধনার ধন, কলা-লক্ষ্মীকে, সে উপেক্ষা করেচে, তাই দুদিনে কলা-লক্ষ্মীর প্রসন্ন হাসিও তার দুঃখের মেঘে অরুণ আলোর রেখাপাত করতে পারচে না।

সারা জীবন অভিনয়-শিক্ষকের যে নির্দ্দেশ, লেখকের যে ভাব-ভাষা, তার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা ক'রে এসেচে, আজ নিজের সত্যিকার জীবনে যখন তার প্রয়োজন এল তখন তার সে বিদ্যা সে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব কোন কাজেই এল না। অভিনয়ে সাফল্যলাভ করতে ভাব ভঙ্গী প্রকাশ—যা-কিছু দরকার সবই যে প্রচুর পরিমাণেই সে একদিন আয়ত্ব ক'রে দেশের নর-নারীর মনোহরণ করতে পেরেছিল, আজ প্রকৃত কাজের বেলায় সে সমস্তই অকর্ম্মণ্য হ'য়ে দাঁড়ালে। বালকের সম্মুখে একটা জটিল সমস্যা এনে দিলে সে যেমন বিহ্বল হ'য়ে প'ড়ে সে-ও তেমনি তার দক্ষতায় চাতুর্য্য—সমস্ত নিয়ে বাস্তব জীবনে সত্যিকারের অভিনয় করতে যেয়ে দেখ্‌লে, তার তো প্রেমের দেবতার পূজা করবার কোন সম্বলই নেই। যতই দিন যেতে লাগ্‌ল, কাজের প্রয়োজন এবং তাড়া ততই

বেড়ে যেতে লাগল কিন্তু তার পক্ষে সমস্যা সমস্তাই থেকে গেল। একদিন ব্যর্থতার দারুণ বেদনায় হতাশ হ'য়ে সে যখন আপনার মনে ইতস্তত পাইচারী কর্‌ছিল, ঠিক সেই সময় একটি লোক তার সঙ্গে দেখা করতে এল। ইনি আর কেউ নন, সে পূর্ব্বে যে-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কর্‌ত, ইনি তারই অধিকারী। ইনি এসেচেন অভিনেত্রীকে একখানা নতুন নাটকে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কর্‌বার আমন্ত্রণ করতে। বলা বাহুল্য যে, সে অভিনয় করতে সম্মত হল না। সে তো-আর অভিনয় কর্‌বে না, কেননা অভিনয়-শিক্ষক বা নাট্যকারের হাতে খেলার পুতুল হ'য়ে একদিন সে যে-সুখ্যাতি পেয়েচে, তার কিছুমাত্র দাম নেই, তা কার্য্যক্ষেত্রে একান্ত অকেজো।

এতদিন রঙ্গমঞ্চে সে যে-সকল করুণ রসাত্মক অভিনয় দেখিয়ে বাহবা পেয়েচে, আজ বাস্তব জীবনে যে ট্রাজেডির সুমুখে এসে দাঁড়িয়েচে, তার তুলনায় করুণ রসাত্মক অভিনয়গুলি যে কিছুই নয়, এ কথা আজ সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি কর্‌চে। তিনি ধ'রে বস্‌লেন—অভিনয় তাকে করতেই হবে—কেননা সে যদি অভিনয় করে তা হলে তাঁর পয়সা আস্‌বে প্রচুর, তাই তিনি তো তাকে কিছুতেই উপেক্ষা কর্‌তে পারেন না। তরুণীকে রাজী করাতে যত রকমের চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি কর্‌লেন না। বল্লেন, একবার বইখানা প'ড়ে দেখতে আপত্তি কি? ভূমিকা বা বই পসন্দ না হয়, অভিনয় না করলেই হল।

অধিকারীর হাত এড়াবার জন্যে সে বইখানা নিয়ে পড়ে দেখলে যে, বইয়ের ট্রাজেডি আর তার নিজের জীবনের ট্রাজেডি—দু'টোই এক। ঘটনা-সন্নিবেশের মধ্যেও কিছুমাত্র পার্থক্য নেই, এমন কি সমস্যার সমাধানও কি হবে তাও বইয়ে দেওয়া রয়েচে। অদৃষ্টদেবতা এমনি করে নাটকের মধ্যে দিয়ে অভিনেত্রীর চরম মুহূর্ত্তে তার কল্যাণহস্ত প্রসারিত কর্‌লেন। তবে কলালক্ষ্মী ভোলেন নি, তাকে ভোলেন নি। কৃতজ্ঞতার আনন্দে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা নেমে এল।

নিজের জীবনের ঘটনা-সন্নিবেশের সবকিছু খুঁটিনাটি আয়ত্ত কর্‌বার উদ্দেশে সে শেষটায় অভিনয় কর্‌তেও রাজী হল এবং যথাকালে বিপুল জনতার সুমুখে তার অভিনয়ও হয়ে গেল। অভিনয় এতটা চমৎকার একটা মনোজ্ঞ হল যে, তার সমগ্র জীবনের সকল সাফল্য তার কাছে অকিঞ্চিৎকর। সর্ব্বজয়ী প্রতিভার পায়ে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হ'য়ে আস্‌চে, চারিদিক থেকে অভিনেত্রীর ভাগ্যেও সেরূপ সুখ্যাতির পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হল।

অভিনয় শেষে ক্লান্ত অবসন্ন দেহমন নিয়ে সে বাড়ীতে ফিরে এল, তখনো তার কানে সহস্র নর-নারীর উল্লাস ও করতালির শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে তাকে কেমন যেন বিমূঢ় ক'রে ফেলেচে। অভিনয়ে সে তার সমগ্র শক্তি নিয়োগ ক'রে নর-নারীর পায়ে তা নিবেদন ক'রে এসেচে, তার নিজের জন্যে থাক্‌বার মধ্যে আছে একটা অসহায় দুর্ব্বলতার ভাব। অবসন্ন দেহমন নিয়ে রাশি রাশি ফুলের ভারে সে নেতিয়ে পড়েচে। এমন সময় দেখ্‌লে, সুমুখেই খাবারের জায়গা করা রয়েচে, আর সেখানে দু'জনার মত খাবার ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েচে। চট ক'রে তার মনে প'ড়ে গেল, আজই না তার ভবিষ্যৎ জীবনের ধারা নির্দ্ধারিত হবে। একথা তো তার কিছুই মনে ছিল না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার সেই তরুণ প্রেমাস্পদ এসে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, আমি ঠিক সময়েই এসেচি তো?

সে সমুখের দেয়াল-ঘড়িটার দিকে চেয়ে জবাব দিলে, ঠিক সময়েই এসেচ বটে কিন্তু 'একটু' দেরী হ'য়ে গেছে। *

পয়সা করি নি আমি পাই নি খেতাব,
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখি নি কেতাব।

—সনেট পঞ্চাশৎ।

---

* অস্কার ওয়াইল্ডের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত একটি লেখা অবলম্বনে।

ভাগ্যবতী

—শ্রীদীনেশচন্দ্র লোধ।

বিমি, এসেছিস্? এ দিকে আয় ত' মা, একটা কথা শুনে যা।

রুগ্নমাতার ডাক শুনিয়া কলসীটা দাওয়ায় রাখিয়া ভিজা কাপড়েই দরজায় উঠিয়া বিমলা বলিল, কেন শীগ্‌গির বল, মাজা বাসন ঘাটে ফেলে এসেছি।

অতি কষ্টে পাশ ফিরিয়া মা বলিলেন, উনি আজ আবার দেওঘরে গে'ছেন, এ বেলা বোধ হয় ফিরবেন না। তোর জন্যে চারটে চাল সেদ্ধ করে' নে মা, কাল রাত্তিরেও কিছু খাস নি। আর খোকা কোন দিকে গেল, একটু দেখিস্ আমারও জ্বরের সময় হয়ে এল।

বিষণ্ণ মনে বিমলা ঘাটের দিকে চলিল। বৃদ্ধ পিতা আজও আবার দেওঘরে গিয়াছেন শুনিয়া বিমলার মুখ হঠাৎ মলিন হইয়া উঠিল। বাসনগুলি লইয়া ফিরিতেই দেখিল, ছোট ভাই খোকা গায়ে কাদা মাখিয়া খেলা করিতেছে। তাড়াতাড়ি বাসন রাখিয়া খোকার গায়ের কাদা ধুইয়া যে ঘরে মা শুইয়াছিলেন, সে ঘরের মেঝেতে ছাড়িয়া দিল। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ভাবিল, কে আবার পোড়া পেটের জন্য ভাত সেদ্ধ করতে যাবে, কালকের পান্তা রয়েছে তাতেই হবে।

তারপর খোকার দুধ গরম করিতে রান্না ঘরে যাইতেই দেখিল, কোথাকার এক হতচ্ছাড়া কুকুর রান্না ঘর হইতে জিভ্ চাটিতে চাটিতে বাহির হইতেছে।

ব্যাপার বুঝিয়া রাগে ও দুঃখে বিমলার এ সময়েও হাসি পাইল। দুধ গরম করিয়া খোকাকে খাওয়াইল। শান্ত হইয়া খোকা কাঠের ঘোড়াটা লইয়া খেলা জুড়িয়া দিল। বিমলা মায়ের কপালে হাত দিয়া জ্বর দেখিল ও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একে একে ঘরের যত রান্নার সরঞ্জাম বাহির করিয়া ঘাটে লইয়া গেল। কতকগুলি ভাত কাকের সামনে ছড়াইয়া ফেলিয়া সমস্ত জিনিষগুলি ধুইয়া যখন বিমলা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল তখন সূর্য্য মাথার উপরে আসিয়াছে।

ঘরে আসিয়া দেখিল, কেরোসিনের ডিবের কালি, গাঁয়ে মুখে মাখিয়া ঘরময় কেরোসিন ঢালিয়া, মাটিতে পড়িয়াই খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জ্বরে তখন মা-ও অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। সে মাকে কিছু বলিল না, খোকারও ঘুম ভাঙ্গাইল না। আঁচল পাতিয়া নিজেও খোকার পাশে শুইয়া পড়িল। কিন্তু বিমলার ঘুম আসিল না, ঘুরিয়া ফিরিয়া কত চিন্তা তাহার মনে আসিতে লাগিল। তার জন্য বৃদ্ধ পিতা কত লাঞ্ছনাই না ভোগ করিয়াছেন। তার জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল।

(দুই)

বৃদ্ধ হরনাথ মুখোপাধ্যায় সামান্য বেতনে গ্রামের জমিদার সরকারে কাজ করেন। মাসে মাসে তিনি যাহা উপার্জ্জন করেন তদ্বারা সংসার ব্যয় নির্ব্বাহ করাই দুষ্কর, তাহাতে আবার স্ত্রী আজ দুই বৎসর যাবৎ ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন, তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যয় ত' আছেই। দুই পুত্র, বড় সুধীর, কলিকাতায় কোন দয়াবান জমিদারের করুণার উপর নির্ভর করিয়া বি. এ. পড়িতেছে; ছোট, 'খোকা'। স্ত্রী শয্যা লইবার পর হইতেই, ষোল বৎসরের একমাত্র অনূঢ়া কন্যা বিমলা সংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম্ম দেখে। জগতের আর দশজন দরিদ্রের দিন যে ভাবে কাটে হরনাথ মুখুয্যেরও সে ভাবে কাটিবে তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কন্যাদায়ের বোঝা-ই তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কন্যা বয়স্থা হইয়াছে, বাহিরে তিনি আর মুখ দেখাইতে পারেন না। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে দেখিলেই নানা কথায় তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে। মেয়ে-মহলে যে সব কথা হয় তাহা শুনিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এই বিপদে সকল পিতাকেই চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু হরনাথ মুখুয্যের সে চিন্তার পথও প্রায় রুদ্ধ, কারণ তিনি নিজে অর্থহীন, কন্যা কুরূপা। পিতার অর্থের জোর থাকিলে কন্যার রূপ না থাকিলেও অনেক যায়গায় চলে, আবার কন্যার রূপ থাকিলে পিতা অর্থহীন হইলে হয় ত' কোন ব্যাঘাত ঘটে না কিন্তু হরনাথ মুখুয্যে যে নিরুপায়।

যে যতই গুণের আদর করুক, মুখে যে যতই বলুক, বিপদগ্রস্ত পিতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করা সম্বন্ধে যতই বক্তৃতা করুক, কিন্তু যেচ্ছায় ও সাদরে নিঃস্বার্থভাবে কুরূপা পত্নী গ্রহণ করিতে পারে, এমন বরের সন্ধান করিলে খুব কমই পাওয়া যায়। কার্য্যক্ষেত্রে ইহা কতদূর সম্ভব, হরনাথ মুখুয্যে তাহা

পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, জানিয়া শুনিয়া, বিশেষতঃ স্বচক্ষে দেখিয়া কে এই অপদার্থ কুরূপা পেত্নীটাকে চির-জনমের সঙ্গিনী করিতে যাইবে। বিমলার সম্বন্ধের জন্য হরনাথ মুখুয্যেকে কত যে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে! অনেক বরপক্ষের নির্ব্বাচন-সমিতি বাড়ীতে আসিয়া বিমলাকে দেখিয়া গিয়াছে। কিন্তু 'ভেবে দেখি' 'পরে জানাব' 'আমাদের আপত্তি নেই যদি মেয়েদের মত হয়' ইত্যাদি বলিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছেন আর পরে ভাবিয়াও দেখেন নাই, জানানও নাই কিম্বা মেয়েদেরও মত হয় নাই। তাঁহাদের কত ব্যঙ্গ বাক্য, ঠাট্টা তামাসা যে হতভাগিনী বিমলাকে সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার শেষ নাই। বিমলা নীরবে সকল সহ্য করিয়াছে, দুঃখক্লিষ্ট প্রাণকে সান্ত্বনা দিয়াছে।

(তিন)

বেলা প্রায় তিনটার সময় হরনাথ বাবু, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঘরে ঢুকিলেন। বিমলা মায়ের মুখে পথ্য দিতেছিল। পিতাকে দেখিয়াই, অভাবনীয় আশঙ্কায় তাহার হৃদয়ে দ্রুত স্পন্দন আরম্ভ হইল। তাড়াতাড়ি মায়ের মুখ মুছাইয়া বিমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অসময়ে ফিরিতে দেখিয়া বিমলা বুঝিল, পিতার এখনও স্নানাহার হয় নাই। সে তাড়াতাড়ি রান্নার বন্দোবস্ত করিতে গেল।

রুগ্না স্ত্রী অতি আশা করিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত তাড়াতাড়ি যে চলে এলে? তাদের মত হয়েছে বুঝি। তা এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে, না খেয়ে না দেয়ে এ দুপুরে আসার কি দরকারই বা ছিল?

সে অনেক কথা, ভগবান জানেন কি হয়। আজ বিকেলে তারা দেখ্‌তে আসবে।

কেন, দেওঘর থেকে ত' তারা একবার দেখে গেছে!

না, সে সম্বন্ধ নয়, সে গাঁয়েরই একজন কুলীন ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে রাজি হয়েছেন, এক কথা—বিয়ের পর ইচ্ছে হলে তিনি শ্বশুরঘরে বিমলাকে নেবেন, না হলে আমাকে তার আজীবন ভরণপোষণ করতে হবে। তিনি কেবল কুল রক্ষা করে যাবেন মাত্র।

বয়স কত?

পঞ্চাশের উপর হবে বলে মনে হল। তার ঘরে আর এক স্ত্রী রয়েছেন।

বিয়ের তাঁর বিশেষ ইচ্ছে নেই, কেবল আমার দুঃখের কথা শুনে রাজি হয়েছেন।

বল কি? থাক্ বিমির বিয়ে দিয়ে কাজ নেই, দুদিন পরেই যে অভাগীকে হাতের নোয়া খুলতে হবে। তার ওপর আবার সতীন-ঘর। তোমার পায়ে ধরি, তুমি এ সম্বন্ধ ফিরিয়ে দাও।

হঠাৎ হরনাথ বাবু রাগিয়া উঠিলেন, বল্লেই হল ফিরিয়ে দাও গে, শুয়ে শুয়ে বলছ কিনা, বেশ লাগছে। আজ তিন বছর ধরে কি লাঞ্ছনা ভোগ করছি আমি জানি। এত ভাবনা হলে আতুর-ঘরে গলাটিপে মেরে ফেল্লেই পারতে। আমি যেন ইচ্ছা ক'রে নিজের মেয়ের সর্বনাশ করছি, অন্য উপায় নেই আর কি করব।

বলিতে বলিতে তিনি রাগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। চোখের জল মুছিয়া স্ত্রী পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

রাগের বশে হরনাথ শেষের কথাগুলি এত জোরে বলিয়াছিলেন যে, বিমলা সবই শুনিতে পাইয়াছিল। সে নূতন কিছু ভাবিল না, এই ব্যাপার সে অনেকবার দেখিয়াছে।

হরনাথ বাবু আহার শেষ করিতে না করিতেই, বহির্বাটীতে বহু অপরিচিত লোকের সমাগম প্রচারিত হইল। সাজ সজ্জা করিয়া বিমলা কোন দিনই নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে আসে নাই। অন্যান্য বার পাড়ার দু'এক জন স্ত্রী-লোক এই সময় উপস্থিত থাকে, কিন্তু আজ সময় সঙ্কীর্ণহেতু কাহাকেও পাওয়া গেল না। সুতরাং হরনাথ বাবু নিজেই বিমলাকে তাঁহাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং তাহাদের জল খাবারের আয়োজনে নিজেই চলিয়া গেলেন। এখানে বরের পরিচয় ও রূপ সম্বন্ধে কোন কথা বলার প্রয়োজন নাই, কারণ ইতিপূর্ব্বে এমন অনেক রূপবান ও গুণধর বর আসিয়াছেন যে, যদি নির্ব্বাচনের অধিকার ক'নের থাকিত, তবে এমন কি বিমলাও অনেককে স্বাগমত অপছন্দ করিতে পারিত!

খানিকক্ষণ কেহ কোন কথা বলিলেন না, কেবল, হাসাহাসি ও চোখের ইঙ্গিত চলিতে লাগিল। এক জন অতি দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন, কি বল, তাহলে উনি এখন যেতে পারেন তোমাদের দেখা হলো ত?

আর এক জন প্রয়োজনের অধিক বাগুতা দেখাইয়া বলিলেন, তা' নিশ্চয়ই, উনি ইচ্ছা করলে আরও আগেও যেতে পারতেন। বিমলা চলিয়া আসিল।

না জানলেও চলত, না দেখে সম্বন্ধ পাকাপাকি করাই ভাল ছিল হে সুবোধ। জলযোগের পর সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। বিদায় হইবার সময় ভাবী বর বলিয়া গেলেন, কাল লোক পাঠিয়ে আপনাকে ঠিক খবর দোব। হরনাথ বাবু অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

(চারি)

রাত্রেও বিমলা কিছু খাইল না, অবসন্ন দেহে বিছানায় শুইয়া পড়িল। সন্তাপহারিণী নিদ্রার দয়াও তাহার উপর হইল না। পাশের বাড়ীতে জমীদারের ছেলের বিয়ে। কত রকমের বাজি তামাসা হইতেছে। নানা রকমের বাজ বাজিতেছে, রং বেরংএর বাজি পোড়ান হইতেছে। সে বাড়ীতে কত আনন্দ কত উৎসাহ কত ব্যস্ততা। আর তারই পাশে দরিদ্রের কুটীরে কেবল কর্ম্মক্লান্ত পিতার দীর্ঘশ্বাস রুগ্না মাতার রোগ-যন্ত্রনার আর্ত্তনাদ এবং কুরূপা কুৎসিতা, লাঞ্ছিতা, ঘৃণিতা অভাগিনীর মনস্তাপ ভিন্ন আর কিছুই নাই। চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া বিমলাকে পাগল করিয়া তুলিল। হঠাৎ বিমলা উঠিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল, সে ঠিক করিল সে আত্মহত্যা করিবে। থাকুক আত্মহত্যায় ঘোরতর পাপ, সে পাপের জন্ত ঘোরতর নরক-যন্ত্রণাও তার কাছে স্বর্গ। সমাজ তাহাকে ত এই ভাবে বাঁচিতেও দিবেনা। বরঞ্চ শত শত বিধবার ভার সহ্য করিতে পারে, কিন্তু একটা হিন্দু অরক্ষণীয়া ভাবে সে স্থির থাকিতে পারে না। সে যে সমাজের কাছে ঘোর অপরাধী, তাহার অপরাধের শাস্তি যে ভোগ করিতেছেন তাহার পিতা মাতা। রূপ থাকিলে অন্য সকল অপরাধও যে ক্ষমা পায়, কিন্তু কুরূপা নির্দ্দোষী হইলে যে ক্ষমারও অযোগ্য। তার ত কেবলমাত্র এক অপরাধ, যে তার রূপ নাই। সে কি নিজে ইচ্ছা করিয়া কুরূপা হইয়াছে। ভগবান তাহাকে এমন করিয়া সৃষ্টিই-বা করিলেন কেন? সৃষ্টিই যদি করিলেন রূপ দিলেন না কেন? রূপই যদি না দিলেন তাহাকে নারী করিয়া সৃজন করিলেন কেন? পুরুষ করিয়া সৃষ্টি করিলেইত সকল আপদ চুকিয়া যাইত। আরও কত কথা সে ভাবিতে লাগিল। তারপর আত্মহত্যা করিবে ইহাই স্থির করিল।

এমন সময় বহির্ব্বাটীতে, বিমলার দাদা সুধীরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বিমলার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া দাদার সঙ্গে শেষ দেখা করিয়া এই রাত্রেই সমস্ত শেষ করিয়া ফেলে। কিন্তু সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না, হাত পা

কাঁপিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর হইতেই বিমলার জরানুভব হইয়াছিল, কিন্তু সে দিকে সে খেয়ালও করে নাই। ক্রমেই জর বাড়িয়া চলিয়াছে। সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। আর কিছু ভাবিতে পারিল না।

সমস্ত দিনের পরিশ্রম, অনাহার অনিয়মিত স্নান, জর হওয়া স্বাভাবিক। প্রাতঃকালে সুধীর ডাক্তার ডাকিয়া আনিল, ডাক্তার ঔষধ দিলেন, বলিলেন, শীঘ্রই সেরে উঠবে। সকলেই আশ্বস্ত হইল কিন্তু বিমলা কিছুতেই ঔষধ খাইতে চাহিল না। প্রথম দুই দিন বলিল, এ জরে কে আবার ওষুধ খায়, এই ত কালই সেরে যাবে। কিন্তু জর কালও সারিল না, পরশুও সারিল না। অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলিল। দিনরাত সুধীর তাহাকে, ঔষধ খাইবার কথা পীড়াপীড়ি করিত, সে এক উত্তর রোজই দিত। ক্রমে পাঁচদিন অতীত হইল, জরের বিরাম নাই, নানা উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল। মাঝে মাঝে প্রলাপও বকিতে আরম্ভ করিল। ডাক্তার বলিলেন ঔষধ না খেলে কি করব বলুন, আমি ত চেষ্টা করতে কম করছি না। আচ্ছা একটা কি দুটো ইন্‌জেকসন দিচ্ছি। ডাক্তারের কথা শুনিয়াই বিমলা বলিল, দাদা, তাও দিতে দোব না, আমি হাত পা নাড়ব। সকলেই তখন হতাশ হইল।

সুধীর ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, পাশ ফিরিয়া বিমলা কি ভাবিতেছে ও অনর্গল অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। সুধীর বিমলার মাথার কাছে বসিয়া বলিল, দিদি, তুই কি শেষকালে ইচ্ছা করে মারা পড়্‌বি?

তা হয় কৈ দাদা, মরতে ত চাচ্ছি কত দিন থেকে, মরণ হয় কই।

আঃ কি যে বলছিস্ মরবি কেন? তোর কিসের দুঃখ দিদি, আমার কথা শোন, এই ঔষধ টুকু খেয়ে ফেল দিকি লক্ষ্মী।

আর কেন দাদা, জগত যাকে ঘৃণা করে, তার বেঁচে কি ফল দাদা, তোমরা আমায় মরতে দাও।

জগত না চায় আমরা ত চাই দিদি, তোর আর কোন লাঞ্ছনা হবে না' তোর বিয়ের কথা আর মুখেও আনব না। আমাদের দেশে ত অনেক কুমারী মেয়ে আছে তুইও থাকবি।

সমাজে যে তোমাদের লাঞ্ছনা হবে দাদা।

সে সমাজ নিয়ে আমরা কি করব দিদি। সমাজের ত' একঘরে' করার অধিকার আছে মাত্র, আর কি করতে পারে সমাজ? নে আমার কথা শোন দিদি লক্ষ্মী বোন আমার নে একটু খা।

পায়ে ধরি দাদা আর ও কথা বলো না, যদি ছোট বোন বলে স্নেহ করে থাক তবে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি এই জ্বরেই মরি আর পরজন্মে যেন তোমাদের ভাই হয়ে জন্মাই।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুধীর উঠিয়া গেল।

শেষ রাত্রেই বিমলার প্রলাপ আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার আসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। বেলা এক প্রহরের সময় বিমলার প্রলাপ থামিল। জন্মের মত তার কথা শেষ হইল।

কুরূপা দরিদ্র কন্যাকে নিজে ভগবান তাঁহার মুক্তি মন্দিরের সেবিকা করিয়া লইলেন।

অজানাটা অজানাই—

যেন ছোটাছুটি শোন মোটামুটি কোনখানে সে যে নাই

—মরীচিকা।

প্রাপ্ত পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়

'বিজলী'—পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। বিজলীর আরম্ভে সে যে-অভ্যুদয়ের সুবপত্র ছিল, আজ বহুবিবর্তনের মধ্য দিয়া সে তাহার ধারা বদলাইলেও প্রাণশক্তি হারায় নাই। সাপ্তাহিকের কাজ বিজলী আজও তেমনি সুন্দর ভাবে চালাইতেছেন। এতকাল ধরিয়া যাহারা বিজলীর সহিত পরিচিত তাঁহারা হয়ত বিজলীর বৈশিষ্ট্যের ধারার মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখিবেন। বিজলী কেবলমাত্র রাজনৈতিক আলোচনা না করিয়া আজকাল গল্প, নাট্যকলা প্রভৃতিও আলোচনা করিতেছেন।

বাঙ্‌লার বহু সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে বিজলী একটি শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক একথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

রক্তকমল—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু কর্তৃক লিখিত ও বরদা এজেন্সী দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১৸৵০ মাত্র।

রক্তকমল মণীন্দ্র বাবুর কতকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি।

শীতের সন্ধ্যায় প্রায়ই দেখা যায় সারাদিন ধরিয়া কোথা হইতে বাষ্প জমিয়া অতি কলাকার নিত্য পরিচিত জায়গার উপর এমন ভাবে ভাসিতে থাকে যে, তাহার আবরণের মধ্যে প্রতিদিনের পরিচিত জগত এক নূতন অবাস্তব মূর্ত্তি গ্রহণ করে। একটি ধূসর যবনিকা আকাশ হইতে পৃথিবীকে পৃথক করিয়া দেয়। যবনিকার একদিকে পৃথিবীর মানুষের ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট ভাষা শুনা যায়, যবনিকার অন্যদিকে উপরের আকাশ হইতে আলো আসিয়া পড়ে। জ্যোৎস্না আসে স্বপ্নকে সাথী করিয়া, ফুলের গন্ধ আসে তারার চাহনি লইয়া। মণীন্দ্র বাবুর গল্পগুলি সেই যবনিকার মত চিররহস্যময় সুন্দরের ইঙ্গিতে ভরা।

রক্তকমলে আছে, 'অশোক', 'সাগরিকা', 'অতিথি', 'খেয়াঘাট', 'রেবতী', ও 'রতন'।

সোনার হরিণ—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু কর্ত্তৃক লিখিত ও বরদা এজেন্সী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৵০ মাত্র।

সোনার হরিণেও পাঁচটি গল্প আছে। 'দার্জ্জিলিং-এ', 'বেনামী', 'সুধা', 'সুরেশের মায়া', 'অলকা'। পাঁচটি গল্পই মণীন্দ্র বাবুর লেখার বিশেষত্বে পূর্ণ।

নিগৃহীতা—শ্রীবিজনবালা কর কর্ত্তৃক লিখিত। আর্য্য পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ মাত্র।

এই পুস্তকখানি বাঙলাভাষায় লিখিত মহিলা লেখিকাদিগের মধ্যে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস। বাঙলার সামাজিক জীবন যাঁহাদের লইয়া, তাঁহাদের নিখুঁত ছবি এত সুন্দর ভাবে লেখা বড় দেখা যায় না। চরিত্র-বিশ্লেষণে কোথাও নারী-হৃদয়সুলভ দুর্ব্বলতা দৃষ্ট হয় না, ইহাই এই বইখানির প্রধান বিশেষত্ব। বইখানিতে ভাষা কোথাও অপ্রয়োজনীয় দেখা যায় না। লেখিকার সংযত লেখনীর মুখে মানুষের মনের ভাবগুলি শুধু উচ্ছ্বাসবাক্যে দীর্ঘ না হইয়া সুন্দর অল্প কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভ্রম সংশোধন

৯১৮ পৃষ্ঠার ১৬শ লাইনে "ছিনির" স্থানে "তিনি" হইবে।
৯২১ ,, ২য় লাইনে "আকাশের" স্থানে "অবকাশের" হইবে।
,, ৪র্থ লাইনে "প্রুখ" স্থানে "মুখ" হইবে।
৯৩৪ ,, ২৩শ লাইনে "ঘাইত" স্থানে "চাহিত" হইবে।
৯৪০ ,, ২২শ লাইনে "শিখর" স্থানে "নিঝর" হইবে।
৯৪২ ,, ২০শ লাইনে "সত্য" স্থানে "সন্ধ্যা" হইবে।
৯৫৩ ,, ৭ম লাইনে "হাতহালির" স্থানে "হাততালি" হইবে।



ম্যাক্সিম্ গর্কী

BANI PRESS, CALCUTTA

চৈত্র, ১৩৩১ সাল]

[দ্বিতীয় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

কল্লোল

অন্ধকার

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন তপস্যা তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার!
প্রভাত আলোকচ্ছটা তোমারি প্রথম শঙ্খধ্বনি,
চিত্তের কন্দরে মোর বেজেছিল, একদা যেমনি
নূতন চেয়েছি চক্ষু তুলি';
সে তব সঙ্কেতমন্ত্র আনিয়াছে, হে মৌনী মহান,
কর্ম্মের তরঙ্গে মোর; স্বপ্নউৎস হ'তে মোর গান
তুলেছে ব্যাকুলি'॥

নিস্তব্ধের সে আহ্বানে বাহিয়া জীবনযাত্রা মম,
—সিন্ধুগামী নির্ঝরিণী সম—
এতকাল চলিয়াছি তোমারি নির্জ্জন অভিসারে
বঙ্কিম জটিল পথে সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে
অনির্দ্দেশ অলক্ষ্যের পানে।
কভু পথতরুচ্ছায়ে খেলাঘর করেছি রচনা,
শেষ না হইতে খেলা চলিয়া এসেছি অন্যমনা,
অশেষের টানে॥

আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে
যেথানে দিনান্তরবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হ'ল।
যেথানে দরিদ্র দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণ বেশে
নূতন প্রাণের তরে তোমার প্রাঙ্গণতলে এসে
বলে, "দ্বার খোলো॥"

দিনের আড়ালে থেকে কি চেয়েছি পাইনি উদ্দেশ,
আজ সে সন্ধান হোক্ শেষ।
হে চিরনির্ম্মল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ কর চোখ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্ব্বারিত হোক
আঁধারের আলোক-ভাণ্ডার।
সেথা নিয়ে যাও, যেথা নিঃশব্দের শৈল-শির হ'তে
ভেদিয়া বিশ্বের কণ্ঠ উচ্ছসিছে চিরন্তন স্রোতে
সঙ্গীত তোমার॥

দিনের সংগ্রহ হ'তে আজি কোন্ অর্ঘ্য ল'য়ে যাই
তোমার মন্দিরে, ভাবি তাই।
কত না ধনীর হাতে পেয়েছি কাজের পুরস্কার,
সযত্নে এনেছি বহে' সেই সব রত্ন অলঙ্কার,
ফিরিয়াছি দেশ হ'তে দেশে।
আজ চেয়ে দেখি শেষে যবে মোর যাত্রা হ'ল সারা
দিনের আলোর সাথে ম্লান হ'য়ে এসেছে তাহারা
তব দ্বারে এসে॥

রাত্রির নিকষে হায় কত সোনা হয়ে যায় মিছে,
সে বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে।
তবু সব নহে ফাঁকি; ভোর বেলা মোর সহচরী
অকারণে দিয়েছিল হাতে মোর মাধবী মঞ্জরী
আজো তাহা অম্লান বিরাজে।
শিশিরের ছোঁওয়া যেন এখনো কাঁপিছে তার গায়,
এ জন্মের সেই দান রেখে দেব তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে॥

হে নিত্যনবীন, কবে তোমারি গোপন কক্ষ হ'তে
পাঠি দিল এ ফুল আলোতে।
সুপ্তি হ'তে জেগে দেখি বসন্তে একদা রাত্রিশেষে
অরুণ কিরণ সাথে এ মাধুরী আসিয়াছে ভেসে
জীবনের বিজন পুলিনে।
দিবসের ধূলা এ'রে কিছুতে পারেনি কাড়িবারে;
সে তব আপন ধন বহিয়া আনিনু তব দ্বারে,
তুমি লও চিনে॥

এরি গন্ধে, হে চন্দ্রম, তোমারি আনন্দ এল মিশে,
বুঝেও তখন বুঝিনি সে।
তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিল এরি পাতে পাতে,
তাই নিয়ে মোর কাছে এসেছিল তোমারে চিনাতে,
কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
আজিকে সন্ধ্যায় যবে সব শব্দ হ'ল অবসান,
আমার ধেয়ান হ'তে জাগিয়া উঠিছে এরি গান,
তোমার আকাশে॥

জ্যুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১০ জানুয়ারী, ১৯২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

জাঁ মিশেল্ ক্রিস্তফ্‌কে গির্জ্জার উপাসনায় যোগ দিবার জন্য লইয়া যান, তাহার ভাল লাগে না। মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে। তাহার নড়িবার চড়িবার উপায় নাই; মানুষ ভিড় করিয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া একসঙ্গে চীৎকার করিয়া কি সব বলিতে থাকে, যাহার অর্থ সে বুঝে না। সকলের মুখই যেন গম্ভীর, বিমর্ষ; বাহিরে তাহারা ত কখনও এই ভাবে থাকে না। ক্রিস্তফ্ ভয়ে ভয়ে সকলের মুখের দিকে তাকায়, তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রাতিবেশিনী বুড়া লীপার মুখখানি যেন কেমন রাগী-রাগী! সময় সময় সে তাহার দাদু'কেও যেন চিনিতে পারে না। ক্রমে এ সবও তাহার সহিয়া আসিল। এবং এই ভাবে বসিয়া থাকার সময় নানা উপায়ে আপনাকে সে বিরক্তি হইতে মুক্তি দেয়,—পা দোলায়, ঘাড় তুলিয়া কড়িকাঠ গুণিতে থাকে, মুখ বিকৃত করে, 'দাদু'র জামা টানিয়া ধরে, চেয়ারের ভিতরে কি আছে তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য গদীতে আঙুল দিয়া গর্ত্ত করিয়া ফেলে, পাখীর গান শুনিবার জন্য বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকে, এত বড় বড় হাঁ করিয়া হাই তুলিতে থাকে যে, মনে হয় যেন সে তাহার চোয়াল দুটিকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়!

সহসা ঘরের ভিতর সুরের বন্যা বহিয়া যায়, অর্গ্যান বাজিয়া উঠে! শিশুর শরীরের ভিতর দিয়া যেন আনন্দের শিহরণ খেলিয়া যায়, সে উঠিয়া

চেয়ারের পিছনের কাঠের উপর গাল রাখিয়া গম্ভীর ভাবে শুনিতে থাকে। কিছু বুঝিতে পারে না। কিছুই পরিষ্কারভাবে ধরিতে বা শুনিতে পায় না, তবু মন বিস্ময়ে ভরিয়া উঠে, ভাল লাগে। সে যে কোন বদ্ধ ঘরের ভিড়ের মধ্যো একটা চেয়ারে বসিয়া আছে তাহা ভুলিয়া যায়, তাহার মনে হয় সে যেন পাখীর মত ধীরে ধীরে বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে সুরের তীব্র ঝঙ্কার উঠিয়া ঘরের প্রত্যেক দেওয়ালে আঘাত খাইয়া আবার মিলাইয়া যায়, সেই সুর-স্রোতের সঙ্গে চারিদিকে সে নিজে যেন ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে; আর কিছুই করিবার নাই। সে মনে করে, সে মুক্ত। সূর্য্যের আলোতে ঘর ভরিয়া যায়। ঐ সুরের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া তৃপ্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠে, সে ঘুমাইয়া পড়ে।

বুড় ম'। মিশেল্ বিরক্ত হন্। ভাবেন, ছেলেটা ভারি বেয়াড়া—উপাসনার সময় ঘুমোয়!

*   *   *   *

ঘরে ফিরিয়া ক্রিস্তফ্ দুপুর বেলা একলাটি চুপ করিয়া পায়ের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া থাকে, কত কি ভাবে। এক সময় তাহার মনে হইল ঘরের পা-পোষ্টা যেন একটি নৌকা এবং ঘরের মেঝেটা যেন বিরাট একটা নদী এবং ঐ কার্পেট হইতে নামিলেই সে ডুবিয়া যাইবে। অন্য কেহ যে এই ব্যাপারটিকে তাহার মত ধরিয়া দেখে না, ইহাতে তাহার আশ্চর্য্য লাগে। মাকে ঘরের ভিতর চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া তাহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া মেঝের টাইলের ফাটলগুলি দেখাইয়া বলে—মাগো, তুমি এই সাঁকোর উপর দিয়ে যাও, দেখ্তে পাচ্ছ না, এটা জল? ডুবে যাবে যে!—

মা কিন্তু সে কথা কানে তুলে না, আপনার ইচ্ছামত চলা ফেরা করে। স্বরচিত নাটকের অভিনয়ের সময় দর্শকবৃন্দ কথা কহিলে নাট্যকার যেরূপ বিরক্ত হয়, ক্রিস্তফ্ও সেইরূপ বিরক্ত হইয়া উঠে—কেহ তাহাকে বুঝে না।

পর মুহূর্ত্তেই এ সমস্ত চিন্তা তাহার মনে আর থাকে না। ঘরের মেঝেকে নদী বলিয়া মনে হয় না, সে তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আঙুল চুষিতে থাকে। আপনার মনে আপনার রচিত গান গায়, মেঝের টাইলের ফাটলের দিকে চাহিয়া থাকে, তাহার মধ্যে কত বীভৎস মুখ যেন সে দেখিতে পায়; ক্রমে ঐ সব রেখাগুলি দীর্ঘতর হইতে হইতে বিরাট আকার ধারণ করে—সেগুলি যেন পাহাড়ের উপত্যকা, তাহাকে জীবন্ত মৃত্যু অধিকার অন্ধকার বিস্তার করিতেছে।

এই সব মুহূর্তে তাহার নিকটে কোথাও বজ্র পতন হইলেও শিশু শুনিতে পায় না। আপনার খেয়ালে বিভোর থাকে।

এই খেয়ালী ছেলেটির প্রতি বিশেষ কেহ মন দেয় না। এবং তাহারও কাহাকেও বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কোন জিনিষেরও প্রয়োজন নাই। পা-পোষ বা টাইলের কাটলের সমস্ত আঁকগুলি রূপ না দেখিলেও তাহার ক্ষতি নাই, তাহার নিজের শরীরটাই তাহার কাছে বিশেষ আমোদপ্রদ। হাতের নখের দিকে চাহিয়া সে হাসিতে থাকে—সেগুলি যেন মানুষের মুখের মত! কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। তাহার সমস্ত শরীরটিকে সে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে থাকে, প্রত্যেকটির গঠন এবং রূপ অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর মনে হয়, সে তন্ময় হইয়া দেখিতে থাকে। কিন্তু সময় সময় ধরা পড়িয়া ইহার জন্য মার খায়!

* * * *

কোন কোন দিন মাতার অন্যমনস্কতার সুযোগে সে বাড়ী হইতে পলাইয়া যায়। প্রথম প্রথম সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে বাহিরে আসিয়া ধরিয়া আনিত, কিন্তু শেষে বেশী দূরে চলিয়া না গেলে কেহ বড় একটা লক্ষ্য করিত না।

তাহাদের গৃহটি শহরের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত। সেইখান হইতেই গ্রামের পথ সুরু হইয়াছে। যতদূর পর্য্যন্ত গেলে বাড়ীর জানালাটিকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রিস্তফ্ প্রথম প্রথম ততদূরই যাইত। তাহার চলিবার ভঙ্গীর অন্ত নাই। কখনও খোঁড়ায়, কখনও একপায়ে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। এইরূপে যাইতে যাইতে মোড়ের মুখে আসিয়া জানালাটিকে গাছের আড়ালে আর না দেখিতে পাইলে সে থামিয়া যায়। মুখে আঙুল দিয়া বসিয়া ভাবিতে থাকে—গল্পের পর গল্প সৃষ্টি করিয়া যায়। সে সমস্ত কাহিনীর রূপই প্রায় একই প্রকারের এবং অল্প কয়েকটি কথায় বলিয়া শেষ করা যায়, তবুও সে ভাবে। কখনও বা ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্বে যে পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া ছিল, সেই-খান হইতে আবার নূতন করিয়া রং চড়াইয়া গল্পটিকে জমাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু একটা শব্দ শুনিলেও তাহার কল্পনার গতি ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাত্রা করে।

দৈবের যে-কোন রূপ, যে-কোন আকস্মিক প্রকাশই যেন শিশুর খেলার আয়োজন করিয়া দেয়। একটা কাঠের টুকরা, বেড়ার ধারে পতিত গাছের ছিন্ন শাখা বা কোন ভাঙা গাছ হইতে ডাল ভাঙিয়া সে হাতে লয়। সেটি

তাহার কাছে, 'ভানুমতির হাড়'বিশেষ। ইহা দিয়া সে সমস্তই 'যাদু' করিয়া ফেলিতে পারে। ডালটি যদি সরু এবং লম্বা হয়, সে ভাবে, সেটি একটি তরবারী অথবা বর্শা। সেটি হাতে লইয়া বাতাসে আস্ফালন করার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ভেদ করিয়া যেন অগণিত সৈন্য আসিয়া তাহার সম্মুখে কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়ায়, সে হয় তাহাদের সেনাপতি। সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সে যেন গিরি-দুর্গ আক্রমণ করিতে ধাবিত হয়। ডালটি যদি নরম হয়, তরবারীর পরিবর্ত্তে সেটি হয় চাবুক। সেটি হাতে লইয়া ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া পাহাড়ের বড় বড় খাদ ডিঙাইয়া চলিয়া যায়। কখনও কখনও ঘোড়া দুষ্টামি করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেয়, সে দেখে পথের ধারের নর্দ্দমায় আসিয়া পড়িয়াছে! শরীর কর্দ্দমাক্ত, স্থানে স্থানে ছড়িয়া বা কাটিয়া গিয়াছে।

ঐ গাছের শাখাটি ছোট এবং কঠিন হইলে, কনসার্ট পরিচালকের হাতের ছোট লাঠির মত সে সেটিকে ব্যবহার করে। সে নানা ভঙ্গিতে উহা ঘুরাইয়া একই সময়ে বন্ধীদের ও পরিচালকের ভূমিকা অভিনয় করে। কখনও গান করে, গান সমাপ্ত হইলে বিজ্ঞ পরিচালকের মত গম্ভীর ভাবে গাছের ঝোপের দিকে ফিরিয়া নমস্কার করে, হাওয়ায় গাছের পাতাগুলি নড়িতে থাকে, যেন, তাহারা ক্রিস্তফের গানে মুগ্ধ হইয়া হাততালি দিতেছে!

কখনও সে আবার যাদুকরও সাজে। বড় বড় পা ফেলিয়া মাঠের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, আকাশের দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া বিড় বিড় করিয়া কি সব বলে, কখনও গম্ভীর কণ্ঠে মেঘগুলিকে আদেশ দেয়—তোমরা ডান দিকে যাও—

কিন্তু মেঘ বাম দিকে ভাসিয়া যায়। তখন সে মেঘকে ভৎর্সনা করে এবং দ্বিতীয় বার হুকুম দেয়। তাহার পরই আড়চোখে দেখে মেঘ তাহার আদেশ একটুও পালন করিল কি না।

মেঘ কিন্তু বাঁ দিকেই ভাসিয়া চলে। সে মাটিতে পা ঠুকিয়া আবার চীৎকার করিয়া বলে—তোমাদের ডান্ দিকে যেতে হবে না, বাঁ দিকে যাও—

এইবার মেঘ তাহার হুকুম তামিল করে। আপনার ক্ষমতা দেখিয়া ক্রিস্তফ আপনি মুগ্ধ হইয়া যায়।

কখনও বা একটি ফুল হাতে লইয়া সে আদেশ করে—তুমি একটি সোনার গাড়ী হয়ে যাও—

গল্পে এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড হইতে সে বহু বার শুনিয়াছে, কিন্তু ফুলের বদল হয় না। তবু সে ভাবে, ধৈর্য্য ধরিয়া উহার দিকে চাহিয়া থাকিলে একদিন ঐ

ফুলটি একটি সোনার গাড়ি হইয়া যাইবেই। ফড়িং ধরিয়া তাহাকে খরগোস বানাইতে তাহার পিঠে সেই কাঠিটা ছোঁয়াইয়া মন্ত্র বলে, ফড়িং হয় ত উড়িয়া যায়, সে আবার তাহাকে ধরিয়া ফেলে, তাহার পর সে যে যাদুকর তাহা ভুলিয়া মাটির উপর শুইয়া ফড়িংটিকে উল্টাইয়া তাহার হাত পা নাড়ার ভঙ্গী দেখিতে থাকে।

সময় সময় ঐ ছোট লাঠির সঙ্গে সূতা বাঁধিয়া মাছ ধরিবার জন্য জলে ফেলিয়া রাখে। যদিও জানে, মাছ, টোপ ও কাঁটা ছাড়া শুধু সূতায় উঠে না, তবুও তাহার মনে হয়, ঘটনা চক্রে তাহার জন্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে। এবং এই বিশ্বাস তাহার মনে এত বদ্ধমূল হইয়া পড়ে যে, পথের ধারের নর্দমায় ঐ সূতাটি ফেলিয়া মাঝে মাঝে টানিয়া তুলিতে থাকে, যেন, ছিপে মাছ ঠোকর দিতেছে বা আটকাইয়াছে, টানিতে ভারি লাগিতেছে, সে মস্ত একটা মাছ যেন অতিকষ্টে জল হইতে মাটির উপর তুলিয়া ফেলিয়াছে...

ছিপ ফেলিয়া বড় বড় মাছ ধরার অদ্ভুত গল্প যে সব সে তাহার 'দাদু'র নিকট শুনে, তাহাই সে ভাবিয়া যায়। মাছ ধরার আনন্দটুকু সে পরিপূর্ণভাবে কল্পনায় উপভোগ করে।

এই সময় বহির্জ্জগতের সমস্ত কিছুই তাহার মন হইতে লুপ্ত হইয়া যায়, তাহার মনে নানা স্বপ্নের খেলা সুরু হয়। সে যে কি করিতেছে তাহাও তাহার আর মনে থাকে না, এমন কি নিজেকেও ভুলিয়া যায়। এই সমস্ত স্বপ্ন, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহাকে পাইয়া বসে। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে বা নীচে নামিতে তাহার মনে হয়, যেন তাহার পায়ের তলায় পাতাল পুরীর বিরাট গহ্বর! তাহার মধ্যে সে হারাইয়া গিয়াছে! এই স্বপ্নের ঘোর কাটিলে সে বিরক্ত হইয়া দেখিত, সে তাহাদের সেই পরিচিত অন্ধকার কাঠের সিঁড়ির উপরেই আছে! একটি বার নামিতে বা উঠিতে যে সময়টুকু গিয়াছে তাহাই যেন একটি জীবনের পরিপূর্ণ বৈচিত্র্য লইয়া তাহার কাছে প্রতিভাত হয়!...

*   *   *

প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধ জাঁ মিশেল-এর হাত ধরিয়া ক্রিস্তফ শস্য ক্ষেতের ধার দিয়া গ্রামের পথে বেড়াইতে যায়। চষা মাটির গন্ধ আকাশ ভরিয়া তোলে। ঝোপের ভিতর ঝিল্লির ডাক শোনা যায়। কাকের দল জটলা করিয়া পথের মাঝে বসিয়া তাহাদের উভয়কে অগ্রসর হইতে আসিতে দেখে, শেষে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িলে ধীরে ধীরে উড়িয়া আবার কিছু দূরে গিয়া বসে।

জাঁ মিশেল মাঝে মাঝে কাশিয়া উঠেন। ইহার অর্থ ক্রিস্তফ বেশ জানে। কোন একটা গল্প তাঁহার মনে আসিয়াছে এবং বলিবার জন্ত উদ্গ্রীব হইয়া আছেন, শুধু জিজ্ঞাসার অপেক্ষা।

নাতী ও ঠাকুর্দ্দার মধ্যে এই ক্ষেত্রে নীরবে বোঝাপড়া হইয়া যায়। ক্রিস্তফ প্রথম বলিয়া উঠে—একটা গল্প বল না দাদু—

নাতীকে এই রকম উৎসুক শ্রোতা পাইয়া বৃদ্ধের মন ভরিয়া উঠে, খুশী হইয়া বলেন—গল্প শুনবে দাদু?—দাঁড়াও ভাবি।

এই গল্পের ভিতর দিয়া তিনি সাধারণতই নিজের জীবনের কথাই বলেন কিম্বা পূর্ব্ব কালের এবং আধুনিক সময়কার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের জীবন-কথা বলিয়া থাকেন। গল্প বলিবার সময় কখনও তাঁহার গলার স্বর ভারী হইয়া আসে, কখনও শিশুর মত আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আরম্ভ করিয়া আর যেন কথা খুঁজিয়া পান না। সময় সময় কথা বলিতে গিয়াই খেই হারাইয়া যায়। আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে গিয়া ঠেকেন সেই বিপদ।—কিন্তু খেই হারানতেই তিনি এমন অভ্যস্ত যে, সেজন্ত গল্প বলার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে না, গল্প বলা চলিতে থাকে।

রেগিউলুস্, আরমিনিউস্, লুটজাউ-এর সৈন্তদল, এবং ক্যরনার-এর ও ফ্রেড্রিক্ ষ্টাপ্স্ যে সম্রাট নেপোলিয়নকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া ছিল, এমন কত বীর এবং তাহাদের অদ্ভুত বীরত্বের কথা তিনি শিশুকে শুনাইয়া যান। এই সকল কাহিনী বলিবার সময় তাঁহার মুখ চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাঁহার গলার স্বর এত ভারী হইয়া আসে যে, প্রায়ই তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না। এবং সর্ব্বদাই বিশেষ উৎকণ্ঠাপূর্ণ ঘটনাস্থলে আসিয়া থামিয়া যাওয়া যেন তাঁহার অভ্যাস। এই সময় শিশু ক্রিস্তফ অসহ্য ঔৎসুক্যে অস্থির হইয়া উঠে, বলে—তারপর দাদু?—

বৃদ্ধের মন আনন্দে ভরিয়া যায়।

ক্রমে বয়স বাড়িয়া উঠার সহিত ক্রিস্তফ তাহার পিতামহের সমস্ত চালচলন বুঝিয়া লয় এবং বৃদ্ধকে নাকাল করিবার দুষ্ট বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। গল্প বলিতে বলিতে থামিয়া গেলে এখন সে আর বেশী উদ্বেগ প্রকাশ করে না, চটামি করিয়া এমন ঔদাসীন্য দেখায়, যেন গল্প শুনার প্রতি তাহার কোন আকর্ষণই নাই।

বৃদ্ধ ক্ষুণ্ণ হন।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্রিস্তফের মন সমান ভাবেই দুলিয়া উঠিতে থাকে। সমস্ত কথা সে যে ঠিক বুঝিতে পারে তাহা নয়,—কবে যে সে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার পিতামহ সেই সমস্ত মানুষকে জানিতেন কি না, শীর্জার তাহাদের সঙ্গে কোন দিন সাক্ষাৎ হইয়াছে কি না কিছুই সে জানে না, তবুও ঐ সব বীরত্বের কাহিনীতে গর্ব্বে এবং আনন্দে তাহারা ভরিয়া উঠে। এই গল্প শোনা এবং গল্প বলার মধ্যে বৃদ্ধ এবং শিশু উভয়েই সমভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। সে যেন তাহাদের নিজেদেরই কীর্ত্তিকলাপ—এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধ এবং শিশু উভয়েই সমবয়সী।

গল্প বলিবার সময় যখনই জাঁ মিশেল দু'একটি করিয়া নীতি-কথার অবতারণা করেন তখনই ক্রিস্তফের মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই সমস্ত কথার অর্থ যদিও অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত সত্য এবং বেশ বুঝিতে পারা যায় কেন তাহা বলা হইল, তবু শ্রবণমাত্রেই অতি পুরাতন ও নিরস বলিয়া মনে হয়।

বৃদ্ধ বলেন—শক্তির চেয়ে বিনয় বড়... সম্মান রক্ষা জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ... মন্দ হওয়ার চেয়ে ভাল হওয়া ভাল... ইত্যাদি।

এই সমস্ত কথার প্রতিবাদের ভয় তিনি করেন না। ঐ সমস্ত কথার উপরই বিশেষ জোর দিয়া তিনি বলিয়া যান, পুনরাবৃত্তিও করেন, কিম্বা অত্যাসমত চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইলে বা গল্পের বিষয় ভুলিয়া গেলে যাহা খুশী বলিয়া যান, উপসংহারের দায়িত্ব মোটেই অনুভব করেন না। নিজের কথাকে সত্য এবং অব্যর্থ প্রমাণ করিবার জন্য সম্ভব অসম্ভব নানা ভঙ্গিতে হাত মুখ নাড়িতে থাকেন। শিশু শুনে, তাহার দাদুর প্রতি মনে শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠে, সেই সঙ্গেই আবার ভাবে—দাদু একজন বড় বক্তা হ'লেও একটু বাজে বকে।

একটি গল্প তাহারা বলিয়া বা শুনিয়া শেষ করিতে পারে না, সেটি—সম্রাট নেপোলিয়নের কথা, যিনি সমগ্র ইউরোপ জয় করিয়া ছিলেন। বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে অসীম সাহসী অমিত বলশালী মহাপুরুষের বিষয় লইয়া ভাবে। —জাঁ মিশেল তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহার সহিত প্রায় যুদ্ধ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার শত্রু হইলেও জাঁ মিশেল সেই মহাবীরের বীরত্বের কথা, মহানুভবতার কথা স্বীকার করেন, বার বার বলেন—অমন একজন মানুষ যদি আমাদের রাইন নদীর এপারে জন্মাত, আমি আনন্দের সঙ্গে আমার একটা হাত বলি দিতে পারি।—কিন্তু সমস্তই বিধিলিপি, নেপোলিয়ন জন্ম নিলেন কি না কর্সিকায়!...

গল্প ক্রমেই জমিয়া উঠিতে থাকে।—একদিন নেপোলিয়ন তাঁর দল বল নিয়ে এই দেশের বুকের উপর এসে পড়লেন। সমস্ত দেশবাসী একত্রিত হয়ে

তাঁর প্রতিরোধ করবার জন্য দাঁড়াল, এমন সময় কি যে হল কিছুই বুঝা গেল না! চারিদিকে কেবল 'পালাও পালাও' শব্দ!

ছত্রভঙ্গ সৈন্য দলের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের কতই না বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু কে কার কথা শুনে? সব বৃথা হল, নদীর স্রোতের মত তারা আমায় ঠেলে নিয়ে কেবলই দূরে সরে যেতে লাগল! তার পরদিন সকালে দেখি—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমরা এত দূরে এসে পড়েছি যে, সেখান থেকে আর ফিরে গিয়ে লড়াই করা অসম্ভব!

গল্পের এইখানেই ক্রিস্তফ্ বাধা দেয়। বলে, তার পর নেপোলিয়ন্ কি করলেন দাদু?—

নেপোলিয়নের প্রত্যেকটি জয়ের মধ্যে শিশু অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করে। দিনে দিনে সমস্ত দেশ যে তাঁহার পদানত হইয়া পড়িতেছে, ইহাতে সে খুশী হয়। তাঁহার চোখের ইসারা পাইলে দলে দলে মানুষ গিয়া যে শত্রুসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দিয়া আসে, পরাজিত শত্রু দিকে দিকে দলে দলে পলাইয়া যায়—এ সমস্ত কথাই যেন তাহার কাছে পরীর দেশের গল্পের মত মনে হয়।

শেষে বিশেষ বিশেষ জোর দিয়া গল্পে নূতন রং চড়াইয়া বৃদ্ধ বলেন—এমনি ক'রে সমস্ত ইউরোপ জয় ক'রে তিনি স্পেন জয় ক'রে ফেললেন, ইংলণ্ডও প্রায় তিনি নিয়ে ছিলেন, তবে রাখতে পারেন নি।

এই নেপোলিয়নের গল্প বলিতে মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধের গর্বরোধ হইয়া যায়! স্বদেশবাসীর পরাজয়ে তাঁহার প্রাণ মরমে জ্বলিয়া উঠে, স্বদেশপ্রেমিক বৃদ্ধ তখন—গাধা, জানোয়ার, বর্বর, চরিত্রহীন—এমন কত নামে সেই বীরপুরুষকে ভূষিত করিতে থাকেন। এবং এই সমস্ত কথা যদি শিশুর মনে ন্যায় বুদ্ধির উন্মেষ করিবার উদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহা বিফল হইয়াছে।

বালক সিদ্ধান্ত করিয়া বসে—নীতিকে বাদ দিয়া যদি এত বড় হওয়া যায় তাহলে নীতি জিনিসটাই তেমন কিছু নয়, আসল জিনিস হচ্ছে বড় হওয়া।

কিন্তু বালকের এ সমস্ত মনোভাব বৃদ্ধ ধরিতে পারেন না।

এইরূপে নীরবে দুইজনের চিন্তার ধারা বিভিন্ন পথে ছুটিতে থাকে।

পথচলার সময় কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে দাঁ। নিজের মাথা নোয়াইয়া গভীর সম্ভ্রমের সহিত নমস্কার করেন, সময় সময় শিষ্টাচারের

আতিশয্য দেখিয়া ক্রিস্তফ্ বিশেষ অস্বস্তি বোধ করে, কিন্তু ইহার কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না। সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র মানুষের প্রতি বৃদ্ধের মনে চিরকাল গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সমস্ত বিষয়ে তাঁহারা যে সাধারণ হইতে বড় হইয়া উঠিয়াছেন এই কথা মনে করিয়াই হয়ত তাঁহার গল্পের এই সমস্ত বীর পুরুষদের চিরকাল শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন।

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনে জাঁ মিশেল্ যখন গাছের নিবিড় ছায়ায় বসিয়া ঘুমে ঢুলিতে থাকেন, ক্রিস্তফ্ তাঁহার কিছু দূরে কোন পাথরের স্তূপের উপর বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে আপন মনে গান করিতে থাকে। কখনও মাটিতে শুইয়া আকাশে মেঘের খেলা দেখে—গরু, রাক্ষস, টুপি, বুড়ী এমন কত জিনিসের আকৃতি, কত বিচিত্র দৃশ্য সে ঐ মেঘের মধ্যে দেখিতে পায়। তাহাদের সহিত আপনার মনে বকিয়া যায়, কিম্বা বিপুল আকারের মেঘ ছোট একটি মেঘখণ্ডকে গ্রাস করিতেছে দেখিয়া তাহার নানা চিন্তার উদয় হয়। সে ঐ সমস্ত গতিশীল গাঢ় বর্ণের মেঘগুলিকে ভয় করে। তাহার মনে হয়, মানুষের জীবনেও উহারা তাহাদের প্রভাব রাখিয়া যায়। উহারা যেন ইচ্ছা করিলে মানুষের সর্বনাশ করিতে পারে এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য হয় এই কথা মনে করিয়া যে, তাহার 'মা' বা 'দাদু', কেহই এবিষয়ে এতটুকুও মনোযোগ দেন না।

সৌভাগ্যক্রমে কোন অনিষ্ট না করিয়া নানা রূপ ধরিয়া মুখ ভ্যাঙচাইয়া মেঘগুলি ভাসিয়া যায়। বালকের চক্ষু শ্রান্তিতে বুঁজিয়া আসে, সে ঘুমাইয়া পড়ে। তাহার পর হঠাৎ এমন করিয়া শূন্যে হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে, যেন সে এতক্ষণ আকাশেই ছিল, এখন পড়িয়া যাইতেছে! তাহার পর আবার সে ঘুমাইয়া পড়ে।

গাছের পাতা মৃদু শব্দ করিতে করিতে সূর্য্য কিরণে দুলিতে থাকে, অত্যন্ত পাতলা বাষ্প মাটী হইতে উপরে ভাসিয়া উঠে, মাছি ভন-ভন করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, ফড়িঙগুলি গ্রীষ্মের উত্তাপে মাতালের মত অবিশ্রান্ত ভাবে চীৎকার করিতে থাকে। ইহা ছাড়া আর সমস্তই যেন মধ্যাহ্নের স্তব্ধতার আবরণে ঢাকা।

বনের ভিতর কাঠবিড়ালীর অদ্ভুত শব্দ মাঝে মাঝে শুনা যায়। দূরের মাঠে কৃষক কখনও কখনও তাহার বলদের প্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফেলে। পথ দিয়া ঘোড়ার খুরের শব্দ ছুটিয়া চলিয়া যায়। ক্রিস্তফ্ ঘুমাইবার পূর্ব্বে

তাহার মাথার কাছে ডালের উপর যে পিপীলিকাটিকে চলিতে দেখিয়াছিল, জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে আবার সেইখানে চলিতে দেখে, তবু তাহার মনে হয়, ইতিমধ্যে যেন এক যুগ চলিয়া গিয়াছে।

কোন দিন হয় ত জঁা মিশেল বহুক্ষণ ধরিয়া ঘুমাইয়া থাকেন, তাঁহার মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠে, নাক যেন ক্রমেই ফুলিয়া উঠিতে থাকে, মুখের হাঁ বড় হইয়া যায়, ক্রিস্তফ্ তাঁহাকে অস্বস্তির সঙ্গে দেখিতে থাকে এবং ঐ বিকৃত মুখ দেখিয়া তাহার মনে ভয় হয়, পাছে দাদুর মাথাটি হঠাৎ কোন বেয়াড়া রূপ ধরিয়া না বসে! সে তাঁহাকে জাগাইবার জন্ম চীৎকার করিয়া গান গায় বা কোন উঁচু ঢিপি হইতে গড়াইয়া পড়ে। একদিন একমুঠো পাইন গাছের দল লইয়া তাঁহার মুখে ছুঁড়িয়া মারিয়া বলিল—গাছ থেকে পড়্‌ল দাদু—

দাদু ইহা বিশ্বাস করেন। বালকের হাসি পায়।

কিন্তু একদিন হয় ত, দুষ্ট বুদ্ধির বশে বৃদ্ধকে মারিবার জন্ম পাইন দল শুদ্ধ তাহার হাতখানি উঠাইয়াছে এমন সময় দেখে বৃদ্ধ তাহাকে দেখিতেছেন। এ দুষ্টামি তিনি সহ্য করেন না। বয়স্কের সম্মান রক্ষা করা বালকের অবশ্য কর্ত্তব্য;—তাহাকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়,—সময় সময় এক সপ্তাহের জন্য কথা বন্ধ।

পথ যত দুর্গম হয়, ক্রিস্তফ্‌-এর তত ভাল লাগে। পথের ধারের প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ডকে যেন সে চিনিতে পারে। পথের ধুলায় গাড়ীর চাকার দাগগুলিতে ভূ-স্তরের গভীরতম রহস্যের প্রকাশ সে দেখিতে পায়। গৃহের দুই মাইলের মধ্যের সমস্ত খানা, ডোবা, ছোট ছোট ঢিবি প্রভৃতির ম্যাপ, সে মাথার মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছে। কখনও কখনও সে ঐ সমস্ত রেখার পরিবর্তন ও সংশোধন করে, তখন তাহার মুখের গাম্ভীর্য্য দেখিলে মনে হয় সে যেন, কোন প্রতিভাশালী ইঞ্জিনিয়ারের অপেক্ষা নিজেকে ছোট মনে করে না।

এইরূপে খানা ডোবা খাটিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার জুতার গোড়ালি যতই কর্দ্দমাক্ত হয়, তাহার ততই মনে হয়—দিনটি তাহার বৃথা যায় নাই।

জঁা মিশেল-এর সহিত পথ চলিবার সময় হয় ত কোন দিন তাহারা কোন কৃষককে তাহার গাড়ীতে চড়িয়া যাইতে দেখে, এবং সে যদি তাহার পিতামহের পরিচিত হয় তাহা হইলে উভয়ে তাহার পার্শ্বে গাড়ীতে চাপিয়া বসে। ক্রিস্তফ্-এর অত্যন্ত ভাল লাগে।

ঘোড়া ছুটিতে থাকে, পথ দিয়া মানুষ হাটিয়া যায়, জাহাজের দিকে চাহিয়া ক্রিস্তফ্ হাসিয়া উঠে, আবার গম্ভীর হইয়া আপাত ঔদাসীন্যের ভাণ করে; যেন গাড়ীতে চড়াই তাহার চিরকালের অভ্যাস।

ঝঁা মিশেল এবং বৃদ্ধ উভয়ে বালককে ভুলিয়া গিয়া কথা বলিয়া যান। উভয়ের মধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়াও তাহার স্ফূর্তির অন্ত থাকে না! সে আপনার মনে কথা বলিয়া যায়। উভয়ের আশা সে রাখে না। ঘোড়ার কান নড়িতে দেখে, কখনও সাম্‌নে, কখনও পিছনে, কখনও পাশের দিকে এমন অদ্ভুত ভাবে তাহারা ঘুরিতে থাকে যে, দেখিয়া সে হাসি চাপিতে পারে না। বৃদ্ধের হাত ধরিয়া টানিয়া বলে—দাদু, দেখ কি মজা!—

বৃদ্ধ বিরক্ত হন। বকিয়া উঠেন—চুপ কর্ তুই, ছেলে!

ক্রিস্তফ্ ভাবে,—মানুষ বড় হ'লে তাদের কিছুই আর আশ্চর্য্য লাগে না—তারা বোধ হয় সব জানে, সব পারে।

সেও বড় হইয়াছে প্রমাণ করিবার জন্ম ঔৎসুক্য চাপিয়া ঔদাসীন্য দেখাইতে চেষ্টা করে কিন্তু বেশীক্ষণ স্থির হইয়া থাকিলে গাড়ীর দোলায় তাহার তন্দ্রা আসে, ঘোড়ার গলার ঘণ্টার শব্দ গানের সুরের মত তাহার মনকে ঘিরিয়া ধরে, মৌমাছির ডানার শব্দের মত সেই সুর গাড়ীচলার তালে তালে বাজিতে থাকে, বালকের কাছে সে সুর অতুলনীয়, মনোহর। এই সুরের সহিত একটি মাত্র সুরের তুলনা হইতে পারে তাহার মনে হয়,—সে তাহার স্বরচিত গান।

বৃদ্ধকে শুনাইবার জন্ম সে গাহিয়া উঠে, কিন্তু তিনি কৃষকের সহিত অনর্গল কথা বলিয়া যান! বালক আরও জোরে সুর চড়ায়, রাগিয়া বৃদ্ধ বলেন—আঃ থাম্ না, কান ঝালাপালা করে দিলি যে! যেন ষাঁড় চেঁচাচ্ছে।

বালকের মন অভিমানে ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। ভাবে ছাগল-দাড়ি বুড়ো গুলোর কিছু মাত্র বুদ্ধি নেই! আমার এমন চমৎকার গান, এরা বুঝতে পারে না! এরূপে যতই বুড়োদের সম্বন্ধে ভাবে, ততই তাহাদের কদর্য্য ও অসহ্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু বেশীক্ষণ এই চিন্তা তাহার মনে ঠাঁই পায় না! পথের পাশ দিয়া ঘোড়ার যে ছায়াটি সমস্তক্ষণ গাড়ীর সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার দিকে চাহিয়া সে অবাক হইয়া যায়। যেন একটি কিম্ভূত কিমাকার জানোয়ার মাটিতে শুইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে! সন্ধ্যা বেলা ফিরিবার সময় এই ছায়াটি দীর্ঘতর হইয়া মাঠের প্রায় সমস্ত অংশটুকু ঢাকিয়া ফেলে, হয় ত কখনও বা খড়ের গাদায় পড়িয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ম সেটি দাঁড়াইয়া উঠে, আবার সমতল ভূমি পাইলে পূর্ব্বের মত শুইয়া

পড়ে। জন্তুর নাকটা যেন কাটা বেলুনের মত চ্যাপ্টা, প্রকাণ্ড কান দুটি হাতির মত সরু, অনেক সময় এই ছায়াটিকে সত্যই কোন জন্তু বলিয়া তাহার ভয় হয়। তাহার গাড়ির ছায়ার সহিত সে যেমন ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তেমনি করিয়া ঐ ছায়াটির মাথায় পা দিয়া মাড়াইয়া খেলা করিতে সে সাহস পায় না।

সন্ধ্যাবেলা গাছের ছায়াগুলি যতই দীর্ঘতর হইয়া আসে, ক্রিস্তফ-এর চিন্তা-স্রোত ততই নানা দিকে বহিতে থাকে। সমস্ত পথটি জুড়িয়া তাহারা যেন দাঁড়াইয়া থাকে, বিকটাকার দৈত্যের মত বিসদৃশ। গম্ভীর স্বরে যেন বলে —আর এগিও না—'

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর চাকার শব্দে সে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়—এগিও না . . . আর এগিও না—

এত কাণ্ড ঘটিয়া যায় কিন্তু বৃদ্ধ জাঁ মিশেল এবং কৃষকের কথার স্রোত বন্ধ হয় না। সময় সময় সুর সপ্তমে চড়িয়া উঠে, বিশেষত যখন তাঁহারা স্থানীয় কোন বিষয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থহানির কথা লইয়া আলোচনা করেন। বালকের স্বপ্ন টুটিয়া যায়। সে অস্বস্তির সহিত দুই বৃদ্ধকে দেখে, ভাবে এইবার তাঁরা দুজনে ঘুষি চালাইবেন!

কিন্তু তা হয় না। ব্যক্তিগত ঘৃণার ভিতর দিয়া যেন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া হইয়া যাইতেছে। অথচ কথাবার্তার কোন প্রশ্রয় বা অবসর তাঁহারা দিতেছেন না।

এইরূপে সামান্য যে-কোন বিষয় লইয়া তাঁহারা আলোচনা করিয়া যান, ক্রিস্তফ তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। শুধু তাঁহাদের চীৎকার এবং আস্ফালন শুনে। মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া ভাবে—কি বিশ্রী ঐ কৃষকটাকে দেখতে! চোখ দুটো বোজাচ্ছে দেখ না! কত বড় বড় হাঁ ক'রে কথা বলে! বা-বোতো, আমার মুখে থুথু ফেললে বজ্জাতটা!—আঃ কি! গাড়ী থামায় কেন? দাদুকে মারবে নাকি? . . .

গাড়ী সহসা থামিয়া গেল। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মাটিতে নামিয়া আসিলেন। বালক ক্রিস্তফ্‌কে তুলিয়া বৃদ্ধের হাতে দিয়া, উভয়ের মধ্যে দুচারটি ও নমস্কারের বিনিময় হইল, তাহার পরই ঘোড়ার পিঠে এক চাবুক। ঘোড়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল, ক্রিস্তফ দেখিল, সে তাহাদের রাইন নদীর নীচু পথটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরপারের শস্য ক্ষেতের মধ্যে সূর্য্য ডুবিয়া যাইতেছে।

উভয়ে ধীরে ধীরে জলের ধারে নামিতে লাগিল। পায়ের নীচে লম্বা নরম ঘাসে ঈষৎ শব্দ হইতেছে। বড় বড় গাছগুলি প্রায় নদীর মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে, মশারদল নৃত্য করিতেছে, একটি ছোট নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, আকাশের আলো অত্যন্ত ম্লান, এবং ঈষৎ কুয়াসায় ঢাকা, ঝুলেপড়া উইলো গাছের শাখায় নদীর স্রোত প্রতিহত হইয়া যেন চুম্বনের মত শব্দ করিতেছে। নদীর জলে আকাশের রং লাগিয়াছে, চারিদিকের ঝোপের মধ্যে ঝিঁঝি ডাকিয়া উঠিতেছে। বালক দেখিল সম্মুখে তাহাদের ঘরের দরজার কাছে হাসিমুখে তাহার মা দাঁড়াইয়া।...

অতীত জীবনের এই সমস্ত স্মৃতি সুখস্বপ্নের মত অফুরন্ত আনন্দের সুর তুলিয়া পরবর্তী জীবনের পথচলা দুঃখকে মধুর করিয়া তোলে।

বিপুল জনাকীর্ণ শহর, চিরচঞ্চল সমুদ্র, স্বপ্নপুরীর মত সুন্দর সুন্দর দেশ, মানুষের মুখ—এ সমস্ত বোধ হয় শিশুর মনে ততটা রেখাপাত করে না, যতটা সে অলস অবসরে আধ-আলো কুয়াসার মধ্যে জানালার ভিতর দিয়া তাহার বাগানের কিয়দংশ দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়। এবং তাহার প্রতি দিনের জীবনের ভিতর দিয়া যে অভিজ্ঞতা সে লাভ করে, তাহার তুলনায় এ সমস্তই একান্ত অলীক মনে হয়।

* * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গৃহের দরজা বন্ধ হইয়া গেল।—গৃহ, যাহার মধ্যে আসিয়া মানুষ অন্ধকার, অজ্ঞাত অস্পষ্ট ভয়, আতঙ্ক প্রভৃতি হইতে আশ্রয় পায়। বাহিরের কোন উপদ্রবের এখানে প্রবেশাধিকার নাই... উনানে আগুন জ্বলিতেছে, কড়ায় চাপান হাঁসের মাংস সিদ্ধ হওয়ার সুগন্ধে ও শব্দে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে... ভোজনের অপূর্ব সুখানুভূতি ও ক্ষুধার শান্তির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত শরীর তাহার অবসন্ন হইয়া আসিল। মানুষের মুখ, আলো ও ছায়া, সব তাহার চোখে কেমন স্বপ্নময় হইয়া গেল। উনানের আগুনে তাহার মত কি সব যেন নৃত্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ধীরে ধীরে ক্রিস্তফ-এর মাথাটি ঘুমের ভারে খাবারের প্লেটে আসিয়া ঠেকে, মনে তাহার অপূর্ব সুখ।...

হঠাৎ অনুভব করে যে, সে নিজের বিছানায় শুইয়া আছে। কেমন করিয়া

কখন সে এখানে আসিল? ঘরের মানুষের কণ্ঠস্বর এবং দিনের শোনা সহস্র শব্দ এক সঙ্গে তাহার মনে আসিয়া জমা হইয়া উঠে। তাহার পিতা বেহালা বাজাইতে থাকে; সে সুর কান্নার মত রাত্রির বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সে আনন্দ পায় যখন মা তাহার শয্যার পাশে আসিয়া তাহার হাতখানি আপনার কোমল হাতে তুলিয়া লয়।—জড়িত কণ্ঠে সে বলে—একটা গান কর না মা—'

মা গান গাহিয়া যায়। কিন্তু কি তাহার অর্থ সে জানে না! শুধু ঐ গান শিশুর অপূর্ব্ব মনে হয়!

মেজপিসোর বলে—কি কতকগুলো মাথামুণ্ডু হাউ হাউ ক'রে চেঁচাচ্ছ?—

কিন্তু ক্রিস্তফ-এর যেন আশা মিটে না, সে আরও শুনিতে চায়। তাহার হাসি পায়, কান্না আসে, মন যেন নেশায় ভরিয়া উঠে। সে কোথায় আছে তাহাও যেন ভুলিয়া যায়। মা'র গলা জড়াইয়া তাহার মুখে চুমা দেয়, মা বলে—ছাড়, ছাড়, ছেলে, আমায় মেরে ফেল্‌বি?—

শিশু আরও জোরে তাহাকে চাপিয়া ধরে, বলে—মা-মণি, তোমায় খুব ভালবাসি . . . সকলকে ভালবাসি—সকলকে—

ক্রমশঃ শিশু ঘুমাইয়া পড়ে। ঝিঁঝিঁ ডাকিতে থাকে, 'দাদু'র মুখে শোনা গল্পের যত বীর পুরুষের কথা ঘুমের ঘোরেও তাহার মনে পড়ে, তাহার সমস্ত প্রাণ যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিতে থাকে—সেও একদিন অমনি বীরছেলে হবে . . .

* * *

কি আশ্চর্য্য শক্তি, আবেগ, অভিমান দিয়া গঠিত এই ক্ষুদ্র জীবটির শরীর মন! কি বিপুল তাহার তেজ, এক মুহূর্ত্তের জন্য সে যেন বিশ্রাম করিতে চায় না, অবিশ্রাম স্রোতে জগতের সমস্ত জিনিষের পিছনে পিছনে সে যেন ছুটিয়া চলিয়াছে! [illegible] দলের মত তাহার মন চিরনৃত্যশীল। পৃথিবীর সমস্ত জিনিস হইতেই যেন সে তাহার অসীম উৎসাহের খোরাক পায়। মধুর স্বর্গ—উৎসের কলোচ্ছ্বাস—অফুরন্ত আশা—হাসি—গান—অপরিসীম উচ্ছ্বাস—সেই ত শিশুর প্রাণ! জীবনের শত বাধাও তাহাকে বন্দী করে নাই, সে পলাইয়া বেড়াইতেছে! অসীমের বুকে সে যেন সাঁতার দিতেছে, সে সুখী যেন সুখী

হইবার জন্যই জন্মিয়াছে। সুখ ছাড়া যেন অন্য কোন কিছুকে সে বিশ্বাস করে না। সে তাহার সমস্ত শিশু-শক্তি দিয়া এই সুখকে, আনন্দকে যেন দুই বাহু দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে চায়!

ভাবীজীবন অচিরেই তাহার এই ভ্রম সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

—ক্রমশ।

অনুবাদক — শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

জীবন-শিয়রে বসি
স্বপ্ন দেয় দোল

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল,—
ওরে ব্যর্থ ব্যথাতুর,
সে বিলাসে মত্ত হয়ে সত্য তোর ভোল্।
ব্যথিত প্রাণের প্রান্তে ইন্দ্রধনু রচি' ইন্দ্রজালে,
যদি সে মৃত্যুর মরু-মরীচিকা সৃজিয়া সাজালে,
অনন্ত যৌবনা মায়ে ডাকিল রঙ্গী—
এক কণা সুর লাগি এত করি সাধিল সে যদি,
শরীর পাণ্ডুর ভরে শীতল রিক্ততা,
অন্তরের নিষ্ঠুর রিক্ততা,
ক্ষণিকের অপ্রচুর দীর্ণ শুষ্ক
হাসির ছলনা দিয়া ঢাকিতে আবরি,
এত সকাতর ব্যর্থ চেষ্টা হায়,
তবু তার সকরুণ প্রেমটিরে স্মরি
আঁখি ভরে সহজনে হায় উঠি বাধাগ্রস্ত মুখে
নিদারুণ কপট কৌতুকে
রঙীন বিষের পাত্র ভরে তুলি যদি
যাব পান করি।

অবিশ্বাসী প্রিয়ারেও অসঙ্কোচে দিব আলিঙ্গন,
যে অধর করিল বঞ্চনা, তাহারেও করিব চুম্বন।
যে আশার ম্লান দীপখানি
তিমির রাত্রির তীরে আতঙ্কে শিহরি
বহুক্ষণ নিভে গেছে জানি,
—তারি আলো আছে,—করি ভাণ,
কণ্টকিত লক্ষ্যহীন পথে, নিরুদ্দেশে করিব প্রয়াণ,
মিথ্যা অভিযান।

যে প্রেম জীবনে কভু মুঞ্জরে না তারি মৃতমূলে
সমস্ত জীবন-রস
নিঙাড়িয়া সঁপি দিব জ্ঞাতসারে ভুলে
মর্ম্মগ্রন্থি খুলে।
ভুল করি ভালোবাসি, জরা-শোক-জর্জ্জরিত, মূল্যহীন এ মমীর শব,
আমার আয়ুর দীপে অনন্তকাল তরে,
তার লাগি আয়োজিব মিথ্যা মহোৎসব।

যদিও সকল হাস্ত-ফেনপুঞ্জ-তলে
জানি শুধু ব্যথা-সিন্ধু দোলে,
যদিও অশ্রুর মূল্যে কোন স্বর্গ মিলিবে না জানি,
হাসি মুখে উচ্ছলিত তবুও রঙীন,
এ বিষাদ জীবনের বিষ-পাত্রখানি
ওষ্ঠে তুলি ধরি,
নিঃশেষিয়া যাব পান করি,—
শুধু তার সান্ত্বন অনুরাগ স্মরি,
জীবন-শিয়রে বসি দোলা দেয় যে স্বপ্নসুন্দরী!



অগ্নিশিখা



—শ্রীভূপতি চৌধুরী।

শীতের উত্তুরে বাতাস থেমে গিয়ে তখন সবে ফাগুনের দখিন হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। সবুজ পাতার মাধুরী ও ফোটাফুলের সৌরভে রাত্রির অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়েছিল।

মণি চুপ ক'রে বিছানায় পড়েছিল, চোখে তার ঘুম ছিল না। ঘরের মধ্যে বড় ক্লক-ঘড়িটা বেয়াড়া একঘেয়ে ভাবে টিক্‌টাক্ শব্দ ক'রে চলেছে। তার ভারি বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। শূন্য মস্তিষ্কে তখন তার চিন্তারাজ্যে এক বিষম বিপ্লব চলছিল। ঠিক কোনো একটা ভাব কেন্দ্রীভূত ক'রে সে চিন্তা চলে নি, শুধু কতকগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো খণ্ড কতকগুলো কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ-বিচারের চেষ্টায় তার সময় কাটছিল।—সে ভাবছিল—এই জীবনটা কি বিশ্রী; এই একটানা একঘেয়ে জীবনে যখনই একটা ছুটির ফাঁক এসে পড়ে, তখনই আমরা কি করব ভেবে না পেয়ে যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি—কিছুই আর তখন ভালো লাগে না—পাখীর গানের সুর, প্রভাতের শিশির ধারার রূপ, আকাশের প্রশান্ত নীলিমা—সবই আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে।—প্রমাণ, তার আজকের এই ফাগুনের মধুর রাত সে উপভোগ করতে পারছিল না—রাতের এই শুভ্র ফাঁকা সময়টায় তার মনে এক প্রকার চাঞ্চল্য পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল।

জানলার অন্তহীন পথেই হয় ত সে চলত কিন্তু ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে কয়েকটা বেজে ওঠার সঙ্গে সে চমকে উঠে হাতের ঘড়িটা, জানলা-থেকে-আসা রাস্তার গ্যাসের আলোর রশ্মি-পথে ধ'রে দেখ্‌লে—রাত বারোটা। এক রকম জোর ক'রে সকল চিন্তার অন্ত ক'রে সে ঘুমোবার চেষ্টা করলে—কিন্তু ঘুম কিছুতেই এলো না।

বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে সে তার ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিলে। কিন্তু তাতেও তার ঘুম এলো না দেখে তার পুরানো অনিদ্রা রোগটা প্রবল ভাবে তাকে আক্রমণ করেছে স্থির ক'রে আল্‌না থেকে জামাটা টেনে, গায়ে দিয়ে, সে সটান বাড়ী হ'তে বার হ'য়ে পড়ল।

(দুই)

কল্‌কাতার রাস্তায় লোকের ভিড় ছেড়ে লোকই বড় ছিল না। দু'একজন অবশ্য মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করছিল; দু'একখানা মোটারও তীব্রবেগে ছুটে গিয়ে শব্দের আঘাতে রাত্রির বুক কম্পিত ক'রে তুল্‌ছিল। মণি খুব ধীরে ধীরে পথ দিয়ে চল্‌ছিল। মোড়ের মাথায় পাহারাওয়ালাটা চৌমাথার গ্যাসের আলোয় তার মুখ দেখে নিলে। মণি তা লক্ষ্য না ক'রে উদ্দেশ্যহীনভাবে যেমন চল্‌ছিল তেমনই যেতে লাগ্‌ল। ফুটপাতে গাড়ী-বারান্দার তলায় অসংখ্য গৃহহীন শ্রমিকের দল শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। একবার এদের দিকে চেয়ে সে ভাব্‌লে—জীবনটাকে এরা কত সহজ ক'রে নিয়েছে।

রাস্তার গ্যাসের আলোর দীপ্তি সেই রাতের গভীর অন্ধকারের বুকে স্থির প্রেশান্তিতে জেগে আছে অনন্ত প্রতীক্ষমানার প্রতীকের মতো। রাতের এই সুগভীর স্তব্ধতা মণির হিয়াকে স্থির ক'রে তুল্‌ছিল পাষাণ-ভারের মতো।

রাস্তার মোড়ের মাথায় একটি বাড়ী হতে প্রচুর আলোক উদ্দাম বেগে রাস্তায় এসে পড়্‌ছিল। সে আলোর ধাক্কা লাগ্‌তেই উপর দিকে চোখ চাইতে, দৃষ্টিতে পড়্‌ল—এক নারী-মূর্ত্তি। মুখ তার খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল না কিন্তু ঘরের উজ্জ্বল আলোয় তার বস্‌বার ভঙ্গিটি বেশ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল, সাদা জমিতে কালো রঙের ছবির মতো। কি যেন সে ভাব্‌ছিল। তার দিকে কয়েকবার চেয়ে মণি কয়েক পা হন্‌হন্ ক'রে এগিয়ে গেল। আবার কি ভেবে একটু থেমে সে আবার সেই পথে ফিরে এসে, বাড়ীর সেই জানলার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। জানালার সেই নারী-মূর্ত্তির মুখে মনে হল যেন বর্ণালোকের মৃদু হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

মণি আর ইতস্ততঃ না ক'রে সেই বাড়ীর আধ-ভেজান দরজা দিয়ে সটান বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়্‌ল।

(তিন)

মাঝারি একটি ঘর, বেশ সুন্দর ক'রে সাজান। দেয়ালে কয়েকখানি নারী-মূর্ত্তির ছবি। একখানি সরস্বতীর ছবি, ফ্রেমের উপর একটি ফুলের মালা দোলান। মেঝের উপর বেশ সুন্দরভাবে ফরাস পাতা, তার উপর বড় বড় কয়েকটা তাকিয়া। মাঝে একটি ফুলদানিতে কয়েকটি গোলাপের কুঁড়ির মধ্যে একটি ফোটা লাল গোলাপ। প্রবেশ দ্বারের অপর দিকের দেয়ালের মাঝখানে একটি

দরজা, পর্দা লাগান। সরে-যাওয়া পর্দা দিয়ে অপর ঘরের অতি নিভাঁজ ভাবে সাজান খাটের বিছানার কিয়দংশ দেখা যাচ্ছিল।

মণি ঘরের মধ্যে ঢুক্তে না ঢুক্তে দরজার সেই পর্দাটি সিপ্ ক'রে স'রে গেল। জানলায় সেই রহস্যময়ী নারী এসে দাঁড়াল। তার মুখে একটি হাসির বিজলী-চমক্ ফুটে মিলিয়ে গেল। মণি একবার চোখ তুলে সে মুখের দিকে চেয়ে ভাবলে—কি অর্থ এ হাসির!

নারী শুধু মুহূর্ত্তের জন্য একবার তার দৃষ্টির আলোয় মণিকে দেখে নিলে। একবার যেন তার মুখখানা কঠোর হয়ে উঠ্ল কিন্তু তার উপর আবার এক মৃদুহাসির প্রলেপ দিয়ে আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে, নিজের ছায়ার অন্ধকারে মুখ ঢেকে ফরাসের এক কোণে বসে পড়্ল।

মণি এ সব স্থানে অনভ্যস্ত না হলেও, এই রহস্যময়ীর ব্যবহারে সে যেন কেমন আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। ঠিক কি কথা ব'লে আলাপস্রোত প্রবাহিত করা যায় তা যেন তার মনে পড়্ছিল না।—

কয়েক মুহূর্ত্তের স্তব্ধতার পর নারী-কণ্ঠ হতে প্রশ্ন এল—তা হ'লে একটা গান গাই—।

মণির মনে হ'ল সে যেন বল্লে—তাই ভাল। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোন স্পষ্ট স্বর বার হল না। চেষ্টাকৃত হাসির রেখা মুখে ফুটে উঠ্তে না উঠ্তে মিলিয়ে গেল।—

নারী হারমনিয়মে সুর ধর্লে।

(চার)

মণি মুগ্ধ হয়ে গান শুনছিল। গানের কথা শেষ হয়ে গেল, সুরের রেশ মিলিয়ে গেল। নারী তার কাছে এল। আলোর সমস্ত দীপ্তি তার মুখের উপর এসে পড়েছিল। চোখে তখন তার সেই দৃষ্টি, শিকার হস্তগত ক'রে বাঘিনীর চোখে যে দৃষ্টি ফু'টে ওঠে। তার অধরপ্রান্তে একটুখানি হাসির ঝলক্ ঠিক্‌রে গেল, জলের ঢেউয়ে ঠিক্‌রে-পড়া সূর্য্যালোকের মতো।

মণি পূর্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠে কিছু ভাববার আগেই, সটান সোজা হয়ে ওঠবার যোগাড় করতেই, এই অদ্ভুত নারী তার হাতখানা চেপে ধরে বল্লে—কি? তার শান্ত গলার সুরে তখন সে কী বাজের বিদ্যুৎ-গর্জ্জনের গমক মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্ল।

মণির চোখের সামনে দিয়ে কয়েক বছর আগের গোটাকয়েক ঘটনা যেন এক পলকে উঁকি দিয়ে গেল—

নারী তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বল্লে—একদিন ত আমায় পেলে ধন্য হ'য়ে যেতে, কিন্তু আজ—চম্‌কে উঠ্‌লে যে ?—আবেগের উত্তেজনায় সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল।—

সে নারীর রহস্যময় আবরণ যেন উন্মোচিত হয়ে গেল। তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠ্‌ল একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার আর্তনাদ। তার মুখে সর্পিনীর ক্রূরতার দৃঢ় রেখা ফুটে উঠ্‌ল। এক কঠোর বিষাক্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নারী তার বাণীর অগ্নিতে মণিকে দগ্ধ করতে উদ্যত হল।

মণি চুপ ক'রে যেমনভাবে বসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে বসে রইল। তার মুখ থেকে কোনো কথা বার হচ্ছিল না বটে কিন্তু সে তার দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা তাণ্ডব নর্তন অনুভব করছিল। দেহের প্রতি রক্তকণা উত্তেজনার তাপে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়্‌তে চাইছিল। চোখের দৃষ্টি, মনের চিন্তা করবার শক্তি যেন সেই নারীর বাণীর অগ্নিকুণ্ডে অসহায় হয়ে পড়েছিল।

(পাঁচ)

এই নারী, একে সে চেনে। একেই একদিন সে তার যৌবনের প্রেম নিবেদন করেছিল। এরই জন্তে সে পাগল হয়ে উঠেছিল কিন্তু একে সে পায় নি তখন। তারপর যেদিন এই নারী তার স্বামী হারিয়ে তার দেওরের সংসারের ভারস্বরূপ হয়ে উঠ্‌ল, সেদিন তার দেওর বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ছিলেন। ঠিক সেই সময় একদিকে দেওরের ভ্রূকুঞ্চন ও অপর দিকে পাড়ার লোকের অহেতুক সহানুভূতির জ্বালায় তাকে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তে হয়েছিল। অবশেষে এই পাড়ার লোকেরই অযাচিত আত্মীয়তার হেতু দিয়ে সামাজিক শাসন-বিধানে তার দেওর, তার সহস্র অনুনয় ও চোখের জল উপেক্ষা ক'রে তাকে আশ্রয়চ্যুত করলে। সমাজের কাপুরুষদের দল এই অসহায়া নারীর উপর এই ভাবে তাদের শাসন-দণ্ডের অপব্যবহার ক'রে আত্মপ্রসাদে উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ল।—সেদিন তাকে সাহায্য করার কথা ত তার মনেও হয় নি। আজ এমন অবস্থায় তার মনে হল—কি মিথ্যা প্রেম মানুষের! ভালোর আবরণে মন্দের অভিনয়ই সব।—তা না হ'লে আমি ভাবলামই না—আশ্রয়চ্যুত হয়ে তার কি দশা হবে।

এমনি কথা তার মনে পড়্‌ছিল। নারী তখন ব'লে চলেছে—সমাজ যেদিন আমায় তাড়িয়ে দিলে, যেদিন নিজেকে নিরাশ্রয় অসহায় জেনে, শোকে লজ্জায়

গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলাম। হয় ত ঝাঁপই দিতাম, কিন্তু আমায় রক্ষা করলে একজন। সে আজকে আমারই মতো একজন অন্ধকারে হারাপথের যাত্রী। সে-ই আমায় বুঝিয়ে দিলে—আমরা নিরাশ্রয় নয়। এই হীন পঙ্গু সমাজ—যে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আমরা নিজেরা একত্রিত হয়ে তাদের উপর এই অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব। প্রতিহিংসা নিতেই হবে, এই তার পথ।

তার চোখ দুটি যেন কিসের জ্বালায় দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। দেহের সর্ব্বাঙ্গ উত্তেজনায় কম্পিত হয়ে উঠ্‌ল।

মণি তাকে স্তব্ধ হতে দেখে একবার ধীরে ধীরে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে—তার চোখ জলে টল্‌ টল্‌ কর্‌ছে!

কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বার হল না, বিস্ময়ে সে অবাক হয়ে গিয়ে ছিল। তার দৃষ্টির উত্তরে নারী কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে—কেন এলে, কেন এলে তুমি? স্তব্ধ নিশীথের এই সময়টুকুকে আমার নিজের ক'রে নিয়ে, সমস্ত সন্ধ্যার মলিনদের প্রতিহিংসার কথা ভাব্‌ছিলাম।—কি প্রতিহিংসা নিতে এসেছি ভেবে অবসাদে আমার মন ভিজিয়ে আস্‌ছিল। ভাব্‌ছিলাম, এ কি রকমের প্রতিহিংসা নিতে এসেছি! এই কি ঠিক পথ? সমাজের আবর্জ্জনা; তার বিষ আমরা ধারণ ক'রে চিরঘৃণিত হয়ে আছি। সমাজ বেঁচে যাচ্ছে, আর আমরা তার বিষ সযত্নে লুকিয়ে রাখ্‌তে গিয়ে মরণের দিকে এগিয়ে চলেছি, মৃত্যুঞ্জয়ের মতো আমরাও ত বিষ খেয়েছি কিন্তু মানুষের স্মরণের পাতায় ত আমরা তার মতো অমর হতে পারছি না। আমরা তার সর্ব্বনাশ করতে এসে করতে বসেছি তার উপকার, কিন্তু তাও করতে চাই না। এ ভুল, ভুলপথ নিশ্চয়ই, নয় ত প্রতিহিংসা নেওয়ার তীব্র বিষাক্ত আনন্দের পরিবর্ত্তে জ্বালা, চিরঅশান্তির তপ্তস্পর্শ পাচ্ছি কেন?—

তার এই ক্রন্দনোন্মুখ আবেগকে সহসা সংযত করতে গিয়ে সে যেন রুক্ষ হয়ে উঠ্‌ল। ক্ষণিকের জন্য যেন সে সম্বিৎহারা হয়ে পড়্‌ল। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হয়ে মণির হাতখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে চীৎকার করে উঠ্‌ল—যাও—যাও চলে যাও এখনি—এ কেলেঙ্কার কথা তোমাদের বলে কি হবে—তোমাদের—

মণি তখনও ইতস্তত কর্‌ছিল দেখে, একবার একটু অস্থিরের মতো দাঁড়িয়ে সহসা দুই হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে মিনতি ভরা কণ্ঠে বল্‌লে—না, আর থেক না—যাও, চ'লে যাও, যাও—

আবেগে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। তাকিয়ার ওপর মুখ গুজে সে পড়ে রইল।

মণি আর অপেক্ষা না ক'রে দ্রুত সে ঘর থেকে বার হয়ে এল। আবর্জ্জনার অন্ধকূপের এই অগ্নিশিখা তার মনকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলল।

সে রাত তার বিনিদ্র ভাবেই পথে পথে কেটে গেল।

রাত্রি ও দিবার যুগলগাছ-গাঁথা মণিমালার মরকত মণি হয়ে মাঝখানে দুলছে—সন্ধ্যা। সন্ধ্যা অশব্দ ও শব্দের পারাপার করে। দিবারাত্রির পারাপার ক'রে সন্ধ্যার বুকে যে দোলা লাগে তা দিবসও জানে না, রাত্রিও জানে না। * * * পৃথিবীতেও কতগুলি মানুষ আছে সন্ধ্যারই মত। তারা সার্থক না অনর্থক?

—আয়না।

সাঁঝে

—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কাহার শ্বাসের বাতাস আসে আজকে সাঁঝের বেলায় ?
প্রেমে নিরাশ কি সে ?
তপ্ত দিনের অবসানে ঘন ছায়ার মেলায়,
চায় কি যেতে মিশে ?

আয় রে আমার বিজন তীরের শান্ত শীতল কোলে,
বুকে চেপে উহ।
হৃদয় ব্যথা (মরণ যেমন তীব্র দহন ভোলে)
মর্ম্ম দিয়ে মুছ।

খুঁজিস্ না রে সাঁঝের পায়ে পূর্ণিমা কি অমা ;
অটল পায়ে দাঁড়া।
আমার কাছে আছে রে তোর স্বপ্ন-সুধা জমা ;
হাতখানি তোর বাড়া।

তুমি আমি ঘুমিয়ে পড়ি অস্ত-উদয় ভুলে,
ছায়ায় ঢেকে তনু ;
মিলে যাবে—মিশে যাবে শ্বাসে ছলে দুলে,
অণুর সাথে অণু।



রাত-বিরেতে

—শ্রীযুবনাশ্ব।

শীতের শেষরাত।

বড় রাস্তার ওপর মস্ত তেতলা বাড়ী। অনেক জায়গা-জমী চারিধারে, প্রকাণ্ড ফটক। লতাপাতায় ঝোপঝাড়ে দেয়াল ঢাকা।

বাড়ীর বেশী ভাগটাই অন্ধকার। দু-একটা বারান্দায় আলো জ্বলচে। তেত্‌লার একটা জানালা থেকে খানিকটা আলো বেরিয়ে এসে জমাট কুয়াসার জালে আট্‌কা পড়ে থেমে গেছে।

ওপরের বারান্দা দিয়ে বারদুই একটি নার্স হেঁটে গেল। মাঝে মাঝে রোগাতুর কণ্ঠের দু'একটা কাৎরানি আর দেখর্ জমাদারের ফিস্‌ফাস্ ছাড়া কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

রাস্তা নির্জ্জন,—নিস্তব্ধ। দূরের একটা বাড়ী হতে থেকে থেকে রুগ্ন ছোট-ছেলের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্চে।

বড় বাড়ীটার পাশেই ছোট্ট একটা গলি। গলির মুখটা বড় রাস্তার গ্যাস্-বাতির আলোয় আলোকিত, ভেতরটা বেজায় অন্ধকার। তেতলা বাড়ীটার জঙ্গলে দেওয়ালের মধ্যে ছোট্ট একটি দরজা গলির ওপর। লতাপাতাগুলো এমন ঝুলে পড়েচে যে, চট্ ক'রে নজরে পড়ে না।

দরজা খু'লে আপাদমস্তক কালো চাদরে মুড়ি-দেয়া আয়াশ্রেণীর একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। এসে সন্তর্পণে এদিক ওদিক চেয়ে ডাক্‌ল,—সুমন্—

অন্ধকার গলির সবচেয়ে আঁধার কোণ থেকে সাড়া এল—কে, সুখিয়া—

হাঁ, ব'লে সুখিয়া রাস্তায় নাম্‌ল।

দুজনে মিলে গলির ভেতরে খানিকটা এগিয়ে গেল।

সুখিয়া বল্‌ল—তোর আস্‌তে এত দেরী হ'ল যে আজ? আমি দু'বার এসে ঘুরে গেছি আগে।

সুমন একটা বিড়ি ধরিয়ে বল্‌ল—পড়ে একশালা পুলিশের পাল্লায় প'ড়ে গেছ্‌নু! শালা কি সহজে ছাড়ে! অনেক ভজিয়ে টিজিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে আস্‌চে

দেরী হ'য়ে গেল।—বাপ! যা শীত পড়েচে আজ! ব'লে ছেঁড়া কাঁথাখানা দিয়ে বেশ ক'রে কাণ মাথা ঢেকে নিয়ে বল্‌ল—নে' মাল বার কর্‌।

সুখিয়া চাদরের ভেতর থেকে একটা কাপড়ের পুঁটলি বা'র করল। ঝুমন হাত পেতে ধর্‌তেই সেটা নড়ে উঠ্‌ল। ভেতর থেকে অস্ফুট শব্দ হল,—ওঁয়া—ওঁয়া—

ঝুমন সতর্কভাবে চারিদিকে তাকিয়ে বল্‌ল,—কদ্দিনের?

—একটা দিনষোল, আর একটা একমাস।

—মেয়ে, না ছেলে?

—দুটোই মেয়ে।

ঝুমনের বীভৎস কুৎসিত মুখখানা সেই অন্ধকারের মধ্যে সুখের হাসিতে ভ'রে উঠ্‌ল।

সুখিয়া বল্‌ল—দুখানা নোটের কমে এ জোড়া ছাড়্‌চি নে।

ঝুমন বল্‌ল—থাম্‌ মাগী! দুখানা নোট্‌! গেল হপ্তায় যে জোড়া দিইছিলি তার মেয়ে বাচ্ছাটা ত দু'রাত পোয়ালে না! আমার ছ-ছ'টা কর্‌করে টাকা লোক্‌সান! এ জোড়ার জন্যে বারোখানা টাকা পাবি—আমি ব'লে বল্‌চি, মদ্দা হলে অর্দ্ধেক দিয়েও পুছ্‌তুম না।

সুখিয়া বল্‌ল—ম'রে গেল, সে কি আমার কসুর? কুড়িদিনের অতবড় ছানা, তু বাঁচাতে পারলি না তা আমি কি করব? এর আগে ত কখনো মরে নি আর! সেগুলোতে কত রোজগার করেচিস্‌ তার ঠিক?—না, না, এ জোড়া নিতে হলে বিশ রূপেয়া ক্যাল্‌ তা'পর নে যা!

একটা লম্বা টান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিয়ে ঝুমন বল্‌ল—বিশ রূপেয়া কিছুতেই পার্‌ব না। আচ্ছা বারোতে না ছাড়িস্‌, সাত সাত চৌদ্দটা নে—বা। ব'লে সে গাঁ্যাজে হাত দিল।

সুখিয়া অসন্তুষ্ট ভাবে বল্‌ল,—তাহলে পনেরটা দে। সিপাইকে আবার পাঁচটাকা দিতে হবে এ থেকে—আমার থাকল ছাই!

ঝুমন বল্‌ল—জবরদস্তি ক'রে একটা টাকা বেশী নিবি?—নে! কিন্তু আগামী হপ্তায় ভাল মাল চাই—মেয়ে। ছোঁড়া অনেকগুলো হয়ে গেছে, ও আর চাই নে। মেয়ে দিবি। আর বেশ পুরুষ্টু যেন হয়।

সুখিয়া বল্‌ল—খালি মেয়ে হ'লে আগামী হপ্তায় হবে না—পরের হপ্তায়।

—আচ্ছা, আচ্ছা তাই। কিন্তু মদ্দা-বাচ্চা আর চাই নে।

—সে মেয়েগুলো পার করেচিস্ ?

—কোন্‌গুলো ?—ওঃ—হ্যাঁ। কুসমি নিয়েচে। বেটী চিপ্‌সের হাড়। বরাবর বেটীকে তাজা মাল জোগাচ্চি, কিন্তু দরদস্তুরের বেলায় বেটি যেন শকুন! এই ত সে দিন পটলীকে পার করলুম—ন'বছরের অমন ডব্‌কা মেয়ে' বেটী দিতে চায় কিনা চল্লিশ টাকা! বল্লুম মাসি, পথ দ্যাখ্‌। ওকে ক্ষ্যান্তর কাছে ছাড়্‌ব, ষাট্‌ টাকায় লুপে নেবে। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর বাহান্ন টাকায় রফা হোল।

—এত পাস্, আর আমাদের সাতেই যত ছোটমান্‌ষী ?

—ছোট মান্‌ষী!—তোদের বেশী দোব কোন্ সাহসে ? যদি ম'রে যায় ? আর আমার ত নিয়ে গিয়ে পুষবার খরচ আচে! পাঁচ ছ'দিনের ছা' নিয়ে গে' ন দশ বছরেরটি করতে হ'লে খাওয়াতে পরাতে কি কম খরচটা হয় ? তার ওপর সব ক'টা কিছু দেখতে ভালো হয় না। খারাপ হলে দামও কমে যায়। কতকগুলোকে আবার ঘরে বসিয়েই ছিস্তে করতে হয়। এসব খরচ পুইয়ে শেষমেষ আমার ত থাকে কচু! আর ছোঁড়াগুলো ত বাজে খরচ! খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করি,—চোখ ফুটলেই নিজের পথ্‌ দ্যাকে—

সুখিয়া বল্‌ল—তার মানে ? গোড়াতেই খাম করে দিস্‌না সেগুলোকে ?

ঝুমন বল্‌ল—সবগুলোকে নয়। যেগুলো দিই, তাদের কাছ থেকে অনিশ্চি কিছু আদায় হয়। সেই লালচুলো বাচ্চাটার কথা মনে আচে তোর ? সেটাকে হাত মুচ্‌ড়ে কোমরের সাতে বেঁধে দিইছিনু। দিব্যি খুলো হয়ে গেচে এখন,—পথে বসে, রোজগারও মন্দ দেয় না।

সুখিয়া বল্‌ল—সে সাহেবের ছা'টার কি করেচিস্ ?

ঝুমন বল্‌ল—সেটার জিব কেটে দিইছিনু—কি জানি ব্যাটাচ্ছেলে বড় হ'য়ে যদি সাহেবী বুলি ঝাড়্‌তে শুরু করে! এখন সেটা খুব রোজগেরে হয়েচে,—তবে আমায় বড় একটা মানতে চায় না।

সুখিয়া বল্‌ল,—তা হাতের পাঁচটা আঙুলই কি সমান হয় ? সবাই যে তোর বশ হবে এমন ধরাবাঁধা কথা ত কিছুই নেই!

কথা বল্‌তে বল্‌তে দু'জনে ছোট দরজার কাছে এগিয়ে এল।

সুখিয়া বল্‌ল, বিঁড়ি দে একটা—

—এই ধর, ব'লে ঝুমন সুখিয়ার হাতে বিঁড়িটা দিয়ে শিশু দুটিকে বেশ ক'রে ছেঁড়া কাঁথায় ঢেকে নিল।

একখানা ফীটন্ গাড়ী এসে গলির মুখে থাম্‌ল। আরোহী দুটি বিবিঙ্গী যুবক।

একজন চীৎ হয়ে প'ড়ে মত্তকণ্ঠে দুর্বোধ্য ভাষায় কি একটা ইংরেজী গানের সুর ভাঁজ্‌ছিল।

ফাটন্ দেখেই সুখিয়া দরজা দিয়ে না ঢুকে অন্ধকারে এসে দাঁড়াল। কুমন বল্‌ল,—গেলি না যে বড় ?

সুখিয়া তার মুখে হাত দিয়ে বল্‌ল—চুপ্।

ফুলে-পাতা লতা-পাতাগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে একজন নার্স এসে গলিতে নাম্‌ল। দু'একবার শঙ্কিত চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে হন্ হন্ ক'রে গাড়ীর দিকে চল্‌ল।

কুমন কি বল্‌তে যাচ্ছিল, সুখিয়া তার হাত টিপ্‌ল।

নার্স গাড়ীর পা-দানে পা দিতেই একজন যুবক তাকে পাঁজাকোলা ক'রে তু'লে নিল। মাতালটা গাড়োয়ানকে বল্‌ল—এই—জো—চালাও।

রাতের স্তব্ধতা ভেদ ক'রে দু'একটা চুমনের আওয়াজ শোনা গেল।

গাড়ী চলে গেল।

সুখিয়া বল্‌ল, সিস্টারকে নিয়ে দিনকতক বেশ মজা লুটছে ছোঁড়া দুটো।

কুমন জবাব দিল না। কাঁথাখানা আর একবার ভালো ক'রে জড়িয়ে নিয়ে সে বল্‌ল—আজ চল্‌লুম সুখিয়া—

সুখিয়া বল্‌ল—আয়।

গলি থেকে বেরিয়ে কুমন বড় রাস্তা ধ'রে কিছুদূর চল্‌ল। সাম্‌নে একটা কন্‌স্টেবল দেখে সে পাশের একটা গলিতে ঢুকে পড়্‌ল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এ-গলি সে-গলি ক'রে সে শহরের এক প্রান্তে এসে উপস্থিত হ'ল। সেখান দিয়ে একটা খাল চ'লে গেছে। সে সন্তর্পণে খালটা পার হয়ে, আরো কিছুদূর গিয়ে বাঁ-হাতি একটা সরু অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল।

ঘোর অন্ধকার। দুধার দিয়ে ছোট ছোট খোড়ো কুঁড়ে। দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। শীতকালেও সে জায়গাটা কাদায় প্যাচ্‌ প্যাচ্‌ করছে।

খানিকটা গিয়ে মোড় ঘুরতেই, সে দেখ্‌ল একজন ভদ্রলোকের মতন মানুষ র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে চোরের মতো চলেছে।

সে দাঁড়াল, ডাক্‌ল—কি চান্ বাবু কোথায় ?

ভদ্রলোক সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগ্‌ল।

সাম্‌নের কুঁড়ের ঝাঁপ খুলে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। বল্‌ল—কে ও ? সর্দার ! ছেড়ে দাও—বাবু আমার কাছে এসেছেলো !

—ওঃ—বাস্। ব'লে ঝুমন স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বল্ল—মন্নার কাছে ? কত দিলে ?

—ছ' আনা।

—বিড়ি আছে ঘরে ? সে ত একটা, ব'লে সে দুয়োরে পা দিতেই স্ত্রীলোকটি বল্ল—ঘরে ঢুকো না সর্দার,—মানুষ আছে।

ঝুমন অবাক্ হ'য়ে তার দিকে তাকাতে স্ত্রীলোকটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে একটু হাস্‌ল। বল্‌ল—ভুঁদীর ঘরে।

ঝুমন বিস্মিত কণ্ঠে বল্‌ল—আস্তানার মধ্যে হঠাৎ এত বাবুর আমদানী কল্লানি কোত্থেকে থেঁদি ?

থেঁদী বল্‌ল—বাবুর আবার অভাব! ঘণ্টা দুত্তিন আগে ওই হোতা বড় রাস্তার মোড়ে বাবু দুটি আস্তানার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘোরা-ফেরা কর্‌ছিল। ভুঁদী গিয়ে কতা কোয়ে নিয়ে এয়েচে!

—এটা যে পাড়া নয়, তা জানে ত ?

—তা আর জানে না! কত জিজ্ঞেসবাদ কর্‌লে। কে কে থাকে হেতা, দিনের বেলা কি করে,—এই সব। আমি বলি কি সর্দার, বাড়ীউলি মাসিদের কাছে ছুঁড়িগুলো না বেচে, এখেনেই কেন ব্যবসা লাগিয়ে দাও না! আমি বল্‌চি তোমায়, বাবুর অভাব হবে না।

—না, না—তু পাগল হলি না কি ? আর হাঁথ, একটু সাবধানে কাজ করিস্। এখন শোন্,—ইদিকে আয়। ব'লে ঝুমন থেঁদিকে সাথে করে নিজের কুঁড়ের দিকে গেল।

ঝাঁপ খু'লে ভেতরে ঢুকে বল্‌ল—এই ছাখ্, আ-কের সওদা!

শিশু দুটি দেখে থেঁদী বল্‌ল—কত নিলে ?

—পনের।

—ঠকায় নি। বেঁচে বর্তে থাক্‌লে কোন্ না চার কুড়ি টাকায় এক একটা বিকোবে!

ঝুমন শিশু দুটিকে ঢেকে ছেঁড়া মাদুরের ওপর শোয়াল। তার পর বল্‌ল, তু একটু খবরদারী করিস্। আমি আস্‌চি। ব'লে সে বেরিয়ে পড়ল।

ভুঁদীর ঘরে শব্দ শু'নে তাকাতেই, সে দেখতে পেলে ফিট্‌ফাট্ ফিট্‌ফিটে এক যুবক কুঁড়ে থেকে বেরুল। সেদিকে আর না চেয়ে সে নিজের পথ ধরল।

চারদিক একটু একটু করে ফরসা হয়ে আসছে। ঝন্ ঝন্ শব্দ করতে করতে ময়লা-ফেলা এক্কাগুলো বড় রাস্তা দিয়ে চল্‌তে সুরু করেছে।

পেছনের কুঁড়েটা থেকে ছোট্ট ছেলের কান্না শোনা যাচ্ছে—ওঞা-ওঞা!

ধরা-তে চরণ রাখি আকাশেরে লইব মাথায়

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

ধরাতে চরণ রাখি' আকাশেরে লইব মাথায় !
মৃত্তিকার ধূসর ধূলায়
আমার এ ছিন্ন ম্লান শয্যাখানি বিরচিয়া,
ক্ষুধার্ত্ত মাটির বক্ষ তপ্ত বক্ষে স্নেহে আঁকড়িয়া,
র'ব শুয়ে মা'র মৃত্যু-সুশীতল ম্লান অঙ্কটিতে
মা'র বুকে মরণের স্তন্য করি পান,
আর মোর প্রাণের প্রদীপখানি প্রেমে প্রজ্বালিয়া
দীপ্ত শিখা কল্পনার কেলিহান—
পাঠাইব ঊর্দ্ধে হায় আকাশেরে পরশিতে !

বসুধার নেত্র-কোণে পুঞ্জিত করিয়া রাখি' মোর অশ্রু গ্লানি,
অবশেষে অনন্ত আনন্দ-ধ্বনি
আকাশের নীলিমায়,
জ্যোৎস্নার বিলোল স্বপ্ন-সুরভি-সুধায়,
রৌদ্রের ঝুলন-দোলে রাখিব দুলায়ে,
থাকি থাকি।
আমি যেন নামহারা ক্ষুধাতুর পাখী
আকাশে মেলিয়া ডানা খুঁজিতেছি অজানারে
সঙ্গীতের স্বপ্ন-পারাবারে ;
তারপরে ক্লান্তপক্ষ নেমে আসি ধরণীর ধূলির কুলায়ে
উষার ধূসর বুকে হায়,

কণ্ঠে আর গান নাই, হা হা বাজে ঝঞ্ঝার মৃদঙ্গে,
পঙ্কে পঙ্কে
জীবনের ভিক্ষাভাণ্ড পূর্ণ করি কলঙ্ক-কলুষ-কালিমায় !

কুৎসিত কামনাখানি ধূলাতে ঢাকিয়া রাখি,'
প্রেমের আকাঙ্ক্ষা মোর অন্তহীন আকাশের ভালে
মেঘের বিচিত্রবর্ণে রাখি আঁকি'
স্নিগ্ধ শ্বেত শীতল চন্দনে ।
কামনা যে-দীপখানি জ্বালে,
নিজে তাতে দগ্ধ হয়ে করে যে আলোক বিতরণ,
তাই এই মৃত্তিকার কুশ্রী ইচ্ছাখানি প্রেম হয়ে আকাশে যে
করে আরোহণ
প্রার্থনার মত !
এ-ধরণী প্রসারিয়া বাগ্র বাহু-ফণা শত শত
আমার এ-শরীরেরে রয়েছে আঁকড়ি ;
কিন্তু ওই মহোজ্জ্বল আকাশ অবাক্
আমার আত্মারে আজি দিয়েছে যে ডাক,
জাগায়েছে প্রেমেরে আমার ।
এ দেহে পেয়েছে খুঁজে ধরা তার রসের আগার,
এ দেহে পেয়েছে তার কামনার খনি ;
আর ওই শান্তজ্যোতি স্নিগ্ধচক্ষু আকাশ আমার
প্রাণে প্রাণে খুলেছে যে প্রেমের বিপণী !
কামনা ও প্রেমেরে যে বাঁধিয়াছি এক বীণা-তারে ।
ধরণী ও আকাশেরে আমি-ই যে মিলায়েছি মোর তপ্ত বুকে
দুয়াতুর ;
এ-নিকট আর ও-সুদূর !

একজন বিরহিণী নিদারুণ দুখে
পিপাসায় চঞ্চল উৎসুকে
পঙ্কেরে করিছে গান ;

আরজন তাম্রবর্ণ গেরুয়া করিয়া পরিধান
উদাস সন্ন্যাসী—
তপস্যার অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করে তমিস্রার রাশি
বিস্তারিয়া একখানি বাহু।
আমি-ই ত' আকাশ ও ধরণীর দিলাম বিবাহ
মোর এই অঙ্গের অঙ্গন-তলে ;
আনন্দে ও অশ্রুজলে
আমি-ই বাঁধিনু রাখী ধরণী ও আকাশের হাতে,
অপসৃত-অন্ধকার পবিত্র প্রভাতে
মোর বক্ষ মাঝে ;
সে-মিলন-বাদ্য সদা বাজে
মোর প্রতি স্নায়ুতে শিরায় !—

পিপাসা-জর্জর মোর বুকের পঞ্জর,
এক পার্শ্বে রাক্ষসের অন্য পার্শ্বে দেবতার ঘর !
মোর বুকে তারা আজ হ'ল প্রতিবেশী
যারা ছিল যাযাবর দূরের বিদেশী,
এক সাথে তারা আজ বাঁধিয়াছে বাসা মোর বুকে
একজন যাতনায়, আরজন ক্লান্তিহীন সুখে
অপরূপ ;
একজন অগ্নি হ'ল আর জন ধূপ,
আমি শু'ধু ধূলার ধূপতি !

আমি যদি না থাকিতাম,
তবে হায় ঘুচিত না আকাশ ও ধরণীর এ বিরহ অবিরাম,
ঘুচিত না এই ব্যবধান !
আমি আসি পূর্ণ করি দিয়া গেনু উহাদের শূন্যতার স্থান
মুছায়ে ক্রন্দন।
তাই শুনি দিবারাতি,
মোর বুকে ব্যাপক-শ্বসন পাতি

এই দুই বর-বধূ
করে নব-প্রেম-বার্ত্তা মৃদু গুঞ্জরণ,
আকাশ মধুপ হয়,
আর ধরা বক্ষে ভরি বয়
পঙ্কের কলুষ-মধু
মৃত্যুর সঙ্গীত।
উহাদের মিলনের যজ্ঞে আজ আমি শুধু পুরোহিত ;
প্রসারিয়া প্রীতি
ডাকিয়াছি মোর ঘরে এই দুই ঘরছাড়া পথিক অতিথি।

আশা

—শ্রীরামপরায়ণ রায়।

ভক্তি বল্লে, আমি যদি আমার ধূপ-ধুনোর গন্ধ নিয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে রাজপথ দিয়ে যাই, তা হলে পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যার দুয়ার না আমার শাঁখের আওয়াজে খুলে যাবে।

প্রেম বল্লে, আমি যদি আমার মোহন বাঁশী আর সবুজ স্বপ্ন নিয়ে একবার নামি, তা হলে ধরার মাঝে এমন মানুষ নেই, যে না আমার বাঁশী শুনতে দৌড়ে আসবে।

আশা চুপ করে রইলো।

ভক্তি ধূপের পাত্র নিয়ে, শাঁখ ঘন্টা বাজাতে বাজাতে রাজপথ দিয়ে যেতে লাগ্‌ল; তরুণ তরুণী তখন আপনাদের রঙীন স্বপ্নে বিভোর। শাঁখের আওয়াজ আর ধূপের গন্ধ থেকে তখন তাদের ভাল লাগ্‌ছে দয়িতের কণ্ঠস্বর আর তার অঙ্গের স্নিগ্ধ সুরভী। ভক্তি মাথা নীচু করে ফিরে গেল।

প্রেম তার সবুজ নিশান উড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দূরের শব্দবিহীন দরার বাটিতে। পণ্ডিত তখন তার পুঁথিপত্রে এমন ক'রে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে যে, বাঁশীর মিঠে আওয়াজ, তার কাছে গবেষণার ব্যাঘাতজনক ব'লে বোধ হলো; সে অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়ন বন্ধ ক'রে দিলে। বাঁশীর সুর সেই বাতায়নে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল। প্রেম ফিরে গেল ব্যর্থ মনোরথ হয়ে।

সবশেষে আশা নেমে এল নৃত্য দোদুল ছন্দে, তার চঞ্চল অঞ্চলপ্রান্ত দুলিয়ে। তার অঞ্চলের ছায়া গিয়ে পড়্‌ল চাষার ক্ষেত থেকে রাজার সিংহাসনের উপর। কুঁড়ের আগোড় থেকে ধনীর সিংহদুয়ার পর্য্যন্ত সব উন্মুক্ত হয়ে গেল, তাকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্যে। দেশের ভিতর একটা জাগরণের সাড়া প'ড়ে গেল,

মন্দির-প্রাঙ্গণে কাঁসর ঘন্টা দ্বিগুণ শব্দে বাজ্‌তে সুরু কর্‌ল। নির্জ্জীব বন্দী নবীন সজীবতায় কারাগৃহের লৌহ দণ্ডে আঘাত কর্‌তে লাগ্‌ল, ধূলারাশির মাঝ থেকে, আবার পুঁথিপত্রকে বার ক'রে পণ্ডিত নূতন উদ্যমে অধ্যয়ন কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। বিরহিনীর পাণ্ডুর মুখে আবার সজীবতার হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

আশার আর ফিরে যাওয়া হ'লো না; পৃথিবীর সকলে, হাসি-কান্নার মাঝখানে তাকে জড়িয়ে ধ'রে রইল।

পান্থ-বীণা

—শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—১৪—

নিভা বলিল, গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও দৈবু, দাদা আস্‌বে।

গাড়ী চলিয়া গেলে নিভা ঘরে ঢুকিয়াই গায়ত্রীর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া সানন্দে হাসিয়া উঠিল।

গায়ত্রী বলিল, না ডাক্‌লে হয়ত আসতে না?—ভাল আছ?

নিভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আর লজ্জা দিও না দিদি,—চল।

বিভা সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়া বারান্দার উপর লাফাইয়া লাফাইয়া হাততালি দিয়া পায়রাগুলাকে উড়াইবা মজা দেখিতেছিল। বারান্দার একপাশে তক্তা-পোষের উপর ব্রজেশ্বর বসিয়াছিলেন; হাততালির শব্দে হঠাৎ সচকিত হইয়া কি যেন বলিতে গেলেন, কিন্তু চোখের সম্মুখে হাস্যমুখী ক্রীড়ারতা এই মেয়েটিকে দেখিয়া আনন্দে চোখদুইটা তাঁহার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না,—একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অদূরবর্ত্তী একটা মুখি পায়রা টোঙের উপর বসিয়া ঘাড় নাড়িতেছিল, থোপা থোপা কোঁকড়ানো কালো চুলের গোছা দুলাইয়া বিভাও ঠিক তেমনি করিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, দেখ, দেখ দিদি,—কেমন ঘাড় নাড়ছে, এম্‌নি—এম্‌নি করে! দেখ, দেখ—

নিভা ও গায়ত্রী পাশাপাশি বারান্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

গায়ত্রী বলিল, বাবা! নিভা বিভা আজ ওরা দু'বোনে বেড়াতে এসেছে।

নিভা মাথা হেঁট করিয়া তাঁহাকে একটি প্রণাম করিতেই ব্রজেশ্বর চোখ বুজিয়া বোধ করি আশীর্ব্বাদ করিলেন। মুখ তুলিয়া নিভার সুন্দর মুখখানির পানে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, কোন্ গাঁয়ে বিয়ে হয়েছে মা তোমার?—আহা! একেই বলে স্বয়ং মা লক্ষ্মীর মতন রূপ!—ওইটি বুঝি তোমার মেয়ে? বলিয়াই তিনি বিভার দিকে একবার মুখ ফিরাইয়া তাকাইলেন।

তাঁহাকে আর বেশি কিছু বলিবার অবসর না দিয়া নিভার হাত ধরিয়া গায়ত্রী হাকে সেখান হইতে চলিয়া আসিবার ইঙ্গিত করিল; এবং বংশীর ছোট খানির মধ্যে লইয়া গিয়া বলিল, বাবার সবসময় মাথার ঠিক থাকে না ভাই, যে বলেন . . . বলো। কিন্তু কোথায় যে বসতে দেব তোমাদের—এই লিয়া গায়ত্রী যেন একটুখানি ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

বংশীর খাটের উপর নিভা তখন বসিয়া পড়িয়াছিল, বলিল, বেশ বসেছি দি!

গায়ত্রীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নিভা আবার বলিল, আমায় বসিয়ে কে যে দাঁড়িয়ে রইলে দিদি?

গায়ত্রীও তাহার পাশে গিয়া বসিল, কিন্তু কি যে বলিবে কিছুই সে খুঁজিয়া ইতেছিল না; যে মেয়েটির সহিত মাত্র তাহার সেই একটিদিনের দেখা-শোনা, লোক বলিয়া প্রাণ খুলিয়া তাহার সহিত সে মিশিবে কি না এ ধারণাও যাহার ছে ছিল,—আজ সেই নিভাই যে বলিবামাত্র নিজে হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে, ং শুধু ছুটিয়া আসাই নয়, কথায়-বার্ত্তায় ভাবে-ভঙ্গীতে দ্বিধা-সঙ্কোচের াথাও একটু চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।—ইহাই আজ তাহার কাছে বড় বেশি আশ্চর্য্য লিয়া বোধ হইতেছিল। তাই সে মিনিটখানেক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া লিল, সে দিন এসেছিলে, বাবার তখন অসুখ, একদণ্ডের জন্যে আমার তখন ড়াবার অবসর ছিল না।

নিভা বলিল, একা একা সত্যি ভাল লাগে না দিদি, তবু ভাগ্যিস আমার এই গানটা আছে।

গায়ত্রী বলিল, আমায় দিদি বলে কেন ডাকছ নিভা, নাম ধরেই ডাকো না?

ঘাড় নাড়িয়া নিভা কহিল, না ভাই, দিদি বলে' ডাকতে কাউকে পাইনি ানদিন,—সে অধিকারটুকু আমায় দিতে হবে। এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ থামিয়া স আবার বলিতে লাগিল, বেশ দিদি, সেই যে তোমায় প্রথমদিন দেখে গেলুম, সদিন থেকে রোজ আমি ভাবতুম, যে তোমার কাছে আসব, কিন্তু কোনদিনই য়ে উঠতো না। আচ্ছা দিদি, এই বাড়ীতে তোমরা প্রথম থেকেই আছ, না?

গায়ত্রী বলিল, হাঁ, এই বাড়ীতেই।

নিভা কহিল, বেশ ত' দিদি, এতদিন আমরা রয়েছি এখানে তবু আমাদের কেউ আর পরিচয় করিয়ে দেয়নি।

পরিচয় কাউকে করিয়ে দিতে হয় না নিভা, প্রয়োজনের দিন যখন আসে, পরিচয় তখন নিজে থেকেই হয়।

সে কথা সত্যি। বলিয়া নিভা একবার ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, তাহারপর ধীরে ধীরে বলিল, বাড়ীটা ছোট, কিন্তু বেশ সাজিয়ে রেখেছ দিদি। তোমার বাহাদুরি আছে।

গায়ত্রী বলিল, এটা ত' আমার ঘর না নিভা, এটা বংশীর। আমার ঘর—বলিয়া সে আঙুল বাড়াইয়া পাশের ঘরখানা দেখাইয়া দিল।

মাথার একটা বালিসের উপর হাত রাখিয়া নিভা বসিয়াছিল, হাতটা সে ধীরে ধীরে সরাইয়া লইয়া সম্মুখে ভাঙা-টেবিলের উপর সাজানো বইগুলার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, ছোটঘর আমার বেশ ভাল লাগে দিদি, বাবাঃ! আমাদের যা ঘর! ঝাড়ামোছা করতেই পাঁচজন লোকের দরকার। আবার দাদাটি আবার এমনি, অপরিষ্কার কিছুতেই দেখ্‌তে পারেন না।

গায়ত্রী বলিল, কিন্তু আমার বংশীটি আবার ঠিক তার উল্টো! দেখ্‌তে সে যে কি পারে আর না পারে কিছুই বোঝ্‌বার জো নেই।

এই প্রসঙ্গে তাহাদের দুটি ভাই-এর কথা উঠিল; গায়ত্রী যত না বলিল অমরেশের কথায় নিভা ততই মাতিয়া উঠিল।

তারপর, এমনি-সব ছোট-খাট নানাকথা কহিতে কহিতে নিভা হঠাৎ একসময় জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, আচ্ছা দিদি, সঙ্গীর অভাব তোমার মনে হয় না কোনদিন? কষ্ট হয় না?

গায়ত্রী ঈষৎ হাসিল।

নিভা বলিল, আমরা ত্রু ইস্কুলে পড়েছি, বন্ধুবান্ধব চিরকালই ছিল, কিন্তু তুমি ত দেখ্‌ছি এক ঝি ছাড়া কারও সঙ্গে দুটো কথা বলতেও পাও না?

গায়ত্রী কহিল, ঝি কোথায় পাব নিভা? আমি কথা বলি আমার নিজের সঙ্গে।

ধন্যি, তুমি বলে তাই পার দিদি, অন্য কেউ হলে পারতো না।

কি পারতো না নিভা?

গায়ত্রীর আরও একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া নিভা বলিল, তোমার মত এমনি সঙ্গীহারা হয়ে একলা জীবন কাটাতে।

গায়ত্রী ঈষৎ হাসিল।

নিভা মুখে কিছুই বলিতে পারিল না, গায়ত্রীর হাতখানা সে তাহার নিজের হাতের মুঠার মধ্যে বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিল।

সে ইঙ্গিত বুঝিতে গায়ত্রীর বাকী রহিল না, সেও তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া ঘাড় নাড়িল। কহিল, কোনও দুঃখু নেই।

সহজ এবং অকুণ্ঠিত তাহার এই জবাব শুনিয়া নিভা চুপ করিয়া রহিল।

সুমুখে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের দিকে পিছন করিয়া বিভা তখন আপন মনেই গুন্ গুন্ করিয়া কি একটা গান গাহিতেছিল।

নিভা কান পাতিয়া প্রথমে সে গানটা একবার শুনিয়া লইল, তাহারপর ডাকিল, ওরে ও পথ-ভোলা এক পথিক!

গান হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিদির ডাকে সে পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, পায়রা দেখেছিস্?

বিভা হাসিতে হাসিতে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিভা তাহার মাথার চুলগুলা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, কুকুর দেখেছিস?

ঘাড় নাড়িয়া বিভা বলিল, হঁ্যা। তুমি দেখবে?

নিভা আবার প্রশ্ন করিল, আজ দেখেছিস্?

না। আজ ত' দেখলুম না। কোথা গেল দিদি কুকুরগুলো? বলিয়া সে গায়ত্রীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল।

গায়ত্রী বলিল, কেন? কেন ঘরেই ত আছে। আজ দেখনি?

বিভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আজ ত' দেখলুম না তাদের?

তাহ'লে বোধকরি ওই ঘরের ভেতর ঢুকেছে। বলিয়া গায়ত্রী তাহাদের সদর দরজার পাশে খোলার সেই ভাঙা ঘরখানা দেখাইয়া দিল।

নিভা বলিল, যা দেখে আয়।

বিভা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে গায়ত্রীর হাতখানা আর একবার চাপিয়া ধরিয়া নিভা বলিল, সব কথাই ত বল্লে দিদি, কিন্তু একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব?

কি কথা বল। বলিয়া গায়ত্রী তাহার মুখের পানে তাকাইল।

নিভা ধীরে ধীরে কহিল, তোমার বিয়ের কথা,—শুনতে বড় সাধ হয় দিদি!

নিভাকে যে এইজন্যই এখান হইতে তাড়ানো হইল সেকথা বুঝিতে গায়ত্রীর

বিলম্ব হইল না, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, সে যে কতকাল হয়ে গেল নিভা, সে-সব দিনের কথা কি আর মনে আছে আমার ?

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, কতদিন ছিলেন তিনি ?

এক মাস। আমার সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হয়েছিল সেই বিয়ের সময়।

তাহ'লে বল তোমাদের আলাপ-পরিচয় কিছুই হয়নি ?

গায়ত্রী এইবার না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, একটিদিনের পরিচয়, আনার কথা না হয় ছেড়েই দাও নিভা, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সত্যিকারের পরিচয় কোথায় যে হয় তাও ত' আমার জানা নেই ভাই!

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, কোথাও হয় না ?

গায়ত্রী বলিল, সে কথা আমি কেমন করে' জানব ভাই ?

তবে এই যে বল্লে তুমি ?

কথাটা চাপা দিয়া গায়ত্রী বলিল, ও এমনি বললাম। ও কিছু নয়।

কিন্তু চোখের সুমুখে যে-কথাটা মানুষ চাপা দিয়া যায়, সেইটা জানিবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক। নিভা কিছুতেই ছাড়িল না, এই লইয়া তাহাকে সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সহিত নিভার আজিকার এই অসঙ্কোচ মিলনে, ব্যবহারে, কথায় বার্ত্তায়, তাহার মনের রাজ্যে কোথায় যেন একটা কিসের পরিবর্ত্তন হইয়েছে বলিয়াই তাহার মনে হইল, এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে আসিয়া এই যে নরনারীর মিলনের সম্বন্ধে তাহার জানিবার একটা প্রবল আগ্রহ—এ যে কোথা হইতে কেমন করিয়া জাগিতেছে, তাহাই জানিতে গিয়া গায়ত্রী শুধুই মনে হইতে লাগিল,—মেয়েটা যেন কাহাকেও ভাল বাসিয়াছে!...

গায়ত্রী বলিল, মানুষকে চেনা বড় শক্ত নিভা।

কেন দিদি ?

নিভার চওড়া শাড়ীর পাড়টা হাত দিয়ে পরীক্ষা করিতে করিতে গায়ত্রী বলিল, মানুষের মনটাকে বাদ দিয়ে বাইরের জিনিষটাকেই যারা বড় করে' দেখে, মানুষের উপর তারা অবিচার করে।

নিভা চুপ করিয়া রহিল।

গায়ত্রী বলিল, কিছু মনে করো না নিভা, আমিও যে ভুল করেছিলাম।

নিভা এইবার মুখ তুলিয়া গায়ত্রীর মুখের পানে তাকাইল।

গায়ত্রী ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতে লাগিল, প্রথমে যেদিন তোমার কথা

শুনলাম,—শুনলাম আমার গরীব ভাইটির ছেঁড়া জুতোজোড়াটি তুমি তোমার মার্ব্বেল বারান্দা থেকে নীচের নর্দ্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ, বর্ষার দিনে সে খালি পায়ে হেঁটে বাড়ীএলো,—আমার তখন এমন সঙ্গতি নেই যে—

নিভা হাত দিয়া গায়ত্রীর মুখখানা চাপিয়া ধরিল —দিদি থামো! নিভার চোখদুইটা হঠাৎ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল এবং তাহাই সে তাড়াতাড়ি গোপন করিবার নিমিত্ত হাত ছাড়িয়া দিয়া ছেলেমানুষের মত গায়ত্রীর কোলের উপর সে তাহার মাথা লুটাইয়া দিল।

গায়ত্রী সস্নেহে তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিল, আজ সে ভুল আমার কেটে গেছে নিভা, বড় লোক বলে তোমার বিরুদ্ধে কত কথাই না ভেবেছিলাম সেদিন।

মুখোমুখি যে কথাটা বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, আড়াল হইতে তাহা উচ্চারণ করা অনেক সময় সহজ হইয়া ওঠে। গায়ত্রীর কোলে মুখ রাখিয়া নিভাও তাই বলিয়া উঠিল, এবার আমায় ভালবাসতে পারবে ত' দিদি?

কেন পারব না নিভা,—ভাল ত' বেসেছি। বলিয়া গায়ত্রীও তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, নিভা!

এমন সময় দরজা ঠেলিয়া বিভা ঘরে ঢুকিতেই নিভা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

গায়ত্রী বলিল, কি রে? ছুটে' এলি যে?

বিভা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেখ দিদিমণি, আমায় ডাকছে ওরা, বলছে—আয়, আয়, আমাদের ঘরে খেলা করবি আয়।

গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, কে?

এই যে, দেখ না, এসো না তুমি,—এই যে ওদের ছাতে। বলিয়া গায়ত্রীর একখানা হাত ধরিয়া বিভা টানিতে লাগিল।

গায়ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, কে রে,—কে? কোথায়?

ওই যে। দেখতে পাচ্ছ না? বলিয়া দরজার নিকট হইতে রান্নাঘরের প্রাচীরের ও-পাশে ছোট দোতালা ঘরখানির দিকে সে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল।

ও, ওরা? আচ্ছা তোমায় যেতে হবে না বিভা, আমিই ওদের ডেকে দিচ্ছি।—এই বলিয়া গায়ত্রী বাহিরে উঠিয়া আসিল এবং হাতের ইসারায় তাহাদের ডাকিয়া দিয়া সে পুনরায় তাহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

নিভা তখনও নতমুখে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল।

গায়ত্রী বলিল, আর! ওই এক হতভাগা ছেলে ওরা!

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, কে দিদি? ওরা কে?

সে এক বড় দুঃখের কাহিনী ভাই! ওদের মা মরে গেছে তাই এই মামার বাড়ীতেই থাকে ওরা। মেয়েটির নাম ছিল চারু—বেশ মেয়েটি। আমাদের প্রায় এক সময়েই বিয়ে হয়েছিল দুজনের! চারুর বয়স তখন ন'দশ বছরের বেশী হবে না। তের বছরে তার ওই বড় ছেলেটি হয়,—তার পরেই আবার! ষোল বছর তখনও তার পেরোয়নি। সেই বারেই শেষ!—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই একটুখানি থামিয়া গায়ত্রী আবার বলিতে লাগিল, আর! সে যে কি কষ্ট নিভা, চোখে না দেখ্‌লে বোঝা যায় না। আমি দেখতে গিয়েছিলাম চারুকে—এই পাশের বাড়ী। এখনও মনে হচ্ছে যেন চোখের সুমুখে ভাসছে! মরবার সময় চারুর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না,—চোখ দিয়ে দর্ দর্ করে' জল গড়াচ্ছিল শুধু! প্রসব হবার পরেই সে মরে গেল। স্বামী তার পশ্চিমের কোথায় একটা কোন কারখানায় চাকরি করে,—মরবার সময়ও আসেনি,—তারপর শুনছি নাকি ছেলে দুটোকে দেখ্‌তেও সে আর আসে না।

নিভা একদৃষ্টে বংশীর টেবিলের দিকে তাকাইয়া রহিল।

(ক্রমশ)

ম্যাক্সিম গর্কী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

(১)

ম্যাক্সিম গর্কীর সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে রুষিয়া ও রুষ সাহিত্যের রূপ ও ধারার বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। কেন না রুষিয়া ও তাহার সাহিত্য ইউরোপ কেন জগতের যে কোনও দেশের রূপ ও সাহিত্য হ'তে সম্পূর্ণ আলাদা। এবং রুষিয়ার অন্তরখানি রূপ নিয়ে উঠেছে বর্ত্তমান রুষিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ম্যাক্সিম্ গর্কীতে।

Madame Jarintzov তাঁর রুষীয় কবিগণের বিখ্যাত জীবনীতে এক জায়গায় বলেছেন,—Our land is a land of extremes, রুষিয়া চরমতার জন্মভূমি। শীতকালে সমস্ত দেশ সদা সর্ব্বদা এক গভীর নিরুদ্ধ তুহিনে আচ্ছন্ন। সে শীতের স্পর্শ পেয়ে একদিন দিগ্বিজয়ী ফরাসী-সম্রাটও এ দেশ জয়ের আশা ত্যাগ করে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গ্রীষ্মে এত উত্তাপ যে, গর্কীর গল্পের কোন নায়কই বলছে—Bloody, we sweat like pigs.

ধরণী বিপুল অপব্যবহারে এখানে দিগ্বিদিগব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। Steepe রুষসাহিত্যের যেন Mount Parnacus. রুষিয়ায় এমন লেখক জন্মে নাই যে একদিন এই Steepe-র কোলে দাঁড়িয়ে উপরের দূরপ্রসারিত আকাশের দিকে চেয়ে মনে মনে বিস্ময় সঞ্চয় করে নাই—এবং সে বিস্ময় আবার প্রকাশ করে নাই।

মানুষের মনের ও দেহের যত প্রকার বিকৃত পরিণতি হ'তে পারে এখানে সে সমস্তই এক অতি বৃহৎ-আকারে ফুটে আছে। যে দুঃখ অন্য কোথাও পারিপার্শ্বিকতার সাহায্যের অভাবে ফুটে ওঠে না কিংবা যে দুঃখ সঙ্কোচে ও লজ্জায় হীন দাসত্বের অঙ্গে আত্মগোপন করে, কিংবা নিত্য নিত্য যে দুঃখ বিলাসিতাজীর্ণ সভ্যতার যাত্রী নগরীর পথে পথে প্রাণ রাখিয়া পরিত্যক্ত অসংখ্য জঞ্জাল-কঙ্কালের মত মাত্রার হীন লজ্জায় লুক্কায়িত, কোথাও সুপ্ত, রুষিয়ার সাহিত্যে তারা

জাগ্রত ; তারা যেন ধরণীর বিদ্রোহের বাণী আকাশের দিকে ধরণীর বাণিত বিপুল জিজ্ঞাসার মত উঠেছে।

সামান্য একটা পতঙ্গের ডানায় যেমন অণুবীক্ষণের সাহায্যে অসংখ্য রূপ ও বর্ণের অস্তিত্ব স্পষ্ট দেখা যায়—তেমনি এখানে মানুষের মনের অগম-লোকের সমস্ত বুদ্বুদ্ গুলি অতি স্পষ্ট ও বৃহৎ-আকারে পরিলক্ষিত হয়। এখানে জীবনে অবসাদ, শিরায় রক্তের সঙ্গে মিশে আছে ; কিন্তু আপোস নাই। দুঃখ যেন বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের মত জীবনকে সর্বদাই কিরান দিচ্ছে।

বিংশশতাব্দীর ধরণী দুঃখের শবাসনে ব'সে মুক্তির ধ্যান করছে। আজ দুঃখ অনিবার্য। বিভিন্ন নগরীর পথে পথে আজ লোক অনাহারে অশিক্ষায় রাত্রি থেকে রাত্রিতে চলেছে। অভাবের অভ্যস্ততায় তারা অধিকাংশস্থলে অভাবকে অবজ্ঞা করে বা নিরুপায় ভাবে মেনে নেয়। কিন্তু রুশসাহিত্যে দেখা যায় একটা সামান্য কৃষক সে-ও তার একটি মুহূর্তের বিফলতাকে অত সহজে মেনে নিতে চায় না। সে নিজেকে মানুষ ব'লে ভয়ানক ভাবে জানে। তাই প্রত্যেক বিফলতা সর্বদাই তাকে বিদ্রোহের জন্য উন্মুখ করে। তার ও নিভৃত চিন্তার সঙ্গে Czarএর জীবন মৃত্যু জড়ান থাকে।

এখানকার মানুষ যেমন অত্যন্ত নিষ্ঠুর তেমনি আশ্চর্য্য কোমল। অন্তরের একধারে এদের মাংসলোভী দানবের বাস, অন্যদিকে আকাশস্পর্শী দেবতার মন্দির। জীবনে এমন কোন জঘন্য কাজ নেই যা' এরা সহজে করতে পারে না, জগতে এমন কোন মহত্ত্ব নেই যা তারা অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করতে জানে না। তাই এই অদ্ভুত চরিত্রের সমাবেশে রুশসাহিত্য এক অপূর্ব মানবচরিত্রের লীলাভূমি হয়েছে। Realism ও Idealism এখানে এক নীড়ে বাস করে।

রুশিয়া প্রায় এক শতাব্দী ধ'রে তার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য যায়। এই একটি শতাব্দীর জীবন নিয়ে বর্তমান রুশ সাহিত্যের সৃষ্টি। মনে হয় রুশসাহিত্য জন্মগ্রহণ করে—১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর, যেদিন রুশসম্রাট—নিকোলাসের আজ্ঞায় শতাধিক রুশিয়ার প্রতিভাবান্ যুবক এক সঙ্গে সুদূর সাইবেরিয়ায় কঠোর চির-নির্বাসনে দণ্ডিত হয়েছিল। এই দিনকে অমর করে Merezhkovsky "14th December" নামক অপূর্ব নভেল লেখেন।

এই একটি শতাব্দীর মধ্যে সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে অসংখ্য মত ও চিন্তার ধারার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের মনকে নিংড়ে, ছিন্ন ভিন্ন ক'রে, ব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত ক'রে—মানুষকে কখন আকাশে তুলে, কখন অতল তলিয়ে ফেলে, আধুনিক

মানুষের শাস্ত্র তৈরী হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এবং সে শাস্ত্র যেখানে তৈরী হচ্ছে ইউরোপের অন্য সমস্ত দেশের তুলনায় সে জাতি শিশু ও অৰ্দ্ধজাগ্রত। Norway ইউরোপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ realistic drama দিয়েছে, Russia মানবের ও সমাজের গভীরতম বাণীকে মূর্ত্তি-দেবার সাধনায় এক অভিনব সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে।

রুশসাহিত্য দুঃখের সংহিতা। এ দুঃখ যেন মানবের আদিম সহচর। ধরণীর বিবর্ত্তনের বেগে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাবে এই দুঃখের স্পর্শে আসে। বারে বারে মানব সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে চায়—এই দুঃখের উপরে উঠতে, তাকে জয় করতে, মানব চায় মুক্ত হ'তে। তাই যুগে যুগে ব্যথিত মানব চলেছে তার বোধিদ্রুম মূলের সন্ধানে যেখানে হয়ত তথাগত পরমায় নিয়ে আছে তার বোধি-সত্ত্বের জন্য। রুশসাহিত্য এই পথে চলেছে একটা পূর্ণ শতাব্দী ধরে। এবং এই পথে যতগুলি বোধি-সত্ত্ব আত্মাহুতি দিয়েছে তার সর্ব্বশেষ Maxim Gorky.

২

Gorky মানে তিক্ত। প্রথম জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার জন্য maxim এই নাম গ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম Alexi Maximich Peskov- তাঁর বাল্য জীবন Knut-Hamsun এর মত নিদারুণ দুরবস্থায় অতিবাহিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ Nizni Novgorod-এ গর্কী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বাগানের কাজ করতেন এবং মা একজন সাধারণ কৃষক রমণী ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে গর্কী পিতৃহীন হন এবং তাঁর মাতামহের কাছে যান। এই বৃদ্ধ মাতামহটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। In the World-এ এই সময়কার বহুস্মৃতির কথা লেখা আছে। নয় বছর বয়সে মা মারা যাওয়ার পর গর্কী এক জুতার দোকানে বেয়ারার কাজ করেন। In the World-এ দেখতে পাওয়া যায় কেমন ক'রে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে এই শিশুর মনটি ক্রমশঃ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর অগ্রসর হয়ে চলেছে। পনেরো বছরের মধ্যে বাসীগিরি থেকে আরম্ভ ক'রে এমন কোনও কাজ নেই যা' গর্কীকে করতে হয় নাই। অবশেষে এক জাহাজে বাবুর্চির চাকরী পান। সেখানে Smaire নামে আর এক বাবুর্চির কাছে গর্কী একদিন "The Lives of Saints" এবং Gogol এর বই দেখতে পান। বাল্যে মাতামহের কাছে গর্কী সামান্য লেখা পড়া শিখেছিলেন। অতি আগ্রহে গর্কী পড়তে আরম্ভ করলেন।

Gogol রুষগদ্য-সাহিত্যে যেমন প্রথম স্রষ্টিকর্তা, গর্কীর জীবনেও প্রথম তিনিই সাহিত্যের দীপশিখা ধরে দিয়েছিলেন। এই সমস্ত বই প'ড়ে গর্কীর পড়বার স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল হয়। তাই তিনি Kazan শহরে এসে এক স্কুলে ভর্ত্তি হ'তে চেষ্টা করেন। তাঁর জীবনের এই অধ্যায় থেকে "Remini-scences of My Youth" আরম্ভ। কিন্তু অর্থাভাবে তা অসম্ভব হওয়ায় সে আশা ত্যাগ ক'রে অবশেষে এক রুটীওয়ালার কারখানায় অতি অল্প বেতনে এক চাকরী পান। সারাদিন রাত্রি এই কারখানায় জীবন এক তিক্ত বৈচিত্র্যহীন গতিতে অতিবাহিত হ'ত। বাহিরে রাত্রি হ'ত, আবার প্রভাত হ'ত কিন্তু এই কারখানার কারাগারে একটি বিষাক্ত ধূম্রকলিন তিমির সমস্ত আচ্ছন্ন ক'রে থাকত। Twenty-Six men and a Girl এই কারখানার স্মৃতি।

এখান থে'কে কোন রকমে অব্যাহতি পেয়ে তিনি Volgaর ধারে জেটীতে কাজ সুরু করেন। এই সময়ে কাজের অবসরে যা বই পেতেন পড়তেন। এখান থেকে শেষে রেলে চাকরী নিয়ে তিনি বিশ বছর বয়সের সময় সৈন্য হবার জন্য Nizni Novgorod এ আসেন। যে কোন কারণে যোদ্—সৈন্য হ'তে হ'লে যে সব পরীক্ষা দিতে হয়—তাতে অনুত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি Lanin নামে এক উকীলের সেক্রেটারীর কাজ পান। এই Laninএর নিকট তিনি তাঁর সমস্ত শিক্ষার জন্য ঋণী। কিন্তু বেশীদিন এমনি সুস্থির হয়ে থাকা গর্কীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাঁর রক্তে যেন দূর পথের ডাক মিশিয়ে ছিল। এই যৌবনে তিনি পথে নামলেন। সমস্ত রুষিয়া পদব্রজে পরিভ্রমণ ক'রে বেড়ালেন।

সমাজত্যক্ত পতিতগণের মধ্যে—গৃহহারা পথবাসী পথিকদের মধ্যে তাঁর দিন অতিবাহিত হ'তে লাগল। এই সময়ের অভিজ্ঞতা Maxim Gorkyর সাহিত্য সৃষ্টি বিষয়ে প্রধান সহায়তা করে। এই সমস্ত সমাজ পরিত্যক্ত পথবাসী মানুষের দল তাঁর গল্পের নায়ক। সমস্ত দক্ষিণ রুষিয়া পরিভ্রমণ করবার পর তিনি যখন Tiflis নগরে এসে পৌঁছিলেন তখন সেইখানে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। Maxim Gorky নাম দিয়ে তিনি তখন ক্রমাগত ছোট গল্প লিখতে থাকেন।

তখন রুষিয়ার অন্য সমস্ত সাহিত্যিকগণের সঙ্গে Maxim Gorkyর পরিচয় হয় নাই। কিন্তু তৎকালীন রুষিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক V. G. Korolenko Tchekov, সাহিত্যে এই নবাগত প্রতিভাকে প্রথমেই চিনতে পেরেছিলেন,

এবং Korolenko আপনি Gorkyর সঙ্গে পরিচয় ক'রে তাঁকে রুষিয়ার সাহিত্য সমাজে পরিচিত ক'রে দেন। Reminisscences of My Youthএ Korolenkoর সহিত পরিচয় ব্যাপার নিয়ে একটি আলাদা অধ্যায় আছে। তার পর ক্রমশঃ গর্কীর সহিত Tchekov, Tolstoi প্রভৃতির পরিচয় হয়। এবং শেষে Tchekov—এর সহিত তাঁহার পরিচয় বন্ধুতায় পরিণত হয়েছিল। Tchekov-এর চিঠিতে এই দুই বন্ধুর অন্তরের বহু কথা লিপিবদ্ধ আছে। Tolstoiএর জীবনের অন্তিম প্রহরে গর্কীর অভ্যুদয় হয়। Tolstoi গর্কীকে সহ্য ক'রতে পারতেন না। বহুত সমাজের নিম্নস্তরে যে পঙ্কিলতা লুকিয়ে ছিল—তাকে সমাজের উপরে তুলে আনায় গর্কী সাহিত্যে যে বিষ-তিক্ততার সৃষ্টি করেছিলেন—জীবনের অন্তিম প্রহরে ঋষি Tolstoiএর চক্ষে তা' বিপদজনক লাগত। তাই তিনি একবার Tchekovকে বলেছিলেন "Do you know—that man (Gorky) has only one God and that is Satan ?"

গর্কী কিছুকালের জন্ম সাহিত্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯০৫ খৃঃঅব্দে যে বিদ্রোহ সমস্ত রুষিয়াকে কম্পান্বিত ক'রে দিয়ে গে'ছে তার একজন প্রধান অধিনায়ক গর্কী। এই সময়ে গর্কীর সহিত Leonid Andreyeff—এর পরিচয় হয়। দুইজনের সম্পাদকতায় বিদ্রোহের বাণী সমস্ত লোকদের মধ্যে প্রচারিত হয়। সেই বৎসরেই তিনি বন্দী হ'ন এবং পরে রুশিয়া থেকে নির্বাসিত হ'ন এবং Italyতে যান। ১৯১৭ খৃঃ অঃ বিদ্রোহের পর আবার তিনি রুষিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। এবং রুষিয়ার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্ম সমস্ত জীবন মন উৎসর্গ করেন। Bertrand Russel—Theory and Practice of Bolshivism-এ দুই একটি কথায় Gorkyর এই সম্বন্ধে যে ছবি দিয়েছেন—সে অপূর্ব। তিনি বলেছেন—সমস্ত রুষিয়ার মধ্যে এই একটি মানুষ দেখলাম—যে সাহিত্য ও শিল্পকে আজও এ দেশে বাঁচিয়ে রেখেছে। হয়ত Gorkyর সঙ্গে সঙ্গে রুষ—সাহিত্য ও শিল্প বিদায় নেবে। হয়ত তাঁর আশঙ্কা অমূলক।

(৩)

গর্কী সাহিত্যে যে মানুষটিকে ফুটে ধরেছেন তার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় নেই। তিনি সমাজের অতি নিম্নস্তর হ'তে কাদামাটি মেখে স্বর্ণ আবিষ্কার

করেছেন। রুষিয়ার সমাজপরিত্যক্ত, নিরন্ন অসভ্য মানুষের মনকে তিনি মানুষের সমাজের উপরে উত্তোলন করে সেই ছিন্ন-মলিন অপদস্থ-মনুষ্যত্বের মধ্যে বন্দী দেবতাকে মুক্তি দিয়েছেন। দেবতাকে দেখিয়েছেন। মানবতার যে মহৎ অংশ চিরদিন আপনার বিশাল সংক্ষুব্ধ জীবনকে প্রকাশ করতে পারে না, যে সমস্ত শক্তি ও চিন্তা, ক্ষেত্রের অভাবে সমাজের অপব্যয় ও ক্ষতিতে পরিণত হয়—গর্কী তাদের প্রতিনিধি হ'য়ে সাহিত্যে প্রবেশ করেন। জগতের যে বিপুল অংশ মূক হয়ে ম'রে যায়—তিনি সেই বিশাল জগৎকে মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা করেছেন। তাদের অন্তরের সমস্ত আশাকে তিনি ভাষা দিয়েছেন। তাঁর দুঃখের মরুপথ বেয়ে তিনি মানুষের মনের আর একটি নূতন জগৎ আবিষ্কার করেছেন।

গর্কীর গল্পের মধ্যে প্রধান কতকগুলি—Creatures that were once men, Twenty-six men and a girl, My fellow-traveller, Through Russia, এবং Tales of two countries.

গর্কী যাদের কথা বলেছেন তাদের জীবন ভয়াবহ। অনন্ত দুঃখের বোঝা তাদের মাথায়,—কিন্তু তারা সমস্ত দুঃখের উপরে দাঁড়িয়ে বলতে পারে—ভয় করি না। তাই গর্কীর সমস্ত লেখার উপর একটি ভয়াবহ গম্ভীর কৃষ্ণছায়া মৃত্যুর মত নির্ম্মমভাবে লুকিয়ে আছে। Through Russiaতে Nilushkaকে মানব মনের এত ভয়াবহ সুন্দর চিত্র অন্য কোথাও চোখে পড়ে না। সত্যি-কারের মানুষ একইকালে কতদূর নিষ্করুণ ও কোমল হ'তে পারে—কতদূর অবক্ত ও সুন্দর হ'তে পারে—এই জগতে সৌন্দর্য্যের কি ভয়ানক অপচয় নিত্য ঘটে—Nilushka তার পরিচয়। গর্কীর নায়কেরা সকলেই এক সময়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ ছিল, মাঝে মাঝে হঠাৎ অবসরে দূরের আকাশের রক্তিমতার দিকে চেয়ে তাদের মনে জাগে, এক সময়ে তাদের একটি ঘর ছিল; একটি আর্ত্ত স্নেহ নিত্য সেবায় আনন্দ দিত—, তারপর যখন সহসা গগনে সূর্য্য ডুবে যায়—আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে, ক্ষুদ্র জীর্ণ ঘরের ভেঙে-পড়া ছাদের অন্ধকার কবরের ছায়া ব'লে তাদের মনে হয়, অন্ধকারে চামচিকার ডানা মারে শাপে মৃত্যুর স্পর্শের মত—তারা উন্মাদ হ'য়ে উঠে। এবং এই উন্মাদনার ঘোরে তারা যে সমস্ত কথা বলে, জগতের ইতিহাসে কখনও সে কথা বলা হয় নাই।

অনেকে দুঃখ করেন Gorkyর গল্পের কোন form নাই। Gorky

ফরাসী Realism এর অনুকরণে গল্প লিখতে বসেন নাই। সত্যকারের জীবন Maupassantর গল্পের মত চলে না। গল্পে যেমন ঘটনা লেগে জুড়ে আসে জীবনে সে রকম আসে না। লেখক তাকে প্রয়োজন মত সাজিয়ে নেন। Realistic লেখকদের তাই প্রয়োজনের মত মালমশলা জীবন থেকে নিতে হয়—এইটির পর এইটি হ'লে ঘটনার সাহায্য হয়—এইখানে শেষ হ'লে পরিণতি জোরাল হয়। অনেক সময় শেষ কথাটিতে গল্প নির্ভর করে। কিন্তু গর্কী সে দিক দিয়ে লেখেন নাই। তিনি যা জীবনে দেখেছেন সমস্ত বলে চলেছেন। অনেক সময় তাতে মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেছে, হয়ত একটি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের রূপ, হয়ত দিনান্ত-রবির মৃত্যুছবি, অঙ্কিত হয়ে উঠেছে; আবার কোথাও গল্প জমে উঠেছে—আবার কোথাও আকাশ ও আলোর অবসর। তাই গর্কীর সমস্ত গল্পে মানুষের সঙ্গে আকাশকেও দেখতে পাই—মানুষের মনের গতির সঙ্গে সমুদ্র তরঙ্গের ছন্দ শুনি। সমুদ্র ও আকাশের সঙ্গমে—এই দুই অসীমের ক্রোড়ে এই সমস্ত ভয়াবহ মানবের চিত্র এক অপূর্ব রহস্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। Chelkash এ তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে—দুটি মানব মনের যে নাটকখানি অভিনীত হয়েছিল, উপরের শশীতারাহীন মৌন আকাশ তাকে আরো রহস্যময় করেছিল। গর্কীর গল্পের আর একটি বিশেষত্ব যে তাঁর নায়কেরা কোন প্রথামত একটানা কথাবার্তা বলে না। একটা মেলার মধ্যে যেমন চারিদিক থেকে কথা আসে তেমনি গর্কীর গল্পের নায়কগণের কথাও বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্নদিককে আশ্রয় ক'রে আসে, কেউ অর্দ্ধস্ফুট, কেউ অসংলগ্ন। অথচ এই সমস্ত কথাগুলি নিয়ে একটি সুন্দর সঙ্গতি ফুটে উঠল।

গর্কীর নভেলের মধ্যে দুইখানি প্রধান—Spy এবং Mother. এই দুইখানিই ১৯০৫ সালের রুশিয়ার বিদ্রোহের ছবি। এই বই দুইখানি পড়বার আগে মনে রাখতে হবে যে পনর বছরের মধ্যে এই বিদ্রোহের জন্য রুশিয়ায় একই পথ বেয়ে আট লক্ষ লোক সাইবেরিয়ায় চির-নির্বাসনে স্বদেশ থেকে অপসৃত হয়। Spyএ রাজতন্ত্রের দিক দিয়ে এই বিদ্রোহকে দেখা হয়েছে। Motherএ জনসাধারণের মধ্যে থেকে বিদ্রোহের মূর্ত্তিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এত সত্য ও নিখুঁতভাবে সাধারণের মনের ও চিন্তার বিশ্লেষণ করতে কোন নিপুণ ঐতিহাসিক ও সমর্থ নন্। Mother বিংশশতাব্দীর সাহিত্য জগতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। গণতন্ত্রের বেদ।

১৯০৩ সালে গর্কী একখানি নাটক লেখেন—তার নাম The Lower

Depths. ঘটনাস্থল একটী জীর্ণ রাত্রি-বাস, ভবঘুরে, চোর ইত্যাদির আবাস-স্থল। সেখানে একজন আছেন যিনি এক সময়ে নাকি ভাল অভিনেতা ছিলেন—আর একজন নিজেকে Baron বলে পরিচয় দেন, একজন চোর, একজন মুচী, আর একটি মুমূর্ষু নারী—এদেরি মধ্যে আর একজনের স্ত্রী, নাম Anna, এবং Luka নামে এক তীর্থযাত্রী। এরা সকলেই জীবনে পরাজিত, এবং প্রত্যেকের মনে এক একটি মিথ্যা আশা আছে যার সঙ্গে তাদের জীবন মরণ জড়ান।

এই সমস্ত লোকের আশা নিরাশার মাঝে Anna দিনান্ত রবির অস্তরেখার মত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। তার মৃত্যুকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না। Anna যেন মানবের পরিত্যক্ত বিমলিন সৌন্দর্য্য,—মানুষের অন্তরধন, দুর্দ্দম মানবের পঙ্কিল ব্যর্থ-জীবনের মধ্যে নিঃশব্দে অগোচরে সে লুপ্ত হয়ে গেল।

নাটকখানি একটি আশ্চর্য্য জিনিষ। জীবনের ঊর্দ্ধে উঠে যদি দেখা যেত তাহলে বোঝা যেত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে একই সময়ে যে মহানাট্য রচনা হয়ে চলেছে—এ তারি প্রতিকৃতি। সে নাটকে দেখা যায় অস্ফুট বেদনার একটি শব্দ, কখনও নিঃশব্দতা, আলাপের সমান রসোদ্দীপক। একটি বাড়ীতে এক সঙ্গে যে অভিনয় হয় এ তারি রূপ।

Gorkyর সাহিত্যে যদিও দুঃখ ধাত্রীর মত দোলা দিয়েছে তবুও মনে হয় এই সমস্ত লেখার মধ্য হতে যেন লেখকের ব্যথিত হৃদয়ের একটি প্রার্থনা আকাশের দিকে উঠছে—মানবের মঙ্গল কামনার নিমিত্ত। সে প্রার্থনা যাবে যাবে বলছে—Yevseyএর মত—"It will pass away—" "এ রাত্রি প্রভাত হবে।" গর্কীর সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে দেখেছি একটি বৃহৎ রেখাহীন জ্যোতিঃ পাখী উপমাস্থলে সর্ব্বত্র আছে। রাত্রি যেন সেই বিহঙ্গের পক্ষের বর্ণ, দিনান্ত রবি যেন বাণ-বিদ্ধ রক্তাক্ত সেই পক্ষী, দূরে সমুদ্রের তরঙ্গের গর্জন—সে যেন সেই বিহঙ্গমের আকাশ যাত্রার শক্তি-শব্দ। হয়ত সে বিহঙ্গম বীর বাহন—বীর কমণ্ডলুতে অমৃত আছে।

নৈয়ায়িক

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম, পথে দেখি আমাদের এক বন্ধু একটি দীপাধারের কাছে দাঁড়াইয়া। জানিতাম সে আমেরিকা গিয়াছে, অনেক দিন তাহাকে দেখি নাই। শুনিয়াছিলাম সে প্রচুর পাণ্ডিত্য ও প্রচুরতর উপাধি সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিয়াছে। বিদ্যা যে তাহার বিপুল হইয়াছিল তাহা তাহার পেটটি দেখিয়া আর সন্দেহ রহিল না কারণ বিদ্যার স্থান নাকি পেটেই! অল্প পরিবর্তনের মধ্যে দেখিলাম তাহার চোখে এক জোড়া চশমা ও মুখে ফরাসী ধরনে ছুঁচাল খানিকটা দাড়ি। যাহারা আমেরিকা ফেরৎদের আগা গোড়া পরিবর্তন দেখিবার আশা করিয়া থাকেন তাহারা নিরাশ হইবেন সন্দেহ নাই! বন্ধুর বাহ্যিক পরিবর্তন এই রকম, জানি না ভিতরে আর কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে কি না!

বন্ধুটির সাথে অনেক দিন পরে দেখা হওয়াতে তাহার উন্নত উদরের উপর একটা কর-সন্তাপন করিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। হঠাৎ কালো চশমা খুলিয়া গেল এবং অপরিচিত কণ্ঠে বিজাতীয় ভাষায় লোকটি গর্জ্জন করিয়া উঠিল "হউ—ড্যা—ড!" এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা গর্জ্জনের অনুপাতে বর্ষণ করে না, তাই রক্ষা পাইলাম। বে-রকম বেগে ইংরাজি কথা দুইটি বিস্ফোরক পদার্থের মত বাহির হইয়া আসিল মনে মনে বিপদ গণিয়া ভাবিলাম না জানি কি হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বিশেষ কিছুই হইল না। লোকটি বিশুদ্ধ বাংলায় বলিল "এই ব্যবহারের অর্থ কি?" অর্থ যে কি তাহা অর্থ না থাকিলে বুঝানো কঠিন। কাজেই ত্রুটি স্বীকার করিয়া ভুলের জন্য ক্ষমা চাহিলাম। লোকটি বলিল, ভুল আপনার হ'তেপারে কিন্তু "ধড়ি" টা যে আমার তা'তে কি ভুল আছে? আমি আমার ভুলটাকে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলাম:—দেখুন মশায়, এই সহরে যত লোক আছে প্রত্যেকেরই খানিকটা করিয়া স্বতন্ত্র জায়গা আছে, বাড়ী ঘর আছে। একজন যদি অপর জনের জায়গায় বেদখল করে তবে তাহাকে

জোর করিয়া সরাইবার অধিকার আছে কিনা ? লোকটি দাড়ির মধ্যে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে বলিল, নিশ্চয় । আমি বলিলাম, আপনি পথে চলেছেন আপনার খানিকটা জায়গার উপরে স্বাভাবিক দখল আছে । কিন্তু আপনার "ছড়ি" টি অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠে সাধারণের জায়গা বেদখল করেছে । এখন আপনিই বলুন যদি আমি সেই জায়গার ক'র সঙ্কোচন করে থাকি তা হ'লে সেটা ন্যায় হয়েছে কি অন্যায় ? লোকটির মুখে প্রশংসমান হাসি দেখা দিল এবং আমার পিঠে চাপড় দিয়া বলিল "কোয়াইট সো ।" এমন সুন্দর লজিক্যাল ব্যাখ্যা শুনিনি । যাক্ আপনার অভদ্রতা মাপ করা গেল ।

আমি লোকটির ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম ।

সে বলিতে লাগিল "লজিক হচ্ছে জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ । এই 'ইডেন অব লজিক' থেকে আমরা চ্যুত হয়েছি বলেই দেশের এমন দুর্দ্দশা । এত দিন কল্‌কাতার পথে পথে ঘুরছি মশায়, আপনার মত এমন লজিকাল 'হেড' কারো দেখিনি । দেখুন দেখি এই অভদ্র ব্যাপারটাকে এমন একটু লজিকের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলেন, সব জিনিষটা কেমন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল । পাহাড়ের উঁচু চূড়ার যেমন বরফরাশি থাকে তেমনি সিভিলাইজেশনের উচ্চ চূড়াতে এই লজিক জ্বল জ্বল করতে থাকেন । অন্যান্য বিদ্যা হচ্ছে গাছ পালার মত তা মাটি থেকে গজায় । আর লজিক হচ্ছে বরফের মত, তা উপর থেকে পড়ে । তাঁহার এই অপূর্ব্ব উপমা শুনিয়া মনে ভাবিলাম কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়, লজিকের বরফ পড়িলে অন্যান্য বিদ্যার গাছ পালার সাধ্য কি মাথা তোলে ।

লোকটি বলিতে লাগিল, দেখুন না কেন গ্রীক সিভিলাইজেশনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এরিষ্টটলের লজিক । আর আমাদের নবদ্বীপের নব্য ন্যায় । এটা একটা সামান্য ব্যাপার নয় যে অত বড় বড় পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত ঠাউরে উঠ্‌তে পারলেন না, তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল । আপনি কি ভাবেন এ রকম একটা ব্যাপার আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে হ'তে পারত ? কখনই না । কারণ সহজ জিনিষকে সহজ ভাবে বোঝাটা মনের জড়তার পরিচয় । বুদ্ধি যখন সূক্ষ্ম হয় তখনই এই সব সামান্য প্রভেদ চোখে পড়ে । সিভিলাইজেশন বড় সূক্ষ্ম জিনিষ ।

আমি তাহাকে এড়াইবার চেষ্টায় বলিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় আনন্দিত হ'লাম ।

সে আমাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কিন্তু আপনাকে সহজে ছাড়ছি না । আপনি ভাবছেন লজিকের জন্য যে এত আগ্রহ সেটা বুঝি, আমার শুধু মৌখিক

তা নয়। তবে তার খানিকটা যে মৌখিক তা আমার এই দাড়ি দেখেই বুঝতে পারছেন।

স্বীকার করিতে হইল বুঝিতে পারি নাই। কারণ ফরাসী ধরনে ছুঁচাল দাড়ির সঙ্গে এবং ন্যায় শাস্ত্রের সঙ্গে মিল যে কোথায় তাহা হঠাৎ আবিষ্কার করা দুরূহ।

লোকটি আমাকে টানিয়া লইয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল, একটা কথা জেনে রাখুন, আমি একখানা লজিকের বই লিখছি, তার মূল কথাটা এই জগতে দুটো জিনিষ আছে, একটি ন্যায় আর তা ছাড়া যা কিছু সব অন্যায়। কেমন না, আমি কি মিথ্যা কথা বলেছি? কথা বলিতে বলিতে আমরা ট্রামের লাইনের ধারে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। একখানা ট্রাম আসিয়া পড়িল, কিন্তু সেখানে তাহার থামিবার কথা নহে। লোকটি দেখিলাম চলন্তি ট্রামে উঠিতে নারাজ। সে তীব্রস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, বাঁধো বাঁধো। কিন্তু ট্রাম-চালকরা বোধ হয় যথেষ্ট লজিক্যাল না হওয়াতে ট্রাম বাঁধিল না। অগত্যা আমরা ট্রাম যেখানে চীৎকার না করিলেও বাঁধে এমন একটা জায়গায় আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এবার ট্রাম আসিয়া পড়িতে আমি উঠিয়া পড়িলাম কিন্তু লোকটি দেখি নীচে দাঁড়াইয়া স্বগত উক্তিতে বলিতেছে "জেড ইজ" ওয়ান, টু, থ্রি। আমি বলিলাম, উঠে পড়ুন, এখনি ছেড়ে দেবে। ট্রামে উঠিয়া দু'জনে বসিলে ট্রাম ছাড়িল। টিকেট বিক্রেতা নিকটে আসিলে লোকটি আমাকে বলিল, দু'খানা কাওড়া ব্রিজের টিকিট্ নিন্‌তো! আমি তো অবাক্! কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলাম অবাক্ হইবার কিছুই নাই কারণ একটু আগেই শুনিয়াছি জগতে দুইটি মাত্র জিনিষ আছে একটি ন্যায় অপরটি অন্যায়। লোকটির ইহাতে কোন দ্বিধা দেখিলাম না। সে অক্লেশে এরিষ্টটলের লজিকের মধ্যে ডুব দিল। এবং আমি তাহার প্রশ্নের উত্তরে যথাক্রমে না এবং হাঁ বলিয়া যাইতে লাগিলাম।

ট্রাম বড় বাজারের মধ্যে আসিয়া পড়িতেই লোকটি আমাকে টানিয়া লইয়া নামিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল কিন্তু ট্রাম তখনি ছাড়িয়া দিল, তাহার নামা আর হইল না।

এই রকম তিন চারিবার নামিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে এক জায়গায় চইজনে নামিয়া পড়িলাম। সে আমাকে টানিয়া লইয়া একটি চায়ের দোকানে ঢুকিল। একটু আগেই ট্রামের টিকিটের যে নমুনা দেখিলাম তাহাতে চায়ের দোকানে ঢুকিতে বড় ভরসা হইতেছিল না, কিন্তু না ঢুকিয়াও উপায় নাই। আমরা

দু'জনে দু'খানি চেয়ারে বসিতেই লোকটি দুই কাপ চা আনিতে বলিল। আমার দিকে ফিরিয়া লোকটি আরম্ভ করিল, মশায়, রাস্তার ওপারে যে বড় বাড়ীটা দেখছেন, ওটা একটা সওদাগরী আফিস ওখানে আগে আমি কাজ করতাম। কিন্তু যেখানে আলো-বাতাস নাই এমনতর আফিসেও টেকা যায় কিন্তু যেখানে লজিক নাই সেখানে থাকা হচ্ছে বিধাতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা। শুনুন তবে ব্যাপার খানা কি?

এক দিন আমি আমার অবসর সময়ে ঘরে বসিয়া ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিতে ছিলাম, হঠাৎ আমার মনে হ'ল মানুষের দাড়ি রাখা নিতান্ত কর্তব্য।

আমি অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হঠাৎ ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিতে দেখিতে দাড়ি রাখার প্রয়োজনীয়তা কি করে বুঝতে পারিলেন? লোকটি বলিল, দেখেননি ভারতবর্ষের মানচিত্র। কুমারিকা অন্তরীপটা ঠিক ভারতবর্ষের ফরাসী ধরনে ছাটা দাড়ির মত মনে হয়।

আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। কিন্তু লোকটি গম্ভীরভাবে বলিল—হাসির কথা নয় মশায়। দাড়িতে মানুষের মুখকে 'আর্টিষ্টিক্ ফিনিস্' দেয়। এই সব নানা চিন্তা ক'রে আমি সেই দিন থেকেই দাড়ি রাখ্‌তে সুরু করলাম। ইতিমধ্যে চা আসিয়া পড়াতে আমি চা-তে মনোনিবেশ করিলাম কিন্তু লোকটি বলিয়া যাইতে লাগিল।

"কিন্তু মশায় আমাদের আফিসের সাহেবটার না ছিল দাড়ি না ছিল গোঁফ। ব্যাটা নাকি দিনে তিনবার দাড়ি কামাতো। একবার সকালে, একবার বিকালে আর একবার রাত্রি আটটার সময় বিদ্যুতের আলো জ্বালিয়ে। সে বেটা আফিসের বাবুদের কারো দাড়ি গোঁফের চিহ্ন মাত্র দেখ্‌তে পারতো না। কারো একটু দাড়ি গোঁফ বাড়লে, ধ'রে জরিমানা ক'রে দিত। কিন্তু আমাকে মশায়, কাপুরুষ এবং আর্ট জুটাকে 'ইনস্পায়ার' করেছে, আমি সাহেবকে ভয় করবো কেন? একদিন সোমবারে মুখভরা দাড়ি ও বুকভরা সাহস নিয়ে আফিসে হাজির। অন্য সব কেরানীরা অবাক্ হ'য়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহেব এসে আমাকে আক্রমণ করলো। আমিও ছাড়বার পাত্র নই—দাড়ি রাখ্‌বার উপকারিতা সম্বন্ধে তাকে এক ঘণ্টা ধ'রে বোঝালাম—কিন্তু মশাই চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। সাহেব উঠে যাবার সময় বলে গেল—well Babu, grow your beard outside office hour. শুনুন, মশায় একবার কথা! ব্যাটার যদি একটুও লজিক্যাল ব্রেন' থাক্‌তো তবে কি এমন কথা বলে! আফি-

সের বাইরে দাড়ি রাখ্বো আর অফিসে দাড়ি কামিয়ে আস্বো। এমন কি 'কুয়ে' বই। এমনকি আমার কাপড় যে ইচ্ছামত পর্বো তাও পর্বো। যেখানে শিখদের এমন অপমান, সেখানে কাজ করা মনুষ্যত্বের অপমান। আমি সেই দিনই কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। দেখলেন মশায় এখন শিখদের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করেছি কিনা? ইতিমধ্যে উভয়ের চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ হইয়া আসিল। আমি তাহাকে বলিলাম এ রকম স্বার্থত্যাগ আজ কালকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু আমার প্রশংসায় বড় সায় না দিয়া লোকটি হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। এবং সহসা কাহাকে যেন পথে লক্ষ্য করিয়া মশায় দাঁড়ান দাঁড়ান বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু সে ফিরিল না। পয়সাটা চায়ের দাম চুকাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। জীবনে একবার মাত্র এই রকম "লজিক্যাল ব্রেন" দেখিয়াছি। এবং এই রকম অত্যাশ্চর্য্য 'লজিক্যাল ব্রেন' পথে ঘাটে দেখা যায় না তাই রক্ষা, নইলে মাইনের টাকার অনেকখানিই ট্রামের ভাড়ায় এবং চায়ের দামে চলিয়া যাইত।

পাশের বাড়ী

—শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী।

(১)

কবিতা—অপর্ণা!

কেমন দিদি?

তাকে একবার আসতে দিবি?

না দিদি, বলিয়া নিজের রোগ প্রায় চোখ দুটি তুলিয়া কবিতা তাহার দিদির মুখের দিকে চাহিল। সে দিন সন্ধ্যার প্রারম্ভেই বাদলটা বেশ জাঁকাল ভাবেই নামিয়াছিল, তথাপি রাত্রি প্রহরাতীত হইবার পরও তাহার বিরাম হইবার মত কোন উপক্রম দেখা গেল না,—চতুর্দিক হইতে অজস্র বারির পতনের শব্দ উঠিতেছিল—ঝম্ ঝম্ ঝম্।

উন্মনা ভাবে রাত্রিবেলা সেই শব্দের দিকে কিছুক্ষণ কান পাতিয়া থাকিয়া অপর্ণা আবার বলিল,—তোর মনটা কেমন্ তা' আজো চিনতে পারলাম না কণা।

তিনি আর কি বুঝিবি ত' বিষণ্ণমুখে কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া সে ধীরে ধীরে আপনার চোখ দুটি বন্ধ করিল।

কবে ফিরবে তা ত বলতে পারিনে, কিন্তু ফেরা হবেই ত; ফেরা পারবো কিছু।

অপর্ণার এই কথার উত্তরে চোখ বন্ধ করিয়াই কবিতা বলিল, তুমি উহাদের একটুই জানো দিদি—তাদের প্রকৃতিটা যদি জানতে ত' বলতে অমনটি, আর একবার মুখে এ সম্বন্ধ কোনদিনই তোলো না।

বিস্মিত মুখে অপর্ণা বলিল, কেন বল্ দেখি, তুই ত' আর ছেলেমানুষ নেই যেখানে হবে পরের বাড়ী।

বল—দাঁড়া ভাবেছি এই কিছু…

হবে?

কণিকা এ প্রশ্নের সহসা উত্তর না দিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি যেন ভাবিতে লাগিল। অপর্ণাও সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যগ্রতা না দেখাইয়া নীরবভাবে তাহার মাথার নিকটেই বসিয়া রহিল। প্রদীপের স্তিমিত আলোক সর্বাঙ্গে মাখিয়া, রাত্রির গভীরতা যেন আরো দ্বিগুণ বাড়িল, সমস্ত ঘরটি যেন দ্বিগুণ গম্ভীর মুখেই চাহিয়া রহিল, এই দুইটি নীরব প্রাণীর মুখের উপর।

কিছুক্ষণ অতীত হওয়ার পর পাশ ফিরিয়া শেষে ধীরে ধীরে কণিকা বলিল, আমায় সে বিয়ে করেছিল কেন তাতো জান দিদি, কেবল কাজের জন্য, তার নাবালক প্রতিপালনের জন্য, তার বাপ মায়ের সেবার জন্য, তার অতিরিক্ত—

অপূর্ণ কথাতেই কণিকা চুপ করিয়া গেল। এই কথাগুলি যে শুনিতে তিক্ত হইলেও একান্ত নির্ভুল, বড় কঠোর সত্য অপর্ণা তাহা বিশেষরূপেই জানিত, যেদিন কণিকার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া গিয়াছিল, পাত্রতো সে দিন নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছে—'তাহার এই পরিণয় স্বীকার কেবল সংসার রক্ষার জন্যই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, তার কাজের জন্য, নাবালক পুত্র রক্ষার জন্য, বৃদ্ধ পিতা মাতার জন্যই দ্বিতীয় বার সে এ দায়ীত্ব গ্রহণ করিতেছে।'

কিন্তু সত্যই যে তাহা এইরূপ হইবে, এতদূর গড়িয়া উঠিবে তাহা ঠিক তাহাদের বিশ্বাস হয় নাই, অনেক আত্মীয় আত্মীয়াই সে দিন দ্বিতীয় পক্ষের আদরটা যে কিছু বেশী পরিমানেই হইয়া থাকে সেই যুক্তিও স্পষ্টই দেখাইয়াছিলেন, এবং ওই কথাগুলি যে বিশেষ মৌখিক তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিতে গিয়া গ্রামের ভিতর হইতেও কয়েকটা নজির উপস্থিত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

সুতরাং দরিদ্র বেণীমাধব বিনা পণের এই সুবিধাটুকু প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া হেমন্তের হাসিভরা অগ্রহায়ণের শেষেই শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়া কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। বিবাহের দুই মাস আগেই উভয়ের সাধ্বী জননী স্বর্গগতা হইয়াছিলেন, পরে বিবাহের দুই মাস অতীত হইতে না হইতেই যখন তাহারা দুই ভগিনীতে শ্বশুর বাড়ী যাত্রা করিল, তখন তিনিও যাহা কিছু পুঁজি সঞ্চয় করিয়া লইয়া শেষ আশ্রয়-বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন, দেশের ভিতর কিছুকাল স্মৃতি বহন করিবার জন্যই কেবল দাঁড়াইয়া রহিল পুরাতন মৃন্ময় গৃহখানি।

কণিকার মাথার নিকটে বসিয়া অপর্ণা যেন আজ অতীত ঘটনাগুলিকে বড় স্পষ্টরূপেই চোখের নিকট ফুটিয়া উঠিতে দেখিল, সহসা সে বর্ষার শীকরাসিক্ত স্নিগ্ধ সমীরণে একটা ব্যথিত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ডাকিল, কণা!

কিন্তু এবার আর উত্তর আসিল না, গৃহদীপের স্তিমিত আলোকে সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কণিকার তন্দ্রা আসিয়াছে, আর সেই তন্দ্রা-স্পর্শভিরা আয়তনেত্রের প্রান্ত বাহিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে মুক্তার মত দুই বিন্দু অশ্রু!

(২)

গভীর রাত্রিতে সুধাময় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কণিকা আজ কেমন আছে?

ঈষৎ বিষণ্ণমুখে অপর্ণা উত্তর দিল, এক রকম।

সন্ধ্যার পর আবার জ্বর এসেছে?

হাঁ, রাত আটটার পর যেমন আসে!

তাইত, তাহ'লে ভাবিয়ে তুললে দেখচি, বলিতে বলিতে একটু অন্যমনস্কভাবে সে আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া আহারে মনঃসংযোগ করিল। লণ্ঠনটা আরো একটু নিকটে রাখিতে রাখিতে অপর্ণা বলিল, কি করা যায়, আমিও কিছু ভেবে পাচ্ছিনে, তাদের খবর দিতে চাইলেও কণিকা বারণ করচে. এমন হবে জানলে ওকে আনার জন্য ব্যস্ত হতাম না!

সুধাময় অপেক্ষাকৃত চিন্তিতভাবে বলিল, আনাটা আর কিছু মন্দ হয়নি, আর আমরা না হলে ওর খোঁজ নেবারই বা কে আছে? তবে অসুখটা করেছে বলেই ভাবনা, আট দিনেও আজ জ্বর ছাড়লো না, যাহোক কাল অনুপমকে একখান চিঠি লিখবো।

একটু কুণ্ঠিতভাবে অপর্ণা বলিল, কণিকা কিন্তু মানা করছে! তা করুক আমাদের তো একটা কর্তব্য আছে, ওকে আমি নিজে কিছুই দেখতে পারবো না, এখন আবার কাজের চাপটাও এত বেশী পড়ে গিয়েছে যে নিশ্বাস ফেলবার যেন ফুরসৎ নেই, যত ছোটলোক নিয়ে কাজ, অকাণ্ডম আর কি।

অপর্ণা কোন কথা না কহিয়া নীরব হইয়া রহিল, স্বামীর পরিশ্রম সম্বন্ধে সে কোন দিনই অনভিজ্ঞ ছিল না, তথাপি আজ তাহার মুখে অন্য দিনের মত সহানুভূতিকর উক্তি কথাও আসিল না, আর তার নিজের ভিতরটাতে সে নিজেই যেন শক্ত প্রাণ অনুভব ক'রতেছিল।

তাহাকে এইরূপভাবে নীরব দেখিয়া সুধাময় পুনরায় বলিল, ঝকমারী কাজ এই কন্ট্রাক্টরগিরি, মিস্ত্রী বেটাদের সঙ্গে বেখাতে বেখাতে যেন হয়রাণ হতে হয়, একটু যদি তাকিয়েছ অমনি ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে।

এবার অপর্ণা ধীরে ধীরে বলিল, সেই জন্যেই তোমার উপর কিছু আর দেওয়া শক্ত হয়ে পড়ে, মনে হয় তোমাকে কিছু না জানিয়ে দিনগুলো যদি চলে যায় তবে বাঁচি।

তা আমি বুঝতে পারছি, আর সেই জন্যেই অনুপমকে চিঠি লেখাটাও যে বিশেষ দরকার। তুমি ত এই একলা, এক ওই বুড়ো ঝি, তার ভরসাও মিথ্যে, তার উপর সংসার আছে, খোকা আছে, সব রোগে রোগীর বড় কখনো ঠিক মত হয়ে ওঠে না, আর অনুপম নিজেও একজন ডাক্তার, তাকে খবর না দিলে কি কখন চলে, বলবে কি সে!

আহার শেষ করিয়া উঠিতে উঠিতে সুধাময় কথা কয়টা শেষ করিয়া হাত মুখ ধুইবার জন্য রান্না ঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। অপর্ণাও আর কোন প্রসঙ্গ না তুলিয়া নিজ মনেই রান্না ঘরের অবশিষ্ট কাজগুলি সারিতে লাগিল।

রাত্রিটা কোন রকমে অতীত হইলে পরদিন যখন মেঘমুক্ত আকাশের বুকে শিশুসূর্য্য হাসিমুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সুধাময় শয্যাত্যাগ করিয়া হাত মুখ ধোওয়ার ব্যাপারটা শেষ করিয়া এবং একটু চিন্তিত মুখেই পাশের ঘরে অপর্ণার নিকট উপস্থিত হইল।

সমস্ত রাত্রি সুনিদ্রা না হওয়ার দরুণ অপর্ণা তখন ঘরের মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া নিদ্রাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। চৌকীর উপরে বিছানায় ভোরের বাতাসের স্পর্শ পাইয়া কণিকাও বড় স্বচ্ছন্দভাবে ঘুমাইতেছিল, তাহাদের এই শান্ত নিদ্রাটুকু ভাঙাইতে সুধাময়ের যেন প্রবৃত্তি হইতেছিল না, সে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই অবসরে অপর্ণা আপনিই যেন চমক ভাঙ্গার মত উঠিয়া, মাথের কাপড়টা টানিতে টানিতে সুধাময়কে দেখিয়া বলিল, এত ভোরেই উঠে পড়েছ যে।

সুধাময় নিকটেই অবস্থিত একখান টুলের উপর সুবিধামত করিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, ভোরে ঠিক নয়, এই খানিকটা আগে উঠেছি, ভাবছি অনুপমকে টেলিগ্রাম করে দিইগে, কি বল?

ঘুমন্ত কণিকার মুখের দিকে চাহিয়া অপর্ণা বলিল, রাতদিন, কি জানি আমার যেন আর ভাল লাগছে না, কাল সমস্তটা রাত্তির, কি যে বকুনি, দেখতে যদি তুমি—অপর্ণার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল, সে থামিয়া গেল। ব্যথিতভাবে সুধাময় বলিল, আমাকে ডাকলে না কেন?

তুমি খেটে এসে ঘুমোলে, তোমাকে আর ডাকতে ইচ্ছে হ'ল না।

তা বল্লে কি চলে?

অপর্ণার কথায় শান্তভাবে উত্তর দিয়া সুধাময় পুনরায় বলিল, তা হলেআর দেরী করবো না, কি বল?

অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে অপর্ণা বলিল, না।

টেলিগ্রাম গিয়াছে। অপর্ণার দৃষ্টি সেই মুহূর্ত্ত হইতেই পথের দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহাও যে তিন দিন অতীত হইয়া গেল! একজন আগন্তুক, অথবা একখানা টেলিগ্রাম, না হয় একখান চিঠি কিছুরই যে সন্ধান নাই! অপর্ণা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল 'মানুষ এমন হয়, একি অবিচার—নিজে আসা দূরে থাকুক তাদের ঘরের বৌয়ের একটা সংবাদ লওয়াও কি তাহারা প্রয়োজন মনে করে না।

সে যখন এই রকম ভাবিতেছিল, সেই সময়ে কণিকা সহসা চোখ মেলিয়া বলিল, দিদি, দেখলে আমার কথাটা না শুনে কি ফল হ'লো দেখলে—আমি যে জানি।

অপর্ণাও তাহা মনে মনে বিশেষরূপেই বুঝিতেছিল, তবু একটু ধমক দেওয়ার সুরে বলিল, তুই সব জানিস! ব্যস্ত আছে বোধ হয়!

ব্যস্ত! বলিয়া, কণিকা তার রোগ পাণ্ডুর মুখে একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিল।

কণিকার জ্বরটা সে দিন দুপুরের পর হইতেই বড় প্রবল ভাবেই আসিয়াছিল, অপর্ণার মনটা এইজন্য অত্যন্ত খারাপ হইয়া থাওয়ায় সে আর ইহা লইয়া বিশেষ বাড়াবাড়ি করিতে ইচ্ছা করিল না। নিঃশব্দভাবেই তাহার মাথার কাছে বসিয়া আর একবার জলের পটী বদল করিয়া পাখার হাওয়া করিয়া যাইতে লাগিল।

একটু নীরব থাকিয়া কণিকা আবার বলিল, দিদি ওটা ভুল, বড় ভুল কথা, মানুষের প্রাণের সংযোগ যেখানে থাকে, সেখানে কোন বাধা কোন ব্যস্ততাই তার পথ রোধ করতে পারে না, বুঝতে পারছো না দিদি, এখনো বুঝতে পারছো না!

গভীর উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে কণিকার পাণ্ডুর মুখ লাল হইয়া উঠিতেই অপর্ণা তীব্রস্বরে ডাকিল, কণা!

পরক্ষণেই মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থিরভাবে কণিকা উত্তর দিল, দিদি!

কেন অত বকছিস্ কণা, ডাক্তার বাবু তোকে বেশী কথা কইতে বারণ করে দিয়েছেন, মাথার যন্ত্রণা যে আবার বেড়ে উঠবে!

শান্তস্বরে কণিকা বলিল, আর বকবো না দিদি।

ইহার পর সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া আবার চোখ বন্ধ করিল। অপর্ণা পূর্ব্বের মতই তাহার মাথার নিকটে বসিয়া রহিল সেবা নিরত মূর্ত্তিমতী করুণার মত অতিরিক্তের ভিতর অনাহূত ভাবেই তার চোখের কাছে দুই বিন্দু অশ্রু আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই ভাবে আধ ঘণ্টা অতীত হইয়া গেলে, সুধাময় এক খানা চিঠি লইয়া আসিয়া বারান্দা হইতে ডাকিল, শোন!

অতি সন্তর্পণে রোগীর শিয়র হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া অপর্ণা প্রশ্ন করিল, কি বলছো?

কণিকার শ্বশুর চিঠি দিয়েছে।

মুখের কথায় বাধা দিয়া ব্যগ্রতার সঙ্গে অপর্ণা প্রশ্ন করিল, কি লিখেছে? লিখেছে আর কি, অনুপম বাড়ী নেই, কোথায় কোন বন্ধুর বিয়েতে ক্ষণার গেছে। অনেক খানি তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই সুধাময় বক্তব্য শেষ করিল।

গম গমে কয়লার আগুনের মতই আরক্ত মুখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া শেষে অপর্ণা বলিল, কেবল হরিশপুরের দু'বিঘে ধানের জমি আর ক্যাম্বেলে ফেল এক ডাক্তার দেখেই বাবা ভুলে গিয়ে ছিলেন!

তিনি কি করবেন, অদৃষ্ট বুঝতে হবেতো, সুধাময় আকাশের বুকে দৃষ্টি রাখিয়া উত্তর দিল।

ঘরের ভিতর হইতে কণিকার ক্লান্তস্বর ছুটিয়া আসিল, দিদি!

অপর্ণা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। সুধাময়ও তাহার অনুসরণ করিয়া নীরব ভাবেই আসিয়া কণিকার মাথার নিকটে দাঁড়াইল।

কণিকার রোগ শ্রান্ত দৃষ্টি সম্মুখস্থিত সুধাময়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল, শেষ সে উচ্ছ্বাসিত ভাবেই বলিয়া উঠিল, বলতে পারেন জামাই বাবু! এই স্নেহ, দয়া, মায়া প্রেম এ গুলো কি? এর ভিতর যথার্থ বলে কিছু আছে? না অভিনয়,... আর ফাঁকি?

স্নেহের সঙ্গে তাহার তপ্ত ললাট স্পর্শ করিয়া সুধাময় বলিল, কে বলে ফাঁকি, কে বলে?

কেউ না... দেখতে পেলে আর কি শোনবার দরকার হয়! আকাশটা বলছে ফাঁকি, ওই বাতাসটাও বলছে ফাঁকি, শুনতে পেলেন না? ওই যে আমি সব শুনতে পাচ্ছি.... যাই, গিয়ে বলবো... এ ফাঁকির কথা বলো গিয়ে... ঈশ্বর যেন তুমি সংসারটাকে ভরিয়ে রেখেছ?

কণিকার মুখের এরূপ কথা জীবনে এই প্রথম সুধাময়ের কানে আসিল, সে একটু ব্যথিত ভাবে অপর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, জ্বরের মাত্রাটা আজ বড় বেশী এসেছে দেখছি। * * *

পাশের বাড়ী হইতে সানাইয়ের মধুর ধ্বনি উঠিয়া পাড়া খানি মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। আসন্ন মিলনের মঙ্গল-শঙ্খ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বাজিয়া প্রতিবেশীকে সজাগ করিয়া তুলিতেছিল, অগণ্য নরকণ্ঠের আনন্দ কলরব উঠিয়া বর্ষার শীকর সিক্ত সমীরণে ছুটিয়া আসিতেছিল, অপর্ণার ক্ষুদ্র আঙ্গিনাটির উপর।

কিন্তু বহির্জগতের এই যে আনন্দের আঘাত তাহার ব্যথিত দীর্ণ বুকটাকে অধিকতর চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল! সেও বুঝি একদিন এমনি করিয়াই কণিকার বিবাহের উৎসবে অনেক হাসিই হাসিয়াছিল; তার পর আজ পনর দিন আগে সেই যে নিজ হাতে তাহাকে চির বিদায়ের বেশে সাজাইয়া দিয়াছে! নিস্তব্ধ মর্ম্মর মূর্ত্তির মতই সমস্ত শ্বাসটাকে বুকের ভিতর রুদ্ধ করিয়া অপর্ণা সেই খানে বসিয়া রহিল।

পরক্ষণেই ডাক আসিল, অপর্ণা!

মুখ ফিরাইয়া অপর্ণা বলিল, কি বলবে?

না কিছু নয়, কি করছিলে?

সুধাময়ের এই উত্তরে অপর্ণা বেশ অনুভব করিল, সে যেন কি একটা কথা বলিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াও তাহা সংযত করিয়া লইল। সে ঈষৎ সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল, কি করবো আবার এখানেই আছি; তা কি বলবে তুমি বল না, থামলে কেন!

সুধাময় তাহার কথার সহসা উত্তর না দিয়া স্তব্ধ ভাবে সম্মুখের জ্যোৎস্না-ভরা অঙ্গনটির উপর চাহিয়া রহিল, পরে প্রায় পাঁচ মিনিট অতীত হইলে সমস্ত নির্জ্জনতার উপর একটা আঘাত করিয়া মৃদুস্বরে সুধাময় বলিল, তোমাকে এরা নেমতন্ন করে নি, না?

নির্লিপ্ত ভাবেই অপর্ণা বলিল, না, আর করলেও আমি যেতাম না।

যাও না যাও সে পরের কথা, কিন্তু করে নি কেন জান?

বিস্ময়ের সঙ্গে অপর্ণা বলিল, কেন?

কেন শুনবে?

বললেই শুনবো, বলিয়া অপর্ণা আবার অন্যমনস্ক হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

একটু ইতঃস্তত করিয়া ধীরে ধীরে সুধাময় বলিল, পাত্রটি কে শুনেছ কি ?

সন্দিগ্ধ হইয়া অপর্ণা প্রশ্ন করিল, কে ?

অনেক খানি কঠোরতা অবলম্বন করিয়া এক নিশ্বাসে সুধাময় বলিয়া ফেলিল —অনুপম !

এই একটি কথা আজ নিষ্ঠুর পরিহাসের মতই তাহার কাণের কাছে বাজিয়া উঠিল, 'এখনো যে পনর দিন সম্পূর্ণ ভাবে অতিক্রান্ত হয় নাই, এখনো যে শ্মশান প্রান্তের তরু শিরে শিরে কণিকার চিতাধূমের গন্ধ লুপ্ত হইবার অবকাশ পায় নাই, পথ-চলতি পথিকও বোধ হয় পথের পরিচিত বন্ধুর স্মৃতি এত অল্প দিনে—অপর্ণা আর ভাবিতে পারিল না ; সে মর্মান্তিক বেদনার সহিত ধূলি মলিন বারান্দার উপর লুটাইয়া পড়িল, তার সমস্ত বুকের ভিতর হইতে একটি মাত্র অস্ফুট আর্তস্বর বাহির হইল, ওঃ !

পাশের বাড়ী হইতে তখনো পূর্ণ মাত্রায় আনন্দ উৎসবের ধ্বনি শুনা যাইতেছিল, কোনও সুগায়ক তখন মিলন রজনীকে অভিনন্দিত করিয়া গাহিতেছিল—

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন

পাতিয়া ব'স হে হৃদয় নাথ !

কমলমধু

—শ্রীঅনুপম গুপ্ত

বাবু, নিবাড়ুন, নিবাড়ুন !—

ব্রজনাথ বৈঠকখানা ঘরে সকালবেলা সবেমাত্র মুখ হাত পা ধুইয়া ভিজা গামছা দিয়া পা মুছিতেছিলেন।

এত সকালে জগবন্ধুঠাকুর যখন তাহার দন্তবিহীন মুখ নাড়িয়া চাপাক্রন্দনের সুরে এই কথা কয়টি বলিল, তখন ব্রজনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়ে, এত সকালে ইয়ে তোমার আবার কি হলো ?

জগবন্ধু অতি শৈশবে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া তাহার পিতার সাহত বাংলা দেশে আসিয়াছিল। বহুস্থান ঘুরিয়া শেষ বয়সে প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে ব্রজনাথের পরিবারে পাচক ব্রাহ্মণ, ছোট ছেলেমেয়েদের শাসনকর্ত্তা ও বাড়ীর মেয়েদের অভিভাবকরূপে বিরাজ করিতেছিল। বাংলা কথা খুব ভাল করিয়াই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেও উড়িয়া উচ্চারণগুলি সে এড়াইতে পারে নাই, ব্রজনাথও বৃদ্ধ, পাচক ব্রাহ্মণ হইলেও জগবন্ধু তাঁহার সুখ দুঃখের সহচরের মতই গণ্য হইয়া গিয়াছিল।

ব্রজনাথের বাড়ীতে জায়গা জমী অনেকখানি। বাহির বাড়ীতে বড় আট-চালা, খড়ের ছাউনি। এই আটচালাতেই বৈঠকখানা, দুইখানি বড় বড় কাঁঠাল কাঠের তক্তাপোষ, তাহার উপরে ফরাস পাতা। আসবাবের বেশী কিছু আড়ম্বর ছিল না। পিতলের গোটাতিনেক হুকার বৈঠক। একটি হুকার গায়ে একটি কড়ি বাঁধা, সেটি ব্রাহ্মণের হুকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। আর দুইটির একটি ব্রজনাথের ও অপরটি কায়স্থদের নীচজাতির যাহারা আসিত তাহারা সেই হুকাতে তামাকু সেবন করিত।

ব্রজনাথ বৃদ্ধ হইলেও দাঁত পড়ে নাই। সুন্দর সাদা লম্বা লম্বা দুই পাংক্তি দাঁত, ঠোঁটের উপরেই একজোড়া বেশ বড় সাদা গোঁফ, তামাক খাইতে খাইতে

গোঁফজোড়ার মাঝখানটা কতকটা জায়গা কটা হইয়া গিয়াছে। জ্র যুগল বড়, চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

পা মুছিয়া ভিজা গামছা পাট করিয়া গোঁফজোড়াকে মুখের দুইভাগে সরাইয়া দিয়া ব্রজনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হঁ্যরে—কি—হয়েছে—জগবন্ধু!

জগবন্ধু পানের ঢোপ্‌লাটা গালের একপাশে ঠিক্‌ দিয়া সরাইয়া দিয়া, মুখভরা রস সমেত একটা ঢোক গিলিয়া উড়িয়া উচ্চারণে বলিয়া গেল, সে ঘাটে স্নান করিতে যাইয়া দেখিয়া আসিয়াছে, ঘাটে একটা বড় নৌকা লাগিয়াছে। তাহার উপরে একজন মা-জননীকে সে 'জুত্‌তা পায়ে' ঘুরিতে দেখিয়াছে।

ব্রজনাথ সংবাদটি শুনিয়া মিনিটখানেকের জন্য চুপ করিয়া গেলেন, তাহার পরই মৃদু হাসিয়া বলিলেন, হঁ্যরে, সুনয়না কে তুই জল কোথায় পেলি যে নেয়ে এলি!

বীরগ্রামের বক্ষ বাহিয়া এই সুনয়না নদীটি বহুকাল পূর্বে দুই তীরের হাসি কলরোলে উচ্ছলিত আনন্দে হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া চলিত। কিন্তু গ্রামের লোকের তাহার প্রতি এত ভক্তি সত্ত্বেও সরকারের শক্তির বাঁধে তাহাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল যে সুনয়না এখন একটি শুষ্ক অশ্রুধারার মত নীরবে বীরগ্রামের একপাশে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার সে বেগ নাই, গতি নাই, কলতান নাই, নাচা নাই, দোলা নাই। অস্ত-সৌভাগ্য বৃহৎ পরিবারের বিধবা নারীর চোখের মত সুনয়না তাহার বীরগ্রামের দিকে চাহিয়া আছে।

জগবন্ধু, বাবুর কথার উত্তর করিল, মায়ের বুকে যেটুকু জল আছে, তাতেই গা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

ব্রজনাথ হাসিয়া বলিলেন, হঁ্যরে, সে কি জল রে, সে যে কাদা!

জগবন্ধু কড়া সুরে বলিল, এই মাটির শরীরে মাটি লাগ্‌লে তাতে আর কি?

ব্রজনাথ ধীরে ধীরে মাথা দুলাইলেন। একটু সরিয়া গিয়া তাকিয়ার নীচে হইতে একখানি হিসাবের খাতা টানিয়া বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। একখানি খামে-মোড়া চিঠি পাইয়া সেখানি খুলিয়া দুই একবার চোখ বুলাইয়া বলিলেন, নিধুকে বলে দিস্‌ হঁ্যরে, আজ যেন মাছটাছের একটু যোগাড় দেখে;—হঁ্যরে, বাড়ীর ভিতরে বলে দিস্‌ আজই বোধ হয় শিবনাথ এসে পৌঁছবে।

জগবন্ধু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, শিবুদাদা আসবে? তারপর একটু ভাবিয়া বলিল, এলেত এতক্ষণে এসে পৌঁছত কর্তা?

ব্রজনাথ পত্রখানি আবার মুড়িয়া রাখিয়া বলিলেন, ইয়ে জোড়-পুকুরে মাছ হয় না জগবন্ধু?

জগবন্ধু বলিল, তা কি আর নেই? তবে যে দল জমেছে। বিষ্টুদের তাহলে ডেকে ব'লে দি'—জালটা টেনেই দেখুক।

ব্রজনাথ চুপ করিয়া একবার একটু ভাবিয়া লইয়া সম্মতি দিলেন, আচ্ছা তাই যা'—ইয়ে আর দেখ্, তারানাথদের বাড়ীতে ইয়ে কিছু মাছ পাঠিয়ে দিস্।

জগবন্ধু প্রায় চলিয়া গিয়াছিল, ব্রজনাথের শেষ কথাটি শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আবার তারানাথদের বাড়ী! এত ক'রেও তোমার কর্তা আক্কেল হোল না! ঐ মেজ কর্তার ছেলে কি সম্পর্কের আর কোনও ফাঁক্ রেখেছে? মাছ দিয়ে আবার তার কাছ থেকে অপমান বাড়া কেন বাবু? ওসব হবে-টবে না। বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া জগবন্ধু ভিতর বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

নিধু আসিয়া তামাক সাজিয়া দিল। ব্রজনাথ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, নিধু, ইয়ে আজ আর তা হ'লে ক্ষেত কুপিয়ে কাজ নেই। আমি-ই ইয়ে একলা যতটুকু পারি গাছের গোড়াগুলো চেলে দি'; আজ ইয়ে শিবু আসবার কথা আছে, তুই দ্যাখ, গোটা কয়েক ডাব টাব্ পাড়িয়ে রাখ্। আর দ্যাখ্ ইয়ে ঐ হিজল-বনের ওপরে যে আড়াই-সেরি বেলগাছটা আছে, তাই থেকে ক'টা বেশ পাকা দেখে পাড়িয়ে নে'।

নিধু কর্তার প্রত্যেক কথাতেই, হঁ—বাবু—হঁ বলিয়া সায় দিয়া যাইতে লাগিল।

ব্রজনাথ তামাকে কয়েকটি টান দিয়া আবার বলিলেন, কমলিকে পাঠিয়ে দে'ত, ইয়ে একটা ছোট ডালা নিয়ে আসে যেন। মহেশপুরের দরুণ কাটারিটাও পাঠিয়ে দিস্।

ব্রজনাথ তামাক টানিতে টানিতে মাঠের দিকে বুড়ো নিমগাছটার পাশ দিয়া একবার ঘাটের পথটার দিকে চাহিলেন। দূরে অতিদূরে দুই একজন ছোট ছোট লোক দেখা যায়, তাহা ছাড়া আর কিছুই তাঁহার চোখে পড়িল না। তিনি হুঁকাটি বৈঠকে বসাইয়া রাখিয়া, গামছাটি মাথার উপরে দিয়া খড়ম পায়ে দিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া বাগানের দিকে চলিলেন। তখন একটু রোদ চড়িয়াছে।

ব্রজনাথ বাগানের পাশ দিয়া পাশ দিয়া গিয়া যেখানে বেড়ার ধারে লাল লাল-

পাকা তেলাকুচ্ আর উচ্ছের হলদে ফুলে সকাল বেলাকার সূর্য্যের আলোতে জ্বল জ্বল করিতেছে সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। কয়টা ফিঙ্গে ও দোয়েল পাকা পাকা তেলাকুচ্ ও কাটা উচ্ছে গুলি ঠোকরাইয়া খাইতেছিল, ব্রজনাথ তাহা দেখিয়া আর কাছে গেলেন না, একটা পিঠুলি গাছের তলায় দাঁড়াইয়া পাখী গুলির কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন।

আটচালার পিছন দিক দিয়া কামরাঙা ও কুঁচে গাছের জঙ্গল ভাঙিয়া কমলি আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল। সে সবে মাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে, তখনও তাহার চুলের ডগা দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতেছে। কাটারিখানা ব্রজনাথের হাতের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল, পিসেমশাই, আজ নাকি শিবুদা আসবে পত্র দিয়েছে?

ব্রজনাথ অন্যমনস্ক ভাবে কাটারিখানা কমলির হাত হইতে লইয়া বলিলেন, দেখেছিস্ মধু, পাকা ফল দেখে পাখী গুলোর কত ফুর্ত্তি! ঐ আবার বড় ফিঙেটা আবার বাচ্ছা দোয়েলটাকে তাড়া করল!—হাঁ কি বলছিলি?—হাঁ শিবু আসবে আজ লিখেছে। হাঁরে তুই এক কাজ কর্ দেখি কমলমধু, কাটারিটা নিয়ে ঐ-ই উ-দিককার মাচা থেকে বেশ কচি কচি দু'গাছা ডাঁটা কেটে নে দেখি। আমি হয়ে ক'টা তুলে ফেলি! উঃ, কি উচ্ছেটাই ফলেছে এবার।

নাম তার কমলমধু। ব্রজনাথই তাহাকে এ নাম দিয়াছিলেন। যখন যেমন মেজাজ থাকিত সে ভাবেই তাহাকে কখনও কমলি, কখনও কমল, কখনও মধু, কখনও বা কমলমধু বলিয়া ডাকিতেন।

কমল চুলের ডগায় একটা ছোট গিঁট দিয়া আঁচলটা কোমরে গুঁজিয়া লইল, জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ পিসেমশাই, শিবুদা কি বৌ নিয়ে আসবে?

ব্রজনাথ কমলের মুখের পানে চাহিয়া একবার একটু হাসিলেন। সে হাসির মাধুরী কমলকে নিজের কথা ভাবিতে ভুলাইয়া দিল।

কমল উৎফুল্ল হইয়া বলিল, শিবুদার বউ, নতুন বাড়ীতে আসছে, খাটে শাড়ী টিপ কিছু পাঠান হোলনা।—বেচারী ভুলিকেও ত বলে দিলে হোত? খাট থেকে না হয় বাড়িয়ে নিয়ে আসতো।—পাড়ার ত কেউ খবর পেল না!—

ব্রজনাথের মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি কমলের কথার কোনও উত্তর দিবেন না। কিন্তু কমলের মনটা উস্খুস্ করিতেছিল।

সে আবার বলিল, পিসেমশাই, তা'হলে কোথাকে একটা খবর পাঠিয়ে দাও

না, এখনও ঢের সময় আছে। আর আমি না হয় পাড়ায় গিয়ে ক'বাড়ীতে খবরটা দিয়ে আসি।

ব্রজনাথ সজিনা গাছের একটা শুকনা ডাল মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কি রকম বউ নিয়ে আসবে তাও কেউ জানে না। বউ যদি ইয়ে আমাদের এ সব পছন্দ না করে। ইয়ে, তাহলে এ সব ক'রে ইয়ে তাঁকে কষ্ট দেওয়া কেন? বলিতে বলিতে ব্রজনাথ উচ্ছে ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

কমল নিজের মনেই মাথা নাড়িতে নাড়িতে বিড় বিড় করিয়া কি বলিল। বাগানের পশ্চিম প্রান্তে বেড়ার ধারে একটা লাউ গাছ যৌবনস্থ তরুণীর মত কল কল করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, এখনও ফল ধরে নাই। কমল তাহারই গোটা কয়েক কচি ডগা কাটিয়া লইল। বেড়ার ওপাশ হইতে ও বাড়ীর কামিনী বউ গাছের আড়াল হইতে দৈব বাণীর মত বলিয়া উঠিল, এ কি করলি রে কমল, অমন গাছটা একেবারে মুড়িয়ে দিলি!

আচমকা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া হাত কাঁপিয়া গিয়া কমলের আঙুলের একটু কাটিয়া গেল। সাবধান হইবার পূর্ব্বেই কয়েক ফোঁটা রক্ত একটা সাদা লাউ ফুলের উপর পড়িয়া গেল।

কমল বেড়ার উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে? বউ ঠাকরোণ?

কামিনী বউ-ও ওপাশ হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, অমন গাছটাকে কেটে সাবাড় করে দিলি! দেখ দেখি তোর হাতে ডগা কটা—আহা!

কমল বাঁ হাতের লাউ ডাঁটা ক'টার দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, নাঃ, এ আর ফলত না। সব গাছ-ই কি ফলে?

কামিনী বলিল, তোদের বাড়ীতে নাকি আজ নূতন বউ আসছে ভাই?

কমল অবাক হইয়া গেল, এরই মধ্যে কামিনী খবর পাইল কেমন করিয়া! তাই একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তাইত তোদের সব খবর দিতে যাচ্ছিলুম। আয় না ভাই কাপড়টা ছেড়ে। এখুনি হয়ত এসে পড়বে। আমি একলা তাই কিছু পারবো না, ভারী লজ্জা করছে।

শিবুর বউ আসিতেছে শুনিয়া কামিনীর আগে হইতেই আসিতে ইচ্ছা করিতেছিল। এই কামিনী যখন প্রথম বউ হইয়া ওবাড়ীতে আসে তখন হইতেই শিবু তাহার ছায়ার মত সঙ্গী ছিল। এমন কি সমস্ত দিন তাহারা দুই জনে অনেক সময়েই এক সঙ্গে শুইয়া বসিয়া কাটাইত। সন্ধ্যার পর কামিনী কাজ কর্ম সারিয়া যখন তেলের প্রদীপটি সম্মুখে রাখিয়া সলিতা পাকাইতে বসিত, শিবুও

ততক্ষণে মাথাকাটা-বিলের উপর গোল্লা-পার খেলা সাঙ্গ করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সটান আসিয়া কামিনীর পাশে বসিয়া পড়িত। তার পর বাহিরের জগতের গল্প শিবনাথ কামিনীকে শুনাইত, কামিনী গৃহ সংসারের নানা প্রকারের ছোট খাট স্নেহসুধা ভরা দৈনিক খবর শিবনাথকে বলিত।

শিবনাথ বলিত, আমি যখন চাকরী করব, তখন ত আমাকে গ্রাম ছেড়ে যেতেই হবে—তখন তোমাকে আমার বাড়ীতে রাখবো বউ ঠাকরুণ।

কামিনী হাসিয়া বলিত, চাকরী করবে কেন ঠাকুর পো! কার চাকরী তুমি করবে, তার ঠিক নেই, না বাবু, আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারবো না।

শিবনাথ খুব গর্ব্বভরে উত্তর করিত, লেখাপড়া শিখলে চাকরী করতে হবে না!

এমনি করিয়া তাহাদের দুই জনের মধ্যে যে আত্মীয়তা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, শিবনাথ বউ লইয়া এতকাল পরে গ্রামে আসিতেছে শুনিয়া, কামিনীর সেই সময়কার অনেক কথাই মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, তাহার এথম যৌবনারম্ভেই প্রকৃতির দুইটি বঞ্চনা।

শিবনাথ বিদ্যাভ্যাসের জন্য বিদেশে যাইবার পর প্রথম যে বার সে গ্রামে আসে, তাহার বছর খানেক পূর্ব্বে প্রবল কলেরা রোগে গ্রাম উজাড় হইয়া গিয়াছিল। প্রকৃতি তাহাকে বঞ্চনা করিল তাহার স্বামিটিকে লইয়া গিয়া। কামিনী বসিয়া ভাবিত, তাহার আর কে রহিল! তাহার এমনি জারাক্রান্ত জীবনের একদিনে শিবনাথ গ্রামে আসিলে কামিনীর সহিত প্রথম দেখা হইতে বলিয়াছিল, বৌঠাকুরুণ, তুমি একলা কি করে দিন কাটাও? বড় কষ্ট, না?

ঐ একটি কথা। কামিনীর মনে হইল না, আছে, আছে, তাহার কথা ভাবিবার অন্ততঃ একজন আছে।

তাহার পর কামিনী মনে করিল প্রকৃতি তাহাকে দ্বিতীয়বার বঞ্চনা করিল, যখন শুনিল শিবনাথের বিবাহ।

শিবনাথের বিবাহের সংবাদ শুনিয়া কামিনী ভাবিতে বসিল, আর কি শিবনাথ তাহার কথা তেমন করিয়া ভাবিবে? তবে?

এ প্রশ্নের উত্তর এত কাল ধরিয়া ভাবিয়াও সে পায় নাই। তাই কমলের সঙ্গে সমস্ত দিন রাত্রি কাটাইয়াও মনের মধ্যে তাহার শিবনাথের স্থান ভরিয়া উঠিত না।

শিবনাথ বউ লইয়া আসিতেছে শুনিয়া অবধি তাহার কেবলি মনে হইয়াছে, ঠাকুরপোর বউ যদি খুব সুন্দরী হয়! সুন্দরী হউক তাহাতে তাহার আপত্তি নাই, কিন্তু শিবনাথ তাহাকে কত খানি ভালবাসে তা' কে জানে?

(২)

শিবনাথ যখন নব বধূ লইয়া গ্রামের পথে দেখা দিল, তখন ব্রজনাথ খবর পাইয়া তাহাদের আগাইয়া লইয়া আসিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে গেল নিধু। জগবন্ধু বাড়ীতে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া অল্প কাজকে মস্ত বড় আয়োজনের মত করিয়া তুলিল। কমল তাড়াতাড়ি গ্রাম ঘুরিয়া বাদিয়া বেহারীকে আনাইল। বাড়ীতে সানাই বাজিয়া উঠিল।

ব্রজনাথের স্ত্রী ক্ষীরদা প্রভৃতি পুর মহিলারা ঘাটার কাছে শাঁখ ধান দুর্ব্বা লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ গ্রামময় একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। আশে পাশের গৃহস্থরা বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামের পথে আসিয়া নামিলেন। তখনও কানাকানি আরম্ভ হয় নাই।

শিবনাথ প্রভৃতি যখন খুব কাছে আসিল, তখন সকলে ব্রজনাথকে নব বধূর মাথায় ছাতা ধরিয়া আসিতে দেখিয়া একেবারে যেন হতাশ হইয়া গেল।

ব্রজনাথের মুখখানা পাকা আমের মত আনন্দে যেন টস্ টস্ করিতেছে। তিনি নব বধুর সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথা বলিতে বলিতে আসিতে ছিলেন, গ্রামের কে কোথায় দাঁড়াইয়াছিল তাহার দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই!

নব বধূ বাড়ীর সীমানার প্রবেশ করিতেই মেয়েরা উলু ধ্বনি করিল। ব্রজনাথের স্ত্রী ক্ষীরদা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, বউকে কোলে ক'রে নিতে হবে যে!

ব্রজনাথ বলিলেন, হাঁরে, লক্ষ্মী এল, তাকে আর কোলে ক'রে কাজ নেই। দেখনা চেয়ে যে পথটুকু মা হেটে এসেছেন, তার ধুলো গুলো পর্য্যন্ত যেন সোনার রেণু হয়ে গেছে।

বধূ হাটিয়াই চলিল। সকলে আরও আশ্চর্য্য হইল।

ব্রজনাথ কাহাকেও বাড়ীতে আসিতে অনুরোধ করিলেন না। কাজেই অনেকে হতাশ ও বিরক্ত হইয়াই নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেল। যে কয়েকজন তবুও ব্রজনাথের বাড়ীতে আসিল, ব্রজনাথ তাহাদের খুব সমাদর করিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। নিধুকে তামাক দিতে আদেশ করিলেন। নিজে বাড়ীর ভিতরে যাইয়া জল খাবারের আয়োজন করিলেন।

নূতন বউ একদিনেই পুরান হইয়া গেল। বউয়ের মুখ দেখিতে আর কোনও বাধা নাই। বউয়ের ঘোমটা মাত্র কপাল পর্য্যন্ত, কাজেই মুখ দেখিতে কাহারও অসুবিধা নাই।

কামিনী ও কমল বউকে লইয়া কাপড় ছাড়াইতে অন্য একটা ঘরে লইয়া গেল।

শিবনাথ বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়াই ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কমলি কোথায় বড়মা! বৌঠাকরুণ আসেন নি?

কমল ও কামিনী দুই জনেই সে কথা শুনিল। কামিনীর কান যেন জুড়াইয়া গেল! আছে, আছে, তাহার মনে হইল, ঠাকুরপো তাহার তেমনি আছে!

কমল বাহিরে আসিয়া শিবনাথের পায়ের ধুলা লইল। শিবনাথ কমলকে আদর করিয়া একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইল। তাহা দেখিয়া পাড়ার অনেক মহিলার চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিল।

শিবনাথ বলিল, হ্যাঁরে, বৌঠাকরুণ কোথায় রে?

কামিনী ঘরের হইতে, দুটি ধান দূর্বা তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিল।

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, বাপ্‌রে বৌকে না করলে আর আসা যায় না—না?

শিবনাথ প্রণাম করিবার পূর্বেই কামিনী ধান দূর্বা দিতে গেল। শিবনাথ মাথা নীচু করিতে তাহার মুখটা কামিনীর হাতে ঠেকিল। শিবনাথ কামিনীর হাত দুইখানি লইয়া নিজের কপালে রাখিল।

চারিদিকে অনেক লোক, কিন্তু কামিনী এ অবস্থায় এক পা-ও নড়িতে পারিল না। এক নিমেষের জন্য তাহার চোখ দুইটি আপনা হইতে বুজিয়া আসিল। মুখ ফিরাইয়া লইবার পূর্বেই দুই ফোঁটা চোখের জল তাহার মুখ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

শিবনাথ বলিল, তোমাকে আর প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে না, বৌঠাকরুণ।

এমনি সময়ে জগবন্ধু হাঁক্ ডাক করিতে করিতে লোক জন সমেত কয়েকটা বড় বড় রুই কাতলা আনিয়া একেবারে ধপাস্ করিয়া উঠানের উপর ফেলিল। সে শিবনাথের কাছেও আসিল না। বরাবর রান্নাঘরে গিয়া বড় বঁটিখানা ও কিছু ছাই লইয়া আসিয়া মাছ কুটিতে বসিয়া পড়িল।

ব্রজনাথ ডাকিলেন, জগবন্ধু শোন্।

প্রথম ডাকটা জগবন্ধু গ্রাহ্যই করিল না।

ব্রজনাথ মৃদু হাসিয়া শিবনাথের দিকে চোখ টিপিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, অভিমান হয়েছে।

শিবনাথ উঠানে নামিয়া আসিয়া বঁটির কাছেই মাথা নত করিয়া জগবন্ধুর পায়ের ধুলা লইল।

জগবন্ধু হাঁ হাঁ করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বলিল, করে কি দেখত ছেলেটা। কাট্টা যাবি না কি!

তারপরই বলিল, দাঁড়া এখানে। ছুটিয়া গিয়া কোথা হইতে একটা তেল সিন্দুর মাখান পান লইয়া আসিয়া শিবনাথের কপালে বড় করিয়া একটা তেল সিন্দুরের ফোঁটা কাটিয়া দিল। কাপড়ের খোঁট হইতে কুড়িটা চক্চকে সিন্দুর মাখান টাকা বাহির করিয়া শিবনাথের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, বউকে তোমাদের মনমত কিছু কিনে দিও বাবা।

শিবনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, বয়ে গেছে। আমার বেলা কপালে একটা ফোঁটা, আর পরের মেয়ের বেলা বিশ বিশটা টাকা!

ব্রজনাথ ডাকিয়া বলিলেন, আয় না এদিকে জগবন্ধু, বউ দেখে যা'।

জগবন্ধু যেন বড় বিরক্ত হইয়াছে এই ভাব দেখাইয়া বলিল, মাছগুলো পচে যাক্! বলিয়া টিনের ঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্রজনাথ নিজে বউকে লইয়া আসিয়া বলিলেন, প্রণাম কর।

বউ মাটিতে নুইয়া পড়িয়া জগবন্ধুকে প্রণাম করিল। দাঁড়াইয়া উঠিতেই বউয়ের মুখের দিকে জগবন্ধুর চোখ পড়িল। সে কিছুক্ষণ একেবারে হাঁ করিয়া রহিল।

ব্রজনাথ বলিল, কেমন সোনার প্রতিমা দেখেছিস্।

জগবন্ধু মাথা দোলাইয়া বলিল, হাঁ। তাহার পরেই চোখ দুইটা বড় করিয়া বলিল, প্রাতঃকালে যুক্তা পরিকিরি—

ব্রজনাথ একেবারে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে এক তাড়া দিয়া বলিলেন, যা' তোর আর বাকে বক্তে হবে না। উড়ে ত উড়ে! যা' শীগ্‌গীর মাছগুলো কুটে ফেল্। আর হাঁরে, তারানাথদের বাড়ী মাছ পাঠান হয়েছে রে?

জগবন্ধু একবার মাত্র ঘাড় নাড়িল। ব্রজনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, যা' তুই এখুনি নিজে হাতে ক'রে একটা বড় মাছ ও বাড়ীতে দিয়ে আয়।

কামিনী বলিল, বাড়ীতে এত মাছ কে খাবে জ্যাঠা? বরং ওরা সব এখানেই এবেলা খাবে-এখন।

ব্রজনাথ একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, বিশ্বনাথ, রমানাথ, ছেলেপুলেরা খাবে এ বাড়ীতে!

কামিনী বলিল, কেন খাবে না জ্যাঠা? ঝগড়া ক'রে তোমাকে বাদ দেব

কেমন করে? তুমি যে তাদের জ্যাঠা! ওদের আর কে আছে? আমি ওদের সবাইকে নিয়ে আস্‌বো।

ব্রজনাথ চুপ করিয়া একটু কি ভাবিলেন। তারপর জগবন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন, যা'ত জগবন্ধু, পাড়ার সব বাড়ীতে গিয়ে ছেলে মেয়ে সকলকে আমার নাম করে, গিন্নীমার নাম ক'রে এবেলা এখানে আহারের নেমন্তন্ন ক'রে আয়। অমনি ইয়ে ব'লে আসিস্‌, শিবনাথ আর বউমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবেন। জগবন্ধু বাহির হইয়া পড়িল।

কর্ত্তার হুকুমে বেহারী জাল ছাড়িয়া মাছ কাটিতে বসিল। চারিদিকে লোক জন ছুটাছুটি করিতে লাগিল। জনদুই বড়গাঁয়ে বাজার করিতে নৌকা লইয়া চলিয়া গেল।

কামিনী, নতুনবৌ ও কমল কি একটু পরামর্শ করিয়া একেবারে ব্রজনাথের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষীরদা রান্নাঘরের কোণে বঁটি পাতিয়া তরকারী কুটিতে বসিয়া গিয়াছিলেন।

কমল বলিল, পিসেমশাই—ব্রজনাথ কমলের কথা বলিবার ধরণ দেখিয়া ও নূতন বৌ ও কামিনীর চোখ মুখের ভাব দেখিয়া ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, কি বল্‌বি বল্‌না। ইয়ে, কাকে বল্‌তে ভুল হয় না যেন দেখিস্‌! আজ যদি তারানাথ থাকত!

ক্ষীরদা কাঁচা কুমড়াটা অৰ্দ্ধেক করিয়া ফালি করিতে করিতেই নীরবে আঁচল দিয়া চোখের কোণটা মুছিয়া লইলেন।

কমল বলিল, আজ আমরা ক'জনে নেমন্তন্নর সব রান্নাবান্না করব। জগবন্ধু হাত দিতে পারবে না। ব্রজনাথ হাসিয়া বলিলেন, তোরা ক'জনে মানে?

কমল নিজেদের হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, নূতনবৌ, আমি আর বৌঠাকরুণ।

ব্রজনাথ একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, নূতনবৌকে দিয়ে আজকেই রাঁধাবি? আর তার হাত আক্কেল নেই—ইয়ে অনেক দিন।

ইয়ে কথাটা দিয়া সারিয়া লইলেও কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে ব্রজনাথ সন্দেহ করেন নূতনবৌ রাঁধিতে পারে কি না।

কমল বলিল, নূতনবৌ রাঁধতে জানে।

ব্রজনাথ ক্ষীরদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, শুন্‌ছো, শিবনাথের বউ রাঁধবে?

ক্ষীরদা কর্ত্তার কথা বলাতে একহাত ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিলেন, তা' রাঁধুক।

কমলমধু অমনি একটানে নূতনবৌকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। মিনিট কয়েক পরেই তিনজনে খুব উৎসাহে রান্নাঘরের দিকে বড় বড় হাতা, ডেক, কড়া লইয়া চলিল।

ব্রজনাথ উঠানের দিকে চাহিয়া মিনতির স্বরে বলিলেন, ওরে বেহারী! হয়ে হাতটা ধুয়ে আমাকে এক কল্‌কে তামাক সেজে দে না।

(৪)

নূতন বউ পুরান হইয়া গিয়াছে। ব্রজনাথ বাঁধা নিয়মে কাজ করেন, খান, শয়ন করেন—তাহাতে কোনও ব্যতিক্রম নাই। শিবনাথ গাঁয়ে আসিয়া অবধি বাড়ীর বাহির হয় নাই। কেমন যেন তাহার বাহির হইতে ভাল লাগিত না, বাড়ীরই বাগানে, ক্ষেতে, পুকুরের ধারে সে সময় কাটাইয়া দিত।

ব্রজনাথ একদিন শিবনাথকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁ শিবু, তুমি গাঁয়ে একটু বেড়াতে টেড়াতে যাওনা কেন? হয়ে, সব্বাইকার সঙ্গে দেখা করলেও ত পারতে?

শিবনাথ এক কথায় সারিয়া দিল, ভাল লাগে না দাদামশাই।

ব্রজনাথ শিবনাথের উত্তরের অপেক্ষায় একটা অতি পুরাতন পলাশগাছের লাল ফুলগুলির দিকে চাহিয়াছিলেন। এই পলাশগাছটা যেন বছরে একবার ফরিয়া হাসে, আর সারা বছরটা ধরিয়া যেন কি ভাবে আর ভাবে। গাছে গাছে কত মিলন, কত বিরহ, ডালে ডালে কত গলাগলি, পাতায় পাতায় কত কানাকানি, ফুলে ফুলে দোল খাইয়া কত সোহাগ, লতাকুঞ্জের ডগায় ডগায় কত ঝগড়া, কত আস্ফালন, কিন্তু এই পলাশগাছটি তাহার ঠাঁইটি জুড়িয়া বনানীর সমস্ত উৎসব ও রিক্ততার ভিতর নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

ব্রজনাথ মাটী হইতে একটি পলাশফুল হাতে করিয়া তুলিয়া বলিলেন, হঁরে, কি বলছিলে শিবনাথ। শিবনাথও একটু অন্যমনস্ক ছিল, ব্রজনাথের প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হইবে যেন ভুলিয়া গিয়াছিল।

ব্রজনাথ কোনও উত্তর না পাইয়া আবার বলিলেন, গ্রামে বেড়িয়ে আসনা কেন এক একদিন?

শিবনাথ কিছু না ভাবিয়াই উত্তর করিল, ঐ যে বল্‌লাম, ভাল লাগে না।

ব্রজনাথ চোখ কপালে তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ভাল লাগে না কি শিবু? আমরা ত এখানেই চিরটা কাল কাটালাম, আমাদের ত খুব ভাল লাগে!

শিবনাথ বলিল, গ্রামটাকে ভাল লাগে না তাও বলছি না, গ্রামের লোক-গুলোকে ভাল লাগে না।

ব্রজনাথ কথা বলিতে বলিতে তাহাকে লইয়া গ্রামের রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, লোকগুলো ভাল লাগে না, গ্রামটাকে ভাল লাগে, তার মানে কি? লোকছাড়া গ্রাম, সে ত বন। তাহলে আর মানুষ গ্রামে আসে কেন, বনে গিয়ে থাকলেই পারে!

শিবনাথ বলিল, না তা না।

ব্রজনাথ বলিলেন, তা নয়তো কি বল্? ইয়ে, আমাকে ত সব কথা বলতে পার।

শিবনাথ কিছু বলিবার মত খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, এদের মনগুলো বড় ছোট। কেবল বাজে কাজ, বাজে কথা, অনাবশ্যক ঝগড়া ক'রে এরা দিন কাটায়। আমার তা' সহ্য হয় না।

ব্রজনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ও এই? তা এই লঘু অপরাধে এত গুরুতর শাস্তি দিচ্ছ কেন এদের?

শিবনাথ বলিল, বুঝতে পারলাম না দাদামশাই।

ব্রজনাথ হাসিয়া বলিলেন, পাগলছেলে, এতে বোঝাবুঝির কি আছে? ইয়ে, বীরগ্রামের লোকেরা ত তোমার আমার মত মানুষ-ই।

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শিবনাথ হাসিয়া বলিল, মানুষ! এরা যে কি তার নাম নেই। তোমাকে সে দিন কি অপমান করলে বল ত?

ব্রজনাথ এবার শিবনাথের রাগের একটা কারণ বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, অপমান যদি ক'রে থাকে ত বেশ করেছে। তুমি যে বিয়ে করলে, এদের কোন খবর দিয়েছি আমি? তুমি যে বউ নিয়ে আসছ, এদের আমি সে কথা কিছু বলেছি? এদের কি ঠিক সময়ে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল? আসবে কেন তারা আমার বাড়ীতে? ইয়ে, এত আর ভিখিরী বিশেষ নয়। ওরা যে আসেনি, এতেই বোঝা যায়, বীরগ্রামের লোকেরা মানুষ, আর কিছু নয়। তোমরা থাকবে দূরে দূরে, অথচ চাও এরা সব তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকুক! এটা কি বেশী চাওয়া নয়?

শিবনাথ বলিল, এই সব ঘোঁট পাকিয়ে পাকিয়েই ত এদের মনগুলো হয়ে যায় ছোট, জীবনগুলো হয়ে যায় অকর্ম্মণ্য।

ব্রজনাথ হাসিয়া বলিলেন, রাগ করো না শিবনাথ। তুমি এমন কি কাজ

করলে জীবনে, যে এদের বলছ অকর্ম্মণ্য! ক'খানা বই পড়েছ, ক'টা পাশ দিয়েছ, এই ত? কাজ ত তুমি এবার শুরু করবে সবে। আগে কাজ কিছু কর, দেখ্‌বে এরাও কাজ করছে।

শিবনাথ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, এখানে কাজ? এখানে ব'সে কি কাজ করব?—এখানে কি আছে, কে আছে যে কাজ করব?

ব্রজনাথ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, এখানে কিছু নেই, কেউ নেই বলেই ত কাজের জায়গা। পাহাড় কেটে যারা প্রাসাদ তৈরী ক'রে গেছে তারা বড় কারীগর না শহরে বসে হাজার কয়েক ইট্‌ বসিয়ে যারা টোঙ্গ তৈরী করেছে তারা কাজের লোক!

শিবনাথ একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহ'লে কি আপনি বলেন, এত কষ্ট ক'রে পাশটাশ ক'রে গ্রামে পড়ে থাক্‌তে হবে সারাটা জীবন!

ব্রজনাথ আবার হাসিলেন। সে হাসিতে মধুমাখা। বলিলেন, আমি কিছু বলিনা রে পাগল! আমি কেন তোমাদের কিছু বল্‌তে যাব? এতদিন কিছু বলেছি? ইয়ে, তোমার কথায় আজ বুঝ্‌লাম, বীরগ্রামের দশা দেখে তোমার মনে কষ্ট হয়েছে, ইয়ে, তাই এতগুলো কথা বল্‌লাম। আমার একটা কথা। হয় যে যার কাজ নিয়ে থাকুক, বীরগ্রাম পুড়ে যাক্‌, ছাই হয়ে যাক্‌, কেউ যেন তাদের কথা না ভাবে। আর নয় ত যার ভাবনা হয়—সে—এসে—তার নিজের সাধ্যমত, তার বুদ্ধিমত যা পারে গ্রামের জন্য করুক। সেখানে সে গ্রামের আপন, নয়ত সে দূরে ব'সে গ্রামের নিন্দে করলে সে শত্রুর চাইতেও পর। গ্রাম তাকে গ্রাহ্য করে না।

কথাগুলি বলিতে ব্রজনাথ একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, চল শিবু, বাড়ী ফেরা যাক্‌। আমার কদ শরীর দুর্বল লাগ্‌ছে।

শিবনাথ তাক্কার। সে একটু ভয় পাইয়া গেল। এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিলে বাবা মহাশয়ের অনিষ্ট হইতে পারে মনে করিয়া সে আলোচনাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, ক'টা মাস ত এখানে কাটিয়ে দিলাম, একবারও ত বল্‌লে না, নূতন বউ কেমন লাগ্‌ল তোমার।

ব্রজনাথ যেন খাস ফিরিয়া পাইলেন। পূর্ব্বের মত স্মিতহাস্যে বলিলেন, পাশমার্কা দিতে হবে নাকি, বাজারে বেচ্‌বি নাকি বউকে?

শিবনাথ বলিল, না জনু। তোমরা ত সব চ'টে ছিলে?

ব্রজনাথ চক্ষু বড় করিয়া বলিলেন, না, চটিনি একটুও। অন্তত আমি ত না। তবে একটা ভয় ছিল। দূরে থেকে অমন অনেক জিনিসকে ভয় হয়।

শিবনাথ জোর পাইয়া বলিল, এখনও ভয় আছে ?

ব্রজনাথ বলিলেন, আছে, একটু আছে। বর যদি তুমি এখানে থাকাই স্থির কর, তোমার বউ হয় ত গাঁয়ে পড়ে থাকতে চাইবে না। সে ক্ষেত্রে, আমি এও বলে রাখি, ইয়ে, তোমার শহরেই ফিরে যাওয়া উচিত হবে। সেখানে টাকাও রোজগার বেশী হবে, তোমাদের প্রয়োজন মত সুখ সুবিধারও বন্দোবস্ত আছে।

শিবনাথ দাদা মহাশয়ের একটি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বল আমাকে কি দেবে ? যদি বলি তোমার বউ-ই আগে বলেছে, এ গ্রামে আমাদের দু জনের থাকার কথা ?

ব্রজনাথ ক্ষণেকের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন।

শিবনাথ বলিল, বল, কিছু বল।

ব্রজনাথ বলিলেন, কি বল্‌ব তাই ভাব্‌ছি। ইয়ে, ভাবছিলাম ইয়ে, একটা কাজের সুবিধা হো'ল, যদি তোদের সঙ্গে খাটবার মত আমার সে শক্তি থাক্‌ত, যদি আর কিছুকাল বাঁচতে পারতাম! আর কম্‌লিটা! ওটা যে কি তা আজও বুঝলাম না। সত্যি ও যেন মত, যত পুরোন হচ্ছে তত আমার এই পড়ন্ত আয়ুতে ওষুধের মত কাজ করছে! ওর দিকেও একটু তাকাস্ শিবু।

শিবনাথ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে বলিল, আবার কি রকম ক'রে তাকাব ?

ব্রজনাথ লাঠিটি মাটিতে ধীরে ধীরে ঠুকিতে ঠুকিতে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, বুঝিস্‌নি সে কথা, বুঝবিও না কোনও দিন। ও আমাদের কে ? কিন্তু এই যে সংসারটাকে আগ্‌লে বসে আছে, শুধু তোর জন্য!

শিবনাথ আরও আশ্চর্য্য হইল।

ব্রজনাথ বলিয়া চলিলেন, ওকে আমি ইয়ে, একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম ভাবে প্রকারে, যদি তোকে বিয়ে করতে চায়। ওকি বল্‌ল জানিস্ ? ও বল্‌ল, বিয়ে ক'রে উনি আমাকে একদিন ঘৃণা করবেন তা হবে না। আমার এই ভাল। যখন বুড়ো হবে যাব, তখন ওঁর কাছে গিয়ে থাকব। মরবার সময় অবধি ওঁর কাছে থাকতে পারব এই আমার ঢের।

শিবনাথ অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে, কমল ? কি বল্‌ছ দাদা মশাই ?

ব্রজনাথ বাড়ীর খাটের কাছে আসিয়া একটু দাঁড়াইলেন। লাঠিটা ঠুকিয়া

একটা আক্-ক্ষেতের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, ঐ খান থেকে ওকে নিয়ে এসেছিলাম। ও ভাল ঘরেরই মেয়ে, আমি খোঁজ পেয়েছি শেষ কালে। কার মেয়ে তাও জানি। সে হতভাগিনী এখনও এ গাঁয়েই আছে।

শিবনাথ বিড় বিড় করিয়া বলিল, কমল আমাদের মামাত বোন্ নয়? ব্রজনাথ পাথরের মত শক্ত হইয়া বলিলেন, না, ও তোমাদের কেউ না, ও আমার কমলমধু। আমার কামিনী এক বউ, আর মনে মনে, কমল আমার শিবনাথের মরা স্ত্রী, আমার কমলমধু।—তারপর হঠাৎ যেন চমকিত হইয়া বলিলেন, দেখিস্, যেন ইয়ে, কমলকে এ কথা নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করিস্নি। তুই যখন ওর কিছুই বুঝ্লি না, ওকে বিয়ে না ক'রে অন্যত্র বিয়ে কর্লি, আমি ওকে বল্লাম, তুই বিধবা। কমল তাই জানে।

শিবনাথ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ব্রজনাথ তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন।

ব্রজনাথ বাহির বাড়ীতে গিয়া বরাণ্ডে বসিলেন। শিবনাথ বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া শিবনাথ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, নূতন বউ ধীরে ধীরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেড়াতে গিয়েছিলে, বুঝি বাবার সঙ্গে?

শিবনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হাঁ। অনুজা, কিন্তু আমাদের ত এখানে থাকা হয় না।

অনুজা মিষ্টস্বরে বলিল, কেন বল ত? বাবা বারণ করলেন?

শিবনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তবে?

শিবনাথ কি বলিবে ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিল না। কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সেখানে কমল আসিয়া হাজির হইল।

সে শিবনাথের মুখের ভাব দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। দৌড়িয়া গিয়া একটা পাথরের গেলাসে করিয়া বেলপানা লইয়া আসিয়া বলিল, এটুকু খেয়ে ফেলত।

শিবনাথ কমলের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কমল হাসিয়া ফেলিল। সে যেন শিবনাথের অনেক বড় এমনি ভাবে বলিল, খোকার মত আর চেয়ে থেকোনা, শরীর খারাপ লাগ্ছে, এটুকু খেয়ে ফেল দেখি।

অনুজা একটু হাসিয়া বলিল, তোমার দাদাটির মাথা খারাপ হয়েছে। ওঁর

নাকি এ গাঁয়ে থাকা হবে না !

কমল অমনি সোজাসুরে বলিল, এ নিয়ে এত ভাবা আমাদের কি আছে ? থাকা না থাকা তোমার ইচ্ছা ! বউএর গ্রামটাকে বড় ভাল লেগেছিল, আর আমাদের মনে হোল, তোমার ত আর অনেক টাকা রোজগার করবার দরকার নেই। বাড়ীতে যা' আছে, তাইতেই খেতে পরতে পাবে। তুমি যদি গ্রামে থাক, বাড়ীটাও থাকে, আর তোমাদের গ্রামটাও তাহলে ভাল হয়ে ওঠে। এতে ভাববার এত কি আছে ?

শিবনাথ এবার কথা বলিল, বলিল, তোমাদের গ্রাম মানে কি কমল ?

কমল তেমনি হাসিয়া কৌতুক-ভরে বলিল, তোমার দাদামশাই, তোমার মা, তুমি সবাই এ গ্রামের, তোমার ছেলেপুলেদেরও বাড়ী রয়েছে এখনও এইটে, কাজেই গ্রামে তোমাদের দাবী যেমন, দায়ীত্বও ততখানি। তোমাদেরই ত গ্রাম !

শিবনাথ সস্নেহে বলিল, আর তোর !

কমল বলিল, হাঁ আমারও। তোমাদের যেখানে আমারও সেখানেই দেশ, সেখানেই বাড়ী। তারপর একটু থামিয়া বলিল, তুমি যা' জাননা তাই নিয়ে কথা তুলো না। এখন খেয়ে কেল ত দেখিনাজী। কমলের শেষ কথাটায় শিবনাথের মনের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল। সে উঠিতে যাইবে এমন সময় কামিনী অন্ধকারে টুপ টুপ করিয়া আসিয়া বলিল, শিবু-ঠাকুরপো, তুমি আর বউ যাবে আমাদের বাড়ী খাবে। আর শোন, বলিয়া সে শিবনাথকে ইসারা করিয়া কাছে ডাকিল। শিবনাথ উঠানে নামিয়া গেল।

কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, কি ঠিক করলে ?

শিবনাথ বলিল, কিসের ?

কামিনী ভয়ে প্রাণে বলিল, আমাদের কাছে থাকবার ?

হয় না।

কেন হয় না জানতে পারি ?

কাল হোক, আজ আর হয় না।

উঠানে একটা বেলগাছ ছিল, তাহারই নীচেটা মাটী দিয়া উঁচু বেদীর মত করা ছিল। তাহারই উপর বসিয়া পড়িয়া শিবনাথ বলিল, কমল কে জান বউ ?

কামিনীও তাহার পায়ের কাছে উঠানের ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, জানি, কেন ?

তাহলে কি ক'রে হয় বল ? ও এরকম ক'রে পড়ে থাকবে আর আমি ওরই

সামনে—

কামিনী একটা লঘু হাসিতে কথাটা উড়াইয়া দিয়া বলিল, দূর পাগল, ও তেমন মেয়েই নয়; যদি সত্যি মরবার অবস্থা হোত তা হলেও একা মরত না। তোমাকে শুদ্ধ নিয়ে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ত। দূর, দূর, ও ত স্ত্রী নয় ও যে মধু। শুধু মিষ্টি, শুধু ভাল।

কামিনী ও শিবনাথ এমনি কথা বলিতে ছিল, এমন সময় দুই জনেই শুনিল, কমল একটু জোরেই কাহাকে বলিতেছে, বোলনা ওকথা আমাকে, আমি শুধু কমলমধু এই জানি—তাছাড়া আর আমি কেউ না, কিছু না। পিসেমশাই আমার ঐ নাম দিয়েছেন, আমি দিবা রাত্রি ঐ নামের কথাই ভাবি।

আবার অম্বুজার গলার স্বর শোনা গেল। সে বলিতেছে, তাহলে, তুমি তাঁকে কেন কিছু বুঝতে দাও নি! আমাকে এতদিন কেন কিছু বলনি? আমাকে তাহলে বিশ্বাস কর না!

কমল উত্তর করিল, করি করি, আমি সবাইকে বিশ্বাস করি। কিন্তু এও জানি আমার বিশ্বাস করবার দরকারও নেই।

এ সময় ব্রজনাথ ভিতর বাড়ীতে আসিয়া ডাকিলেন, অম্বুজা-মা কোথায় রে?

অম্বুজা উঠানে নামিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা ও রাত্রির একটি স্তিমিত আলোকে মানুষ গুলিকে দেখা যায় কিন্তু অপরিচিতকে চেনা যায় না—এমনি একটি আলোছায়ার স্নিগ্ধ জড়তা।

অম্বুজা কাছে আসিতে ব্রজনাথ বলিলেন, তোমার বড়-মাকে বল, আজ তোমাদের সবাইকার তারানাথদের বাড়ী এবেলা খাবার নিমন্ত্রণ। আমি যেতে পারব না বলে দিয়েছি বিশ্বনাথকে। সে নিজে এসেছিল বলতে। ইস্, আমি ওসব কুপথ্য করলে আবার অসুখে পড়বো, তাকে বলেছি। তোমরা কিন্তু সবাই যেও।

জগবন্ধু হঠাৎ চেঁচাইতে চেঁচাইতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল, মধুভুং! মধুভুং!

তাহার কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়ে, কি বোলছে আবার জগবন্ধু?

কর্তাকে দেখিয়া জগবন্ধু হঠাৎ যেন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে একহাত জিভ বাহির করিয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

কর্তা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে রে জগবন্ধু?

জগবন্ধু যাই যাই করিয়াও যাইতে পারিল না। দাঁড়াইয়া পড়িল।

শিবনাথ উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি মধুতুং জগাদাদা ?

জগবন্ধু দুই হাত নাড়িয়া চোখ মুখ বিকৃত করিয়া উড়িয়া উচ্চারণে বলিতে লাগিল, পাড়ায় কি কথা শুনিনু সবদিদি—শিবুদাদার বউ সাখ্যাতেক পাড়্বতী।

তাহার কথা শুনিয়া সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ব্রজনাথ হাসি থামাইয়া বলিলেন, উঠে যাও ত জগু ও বাড়ীতে, এরা সব খাবে এ বেলা তারানাথের বাড়ী। তুমি গিয়ে ইয়ে একটু ওদের ঘরে কষ্টে দাও গে।

জগবন্ধু চলিয়া গেলে শিবনাথ বলিল, বাছ্ আমরা এখানেই থাকবো ঠিক করলাম।

অম্বুজা একপা একপা করিয়া বড়ঘরের দাবার কাছে গিয়া একপাকে বারান্দায় উঠিয়া, কমল যেখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে গিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল, কমলমধু!

কমল তাহার বড় বড় চোখ দুইটি তুলিয়া অম্বুজার দিকে চাহিয়া রহিল।

অম্বুজা তাহার অঙ্গুল দিয়া আস্তে আস্তে কমলের চোখের পাতাদুইটি বুজাইয়া দিয়া তাহার মুখখানি কমলের চোখের উপর রাখিয়া আবার ডাকিল, কমল!

এতখানি আবেগে কমলের মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না, শুধু একটা অর্থহীন শব্দ মাঝে মাঝে তাহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া উঠিতেছিল, ভাষাহীন এই শব্দ, তবুও যেন সমস্ত প্রাণের আবেগ ইহাতে স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছিল।

ব্রজনাথ ডাকিলেন, কমলমধু!

পোষা সোহাগী বিড়াল শাবকের মত, দুলিতে দুলিতে দুলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে কমল যাইয়া ব্রজনাথের বুকের মধ্যে তাহার মাথাটি রাখিল।

একটী নিবেদন

সাহায্য, সহানুভূতি এবং মানুষ ও দেবতার আশীর্ব্বাদে ৩০শে চৈত্রে কল্লোলের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইবে। আমরা কাহাকে বাছিয়া বাছিয়া ধন্যবাদ দিব, জানি না। ছাপাখানার কম্পোজিটার হইতে আরম্ভ করিয়া, আমাদের গ্রাহক, সমালোচক, ও লেখক সকলের কাছেই আমরা সমস্ত বৎসর ধরিয়া সাহায্য পাইয়াছি।

দুর্দ্দিন ও অভাবের ভিতর দিয়া যে শক্তির বলে কল্লোল এই দীর্ঘপথ একান্ত নিষ্ঠার সহিত অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বৎসরের মুক্তদ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সে শক্তি মানুষ নানা বাধা ও বিপত্তির মধ্যেই সঞ্চয় করে, তাই তাহার কোনও নাম নাই, তাই একান্ত গোপন এ শক্তির কথা প্রকাশ করিবার মত কোন ভাষাও নাই। কেবল মাত্র কন্টকাকীর্ণ দিনের দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া এ পথে চলিয়া যাওয়া ভিন্ন এ পথ ধরিয়া যাওয়া অসম্ভব। যাহাদের সুখ দুঃখের বৈচিত্র্য লইয়া এ যাত্রা, তাহাদের আনন্দের জয়োল্লাস ও একান্ত সঙ্কট এ পথের আশা। ইহার বেশী ভাবিবার আমাদের কিছুই নাই।

নূতন বৎসরে কল্লোল কেমন হইবে তাহা আজই বলা সম্ভব নয়। যে সুর যে দিন বাজিয়া উঠিবে, তাহা সময়ের হৃদয়-বার্ত্তা, কল্লোলের তাহা অস্বীকার করিবার অধিকার নাই।

আয়োজন মানুষ অনেক করে, কল্লোলকেও আগামী বৎসরে আরও মনোজ্ঞ ও বিশিষ্ট করিতে আমরা চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সে কথা বলিয়া এখনই প্রয়োজন দেখাইবার মত আমাদের ইচ্ছা নাই।

আগামী ১৩৩২ বৈশাখ মাসে কল্লোলের তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হইবে।

নূতন ও পুরাতন গ্রাহকদিগের কাছে আমাদের এই একটি ও একই নিবেদন। আশা করি আপনারা আমাদের এই প্রার্থনাটি গ্রাহ্য করিবেন।

গত দুই বৎসরে দেখিয়াছি, আমাদের পুরাতন গ্রাহকদিগের মধ্যে নূতন বৎসরের প্রারম্ভে বড় কেহ কল্লোল ছাড়িয়া দেন নাই। তবুও নূতন বৎসর আরম্ভের পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে মনে করাইয়া দিতে চাই, তাঁহারা যেন কল্লোলের ১৩৩২ এর বার্ষিক মূল্য ৩॥০ টাকা (সাড়ে তিন টাকা) চৈত্র মাসের ২৫শে তারিখের ভিতর মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। ভিঃ পিঃতে বৈশাখ মাসের কাগজ পাঠাইতে হইলে প্রথমতঃ, গ্রাহকগণ কাগজ অনেক দেরীতে পাইবেন। কারণ এতগুলি ভিঃ পিঃ করা একদিনে হইয়া উঠে না। ভিঃ পিঃ প্যাক করা, প্রত্যেকের জন্য আলাদা করিয়া ফরম্ লেখা, ডাকঘরে এতগুলি ভিঃ পিঃ পার্শেল রেজেষ্ট্রী করিতে অনেক বিলম্ব হয়। ইহা ভিন্ন ভিঃ পিঃ তে কাগজ লইলে গ্রাহকদের কিছু খরচ বেশী পড়ে তাহা সকলেই জানেন।

দ্বিতীয়তঃ, ভিঃ পিঃতে কাগজ গেলে অনেক সময়ে অকারণে কাগজগুলি ডাকঘরের মারফৎ আমাদের নিকট ফিরিয়া আসে। কাগজগুলির আসা

পাওয়াতে ছিঁড়িয়া যায় এবং প্রত্যেক ভিঃ পিঃ-র জন্য টিকিট ও রেজিষ্ট্রেশন বাবদ আমাদের অনেকগুলি অর্থ দণ্ড হয়।

তৃতীয়ত, গ্রাহকগণ যখন নূতন বৎসরের কাগজ যথাসময়ে পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াও ঠিক সময়ে কাগজ পান না, তখন আমাদের ত্রুটী হইয়াছে মনে করিয়া চিঠি লেখেন। এই সকল চিঠির প্রত্যেক খানির বুঝাইয়া উত্তর দেওয়াও আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য হয়। অথচ বিনাকারণে আমাদের অনুগ্রাহকগণের নিকট আমরা বিরাগভাজন হই।

এই সকল কারণে, গ্রাহকগণের প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারাও একটু কষ্ট করিয়া ১৩৩২-এর বার্ষিক মূল্যটি যদি সময় মত মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে এতগুলি অসুবিধা হইতে সকলেই নিষ্কৃতি পাই। আশা করি আপনারা সকলেই মনিঅর্ডার করিয়া নূতন বৎসরের জন্য সাড়েতিনটি টাকা পাঠাইয়া দিয়া আমাদের বাধিত করিবেন।

একান্ত যাঁহার অসুবিধা হইবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ২৫শে চৈত্রের ভিতর জানাইবেন, তাঁহাকে বৈশাখের কাগজ ভিঃ পিঃ করিয়া পাঠান হইবে কি না। ইহাও অনুরোধ করি, যাঁহারা কোনও কারণে, আগামী বৎসরে কল্লোলের গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা পত্রপাঠ ২৫শে চৈত্রের পূর্ব্বেই সে কথা জানাইবেন।

একটু অনুগ্রহ করিলেই অনায়াসে মনিঅর্ডার করিয়া টাকা কয়টি পাঠাইতে বা একখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়া ভিঃ পিঃ করা হইবে কি না এ কথাটি আমাদের জানাইতে পারেন, আশা করি গ্রাহকগণ আমাদের একটুকু সাহায্য করিতে দ্বিধা করিবেন না। আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে আশা করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত রহিলাম।

বৎসরের প্রথমেই গ্রাহক হওয়া ভাল হয়, নচেৎ মাঝখানে গ্রাহক হইলে, সমস্ত সংখ্যার কাগজ দেওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। গত বৎসরে অনেককে এজন্য আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসুবিধায় ফেলিতে হইয়াছে, আশা করি, আমাদের এ কথাটি বিশ্বাস করিয়া, যাঁহারা কল্লোলের নূতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও ২৫শে চৈত্রের ভিতরে "নূতন গ্রাহক" এই কথাটি উল্লেখ করিয়া ৩॥৹ টাকা অগ্রীম পাঠাইয়া দিবেন।

দূরে ও নিকটস্থ আমাদের সকল আত্মীয় ও সাহায্যকারী সকলকে আমাদের নমস্কার জানাইতেছি। গতবৎসরের অনিচ্ছাকৃত আমাদের সকল ত্রুটি তাঁহারা মার্জ্জনা করুন।

কল্লোল কার্য্যালয়।
১লা চৈত্র, ১৩৩১
২৭নং কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীট,
কলিকাতা